একত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৩১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

[এই সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ আনা]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি, বি এ,

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ   শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী ; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম্ এ, এল্ এম্ এস্ ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ ; শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ্ ডি ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য— সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবন-চরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালা একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

বঙ্গাব্দ, ১৩৩১

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্
মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

একত্রিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩২

গ্রাহক-পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৹ বার আনা।

দ্বাত্রিংশ ভাগের সূচি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার একত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

ফ

ব

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(২)

এক্ষণে এই সপ্তভঙ্গী নয় কিরূপ, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সপ্ত-ভঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী এইরূপ,—"স্যাৎ কথঞ্চিৎ স্বদ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপেণ অস্ত্যেব সর্ব্বং কুম্ভাদি।" আমরা কেবলমাত্র "কুম্ভঃ অস্তি"—এইভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে 'কুম্ভঃ অস্তি'—এই বাক্যে যে অস্তিত্বের আভাস আছে, সে অস্তিত্বকে একান্তভাবে ধরিতে হয়, সুতরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, 'অস্তি' এই শব্দের দ্বারা 'মৃত্তিকা অস্তি', 'বৃক্ষঃ অস্তি', 'বস্ত্রম্ অস্তি'—এইরূপ বাক্যও সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত হইয়া পড়ে। আরও এক কথা, উহা দ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কুম্ভ, যে কোন কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান কুম্ভ, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশিষ্ট কুম্ভের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে কুম্ভটী স্বীয় উপাদান-দ্রব্য মৃত্তিকা অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে, জল প্রভৃতি রূপে নহে, এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ অবচ্ছেদে বিদ্যমান পরক্ষেত্রে নহে, কুম্ভটী পাটলিপুত্র নামক দেশবিশেষে আছে, কান্যকুব্জে নহে। এইরূপে স্বীয় কাল অপেক্ষায় বিদ্যমান, কিন্তু পরকীয় কাল অপেক্ষায় নহে, কুম্ভটী শীতকালে বিদ্যমান, কিন্তু বসন্তে নহে। এবং উহা রক্তবর্ণের, কিন্তু পীতবর্ণের নহে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র ঐকান্তিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়, তাহা হইলে এ সকল ব্যাবর্ত্তকের অভাবে বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থ-স্বরূপের (Identity) অভাব হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রথম প্রকার বচন-ভঙ্গের দ্বারা কুম্ভটী কোন বিশেষ দেশ, কাল, উপাদান এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এবং আমরা বলিয়া থাকি—'স্যাৎ কুম্ভঃ অস্তি', বা আরও সংক্ষেপে 'স্যাদস্তি'। আবার যেহেতু এই কুম্ভের অস্তিত্বের অঙ্গীকার কেবল অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ও তাহাদের ধর্ম্মের নাস্তিত্বের (Non-being) অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং কেবল 'স্যাদস্তি' ইহাই বলা চলে না, 'স্যান্নাস্তি', ইহাও বলিতে হয়। তবে এই 'স্যাদস্তি' ও 'স্যান্নাস্তি' এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা বা বক্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাধান্য দিতে হয়। কখন বা তিনি অস্তিত্বের দিক্‌টাই বলিতে চান, তখন ঐ দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করে; আর নাস্তিত্বদিক্‌টা গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; একটী অন্যটী

ব্যতিরেকে থাকে না।[১] অতএব সপ্তভঙ্গী-নয়ের প্রথমটী হইল, 'স্যাদস্তি'; দ্বিতীয়টী 'স্যান্নাস্তি'। প্রথমটী বিধি-কল্পনা-প্রসূত; দ্বিতীয়টী নিষেধ-কল্পনা-প্রসূত।

সপ্তভঙ্গী-নয়ের তৃতীয় ভঙ্গ অতি সুগম। কেবলমাত্র বিধি ও নিষেধের ক্রমিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন[২]। উহা এই প্রকার 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি চ'। চতুর্থ ভঙ্গটী এইরূপে উদ্ভূত হয়। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ধর্ম্ম যদি যুগপৎ প্রাধান্য-সহকারে একই বস্তুতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বস্তুর স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া উঠে। ইহারই নাম অবক্তব্য নয়। প্রথম তিনটী নয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটীতে একবার বিধির প্রাধান্য ও আর একবার নিষেধের প্রাধান্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তদিতর সমুদায় বস্তু এবং তদীয় অন্য যাবতীয় ধর্ম্মের নাস্তিত্বের অঙ্গীকার অনুস্যূত রহিয়াছে। তবে যখন আমরা কোন বস্তুতে অস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে বিধির প্রাধান্য; আবার যখন নাস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে নিষেধের প্রাধান্য। এই দুই স্থলেই বিধি ও নিষেধের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারে বাক্য-বিন্যাস করা হইয়া থাকে মাত্র; ক্রম বা যৌগপদ্যের প্রসর নাই। কিন্তু তৃতীয় নয়ে বিধি-নিষেধ, উভয়েরই প্রাধান্য থাকিলেও, ক্রমিক আরোপবশতঃ উহা চতুর্থ ভঙ্গ হইতে বিভিন্ন। চতুর্থ নয়ে বিধি এবং নিষেধ, উভয়ই প্রধান এবং উভয়ই সমকালে একই বস্তুতে আরোপিত হয়। একই কালে একই বস্তু 'অস্তি'ও বটে 'নাস্তি'ও বটে, সুতরাং মানব ধীর অগম্য এবং এজন্য অবক্তব্য, কিন্তু গত্যন্তর নাই। কারণ, বস্তুর স্বরূপই হইল—ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় দেওয়া। মানব-চিন্তাশক্তি এইখানে স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত ভঙ্গ চারিটী পরস্পর মিলিত করিলে আরও তিনটী ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পঞ্চম ভঙ্গটীর প্রকার হইবে এইরূপ—'স্যাদস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আবার অবক্তব্যও বটে। ষষ্ঠ ভঙ্গটী হইবে,—'স্যান্নাস্তি অবক্তব্যঞ্চ'। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাইও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। এবং সর্ব্বশেষে সপ্তম ভঙ্গে আমরা পাই,—'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে—নাইও বটে; আবার অবক্তব্যও বটে। উপরি-উক্ত সপ্ত প্রকার বচন-বিন্যাসের সমুদায়ের নাম সপ্তভঙ্গী নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তুর ধর্ম্ম যখন অনন্ত, তখন বিধানপুরঃসর হউক বা নিষেধ-পুরঃসরই হউক, বচনভঙ্গও কেন অনন্ত হউক না, কেবল সপ্তপ্রকারই বা কেন হইবে? এ প্রশ্ন জৈনাচার্য্যগণ নিজেই উত্থাপিত করিয়া, নিজেই সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,

১। "তস্মাদ্বস্তুনোঽস্তিত্বং নাস্তিত্বেনাবিনাভূতং নাস্তিত্বং চ তেন ইতি। বিবক্ষাবশাচ্চ অনয়োঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবঃ।"

—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৭৮

"The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible"—Mill's *Examination of Hamilton's Philosophy*—pp. 471—472.

২। ক্রমতো বিধিনিষেধকল্পনয়া তৃতীয়ঃ।

যে, বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত, ইহা সত্য। কিন্তু যে কোন এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিধি-নিষেধপূর্ব্বক বচনবিন্যাস করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ঐরূপ সপ্তপ্রকার বচন-ভঙ্গেরই সম্ভাবনা; কারণ, উক্ত অবলম্বিত বস্তু-ধর্ম্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি সপ্ত প্রকারের অধিক হইবার উপায় নাই। উহা সপ্তপ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা বলেন যে, যেমন অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের সাহায্যে সপ্তধা বচন-বিন্যাস সম্ভব দেখান গেল, ঐরূপ সামান্য ও বিশেষ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতির সাহায্যেও সপ্তপ্রকারই বচন নির্দ্দেশ হইবে। যথা স্যাৎ সামান্যং, স্যাদ্বিশেষঃ, স্যাদুভয়ং, স্যাদবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যাবক্তব্যং, স্যাদ্বিশেষাবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যবিশেষাবক্তব্যম্। এস্থলেও বিধি নিষেধের প্রয়োগ অব্যাহত আছে। 'বস্তু স্যাৎ সামান্যং'—এই বাক্যে সামান্যের বিধান করা হইতেছে এবং স্যাদ্বিশেষঃ—এই বাক্যেও নিষেধ নিহিত আছে। কারণ, বিশেষ ব্যাবৃত্তিপরায়ণ, এবং ব্যাবৃত্তি অর্থে পার্থক্য বা পৃথক্করণ বুঝায়। যখন কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত, একথা বলা হয়, তখন আমরা বুঝি যে, প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তুটীর সহিত সমান নহে। সুতরাং বিশেষেও নিষেধ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধেও বিধি-নিষেধ-সহকারে সপ্তভঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনভঙ্গ সপ্তধা নিয়মিত। সাতের বেশী হয় না। কিন্তু সাতের কমে নামিতে পারা যায় কিনা, সে কথা জৈনাচার্য্যগণ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, জৈনগণ বিবেচনা করেন যে, এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গই বস্তু-সম্বন্ধে খাটে। কেন না, ইহাদের যে কোন একটী বচনভঙ্গ মাত্র পাক্ষিক, অথবা আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সুতরাং উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটী নয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মাত্র খণ্ডসত্যে উপনীত হইয়াছেন। বস্তুস্বরূপ-পরিচায়ক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণ ঐরূপ পাক্ষিক বা খণ্ডসত্যের পরিচায়ক বচন-বিন্যাসের তাঁহারা নাম দিয়াছেন "বিকলাদেশ", "নয় সপ্তভঙ্গী" অথবা নয়াভাস। পক্ষান্তরে সমুদিত ভঙ্গসপ্তক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ-প্রকাশে সমর্থ, সুতরাং অখণ্ড সত্যের পরিচায়ক। এজন্য উহার নাম "সকলাদেশ" অথবা "প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী"[১]।

উপরে স্যাদ্বাদের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে আমরা উহা হইতে স্যাদ্বাদ-সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। সে কয়েকটী তথ্য এই,—প্রথমতঃ যদি প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকে, তবে বাস্তবিক বস্তু অনন্ত এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ সত্তা (বিধি), অসত্তা (নিষেধ) এবং অবক্তব্য অথবা অনির্ব্বাচ্য এই কোটিত্রয়ে বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বাক্য-বিন্যাসই

১। বিকলাদেশস্বভাবা হি নয়সপ্তভঙ্গী বস্ত্বংশমাত্রপ্ররূপকত্বাৎ।
সকলাদেশস্বভাবা হি প্রমাণসপ্তভঙ্গী যথাবৎ বস্তুপ্ররূপকত্বাৎ॥"

—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পৃ ২০৬ খ।

(judgment) সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ কোন এক প্রকার বাক্য-বিন্যাসই একান্ত সত্য হয় না, আপেক্ষিক সত্যের সূচনা করে মাত্র। তাহা হইলে স্যাদ্‌বাদে বাহ্যবস্তুর স্বরূপ হইতেছে এইরূপ। বস্তুর জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে (Realism), কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই বস্তুর এক একটা দিক্ (aspects) অথবা এক এক রকম ধর্ম্মের বা বিকাশের (manifestations) গ্রহণ করিতে সমর্থ, সুতরাং পাক্ষিক সত্যের আভাস দেয় মাত্র, এবং এই অফুরন্ত বিকাশের পশ্চাতে যে স্বরূপ-শক্তি আছে, তাহার অস্তিত্ব উক্ত অনন্ত বিকাশের নিদান-স্বরূপ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে কি ইহা Herbert Spencerএর Transfigured Realismএর সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত। একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, Spencerএর চিন্তাপ্রণালী ও স্যাদ্‌বাদ ঠিক একই নহে। স্পেন্সরের মতেও বস্তুজগৎ জ্ঞান-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং আমাদের জ্ঞান কেবল উহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা আপেক্ষিক সত্য প্রদান করে বটে। কিন্তু ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহা এক ও অনন্ত (Absolute and Infinite) —যাহার বলে আপেক্ষিক (relative) সত্যগুলির উদ্ভব বা অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্‌বাদ ও স্পেন্সরের Transfigured Realism উভয়ই বস্তুতন্ত্রবাদী হইলেও স্পেন্সর একত্বের পক্ষপাতী (Monistic), পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদ বহুত্বের পক্ষপাতী (Pluralistic Realism). এতদ্ভিন্ন স্পেন্সর আমাদের জ্ঞেয়-জগতের (world of experience) ভিত্তিস্বরূপ যে এক স্বরূপশক্তির (Power) স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু তাঁহার মতে অজ্ঞেয় (unknown and unknowable); পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান অস্বীকৃত হয় নাই।

আর এক কথা, স্যাদ্‌বাদে আমরা পাইলাম যে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (relative truths). কিন্তু এই আপেক্ষিক ভাবটাই আবার নিজেই আপেক্ষিক। কোন প্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার আপেক্ষিকতা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা উহাকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অবশেষে এক অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হই, যাহাতে এই অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সমাধান হয়[১]। কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদে এরূপ অবশ্য-উত্থাপনীয় অনপেক্ষ বা একান্ত সত্যের (Absolute truth) স্বরূপ-নির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছেন যে, সপ্তভঙ্গী নয়ের সমুদিত প্রয়োগেই প্রামাণ্য; আর তদ্ভিন্ন যাবতীয় বাক্য-বিন্যাস প্রমাণাভাস—অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। অবশ্য জৈনগণ এক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের '**কেবল জ্ঞান**'। এই জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মের মল ধৌত হইয়া গিয়াছে—এক কথায় যিনি 'জিন' হইয়াছেন, তাঁহারই এই **বিশুদ্ধ জ্ঞান** (Pure Intelligence) যাহা আত্মার

১। Cf. Bradley's "Coherence view of Truth". "But though transcending these modes of experience, it includes them all fully".—*Essays on Truth and Reality*, pp. 343-44.

স্বাভাবিক সম্পত্তি, ফিরিয়া আসিয়াছে। এই 'কেবল জ্ঞান' বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, ইহার নিকটে দেশ বা কালকৃত ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ও একান্ত এবং অখণ্ড সত্য স্বয়ং প্রকাশ লাভ করে। (Intellectual Intuition ইহা অনেকটা Schelling-এর ম॰) কিন্তু এই 'কেবল জ্ঞান' এক মুখ্যজ্ঞান ধরিয়া লইয়া বস্তুস্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, জৈনগণের অনেকান্ত-বাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, (১) জৈনদিগের চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ; (২) সত্তা, অসত্তা এবং অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য, এই কোটিত্রয় অবলম্বনে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের বাস্তবিক অবকাশ আছে কিনা; এবং (৩) সর্ব্বশেষে স্যাদ্‌বাদের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলি প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন অন্যান্য মতবাদের সংঘর্ষেই সমুৎপন্ন হয়। এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক যে, জৈনদিগের স্যাদ্‌বাদ যখন প্রথমে জগতে ঘোষিত হয়, তখন ঐ প্রকার চিন্তার ধারা ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে স্থান পাইয়াছিল কিনা। যে সময় ভারতে স্যাদ্‌বাদের ঘোষণা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ভারতে আরও দুইটী প্রধান চিন্তার ধারা প্রবাহিত ছিল। একটী বৌদ্ধ ও অপরটী ঔপনিষদিক জৈনদিগের ধর্ম্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, ভদ্রবাহু-রচিত "সূত্রকৃতাঙ্গ-নির্য্যুক্তি" নামক গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে। এই ভদ্রবাহুর জীবনকাল-সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই[১]। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তিনি যে সময়ে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, সে সময় বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত অনেক-পরিমাণে সংগঠিত হইয়াছিল[২], এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল[৩] এবং উহাদের চিন্তার ধারা এবং মতবাদগুলি সম-সাময়িক দার্শনিক-জগতের উপর কতক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রবাহু সর্ব্বপ্রথম স্যাদ্‌বাদের প্রচার করিলেও পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি বাচকমুখ্য "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র" নামক জৈন-দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে সমন্তভদ্র ঐ গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার মুখবন্ধের নাম "আপ্ত-মীমাংসা"। এই আপ্ত-মীমাংসায় স্যাদ্‌বাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সমন্তভদ্রের জীবনকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

১। পরলোকগত মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ভদ্রবাহুর কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

২। প্রায় সমুদায় ত্রিপিটক বৌদ্ধ-গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪১ বৎসরের পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়া গিয়াছিল।—দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির সময় ৭০০—৬০০ খৃঃ পূঃ (ঐ)।

অতএব পরবর্ত্তী কালে মাণিক্য নন্দী-রচিত "পরীক্ষামুখসূত্র" (আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ), প্রভাচন্দ্র কবি-রচিত পরীক্ষামুখসূত্রের টীকা "প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড" নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ৮২৫ খৃষ্টাব্দ) হরিভদ্র-রচিত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" (১১৬৮ খৃষ্টাব্দ), মল্লিষেণ কৃত "স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী" (১২১৪ শকাব্দ ১২৯২ খৃষ্টাব্দ[১]) প্রভৃতি গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্যাদ্‌বাদের চিন্তা-প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, স্যাদ্‌বাদের উপর বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্যবাদের প্রভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, স্যাদ্‌বাদের হস্তে ক্রীড়নক হইল তিনটী,—সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্য, অথবা সামান্য, বিশেষ ও অবক্তব্য; অথবা নিত্য, অনিত্য ও অবক্তব্য, অর্থাৎ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমিক উল্লেখ ও তাহাদের যুগপৎ প্রাধান্যবশতঃ বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতা। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধম্ম-পিটকের সুত্ত ও বিনয়-পিটকের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ে সাম্য থাকিলেও উহাদের অপেক্ষায় অভিধম্ম-পিটক অধিক-পরিমাণে যুক্তি-তর্কের সাহায্য গ্রহণ করে। আবার সেই অভিধম্ম-পিটকের মধ্যে "কথাবত্থু" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় বিরুদ্ধ-মতাবাদিগণের[২] খণ্ডনপ্রসঙ্গে দ্বিকোটিক তর্কের উত্থাপন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাঁহাদের মতবাদগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আধার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইহার কিছু পরে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই (৪০১ খৃষ্টাব্দ) প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার শূন্যবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন বস্তুরই কোন নিজস্ব 'স্বভাব' বা সত্তা নাই। তাপকে অগ্নির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, তাপ এবং অগ্নি উভয়েই অন্য অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল তাহাই কোন বস্তুর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না; এবং জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং সর্ব্ববস্তুই নিঃস্বভাব। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা শূন্যবাদের নিগূঢ় অর্থ। ফলতঃ যেমন আমরা কোন বস্তু-সম্বন্ধে "ইহার স্বভাব এই"—এরূপ বিধিপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, সেইরূপ "ইহার স্বভাব এরূপ নহে"—এরূপ নিষেধ-বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং বস্তু-স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১। মল্লিষেণ তাঁহার পুস্তকের রচনা-কাল পুস্তকের শেষে স্বয়ং দিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীমল্লিষেণসূরিভিরকারি তৎপদগগনদিনমণিভিঃ।

বৃত্তিরিয়ং মনুরবিমিতশকাব্দে দীপমহসি শনৌ।" (মনুরবি—১২১৪)

২। কথাবত্থুর টীকাকার এই কয়েকটী বিরুদ্ধমতবাদীর উল্লেখ করেন যথা,—মহাসঙ্ঘিকাঃ, লোকোত্তরবাদিনঃ, কক্কুলিকাঃ, প্রজ্ঞপ্তিবাদিনঃ, একব্যবহারিকাঃ এবং সর্ব্বাস্তিবাদিনঃ। ইহাদের মধ্যে মহাসঙ্ঘিকবাদে জৈন-সম্মত আত্মার কৃৎস্ন-শরীর-ব্যাপিত্বের ন্যায় চিত্তের সর্ব্বশরীর ব্যাপিত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।—(নারায়ণ, ১৩২২, শ্রাবণ)।

দৃশ্যমান জগতে বস্তুনিচয় এক ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসলাভ করিতেছে। এইরূপ উৎপাদ ও ধ্বংস ব্যতিরেকে তাহাদের কোন নিজস্ব স্বভাব নাই। এ জগৎটাই এরূপ নিঃস্বভাব, উৎপাদ ও বিনাশের প্রবাহ মাত্র। ইহারই অপর নাম "প্রপঞ্চ-প্রবৃত্তি"। এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্তির নাশেই নির্ব্বাণ; এবং নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। নির্ব্বাণের স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা ভাবরূপও নহে, আবার অভাবরূপও নহে। নির্ব্বাণ ভাবরূপ হইলে, উহা কতকগুলি কারণ-সামগ্রী হইতে "সংস্কৃত" বা উৎপন্ন এবং যাহা উৎপন্ন, তাহা ধ্বংসশীল। আবার উহা অভাবস্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, যখন শূন্যবাদে কোনরূপ ভাবপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না, তখন অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃই নিরাকৃত হয়। সুতরাং দেখা গেল, নির্ব্বাণ ভাবস্বরূপও নহে; অভাব-স্বরূপও নহে। পরিশেষে মাধ্যমিকেরা নির্ব্বাণ বা শূন্যকে "চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা 'অস্তি'ও নহে, 'নাস্তি'ও নহে, তদুভয়ও নহে, অনুভয়ও নহে। উহা অনির্ব্বাচ্য বা জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা অবক্তব্য। এইরূপে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য লইয়া বৌদ্ধ বিচারপ্রণালী জৈনের স্যাদ্‌বাদকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না।

স্যাদ্‌বাদ ও বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যবাদ। অদ্বৈতবাদে মায়া ও মায়াপ্রসূত এই জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ-নির্ণয়প্রসঙ্গেও ঠিক এই সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ কি না—উহা সৎ। কারণ, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, তাবৎ উহার অস্তিত্ব আছেই ত এবং উহা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিত্রী বটেই ত। আবার ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই উহার তিরোভাব, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-সংসারেরও তিরোভাব হয়, সুতরাং মায়া সৎও বটে, অসৎও বটে। পরন্তু উহা 'সদসত্ত্যামনির্ব্বাচ্যা'। এইরূপে এই অনির্ব্বচনীয়া মায়া হইতে প্রসূত বলিয়া জগৎ-সংসারের যাবতীয় বস্তুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার এবং অনির্ব্বাচ্য।

এই মায়ার স্বরূপ এবং অনির্ব্বাচ্যবাদ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি অতি প্রাচীন উপনিষদে ঠিক এইরূপে প্রচারিত নাই সত্য এবং এমন কি, মায়া শব্দটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে আর কোন উপনিষদে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহাও সত্য, তথাপি বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ও ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মায়াবাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে চিন্তাপ্রণালী আরব্ধ হইয়া, পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জৈনাচার্য্যগণের চিন্তার ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

পক্ষান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের তর্কপাদে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদানুসারে একই বস্তুতে যুগপৎ সত্তা ও অসত্তাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া স্যাদ্‌বাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বাচ্য মায়ার

সাহায্যে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। জগতের বস্তুজাত মায়াপ্রসূত বলিয়া তাহারাও সৎও বটে, অসৎও বটে, এজন্য অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে তিনিও ত বস্তুতে সদসত্ত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র তর্ক-পাদে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও জৈনচার্য্যগণের চিন্তার ধারার অনেকটা অনুরূপ। তাঁহার পরে শ্রীহর্ষ তাঁহার "খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যে" অনির্ব্বাচ্যবাদ-সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ জগতে কোন বস্তুই অস্তি বা নাস্তি—এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, আবার উহা সৎও বটে, অসৎও বটে ; উহা সদসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় ; উহা অনির্ব্বাচ্য বা অবক্তব্য। এজন্য শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম "অনির্ব্বচনীয়তাসর্ব্বস্ব"। নৈয়ায়িকই শ্রীহর্ষের শরব্য। কারণ, নৈয়ায়িকই লক্ষণ-সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষও নৈয়ায়িকের যত লক্ষণ উক্ত প্রকার ত্রিকোটিক যুক্তি-সাহায্যে একে একে তাহার সমস্ত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যখন লক্ষণ টিকিল না, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ব্বচন করা যায় না। এক কথায় উহা অনির্ব্বাচ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিতে পারি যে, খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক ত্রিকোটিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জৈনগণ স্যাদ্বাদের অবতারণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদের সহিত স্যাদ্বাদের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক—উভয়েই বস্তুকে এক হিসাবে বাধিত করিয়াছেন, স্যাদ্বাদ বস্তুস্বরূপ সাধিত করিয়াছে। বৌদ্ধমতে বাহ্য জগৎ শূন্য, বেদান্তমতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবহারিক জগৎ বাধিত এবং ব্যাবহারিক বাহ্যজগতের মধ্যেও এক উচ্চস্তরের সত্যের অপেক্ষায় নিম্নস্তরের সত্য বাধিত। স্যাদ্বাদ দেখাইয়াছে যে, বস্তু সত্তা ও অসত্তা, নিত্যতা ও অনিত্যতা, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার হইতে পারে। ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশেই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধি। বিরোধি-ধর্ম্মাধ্যাস বস্তুর বাধিতত্ব বা শূন্যতা আপাদন করা দূরে থাকুক, বস্তুর বাস্তবতাই সম্পাদন করে। কারণ, প্রতীতি ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমান আমাদিগকে জ্ঞাপন করে যে, কেবল নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, সামান্য ও বিশেষ, দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই উভয়াত্মক বস্তুই আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির সহায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমুদায় বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের বাধ ও বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের নাশ, পরন্তু জৈনের স্যাদ্বাদে জগতের প্রতিষ্ঠা।

আর এক কথা। আমরা পূর্ব্বে স্যাদ্বাদের সপ্ত প্রকার বচন-ভঙ্গের আলোচনা-কালে দেখিয়াছিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনবিন্যাস সপ্ত প্রকার মাত্রই হইবে ; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, বচনভঙ্গ জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত সপ্ত প্রকার জিজ্ঞাসার পর আর সন্দেহের বা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না। সেইখানেই বচনের বিশ্রান্তি হয়। সুতরাং স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ

স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, এই **সপ্ত-প্রকারই** তাঁহাদের মতে আবশ্যকীয় বচনভঙ্গ। উহার কমও নহে, বেশী নহে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জৈনগণের মতবাদ সত্যের অদূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত বচনভঙ্গের **সপ্তপ্রকার** সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার, সুতরাং এক ধর্ম্ম অপেক্ষায় ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় ইহাতে নাস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়। পরে ঐ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের ক্রমিক আরোপ করিলে 'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ' এইরূপ বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যের প্রয়োগ বেশ বুঝা যায়। এবং অবশেষে সেই একই বস্তুতে যুগপৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কল্পিত হইলে, বাস্তবিকই বস্তুস্বরূপ অবক্তব্য হয়, এপর্য্যন্তও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার পর পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট তিনটির ভঙ্গের প্রয়োগের অবকাশ আছে বলিয়া, অন্ততঃ আমার মনে হয় না। কারণ, চতুর্থ ভঙ্গে যাহাকে অবক্তব্য বলিয়া আপন ধীশক্তির অক্ষমতা মানিয়া লইলাম, আবার তাহার সম্বন্ধে বচনবিন্যাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং আমার এরূপ ধারণা যে, চতুর্থ ভঙ্গেই বস্তুসম্বন্ধীয় চিন্তার ও বাক্যের বিশ্রান্তি হওয়া উচিত। অথচ উহাতে জৈনগণের প্রতিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের হানিও হয় না। অবশ্য ইহাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

ইহার পর আরও একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। তাহা স্যাদ্‌বাদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের শাসনের সম্বন্ধে। স্যাদ্‌বাদের বিস্তারিত আলোচনায় বোধ হয়, ইহাই সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে, বাস্তব-জগতে বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার প্রহেলিকাময়। কারণ, কোন বস্তুকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না, আবার নাইও বলিতে পারি না। নিত্যও বলিতে পারি না, আবার অনিত্যও বলিতে পারি না। একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। বস্তু তাহার নিজ স্বরূপের দ্বারা প্রতিনিয়তও বটে, আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্য জৈন আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইও না। করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত হইবে। আমার মনে হয়, ইহার ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধের উপদেশ আর নাই। পারমার্থিক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন এক প্রকার একান্ত-সত্য-প্রকাশক বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহায্যে বাহ্য বস্তু লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ততক্ষণ আমার বোধ হয়, স্যাদ্‌বাদ-প্রদর্শিত বস্তুস্বরূপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় বাস্তবিক সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে পারে। কিন্তু উহাই প্রকৃত বস্তুর স্বভাব এবং প্রকৃত বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়; কতকগুলি কল্পিত আন্তর ভাবের সহিত নহে।

এস্থলে আরও একটী কথার উত্থাপন বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্রে (Logic) Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নামে

তিনটী নিয়ম আছে। সেই তিনটী নিয়মের কার্য্য হইতেছে, ভাব-রাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity অনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে বস্তুটীকে একবার যে প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন A is A, ঘট ঘটই। A is B, এ কথা বলা চলে না, বা ঘটটী নূতন বা ঘটটী পুরাতন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। Law of Contradiction বলে যে, একটী মাত্র বস্তুতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কল্পনা করা যায় না। A cannot be both B and not—B. ঘটটী মৃৎ-সংস্থানবিশেষও বটে, আবার মৃৎসংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথা বলা যায় না। এইরূপে Law of Excluded middleএ বলা হয় যে বস্তু কোন দ্বিকোটিবিনির্ম্মুক্ত, এ কথা বলা চলে না। হয় বল, ঘট অস্তি, না হয় বল, ঘটটী নাস্তি; উহা 'অস্তি' ও 'নাস্তি' —এই দুই ভিন্ন অপর কিছু, এ কথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্ত্য প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ তর্ক-শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিতে চান যে, ঐ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহীন আন্তর-জগতে খাটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব-জগতে খাটে না। সেই জন্য Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Are they laws of thought or of things?" বাস্তব-জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা সেই বাস্তব-জগতের বস্তু-সমুদায়ের প্রকৃতি-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্-বাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই Schiller-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ চিরন্তন বস্তুনিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) সংস্কারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিষ্টটল-কথিত একান্ত-স্বরূপতা (rigid identity) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রকৃতিসিদ্ধ বস্তুজগতে ঐরূপ একান্তস্বরূপতার অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তুই নিত্যও বটে, পরিণম্যমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাতে Identityও আছে, আবার differenceও আছে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা উৎপাদ, ধ্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত। উহা 'অস্তি'ও বটে, 'নাস্তি'ও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। সুতরাং উপরি-কথিত একান্তবাদী Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নিয়মত্রয়ের অবকাশ বস্তুজগতে নাই।

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

আমাদিগের অয়নাংশ *

আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের অয়নাংশ লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়া আছে, তাহার মীমাংসার কিছু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে যে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত সভ্যগণ কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। পঞ্জিকাকারগণ স্বেচ্ছামত অয়নাংশ স্থির করিয়া নিজ নিজ পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী সিদ্ধান্ত-রহস্য-মতে অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর মতানুসারে অয়নাংশ গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিপূর্ণ, তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমান্ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার" নামক পুস্তকে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমবন্ধু শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters নামক সাময়িক পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধটীতে তিনি হিন্দুদিগের অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটী বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায়, তাহা সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখি যে, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদ নহে; অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষের পক্ষ হইতে এভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর এক কথা, জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কারণ, সে কথা আমার পক্ষে আদৌ খাটে না। এই প্রবন্ধ-পাঠে যদি সকলে অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখ করিয়া রাখি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারিয়া বৃথা বাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মতান্তর হইতে মনান্তরে উপনীত হন ও বৃথা গালাগালি করিয়াই ক্ষান্ত হন—ফলে কিছুই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। বিজ্ঞান শাস্ত্রে কোন বিষয় এইরূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ইহাতে আমরা আমোদ না পাইয়া রাগান্বিত হইব কেন? এই বিষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে আমাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রবন্ধটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, মহাসিদ্ধান্ত, ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মূল, সরল অনুবাদ ও একটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করা হইয়াছে। সাধারণের উপলব্ধির জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের যে যে অংশ না জ্ঞাত থাকিলে উপস্থাপিত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধা হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রথমে কিছু লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

১। আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং পিতামহ-সিদ্ধান্তে অয়নাংশের কোন উল্লেখ পাই নাই। ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তেও এ সম্বন্ধে কোন কথা দেখা যায় না। গ্রহলাঘবাদি আধুনিক গ্রন্থ অনাবশ্যক-বোধে আলোচিত হইল না।

(ক) সোমসিদ্ধান্ত। আমরা সোম-সিদ্ধান্তে সংক্ষেপে অয়নাংশ-নিরূপণের প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। স্পষ্টাধিকারে ৩১ ও ৩২ শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

যুগে চ ষট্‌শতৈকত্বে ভচক্রং প্রাক্ চ লম্বতে।
তদ্‌গুণো ভূদিনৈর্ভক্তো দ্যুগণোঽয়নখেচরঃ॥
তচ্ছুদ্ধচক্রদোর্লিপ্তা দ্বিশত্যাপ্তায়নাংশকাঃ।
সংস্কার্য্যা জূকমেষাদৌ কেন্দ্রে স্বর্ণং গ্রহে কিল॥

একযুগে (মহাযুগে) ভচক্র ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হয়। এই সংখ্যা ভূদিন (অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে গত দিন-সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে দ্যুগণ (অর্থাৎ এক যুগের দিন-সংখ্যা) দ্বারা ভাগ করিলে, অয়ন-খেচর (অয়নগতি) নির্ণীত হইবে।

ভূদিনের অয়নগতির শুদ্ধচক্রকে (অর্থাৎ ভুজজ্যাকে) ৬০০ ছয় শত দ্বারা বিভক্ত করিয়া ২০০ দুইশত দ্বারা গুণ করিলে, অভীষ্ট ভূদিনের অয়নাংশ পাওয়া যাইবে।

অয়নগ্রহ তুলাদি ছয় রাশিতে হইলে অয়নাংশ গ্রহে যোগ এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিয়োগ করিয়া সংস্কার করিতে হইবে।

প্রথম প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক মাত্র—দ্যুগণ : ভূদিন : : ৬০০ : অভীষ্ট ভূদিনের অয়নগতি। (ক)

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটী (ক) এর ভুজজ্যা নিরূপণ করা।

তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ও একটী ত্রৈরাশিক—

৬০০ : অয়নগতির ভুজজ্যা : : ২০০ : অয়নাংশ। এই অয়নাংশ তুলাদি ছয় রাশিতে অবস্থিত হইলে, ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিযুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ নিরূপণ।

সৃষ্টির আদি হইতে অভীষ্ট বর্ষ পর্য্যন্ত গতবর্ষ-সংখ্যা—

সৃষ্টির আদি হইতে কলিযুগের আদি পর্য্যন্ত		১৯৬৯৯২০০০০
শকাব্দের আদি পর্য্যন্ত গত কলিবর্ষ	...	৩১৭৯
শকবর্ষ ...	...	১৮৪৪
	মোট	১৯৬৯৯২৫০২৩

অতএব অয়নগতি

$$= \frac{৬০০ \times ১৯৬৯৯২৫০২৩ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}{৪৩২০০০০০ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}$$

$$= ২৭৩৬০০|২৫১ \text{ অংশ ৯ কলা।}$$

ইহার চক্র (বৃত্তাংশ) = ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা (বিষমপাদে অবস্থিত বলিয়া)

= ২৫১ অংশ ৯ কলা — ১৮০ অংশ

= ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ $= \frac{৭১।৯ \times ২০০}{৬০০}$

$= ৭১।৯ \times \frac{১}{৩}$ ($\frac{২}{৬}$)

= ২৩ অংশ ৪৩ কলা।

(খ) **ব্রহ্মসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আমরা অয়নাংশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার অয়নাংশ-বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮৪—১৯৪ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কর্ক্যাদিস্থা মৃগাস্তস্থাঃ সৃষ্টেরুদগবাঙ্মুখাঃ।
প্রত্যব্দং যান্তি যাম্যোদগগমনে বিহিতেঽপি যৎ॥
তত্তৎ পশ্চান্নবক্রান্তিপ্রসঙ্গাদত্রিদৃগ্লবাঃ।
ততোঽন্যথাঽথ প্রত্যব্দং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ ব্রজন্তি হি॥
তত্তৎ পশ্চান্নবক্রান্তিপ্রসঙ্গেঽপি নিজাস্পদাৎ।
পশ্চিমাংশক্রমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং হিতং॥
যাবৎ সৃষ্ট্যাদিনির্দিষ্টস্থানং তাবৎ প্রভান্তি তে।
আদ্যোষু চরন্তাং তেষামন্তরং শান্তদাস্পদাৎ॥

তদ্বৎপ্রাগংশকক্রান্তিপ্রাপ্তেঃ স্যাৎ প্রাগ্‌লবস্য চ।
প্রাক্ চক্রং চলিতং চেতি নারদেবোপর্যাতে॥
প্রাগংশক্রমমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং ভবেৎ।
প্রাক্‌পশ্চাচ্চলনাংশোনাঃ স্বর্ণং স্যাস্তাস্করাদিষু॥
ক্রান্তিকীলাংশলগ্নানাং লম্বনং হ্যগতং দ্বয়োঃ।
স্ফুটার্থময়নার্থং চ প্রত্যহং হ্যুদয়াস্তয়োঃ॥
যদ্দিনে যস্য কক্ষা চ তত্র তেষাম্ প্রবৃত্তিতঃ।
ইত্যেতদেকং চলনং প্রাক্ যুগেতানি চ ষট্‌শতম্॥
যুক্ত্যাঽয়নগ্রহস্তস্মিংস্তুলাদৌ প্রাক্‌চলং ভবেৎ।
তচ্ছুদ্ধচক্রে বিযুক্ত্যা মেষাদৌ প্রাক্ চলং ভবেৎ॥
অয়নাংশস্তদ্‌ভুজাংশাস্ত্রিঘ্নাঃ সন্তোদশোদ্ধৃতাঃ।
প্রাক্‌প্রত্যক্‌চলনং চক্রস্যেবেতি মন্যতে তু যঃ॥

সৃষ্টির আদি হইতে পরবর্ত্তী কালে কর্কটের আদিতে এবং মকরের অন্তে স্থিত যাহা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিতেছে, সেই সচলক্রান্তি পশ্চাদ্দিকে ২৭ সাতাইশ অংশ চালিত হয়, তবে তাহাতে এই অন্যথা যে, ইহা প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ করিয়া চালিত হয়। এইরূপে পশ্চিমদিকে চালিত ক্রান্তি নিজ স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইলে, ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হইতে থাকে এবং সৃষ্ট্যাদি স্থানে যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ চলিতে থাকে। সচল ক্রান্তিপাতের নিজ স্থান হইতে আদিস্থানের অন্তর অয়নাংশ। নিজ পূর্ব্বগতি এবং পূর্ব্বাংশ-স্থিত ক্রান্তি পাইবার জন্য ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়—নারদও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ক্রমশঃ পূর্ব্বাংশ অপ্রাপ্তে (অর্থাৎ যতদিন পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত না হয়) চক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। (ভচক্রের) এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চলনের জন্য অয়নাংশ সূর্য্যাদিতে যুক্ত এবং বিযুক্ত হয়। ক্রান্তিচ্ছায়া ও লগ্নের দিনগত লম্বন (পরিমাণ) এবং প্রত্যহ উদয়াস্তের স্পষ্টার্থ অয়নের জন্য (হইয়া থাকে)।

যে কক্ষায় ছিল, সেই কক্ষায় ক্রান্তিপাতের পুনরাগমনে এক অয়নচলন হয়। এক যুগে তাহা পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার। অয়নগ্রহের তুলাদিতে পূর্ব্বদিকে গতি হইলে, অয়নাংশ যোগ করিতে হয়। মেষাদিতে শুদ্ধচক্রে পূর্ব্বদিক্‌গমনে বিয়োগ করিতে হয়।

অয়নগ্রহের ভুজাংশকে তিন গুণ করিয়া দশ ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে রাশিচক্রের গতি জানিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তকারের মতেও অয়নগ্রহ এক যুগে (মহাযুগে) ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। তিনিও অয়নগ্রহের ভুজাংশ গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে যে প্রক্রিয়াটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সোমসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, তবে ইহাও একটী ত্রৈরাশিক—

১০ (৯০) : অয়নগ্রহের ভুজজ্যা : : ৩ (২৭) : অভীষ্ট অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩। এক মহাযুগে অয়নগ্রহের ৬০০ বার চলনের হিসাবে অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহের চলন ২৭৩৫০।২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্রাংশ (বৃত্তাংশ) ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১ অংশ ৯ কলা − ১৮০ অংশ

　　= ৭১ অংশ ৯ কলা

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)}$$

　　= ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(গ) **সূর্য্যসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুযায়ী; অয়নাংশের বিবরণ কিন্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তখানি অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও প্রচলিত। ইহার অনেক টীকাও লিখিত হইয়াছে। অয়নাংশবিবরণ যে স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চাৎ শ্লোকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী অয়নাংশের শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যে কোন গোলযোগ নাই, তাহা অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপ্রশ্নাধিকারে ৯—১২ শ্লোকে অয়নাংশের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্ভূদিনৈর্ভক্তাদ্ দ্যুগণাদ্যদবাপ্যতে ॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ ॥
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্ ॥
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে।
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥

এক মহাযুগে ভচক্র ৩০ × ২০ বা ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হইতে থাকে (ভাস্করাচার্য্য ৩০০ বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ৬০০ বার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন)।

অহর্গণকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া যুগের দিন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহার ভুজাংশকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা হইল, তাহাই অয়নাংশ

অয়নাংশ সংস্কৃত গ্রহ হইতে ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদি সাধিত হইবে।

অয়নে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সংযোগে) এবং বিষুবদ্বয়ে দৃক্‌তুল্যতা দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হইবে।

ছায়া হইতে প্রাপ্ত রবি (রবিস্ফুট) হইতে গণিতাগত রবি হীন হইলে চক্র পূর্ব্বগামী হয়। ছায়া সাধিত রবি হইতে গণিতাগত রবি অধিক হইলে উভয়ের অন্তরাংশ পরিমাণে ভচক্র পশ্চিমগামী হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তানুযায়ী। প্রথম ও তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ত্রৈরাশিক।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ অভীষ্টবর্ষের অহর্গণে ভচক্রের পরিভ্রমণ।

$$= \frac{\text{অহর্গণ} \times ৬০০}{\text{যুগের দিন-সংখ্যা}}$$

$$= ২৭৩৬০।২৫১ \text{ অংশ } ৯ \text{ কলা।}$$

ইহার ভুজজ্যা ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০}$$

$$= ২১ \text{ অংশ } ২০ \text{ কলা } ৪২ \text{ বিকলা।}$$

(ঘ) **বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত**। এই সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব বজায় রাখিয়া একটী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় অয়নাংশ নিরূপণের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধ্যমাধিকারে ৩৬—৩৮ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ শত ১৮০০ শিষ্টেহব্দে
৬২৭ বিনিঘ্নে বিভাজিতে বিষমে।
ভুক্তে যুগ্মে গম্যে খখগজচন্দ্রৈ ১৮০০
চলাংশকা স্বর্ণাঃ॥

ছায়াগণিতাগতয়োর্ভানোর্বিবরং চলাংশকাস্তে বা।
ছায়ার্কাদ্‌গণিতার্কো হীনঃ পূর্ব্বোহন্যথা পশ্চাৎ॥
খচরাশ্চলস্তি তস্মাৎ পূর্ব্বে যুক্তাশ্চ পশ্চিমে হীনাঃ।
তস্মাদপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদিকং সাধ্যং॥

১৮০০ বৎসরের অবশিষ্ট বর্ষকে (অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে,) ২৭ দিয়া গুণ করিয়া ১৮০০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

অয়নাংশ অযুগ্মপাদে থাকিলে যুক্ত ও যুগ্মপাদস্থ হইলে বিযুক্ত হইবে।

ছায়াসূর্য্য ও গণিতসূর্য্যের প্রভেদ অয়নাংশ (নামে অভিহিত); ছায়ার্ক গণিতার্ক হইতে হীন হইলে অয়নাংশ পূর্ব্বে এবং অন্যথ হইলে পশ্চিমে অবস্থিত হয়।

সূর্য্যাদি গ্রহের পূর্ব্বে থাকিলে অয়নাংশ যুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশ বিযুক্ত হইবে। তাহা হইতে অপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদি সংস্কার করিতে হয়।

বৃদ্ধবসিষ্টসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতানুযায়ী। প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক।

এক যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ভচক্র ৬০০ বার লম্বিত হয়, সুতরাং $\frac{৪৩২০০০০}{৬০০}$ বা ৭২০০ বৎসরে ইহা একবার লম্বিত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ৭২০০ বৎসরে অয়নাংশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৭ × ৪ বা ১০৮ অংশ গমনাগমন করে।

সুতরাং অয়নাংশের ২৭ অংশ গমনে $\frac{৭২০০}{৪}$ বা ১৮০০ বৎসর লাগে।

ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করে বলিয়া গ্রন্থকার অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দিয়া ভাগ দিতে বলিয়াছেন। ভাগফল যত হইবে, ততবার ক্রান্তি-পাতবিন্দু ও নিরয়ণবিন্দুর মিলন হইবে, সুতরাং ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই বর্ষ-সংখ্যায় ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে ত্রৈরাশিক দ্বারা ঐ বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ নির্ণীত হইবে।

১৮০০ : অবশিষ্ট বর্ষসংখ্যা : : ২৭ : অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ = $\frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{১৮০০}$ = ১০৯৪৪০২ ভাগশেষ ১৪২৩

সুতরাং অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ = $\frac{১৪২৩ \times ২৭}{১৮০০}$ = ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(ঙ) **বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে কেবল অয়নাংশ-নিরূপণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (স্ফুটগত্যাধিকারে) ৫৫ম শ্লোকে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায় লিখিত আছে,—

অব্দাঃ খখদ্ব্যগৈ ৭২০০ র্ভাজ্যাস্তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশোদ্ধৃতাঃ।

অয়নাংশা গ্রহে যুক্তা···

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ৭২০০ দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহার অংশাদির ভুজজ্যা তিন গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩

$\frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{৭২০০} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৬০০}{৪৩২০০০০}$ = ২৫১ অংশ ৯ কলা

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১।৯ − ১৮০ = ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ = ৭১।৯ × $\frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)}$ = ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী।

(চ) **মহাসিদ্ধান্ত**। আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে আমরা দুইটী পৃথক্‌গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ শ্লোকে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—

সপ্তর্ষীণাং কুণিধুধিধুধিজা

এককল্পে সপ্তর্ষিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অয়নগ্রহের ভগণ দেওয়া আছে,—

.........মসিহটমুধাঃ।

অয়নগ্রহস্য

অয়নগ্রহের ভগণ এক কল্পে ৫৭৮১৫৯।

আর্য্যভট দুইটী ভগণই এক কল্পের জন্য স্থির করিয়াছেন।

পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে—

অয়নগ্রহদোঃ ক্রান্তিজ্যা চাপং কেন্দ্রবদ্ধনর্ণ স্যাৎ।

অয়নলবাস্তৎ সংস্কৃতখেটাদায়নচরার্দ্ধপলানি॥

অয়নগ্রহের (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের) ভুজজ্যা হইতে ক্রান্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া তাহার চাপকে মেষাদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিযুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কৃত খেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্‌কর্ম্মাদি) ও চরার্দ্ধপল নির্ণীত হয়।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩।

এককল্পে অয়নগ্রহ-ভগণ ৫৭৮১৫৯

এক কল্পের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০

সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩ : : ৫৭৮১৫৯ : অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগণাদি

$$\text{অভীষ্ট বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৫৭৮১৫৯}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= \frac{১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= ২৭৩৬৪১।৬৩ \text{ অংশ } ২৬ \text{ কলা } ৫১\cdot৮ \text{ বিকলা}$$

বৃত্তের প্রথম পাদে থাকায় ৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা ইহাই ভুজজ্যা।

৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা = ৩৮০৬·৮ কলা।

৩৮০৬·৮৬ কলার চাপ = ৩০৭৫·৪৬

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ = ১৩৯৭

$$\text{অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার চাপ} = \frac{(৩০৭৫\cdot৪৬) \times ১৩৯৭}{৩৪৩৮}$$

$$= ১২২০\cdot৫৯৮ \text{ চাপ}$$

ইহার ধনু = ২২ অংশ ১ কলা ১২·৪৮ বিকলা

= অয়নাংশ (যুক্ত)।

এ স্থলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তর্ষি-ভগণের এক কল্পে যে সংখ্যা উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটী ৬টী অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনায় ৪ পৃষ্ঠা এবং contents এর ৩ পৃষ্ঠায় তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাংশ ১৭৩'৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এককল্পে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯ × ১২৯৬০০০ বিকলা (অর্থাৎ ৩৬০ অংশের বিকলা-সংখ্যা); এবং এক কল্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া ঐ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সৌর বর্ষে অয়নগ্রহ চলন

$$= \frac{৫৭৮১৫৯ \times ১২৯৬০০০}{৪৩২০০০০০০০} \text{ বা } ১৭৩\text{'}৪৪৭৭ \text{ বিকলা।}$$

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্য্যভটের মতে অয়ন-গ্রহের ৩৬০ অংশ-ভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪ × ৪ = ৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং বার্ষিক অয়নাংশ =

$$\frac{১৭৩\text{'}৪৪৭৭ \times ৯৬}{৩৬০} = ৪৬\text{'}২৫২৭ \text{ বিকলা}$$

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

(ছ) **সিদ্ধান্তশিরোমণি**। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে ইহা লিখিত আছে—

বিষুবৎক্রান্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥
অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদ্যৈ স এবায়ং।
তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোঽঙ্গর্ত্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥

বিষুবরেখা ও ক্রান্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রান্তিপাত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাতের ভগণ বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতিষিগণ তাহাকে অয়নচলন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯।

পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরতো যাম্যদিশং যাম্যান্তাত্তদনুসৌম্যদিগ্‌ভাগং।
পরিসরতাং গগনসদাং চলনং কিঞ্চিদ্ভবেদপমে॥

বিষুবদপক্রম-মণ্ডল-সম্পাতে প্রাচিমেষাদিঃ।
পশ্চাত্তুলাদিরনয়োরপক্রমাসম্ভবঃ প্রোক্তঃ॥
রাশিত্রয়ান্তরেঽস্মাৎ কর্কাদিরমুক্রমান্মৃগাদিশ্চ।
তত্র চ পরমাক্রান্তি র্জিন-ভাগ-মিতার্থ তত্রৈব॥
নির্দ্দিষ্টোঽয়নসন্ধিশ্চলনং তত্রৈব সম্ভবতি।
তদ্ভগণাঃ কল্পে স্যুর্গোরস-রস-গোঽঙ্ক-চন্দ্র-মিতাঃ॥

উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গগনে বিদ্যমান ক্রান্তি চলিতে চলিতে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতেছে। বিষুবদ্‌বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাতের পূর্ব্বদিকে মেষাদি এবং পশ্চিমদিকে তুলাদি রাশি ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। ক্রান্তিপাত হইতে তিন রাশি অন্তরে যথাক্রমে কর্কটাদি ও মকরাদিতে পরমক্রান্তি অবস্থিত। তাহাই অয়নসন্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং সেই স্থান হইতে অয়ন-চলনের আরম্ভ। এককল্পে তাহার ভগণ ১৯৯৬৬৯। এসম্বন্ধে আমরা আবার আলোচনা করিব।

২। এক্ষণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ক) প্রথমতঃ, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং বসিষ্ঠসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব একপ্রকার। আমরা দেখিতে পাই যে, (১) অয়নগ্রহ (বা ভচক্র) এক মহাযুগে ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে চালিত (ঘূর্ণিত হয়), (২) তৎসঙ্গে ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণবিন্দু হইতে কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) সরিয়া গিয়া আবার নিরয়ণবিন্দুতে আগমন করতঃ অপর দিকে ঐ কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়া আবার পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হয়। এসম্বন্ধে আবার দুইমত দেখা যায়—(১) সোমসিদ্ধান্তের এবং (২) অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মত। (১) সোমসিদ্ধান্ত-মতে ক্রান্তিপাত-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর উত্তরদিকে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং অয়নগ্রহের একবার পূর্ণপরিবর্ত্তনে (৩৬০ অংশ) ক্রান্তিপাতবিন্দু মোট ৩০ × ৪ বা ১২০ অংশ গমনাগমন করে।

ধরা যাউক, নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহ ও ক্রান্তিপাতবিন্দু চালিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে (অর্থাৎ প্রথম পাদের শেষে) উপস্থিত হইল, তখন ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ৩০ অংশ সরিয়া আসিয়াছে। অয়নগ্রহ চলিতে চলিতে ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে, ক্রান্তিপাতবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ২৭০ অংশে আসিয়া পড়িল, ক্রান্তিপাতবিন্দু তখন নিরয়ণ-বিন্দুর অপরদিকে চালিত হইয়া তাহা হইতে ৩০-অংশ দূরে উপস্থিত হইল। অবশেষে যখন অয়নগ্রহ ৩৬০ অংশে অর্থাৎ আদ্য-স্থানে আসিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল; ক্রান্তিপাতবিন্দুও পশ্চাদ্‌গতিতে উঁহাদের সহিত একত্র হইল।

সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সাধিত হয়। (১) অভীষ্ট-বর্ষে অয়নগ্রহের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। অয়নগ্রহের পূর্ণপরিবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয় বলিয়া পূর্ণপরিবর্ত্তনের পর যে অংশকলাদি অবশিষ্ট থাকে

তাহা হইতেই অয়নাংশ নির্ণীত হয়। এক মহাযুগে অয়নগ্রহ চলন ৬০০ বার হয়, সুতরাং ত্রৈরাশিক দ্বারা অভীষ্ট-বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ চলন নির্ণীত হয়। (২) অবশিষ্ট অংশকলাদির ভুজ-সংস্কার করিতে হইবে। এক্ষণে ইহার আবশ্যকতা দেখা যাউক। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিল, ক্রান্তিপাতবিন্দু ৩০ অংশে আসিয়া পৌছিল। প্রথম পাদে অবস্থিতির দরুণ নিরায়ণ-বিন্দু হইতে উভয়ের দুরত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং অয়নগ্রহ যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই তাহার ভুজজ্যা, এস্থলে অয়নগ্রহের দুরত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশ হইতে দ্বিতীয়পাদে গমন করিবে, তখন তাহার সঙ্গে ক্রান্তিবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে অপসৃত হইতে থাকিবে, এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহের দুরত্ব (অয়নাংশসম্বন্ধে) লইতে হইলে ১৮০ অংশ হইতে তাহার স্থানের দুরত্ব পশ্চাদ্‌গণনায় তাহার ভুজজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপে তৃতীয়পাদে প্রথমের মত এবং চতুর্থপাদে দ্বিতীয়ের মত ভুজজ্যা নির্ণীত হইবে। (৩) অয়নগ্রহের অবশিষ্ট অংশাদির ভুজজ্যা হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা অয়নাংশ নির্ণীত হইবে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, অয়নগ্রহের ৯০ অংশ গতিতে অয়নাংশের ৩০ অংশ গতি হয়।

৯০ : ৩০ : : অয়নগ্রহের অংশাদির ভুজজ্যা : অয়নাংশ।

(২) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত ও বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মত এক প্রকার। তাহাদের মত সোমসিদ্ধান্তমতানুযায়ী, তবে এই প্রভেদ যে, তাহাদের মতে অয়নগ্রহের ৯০ অংশ চালনে ক্রান্তিপাত-বিন্দু ২৭ অংশ চালিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে ইহা মোটামুটি ২৬ অংশ ৩০ কলা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যভটের মত উল্লিখিত সিদ্ধান্তজ্যোতিষগ্রন্থগুলির মত হইতে কয়েক বিষয়ে ভিন্ন। (১) আমরা মহাসিদ্ধান্তে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ দেখি। সপ্তর্ষি-নক্ষত্রপুঞ্জের ধ্রুবতারার চতুর্দ্দিকে একবার পূর্ণ পরিবর্ত্তনকে সপ্তর্ষি-ভগণ কহে, এক কল্পে তাহা ১৫৯৯৯৯৮ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভটের মতে ২৭০০ বৎসরে এক সপ্তর্ষি-ভগণ হয় ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে Precessional period ; আধুনিক মতে ইহা ২৫৮৬৮ বৎসর। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লিপিপ্রমাদবশতঃ ২৭০০০ বৎসর ২৭০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে ২৭০০০ বৎসর হিসাবে ইহার বাৎসরিক গতি ৪৮ বিকলা হয়। সম্ভবতঃ ১৫৯৯৯৯৮ স্থলে ১৫৯৯৯৮ হইবে। (২) আর্য্যভটের মতে অয়নাংশ-নিরূপণ এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহ ভগণ এককল্পে ৫৭৮১৫৯, অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থাপেক্ষা হীনতর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় দিকে গমনাগমন না ধরিয়া পরমক্রান্তি-বিন্দুর (Solstitial Point) নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে গমনাগমন হইতে অয়নাংশ নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যাই অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। চতুর্থতঃ, অয়নগ্রহের পূর্ণ ঘূর্ণনে পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ করিয়া উভয় দিকে গমনাগমন করে। যদিও তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাহা সহজেই নির্ণীত হয়। অয়নগ্রহ যেমন সরিতে থাকে,

পরমক্রান্তি-বিন্দুও নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকে। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিয়া পড়ে, তখন ইহার ক্রান্তিজ্যা ২৪ অংশ, সুতরাং ইহাই অয়নাংশ। অয়নগ্রহ দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইলে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে বলিয়া তাহার ক্রান্তিজ্যাও কমিতে থাকিবে এবং পরমক্রান্তি আবার নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে। অয়নগ্রহ ১৮০ অংশে থাকিলে, পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। অয়নগ্রহ তৃতীয় পাদে উপনীত হইলে, প্রথম পাদের ন্যায় পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকিবে (তবে অপর দিকে) এবং অয়নগ্রহ ২৭০ অংশে আসিলে পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আবার ২৪ অংশ দূরে আসিয়া পড়িবে। অয়নগ্রহ চতুর্থ পাদে আসিলে পরমক্রান্তি-বিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে, এবং অবশেষে অয়নগ্রহ ও পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-মতে ইহা ২৪ অংশ ৩০ কলা। পঞ্চমতঃ, অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার পরিমিত অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, অয়নগ্রহের চলনের হার (rate) একরূপ হইলেও, অয়নাংশের গতির হার সমরূপ হইবে না। যেমন অয়নগ্রহ প্রতি বৎসর সমহারে চালিত হইতে থাকে, অয়নাংশের গতি কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন হইতে থাকিবে। পর পর কয়েক বৎসরের অয়নাংশ নির্ণয় করিলেই, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নাংশ একেবারে অন্যান্য গ্রন্থকারের অয়নাংশ হইতে ভিন্ন। মুঞ্জালের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯ অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত-ভগণে ২১৬৩৬ বৎসর লাগে এবং এক বৎসরে তাহার গতি ৫৯.৯ বিকলা। ইহা কিন্তু অয়নগ্রহ নহে—পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের precessional period নহে, তাহা আর্য্যভটের মতে ২৭০০০ বৎসর। পাশ্চাত্ত্য মতে precessional period (অয়নাংশ) ২৫৮০০ বৎসর এবং বৎসরে তাহার গতি ৫০.২ বিকলা ৭ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষিগণের মতে ইহার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউকোম্ব সাহেবের মতে বাৎসরিক হার

= ৫০.২৫৮ বিকলা + ০.০০০ ২২২ (খ্রীষ্টাব্দ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুতরাং ভাস্করের সময় ও তাহার পূর্ব্বে ইহার বাৎসরিক গতি ৫০.২ বিকলা অপেক্ষাও কম ছিল, ২৭০০০ বৎসর হিসাবে তাহার গতি ৪৮ বিকলা হয়, সুতরাং মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ precessional period বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ বাধা আছে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিপাত-বিন্দু যেমন পশ্চিম দিকে চালিত হইতেছে, তৎসঙ্গে মন্দোচ্চ (aphelion) পূর্ব্বদিকে চালিত হইতেছে এবং ইহার বাৎসরিক গতি গড়ে ১১.৮ বিকলা। দুই গতি যোগ করিলে ৬২ বিকলা হয়, সুতরাং ক্রান্তিপাত-বিন্দু হইতে ধরিলে মন্দোচ্চের গতি অথবা মন্দোচ্চ হইতে ধরিলে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর বার্ষিক গতি মোটামুটি ১কলা হইবে এবং ইহাই মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণের বার্ষিক গতি বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য মতে ক্রান্তিপাত-ভগণ মোটামুটি ২০৯৮৬ বৎসর। সুতরাং দেখা গেল যে, মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মন্দোচ্চ বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর রাশিচক্রে সম্পূর্ণ ভ্রমণ (অর্থাৎ মন্দোচ্চ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া তাহার সহিত পুনর্মিলন)।

৩। এক্ষণে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে আমাদের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যাউক। আবশ্যক বোধে অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কৃষ্ণপক্ষে কোন মেঘশূন্য রজনীতে তারকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তারকাগুলি একত্রে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার কতকগুলি ধ্রুববিন্দুর (North Pole) চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অস্তগত না হইলেও, দিবসে সূর্য্যের আলোকে অদৃশ্য থাকে। এই তারকাপুঞ্জের সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে (অর্থাৎ একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই স্থানে আসিতে) প্রায় একদিন ও এক রাত্রি অতিবাহিত হয়। যে সময়ে কোন একটী তারকার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সাধিত হয়, সেই সময় নাক্ষত্র-দিন নামে অভিহিত। আমাদের ঘটিকাযন্ত্রে নির্ণীত সময় হিসাবে এক নাক্ষত্র-দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘূর্ণনের জন্য আমরা পৃথিবীর উপর হইতে আকাশমার্গস্থ তারকাগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখি, বাস্তবিক তাহারা আমাদের সম্পর্কে নিশ্চল। পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষদণ্ড (axis of rotation) উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, যে দুই স্থলে তাহা আকাশ-মার্গ ভেদ করিবে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুববিন্দু। আমরা পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে বাস করি, এজন্য কেবল উত্তর ধ্রুবটী দেখিতে পাই; যাঁহারা দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণ ধ্রুবটী দেখিতে পান; আর যাঁহারা বিষুবরেখার উপর বাস করেন, তাঁহারা দুইটী ধ্রুবই ক্ষিতিজ রেখায় দেখিবেন। আমরা উত্তর ধ্রুবের চারিদিকে তারকাগুলি ঘুরিতে দেখি।

পৃথিবীর তলদেশস্থ যে কোন স্থান হইতে আকাশ গোলার্দ্ধের ন্যায় দেখায় এবং পৃথিবীর ঐ স্থানটী তাহার কেন্দ্রস্বরূপ মনে করা যায়। এইরূপে আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ একটী বৃহৎ গোলকরূপে মনে করিতে পারি এবং পৃথিবীকে তাহার কেন্দ্রস্থ বলিতে পারি। এই আকাশ-গোলকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব (পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমরেখায়) স্থির করি এবং ঐ উভয় ধ্রুবের সমদূরে আকাশমার্গে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, যাহার নাম বিষুবন্মণ্ডল (Equinoctial or Celestial Equator)। পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্তের সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিলে, তাহা বিষুবন্মণ্ডলের সহিত মিলিত হইবে। আবার দুই ধ্রুবের মধ্য দিয়া আকাশ-মার্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তাহাদের নাম ঘটিকা-বৃত্ত (Hour circle)। আমরা আকাশগোলকে ঐরূপ ২৪ বৃত্ত কল্পনা করি; প্রত্যেকে এক এক ঘণ্টা অন্তরে থাকে। পৃথিবীর তলদেশস্থ কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের (meridian) সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, তাহা যে স্থলে মিলিত হইবে, তাহাও বৃত্তাকার; এই বৃত্তের নাম আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্ত (Celestial meridian)। কোন স্থানের শীর্ষদেশে যদি ঘটিকাবৃত্ত থাকে, তাহা তখন আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এক্ষণে সূর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা দেখি, সূর্য্য প্রতিদিন তারকাবলীর মত পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার পরদিন প্রাতে উদিত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণের গতির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। আমরা যদি সন্ধ্যার পর এমন কয়েকটী তারকা দেখিয়া রাখি, যাহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পরে অস্ত যায় এবং যদি সেগুলিকে প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাই, আমরা দেখিব যে, তাহারা ক্রমশঃ আরও শীঘ্র অস্ত যাইতেছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিছুকাল পর দেখিব যে, সেগুলি প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উদিত হইতেছে এবং নিশ্চয় সূর্য্যাস্তের বহু পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে। এইরূপে ৩৬৫ দিবস গত হইলে, আমরা আবার সন্ধ্যার পর ঠিক সেই সময়ে ঐ তারকাগুলি দেখিতে পাইব। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও সূর্য্য ও তারকাগুলি প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তারকাগুলি প্রথমতঃ সূর্য্যের সহিত উদিত ও অস্তমিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রে উদিত ও অস্তমিত হইতে হইতে বৎসরান্তে (৩৬৫ দিনে) আবার একসঙ্গে উদিত ও অস্তমিত হয়। তারকাগুলি অগ্রগামী হয় এবং সূর্য্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা সূর্য্যের দ্বিবিধ গতি বলিতে পারি—(১) তারকাদিগের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি (ঘূর্ণন) এবং (২) ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়ায়, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আকাশমার্গ বেষ্টন করিয়া পুনরায় সেই তারকাপুঞ্জের সহিত মিলনের জন্য গতি। সূর্য্যের তারকাদের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে একদিনের গতি গড়ে ২৪ ঘণ্টায় সাধিত হয় অর্থাৎ নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্য্যের গতিতে ৪ মিনিট সময় বেশী লাগে—অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিদিন ৪ মিনিট করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তনবশতঃ আমরা তারকাপুঞ্জের ন্যায় সূর্য্যের পূর্ব্বপশ্চিমে দৈনিক গতি দেখিতে পাই ; বাস্তবিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-সম্পর্কে সূর্য্য নিশ্চল। সূর্য্যের দ্বিতীয় গতির পথ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশমার্গে যে বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া বৎসরে একবার পশ্চাদ্‌গতিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, সে কক্ষার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৮ অংশ-পরিমিত স্থানের তারকাপুঞ্জ লইয়া আমাদের রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নহে এবং উভয়ে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হয়। এই মিলনস্থান-দ্বয়কে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) কহে। যে ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্য বিষুব-মণ্ডলের দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা মেষক্রান্তি (First point of Aries) এবং যাহা হইতে বিষুবন্মণ্ডলের উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম তুলাক্রান্তি (First point of Libra)। এই দুই ক্রান্তিপাতের ব্যবধানে বিষুবন্মণ্ডল ও ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানদ্বয় পরস্পর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকে, তাহা পরমক্রান্তি নামে অভিহিত (Solstitial points). আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে থাকিয়া যদি প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, দেখিতে পাইব যে, ২১এ মার্চ্চের পর (৭।৮ই চৈত্রের পর) সূর্য্য মেষক্রান্তিপাত হইতে প্রতিদিন উদিত হইবার সময় উত্তরদিকে ঊর্দ্ধে সরিয়া যাইতেছে এবং তিন মাসকাল এইরূপে সরিতে সরিতে পরমক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সূর্য্য আবার দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া তিনমাসে তুলাক্রান্তির

উপর আসিয়া পড়ে এবং আরও দক্ষিণে নামিতে থাকিয়া, তিন মাসে অপর পরমক্রান্তি-স্থানে উপনীত হয় এবং পুনরায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাকি তিন মাসে মেষক্রান্তিপাতে আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষায় ভ্রমণের জন্য আমরা সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি। পৃথিবী নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজ কক্ষ দিয়া যেমন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে, সূর্য্যকে আমরা বিপরীত দিকে আকাশমার্গে তারকামণ্ডলের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ হইতে দেখি। পুনশ্চ পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্ত এবং তাহার কক্ষের সমতল পরস্পরকে ছেদ করে বলিয়া, ক্রান্তিপাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলের একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে যাইতে দেখি।

আকাশমার্গে কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমরা প্রধানতঃ দুইটী পন্থা অনুসরণ করি (চিত্র ১)। প্রথমতঃ, আমরা বিষুবন্মণ্ডলের উপর তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা যদি ঐ জ্যোতিষ্কের উপর দিয়া এমন একটী বৃত্তাংশ (ধনু) কল্পনা করি, যাহা ধ্রুবদ্বয়ের উপর দিয়াও গমন করিয়া বিষুবন্মণ্ডলকে ছেদ করে, তাহা হইলে, ঐ ধনু দ্বারা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। মেষক্রান্তি হইতে বিষুবন্মণ্ডলে ঐ ছেদস্থান পর্য্যন্ত যে ধনু থাকে, তাহাকে সরলোত্থান (Right ascension) বলে, (যেমন চিত্রে ঘক) আর ঐ ধনুর যে খণ্ড জ্যোতিষ্কটী ও বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ছেদের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা ঐ জ্যোতিষ্কটীর ক্রান্তি বা declination নামে অভিহিত (যেমন ঙক)। আমরা right-ascension এবং declinationএর দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তিবৃত্তের উপর আমরা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা বিষুবন্মণ্ডলের ধ্রুবের ন্যায় ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী ধ্রুববিন্দু কল্পনা করিতে পারি এবং right ascensionএর মত ক্রান্তিবৃত্তের ধনুকে Longitude (স্ফুট, যেমন ঘগ) ও declinationএর মত ধনুর খণ্ডকে latitude (যেমন ঙগ) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই দুইএর দ্বারা আমরা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি।

চিত্র ১

আমরা ইতিপূর্ব্বে নাক্ষত্রিক দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কোন একটী নক্ষত্র কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার তাহার উপর আসিয়া পড়ে। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, সেই সময় হইতে নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ ধরা হয়। আমাদের সৌরমণ্ডলের (অর্থাৎ মধ্যস্থ সূর্য্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহ ধরিয়া সৌরমণ্ডল) চতুর্দ্দিকে বহু দূরে তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণনের জন্য ইহার তলদেশে প্রত্যেক স্থানই দিবারাত্রে (এক-

দিনে) একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে ; তজ্জন্য ক্রান্তিপাত এক বার যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর দিয়া গমন করে। এক নাক্ষত্রিক দিন আমাদের সৌর দিন অপেক্ষা কম। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এক নাক্ষত্রিক দিনের শেষ এবং দ্বিতীয় নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ হয় বলিয়া ঘড়ী নাক্ষত্রিক দিন-পরিমাণার্থ চালিত হইলে, তাহা ঐ সময়ে শূন্য ঘণ্টা মিনিটাদি প্রদর্শন করিবে। এইরূপ ঘটিকাযন্ত্র নাক্ষত্রিক সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। কারণ, নাক্ষত্রিক দিন আবার নাক্ষত্রিক ঘণ্টা-মিনিটাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে সৌর দিন (solar day) কাহাকে বলে, দেখা যাউক। সূর্য্য স্থানীয় যাম্যোত্তর বৃত্ত অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই একটী সৌর দিন। এক বৎসরে ৩৬৫·২৪২১৪ অথবা ৩৬৫¼ সৌর দিন। সূর্য্যের ক্রান্তিবৃত্ত ধরিয়া আকাশমার্গে একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই সৌর-বৎসর। সূর্য্যঘড়ি (Sundial) দ্বারা সৌরদিনের সময় নিরূপিত হয়। সৌর-দিনগুলি সব সমান নহে ; তাহার কারণ, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের গতি সমভাব নহে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিজকক্ষে দৈনিক গতি সমভাবে সাধিত হয় না। সৌরদিনগুলি সব অসমান হওয়ায়, সাধারণ ঘটিকা-যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। সৌরদিনগুলির পরিমাণ অসমান হওয়ায় ঐ সকল দিনের ঘণ্টা-মিনিটাদিও সব অসমান জানিতে হইবে। এ কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ একটী মধ্যসূর্য্য বা গণিতসূর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ সূর্য্যের একবার ক্রান্তিবৃত্তে ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ এক সৌরবর্ষে), সেই সময়ে এই কাল্পনিক সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে একবার ঘুরিয়া আসিতে স্থির করা হয়। এই সময়কে সৌরদিন-সংখ্যা-হিসাবে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে মধ্য-সৌরদিন বলিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং মধ্য-সৌরদিনগুলি পরিমাণে সমান বুঝিতে হইবে এবং তজ্জন্য সাধারণ ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য-সৌরদিনের সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, মধ্য-সৌরদিনগুলি সব সমান, কিন্তু প্রকৃত সৌরদিনগুলি সেরূপ নহে ; তাহাদের কতকগুলি পরিমাণে বৃহত্তর, কতকগুলি ক্ষুদ্রতর। আবার কতকগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা বৃহত্তর, কতকগুলি সমান, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর ; তবে প্রভেদ বেশী নয়। মধ্য-সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ও প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় (যেমন মধ্য-সৌরদিনের ১২ ঘটিকা ও প্রকৃত সৌরদিনের ১২ ঘটিকা), এই উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী সময় (মধ্য-সৌরদিনের সময় হইতে হিসাবে) Equation of time বা সমকালপ্রভেদ নামে অভিহিত। সচরাচর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ ও পঞ্জিকায় মধ্যাহ্ন সময় লওয়া হয়। গণিত-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে প্রত্যক্ষ সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালের অন্তরই মধ্যাহ্নে সমকাল-প্রভেদ। যখন মধ্যসূর্য্য অগ্রগামী হয়, অর্থাৎ মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন প্রকৃত সৌরদিনের মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তখন সমকালপ্রভেদ যুক্ত হইবে ; আর যদি মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন পশ্চাতে থাকে, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে। বৎসরের মধ্যে চারিবার মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষ-সূর্য্য একস্থানে থাকে বলিয়া সমকালপ্রভেদ কিছুই থাকে না ; ৩।৪ ঠা

বৈশাখ, ১২রা আষাঢ়, ১৬।১৭ই ভাদ্র ও ১০।১১ই পৌষ—এই চারিদিনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সমকালপ্রভেদ হিসাব করিয়া লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে উভয় দিনেরই সময় হিসাব করিয়া লওয়া যায়।

এক্ষণে গণিত বা মধ্য এবং প্রত্যক্ষ সৌরদিনের প্রভেদের (অর্থাৎ সমকাল-প্রভেদের) কারণ দেখা যাউক। প্রথমতঃ ঐ প্রভেদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। ইহার কারণ দুইটী। (১) পৃথিবীর কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে—তাহা বৃত্তাভাস (elliptical)। বৃত্তে একটী কেন্দ্র থাকে, কিন্তু বৃত্তাভাসে দুইটী foci বা উপকেন্দ্র থাকে। বৃত্তাভাসের এক উপকেন্দ্রে বা focusএ সূর্য্য অবস্থিত। কক্ষের যে স্থান সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ, তাহা পেরিহেলিয়ন (perihelion) নামে অভিহিত এবং যে স্থান সর্ব্বপেক্ষা দূরস্থ, তাহা আপ্‌হেলিয়ন (aphelion) বা মন্দোচ্চ নামে অভিহিত। যে রেখা পেরিহেলিয়ন হইতে আপ্‌হেলিয়ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে line of the apsides বা উচ্চরেখা কহে। (২) ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল না হইয়া কিছু তির্য্যক্‌-ভাবে থাকায়, পরস্পরে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হইয়া ক্রান্তিপাতের সূচনা করিয়াছে। আমরা পৃথিবীর উপর বাস করিয়া তাহার যাম্যোত্তর রেখাগুলির (যাহারা বিষুবদ্‌বৃত্তের সমকোণে মেরুদ্বয়-মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত) পরস্পরের দূরত্ব হইতে সময় নিরূপণ করিতে পারি এবং তজ্জন্য মধ্যসূর্য্যকে বিষুবদ্‌বৃত্তের উপর কল্পনা করিতে বাধ্য হই। এই মধ্যসূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য ক্রান্তিবৃত্তে চালিত প্রত্যক্ষ-সূর্য্যের স্থান ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিষুবন্মণ্ডলে যথাযথ গ্রহণ করিয়া থাকি। *ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমন্তরাল নয় বলিয়া প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে যদি সমগতিতে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলেও, বিষুবন্মণ্ডলে তাহার গতি সমভাবে হইতে পারে না,* তাহার উপর আবার প্রত্যক্ষসূর্য্য নিজ কক্ষায় বিষমগতিতে ভ্রমণ করে। এই জন্য মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষসূর্য্যে গতির প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর কক্ষের আকৃতির বৃত্তাভাসবশতঃ যে সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তদ্‌বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা যাউক (চিত্র ২)। ভৌতিক নিয়মাধীনে পৃথিবী যখন পেরিহেলিয়নের নিকট
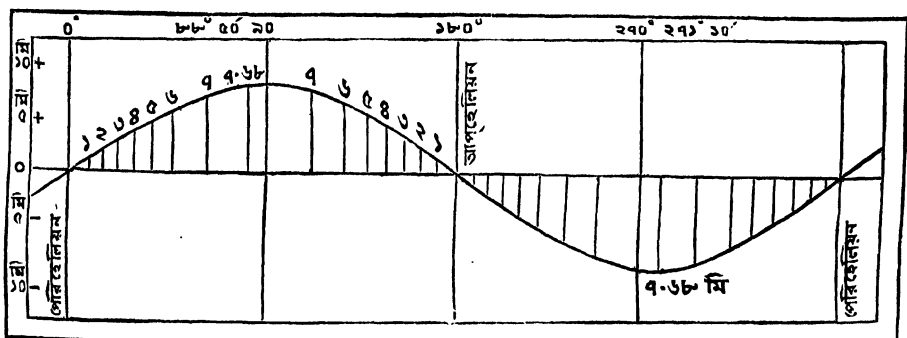
চিত্র ২

আসিয়া পড়ে, তখন তাহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা বেগশালিনী হয় এবং তজ্জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্য যে হারে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে (অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে) গমন করিতেছে, তাহা মধ্য-সূর্য্যের গতির হার অপেক্ষা অধিকতর। নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘূর্ণনবশতঃ প্রকৃত সৌরদিনগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা দীর্ঘতর। পেরিহেলিয়নে প্রকৃত সৌর-দিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য সৌরদিনের ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় একসঙ্গে থাকে বলিয়া, এই সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়। কিন্তু পেরিহেলিয়নের পর যত দিন গত হয়, প্রত্যক্ষ-সৌরদিন-গুলি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে থাকে বলিয়া, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য-সৌরদিন-গুলি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পশ্চাতে সরিয়া যায় এবং সমকালপ্রভেদ এখন যুক্ত হয়। তিন মাসের শেষে সমকাল প্রভেদ + ৭½ মিনিট হয়, কিন্তু তাহার পর আবার প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি খর্ব্বতর হইতে থাকে এবং তজ্জন্য সমকালপ্রভেদও কম হইতে থাকে। তিন মাসের শেষে (অর্থাৎ পেরিহেলিয়ন হইতে ছয় মাসের শেষে) আবার ঐ দ্বিবিধ দিনগুলির পরিমাণ সমান হওয়ায়, সমকাল-প্রভেদও শূন্য হইয়া পড়ে; এই সময় পৃথিবী মন্দোচ্চে বা আপ্‌হেলিয়নে অবস্থিতি করে। পৃথিবী যেমন আপ্‌হেলিয়ন হইতে আবার কক্ষের অপরদিক্ দিয়া যাত্রা করে, তখন প্রত্যক্ষ দিন-গুলি কাল্পনিক মধ্য-দিনগুলির অগ্রগামী হওয়ায়, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্য-সৌরদিনের সময়ের অগ্রে অবস্থিত করিতে থাকে; তজ্জন্য সমকাল-প্রভেদ হীন হইতে থাকে। ক্রমশঃ তিন মাসের শেষে সমকালপ্রভেদ ৭½ মিনিট পর্য্যন্ত হইয়া আবার অবশিষ্ট তিন মাসে কম হইতে হইতে পেরিহেলিয়নএ তাহা শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা গেল যে, পেরিহেলিয়ন এবং আপ্‌হেলিয়ন—এই দুই স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য এবং দুইএর মধ্যস্থানে সর্ব্বাধিক প্রভেদ ৭½ মিনিট যুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডলের পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থানবশতঃ সমকালপ্রভেদের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ১ম ও ৩য় চিত্র দ্বারা বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। মেষক্রান্তি হইতে
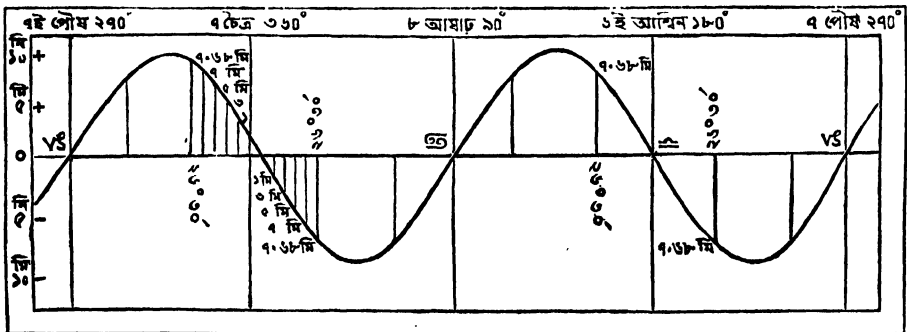
চিত্র ৩

প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্যের গতি ধরা হউক। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্য বিষুবন্মণ্ডলে গমন করিতেছে। দুই ক্রান্তিপাতস্থানে ও দুই পরমক্রান্তি-স্থানে সমকালপ্রভেদ

সমান হইবে। কারণ, এই চারি স্থানে তাহাদের সরলোত্থান (right ascension) সমান হইয়া থাকে। অন্য স্থানে উভয়ের সরলোত্থান সমান হয় না। মেষক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত-সৌরদিনগুলি, কাল্পনিক মধ্যসৌরদিনের অগ্রগামী হওয়ায়, সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে এবং দেড়মাসে প্রভেদ সর্ব্বাধিক হইয়া (−১০ মিনিট) অবশিষ্ট দেড়মাসে আবার শূন্য হইয়া যায়। তৎপরে দেড়মাসে সমকালপ্রভেদ +১০ মিনিট হইয়া আবার কমিতে থাকিয়া শূন্য হইয়া পড়ে, এক্ষণে সূর্য্যদেব তুলাক্রান্তিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে পুনর্ব্বার সমকালপ্রভেদ প্রথমে −১০ মিনিট এবং শূন্য হইয়া আবার +১০ মিনিট হইবার পর সূর্য্যদেব মেষক্রান্তিতে উপস্থিত হয়।

আমরা দ্বিবিধ কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, তাহা এই দুই প্রকার সমকালভেদের মিলন-ফল।

পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ প্রকৃত-সৌরদিন ও মধ্যসৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রভেদ (অর্থাৎ সমকাল) প্রভেদ ৭½ মিনিটের অধিক হয় না—

মধ্যসৌরসময়—প্রকৃত সৌরসময় = +৭½ মিনিট।

প্রকৃত সৌর সময়—মধ্য সৌর সময় = −৭½ মিনিট।

ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিতির কারণ সমকালপ্রভেদ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত হইতে পারে—

মধ্য সৌরসময়—প্রকৃতসৌরসময় = +১০ মিনিট।

প্রকৃত সৌরসময়—মধ্য সৌর সময় = −১০ মিনিট।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুই কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ একত্র করিলে, কোন কোন সময়ে তাহা শূন্য হইবে। প্রথমতঃ যদি উভয় কারণেই এক সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহা হইলে সমকাল ভেদের মিলনফল শূন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম কারণবশতঃ সমকাল-প্রভেদ +৭½ মিনিট হয় এবং দ্বিতীয় কারণবশতঃ −৭½ মিনিট হয়, তাহা হইলে একত্রিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে। বিষুবন্মণ্ডলের মেষক্রান্তির নিকটস্থ যে স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ নিরয়ণ-বিন্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শূন্য সমকালপ্রভেদ বৎসরে চারিবার ঘটিয়া থাকে—দুই ক্রান্তিপাত-বিন্দু ও দুই পরমক্রান্তির সন্নিকটে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত দুই দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ তাহা ৩০ অংশ বা ২৭ অংশ বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। অপর নিরয়ণ-বিন্দুদ্বয় পরমক্রান্তির দুই পার্শ্বে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আর্য্যভট তাহা ২৪ অংশ ধরিয়া গিয়াছেন।

---

* সাধারণতঃ আমরা "নিরয়ণ-বিন্দু" রেবতী নক্ষত্রে স্থিত বলিয়া মনে করি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে-ভগণঃ স্মৃতঃ" এই পদের অর্থ "পৌষ্ণস্য রেবতীযোগতারায়া অন্তে নিকটে প্রদেশে" রঙ্গনাথের টীকায় পাওয়া যায় বলিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোকের অর্থ "সূর্য্যের নিকটে" করিলে বুঝিতে পারিব, ইহা পৃথিবীর কক্ষের 'পেরিহেলিয়ান ও সূর্য্যের দিক্ হইতে আপ্‌হেলিয়ান-স্থানে অবস্থিত এবং যখন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে তাহা রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

আমরা এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতদ্বয়ের উভয় দিকে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষেপের কারণ নিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাস-বশতঃ এবং বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের বক্রভাবে স্থিতির দরুণ সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে। যদি পৃথিবীর কক্ষ (অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ত) এবং ক্রান্তিপাতদ্বয় চিরকাল নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ এক সময়ে একপ্রকার হইত—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইত না। কিন্তু দুই কারণে বৎসরের পর বৎসর সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তজ্জন্য ক্রান্তিপাতবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দু—এই উভয়ের পরস্পরের দূরত্বেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃত্তাভাসকক্ষ অতি ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহাকে আমরা পেরিহেলিয়নের গতি বলি। সুতরাং পেরিহেলিয়ন ও আপ্‌হেলিয়ন একস্থানে নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, সমকালপ্রভেদের সময়ও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিষুবন্মণ্ডলের বিপরীত-ঘূর্ণনে ক্রান্তিপাতদ্বয় কক্ষ-বর্ত্তনের বিপরীত দিকে অপসরিত হইতেছে এবং তজ্জন্যও সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মোট সমকাল প্রভেদের সময় এই দুই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বৎসর অতি অল্পপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

উপরোক্ত দুইটী পরিবর্ত্তনের উপর আরও দুইটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও সমকাল-প্রভেদের এত অল্পপরিমাণ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা গণ্য না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ বৃত্তাভাস কক্ষের আকার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা এত অল্প যে, বহুবৎসর পর্য্যন্ত তজ্জন্য গণনায় কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সোমসিদ্ধান্তে যে অয়নাংশের গতি ৩০ অংশ, পরে ব্রহ্মসিদ্ধান্তাদিতে ২৭ অংশ এবং আধুনিক হিসাবে ২৬ অংশ ৩০ কলা—এই যে পার্থক্য হিন্দুগণের স্থূল গণনার উপর সমুদায় নির্ভর না করিয়া, অন্ততঃ কিছুও কক্ষের আকৃতির পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুবন্মণ্ডলের সম্পাতে যে কোণ হয় (যাহাকে আমরা পরমক্রান্তি বলি) তাহা অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা উপস্থিত বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ বিকলা করিয়া কমিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারাও সমকালপ্রভেদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

পেরিহেলিয়ন ও ক্রান্তিপাতবিন্দুর বিপরীত দিকে ঘূর্ণনের জন্য ক্রান্তিবিন্দু ও নিরয়ণ বিন্দুর মধ্যস্থ দূরত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অনুমান ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্বে আপ্‌হেলিয়ন ও মেষ-ক্রান্তি নিরয়ণবিন্দুর সহিত একস্থানে অবস্থিত ছিল। তদবধি আপ্‌হেলিয়ন কক্ষের ঘূর্ণনবশতঃ প্রতিবৎসর ১১·৮ বিকলা করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে এবং মেষক্রান্তি প্রতি বৎসর ৫০·২ বিকলা করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে, কাজেই আপ্‌হেলিয়ন হইতে মেষক্রান্তির দূরত্ব প্রতিবৎসর ১১·৮+৫০·২ অথবা ৬২ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ সমকালপ্রভেদ প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নিরয়ণ-বিন্দুর স্থানও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ক্রান্তিপাত ও আপ্‌হেলিয়নের বিপরীত বর্ত্তনে নিরয়ণ-বিন্দু উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বে অপসারিত হইতে থাকে। পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ সমকালপ্রভেদ

৭২ মিনিট হইয়া থাকে এবং ইহা পেরিহেলিয়নের ৯০ অংশ (সূক্ষ্মরূপে ৮৮ অংশ ৫০ কলা) দূরে অবস্থিত এবং একদিকে যুক্ত ও অপরদিকে বিযুক্ত (অথবা আপহেলিয়ন হইতে ৯০ অংশ, একদিকে বিযুক্ত ও অপরদিকে যুক্ত)। সুতরাং যদি ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাববশতঃ সমকাল-প্রভেদ ঐ স্থানে ৭২ মিনিট হয় এবং যুক্ত স্থানে বিযুক্ত ও বিযুক্ত স্থানে যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষুবন্মণ্ডলের ঐ স্থানে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে এবং তথায় নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি হইবে। এইরূপ হইতে গেলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে আদ্য-স্থান হইতে ২৭ অংশ (২৬ অংশ ৩০ কলা) পশ্চিমে সরিয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ৯০+২৭ বা ১১৭ অংশ দূরে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ক্রান্তিবৃত্তের উপর তাহার স্থান ১২০ অংশ দূরে হইবে। আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তিপাত হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের দিকে ধাবিত হইবে। যখন আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ দূরে যাইবে এবং পেরিহেলিয়ন মেষক্রান্তির উপর আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ বিন্দুও উহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। আপ্‌হেলিয়ন আরও চলিতে চলিতে যখন মেষক্রান্তি হইতে ১৮০+৬০ বা ২৪০ অংশে (পেরিহেলিয়ন ৬০ অংশে) আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন আপ্‌হেলিয়ন সরিতে সরিতে ২২০+১৪০ বা ৩৬০ অংশে উপনীত হইবে, নিরয়ণ-বিন্দুও আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আপ্‌হেলি-য়নের সহিত মেষক্রান্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যদি নিরয়ণ-বিন্দুকে স্থির ও নিশ্চল ধরি, তাহা হইলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। এইরূপে আমরা মেষক্রান্তি ও তুলাক্রান্তি—উভয়কেই নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। পরমক্রান্তিদ্বয়কে ঐ রূপে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে দেখা যায়। দুইখানি অভ্রপট্টে অথবা সেলিউলয়েড্ পট্টে দ্বিবিধ সমকাল-প্রভেদ (চিত্রানুরূপ) পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কিত করতঃ দুইটী পট্টকে বৃত্তাকারে বন্ধন করিয়া একটী অপরটীর ভিতরে রাখিয়া বিপরীত দিকে ঘুরাইলে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্যের স্থান অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গোলত্রিকোণমিতির সাহায্যেও বিষয়টী প্রমাণ করা যায়, তাহা অনাবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত কঠিনবোধে পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ক্রান্তিপাতের নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া ২৭ অংশ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া, অপর দিকে ২৭ অংশ যাইতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি—

(১) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়নের ১১৭ অংশ (১২০ অংশ) গমনে নিরয়ণ-বিন্দু মধ্যস্থ হইয়া মেষক্রান্তিপাত হইতে ২৭ (৩০ অংশ) সরিয়া আসে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে এক দিকে আপ্‌হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে এবং অপরদিকে মেষক্রান্তি ২৭ অংশ দূরে অবস্থিত থাকে।

আপহেলিয়ন—৯০ অংশ—নিরয়ণ-বিন্দু—২৭ অংশ—মেষক্রান্তি…(ক)

(২) মেষক্রান্তি-পাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ দূরে চালিত হইলে, অর্থাৎ মোট ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ অপসৃত হইলে নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তি-পাতের উপর আসিয়া পড়ে। তখন নিরয়ণ-বিন্দু হইতেও আপ্‌হেলিয়ন ১৮০ অংশ দূরে থাকে (২৭কে মোটামুটি ৩০ ধরা হইল)

আপ্‌হেলিয়ন—৬০+৯০+২৭ অংশ—{ মেষক্রান্তি / নিরয়ণ-বিন্দু } …(খ)

(৩) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ সরিয়া গেলে অর্থাৎ মোট ১২০+৬০+৬০ বা ২৪০ অংশ সরিয়া গেলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ সরিয়া যাইবে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে আপ্‌হেলিয়ন ২৪০+৩০=২৭০ অংশে দূরে থাকিবে।

আপ্‌হেলিয়ন—৬০+৬০+৯০—মেষক্রান্তি—২৭ (৩০)…(গ)

(৪) অবশেষে মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ১২০ অংশ, অর্থাৎ মোট ১২০ ৬০+৬০+১২০ বা ৩৬০ অংশ সরিয়া গেলে (অর্থাৎ পুনরায় মেষক্রান্তির সহিত মিলিত হইলে), নিরয়ণবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবে।

আপ্‌হেলিয়ন
নিরয়ণ-বিন্দু } …(ঘ)
মেষক্রান্তি

আমরা আপ্‌হেলিয়ন, নিরয়ণ-বিন্দু এবং মেষক্রান্তিপাতবিন্দুর চতুর্বিধ সম্পর্ক (ক-ঘ) দেখিলাম। এক্ষণে তাহাদের ব্যবধানে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। বলিয়া রাখিতে হইবে যে, এত প্রাচীন কালের হিসাব মোটামুটি ভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং গণনা সবই স্থূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেও এত অধিক বর্ষের গণনা সূক্ষ্ম হইতে পারে না। আমরা দেখিলাম যে, প্রতি বর্ষে আপ্‌হেলিয়ন ক্রান্তিপাত হইতে ৬২ বিকলা (৬১·৯) করিয়া সরিয়া যাইতেছে; উপস্থিত তাহা মোটামুটি এক কলা বলিয়া ধরা যাইবে।

আদ্য-কাল এবং প্রথম সম্পর্কের (ক) ব্যবধান আপ্‌হেলিয়নের গতি ১২০ অংশ হওয়ায় ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর। তদ্রূপ প্রথম (ক) এবং দ্বিতীয় সম্পর্কের (খ) ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। দ্বিতীয় (খ) এবং তৃতীয় (গ) সম্পর্কের ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। অবশেষে তৃতীয় (গ) এবং এক চতুর্থ সম্পর্কের (ঘ) ব্যবধান ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর হইবে। সর্ব্বসুদ্ধ ২১৬০০ বৎসর হইবে। সুতরাং ক্রান্তি-বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণন দ্বারা তাহার সহিত পূর্ণমিলনে ২১৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। তাহা হইলে এক মহাযুগে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতি ~~[illegible]~~ বা ২০০ বার সাধিত হয়। ২১৬০০ বৎসর মোট

হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে; আধুনিক মতে সূক্ষ্ম গণনায় ২০৯৮৬ বৎসর হয়। মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নচলন এই আপ্‌হেলিয়নের গতি, তাঁহাদের মতে ইহার এক পূর্ণঘূর্ণনে ২১৬৩৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহারা ক্রান্তিপাতকে আপ্‌হেলিয়নের স্থান হইতে চালিত বলিয়া ধরেন।

৪। এক্ষণে প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের তুলনায় আলোচনা করা যাউক।

আমরা আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণঘূর্ণনের সময় ২১৬০০ বৎসর দেখিয়াছি এবং ঐ সময়ে অয়নাংশের নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন দেখিয়াছি। আপ্‌হেলিয়ন এক যুগে ২০০ বার ঘূর্ণিত হয়, তাহাও জানিয়াছি।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগুলির মতে এক যুগে চক্রের বা অয়নগ্রহের পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার গতি লিখিত হইয়াছে এবং ৯০ অংশ অয়ন-গ্রহের গতিতে ২৭ অংশ (বা ৩০ অংশ) অয়নাংশের গতি হয়। আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে এই অয়নাংশের সম্পূর্ণ গমনাগমন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) ৭২০০ বৎসরে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে ২৭ অংশ গমন; (২) পূর্ব্ব-দিক্ হইতে নিরয়ণ-বিন্দু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন; ইহাতে ৩৬০০+৩৬০০ বা ৭২০০ বৎসর লাগে; (৩) পূর্ব্বদিকে আবার ঐ ২৭ অংশ গমন করিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলন; ইহাতে ৭২০০ বৎসর লাগিবে। এই হিসাবে অয়নগ্রহের গতিও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ৯০ অংশ, (২) ৯০+৯০ বা ১৮০ অংশ; (৩) ৯০ অংশ। এই তিন গতির সমষ্টি ৩৬০ অংশ। সুতরাং অয়নগ্রহের পূর্ব্বগতি (নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে গমন—ইহাই সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে) অর্থাৎ ইহার গতিসমষ্টির ⅓ ভাগ যদি এক যুগে ৬০০ বার সাধিত হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ গতি (৩৬০ অংশ ব্যাপিয়া) এক যুগে ⅓×৬০০ বা ২০০ বার সাধিত হইবে। সুতরাং আমরা এক সম্পূর্ণ অয়নগ্রহের ঘূর্ণন একযুগে ২০০ বার ধরিতে পারি এবং অয়নগ্রহকে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তবে তাহার গতি ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে না ধরিয়া নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিতে হইবে। অয়নগ্রহের গতি এইরূপে একযুগে ৬০০ বার সাধিত হইলে, অয়নাংশের গতিও ঐ সময়ে ৬০০ বার সাধিত হইবে। অয়নগ্রহের এক পূর্ণাবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয়, এজন্য কোন অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ-নিরূপণে অগ্রে অয়নগ্রহের পূর্ণাবর্ত্তনের পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইতেই অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হইবে। তাহা ত্রৈরাশিক সাহায্যে অনায়াসেই নিরূপিত হইবে।

এক যুগের দিনসংখ্যা : অভীষ্ট বর্ষের দিনসংখ্যা : : ৬০০ : অভীষ্ট বর্ষের দিন-সংখ্যার অয়ন-গ্রহের গতি। গতিতে যে ভগ্নাংশ থাকিবে, তাহাই অংশ-কলাদিতে পরিণত করিলে অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইবে।

অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে গণনা করা হয় বলিয়া অয়নগ্রহের পূর্ণগতির পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক; তজ্জন্যই তাহাদের ভুজ-সংস্কারের আবশ্যকতা। এই বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অয়নগ্রহের অংশকলাদির ভুজজ্যা হইতে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে। আমরা জানি যে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ৯০ অংশ হইলে অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ (সোমসিদ্ধান্তমতে ৩০ অংশ) দূরে থাকিবে। এক্ষণে ত্রৈরাশিক-সাহায্যে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

৯০ : অয়নগ্রহের অংশকলাদির ভুজজ্যা : : ২৭ : অয়নাংশ

৫। অবশেষে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের প্রণালী আলোচনা করা যাউক।

আমরা জানিয়াছি যে, মধ্যসূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে ঘূর্ণিত বলিয়া কল্পনা করা হয়। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। সমকাল প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক এবং সম্ভবপর, তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়; যেমন, *ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের দ্রাঘিমা (লঙ্গিটিউড্—longitude) ১২০ অংশ হইলে বিষুবন্মণ্ডলে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের সরলোত্থান (রাইট্-আসেন্সান্—Right ascension) ১১৭ অংশ। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যের স্থান উভয় বৃত্তেই মেষক্রান্তি হইতে গণিত হয়। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও মধ্যসূর্য্যের গতি একস্থান হইতে আরম্ভ ধরা যাইবে।* যিনি সমকালপ্রভেদ শূন্য হইলে (অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুতে) বিষুবন্মণ্ডলে চালিত মধ্যসূর্য্য এবং অয়াতে নির্দ্ধারিত প্রত্যক্ষসূর্য্য একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আপ্‌হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে থাকিলে মেষক্রান্তিপাত অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে থাকে এবং তখন অয়নাংশ ২৭ অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। কাজেই মেষক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব (ঐরূপে তুলাক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব) অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষসূর্য্যের বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত স্থানের নিকটস্থ ক্রান্তিপাত (মেষ বা তুলাক্রান্তি) হইতে দূরত্বই অয়নাংশ হইবে। অর্থাৎ নিকটস্থ ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে গণিত নিরয়ণ-বিন্দুতে প্রত্যক্ষসূর্য্যের দ্রাঘিমা বা সরলোত্থানই অয়নাংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

যখন মেষক্রান্তিতে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বে থাকিবে, যখন যুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পশ্চিমে থাকিবে। নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তির পূর্ব্বে অয়নাংশযুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশবিযুক্ত হইবে। ইহাও সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে অয়নাংশ কিরূপে সূক্ষ্মভাবে গণিত হইতে পারে, দেখা যাউক।

১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের (আদিতে) অয়নাংশ নিরূপণ করা যাউক। প্রথমতঃ, ১৮৪৪ শকাব্দের আদি ইংরাজি সনের কত তারিখ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল ইংরাজি সন জানিলেই চলিতে পারে; কারণ, ইংরাজি সনের প্রথম যে দিন সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই দিনেই নিরয়ণ-বিন্দুর মেষক্রান্তির নিকট স্থিতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৮৪৪ শকাব্দা ইংরাজি ১৯২২ সনের সম বলিয়া, আমরা ঐ সনের নাবিকপঞ্জিকা হইতে মেষক্রান্তির নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল ১৫।১৬ এপ্রিলের মধ্যে পড়িয়াছে জানিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই দিনের

মধ্যে কোন সময় সমকালপ্রভেদ শূন্য হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ ঐ সময়ের সূর্য্যস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে নির্ণয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধ অয়নাংশ হইবে।

নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল অথবা সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইলে দুইটির একটী পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পন্থাটী অতি সহজ এবং একটী ত্রৈরাশিক প্রক্রিয়া মাত্র, তবে ইহার ফল স্থূল হইবে। দ্বিতীয় পন্থাটী অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে ইহার ফল সূক্ষ্ম।

প্রথম প্রক্রিয়া।

১৫ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ −০ মিনিট ১০'৭৯ সেকেণ্ড } গ্রিণউইচের বেলা
১৬ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ +০ মি ৪'০৫ সে } ১২টার সময়

দুইএর প্রভেদ +০ মি ১৪'৮৪ সে

সুতরাং ১৪'৮৪ : ১০'৭৯ : : একদিন : দিনের ভগ্নাংশ

$$\text{দিনের ভগ্নাংশ} = \frac{১০৭৯}{১৪৮৪} = \text{১৭ ঘণ্টা ২৭ মি ০'৪৮ সে।}$$

নাবিকপঞ্জিকায় দিবা ১২টার সময়ে ঐ সমকালপ্রভেদ লিখিত হওয়ায় সমকালপ্রভেদ শূন্যের সময় ১৭ ঘ ২৭ মি ০'৪৮ সে − ১২ ঘণ্টা = প্রাতঃকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে। ইহা গ্রীণউইচের ঘটিকা হিসাবে বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার দেশান্তর ৫ ঘ ৫৩ মি ২১সে এবং কলিকাতা গ্রীণউইচের পূর্ব্বে স্থিত বলিয়া তাহা যুক্ত হইবে।

সুতরাং কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে + ৫টা ৫৩ মি ২১সে = ১১টা ২০ মি ২১'৪৮ সে হইবে। ইহা নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি-কাল।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রপশ্চাৎ কয় দিনের সমকালপ্রভেদ ধরিতে হইবে।

এপ্রেল সমকালপ্রভেদ	প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৪ই −০ মি ২৫'৯৯ সে ($ক^{১}$)		
	+১৫'২০ সে ($খ^{১}$)	
১৫ই −০ ১০'৭৯ ($ক^{০}$)		−০'৩৬ সে ($গ^{১}$)
	+১৪'৮৪ ($খ_{০}$)	
১৬ই +০ ৪'০৫ ($ক_{১}$)		−০'৩৮ সে ($গ^{০}$)
	+১৪'৪৬ ($খ_{২}$)	
১৭ই +০ ১৮'৫১ ($ক_{২}$)		

বেসেল (Bessel)-কৃত অন্তর্নিবেশ (interpolation) সূত্র (formula) হইতে গঠিত নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে দিনের ভগ্নাংশ নিরূপিত হইবে।

$$\text{দিনের ভগ্নাংশ} = \frac{-ক^{০}}{খ_{০} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right) \times \frac{১}{২} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right) \times \frac{১}{২} \times \frac{+ক^{০}}{+খ^{০}}}$$

= ১৭ ঘ ২৩ মি ২৭'৪৮ সেকেণ্ড।

সুতরাং সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = সকাল ৫টা ২৩ মি ২৭·৪৮ সেকেণ্ড।

কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = ১১টা ১৬ মি ৪৮·৪৮ সে।

গ্রিণউইচ ঘটিকায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকালের সূর্য্যের স্ফুট গ্রহণ করিলে তাহাই অয়নাংশ হইবে। এ কারণ পর পর কয়দিনের সৌরস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

এপ্রিল	১২টার সময়ের সৌরস্ফুট				প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৩	২২ অংশ	৪৬ কলা	১৭·৭ বিকলা	(ক^{২})		
১৪	২৩	৪৫	২·১	(ক^{১})	৫৮ক ৪৪·৪ বি (খ^{২})	−১·৮ বি (গ^{২})
১৫	২৪	৪৩	৪৪·৭	(ক^{০})	৫৮ ৪২·৬ (খ^{১})	−১·৭ (গ^{১})
১৬	২৫	৪২	২৫·৬	(ক$_{১}$)	৫৮ ৪০·৯ (খ$_{০}$)	−১·৮ (গ^{০})
১৭	২৬	৪১	৪·৭	(ক$_{২}$)	৫৮ ৩৯·১ (খ^{১})	−১·৬ (গ^{১})
১৮	২৭	৩৯	৪২·২	(ক$_{৩}$)	৫৮ ৩৭·৫ (খ$_{২}$)	

দেখা যাইতেছে যে, ১৫।১৬ই এর মধ্যে কোন এক সময়ের সৌরস্ফুট নিরূপণ করিতে হইবে। এই সময়কে দিনের কোন অংশ হিসাবে (কারণ, আমরা প্রতিদিনের স্ফুট পাইতেছি) "স" বলিয়া ধরিলে, ১৫ই তারিখের ১২টা হইতে তাহা ক^{স} বলিতে পারা যায়। এক্ষণে বেসেলের সূত্রমত ক^{স} নিরূপিত হইবে। ক^{স}ই আমাদের অয়নাংশ।

$$ক^{স} = ক^{০} + সখ^{০} + \frac{স(স-১)}{২}\left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right)$$

এস্থলে স = ১৭ঘ ২৭ মি ২৭·৪৮ সে $= \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭}$ দিন

সুতরাং অয়নাংশ = ২৪ অংশ ৪৩ ক ৪৪·৭ বিকলা $+ \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times$ ৫৮ক ৪০·৯ বিকলা

$$+ \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times \left(\frac{৩২০১৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭১}\right)$$

$$\times \frac{১}{২} \times \left(\frac{-১·৭-১·৮}{২}\right)$$

= ২৫ অংশ ২৬ ক ১৬ বিকলা।

এইরূপে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিলে ইহার বার্ষিক গতি জানা যাইবে। কয়েক বর্ষের অয়নাংশ নিরূপণ করিতে পারিলে ইহার গতির হার শুদ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। কিছু অধিক গত বর্ষসংখ্যার অয়নাংশ ধারাবাহিকরূপে স্থির করিয়া, তাহাদের সাধারণীকরণ (integration) প্রক্রিয়ার দ্বারা এমন একটী নিয়ম গঠিত হইতে পারে, যাহাতে নাবিকপঞ্জিকার বিনা সাহায্যে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত অয়নাংশ গণিত হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ" কথাগুলিতে রেবতী নক্ষত্রের শেষে ভগণের আদি না বুঝাইতে পারে ; এই বাক্যাবলী সোমসিদ্ধান্তে এবং ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেও দেখা যায়। ভাস্করাচার্য্যও রেবতী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ কারণে পৌষ্ণান্তে অর্থে রেবতীর অন্তে ধরিলে আমরা দেখি যে, আদিবিন্দু সচল না হইয়া নিশ্চল হইবে এবং তাহা আমাদের মূল তত্ত্বের প্রমাণের বিপক্ষে যাইবে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তজ্যোতিষগুলির পূর্ব্বের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, তৎকালে নক্ষত্রের আদি অশ্বিনী বলিয়া ধরা হইত না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার নিকট আদিবিন্দু অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার পিতামহসিদ্ধান্তে আদিবিন্দুর স্থান ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল। মহাভারত রচনাকালে শ্রবণা নক্ষত্রকে আদি বলিয়া ধরা হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবিন্দু সচল এবং হিন্দুগণ বহুদিন হইতে আদিবিন্দুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	১৩	পংক্তি	২৫	"যাম্যোদ্‌গ" "যাম্যোদগ্‌" হইবে।
পৃষ্ঠা	„	„	৩১	"তেষামন্তরং শান্তদাস্পদাৎ"। "তেষামন্তরংশান্তদাস্পদাৎ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৪	পংক্তি	১০	"বিষুক্ত্যা" "বিষুক্ত্যা" হইবে।
পৃষ্ঠা	„	„	১২	"ষঃ" "ষঃ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৫	পংক্তি	১৯	"কৃত্যো" "কৃত্যো" [illegible]
পৃষ্ঠা	„	„	[illegible]	[illegible] "বিষুবদ্যে" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৬	পংক্তি	২৫	"নাত্তাদিকং" "নাত্যাদিকং" হইবে।

মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি

আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় "মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে সময় তথাকার যে সকল শিলালিপি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, উক্ত প্রবন্ধে সমস্তই সন্নিবেশিত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুনা দেবীপুর নামক যে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে, এক কালে তাহা সাধু মোহান্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা উক্ত স্থানে মানবদেহের সার্থকতার জন্য আসিয়া মন্দির-মঠাদি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গমে ও ধর্ম্মযাজনে জীবন যাপন করিতেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতের কবলে অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া উক্ত দেবীপুর গ্রামের সামান্য অংশই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ তিনটী আখড়া বা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠেই এক বা ততোধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে দেবসেবা ও অতিথি-সৎকারাদির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের সেই আখড়াগুলির বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবশেষে ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে তথাকার মধ্যম আখড়ার একটী শিলালিপি রক্ষিত আছে শুনিয়া, আমি তাহা দেখিতে যাই। উক্ত আখড়ার একটী গৃহে কাল প্রস্তরের একটী বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাই। সে সময় আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি (rubbings) লইবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। পূর্ব্বপ্রদেশের প্রত্নবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ প্রস্তরটী তাঁহাকে দেখাই। আমাদের সঙ্গে ইতিহাস-প্রেমিক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়ও ছিলেন। সেই সময় এই শিলালিপির ছাপ লওয়া হয়, তাহাই আজ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪।• ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তোলা অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহার চারি ধারও সুন্দর নক্সায় শোভিত। সমস্ত লিপিটী মধ্যভাগে একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটী কবিতা লিখিত আছে। নিম্নভাগ আর একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার বাম দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে পদ্যে ও দক্ষিণ দিকে পারসী কবিতায় লিপিটী ক্ষোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটীর মধ্যভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার ক্ষোদিত আছে। এইরূপ তিন ভাষাযুক্ত শিলা-লিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিলালিপির সারাংশ এই যে, বিক্রমসংবৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুরপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জমি ক্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে হরিমন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। লিপিতে জমির পরিমাণ বাইশ বিঘা আট কাঠা, এবং চৌহদ্দী—পশ্চিমে গঙ্গার আইল, উত্তরে দেবীপুর ও দক্ষিণে বাহাদুরপুর লিখিত আছে। ঐ জমি রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করার উল্লেখ হিন্দী, বাঙ্গালা ও পারসী—এই তিনটী ভাষাতেই আছে। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় কেবলমাত্র রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট উদ্যান হইতে খরিদ করার বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু পারসী ভাষাতে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রত্নেশ্বরের বিধবা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর উদ্যান হইতে লাখরাজ জমি খরিদ করার উল্লেখ থাকায়, রত্নেশ্বরের স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লেখকের নাম রামকৃষ্ণ উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত দেবীপুর ও বাহাদুরপুর গ্রামদ্বয়ের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের যে ইতিহাসগুলি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাতে উল্লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহের কোন বিবরণ দেখা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের কোন না কোন স্থানের প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। হিন্দীতে নৃপ গন্ধর্ব্ব সিংহ ও পরে তাহার বিশেষণস্বরূপ মহারাজ শব্দ লিখিত আছে। বাঙ্গালায় মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর এবং পারসীতে কেবলমাত্র রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ লিখিত আছে। যাহা হউক, গন্ধর্ব্ব সিংহ যে, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই শিলালিপির আর একটী বিবেচ্য বিষয়ে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটী এই যে, ইহার হিন্দী ভাষার লিপিতে বিক্রম সংবৎ ১৭৮১ লিখিত আছে। বাঙ্গালা ভাষার লিপিতে শকাব্দা "ষোলষস" ও অঙ্কে "৪৬ সনে" অর্থাৎ ১৬৪৬ সনের উল্লেখ আছে। ইহার সামঞ্জস্য হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। সংবৎ ১৭৮১ ও শকাব্দা ১৬৪৬ এই দুইয়ে অমিল নাই। কিন্তু ঐ সনে হিজরী ১১৪৬ স্থলে ১১৪২ হওয়া উচিত ছিল। যদি উপরোক্ত সংবৎ কিংবা শকাব্দা এবং হিজরী—এই দুই সন তারিখ, একটী জমি ক্রয় করিবার ও অপরটী শুভদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ধরা যায়, তাহা হইলে, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার লিপির সন তারিখই অর্থাৎ সম্বৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া—(অক্ষয়তৃতীয়া) মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া ধরা উচিত। জমি ক্রয়ের সময় অবশ্য ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হইবারই কথা; অথচ পারসী ভাষার লিপির সন তারিখ তাহার আরও তিন চারি বৎসর পরের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনরূপ সাধন না থাকায়, আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে এই অপ্রকাশিত শিলালিপির লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ সম্বন্ধে যদি কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিশেষ সফল হইবে।

শিলালিপির বঙ্গাক্ষরে অক্ষরান্তর

(দেবনাগর)

১। শীর্ষভাগে—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবজূ সদাসহাই।

২। দক্ষিণভাগে—শ্রীলছমনায় নমঃ।

৩। নিম্নভাগে—শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীঃ॥

৪। বামভাগে—শ্রীরঘুনাথায় নমঃ॥

(উপর অংশে দেবনাগর)

১। সম্বতু ১৭৮১ বৈশাষ মাস সুদি তীজ॥ শ্রীনৃপ গন্ধর্ব্ব সিংঘ ভূব মোললে বয়ো ধর্ম্মকো-বীজ॥ দেবপুরী অস্থানু ন

২। হ বাগু গঙ্গকে তীর॥ জর খরীদি লীনোঁ সৌঙ্গি শ্রীহরিসুমরণকোঁ ধীর॥ রত্তনেসুরকী নারিনেঁ দয়ৌ খুশী করি মোল॥ থ

৩। রি রোপী মহারাজনেঁ ধর্ম্মপুরী অডোল। উত্তর দেবীপুর বসে পচ্ছিম গঙ্গা আলি॥ মেঁড বহাদুর পুর লগী দচ্ছিন

৪। পূরব খালি॥ বীঘা বীস পর দোয়হৈ আঠ বিসে পরিমাঁন॥ হরিমন্দিলু কীন্হো তহাঁ বাঁধ্যৌ কূপ নিরাঁন॥ ৫॥

(নিম্নে বাম অংশে বাঙ্গালা)

১। ওঁ শ্রীমহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর রত্নে—

২। সরের স্ত্রি স্থানে বাগ হইতে বাইশ বিঘা আট

৩। কাঠা ইহ পশ্চিমে গঙ্গার আলি উত্তরে দেবীপু—

৪। র পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহাদুরপুর জর খরিদ লইয়া

৫। সকাব্দা সোলষস ৪৬। সনে বৈসাখ মাষের ×

৬। অক্ষয়ত্রিতীয়া দিবশে হরিমন্দির ও কূপ দিলা।

(নিম্নে দক্ষিণ অংশে পায়সী)

১। রাজা গন্ধরব্ সিন্হ্ বহাদুর বাগ্ করদন্দ জর খুরীদ ওদ নমুদ অন্দার হবেলী চাহসীরাঁ অকজীদ।

২। মী-গিরফ্‌ৎ অজ নিজদ মুসমাত ঈশরী দেবী চোবুদ, অহ্‌লিয়ে রত্তনেসর জুন্নারদার মুতবন্নক বয়ুদ।

৩। বিস্তউ দো বিঘা মোয়াজী হস্ত বিস্ওয়ে লাখরাজ, হদ্দ মযরিব অওজ দরিয়ায়ে মৌজ দর নৌজমিজাজ।

৪। পূর বহাদুর হর দো সুদ্ মসরীক্ ও জনুব দারদ্ জমীন, তা শমাল হদ্দ দেবীপুর মোকর্‌র শুদ। আমীন।

৫। অজ তবারিখ নহুম শব্‌বাল দহ উ শশ্ সনহ্ জলুস, য়ক হজার উ য়কসদ উ চেহল উ শশ্ হিজরী মনুষ

৬। অজ্ খৎ-ই রামকৃষ্ণ

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি

"মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি"
পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় আমাদের সমক্ষে এই অপূর্ব্ব ত্রিভাষাময় লিপিখানি উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশে প্রদত্ত তারিখ তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি স্বকীয় পাঠ অবলম্বন করিয়া দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশের সংবৎ ও শকাব্দের সহিত ফারসী অংশের হিজরী সনের অসামঞ্জস্ত দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে সেই অসামঞ্জস্তের কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি উভয়ে মিলিয়া এই লিপিখানির ছবার ছাপাটি আলোচনা করি। ফারসী পাঠটিও আমরা পড়ি। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ফারসী অংশের তারিখটী লইয়া অনুশীলন করেন। আমরা দেখিতেছি, লিপিতে কোনও অসামঞ্জস্ত নাই।

দেবনাগরী অংশে প্রথম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

সংবতু ১৭৯১ বৈসাষ (ষ=খ) মাস সুদি তীজ ॥

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু ১৭৮১ পড়িয়াছেন। স্পষ্ট ১৭৯১ আছে, ১৭৮১ নহে।

বাঙ্গালা অংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে তারিখ এই আছে :—

সকাব্দা সোলষ পাচপোন বৈসাথ মাসের অক্ষয় ত্রিতিয়া দিবশে ॥

অর্থাৎ শকাব্দা ১৬৫৫ বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়া।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু পড়িয়াছেন, "সকাব্দ সোলষস ৪৬। সনে" ইত্যাদি। এই পাঠ মোটেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। "পঞ্চান্ন" স্থলে "পাচপোন" বঙ্গদেশে বিরল নহে। "সোলষস ৪৬"—অর্দ্ধ অংশ অক্ষর বিন্তাসের দ্বারা, অর্দ্ধ অংশ সংখ্যা-লেখের দ্বারা—এইরূপে কাল-নির্দ্দেশ একেবারে দুর্লভ। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু "পা" কে "স ৪" পড়িয়াছেন, "চ" কে "৬" ধরিয়াছেন, "পোন" কে '। সনে' পড়িয়াছেন। ইহাতেই যত গোল।

সংবৎ ১৭৯১=শকাব্দা ১৬৫৫=খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪, এখানে কোনও গোল নাই।

ফারসী অংশের পঞ্চম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

অজ্ তবারিখ ই নহুম্ শব্বাল দহ্ উ শশ্ সনহ্ জলুস য়ক্ হজার উ য়ক্ স্বদ্ উ চিহিল উ শশ্ হিজরহ্।

রাজ্যাঙ্ক (সনহ্ জলুস্) ১৬ (দহ্-উ-শশ্) ৯ই শওয়াল, এক হাজার এক শত চল্লিশ ও ছয় হিজরী (=১১৪৬ হিজরী)।

দিল্লীতে মুহম্মদ শাহ হিজরী ১১৩১ হইতে ১১৬১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের যোড়শ বর্ষ = ১১৪৬ হিজরী। ১১৪৬ হিজরী ১৪ জুন ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১১৪৬ হিজরীর শওয়াল মাস ১৭৩৪ সালের মার্চ্চে পড়ে। সুতরাং ১৭৯১ সংবৎ = ১৬৫৫ শকাব্দ = ১১৪৬ হিজরী—এই তিনে বেশ মিল আছে।

দেবনাগরী অংশের ভাষা রাজস্থানী-মিশ্র ব্রজভাষা; চতুর্থী বিভক্তিস্থলে "নে" ("রতনেস্বরকী নারিনেঁ দয়ৌ" = রত্নেশ্বরের স্ত্রীকে দিল) রাজস্থানীর বিভক্তি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—০—

ধনুর্ব্বান লয়ে হাথে লক্ষন আইল সাথে
বাঁসা কৈল পঞ্চবটী বন।
বনে জত দুখ পাই না কহি রামের ঠাই
মুখ হেরি জুড়ায় জিবন॥
তিলার্দ্ধেক জদি রাম না থাকেন নিজ ধাম
মন মোর উচাটন করে।
নিরক্ষিলে চাঁদমুখ হৃদয়ে বড়ই সুখ
সজ্যা করি কুসের উপরে॥
লঙ্কাপুরে অষ্ট মাস না থাকি প্রভুর পাস
হিয়া সুক্ষ হইল আমার।
রামপদ না দেখিয়া কান্দয়ে আমার হিয়া
রহিলাম সাগরের পার॥
বল বাপু হনুমান কেমন আছেন রাম
আমার বিরহে পোড়ে মন।
হনু বলে সুন মাতা কি কব রামের কথা
প্রবোধিতে না পারে লক্ষন॥
কি কহিব বিধাতারে সকলি করিতে পারে
মিন নাহি জল ছাড়া বাঁচে।
কিত্রিবাস কহে বানি না কান্দিহ ঠাকুরানি
পুন জাবে শ্রীরামের কাছে॥
পবননন্দন, সুনহ বচন
ত্বরায় আনহ রাম।
বহু দিন হৈলে কাতি দিব গলে
সুকাবে জাহুকি নাম॥
অশোককাননে চিন্তি রাত্রদিনে
ভুমেতে লিখি শ্রীরাম।
লিখিতে লিখিতে দেখি আচম্বিতে
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রভুর অঙ্গরি দেখি চক্ষু ভরি
আজি মোর সুপ্রভাত।
অষ্ট মাস মোরে শাগরের পারে
রাখিলেন রঘুনাথ॥
রাবনের চেড়ি মারে সভে বেরি
কেমনে ধরিব প্রান।
রামে জদি দেখি তবে প্রান রাখি
সুন বাপু হনুমান॥
দেবর লক্ষন কিসের কারন
তর্ত্ত নাহি মোর করে।
মোর দুখ শেষ বুঝিনু বিশেষ
বিধি মিলাইল তোরে॥
সুন হনুমান কহি তব স্থান
জত দুখ আমি পাই।
হেন অষ্ট মাস নিত্য উপবাস
কহিও প্রভুর ঠাই॥
রাক্ষসের ঘরে প্রান কাঁপে ডরে
নারির কতেক প্রান।
বিসম রাক্ষস বচন কর্কস
সদা করে অপমান॥
প্রভু নারায়ন বধিয়া রাবন
উদ্ধার করুন মোরে।
শ্রীঅযোধ্যানগরে গিয়া নিজ ঘরে
প্রনাম করিব তারে॥
কিত্তিবাস কয় না করিহ ভয়
লঙ্কাজয়ি হবে রাম।
অশোকের বনে ভাব নারায়নে
মুখে বল রাম নাম॥ (পৃ০ ২৯।২-৩০।২)

শেষ ৫৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। পুষ্পিকার পর,—

তোমার চরনে এই নিবেদন রাম।
ধন পুত্র লক্ষি দিয়া পুরায় মনস্কাম॥
ইহা বিনে অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন।
মনের মানস পূর্ণ কর নারায়ন॥
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর।
ময়নে স্মরন দিও রাম গদাধর॥

এই মহাজ্য কোর রাম বাপের ঠাকুর।
অশেষ পাপে মুক্তি করি লবে নিজ পুর॥
রাম রাম প্রভু রাম কোমললোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইলাম স্মরণ॥
তোমা বিনে অকিঞ্চনে নাহি কেহ আর।
অন্তকালে ও পদে মতি রাখিবে আমার॥
এই নিবেদন মোর সুন নারায়ন।
গঙ্গাজলে রাম বলে ত্যজি এ জীবন॥

৬২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪৯,৫১-৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

করেছি দারূন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানে[র] অধিক তোরে বাসিয়ে অঙ্গদ॥
সরমে করহ পার সন্যগন নঞা।
সিতা অন্যসন কর আমা পানে চেঞা॥
সিতা বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটি বনে।
বিধুমুখি সিতারে মোর তাই পড়ে মনে॥

ইহার পর ৫৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

মধ্য,—

বসিলেন দুই জনে ডাকি নিজ মুন্তিগনে
প্রধান প্রধান জুথে জুথে।
সুগ্রিবেরে শঙ্গে করি গমন করিলা হরি
মাল্যবান গিরি করি হাথে॥
চাহিঞা সুগ্রিবের পানে ধারা পড়ে দু নয়নে
কহিতে লাগিলা রঘুবর।
তোমার শহায় মিতা উদ্ধার করিব সিতা
তবে স্থির আমার অন্তর॥
শ্রীরামে[র] করিব কাজ কহে সুগৃব মহারাজ
তুমি জার সঙ্গে রঘুবর।
কপিদল সঙ্গে লব সমুদ্র তরিঞা জাব
সবংশে বধিব লঙ্কেশ্বর॥
প্রভু তোমার চিন্তা কি সিতার তত্ত্ব পেঞাছি
উদ্ধারিব জনকনন্দিনি।
আমার বচন রাখ দিন কর মুন্তি ডাক
উঠে সভে দিঞা জয়ধ্বনি॥
কপিগন লাখে লাখে ব্রহ্মার নন্দন ডাকে
প্রস্তু কর মুন্তি জম্ববান (?)।
মান্দি ক্ষেন গুনে দিল কটকে আনন্দ হইল
ধনু লঞা গা তুলিলা রাম॥
জাত্রা করি রঘুবির চলিলা শাগরতির
পরিহরি গিরি মাল্যবান। (পৃ° ৩৮।১)।

অন্ত,—

মান্দি ক্ষেন গননা করিলা জাম্ববান।
কোদণ্ড করিঞা স্কন্দে গা তুলিলেন রাম॥
অজানলম্বিত ভুজ নিলকান্তি তনু।
নিতম্বে বাকল সাজে রামরম্ভা জানু॥
কোকনদ জিনি পদ নোখচন্দ সাজে।
হেরিঞা রামের রূপ বিধু পড়ে লাজে॥
গোউর বরন শঙ্গে সুমিত্রাকিশোর।
হেরিঞা দোহার রূপ আনন্দে বানর॥
সাজিল বানর জত গাছ পাথ[র] হাথে।
ভল্লুক বানর শব চলে চতুর্ভিতে॥
নল নিল প্রভিতি আর হরিতাল বরন।
নানা বর্ন্নের মেঘ জেন ছাইল গগন॥

শেই মেঘ মর্দ্ধে রামচন্দ্র হইলেন চন্দ্র।
দেখিঞা সুগ্রিবের কত হইল আনন্দ॥
উদয় করিল বিধু কি কহিব কথা।
সুমিত্রানন্দন তাথে বিদ্ধ[্য]তে[র] লতা॥
জাঙ্গালে চরন দিলা কৌশল্যাকিশোর।
আপনাকে ধন্য মানে বশএ বানর॥
অঙ্গে অঙ্গে বানর শব হঞা মেলামেলি।
গগনে লাঙ্গুড় উঠে রামজয় ধর্ব্বনি॥
চলিল বানর জত নহি লেখা জোখা।
লাঙ্গুড় উটেছে জেন দেখিতে পতকা॥
জলধর গর্জ্জে জেন হাকিছে বানর।
শব্দ প্রবেশিল গিঞা লঙ্কার ভিতর॥
প[া]চিরে উটিঞা জত রাক্ষশ দেখিল।
সাগর করিঞা বন্ধ রাঘব আইল॥
সুমুদ্র হইঞা পার রাজিবলোচন।
সুভদিনে লঙ্কা প্রবেসিলা নারায়ন॥
পড়িল বানর জত লঙ্কার ভিতর।
ঘের ঘের সব্দ করে ডাকিছে বানর॥
বানরের সিংহনাদে টলে লঙ্কাপুরি।
মৃগচর্ম্ম পাতিঞা বশিলা জটাধারি॥
সুমুখে সুগ্রিব রাজা বামে জম্বুবান।
রামের দক্ষিনভাগে ব্যেলের শস্থান॥
কৃতাঞ্জলি রাম আগে অঞ্জনানন্দন।
রাঘবে ঘেরিঞা আছে জত কপিগন॥
কেহ বলে বিলম্বে আর প্রওজন কি।
এককালে ধরি লঙ্কায় রসাতলে নি॥
কেহ বলে ভাঙ্গ বেটার কনক পাচির।
কেহ বলে পড় লঙ্কায় ধর দশসির॥
কেহ বলে একবার রামের আজ্ঞা নিব।
চার দণ্ডের মর্দ্ধে লঙ্কা সমুদ্রে ডুবাব॥
এই জুক্তি করে শব জতেক কপিগন।
হেরিঞা আছএ শব রামের বদন॥
সুমুদ্র করিঞা বন্ধ রাম হইলা পার।
ঘেরিল কনক লঙ্কা কৌশল্যাকুমার॥
বশিলা জানকিনাথ লঙ্কার ভিতরে।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা শাঙ্গ এত দুরে॥

৬৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৬, ৮-৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

রাক্ষষ দেখিলে নর ভয়ে জেন জরে।
একেশ্বরি জানকি রাক্ষসিগন মারে॥
ঝরেতে ব্যাকুলি জেন কলার বালুরি।
সিতার দুর্গতি করে রাবনের চেরি॥
রাক্ষসের ভক্ষ নর ভুঞ্জে ব্যবহার।
কোথাহ নাহিক দেখি হেন অনাচার॥
মার কাট চেরি সব তাহে নাই ডর।
রাম ছারি কেহ নহে প্রানের ইশ্বর॥
কোথাএ আছেন রাম কোমললোচন।
তি[ি]ন প্রভু বিনে মোর অভাগ্য জিবন॥
ধুলায় ধুসর হয়্যা উটিলা সত্বরে।
বিক্ষডাল ধরি সিতা কান্দে উশ্চস্বরে॥
হনুমান আছেন সিংসপা বিক্ষডালে।
রাম বলে জানকি কান্দেন তার তলে॥
কোথা গেলে রামচন্দ্র কৌসল্যা সাসুরি।
অপমান করে মোর রাবনের চেরি॥
ভাগ্য[বা]ন্ত লোক দেখে কোমললোচন।
সেই প্রাননাথ সনে নাহি দরসন॥
কত পাপ করিলাম পাপের নাই অবসান।
তেই সে চেরির হাথে এত অপমান॥

প্রান ছারিতে চাহি না হয় বাহির।
আর কত দুঃখ সব মানুস স্বরির॥
আজু জদি প্রভু মোর লঙ্কাপুরে এসে।
রাক্ষস করেন খের চক্ষুর নিমিসে॥
কত কত রাক্ষসেরে করিলা সংহার।
দুঃখিনি জানকি ডাকে না কল্যা উর্দ্ধার॥
আমি এত দুঃখ পাই রাম জদি সুনে।
লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে এক বানে॥
রভাগিনি স্ত্রি আমি বর দুরাচারী।
তেই রপমান করে রাবনের চেরি॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এইমন লঙ্কাপুরি করুন আমার রাম॥
শ্রীরামের বানে হউক রাক্ষস সংহার।
রাক্ষসের চিতাধুমে হউক রন্দকার॥
সুকিনি গিধিনি ছাআ করুক আকাষে।
শ্রীগাল কুকুর তুষ্ট রাক্ষসের মাংসে॥
কেহ জদি এসে থাকে রামের রনুচর।
এই দুঃখ কহো গিআ রামের গোচর॥
সিতা লক্ষি সাপ দেন হয় বিপরিত।
সুন্দরায় রচে কিত্তিবাষ পণ্ডিত॥

(পৃ° ১৬।১-১৭।১)

ধিক ধিক ধিক জন্ম ধিক তোর পরাক্রম
ধিক তোর কুলের রাচার।
ব্রহ্মবংসে জন্ম জার এমন তার কদাচার
রপজস ঘোচএ সংসার॥
মারিচ বদন দিআ পলালি পরান লয়্যা
সন্ন ঘরে সিতা কৈলি চুরি।
ভুবন বিনাষে জে শ্রীরাম পুরুষ সে
সোষক হয়্যা সিংহি কৈলি বৌরি॥
তোরে আমি দেখি জেন ক্ষুদ্র পিপিলিকা হেন
মাকরের ডিম্ব লঙ্কাপুরি।
মারিআ হাতের কাতা ছিরে পেলি দষ মাথা
সিতা নিআ প্রভুর বরাবরি॥
দসানন তুই পাপি মুই একেলা কপি
রন কর বুঝি তোর বল।
রাপনার ভুজবলে চরনপ্রভাব তলে
বল লঙ্কা নেও রসাতল॥
লঙ্কা নি নাঙ্গুরে জরি নিমিসে সাগর তরি
বল জাই রঘুনাথের আগে।
রামের আজ্ঞা পাইলাম জিজ্ঞাসিআ আইলাম
পাসরিলাম তোর বাপের ভাগ্যে॥
হনুর বচন সুনি পার্থ মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বিবিসনে লাগে সঙ্কা নিশ্চএ মজিল লঙ্কা
কিত্তিবাষের লাচারি সুসার॥

(পৃ° ২৯।১)

শেষ,—বানরসৈন্য সহ রামচন্দ্রের লঙ্কা-প্রবেশ এবং যুদ্ধে ভস্মলোচনের অধীন রাক্ষস-সেনার পরাভব। ইহার পর একখানি বিচ্ছিন্ন পত্রে নিম্নলিখিত লাচাড়ীটি আছে,—

সুন প্রভু দেব রাম বিভিসন মোর নাম
রাবনের কনেষ্ট সহদর।
বৈদেহি দিবার তরে অনেক বুঝালাম তারে
হিত না সুনিল লঙ্কেশ্বর॥
মোর বাক্যে কোপে জলে কাটীবারে খর্গ তোলে
তুমী তায় রাখিলে আমারে।
লাথি মাইল মোর বুকে লঙ্কা ছাড়ি মনদুঃখে
আইলাম তোমার বরাবরি॥
মনেতে করিল আস হইব তোমার দাষ
ছাড়িলাম গৃহ সুত নারি।
লোকমুখে সুনি আমী দয়ার সাগর তুমী
গুননিধি দিনে দয়া করি॥
রাবন করিতে নাস ছলে আইলে বনবাস
অনাথপালন গুননিধি।

তোমার নামের গুনে সমনে দমন মানে
এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি ॥
বিভিসনের স্তব স্তুনি তুষ্ট রাম গুনমুনি
ক্ষনে মনে করেন বিশ্বাস।
জেবা জনে স্তুনে ভনে বর দান নারায়নে
লাচারি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥

৬৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল (১১১৩ সালের পুথি দেখিয়া লিখিত)। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

আমার বচন স্তুন রাজিবলোচন।
জুক্তি বোলি ডাক দেখি পবননন্দন ॥
হনুমান বিনে কেবা লংঘিবে সাগর।
স্তুনিআ আসাজ্য কথা কহে রঘুবর ॥
বড় বড় বির জার নারিল লংঘিতে।
হনুমান কেমনে যাইবেক সমুদ্রপারেতে ॥
মন্তি বলে জন্মকথা স্তুন রঘুবর।
জে কালে জনম হৈল হনুমান বানর ॥
পঞ্চ দিনের জথন হৈল হনুমান।
অঞ্জনা বানরি গেলা করিবারে স্নান ॥
পর্ব্বতে স্তুতিএ ছিল মহাবির হনু।
প্রাতঃকালে অরুন উদয় হই[ল] ভানু ॥
ক্ষুধাএ পিড়িত হএ পবননন্দন।
লম্ফ দিএ উঠে বির লক্ষেক জোজন ॥
ধরিল সুর্য্যের রথ আপনার তেজেতে।
চমৎকার হৈল সুর্য্য লাগিল ভাবিতে ॥
ইন্দ্রের সদনে গিআ কহে দিবাকর।
আর কে জন্মিল রাহু সংসার ভিতর ॥
ধরিল আমার রথ আসি বিমানেতে।
এন স্তুনি দেবরাজ চাপি ঐরাবতে ॥
হাতে বজ্র করি ইন্দ্র লড়িল সঘনে।
উপনিত হৈলা আসি হনুমানে স্থানে ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি করিকুম্ভস্থল।
হনুমান বলে পারা পাকা বিম্বফল ॥
ছাড়িআ সুর্য্যের রথ ধরি কোরিশুণ্ড।
নখে করি বিদারিএ মাতঙ্গের মুণ্ড ॥
মহাকোধে পুরন্দর ধেনুক টানিল।
আকর্ন্ন পুরিএ বান হনুরে মারিল ॥
আকাসমণ্ডল হৈতে পড়ে হনুমান।
চুর হএ গেল দেহ বাজি ইন্দ্রবান ॥
শ্চান করি অঞ্জনা আসি পুত্রেরে দেখিঞা।
বজ্রাঘাতে অঙ্গ ভঙ্গ রএছে পড়িআ ॥
অস্তি চর্ম্ম কোলে করি করএ রোদন।
শ্বরন করিল তবে দেবতা পবন ॥
অঞ্জনার স্মরনে পবন মলয় ছাড়িআ।
দুজনে রোদন করে হনুমানে নঞা ॥
পবন বলএ মোর য়োরি পুরন্দর।
উনুপাচাস কৈল্য মোরে গর্ভের ভিতর ॥
পুতের উপরে মোর করে বজ্য বিটি।
তবে শে পবন আজি নাসে ব্রহ্মার ছিটি ॥
এত বলি উনুপচাস নিল কুড়াইয়ে।
মরিচে সকল জিব বাউ বর্দ্ধ হএ ॥
স্তুনিএ নারদের মুখে ব্রহ্মাদি দেবতা।
বাহনে চাপিএ জান হনুমান জোথা ॥
হংস্বের উপরে ব্রহ্মা হয়া আরহন।
বৃসবে চাপিয়া জাত্রা করে পঞ্চানন ॥
সিংহের উপরে চাপি চলিলা পাব্বতি।
মউর উপরে চলে কাত্তিক সেনাপতি ॥

মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মগয়রবাহনে জান জলের ইস্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হয়া আরোহন।
মহিসবাহনে চাপি চলিলা সমন॥
গরুড় উপরেতে চলিলা গদাধর।
উপনিত হৈলা সব পবন গোচর॥
ব্রহ্মা বলে তব পুত্র দিব বাঁচাইঞা।
শৃষ্টি রক্ষা কর তুমি বাউকে ছাড়িআ॥
এত বলি অস্তি চর্ম্ম করি একত্তর।
কুমণ্ডলের জল দিল হনুর উপর॥
জয়ধ্বনি দিআ গা তুলেন হনুমান।
দেখিএ আনন্দ কত অঞ্জনার প্রাণ॥
একে একে বর দেন জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বলে ব্রহ্মঅস্তে না হবে মরন॥
গোবিন্দ বোলিলা মোর সুদরসন হতে।
না হবে তোমার মিত্যু আমার কৃপাতে॥
আনল বলিছে সুন হনু মহাবল।
তোমার পরসে আমি হই[ব] সিতল॥
বোরুন বলেন সুন অঞ্জনানন্দন।
জলনিধির জলে তোমার না হবে মরন॥
সিব বলেন সুল হৈতে পাবে পোরিত্রান।
ইন্দ্রবজ্রে না মরিবে সুন হনুমান॥
প[া]র্ব্বতি বলেন সুন মোর অসি হৈতে।
না মরিবে হনুমান আমার কৃপাতে॥
জম বলেন দণ্ড অস্তে না হবে মরন।
মোর বানে মিত্যু নাহি কহে সড়ানন॥
এত বোলি বর দিলাম জত দেবগনে।
সুনাইলা জাম্বুবান রাজিবলোচনে॥
সিষুকালের পরাক্রম সুন রঘুবর।
লম্ফ দিএ ধরেছিল দেব দিবাকর॥
এখন দিগুন বল করে দিলে রাম।
আপুনি দিএছ জারে তারকব্রহ্ম নাম॥

সুনিয়া মন্তির কথা রামের উলাস।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা রচেন কিত্তিবাস॥*॥
উঠিএ জানকিনাথ চান হনু পানে।
আসিএ অঞ্জনাসুত বন্দিলা চরনে॥
বানর করিয়া কোলে ধরি দুটি হাত।
ছল ছল আখি দুটি কহে রঘুনাথ॥
তিভুবনে ক্ষাতি রাখ অঞ্জনাকুমার।
নিতান্ত জানিহ হনু ভরসা তোমার॥
জানকির বাত্রা আন সুমুদ্র লংঘিএ।
মিনি মুলে দুটি ভাইকে লইবে কিনিএ॥
জানকির বিরহে মোর বিদরএ মন।
সিতা বিনে অন্দকার এ তিন ভুবন॥
এত সুনি হ[নু]মান কহে জোড় করে।
ভিত্যকে এমন কর কোন কায্যের তরে॥
(পৃ° ৩১২-৫১)

পশু জাতি অন্ন ফলে তৃপ্ত হবে কেনে।
শ্রীরামের অন্ন পানে চাহে ঘনে ঘনে॥
এবারে গুরুর ফল কি জুক্তি করিব।
জুত্তার:লালসা অতি রহিতে নারিব॥
পিতা সম রামচন্দ্র পুত্র সম আমি।
খাইব তোমার অন্ন ক্ষেমা কোর তুমি॥
এত বোলি অন্ন মুখে ফেলি দিল।
সে বারে বানরের কণ্টে আঠি জে লাগিল॥
পড়িএ অবনিতলে রামগুন গায়।
উদরে নামিল আঠি করে হায় হায়॥
(পৃ° ১৯১২)।

হোথা রাজা রাক্ষসে সুধায় দসানন।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিএ রেণি কতেক জোজন॥
রাক্ষস বলেন রাজা সুন লঙ্কেশ্বর।
জে পর্ব্বত আনিআছে এক এক বানর॥
এক লক্ষ রাক্ষস ধরি নাড়াতে নারিলাম।
রাত্রে গীয়া এক জোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিলাম॥
রাবন বলিছে ধিক রাক্ষসের বল।
এত কাল রাজ ভোগে পুষিলাঙ নিস্ফল॥

আজি রাত্রিকালে রথে আপুনি সাজিব।
চারি দণ্ডে সমস্ত জাঙ্গাল ভাঙ্গি দিব॥
দিন গেল রাত্রি হইল সাজিছে রাবন।
বাজিছে দামামা বাগু স্থখি দসানন॥
সাজায় পুষ্পক রথ কাঞ্চন তার নাম।
ব্রহ্মার নিম্মীত রথ অতি অনুপাম॥
সনার কলস সব রথধ্বজে সাজে।
চৌদিগে রথখানার জয়ঘণ্টা বাজে॥
রজত কিংকিনি রথে রাঙ্গা পাটের দড়া।
চৌদিগে নিম্মিত রথে নেতের পাছড়া॥
দস মুণ্ডে মকুট পরিল দসানন।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল রাজা রতন অভরন॥
দস হাতে দস ধনু পীসৃটে বান্ধা তুন।
রথের উপরে চাপে রাজা দসানন॥
নয় লক্ষ রাক্ষস সাজিল রাজার সাথে।
রাত্রিকালে জায় রাজা জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে॥
নিদ্রাগত হএ আছে জত কপীগন।
রথ হইতে জাঙ্গালে নাম্বিল দসানন॥
কুড়ি হাতে করি জেই ধরিল সিখর।
স্থূল হাথে করি আসি ডাড়াল সঙ্কর॥
দেখি প্রনাম করে লঙ্কার ইশ্বর।
জাঙ্গাল উপরে তুমি কি লাগি সঙ্কর॥
সুলপানি বলে স্থন রাজা দসানন।
জাঙ্গালের রক্ষক দিলেন রাজিবলোচন॥
হাসিছে রাবন রাজা স্থনি হরের কথা।
মানুসের স্বহায় তুমি দেবাদি দেবতা॥
এত স্থনি সদাসিব রাবনেরে কয়।
রামচন্দে বুঝিলাম না জান পরিচয়॥
পুন্নব্রহ্ম রামচন্দ লক্ষি জনকঝি।
রাম মন্ত্রে উপাসক আমি হইছি॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে সক্তি নাহিক তোমার।
লঙ্কা মুখে ফেরে জায় না থা[কি]হ আর॥

দসানন বলে বুঝি মোরে হলে বাম।
ভোজবিদ্যা দি তোমায় ভুলাইল রাম॥
স্থন সদাসিব ভলা   য়েমন তোমার লিলা
না হইলে মোরে কিপাবান।
দেখিয়া বোরির বল   বেলা পেএগ কৈলে ছল
মস্তি ধরি ভয় দেখা ান॥
রাবন তোমার ভক্ত   ব্র...নে ইহা তিজ[গ]ত
তাথে তোমার এ...ক ছলনা।
হেন সেবক ঘৃনা করি   ভাসাইলা লঙ্কাপুরি
তোমায় আর সেবিব কোন জনা॥
লয়্যাছিলাম পদছায়া জানিলাঙ জতে [ক] দয়া
বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা।
কোলাস গিরি ছাড়িয়া   বিপক্ষের পক্ষ হঞা
জাঙ্গালে বসিয়াছ থানা॥   ইত্যাদি।
(পৃ০ ৪৬।১-২)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৬৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫, ১৭-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

অন্ত[ঃ]পুরে জানকির না পেএ সন্ধান।
চঞ্চল হইল মনে পবনসন্তান॥
হনু বলে আইলাম স্মুদ্রের পার।
সিতা না দেখিএ দেখি কুচ্ছিত আকার॥
চোরের মত এস্তেছিলাম চৌরের মত জাব।
বিরপনা লঙ্কাপুরে কিছু জানাইব॥
জুবতির জটে জটে করিএ বন্ধন।
রাবনের কেসে বান্ধে পবননন্দন॥ (পৃ০ ৭।১)

বিরবাহু সুবাহু ঘর তাহার দক্ষিনে।
তার পর গেল বির অতিকাভুবনে॥
বিরলে বসিএ বির রাম নাম ডাকে।
দাণ্ডাইএ হনুমান দেখিল তাহাকে॥
তার পর গেল বিভিসনের ভুবনে।
দ্বারে আরোপিত জার তুলসিকাননে॥
দ্বারেতে আছএ লেখা শ্রীরামের নাম।
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব দেখে হনুমান॥ (পৃ॰ ৭।২)
নিদ্রা হৈতে উঠিএ বসিল দশানন।
রমনির জটে জটে করিছে বন্ধন॥
জটে জটে বান্ধা জত আছএ জুবতি।
দেখিএ আশ্চর্য্য ভাবে লঙ্কার ভুপতি॥
এমন আস্চজ্জ কর্ম্ম করে কোন জন।
উগ্রচণ্ডা দ্বারি জার চোকী দেবগন॥ (পৃ॰ ৮।২
মন্দোদরি বলে রাজা কহিএ তোমারে।
মন্দবাক্য কভু না বলিবে জানকিরে॥
সিবমন্ত্রে পাসউকভজহ সঙ্করে।
রামমন্ত্র জপেন সিব কহিএ তোমারে॥
গুরুর গুরু পরমগুরু তাঁর বিবাহিতা।
সাস্ত্রের [সিদ্ধান্ত] সিতা তব গুরুমাতা॥
জানকি আনিয়া হৈল কর্ম্ম অদভুত।
লঙ্কা মর্দ্ধে অবস্ত এসেছে রামদুত॥ (পৃ॰ ৯।১)
সুনি ক্রোধে পুর্ন্ন হএ লঙ্কাঅধিপতি।
বিভিসনের বক্ষস্থলে মারিলেক নাথি॥
রামকে ডাকিয়া ভুমে পড়ে বিভিসন।
বজ্জপদাঘাতে পড়ে হএ অচেতন॥
পদাঘাতে বিভিসন হইল কাতর।
অচেতন হএ পড়ে অবনি উপর॥
অতিকা আসিএ বিভিসনে কোলে নিল।
নেতের বসনে তার অঙ্গ মুছাইল॥
বৈষ্টব পরসে তার হইল চেতন।
অতিকা কহিল খুড়া না কর রোদন॥
পদাঘাত নয় তোমায় ছত্রদণ্ড হল্য।
অতপর রাবনেরে কমলা ত্যাগিল॥ (পৃ॰ ৩০।১)

৬৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৫১। প্রতি পত্রে ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মউর উপরে কাত্তিক দেবসেনাপতি॥
মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মকরবাহনে জান দেব জলেশ্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হএ আরহন।
মহিস উপরে চাপী চলিলা সমন॥ ইত্যাদি।

এই অংশে ৬৪ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

মধ্য,—

পথে পথে আভরণ পেলি আইস তুমি।
কুড়ায়া তোমার হার রেখাছিলাম আমি॥
সে হার দিলাম আমি রাজিবলোচনে।
চিনিতে তোমার হার দিলেন লক্ষনে॥
লক্ষন বলেন প্রভু সুন রঘুমুনি।
আভরনের মর্দ্ধে আমি নেপুর মাত্র চিনি॥
চরনের ধুলা নিতে মোর অধিকার।
চরন দেখিয়া মাএর হইতাম নমস্কার॥
ডালে হইতে হনু কহে সুন জনকঝি।
রামমুখে তারকব্রহ্ম নাম পেয়্যাছি॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম মৈত্র করিয়া।
বলিবক্ষ বিদারিলা ধনুর্ব্বান নিয়া॥
সুগ্রীবে রাজত্ত্ব দিয়া কিস্কিন্দানগরে।
একর্ত্ত হয়াছে জড় জতেক বানরে॥

সত অক্ষহিনি বানর ভালুক জুথে জুথে।
মাল্যবানে থানা দিল সুগ্রীব সহিতে ॥
চৌদিগে বানর গেল তোমার অন্ন্যাসনে।
সমুদ্র হইতে পার নারে কোন জনে ॥
শ্রীরামচন্দ্রন বলে তরিলাম আমি।
দুখ সব তোমার না ভাবিহ তুমি ॥
পরিচয় পেয়া মাএর হিদয় জুড়ায়।
ধরিয়া তরুর ডাল বানরে সুধায় ॥
মৃতদেহে প্রানদান কে করিলি মোর।
জনমে জনমে ধার না সুধিব তোর ॥
কাতরে জানকি বলে মোর বাক্য রাখ।
জুড়াক পরান আমার রাম বল্যা ডাক ॥
এখন পৃর্ত্তয় মোর নাহি লয় প্রানে।
রাক্ষসে দারুন মায়া নানা জন্তু জানে ॥
জদি ভুলাইতে আইল্যা দুখিনির মোন।
তোরে পাঠাইয়া জদি দিলেক রাবন ॥
কল্পনা করিয়া জদি বসিআছ আসী।
ডালে হইতে ভুমে পড় হয়্যা ভস্মরাসী॥
জদি নাথের দুত বট রামের কিঙ্কর।
নাম সুনালি জেন জুড়াল্য অন্তর ॥
উল্যাসে সংবাদ লয়া আইলি মোর ঠাঞি।
চারি জুগে অমর হও মিত্তু হবে নাঞি ॥
রামপাদপদ্রে জদি থাকে মোর মোন।
এড়াবে সমন দায় পবননন্দন ॥
সুনি প্রেমে পুলকিত হইয়াছে তনু।
অশ্রুজলে পরিপুর্ন্ন মহাবির হনু ॥
শ্রীরাম জানকি বল্যা ডালেতে বসিয়া।
অসোকের বৃক্ষ হইতে পড়ে গড়াইয়া ॥
জানকির পাদপদ্রে পড়ে গড়াইয়া।
দাণ্ডায় অঞ্জনাসুত কৃতাঞ্জলি হয়া ॥
বিঘতপ্রমান দেখি বানরের গা।
মনেতে বিস্ময় হয়্যা ভাবে সিতা মা ॥

রামতর্ত্ত দিলেক ইহার এই কলেবর।
কেমনে লঙ্ঘিয়া আইল বিলক্ষ সাগর ॥
জানকি বলেন জদি বট রামদুত।
দেখিয়া তোমার অঙ্গ লেগেচে অদ্ভুত ॥
প্রাননাথ সঙ্গে জদি হয়্যাছে দরসন।
বল দেখি রামচন্দ্রের কেমন বরন ॥
এত সুনি কহিতে লাগীল হনুমান।
কহি রামের পরিচয় কর য়বধান ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অতি রমুপাম।
সিরেতে চাঁচর জটা দুর্ব্বাদলস্তাম ॥
পদ্রকে জিনিয়া দুই নয়ান কোমল।
ইন্দধনু ভুরুভঙ্গি করে টলটল ॥
সুমেরুসিঙ্গ জিনি বক্ষ নাভি গভির।
অতি সে দয়ার নিধি তোমার রঘুবির ॥
সিতার পৃত্তয় হয় সুনি বিরের কথা।
এবারে জিজ্ঞাসা করেন রামচন্দ্র কোথা ॥
হনু বলে মাল্যবানে আছেন রঘুনাথে।
ভালুক বানর সব সুগ্রীবের সাথে ॥
জানকি জিজ্ঞাসা করেন পবননন্দনে।
কি চেষ্টা দেখেন রাম কও বিবরনে ॥
হনু কহে সুন মাতা জনকের ঝি।
তব নাম করেন রাম ইহা সুনেছি ॥
জানকি বলেন বাপু কহ দেখি সুনি।
আর কে তার সঙ্গে আছে একা রঘুমুনি ॥
কান্দিছে অঞ্জনাসুত সুন মোর বচন।
রাম সঙ্গে আছে তার অনুজ লক্ষন ॥
সুনিয়া নয়ানজলে ভাসে জনকঝি।
দেওরের তর্ত্ত বাছা তোরে জিজ্ঞাসী ॥

(পৃ০ ১৪-১।২, ১৫-১।)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির সহিত মিলে।

৬৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৯, ৩৬-৪৫, ৪৭-১১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দুর কর অভিমান দেহ রে অভয় দান
শুন বাছা পবননন্দন।
এই সব সেনাপতি দেবতার পুত্র নাতি,
জত দেখ তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সাগর তরিবার বেলে কেহো ত না মাথা তুলে
সভাকার বুঝিলাম * ।

* * * * * *

* * * * ॥

সঙ্কটে করিতে পার তুমা বিনে নাঞী আর
একে একে বুঝিলাম বিচার।
অশিম বিক্রম তুমি * * পবনগামি
তাহে তুমি রুদ্র অবতার॥
সর্গ মর্ত্ত নাগপুরি ত্রিভুবনে গতি করি
তুমা এসব নাঞি আঁটে।
সতেক জোজন সার হেলায় হইবে পার
এনা কি বিসম বড় বটে॥
তুমি ত প্রধান বির পরম ধার্ম্মিক ধির
পরম পণ্ডিত গুনবান।।
এই জে বানরবৃন্দু সভাকার তুমি ইন্দু
কেহো নহে তুমার সমান॥
উঠ উঠ কোপীরাজ চিন্তহ রামের কাজ
সুগ্রিবেরে সত্যে কর পারে।
খণ্ডাহ শিতার ভয় সভে জেন ধন্ন কয়
জস জেন ঘুসয়ে সংসারে॥
আমার বচন রাখ ঝাঁট জেয়া শিতা দেখ
সভাকার মন কর সুখি।
তোমার বাপের পুন্নে দেসে জাই সব জনে
রোঘুনাথের চাঁন্দমুখ দেখি॥
অঙ্গদে এতেক বলি করিছেন কলাকলি
দেখিআ হাশিলা জাম্বুবান।
বানিকণ্ঠে কহে পুন মন দিয়া সভে শুন
হনুমানের জন্মের বাখান॥

(পৃ০ ৪।২-৫।১)

উদ্ধৃত পদটি বাণীকণ্ঠের রচনা। এ ব্যক্তি কে, জানিবার উপায় নাই।

ভয়ঙ্কর রাক্ষশি দেখিআ ত ভয় বাশি
তথির ভিতরে জনকনন্দিনি।
কে দেই আহার পানি জাগি পুহায় রজনি
জেন হরিনিকে বেড়িল বাঘিনী॥
হনুমান চল বাছা শিতার উর্দ্দেসে।
অনাথিনি দেবি শিতা সোকে হয়্যা দুখিতা
বেড়িআছে দুরন্ত রাক্ষসে॥
শ্রীরাম লক্ষন খুসি সুখি সিতা চন্দ্রামুখি
বানররাজ সুগ্রিব হব খুসি।
আমা সভার বোল রাখ আর কোন জনা দেখ
তুমি গেলে সভে হব সুখি॥
তুমি সাগর হইলে পার বানর কটকের নিস্তার
রাম লক্ষন হরিস অপার।
সিতা দেবির উর্দ্ধার রাবনের ঘুচে অহঙ্কার
তুমার জশ ঘুশিব সংসার॥
জল স্থল অন্তরিক্ষে জে তুমা হইতে দেখে
সে সকল পড়য়ে তরাসে।
শুন্দরাকাণ্ডের শুন্দর গিত সর্ব্বলোক হরশিত
রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৬১-২)

৬১ সংখ্যক পুথির 'জনকনন্দীনি সিতা

শ্রীরামের বনিতা' ইত্যাদি ত্রিপদীটির সহিত উদ্ধৃত অংশের কতক মিল আছে।

বাছা হনুমান সেল রহিল ঋদিমাঝে।
আর না দেখিল রাম সুকাল্য জানকি নাম
পরিনামে বুঝিলাম কাজে॥
কাহারে কহিব ইহা কহিতে বিদুরে ইহা[১]
মন দিআ শুন হনুমান।
জনম ভরিআ দুখ কোন কালে নাহি সুখ
কত সহে অবলার প্রান॥
ছিলাম বাপের ঘরে সে দুখ কহিব কারে
হরধনু পন কৈল পীতা।
প্রভু আসি মুনিসঙ্গে জজ্ঞ রাখিবার রঙ্গে
বিভা কৈল অভাগিনি সিতা॥
সম্বুরমন্দিরে বাস সভে ছিল দস মাস
চোর্দ্দি বৎসর বসি বনে।
তাহে বিধি হল্য বাম মৃগছলে গেলা রাম
সৈন্ত ঘরে হরিল রাবনে॥
বিধি বড় নিদারুন অতিসয় নিকরুন
বনে মোরে না দিল শুআন্ত।
কনকের মৃগি হয়্যা

ইহার পর ৪৬ সংখ্যক পত্রের অভাব।

পঠমঞ্জরি রাগ॥

রাজারে নোঙাইয়া মাথা যুক সারন কহে কথা
শুন হে লঙ্কার লঙ্কেশ্বর।
এ কথা কহিব কায় কেবা পতিত জায়
জলনিধি উপরে পাথর॥
সিন্ধুমধ্যে ভাসে শিলা বানর চাপে গুলা গুলা
খিয়ারিআ জেন খেলা করে নাঅ।
বানর দির্ব্ব কাচুটি ধরে পারিজাতমালা পরে
পঞ্চস্বরে গিত গেয়্যা বেড়ায়॥
বানরের নেঙ্গুড়গুলা জেন দেখি মেঘমালা
এক চাপে ভেদিল গগন।
শুর্জ্জ ছাড়ি নিজ কান্তি পলাইলা নিসাপতি
কম্পিত হইলা তারাগন॥
ঘরপড়া জেন ঠান কোটি কোটি বলবান
দাণ্ডাইয়া আছে রামের পাসে।
জবে দেই রাম আজ্ঞাবানি শুমেরু ভাঙ্গিআ আনি
রামচন্দ্র না করেন প্রকাসে॥
পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন বড়ই আশ্চর্য্য কথন
সাগর পরিক্ষা লক্ষ জোজন।
নদ নদি কন্দ রন জত জত ফিরি বন
সর্ব্বত্রে দেখি বানরগন॥
বানর বড় বলবান পর্ব্বতে দেই টান
উপাড়য়ে সর্ব্ব মহাবল।
অচল কুচল নাড়ে স্নঙ্গে গগন জোড়ে
গজ খায়ে মন্দাকিনির জল॥
জাঙ্গাল বান্ধে নল নিল অতুল বিক্রমসিল
পর্ব্বতগুলা বাম হাথে লোফে।
আড়ে দস জোজন জাঙ্গাল পত্তন
পাথর বৈশায় কাঁপে কাঁপে॥
দুই চরের বোল শুনি ত্রাসিত নৃপমনি
কি বলিলি শুক সারন।
হেন বোল প্রকাস [হৈল তোর মতি নাস]
কিম্বা পথে দেখিল সপন॥
দ্বাদস সুর্য্যের উদয় তবে পরত্তিত হয়
প্রত্যক্ষে দেখাব নয়নে।
সপ্ত সাগর একিকালে জদি হয় নিজ্জলে
তবে ত এ কথা প্রমানে॥
রাজা কঅ এ কথা শুনি পবন ডাকিআ আনি
পুষ্পক রথ করহ সাজন।
দুই চর জত কঅ মোর মনে কিছু [না] লয়
ইহা [আমি] দেখিব নয়ানে॥

১। হিআ বা হিয়া।

রাজা উঠিআ আইল সৈর্য্য বির্জ্জ অঙ্গে হইল
নিস্তেজ হইল ঘুচিল মনের আনন্দ।
কির্ত্তিবাস কবি কঅ মনে রাজা পেয়্যা ভয়
দেখিতে নাড়িলা সেতবন্ধ॥
(পৃঃ ১০৫।২-১০৬।২)

সেতুবন্ধনে পুথি শেষ হইয়াছে।

৬৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/১×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২, ১৫-৪৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

হিত বুঝাইতে হইলাম লাথির ভাজন।
সবংসে রামের হাথে তোমার মরন॥
পুর্ব্বকথা কহি ভাই তাহে দেহ মন।
বনজুয়া হাথি বনে চড়ে নিতি নিতি॥
পোষনিয়া হাথি দায় তাহার সংহতি॥
পোষনিয়ার দেখাদেখি পৈষে কাটগড়া।
তথন বেদেতে বান্ধে পায়ে দিয়া দড়া॥
জাতির মিসালে হৈল জাতির বন্ধন।
তোমার সঙ্গেতে আমী মরি কী কারন॥
জমের দ্বারেতে তুমি রহিলে বন্দন।
মরনকালে স্বোঁরিহ আমার বচন॥
এ ধন সম্পদ পায়্যা মর্ত্ত হইলে তুমি।
রামের স্বরন নিতে এই জাই আমী॥
তবে জদি ক্রপানিধি ক্রপা নাই করে।
রামনাম লয়্যা প্রান তেজিব সাগরে॥
তথাপী তোমার সঙ্গে না রহিব এথা।
পতিতে স্বরন রাম দিবেন সর্ব্বথা॥
স্বরনপঞ্জর রামচন্দ্র গুননিধি।
চরনে স্বরন নিব জনম অবধি॥
অনাথপালন দয়া অপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগন দিতে নারে সিমা॥
সভামধ্যে ডাক দিয়া বলে বিবিসন।
ইহার মধ্যে আমার সঙ্গি হবে কোন জন॥
জে জাইবে মোর সঙ্গে বড়ই সেয়ান।
ঘর সব রক্ষা পায় তাহার পরান॥
রাম জারে সদয় সাফল তার তনু।
সাক্ষাত পাইল পবনের পুত্র হনু॥
নল আনল পাত্র ভিম সম্পাতি।
ডাক দিয়া বলে তারা জাইব সংহতি॥
সেইখানে ছিল তার পুত্র তরন।
পিতা পুত্রে লই গিয়া রামের স্বরন॥
কুপিল শুনিয়া পুত্র পিতার উত্তর।
তোমা হেন নহি আমী প্রানেতে কাতর॥
জাতি ছাড়িব আর লঙ্কার আওয়াষ।
মানুষের স্বরন নিব লোকে উপহাষ॥
বিবিসন বলে পুত্র জিয়ন্ত মলি।
আজি হইতে তর্পনের দিব তিলাঞ্জলি॥
তার পর বিবিসন গেল মায়ের স্থানে।
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে রাবনে॥
লঙ্কা হৈতে খেদারিয়া দিলেক আমারে।
স্বরন লইতে জাই রাম বরাবরে॥
নিকষা বলেন বাছা শুন বিবিসন।
রন্ধন করিয়া দি করহ ভোজন॥
উৎকট সময় জাকু বেলা অবসানে।
তবে সে জাইব প্রভু রাম দরসনে॥
জোড়হাথে জননিরে করে নিবেদন।
সকল ভুঞ্জিব সুখ রাঘবমিলন॥
মায়ের চরন তবে করিল বন্দনা।
স্ত্রীর নিকটে গেল জেথানে সরমা॥
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে আমারে।
রামের স্বরন নিব কহিল তোমারে॥

জাবত লঙ্কায় রাম নাহি আনি আমী।
তাবত সিতার প্রান রক্ষা কর তুমি ॥
সরমা সুন্দরি বলে সুন প্রানপতি।
রাঘবচরন বিনা অন্ন নাই গতি ॥
সুভক্ষণে বিবিসন রথে গিয়া চড়ে।
কিত্তিবাষ বলে লঙ্কায় দায় পড়ে ॥
(পৃ° ৩৪।১-৩৫।১)।

৬৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ। ৬১ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

পূর্ব্বকথা কহি তাহা কর অবধান।
স্বর্গে বিন্তা[ধরি পুষ্পগন্ধা] তার নাম ॥
তার কন্তা হইল নামে অঞ্জনা বানরি।
বিত্তাধরি কন্তা সেই পরমসুন্দরি ॥
অঞ্জনার রূপের কথা বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে জেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥
মলয়া পর্ব্বতে আছে কেসরির ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥
ইর্ছারূপে ধরিতে হইল মানুসি।
পর্ব্বত উপরে আছে পরম রূপসি ॥
চৈত্র মাস প্রবেস জবে বসন্ত সময়।
হেন কালে পবন গেল পর্ব্বত মলয় ॥
তথায় বসন্ত বায়ু বহিছে পবন।
কামেতে জর্জ্জর হইল অঞ্জনার মন ॥
সন্ধান না পায় পবন কেসরি দুর্জ্জয়।
পবন চাহিয়া তার না পায় সময় ॥
মলয় বসন্তে হৈল অঞ্জনা ব্যাকুল।
ঋতুস্থান করিতে গেল নর্ম্মদার কুল ॥
সন্ধান পাইয়ে তথা গেল ত পবন।
ঝরে বসন উরাইয়া দিল আলিঙ্গন ॥
অঞ্জনা বলেন পবন কৈলে কোন কর্ম্ম।
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রেতা ধর্ম্ম ॥
দেবতা হইয়া তুমি কর হেন কাজ।
বানরি করিলে ইর্ছা নাহি কিছু লাজ ॥
কেসরি জানিলে মোর সংসয় জীবন।
সাপিব তোমারে আমি শুনহ পবন ॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
রমনির রূপে নর পাসরে আপনা ॥
দেবে মহাপাপ হয় পরস্ত্রী গমনে।
জাতি কুল বিচার তার করে কোন [জনে]॥
দুঃখ সম্বরিয়া তুমি জাহ নিজ ঘরে।
মহাবির জন্মাইবে তোমা[র] উদরে ॥

শেষ,—

কাপিছে সকল অঙ্গ তোমার তরাসে।
কেমনে কহিব কথা মনে নাহি আইসে ॥
হাসিয়া বলিছে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সত্ত কথা কহ মোরে কিছু নাহি ডর ॥
হনুমান বলে সুন দিই পরিচয়।
সূর্য্যবংসে অজোধ্যায় রাম মহাসয় ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস হৈল ভুবনে অজয়।
ইন্দ্র জম কুবের জাহারে করে ভয় ॥
দেবগনে ধরি সদা করে অপমান।
ক্ষিরদসয়নে ছিলা প্রভু ভগবান ॥
কান্দিয়া দেবতাগন কহে তার ঠাই।
রাক্ষসের হাতে প্রভু আর রক্ষা নাই ॥
দেবগনের দুঃখ দেখি প্রভু নারায়ন।
রাক্ষস নাসিতে জন্ম লইলা আপন ॥
চারি অংসে জন্ম লয়ে দসরথের ঘরে।
লক্ষিরূপা সিতা ছিলা মিথিলা নগরে ॥

বিবাহ করিয়া রাম প্রভু নারায়ন।
ছল করি সত্ত পালিবারে আইলা বন॥
নাসিতে রাক্ষসকুল প্রভু গদাধর।
বাস কৈলা পঞ্চবটির বনের ভিতর॥
তাতে ধনুর্ব্বান সদা সহিতে লক্ষন।
জার নাম মুনি ভয় করয়ে সমন॥
মৃগ মারিবারে বনে গেলা রঘুবর।
সিতা চুরি কৈলে তুমি পায়ে সর্ব্ব ঘর॥
দেখাদেখি হইলে জানিতে দসানন।
এক বানে দেখাইতেন জমের ভুবন॥
বালি রাজা আছিল বানরের অধিপতি।
মুগ্রিব তাহার ভাই কিস্কিন্দা বসতি॥
বালি রাজা সুগ্রীবের রাজ্য নাহি দিল।
মুগ্রিবের নারি বলে কাড়িয়া নইল॥
বালির ভয়তে সদা সুগ্রিব আকুল।
কান্দিয়া ফিরয়ে বনে খায় ফল মূল॥
রিস্যমুখ পর্ব্বতে রহিলা বহু দিন।
বালির ভয়েতে বসি কান্দে রাত্রিদিন॥
সিতা খুজি ফেরেন রাম সেই তো কাননে।
পর্ব্বত উপরে দেখা হইল দুই জনে॥
আপনা আপন দুঃখ কহে দুই জন।
মৈত্রতা করিল দোহে হরসিতমন॥
পিতিজ্ঞা করিয়া রাম কহেন মুগ্রিবেরে।
বালি মারি রাজ্য আমি দিবজে তোমারে॥

৭০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩০২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।

ক্ষিরোদ পন্নগ সিজে শ্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে
গুপ্তবেসে ছিলা নারায়ন।
অমরের স্তুতি পায়্যা সূর্য্যকুলে পয়্দা হয়্যা
জন্মিলা রাবণসংহারন॥

বালক কালের লিলা যজ্ঞ রাখিবারে গেলা
হরধনু ভাঙ্গী আচম্বিতে।
খণ্ডিলে জনকভিত রঞ্জিলে জানকিচিত
ভৃগুর রুন্ধিলে স্বর্গপথে॥

পরসিয়া পদরেনু পাসানে মানুসতনু
কৃপায় চণ্ডালে কৈলে সখা।
পিত্রিবাক্যে গেলা বন উদ্ধারিলে কপীগন
পাপের নাহিক জার লেখা॥

হেন কপী সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ঘোষে।
কপিগন নল হেতু সাগরে বান্ধিলে সেতু
জলেতে পাসান তরু ভাসে॥

মারিয়া অশেষ বৈরি অজোধ্যায় দণ্ডধারি
বেদবতি নয়্যা অনুবন্ধ।
অনাথ জনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু
তুমী প্রভু সেবকবৎসল॥

ধ্যানে কিঞ্চিত ধ্যান যোগী হৈলা পঞ্চানন
নারদ বিনাতে গুন গায়।
ব্রহ্মা আদি জত দেবে উ পদপঙ্কজ সেবে
কপীরা পরমপদ পায়॥

তুয়া পদ অর্ঘ্য জল ক্ষাতি গঙ্গা মহিতল
ত্রিপথগামিনি নাম ধরি।
পরসিলে বিন্দু জল ইন্দ্রপদ করতল
হেলায় সমনভয় তরি॥

চরনকমল রাঙ্গা তাহাতে মৃনাল গঙ্গা
হরসীরে মালতির মালে।
তুয়া কির্ত্তিলগা অই বাল্মিকি বাখানে তাই
প্রসাদে রাখিহ পদতলে ॥

পরবর্ত্তী ত্রিপদীটিও প্রসাদ দাসের ভণিতাযুক্ত। তাহার পর,—

মঙ্গল রাগ ॥

প্রনমহো রাম দসরথের কুমার।
লক্ষন কনেষ্ট জার অংশ অবতার ॥
জনকনন্দি[নি] সীতা লক্ষী মুর্ত্তিবতি।
বন্দিব চরণ তার করিয়া ভকতি ॥
ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো দুই সহোদর।
অঞ্জলি করিয়া বন্দো বাল্মিকি মুনিবর ॥
মহামুনি বাল্মিকি বন্দো হাথে করি তাল।
শ্লোকছন্দে রামায়ন রচিল রসাল ॥
অবতার হৈতে ছিল সাটী হাজার বৎসর।
ভবিস্বতি পুরান কৈল বাল্মিকি মুনিবর ॥
সে সকল কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিসম।
কির্ত্তিবাস করিল সরস মনোরম ॥
ফুলিয়ার মুখটী পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
জাহার প্রসাদে রামায়ন হইল প্রকাস ॥*॥
যোড়হাথে বন্দো হনুমানের চরন।
হনুমান বন্দিয়া গাইব গীত রামায়ন ॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবীর বিভা।
বার্য্য হারাইলা রাম অজোধ্যা আসিয়া ॥
অরন্য[১] কাণ্ডে করিলা রাম প্রবেস কাননে।
অরন্যকাণ্ডে সিতা চুরি করিল রাবনে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সর্ব্ব অপচয়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মৈত্রলাভ কটকসঞ্চয় ॥
সুন্দরাকাণ্ডে সেতুবন্ধ গীত মনোহর।
কটক সহিত পার হল্যা রঘুবর ॥
পাঁচ কাণ্ডে গাইল গিত নানা রসভাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস ॥*॥
রঘুবর সুন্দর রাম হে রাম
নবদুর্ব্বাদলস্যাম রাম ॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইল গীত সুন্দর কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন কটকের হানাহানি ॥
বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবনের টুটে অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার টুটে রাজার বাড়ে অভিমান।
অভিমানে খসিল হাথের গুয়া পান ॥
ফাফর হইল রাবন রাজা মনে মনে গুনে।
সুক সারন দুই চরে ডাক দিয়া আনে ॥
তোরে বলি সুক সারন মন্ত্রির প্রধান।
রামের কটক চর্চ্চিয়া আইস মোর স্থান ॥

(পৃ০ ২।২—৩।১)

অই দেখ লঙ্কেশ্বর বসিয়াছেন রঘুবর
নীল কলেবর সুসোভন।
অঙ্গদ চাপীছে হাথ বিরাসনে রঘুনাথ
অই দেখ বামেতে লক্ষন ॥
সুগ্রিব দক্ষিনভাগে জাম্বুবান রামের আগে
অই দেখ বির হনুমান।
কেসরি কুমুদ পাসে বসিয়াছেন হরিসে
বির সব পর্ব্বত প্রমান ॥
মায়া মারিচের চাম তাহার উপরে রাম
অই দেখ হাথেতে কোদণ্ড।
বিভিষন রামের কাছে নানা মত যুক্তি দিছে
বুঝিল্যাঙ লঙ্কা লণ্ডভণ্ড ॥ ইত্যাদি।

(পৃ০ ৭।১)

ভালুক বানর লয়্যা সাগরের পার হয়্যা
রহিলেন জলনিধি তিরে।
রাক্ষস পাইল সঙ্কা কম্পমান হৈল লঙ্কা
দেখিলেক অন্তরিক্ষচরে ॥

১। 'অযোধ্যা' হইবে বোধ হয়।

ততক্ষনে সাজিল ধাড়ি গদা টাঙ্গী নিল বাড়ি
বান এড়িল্যাঙ খরসান।
স্বামি তোর বড় বির রনে নাহি হৈল স্থির
কাটীয়া করিল দুই খান॥
ভয়ানক হয়্যা মন পালাইল লক্ষন
রঘুনাথের হের দেখ মাথা।
সুগ্রিব অঙ্গদ বির বিভিষন অস্থির
অঙ্গদ দেখিয়া পাল্য ব্যথা॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ১৪।২—১৫।১)

মায়ের বচন সুনি দশানন বলে বানি
সুন সর্ব্ব পাত্রমিত্রগন।
ই তিন ভুবনমাঝে দেব দৈত্য যত আছে
কারে না ডরায় দশানন॥
আপনার বাহুবলে সংসার জিনিল হেলে
চন্দ্র সুর্য্যে সঙ্কা নাহি করি।
সে মোরে দেখায় ডর জত বলি নিসাচর
বানরে বেড়িল তব পুরী॥
রাম সে মানুসজাতি তাকে কেন মোর ভিতি
সীতা কেন সমর্পিব তারে।
আপনি করিয়া রন বিনাসিব কপীগন
শ্রীরামে পাঠাব যমপুরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০।২)

যোড়হাথে হনুমান কর রাজা অবধান
সর্ব্বকথা কাহ তোমার ঠাঞি।
আছিল্যাঙ দ্বারে দ্বারি কোন জন করিল চুরি
জদি জানি তোমার দোহাই॥
দ্বারে ছিল্যাঙ একেশ্বর মায়া পাতে নিসাচর
সে কথা কহিতে ভয় করি।
সঙ্গে ছিল বিভিষন জারে কৈলে অপেক্ষন
তাহার সন্ধানে হৈল চুরি॥
বসিষ্ঠের রূপ ধরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
আমার সমুখে উপনিত।
নানা জন্ত্র কৈল মোরে রাম দেখিবার তরে
বিভিষন আইল ঝটীত॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৯০।১)

সুন সুন মহাঁসয় করি আমি পরিচয়
প্রথমেতে ... ...।
কহি কথা অকপটে জন্মিনু অঞ্জনাপেটে
মহাবলি পবন মোর পীতা॥
কর তুমী অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার নিল রার্য্য অধিকার
সুর্য্যসুত হেলা বড় দুখি॥
বালির পাইয়া ত্রাষ ঋষমুখে কৈলা বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাতো নারে।
সাঁপ দিল এক রিসি অতেব নির্ভয়ে বসি
নিবেদিল তোমার গোচরে॥ ইত্যাদি
(পৃ: ২২৯।১)

সোকভরে মন্দোদরি রাবনের পায়ে ধরি
বিলাপ করএ নানা ভাঁতি।
বিসম রামের সরে গেলে প্রভূ কোথাকারে
শরীর লোটায় তোমার খিতি॥
তোমার গমন সুনি প্রভা হরে দিনমনি
চন্দ্র নাহি জায় সিরোপরি।
সেই মুণ্ড ভুমিতলে শ্রীরামের বানজালে
দেখি প্রান ধরিতে না পারি॥
চন্দন তিলক ভালে সোভে দস কপালে
তাহে বহে সোনিতের ধার।
সীরেতে মকুট সোভা নানা জাতি ফুল আভা
কি হইল ত্রিদয়ের হার॥
কেবা নিল কর্ন্নভুষা হিন হৈল তব দসা
ভুমিতে সয়ন কি কারন।
সোনার পালঙ্কমাঝে থাকিতে রাক্ষসরাজে
নানা পুষ্প তাহে সুসোভন॥ ইত্যাদি
(২৫৭।২)

অন্ত,—

চতুর্দ্দিগে হর্ষে করে জয় জয় রোল।
নানা বাদ্য বাজে রার্য্যে লোকের গণ্ডগোল॥
গন্ধর্ব্বে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরি।
আনন্দে পুর্ন্নিত রার্য্য অযোধ্যা নগরি॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগন।
বসিষ্ট মুনি লক্ষনে করিলা আলিঙ্গন॥
দেয়ান ভাঙ্গীয়া উঠিলা কমললোচন।
আপন আপন বাসায় গেলা সর্ব্বজন॥
সুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
ইহা ত সুনিলে নাহি যমের অধিকার॥
দস হাজার বৎসর ছিল লোকের জিবন।
জেষ্ট থাকিতে নহে কনেষ্টের মরন॥
ব্রাহ্মন সুনিলে পায় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান।
বেদবিহিত পায়্যা হয় বিপ্রের প্রধান॥
জার চরিত্র সুনিলে লোকে পাইব নিস্তার।
লোক নিস্তারিতে কৈল রাম অবতার॥
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজা।
মহারাজা হইয়া পালয়ে সর্ব্বপ্রজা॥
বৈশ্য সুনিলে হয় মহাধনে ধনি।
লক্ষ্মি অনুগত তাহে হয়েন আপুনি॥
বন্ধ্যা সুনিলে হয় সেই পুত্রবতি।
বিধোবা সুনিলে হয় পরমমুকতি॥
সধবা সুনিলে হয় সোহাকে আগুলি।
দুর্ব্বল সুনিলে হয় বলে মহাঁবলি॥
যে বাঞ্ছা করিয়া মনে যেই জন সুনে।
সেই বাঞ্ছা পুর্ন্ন হয় রামায়ন শ্রবনে॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নয় পুর্ন্ন হয় কাম।
ইহা জানি অহর্ন্নিসি বল রাম রাম॥
সতি শ্রী সুনিলে সেই কভু নহে রাণ্ড।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল পোথা লঙ্কাকাণ্ড॥

কৌসল্যানন্দন সেই জানকীজিবন।
সেই পদে মতি অতি করিয়া স্থাপন॥
লিখিলাঙ পোথা দোস ক্ষেমিবে আমার।
মনিনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার॥

৭১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ৡ×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০২; ২৩ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৫ সাল।

আদি,—

প্রথম লঙ্কাকাণ্ড অঙ্গদেব রায়বার।
শ্রীরাম লক্ষনেতে মন্ত্রনা কৈলা সার॥
সুগ্রিবে বোলেন শুন বচন আমার।
সিতা কোন বির পাঠাব লঙ্কা করিতে রায়বার॥
সুগ্রিব বোলেন জাইবেন পবননন্দন।
তাহা সুনি বলিছে তবে বির জাম্বুবান॥
রাবণ বলিবে এই বেটা বই বির নাহি আর।
তেই শে কারণে বেটা আইশে বারেবার॥
হনুমান বলি ঘৃর্ন্না করিবে রাবণ।
রায়বার করিবে অঙ্গদ বালির নন্দন॥
অঙ্গদ বলিঞা তবে ডাকিলা গদাধর।
আইলা অঙ্গদ বির বিক্রমে বিসাল॥
ধাইঞা প্রনাম করিল গিঞা রামের চরণে।
কোন আজ্ঞা কর প্রভু রাম নারায়ণে॥
শ্রীরাম বোলেন আইশো বাছা বালির নন্দন।
তুমি গিঞা ভর্চ্ছিআ ত আইসো গা রাবণ॥
আমার আরতি জায় লঙ্কার ভিতরে।
মোর সিতা হরিলে পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ্বরে॥

অভয় মানিঞা আইলাম সাগরের জলে।
শেই সাগর পার হৈলাম বড় পুন্নফলে॥
এবে কোন বির তার করিবে নিস্তার।
কাটিঞা ফেলিব তার দশ মুণ্ড কর॥
তুমি সে অঙ্গদ হয় বুদ্ধে বৃহস্পতি।
লঙ্কাতে দিলাম তোরে প্রথম আরথি॥

মধ্য,—

ধন্ন মাল্যানি বোলে পুত্র করিঞা কোলে
রাবণ রাজার পাটেশ্বরি।
ওরে পুত্র অতিকায় তোরে জুদ্ধ না জুয়ায়
বিষ্ণু আইলা রামরূপ ধরি॥
তোর পিতা অবোধা না সুনে কাহার কথা
পাপবুদ্ধে হরে পরনারি।[১]
হস্তি সিংহের আগে জুদ্ধ করে ছাগ বাঘে
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
কুম্ভকর্ন দুর্জ্জয় জম জারে করে ভয়
শে পড়িল রঘুনাথের বাণে॥
সপনে দেখিল আমি লক্ষ্মণবানে মৈলে তুমি
বের্থ নহে আমার সপন।
সাত পাচ পুত্র নাই তুমি মাত্র মোর ঠাই
প্রান রাখ সুনহ বচন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২৪।১—২)

সিতাসিরে দিঞা দুই হাত কোথা গেলা রঘুনাথ
আমারে করিঞা অনাথিনি।
বড় আমার ছিল সাদ এবে হৈল পরমাদ
আমি এবে হৈলাম একাকিনী॥
খাট পাট সিংহাসন তাথে তোমার সয়ন
এখন কেনে লোটায় ভূমিতলে।
বিস বরিসন হৈল দুই ভাইএর প্রাণ গেল
বড় দুঃখ আমার কপালে॥
বিধি সঙ্গে বাদ ছিল রামধন কাড়ি নিল
আর আমার হবে কোন গতি।
ধুলাএ ধোশর গা মুখেতে নাহিক রা
নিশব্দ হইলা দুই ভাই॥
আরে নিদারুণ বিধি হারাইলাম গুণনিধি
আমার কপালে ছিল এই।
মাতা পিতা কেহো নাঞী নাই সহোদর ভাই
আমি আর জাব কার কাছে।
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর মিনতী করি
মোর ভাগ্যে কত দুঃখ আছে॥
জদি আজ্ঞা দেহ তুমি বিশ খাঞা মরি আমি
এই দণ্ডে জাই রামের পাশ।
সিতার করুনা সুনি ফাটিছে পাশানখানি
নাছাড়ি রচিলা কির্ত্তীবাশ॥*॥
(পৃ° ৩৪।১—২)

দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তুতি করে লঙ্কেশ্বর
তুমি রাম শাক্ষাত নারায়ণ।
ইন্দ্র বরুণ জম জিনিল আমি ত্রিভুবণ
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥
তুমি নিলা মূর্ত্তি সর চমকিত কলেবর
ত্রাসে ফেলিলাম ধনুর্ব্বাণ।
নিশ্চয় হৈল মরণ শাক্ষাতে আইলা জম
রামরূপ মনে করি ধ্যান॥
মুদি কুড়ি নয়ন রাম জপে রাবণ
পুলকে পুর্ন্নিত হৈল অঙ্গ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৮২।১)

কান্দে রানিগণ দিঞা আলিঙ্গন
কান্দে মন্দোদরি সতী।
এ রূপ জোবণ সব অকারণ
তোমা বিনে পাই গতি॥

১। এইখানে দুই পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে মনে হয়।

শুন প্রাণেশ্বর দেহ ত উত্তর
প্রাণ পোড়ে মুখ চাঞা।[১]
দেবতার নারি স্বর্গবিদ্যাধরি
সে কারণে কৈলা বিভা॥
সকল আপণ নহিল রাজণ
কান্দে মুখে দিঞা মুখ।
হা নাথ বলি কান্দে ভুজে ভুজ বান্ধে
দেখিঞা বিদরে বুক॥
কোন নারি বোলে দেহ প্রভু কোলে
কেহো করে হাহাকার।
করি স্মণ্ডরন জালি হুতাশন
জাইব সঙ্গে তোমার॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৮৩।২)

অন্ত,—
হনুমান দেখি সিতা হাথে নিলা হার।
হারের মুল্য দিতে নাঞী জগত সংসার॥
রত্নমুল্য[২] হার সেই অমুল্য পাথর।
হার দেখি বানর সব হইলা ফাফর॥
বানরগন বোলে কাকে হবে সন্মান।
কোন বির পত্তিবেক সিতা দেবির দান॥
রামের মোন বুঝি সিতা হইলা লর্জ্জিত।
হাথে হার করিঞা সিতা হইলা রামের ভিত॥
সিতার মুখ দেখি রাম রাজা হাঁসে।
হার দেও সিতা জাহাকে মোন আসে॥
বলে সিংহ বির বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তার প্রসাদে আমি পাইলাও ঐব্যাহতি॥
পাত্র মধ্যেত পাত্র বিরমধ্যে বির।
সর্ব্বময় মন্ত্রি বির বুদ্ধে গভির॥
জোড়হাথে আগাইলা বির হনুমান।
বহুমুল্য হার সিতা হনুকে দিলা দান॥
হনুমানের গলে দিলা বহুমুল্য হার।
রামনাম না দেখিঞা ভাবেন অপার॥
হাথে করি হার বির ফেলাইলা জলে।
আসিঞা প্রনাম কৈলা রামপদতলে॥
রাম বোলেন সুন পবননন্দন।
কোথাএ রাখিলা হার কহত কারন॥
সুনিঞা রামের কথা বির হনুমান।
হারমধ্যে নাই প্রভু তোমার এক নাম॥
হনুমান মুখে সুনি এতেক বচন।
হনুমানের গলে ধরি রাম দিলা আলিঙ্গন॥
নানা রত্ন দান রাম দিলা পৌরস্কার।
বানরেত সর্ব্ব কৈলা রামের ভাণ্ডার॥
জোড়হাথে বর মাগে বির হনুমান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস বিদ্যমান॥
তোমার গুণ প্রকাস হইবে এইখানে।
অনাহত গতি মোর হবে সেইখানে॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হইলে প্রভু না ভাবিহ রোস।
বিহান রামায়ন পঢ়ে তার এই[৩] দোস॥
দস দণ্ড পরে তোমার গুণ সেবি।
রোগ পিড়া না হইবে হবে চিরজিবি॥
জাবত পর্ব্বত থাকিবে সাগরের পানি।
চন্দ্র সূর্য্য জাবত থাকিবে দিবস রজনি॥
জুবরাজ হবেক সর্ব্ব ভোগে তুমি।
রোগ সোক নহিবেক বলিলাও আমি॥
হনুমানকে বর দিলা সিতা ঠাকুরানি।
নানা ভোগ তোমার আসিবে আপুনি॥
জথা তথা থাকিবেক হইবে নিরুগি।
দেবতায় তোমাকে জোগাবে উপভোগ॥
সভা তুষ্ট করেন রাম ধন দিঞা দানে।
সভা করি বৈসেন রাম দেব অধিষ্টানে॥

১। এইখানে খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।
২। 'রত্নময়' হইবে।
৩। 'নেই' বা 'জেই' হইবে।

সভা করি রামচন্দ্র করিলা দিয়ান।
চতুর্দ্দিগের মুনি আইলা করিতে কল্যান॥
কির্ত্তীবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইলা লঙ্কাকাণ্ড॥

৭২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১১-৫২, ৬৯-১১৮, ১৬৩-২০৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৯ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সিংহবাহনে আইলা দেবি ত পার্ব্বতি॥
আইলে দেবতাগন বসিলা শারি শারি।
গন্ধর্ব্ব গিত গায় নাচে বিদ্যাধরি॥
সভা মর্দ্ধে ভগবতি বসিলে এক ভিতে।
ক্রুধ করি গেলা গৌরি মহাদেবের ভিতে॥
ভাঙ্গড় উন্মত সিব বেড়াও সথাণে।
কোন গুনে পুজি তোমায় লঙ্কার রাবনে॥
ধন জনে মজিল কনক লঙ্কাপুরি।
কেমনে কারনে তুমি আছ অধিকারি॥
আপনার হাথে রাবন আপনি কাটে মাথা।
হেন সেবকে তোমার তিলেক নাহি বোথা॥
রাবন হেন সেবকেরে তোমার নাহি দয়া।
য়ার কোন জন তোমার না লৈবে পদছায়া॥
এত জদি মহাদেবেরে বলিলা পার্ব্বতি।
পার্ব্বতির বচনে কুপিলা পসুপতি॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার কারে নাহি সঙ্কা।
আপনি জুদ্ধ করিয়া রাখ কনকপুরি লঙ্কা॥
তপ করিয়া মৈল রাবন দস হাজার বৎসর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥

মধ্য,—

বারমাসিয়া ফল ছিল সুগৃবের পাষে।
প্রসাদ দিল সুগ্রিব রাজা জতো মোনে আইষে॥
পাকা ডালিম দিল বিদারিত সাদ্ধি।
বাওন নারিকেল দিল আসি হাজার কান্দি॥
হাঁড়িয়া হাড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।
অমৃত সমান দিল ক্ষির থাজুর॥
নিয়ংশ আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিষত প্রমান কোষ দিল হাজার কাঠাল॥
নানা বর্ন্নে ফল দিল পিওল বর্ন্নে রাঙ্গা।
মধুপান করিতে দিল আসি হাজার ডোঙ্গা॥
সেই সব ডোঙ্গার কি কহিব বাখান।
পচিশের বন্দো জেন ঘর একখান॥
রাজপ্রসাদ জত রাজার ঠাঞি পায়।
তিন লক্ষ বানরে অঙ্গদের বোঝা বয়॥
পরামানিক বানর পাইয়া কত করে দান।
কতো দিয়া বির বোঝাঙ্গস করিল সম্মান॥
আপন থানায় গেল বির দক্ষিন দুয়ার।
কির্ত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার॥

(পৃ০২১।১-২)

অঙ্গদে দেখিয়া বির ইন্দ্রজিত রোষে।
গালাগালি পাড়ে এখন জত মনে আইসে॥
আমার বাপকে গালি দিয়া পালাইলে ডরে।
তোর মা সঙ্গি করিল জিয়ন্ত ভাতারে॥
বাপ মরিলে তোর মাকে নিল আনে।
ধিক ধিক বানরা তোর ধিক জিবনে॥
জার কারনে মৈল তোর বাপ বানররাজা।
প্রানে উঠাইয়া করিব তার কাজ॥
জনা কত মারিল রাম আমার গ্যায়াতি।
সহিতে না পারি আমি ক্ষেত্রিজাতি॥

(পৃ০ ২৩।১)

রথ আইল রমনাঝে সোনার সহস্র ঘণ্টা বাজে
নানা সব্দে দেবের বাজন।
সোনার চাকা চারি ভিতে রথ আইল আচম্বিতে
পুলকিত সকল বানরগন॥
সোনার পুতলি চারি কোনে রথ আইল মধ্যস্থলে
চারি ভিতে সোনার চাঙ্গড়া।
রথখান সোনার চাকা সোনার থামে দিয়া ঢাকা
পবনবেগে গতি মষ্ট ঘোড়া॥
জখন এড়ে ঘোড়ার বাগে কেহ নাহি পায় লাগে
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়ালি।
স্বর্গে হইতে যাইল রথ আগুলিয়া রহে পথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজলি॥

(পৃ° ১৬৪।২)

জয় জয় জয় রঘুনাথে।
দেব হরিসে ফুল বরিসে
পড়িছে রামের মাথে॥
বধিয়া বৈরি প্রচণ্ড রাম নাচেন কোদণ্ড
আনন্দে নাচেন প্রভু রাম।
জতেক দেবতাগন করে পুষ্প বরিসন
এতো দিনে পাইল পরিত্রাণ॥
সঙ্খ ঘণ্টা সর্গে বাজে আনন্দে দেবোতা নাচে
গন্ধর্ব্বে গিত নাটন।
জতেক অপছরা হাতে লইয়া অম্বসরা
পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন॥

(পৃ° ১৭২।১)

রামের নিকট অঞ্জনার বিরুদ্ধে হনুমানের অনুযোগ প্রবন্ধটি ক্বচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ,—

অকারনে তোরে আমি গর্ব্ভেতে ধরিনু।
অঞ্জনাপুত্র তুমি নাম জার হনু॥
কহিলে সিতার কথা হরিল রাবন।
ধিক থাকুক জানকির ত্রেথায় জিবন॥
বিস্তর দুঃখ পাইয়া রাম বধিলে লঙ্কেশ্বরে।
রাম হইয়া জুর্দ্ধ করেন ধিক থাকুক লক্ষনেরে॥
জাহার বানের মুখে নিকলে আনল।
এক বানে বধিতে নারিলে রাবন মহাবল॥
সুনিঞা রামের নিন্দা কিছু নাহি বলে।
হনুমানের অঙ্গ ভেজে নয়ানের জলে॥
কান্দিতে কান্দিতে হনু করিল গমন।
রঘুনাথের আগে গিয়া দিল দরশন॥
রাম বলে হনুমান কান্দো কি কারনে।
হনুমান কান্দো কেনে কহ বিবরনে॥
হনু উঠিয়া বলে রাম নিবেদন করি।
তোমায় মন্দ বলিয়া গালি দিল ত বানরি॥
আজ্ঞা কর রাম উহার লইব জিবন।
রাম বলেন স্থির হয় পবননন্দন॥
হেন কথা মুখে বাপু না বল কখন।
কেন গালি দিল তার জানি বিবরন॥
এ কথা বলিয়া রাম করিলা উঠানি।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা রাম রঘুমনি॥
বসিয়াছে অঞ্জনা প্রগাণ্ডস্বরির।
অঞ্জনারে দেখিয়া ত্রাস পাইলা রঘুবির॥
রামকে দেখিয়া অঞ্জনা করিলা প্রনাম।
রাম বলে তোমার পু[ত্র] বির হনুমান॥
সার্থক পুত্র তুমি ধরোছ উদরে।
এমত বির আমি না দেখি সংসারে॥
রাম বলেন অঞ্জনা কহি তোমার স্থানে।
কেন মোরে গালি দিলে কিসের কারনে॥
অঞ্জনা বলে আরে সুন হনুমান।
মাএর ৫
হনু বলে
রামচন্দ্র

বানরি বলে তবে সুন নারায়ন।
জে লাগিয়া গালি দিলাম সুন বিবরোন ॥
আপনে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
তবে কেনে এত দুঃখ পাইলে আপার ॥
কোপদৃিষ্টে রাবনে চাহিতে রঘুনাথে।
সবান্ধবে রাবন তবে হইতে নিপাতে ॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৮৮।১-২)

শেষ,—

[কুবের] বলেন রথ তোরে নিলেক রাবনে।
রথের উপর পুত্রবধু করয়াছে গমনে ॥
* * রাম করিল অবতার।
রামের সেবা করিলে রথ তোমার উর্দ্ধার ॥
জখন রঘুনাথ করিবেন সর্গ আরহন।
তখ[ন] তুমি আমার ঠাঞী করিহ গমন ॥
চলিল রথখান কুবিরের আদেষে।
গেল আইল রথখান চক্ষের নিমিষে ॥
কুবিরের আজ্ঞায় রথ করিল আগুসার।
শ্রীরামের স্থানে রথ আইল পুনুর্ব্বার ॥
কুবিরের কথা কৈলা জোড় করি হাথ।
সুনিঞা হাসেন রাম রঘুবংষের নাথ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না জায় খণ্ডন।
ঐ রথে পিতা পুত্রে হইবেক রন ॥
অন্তরিক্ষে রহে রথ রামের আদেসে।
আজ্ঞা হইলে আইশে জায় চক্ষের নিমিষে ॥
শ্রীরামের আগে রথ রইল অজধ্যায়।
নিরবধি রঘুনাথের চন্দ্রমুখ চায়।
একেতো রামের গুনে কি দিব তুলনা।
হাজার[১] গুনে পাষান মানবি কাষ্ট হল সোনা ॥
কির্ত্তিবাষ রচিল গিত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥

১। 'জাহার' হইবে

এই অবধি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইল।
অতঃপর শেষকাণ্ডে উত্তরা রহিল ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
শ্রীরামের পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥

৭৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৯ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

বান্ধা গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে ঘেরিল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
ফাঁফর হইয়া রাবন ভাবে মনে মনে।
মুক শারন পাত্রে রাজা ডাক দিয়া আনে ॥
মুক শারন বলি তোরা মন্ত্রির প্রধান।
বানর কটক চচ্যা আইশ্য শাবধান ॥
গাছ পাথরে বান্ধা গেল শাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কম্ম করে কোন বির ॥
রাম লক্ষন বিভিশন মুগ্রিব নৃপতি।
ভাল মতে জানি আইশ্য জত শেনাপতি ॥
কে একে জানিবে কাহার কত বল।
কটকের বল বুদ্ধি বুঝিবে শকল ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম জার জতেক মন্ত্রনা।
কোন খানে কোন বির দিয়া আছে থানা ॥
কেবা কোন অস্ত্র ধরে কার কি বাশনা।
আচম্বিতে আশি পাছে রনে দেয় হানা ॥
রাজার কাছে রাজপাত্র কোন জনা থাকে।
বিচার করিয়া মনে দেখিবি শভাকে ॥

রাজার চরন চর বন্দিলেন মাথে।
রাজার আদেশে জায় কটক দেখিতে ॥

মধ্য,—

সুক শারন দুই চর ত্রাশে কাঁপে থরহর
বানরে বেড়িল জল স্থল।
দুর্জ্জয় শমর ধির প্রতাপে প্রচণ্ড বির
পদভরে মহি টলবল ॥
সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমরা তোমার চর
মির্থ্যা বাক্য কভু নাহি বলি।
জে দেখি রামের বান কার নাহি পরিত্রান
লঙ্কায় পড়িল আথালি ॥
বশি আছেন রঘুনাথ অঙ্গদ চাপিছে হাথ
সুগ্রিবের উরূপএ শিরে।
শ্রীরামের চরন চাপিছেন দুই জন
কেশরি আর হনুমান বিরে ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪।১-২)

মায়ামুণ্ড করি কোরে কান্দে শিতা উর্চ্চশ্বরে
দুগর্গম শাগর হইলা পার।
জে মৈত্র শঙ্গে আইলে শেহ ত ছাড়িয়া গেলা
অভাগিনির নহিল উর্দ্ধার ॥
হরি হরি কেবা কার শত্ত পক্ষ আপনার
প্রান দিব গরল ভুখিয়া।
অগ্নিকে নাহিক ডর কঠোরি করিব ভর
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া ॥
দুরন্ত দৈবের গতি বিদেশে হারালাম পাত
ভাই বন্ধু কেহো কার নয়।
শম্পদের ভাগি বটে জখন পরান ছুটে
মিত্যুকালে কেহ নাহি রয় ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ১৬।১-২)

বুড়ি[র] বচন জদি হইল অবশান।
রনের শব্দি পেয়্যা বলে বুড়া মাল্যবান ॥
শাত তাল গাছ রাম বিন্ধে এক শরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষশ জার এক বানে মরে ॥
বাহুবলে মারিলা রাম বালি জে বানর।
জার তেজে বান্দা গেল অলংঘ্য শাগর ॥
রামের বিক্রম সুনি রাক্ষশ তরাশি।
তুমি জত বিক্রম কর শভে হিন বাশী ॥
অহঙ্কার না করিহ তোরে বলি হিত।
বিপরিত অমঙ্গল দেখি নিতি নিত ॥
ঘোড়ার পেটে গাদা জর্ম্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তিতে বিরাল হয় সুকরে কুকুর ॥
মাতঙ্গ ছাড়িল দানা অশ্ব ছাড়ে ঘাশ।
কন্দনের ধারাতে তিতিল দুই পাশ ॥
আহার করিতে তারা জদি করে শাদ।
অন্ন আহার কৈলে গুলা গুলা নাদ ॥
সুকুনি গিধিনি জত ডাকে পেঁচা পাখি।
রার্ত্তযোগে নিদ্রা গেলে দু[ঃ]সপন দেখি ॥
প্রিতি দ্বারে উগী পাড়ে কাল এক বুড়ি।
বিপরিত হাসি ভুমে জায় গড়াগড়ি ॥
মিনি ঝড়ে বিক্ষ পড়ে শহিতে নারে ধরা।
গগন হইতে পড়ে রকতের ধারা ॥
মহাসব্দ করি উঠে সাগরের পানি।
এ শব লক্ষনে রাজা বৈরি নাই জিনি ॥
বিরূপাক্ষ বলে বুড়া মনের পরিতাপে।
তপ্ত তৈলে জল হেন রাবন হেন কোপে ॥

(পৃ° ১৯।২-২০।১)

পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কার কোঙর
হয়্যা আইলে শ্রীরামের চর।
কহ আমি মহাবির ডাক ছাড় গম্ভির
কিবা নাম ধরিশ বানর ॥
আমার নাম অঙ্গদ সুন ওরে রাক্ষস
ঘন ঘন পাশর আপনা।
বালি নামে যেই জন আমি তার নন্দন
জার হাথে পেলে বিড়ম্বনা ॥

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে॥
(পৃ০ ৩১।১)

শিতা রথের উপরে চাড়ি জেখানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়া হয়্যা রহিলাম পড়িয়া॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জলিয়া॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জৌবনে দিলে দুখ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৪৭।১)

অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে।
দেব দানব কির্ন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধর
সুর্ধ্য দেখে গগনমণ্ডলে॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিরের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত যুস্থির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম॥
অতিকা বলে লক্ষন সুন মোর বচন
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান॥
অতিকা কৈল জোড়হাত সুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি॥ ইত্যাদি—
(পৃ০ ৯৩।১)

বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে॥
বিশ্বামিত্র মহাঋশি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে।
রাজার ঠাঞি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
নয়্যা গেল মিথিলা নগরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৭৮।১)

রাম জুড়িলেন মিত্তশর কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে করএ ধিয়ান॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২০৪।১)

শেষ,—

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্থিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা শম্মান॥
রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্রাম অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
অহর্ন্নিশি প্রজাগন নিরথএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে॥
বৃস্ক পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত॥
অপছর্ব্বি কিন্নর্ব্বি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব্ব সদা হয় অজোধ্যাতে॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিতর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি॥

বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত রাবন রাজা শুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা অ নে চর সুক সারনে॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবং করে॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার চর
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কায় দেখি সংসয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা করএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিন্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি

(পৃ° ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে।
৩। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাত্রি পোহাইতে জখন আছে [ডণ্ড] ডেড়।
হেন সময়ে লঙ্কাপুরির চতুর্দ্দিগে বেড় ॥
কনকপুরিতে নিদ্রা জায় কারু নাই সাড়া।
গায় গায় বানর উঠিল জেন সার পিপিড়া ॥
আগে মহিন্দ্র দিবিধ উঠিল বানর এক চোটে।
লঙ্কায় বাহিরে জে ছিল তাহার ঘর লুটে ॥
উর্দ্ধরের সেনাপতি উঠে সতবলি।
সাগরের ঢেউ জেন কটকের কলকলি ॥
সুসেন বৈন্ত লঙ্কা বেড়ে রাজার সমুর।
চর্ম্ম হস্থির মুণ্ড মুটকিতে করে চুর ॥
বিসম ভল্লুক ভাই নঞা কুড়া কুড়া।
তাহার পাছ লঙ্কা বেড়ে জাম্বুবান বুড়া ॥
অঙ্গদ বানর বেড়ে বালির নন্দন।
জাহার বোলে উঠে বৈসে সকল বানরগন ॥
তার পাছে লঙ্কা বেড়ে রাক্ষস বিভিসন।
বিস্তর সঙ্গ নহে তারা সভে পঞ্চ জন ॥
হনুমান বেড়ে লঙ্কা বানরে বাখানী।
জার ভএ লঙ্কার লোক না খায় অর্ন পানি ॥
বামে সুগ্রীব রামের দক্ষিনে সহদর।
লঙ্কায় উঠিলা রাম তৈলক্ষসুন্দর ॥

(পৃ° ১৩।২-১৪।১)

রনে আইলা রাবন লইঞা কুমারগন
রাক্ষস সব করিঞা সাজন।
চড়িঞা বিচিত্র রথে আইলা রামের অগ্রতে
চমকিত দেখি বানরগন ॥
রাম বামহাথে গাণ্ডিব করি ডাকেন মৈত্র মৈত্র করি
সুন মিতা বিভিসন রাক্ষস।
অন্ধকার চতুর্ভিত সুর্য্য নহে প্রকাসিত
রনস্থলে আইলা কোন জনা ॥
বিভিসন বোলেন রাম রথ দেখি অনুপাম
নবদণ্ড ধরে দেবগন ॥

(পৃ° ৪৬।১)

রনে পড়িলা মেঘনাদ হৈল এত পরমাদ
জেই পুত্রে জিনে পুরন্দর।
নর বানরের বানে হেন পুত্র মরে রনে
কেমতে ও জিবেক লঙ্কেস্বর ॥
রাবন কুড়িহাথে মারে তালি লোটাঞা বেড়ায় বলি
হাহাকার করে দস মুখে।
কুড়ি নয়ানের জল করে জেন ছল ছল
কান্দে রাজা পুত্রসোক দুখে ॥
ইন্দ্র জোম বন্দি করে ঐরাবতের পৃষ্টে চড়ে
দেবগন জাহাকে বিস্মিত।
পুত্র নাগফাস জানে বন্দি করে দেবগনে
ইন্দ্র জিনি নাম ইন্দ্রজিত ॥
রাবন ক্ষেনে ক্ষেনে মোহ জায় ক্ষেনে চেতন পায়
কান্দে রাজা এড়িঞা নিস্বাস।
সরস্বতির চরন করিঞা বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ (পৃ° ১০২।১)
পড়িল দস সির দেবতা হইলা স্থির
আনন্দে সভে বেড়ান নাচিঞা।
দেবতা করএ নিত্য গন্ধর্ব্বে গাএন গিত
প্রভু রামের জয় জয় দেখিঞা ॥
বলিছেন বজ্রপানি পোহাইল রজনি
পড়ি গেল সভার দুর্য্যায়।
সভার পরিত্রান করিলেন ভগবান
আর কাহুকে নাহি ভয় ॥
সর্গ্রে দুন্দবি বাজে দেখি নাচেন দেবরাজে
নাচিছেন সকল নাচনি।
বাল্মিকের চরন করিঞা স্মঙরন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ (পৃ° ১৩৯।২)

শেষ,—

বসিঞা আছেন চাণ্ডাল রাম করিঞা ধ্যান।
লাফ দিঞা সেইখানে নাম্বিলা হনুমান ॥
রাজ অভরণ গোহকের গলে পুষ্পের মাল।
হনুমান কথা কন সুনেন চণ্ডাল ॥

শত্রু মারিঞা আইসেন রাম অজদ্ধা নগর।
সঙ্গে লঞা আসিছেন রাক্ষস বানর॥
রাম সিতা দেখিতে তুমি কর আগমন।
রামের সেবক আমার নাম হনুমান॥
রাম লক্ষন সিতার বার্ত্তা জানাইল সর্ব্বর।
পবনের পুত্র মুঞি জাতিএ বানর॥
সুগ্রিবের পাত্র আমী রামের কিঙ্কর।
তোমাকে বার্ত্তা দিতে মোরে পাঠাইলা গদাধর॥
হরিসে পুছেন গোহক গদ গদ ভাসে।
এমত দিবস হবে আমার রাম আসিবেন দেসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত গান করে হাত ধরি।
বাল্মিক মুনির চরনে নমস্কার করি॥*॥

নাছাড়ি॥

রাম আইলা দেসে নগরে পড়ে সাড়া।
দাম গুড়ুগুড়ু বাগু বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥
রাম আইলা দেসে হনুমানের মুখে সুনি।
মৃত সরিরে জেন সঞ্চরে পরানি॥
জগাই মাধাই দুটী ভাই নাচে পুলক হঞা।
গোহক চণ্ডাল নাচিছের্ন করতালি দিঞা॥

৭৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

১২৮।২ সংখ্যক পত্রে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৵০—৮৷৵০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। হরপের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। প্রদাতা, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আরম্ভ,—

বানরে বেড়িয়া তবে দুই চর ধরে।
বিভিসনের আজ্ঞায়ে সমাই তাকে মারে॥
আপনেহি বিভিসনে বোলে বানরেরে।
রামের সাক্ষাতে লও বান্ধি দুই করে॥
বসি আছে রামচন্দ্র তৃলোক্যসুন্দর।
দক্ষিন পাসে বসি আছে সুগ্রিব বানর॥
বাম পাসে বসি আছে অনুজ লক্ষন।
জোড়হাতে দাণ্ডাই আছে জত বানরগন॥
হেন কালে দুই চর বান্ধিয়া বানরে।
রাজ ব্যেবহারে গিয়া দণ্ডবত করে॥
ডরে ডরাইয়া চর জিবনের এড়ে আস।
করজোড়ে কহে কথা শ্রীরামের পাস॥
কট হ চরিতে আমা পাঠাইল রাবনে।
মারিয়া আনিল মোয়ে রাজা বিভিসনে॥
আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত।
রাবনের চর মুঞি কহিলুঁ বিদিত॥

মধ্য,—

সারনের কথা জদি হৈল অবসান।
সুক চরে কহে কথা রাজা বিগুমান॥
জতেক কটক রাজা দেখিল সারনে।
মুঞি জে দেখীলুঁ গোসাঞি কহোঁ বিগুমানে॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ দেখীলুঁ ডাঙ্গর তার গলা।
রাজার প্রতাপ ধরে সুগৃবের সালা॥
কালা বর্ন্ন দেখি জার গায়ে লোমাবলি।
সুর্য্যের প্রতাপ ধরে বলে মহাবলি॥
অঞ্জনিয়া বানর ঘড় অঞ্জন আকৃতি।
লেখা জোখা নাই তার কটক জত ইতি॥
বিক্রমে বিসাল বৈসে নর্ম্মদার তিরে।
তথা হতে আসিছে ধুর্ম্মাক্ষ মহাবিরে॥
তোমার বিক্রম জত সংষারবিদিত।
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ্যের বিক্রম বিসম চরিত্র॥
শ্রুতসেন সমে আছে কপি কুটি কুটি।
শ্রুতসেনের কটক গোশাঞিঁ দেখীতে না আটি॥

ইত্যাদি (পৃ° ৩১—২)

সুগৃব বানররাজা বির অবতার।
বানর হতে সর্ব্ব কার্য্য করহ বিচার॥
ব্রহ্মার আখি হতে জন্মিল কনকা বানরী।
অঙ্গুলি দিয়া ব্রহ্মা তাকে ভুমিতলে পাড়ি॥
কোন জাতি উপজিল ব্রহ্মা চাহে একদৃষ্টি।
সুন্দরি বান'র হৈল দেবতার তুষ্টি॥
বানরি শৃজিয়া থুইল আপনার পাসে।
দেবগন তথা গেল ব্রহ্মার সম্বাসে॥
বানরির রূপ দেখী দেবতা হবিলাস।
ব্রহ্মাতে জিজ্ঞাসা করে বচন প্রকাস॥
ব্রহ্মার গোচরে সবে পুছন্ত সাদরে।
কোন জাতি নারী গোসাঞি হেন রূপ ধরে॥
ব্রহ্মা বোলে তোমা তরে শৃজলুঁ বানরি।
তোমা দিলুঁ সুন্দরী নেও আপনার পুরি॥
মন্দার পর্ব্বতে দেবে লইয়া বানরি।
পর্ব্বতের মধ্যে গীয়া নানা কেলি করি॥
কেলি করিয়া গোসাঞি বানরি তোসে বরে।
মোর বির্য্যে পুত্র হৈব তোমার উদরে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিচাস আর সর্প।
তৃভুবনে না সহিব তোর পুত্রদর্প॥
তার সনে রতি করি দেব পুরন্দর।
বানরি রমন করি তারে দিল বর॥
দুই পুত্র হৈব তোর জনক সঁসর।
দুই পুত্র হৈব রাজা বানর উপর॥
কিস্কিন্দার রার্জ্য ভোগ করিব প্রচুর।
কিস্কিন্দার ফল মুল খাইব মাধুর।
নররূপে রাম ভবে আসিব সংসার।
একজন সোহাএ হৈয়া করিব উপকার॥

ইত্যাদি

(পৃ০ ৫।১-২)

বিসম বানর মেলা না বুঝি কপট কলা
বিদিত হইল ততক্ষন।
দেখীলুঁ জে রামমুখ হেরিতে বিধরে বুক
বুঝিলুঁ সাক্ষ্যাতে নারায়ন॥১॥
না দেখিলে নরবুলি দেখি সেই ক্ষনে ভুলি
তোমা ধাড়ি লৈছে রঘুবর।
ততপর রাজকাজে বুদ্ধিবলে মন্ত্রি সাজে
সুগৃব বানর ইশ্বর॥২॥
লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য সেনাপতি সোভে নবদণ্ড ছাতি
রাজলক্ষ্মি যিনি পুরন্দর।
দেব দানব বিক্রম জিনিতে নাহিক শ্রম
বানর দেখীতে ভয়ঙ্কর॥৩॥
সুনি রাজ সিংহনাদ রাক্ষসের পরমাদ
তোলপাড় করে লঙ্কা পুরি।
বানরবল প্রচণ্ড মেঘ করে খণ্ড খণ্ড
দরসনে ততক্ষনে মরি॥৪॥
জেহেন সাক্ষাতে জম বিক্রমেত বিসম
আসিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি।
অনুপাম সর্ব্বগুনে সর্ব্ব তর্ত্ত জানে সুনে
কনিষ্ঠ লক্ষন অবতরি॥ ইত্যাদি

(পৃ০৭।১-২)

লাচারি ধানসি রাগ॥

অঙ্গদের বাক্য সুনি বোলে রাক্ষস চুড়ামনি
কেনে বেটা কর অহঙ্কার।
না বুঝিয়া বোল বোল নহি জান বলাবল
মোর হস্থে সভান সংহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগন সহিতে না পারে রন
কেবা তোর শ্রীরাম লক্ষন।
দেখিয়া আমার রন কম্পমান ত্রিভুবন
সুন সুন বালির নন্দন॥
ব্রহ্মা করি আরাধন জিনিলুঁ জে ত্রিভুবন
কি করিব এ নর বানরে।
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
ডরে সব থাটে মোর দ্বারে॥

মিত্র পুত্র করি তুমি এতেক সহিএ আমি
আর যদি বোল দুরাক্ষর।
তোকে মারি নিশাচরে পাঠাইব জম ঘরে
দোস নাই আমার উপর ॥

(পৃ০ ৫৩।১)

লাচারি ॥

চারি দিগে পাত্রগন মধ্যে কান্দে দসানন
ভ্রান্তি সোকে দহে কলেবর।
ইন্দ্রে জারে করে ভিত পড়ে ভাই আচম্বিত
অনাথ হইল লঙ্কেশ্বর ॥
দুরে পালায়ে অভরন শোক বাড়ে দসানন
সিরের মকুট পেলে দুরে।
রক্তময়ে কলেবর অভরন সুন্দর
পড়িলেক ভু মর উপরে ॥
মিলিয়া জে পাত্রগন রাজা করে চেতন
সান্ত্বাইয়া অনেক প্রকারে।
সুন রাজা দসানন ক্রন্দনে না কর মন
সুনিয়া হাসিব পুরন্দরে ॥
আছে জত কুমার মহাজুদ্ধে অনিবার
লঙ্কাপুরে আছে জুদ্ধাগন।
তৃভুবন জিনিবারে সে সকল বিরে পারে
কোন রাজা করহ ক্রন্দন ॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৯৭।১)

শেষ,—

চলিলেক মকরাক্ষ্য করিবারে রন ॥
আনন্দিত হৈল তবে লঙ্কার ভুবন।
মকরাক্ষ্যের সন্যে করে গীত নাচন ॥
ভয়ে পাইয়া চন্দ্র সুর্জ্য মেঘের হৈল আড়।
সমুখ হইয়া জুঝে হেন সক্তি আছে কার ॥
ইন্দ্রে বোলেন সুন জত দেবগন।
এথাএ থাকিয়া আর কোন প্রয়োজন ॥
দেয়ান ভাঙ্গিয়া পলায়ে জত দেবগন।
রাক্ষ্যসে বানরে থানাত হৈল দরসন ॥
রাক্ষ্যসের সব্দ শুনি পাইল বানর।
ধাইল বানর সব জমের দোসর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেক টানেন বানর।
আউলাইয়া কারোর জে খসিল কাপড় ॥
পলায়ে রাক্ষসসেনা না সহে সমর।
রাক্ষ্যস পলায়ে কুম্ভ চলিল সত্যর ॥

৭৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩-১৬,২০-১০৫,১০৮-১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

বানর বলে কবে ক্ষয়ে হবে এত বির।
কভু নাই দেখি হেন দুর্জ্জয় সরির ॥
জল স্থল দষ দিগ ছাইল বানর।
বানরের চাপ দেখি ত্রাষ লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিয়া রামের কটক ছারিল নিস্বাষ।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥*॥
মুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমি ত তোমার চর
মিথ্যা বাক্য কভু নাই বলি।
দেখিলাম রামের বান কার নাই পরিত্রান
লঙ্কা নয়্যা পরিল ধনলি ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সকল ছারিয়া রামের চরন করিলাম সার।
দয়াল শ্রীরাম বিনে গতি নাহি আর ॥ ধুয়া ॥
অঙ্গদ বলিছে মুন পাগল রাবন।
মন দিয়া মুন রে বলির উপাক্ষন ॥

বলি নামে দৈত্যপতি থাকে পাতালপুরি।
য়খিলের নাথ হরি জাহার দুয়ারি ॥
তাহার সমান কেবা আছে পুন্ন্যবান।
জাহার দুয়ারি য়খিরথ ভগবান ॥
তাহাকে জিনিতে জদি গেল দসানন।
দায় ছারি দিলা প্রভু দেব নারায়ন ॥
বিষ্টুর মায়াতে বলি য়াছেন বন্দন।
বলির বন্দন দেখে হাসিচে রাবন ॥
লঙ্কাতে য়ামার ঘর নাম দসানন।
বলিষ জদি তোর বেটা ঘুচাই বন্দন ॥
রাবনের কথা শুনি বলি দৈত্য হাসে।
তোমা হইতে য়ামার বন্দন নাহি খসে ॥
তোমা হেন কটি রাবন কি করিতে পারি।
য়খিলের নাথ হরি য়ামার দুয়ারি ॥
রাবন বলে বলি তোর নারায়ন কোথা।
লাগি জদি পাই তার কেটে পেলি মাথা ॥
রাবন বলিছে বলি তোরে কহি দর।
আমা হইতে তোর নারায়ন নহে বর ॥
বিষ্টু নিন্দা বৈষ্টব কদাচ নাহি সুনে।
কোপিলেন বলি দৈত্য রাবনের বচনে ॥
বিষ্টুকে জিনিতে ার এত তোর বল।
তোল দেখি এ ‑গাছি লোহার সিকল ॥
বলি দৈত্যমায়া রাজা নারিল বুঝিতে।
কুড়ি হাত বাড়াইল বন্দন খসাত্যে ॥
বন্দনেতে হাথ জেই ঠেকালে রাবন।
দষ গলায় কুরি হাথে পরিল বন্দন ॥
দষ মুখে কি কি বলি করিছে রাবন।
রাবন বলে মোরে ভাই বান্দে কোন জন ॥
রাবন পরিল বন্দি বলি দৈত্য হাসে।
আপনি পরিলি বন্দি বিষ্টু নিন্দা দোসে ॥
ডাক দিলে বলি রাজা মিরাঘোরে তরে।
ঘোঁরা চোরা বেটাকে বেন্দ্যা থোগা ঘোরাসালে ॥
এ কথা সুনিয়া তবে মিরাঘোর চলে।
চুল্যে ধর‍্যা রাবনে বান্দিল ঘোড়াসালে ॥

(পৃ° ২২।২-২৩।১)

নাকের রক্তেতে কুম্ভুকর্ন্ন বির তিতে।
দুই পাষ তিতিল দুই কর্ন্নের রকতে ॥
নাক কান নাহি বিরের বর হইল লাজ।
কোন মুখে ভেটিব লঙ্কার মহারাজ ॥
আপনার বাহুবলে ভুবন জিনিলু।
আমি হেন বির হয়্যা নাক কান হারালু ॥
জত বল বিক্রম মোর সব হইল মিছ্যা।
বানর বেটা করিলেক নাক কান বোচা ॥
ফিরিয়া আইল বির সংগ্রামের স্থলে।
জতেক বানর পায় ধর‍্যা ধর‍্যা গেলে ॥

(পৃ° ৫৩।২-৫৪।১)

বৃথা কেনে জুর্দ্ধ করি লক্ষনের সনে।
য়াপন মরন কথা কহিব লক্ষনে ॥
য়স্ত্র বানে মিত্তু নাই সুনহ লক্ষন।
ব্রহ্মঅস্ত্র বানে মোরে কর নিপাতন ॥
য়তিকার বচনে লক্ষন না করিলা য়ান।
তুনে হৈতে বাহির কৈল ব্রহ্মঅস্ত্র বান ॥
য়তিকা দেখিল বান লক্ষনের হাথে।
রামময় য়তিকা সব লাগিল দেখিতে ॥
দষ দিগ নেহালে নেহালে বিক্ষ পাত।
জে দিগে য়তিকা চায় সেই দিগে রঘুনাথ ॥
ভয় পাইয়া য়তিকা বির মুদিল নয়ান।
য়স্তরে দেখিছে রাম দুর্ব্বাদলসাম ॥
লক্ষন এরিল বান কি কহিব কথা।
বানেতে কাটিয়া পারে য়তিকার মাথা ॥
ঠিকরিয়া পরে মুণ্ড রামপদতলে।
পদতলে পরে মুণ্ড রাম রাম বলে ॥
য়তিকার মুণ্ড রাম করিলেন কোলে।
সত সত চুম্ব দিল বদনকমলে ॥

অতিকায় মোহে রামের প্রান বিকল।
চক্ষের লোহে রামের তিতিল বাকল॥

(পৃ° ৬:।২-৬৪।১)

রামজয় সব্দ জদি সুনিলে রাবন।
সন্ত লঙ্কা দেখি মন করে উচাটন॥
ক্ষেনেক মধুর হাস ক্ষেনে চমকিত।
রসুক্ষন কাল জম দেখে চারি ভিত॥
নিকটে বসিআ আছে পুত্র মেঘনাদ।
রাবন বলিছে বাছা দেখহ প্রমাদ॥
বিবিসন বলিলেক সিতা দিতে রামে।
তাহার বচন আমি না সুনিলাম কানে॥
তুমি রামি বই লঙ্কায় বির নাহি রার।
তুমি থাকিতে রামি জাব নহে ত বিচার॥
এতেক সুনিআ বির কহিছে পিতায়।
এক নিবেদন বাপা বলিএ তোমায়॥
বারে বারে মারি আমি শ্রীরামলক্ষন।
সুনিয়াছ মরিলে কে পায় ত জিবন॥
মরিলে না মরে বৈরি পায় ত নিস্তার।
হেন রাম কেমনে রামি করিব সংহার॥
বারে বারে আসি আমি রন করি জয়।
কোন বার হবে আমার জিবন সংসয়
রাম লক্ষন মরিবে না লয় মোর চিত্তে।
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিত না পারে লংঘিতে॥
রাপনার সাজ করে পিতার সাক্ষাতে।
পরিপাটি পাগরি তুলিয়া দিল মাথে॥
পাটের চালনা পরে সোনার কিনারি।
সোনার কিঙ্কিনি তায় শোভে সারি সারি॥

(পৃ° ৭৬।২)

কেন রামি রাইলাম বনবাষে।
দেসেতে মরিল পিতা রাবনে রানিলে সিতা
লক্ষন ভাই হারালাম বিদেসে॥
মরিল লক্ষন ভাই রার মোর কেহ নাই
ধর্ম্ম সরির গুননিধি।
রাবনের সক্তিসেলে বিদেসে প্রান হারাইলে
এখন করিব কোন বুর্দ্ধি॥
ভাএর রঙ্গের জুতি জেন সুবর্ন্নের কান্তি
তিভুবন জিনিয়া মহিমা।
সুমিত্রার প্রানধন তুমি ভাই লক্ষন
সোকে মজায়্যা গেলে রামা॥
পিত্রিবাক্যে তিন জনে প্রেবেস করিলাম বনে
বিধাতা করিল তাহে রান।
জতেক বানরগনে তারা জাবে নিজ স্থানে
তোমার সোকে না রাখিলাম প্রান॥

ইত্যাদি। (পৃ° ৯১।১)

তোমা হেন গুনমুনি রস্ত সান্ত সব জানি
স্তির সঙ্গে গমন বিদেসে।
রাজ্যের * * হয়্যা বনেতে ভমন জেয়্যা
ধরি জটা তপস্বির বেষ॥
রাম হেন গুননিধি সেবিতে না দিল বিধি
মোর সম নাহি রভাগিয়া।
এ বর সন্দেহ মনে রাম পাটাইয়্যা বনে
মোর মা কেমনে ধরে হিয়্যা॥
সিতা হেন গুনবতি পতিব্রথা সুর্দ্ধমতি
তারে দুঃখ দিলেক বিধাতা।
বিসম রাক্ষষপুরি দেখিলে তখনি ডরি
কেমনে প্রান ধরিবেন সিতা॥
ভাই গেল বনবাষ বাপের হইল নাষ
মোরে সাপ দিল কোন মুনি।
রাক্ষসে হরিলে সিতা লক্ষন ভাই গেল কোথা
দুঃখ দিলে কৈকৈ দারনি॥
কান্দে ভরথ রামমোহে বাকল তিতিল লোহে
ভুতলে পরিল দুই ভাই।

ভরথের চরিত্র দেখি হনুমান হইল সুখি
কিত্তিবাসে এ রহস্য গাই ॥
(পৃ° ৯৭।২)

দেবিকে তথন বির হনুমান বলে।
করিব তোমার পুজা পিথিবিমণ্ডলে ॥
বাম কান্দে লক্ষন নিল ডান কান্দে রাম।
মাথায় পিতিমা করি হনুর পয়ান ॥
ভদ্রকালি রাম লক্ষন আর হনুমান।
তিন জন উত্তরিল জথা গুপ্তগ্রাম ॥
খিরতরু বিক্ষ আছে অতি মনহর।
দেবির পিতিমা থুইল তাহার উপর ॥
রাবন বধিআ দেসে জখন করিব গমন।
সির্দ্ধ পিটে মহারাজার করিব স্থাপন ॥
(পৃ° ১০৯।২)

উদ্ধৃত কয় পঙ্‌ক্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শেষ,—

লঙ্কা বেড়িয়া বানর বেড়ায় কুটি কুটি ॥
খেত্যে খেত্যে জায় বানর হাথে গুয়াপান।
গা দোলায়্যা গা দোলায়্যা বানর সব জান ॥
রঘুনাথের সাক্ষাতে আইল বানরগন।
বানর দেখিয়া রাম হরিষ বিধান ॥
রাম বলে সুন জত বানরগন।
কালি কেমন সুখে রেখ্যেছিল মিতা বিভিসন ॥
তোমা হেন ঠাকুর প্রভু হইব যুগে যুগে।
নিত্য নিত্য জায় জেন কালিকার সুখে ॥
ভাল রাজা করেছ ধাম্মিক বিভিসন।
এমন মেনে খাই নাই জাবত জিবন ॥
ভাল ভাল সুন্দরি যাছে বিভিসনর ঘরে।
দুই দুই নারি দিয়াছে একক বানরে ॥
জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই।
সেই সব সুন্দরি লইয়া দেষকে পলাই

হাসিলেন রঘুনাথ বানরবচনে।
পাগল করেছে মিতা জত বানরগনে ॥
শ্রীরামে হাসিয়া কন মিতা বিভিসন।
আমি জে বলি কথা তাহা দিহ মন ॥
জেবা কছু বানরেরে খাওাইলে তুমি।
সেই সব দিবা মিতা খাইআছি আমি ॥
বানরে দিয়াছ মিতা জেই অলঙ্কার।
সেই অলঙ্কার মিতা পরেছি তোমার ॥
বানর তুষ্টু হইলে আমার তুষ্টু হয় মন।

৭৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি পত্রসংখ্যা, ৩—৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। আরম্ভটি ৭৬ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

কাতর হইয়া কান্দে সিতা ত রূপসি।
সিতারে প্রবোধ দেন ত্রিজটা রাক্ষসি ॥
সিতা সুন এই রথ দেব অবতার।
অসুচি হইলে রথ না সহিত ভার ॥
স্বরূপেতে সিতা তুমি জদি হৈতে রাণ্ডি।
তোমারে ফেলিত রথ দৈবে নাই খণ্ডি ॥
ক্রন্দন তেজহ সিতা না ভাবিহ আন।
দিন কথ বই তুমি পাইবে শ্রীরাম ॥
এতেক বলিতে সিতা তেজিল কন্দন।
রথ লয়্যা গেল পুন্থ অসকের বন ॥
জেই মাত্র গেল সিতা অসোকের গুড়ি।
সতেকে বেরিলসিয়া রাবনের চেড়ি ॥
অসকের বনে কান্দে নাহিক চেতনা।
সিতাকে পেতাতে আইল রাক্ষসি সরমা ॥
বুনি বুনি বলিয়া সিতারে লয়্যা তুলি।
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা সিরে বান্দে চুলি ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

একত্রিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, এফ সি এস্ (লণ্ডন) ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্‌সি ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ : শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পূরা মাত্রায় দেবতা হন, এ কথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটীকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইলেন। এই সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বড় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড় জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি,—"বন্দে শৈলসুতাসুতং," "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যে সব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেণ্টের দেবতা নহেন; *তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি।* আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি; তাঁহারা পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটী স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ, এই পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটী শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই মহাবস্তু অবদানে লেখা আছে, আগে বহু দিন পূর্ব্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না,নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ করিতেন। কিছু কাল পরে একটা হ্রদের মত দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মত একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীচিহ্ন ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল

তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,—"অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড় ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে ত?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী।

অশোক রাজা একবার এক বৎসরের জন্ত সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের ত সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী। আমাদের সংঘে আশা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ হইত। মনে কর, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটী ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোন কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্ত সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি

সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহা কতক কতক দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উঁহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব হয় বলে, অপূর্ব্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথায় বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস-লেখক জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ দেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেব যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উহাঁদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্য্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্য ও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টী সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষ ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্‌পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে ষষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। ষষ্টিতন্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি অহিবুর্ধ্ন পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ ষষ্টিতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধ-সভায় যদি কাপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যে হেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দুরকম সাংখ্য আছে;—এক রকম হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা ত অত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক রকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক এক রকম "ফিসিকাল সাএন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরও বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দুজনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দুরকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে,—বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপে বহুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গৌতমের সূত্র চলিত ছিল না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন

বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উহাঁদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হুদজবাব, রুদজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর একরকম। ১। সন্দেহ। ২। বিষয়। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজী সিলগিসম (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচারপ্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড় বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুঁথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই তিনটী প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জ্জুনের ও বর্ত্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও এক শত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বই নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লজিকের মত হইয়া গেল preception and inference, অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্ব্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনও পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্‌নাগ কিন্তু আর দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দ্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের

বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি,—

দীপো যথা নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
কৃতী তথা নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

কিন্তু তাঁহার পর এক শত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে॥

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্ম। আর এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মত। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ—তিনি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চ্চাটা ভাল

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভাল নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য, পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরাণ। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রাকৃতের তর্জ্জমা মাত্র। এ সব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐ রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলা মাকান মরু খুঁড়িয়া যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভাল সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুসী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাঙ্ময় পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্নে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন।

তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্য্যস্তে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয় অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙ্গুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারটার পূর্ব্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই আছে, Fast and worship—এদের দেশে কিন্তু Feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের 'ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ'—আহার করিয়া কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস

উপবাস শব্দের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর একদল বলিলেন,—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অম বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বলেন,—"ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশী মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন;—একজন নাভির উর্দ্ধটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁপ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সে কালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনী করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি তল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটা তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটুনী, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই সকল জাতিকে তাহারা কখনই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় ত তাহাকে কামাইবে না। হাড়ীদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সে জন্ত

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য্য করিয়া দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না; মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদী, তোষক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্দে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়মানুষী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশী সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরী-করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সুতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চামড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কি দিয়া ছোপান হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বস্ত্র, কখনও বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙ্গা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় ত দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়-স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না। হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন,—"যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা॥ ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হূং হূং।"

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে জন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিষ দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলীর মধ্যে উহাই সর্ব্বপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জ্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশী বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভাল দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত। আট আঙ্গুল দাঁতন তাঁহারা বড় ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙ্গুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ী ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিষ জন্মিয়া মাড়ীকে আল্‌গা করিয়া দেয়। সে জন্য মাজনটা সে কালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ

বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটী বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। তত্তকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—"ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অম্নে পানে ফুঃ স্বাহা।"

কাপড় কাচা ও তেলমাখা

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মাখিবার অনেক জিনিষ ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসী-ভরা জল থাকিত ও একটা ছোট পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ভাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটী মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য্য শেষ হইলে দুইটী গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টী দ্বারা বাঁ হাতটী ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরটী গুলি সাজান থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটী দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। তত্তকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনায়' বলিয়াছেন,—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যুষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামান্যেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গূঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্।
ততোঽপি বহুভিশ্চৈব মৃত্তিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাবন্যথা ভবেৎ॥"

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও গুণকরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্য্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালন-মন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন,—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটী ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্য্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোন সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অয়ুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্য্যটী করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি।

গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়—যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্য্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন সুঁয়ার ঠিক নীচে দুটী ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটী বাড়ীতে আনেন,—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোন কোন জিঁয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের সুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্ম্মেও এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্য্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ী মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুএকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটীকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ সকলগুলিই বিবাহটীকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটী তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে

রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,—মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতর বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটী অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পাবে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের স্থায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি,—একটী ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবর মত নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে—এ সব কেতাবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই ত গেল নেপালী ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটীও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিষ লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটী শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রকচন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটী শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটী উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটী রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বর বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বর করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বরের নাম বোধিসত্ত্বসম্বর।

তত্তকরগুপ্ত রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন,—"অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্ত উপাসকাদিসর্ব্বসম্বরানাং বীজভূতম্। সম্বরা-

"শৈচতানি (?) কতিসংখ্যাস্তে সম্বরা উচ্যন্তে বিভাষায়াম্। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বরো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক-উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসন্তানাৎ স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ।"

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরও দুইটা সম্বর আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বর, আর একটা বজ্রব্রতসম্বর। বোধিসত্ত্বসম্বর বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বর অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নি স্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লীটী ভাল করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লীতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লীটি পরিষ্কার করিলে আর জন্মে লোকটী ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কাল হয়। দাহকারীদের আর একটা প্রধান কর্ত্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দীপমালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির 'সলিলনিধান' উঠাইয়া, তাহার চৌরাশী হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নেপালে এখনও অনেকগুলি স্তূপ অশোক-

স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন,—ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মত ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তূপের মত। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে—প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল,—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। তত্ত্বকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্ত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাঁহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বস্ত্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা," এইটী তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মত। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়ই দোষ মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন থেকে তাহারা কাহারও এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিড়ীর উপর বসিয়া, উঁবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিড়ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে

ঘটী বাঁ হাতে ধরিয়া আল্‌গোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা'হলে সঙ্ঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সঙ্ঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন,—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে,—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কি রহিল? আমাদের দেশে পালি পার্ব্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি—ভিখারী বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইহাঁকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক্ রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় ত এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় ত সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটী সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কি পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিষ ত তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিষে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

ভতকরগুপ্ত বলিয়াছেন,—"গুরুর্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সংঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতৈর্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েঽপি সূত্রেষু তন্ত্রেঽপি জগৌ মুনিঃ॥"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা*

(১) কোষবিজ্ঞান (Cytology)

Achromatic spindle, Achromatic figure—ভাজনতুরী, তুরীমণ্ডল, তুর্য্যাবস্থা।
Achromatin, linin—ধারণ পদার্থ।
Acrosome—মুকুট।
Amitosis—সরল ভাজন।
Amphiaster, diaster—দ্বিতারকাবস্থা।
Amphinucleolus—মিশ্রগুলিকা, মিশ্রবিন্দু।
Anaphase—তন্তুচলনাবস্থা।
Archoplasm—তুরীতন্তু পদার্থ।
Aster—অংশুখণ্ড, অংশুমণ্ডল।
Bivalent chromosome—যুগ্মজ রঞ্জনতন্তু।
Bud variation—মৌকুর ভাবান্তর।
Cell—কোষ।
Cell membrane, cell wall—কোষাবরণ।
Central fusion nucleus—মধ্যস্থ মিলিত কোষসার।
Central spindle fibres—মধ্য তুরীতন্তু।
Centriole—আকর্ষণ কেন্দ্র।
Centrosome—আকর্ষণ গোলক।
Centrosphere, attraction sphere—আকর্ষণীবেষ্ট।
Chondriocont, plastocont—দৃঢ় তন্তু।
Chondriomite—দৃঢ় মালিকা।
Chondriosome, plastosome—দৃঢ়বস্তু।
Chromatin—রঞ্জনবস্তু।
Chromidia—রঞ্জন কণিকা, সার কণিকা।
Chromidiogamy—কণিকাসঙ্গম।
Chromomere—তন্তুপর্ব্ব।
Chromosome—রঞ্জনতন্তু।
Cytaster—ভেদন কেন্দ্র।
Cytoplasm—কোষবস্তু।
Daughter plate—ভেদজ পট্ট।
Diarinesis—ভিন্নতন্ত্ববস্থা।
Diplotene stage—দ্বিতন্ত্ববস্থা।
Equatorial plate—বিদার পট্ট।
Gametogenesis—জনন-কোষোৎপাদন।
Germinal vesicle—ডিম্বকোষসার।
Idiochromatin—জননরঞ্জনবস্তু।
Idioplasm—কুলবহ বস্তু, তেজঃ বস্তু।
Idiosome—স্বতন্ত্র গুলিকা।
Karyogamy—কোষসার সঙ্গম।
Karyolymph—সাররস।
Karyomere—সারখণ্ড।
Karyosome—রঞ্জন পিণ্ড, রঞ্জন গুলিকা।
Kinetonucleus—চালন কোষসার।
Leptotene stage—সূক্ষ্মতন্ত্ববস্থা।
Macrogomete—ডিম্বকোষ।
Macronucleus—বৃহৎ কোষসার।
Mantle fibres—আকর্ষণ তন্তু।
Meiosis—সংখ্যার্দ্ধীভবন।
Metaphase—তন্তুভেদাবস্থা।
Metaplastic bodies—জাতবস্তু।
Microgamete, spermatozoon—শুক্র-কোষ, পুংবীজাণু।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Micronucleus—অনুকোষসার।

Mitochondria, Plastachrondria—সূত্রকণা।

Mitosis, Karyokinesis—জটিল কোষভেদ, জটিল কোষভাজন।

Monaster—এক তারকাবস্থা।

Multipolar mitosis—বহুমেরুক কোষভাজন।

Nuclear membrane—কোষসারাবরণ।

Nucleolus—সারচিহ্ন, সারগুলিকা।

Oogonia—আদ্যডিম্বকোষ।

Nucleus—কোষসার।

Oocyte—আর্ত্তবকোষ। Ovum, macrogamete—ডিম্বকোষ।

Pachytene stage,—স্থূলতন্ত্বস্থা।

Parasynclesis, parasynapsis—পার্শ্বমিলন।

Parthenogenesis—অসঙ্গমোৎপত্তি।

Plasmosome—রসগুলিকা।

Plastin—যোজন বস্তু।

Plastochondria = mitochondria.

Plastocont = chondriocont.

Plastosome = chondriosome.

Polar body—মেরুকণা।

Prochromosome—আদ্যতন্তু।

Pronucleus—পুরঃকোষসার।

Prophase—তন্তুগঠনাবস্থা।

Protoplasm—জীববস্তু।

Segregation—পৃথগ্‌ভবন।

Spermatid—আদ্যশুক্র-কোষ।

Spermatocyte—শুক্রকোষ।

Spermatogonium—আদ্যজননশুক্রকোষ।

Spindle fibres তুরীতন্তু।

Spireme—তন্তুজাল।

Strepsitene stage—জড়িততন্ত্বস্থা।

Structure, reticular—জাল গঠন।

" fibrillar—তন্তুময় গঠন।

" granular—কণাময় গঠন।

" alveolar—কোষ্ঠময় গঠন।

Syndesis—ক্ষণিক বা সাময়িক মিলন।

Syngamy—সঙ্গম।

Synizesis—রঞ্জনসঙ্কোচ, একত্রীভবন।

Telophase—পুনর্গঠনাবস্থা।

Trophochromatin পোষণ রঞ্জনবস্তু।

Trophonucleus—পোষণ কোষসার।

Zygotene stage—তন্তুমিলনাবস্থা।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব*

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক নিবন্ধ-লেখকগণ পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টিকে মণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত মণ্ডলের স্বরূপ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত কয়েকটী মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিব। পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মণ্ডলের বিবরণ থাকিলেও তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তদ্দ্বারা এত দিন উহার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশের পর এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই মণ্ডলের কল্পনা প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজনৈতিকগণের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছিল।

মণ্ডলের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক রাজ্যেরই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রী বা শত্রুতা, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সান্নিধ্যবশতঃ নানা কারণে রাজ্যগুলির একটিকে অপরটির সম্পর্কে আসিতে হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ নীতির আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কি অবস্থায় কোন্ রাজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু রাজনীতিবিশারদগণ মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন।

তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ ১২টী রাজ্যের কথা চিন্তা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। এই জন্য প্রচলিত মতে নিকটবর্ত্তী ১২টী রাজ্যের সমষ্টিকে একটী মণ্ডল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে, মণ্ডল একটি কল্পিত বস্তু মাত্র। অবস্থার বৈচিত্র্য অনুসারে বার অপেক্ষা ন্যূন বা অধিকসংখ্যক রাজ্য লইয়াও মণ্ডল সৃষ্ট হইতে পারিত। এই জন্যই কামন্দকীয় নীতিসারে (৮, ২০-২৮) এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মণ্ডল কল্পনা।

অর্থশাস্ত্রকর্ত্তারা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সংস্থান অনুসারে এক একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবিধার জন্য একজন রাজাকে কেন্দ্রস্বরূপ ধরিয়া লইয়া, তাহার নামকরণ করা হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এই বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে অবস্থিত পর পর পাঁচজন রাজার নাম 'অরি', 'মিত্র', 'অরিমিত্র', 'মিত্রমিত্র', ও 'মিত্রারিমিত্র' এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থিত চারিজন রাজার নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ', 'আক্রন্দ', 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' ও 'আক্রন্দাসার'। ইহা ছাড়া 'বিজিগীষু'র পার্শ্ববর্ত্তী আরও দুইজন বলবান্ রাজাকে যথাক্রমে 'মধ্যম' ও 'উদাসীন' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সর্ব্বসমেত এই বারজন রাজার রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল পরিকল্পিত হইয়াছে।

---

* রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

'বিজিগীষু' এই নামটির ব্যুৎপত্তির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয় না। যে রাজা যুদ্ধে 'জয় ইচ্ছা করেন', তিনিই 'বিজিগীষু'—এইরূপ ভাবিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলের কল্পনা করা হয়, রাজনীতিশাস্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এইরূপ না হইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আর মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না; অথচ শাস্ত্রে দেখা যায়, শান্তির সময়েও মণ্ডলের শক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটী অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতির মধ্যে নানা কারণে প্রায়ই বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এই হেতু অব্যবহিত সান্নিধ্যকেই একের প্রতি অন্যের শত্রুতার কারণরূপে ধরিয়া লইয়া, বিজিগীষুর ঠিক পরবর্ত্তী রাজাকে 'অরি' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মে 'অরির' পরবর্ত্তী রাজা সান্নিধ্যহেতু তাহার অরি হওয়ার কথা, সুতরাং তাহাকে বিজিগীষুর 'মিত্র' বলা হয়। এইরূপে মিত্রের পরবর্ত্তী রাজা 'অরিমিত্র', তৎপরবর্ত্তী 'মিত্রমিত্র' এবং তাহার পরে 'মিত্রারি-মিত্রের' স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই পাঁচজন রাজার রাজ্য বিজিগীষুর সম্মুখভাগে অবস্থিত। পশ্চাৎদিকেও চারিটী রাজ্যের স্থান ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথম রাজা 'বিজিগীষু'র সন্নিহিত, সুতরাং শত্রু; কিন্তু সম্মুখে অবস্থিত অরির সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহার নাম করা হইয়াছে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ'। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পশ্চাৎদিক্ হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পার্ষ্ণি-গ্রাহের পরবর্ত্তী রাজা অবশ্যই তাহার শত্রু, সুতরাং 'বিজিগীষু'র মিত্র। পার্ষ্ণিগ্রাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিগীষু ইহাকে 'আক্রন্দন' অর্থাৎ আহ্বান করেন, অতএব ইহার নাম 'আক্রন্দ'। ইহার পরবর্ত্তী রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং তৎপরবর্ত্তী আক্রন্দের মিত্র। ইহারা বিপদের সময় নিজ নিজ বন্ধুর প্রতি 'আসার' অর্থাৎ সাহায্য প্রদানের জন্য দ্রুত গমন করে বলিয়া ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' এবং 'আক্রন্দাসার'। এই সকল স্থলে সমীপবর্ত্তিতাকেই শত্রুতার কারণ ধরিয়া, অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতিকে অরি এবং তৎপরবর্ত্তীকে মিত্র স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সোমদেব সূরি তাঁহার নীতিবাক্যামৃতে ষাড়্গুণ্যসমুদ্দেশ প্রকরণে বলিয়াছেন,—"কার্য্যং হি মিত্রত্বামিত্রত্বয়োঃ কারণং, ন পুনর্বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষৌ।" অনেক সময়ে কার্য্যনিবন্ধন শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মে। দূরত্ব বা সান্নিধ্য উহার কারণ হইতে পারে না। কৌটিল্যের মতানুসারেও সান্নিধ্য ব্যতীত অন্য কারণে শত্রুতা জন্মিতে পারে (৭ অধিকরণ)। কামন্দকীয় নীতিসারেও (৮, ১৪) একই বস্তু প্রাপ্তির জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে পরস্পরের শত্রু বলা হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়ে সান্নিধ্যই শত্রুতার কারণ হয় না। এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিজিগীষুর সম্মুখভাগ বা পশ্চাদ্ভাগ একটা কল্পনা মাত্র। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে,—যে দিকে অরির অবস্থিতিস্থান থাকিবে, সেইটাকেই সম্মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত দিক্ হইবে পশ্চাদ্ভাগ।

'অরি', 'বিজিগীষু' প্রভৃতির স্থান ও নাম নির্দ্দেশ।

এখন মণ্ডলের মধ্যে 'অরি' ও 'বিজিগীষু' এই দুইজন প্রধান প্রতিপক্ষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া সহায়, এই দশজন রাজার পরিচয় পাওয়া গেল। অবশিষ্ট দুই জন—'মধ্যম' ও 'উদাসীন' ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। এই নাম দুইটি এমন ভ্রান্তিজনক যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেও ইহাদের ঠিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তাঁহারা 'মধ্যম'কে বিবাদের মীমাংসাকারী মধ্যস্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং "উদাসীন"কে নিরপেক্ষ রাজা বলিয়া ভাবিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মণ্ডলস্থিত অপর রাজারা সকলেই সময়বিশেষে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজা 'অরি' ও 'বিজিগীষু' অপেক্ষা অধিক বলশালী, কিন্তু উভয়ের মিলিত বল অপেক্ষা অল্পশক্তিসম্পন্ন, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'মধ্যম' আখ্যা দিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র ৬, ২, কামন্দক ৮, ২১ মূল এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ রাজার নাম 'মধ্যম'। 'উদাসীন' আবার তদপেক্ষাও বলবান্। যে রাজা 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যম' অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ধারণ করে, কিন্তু উহারা তিনজন মিলিত হইলে সমকক্ষ হইতে পারে না, তাহার নাম 'উদাসীন'। 'মধ্যম' মণ্ডলের মধ্যে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন; 'উদাসীন' ঊর্দ্ধে আসীন। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। 'মধ্যম' বা 'উদাসীন' কারণবশতঃ 'বিজিগীষু'র শত্রু বা মিত্র হইতে পারে। অথবা যুদ্ধকালে নিরপেক্ষও থাকিতে পারে। ইহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে শত্রুতা, মিত্রতা বা নিরপেক্ষতা ঠিক বিচার্য্য বিষয় নহে; বলবত্তাই ইহাদের লক্ষণ। অর্থশাস্ত্রের 'বিজিগীষু'র অতি নিকটেই কোন এক দিকে 'মধ্যমে'র স্থান এবং 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যমে'র পার্শ্বে 'উদাসীনে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মধ্যম', 'উদাসীন,' 'অরি' এবং 'বিজিগীষু' এই চারি জন মণ্ডলের প্রধান অবয়ব। অপর রাজাদিগকে আবশ্যকমত 'অরি' বা 'বিজিগীষু' কোন এক জনের পক্ষভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

মধ্যম ও উদাসীন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের খণ্ডন।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক উদ্ভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণই মণ্ডল কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের সাতটি অবয়ব,—রাজা, মন্ত্রী, দেশ ও তাহার অধিবাসী, দুর্গ, কোশ, সৈন্য এবং সহায়। এই সপ্তাঙ্গের শক্তির উপর প্রত্যেক রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সপ্তাঙ্গের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়, এই ষড়্‌গুণের মধ্যে কোন একটির অথবা দুইটি গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইগুলিই রাজ্যের রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের উপায়স্বরূপ। সকল কয়টির গুণাগুণ বিচার করিয়া, যেটি দ্বারা অধিক পরিমাণে অনিষ্ট নিবৃত্তি বা ইষ্টলাভ হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেটি অবলম্বন করাই রাজনীতি।

সপ্তাঙ্গ ও ষড়্‌গুণ।

যুদ্ধাবসানে শত্রুর সহিত অথবা শান্তিপূর্ণ সময়েও কোন ব্যক্তির সহিত পণে আবদ্ধ হইয়া

মৈত্রী-স্থাপনের নাম সন্ধি। "অপকারো বিগ্রহঃ" অর্থাৎ কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া বৈরভাব প্রকাশ করাকে বিগ্রহ বলে। কৌটিল্য (৭, ২) বিগ্রহের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন এবং সন্ধি দ্বারা কাজ চলিলে বিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষভাবে শক্তিসঞ্চয়ের পর উপযুক্ত কালে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রার নাম "যান"।

উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব বুঝিলে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া, নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন এবং কোন উপায়ে শত্রুর অনিষ্ট সাধনের নাম 'আসন'। 'আসনে' অবস্থিত রাজা শত্রুর বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া, নিজে শত্রু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই যান ও আসন, উভয়ই বিগ্রহের একটা প্রকার মাত্র। কামন্দক (১১, ৩৫, ৩৬) বলিয়াছেন,—"যেহেতু যান ও আসন দ্বারা শত্রুর অপকারই করা হয়, অতএব এই দুইটি বিগ্রহেরই রূপ।" একের সহিত সন্ধি করিয়া অপরের সহিত যুদ্ধ করার নাম 'দ্বৈধীভাব'। শত্রু সংহারে অপরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইলে এই দ্বৈধীভাবের আশ্রয় লইতে হয়। যখন যান, আসন, বিগ্রহ বা দ্বৈধীভাব, কোনটিই অবলম্বনের সামর্থ্য থাকে না এবং শত্রুও যখন সন্ধি করিতে প্রস্তুত না হয়, তখন অপর একজন বলবান্ রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়; ইহাকেই বলে 'সংশ্রয়'। বিভিন্নাবস্থায় অবলম্বনীয় এই মূল নীতি কয়টি ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মত "বিগৃহ্যযান," 'সন্ধায়যান', 'বিগৃহ্যাসন" ও 'সন্ধায়াসন' প্রভৃতি মিশ্রিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক হইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলের স্বরূপ ও মণ্ডলস্থ রাজাদের অবলম্বনীয় ষড়্‌গুণ সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ আছে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তিগুলির আপাত-সুলভ অর্থ গ্রহণ করায় প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ কৌটিল্য ১২টি রাজ্যের সমবায়ে মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন দেখিয়াই ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "প্রাচীন ভারতে" (১৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধেই কৌটিল্যের মণ্ডল-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এ দেশে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল; কারণ, তাহা না হইলে, ঐ পুস্তকে এতগুলি রাজ্যের একত্র সমাবেশের কল্পনা থাকিতে পারিত না। অতএব তাঁহার মতে অর্থশাস্ত্র রচনার সময়ে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্‌ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে (১৯২৪, এপ্রিল; পৃঃ ২৭) এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলান্তর্গত রাজ্যগুলির সংখ্যা দেখিয়াই ঐরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একটি মণ্ডল কতখানি স্থান লইয়া বিস্তৃত থাকিতে পারে, কৌটিল্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণ ও রুসিয়ার মত বড় বড় রাজ্যকেও একই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বার (১২) এই সংখ্যাটি এই স্থলে সম্ভাবিত সংখ্যা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকালে 'বিজিগীষু'র সহিত যে কয় জন রাজার শত্রুতা বা মিত্রতা ঘটিয়া থাকে, কেবল সেই কয়জনই

মণ্ডল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

সেই সময়ে আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতএব অনেকগুলি রাজার নাম দেখিয়াই মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলির ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক।

ঐ পুস্তকেরই আর এক স্থলে (১৩৯ পৃঃ) ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্ন কখনই শান্তিতে বাস করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, 'বলশালী হইলে যুদ্ধ করিবে', 'সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবে' এবং 'কোন রাজ্য অব্যবহিত হইলেই তাহার অধিপতিকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে'—ইহাই হইল ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের উপদেশ।" কিন্তু এই উক্তিগুলি একে একে মূলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বাক্যগুলির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন অনুবাদের দ্বারা ঐতিহাসিকপ্রবর এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—'অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্লীয়াৎ' (৭, ১), 'হীনেন বিগৃহ্লীয়াৎ' (৭, ৩) এই সকল বাক্যের দ্বারা কৌটিল্য বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন নাই কিংবা নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিতে বলেন নাই। যখন অন্যান্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তখন উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিসম্পন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই কৌটিল্যের উপরিউক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। কারণ, তিনি অন্যত্র (৭, ২) বিগ্রহকে ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহকে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিসারে (১০, ৩—৫) বিগ্রহের কুড়িটি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, কেবল বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করাটা নীতিশাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। উপায়ান্তর থাকা সত্ত্বেও যিনি যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা দেন, তাঁহাকে নীতিবাক্যামৃতে (যুদ্ধোদ্দেশ প্রকরণে) নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং বিনা কারণে যুদ্ধায়োজন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রবল ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বলের সহিত সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনে অনিচ্ছা থাকা সম্ভব হইলেও, ভারতবর্ষে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সন্ধিমোক্ষপ্রকরণের প্রথমেই (৭, ১৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"সত্যং বা শপথো বা পরস্রেহ চ স্থাবরঃ সন্ধিঃ" অর্থাৎ সাধুতা বা শপথের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ধি কখনই ভগ্ন করা চলে না। এইরূপে সন্ধিভঙ্গ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিজের অভিমত প্রকাশের পর আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রবল ব্যক্তিরা বলগর্ব্বে সন্ধির নিয়ম নাও মানিতে পারে। কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, এই উক্তিটিকেই স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে সন্ধি-ভঙ্গ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ সমীপবর্ত্তিতাই শত্রুতার স্বাভাবিক কারণরূপে বর্ণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক কালেও আমরা সে বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু তাহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ঐ রাজ্যগুলি পরস্পর সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবে। বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলভাবে

বাড়্গুণ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

যুদ্ধ করার পক্ষে সে কালেও অনেক বাধা ছিল। মণ্ডলস্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক রাজাকেই কথঞ্চিৎ নিয়মিতভাবে চলিতে হইত। কেবল শক্তি থাকিলেই কাহাকে উৎপীড়ন করা চলিত না। কৌটিল্য বলিয়াছেন (৭, ১৩), যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে পীড়া দেয়, সে মিত্রগণেরও অপ্রিয় হইয়া থাকে এবং (৭, ১৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি অত্যাচার করে, অসন্তুষ্ট মণ্ডল তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন রাজা অন্যায় আচরণ করিলে মণ্ডলস্থিত অপর রাজগণ তাহাতে বাধা দিত এবং ঐ ভয়েই তাহাকে তাদৃশ আচরণ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলের গঠন-প্রণালী হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

খুলনা জেলার মাঝির ভাষা

নিম্নে খুলনা জেলার মাঝিদিগের ব্যবহৃত কথাগুলি দেওয়া গেল। বাঙ্গলার মাঝিমাল্লারা যে ভাষায় কথা বলে,—যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভাষায় স্থায়ী আসন দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না।

এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, খুলনা জেলার মাঝিমাল্লারা অনেকেই ফরিদপুর বা তৎসন্নিহিত স্থান হইতে আগত। উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত স্থানীয় মাল্লাদিগের সহিত সামান্য একটু ভাষাগত পার্থক্যও তাহাদের আছে। কিন্তু সে পার্থক্য বড় বেশী নহে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মাঝিদিগের ভিতরও একটু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইহাও সামান্য মাত্র।

মাঝিদের ভাষার উচ্চারণও যথাসম্ভব তাহারা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মত, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। যথা,—কেডা (কে), যা'বানে (যা'বখন), খানডুন, চালডুন্ (এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ ; 'ডুন্' ত সম্পূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গীয়) ; কিন্তু খা'চ্ছিল, যা'চ্ছিল, সকল সময় ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতন, যদিও 'টান্'টা ভিন্ন। আবার 'ভাত'কে খুলনাবাসী ঠিক পূর্ব্ববঙ্গীয়ের মত 'বাত'ও বলে না বা পশ্চিমবঙ্গের মত 'ভাত'ও বলে না। তাহার 'ভ'এর উচ্চারণ অনেকটা 'ব' ও 'ভ'এর মাঝামাঝি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চারণ অনেকটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ; কিন্তু তাহা কৃত্রিম,—অনুকরণজাত। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে তাঁহারাও এখন অভ্যস্ত হন নাই।

শব্দ	প্রতিশব্দ

নাও বা লাও—নৌকা। যথা :—এ নাওখান কা'র ?

দাড়্—দাঁড়।

বোঠে—বৈঠা। যথা :—বোঠে না বাতি পারিস্ ত হাটুরে নায় আসিস্ কেন ?

হাল—হাল।

চোড়্ বা লগি—একটা লম্বা ও সরু বংশদণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌকা চালাইতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা :—তাড়াতাড়ি যা'তি চাও ত লগি খোচাও (বা লগি ঠেল।)

শব্দ	প্রতিশব্দ

বাদাম—পাল। যথা :—এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি ত কবে খাটাবি ?

মস্তুল—মাস্তুল।

ছৈ বা ছাপ্পড়—নৌকার উপরের ছাউনি। যথা :—আমার এ নতুন ছৈ, বাবু, এক ফুটও জল পড়্বে না।

ফুকোর—জানালা।

পাটাতন—নৌকার ভিতরকার তক্তার আচ্ছাদন।

খোল—নৌকার 'ফ্রেম' ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শূন্য জায়গা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দ	প্রতিশব্দ

ডয়া খোল—নৌকার খোলের ঠিক মাঝখানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল।

গোলোই—নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। যথা :—গোলোইতি পা দিয়ে ওঠ্‌ক্যেন (উঠিবেন) না, বাবু।

শড়া—দাঁড় নৌকার সহিত বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাহার মধ্যস্থলে যে মোটা দড়িটার বাঁধন দেওয়া হয়, সেই দড়িটা।

দাড়ের পাতা—জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চেপ্টা তক্তাখানি থাকে। যথা,—পাতায় জল পায় না, কেমন দাড় বা'স ?

টাবুরে নাও—ছোট নৌকা, সাধারণতঃ একজন মাঝিতেই চালায়।

ডিঙ্গি নাও—আরও ছোট নৌকা; সাধারণতঃ মৎস্যব্যবসায়ীরা ইহাতে করিয়া মাছ লইয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

ডোঙ্গা—সাধারণতঃ তালগাছের কাণ্ডে নির্ম্মিত হয়। আকারও নৌকার মত নহে।

পাত্তাম নাও—যে নৌকার তক্তাগুলি পাশাপাশি রাখিয়া, এক প্রকার চেপ্টা পেরেক দ্বারা আবদ্ধ।

খিলেম নাও—ইহার একখানা তক্তার মুখের এক পাশের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া, অন্য তক্তাটীও সেইরূপ করিয়া, কাঠের খিল দিয়া আবদ্ধ।

তেকা'ঠে নাও, পাচকা'ঠে নাও—গঠনের বিশেষত্ব অনুযায়ী।

ছ্যাওট—জল সেচনের পাত্র।

(নৌকা) ভিড়োনো—নৌকা তীরে লাগান। যথা—এই ঘাটে নাও ভিড়োও, মাঝি।

শব্দ	প্রতিশব্দ

গুণ—গুণের দড়ি। যথা :—গুণ টানার সময় দেখ্‌তি (দেখ্‌তে) হয় যে, গাছে বাধে, কি কিসি (কিসে) বাধে ?

পান্‌সী—বড় নৌকা।

ছিপ্‌ বা হাটুরে নাও—সরু অথচ খুব লম্বা নৌকা; খুব দ্রুতগামী। ইহাতে চড়িয়া ব্যবসায়ীরা হাট করিয়া থাকে।

খেয়া—খেয়া নৌকা।

ভাওয়ালে বা বোট—ধনীদিগের ব্যবহারোপযোগী নৌকা।

বজরা—প্রকাণ্ড বড় নৌকা; ইহাতে করিয়া ব্যবসায়ীরা মাল-পত্র চালান করিয়া থাকে।

পাড়ি দেয়া—এড়োএড়ি ভাবে নদী পার হওয়া।

চল্‌তি নাও— চলন্ত নৌকা।

গাঙ—নদী।

জোয়ার—জোয়ার।

ভাটি—ভাঁটা।

উজোন—উজান।

গোণ—অনুকূল স্রোত।

উজোনো—স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।

ভাটোনো—ভাঁটার টানে ভাসিয়া যাওয়া। যথা, —নাও ভাটোলো যে।

বান—বন্যা। যথা,—এবার গাঙে বান ডাহিছে।

একটানা—বর্ষাকালে নদীর স্রোত একমুখেই বহিয়া থাকে, তাহাকেই একটানা কহে। যথা :—সমস্ত বর্ষাভা গাঙে একটানা থাকে।

তোড়—স্রোতের প্রাবল্য।

কূল বা কেনারা—নদীর তীর।

ভাঙ্গন—কূল নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া। যথা :— এবার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গন ধরিছে।

শব্দ	প্রতিশব্দ

কানাল—গভীর স্রোত; সাধারণতঃ ভাঙনের দিকে।
বাক—নদীর বাঁক।
তিরমুনি—ত্রিমোহানা।
গোলা—ঘূর্ণাবর্ত্ত।
ভ্যাম্‌তা—নদীর মোড়।
ঘোচ—ছোট ছোট বাঁক।
ঠোটা—অনেকটা অন্তরীপের মত; যে স্থানের তীরভূমি অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতিতে নদীর ভিতর দিকে আসিয়া পড়িয়াছে।
চর—নদীগর্ভোত্থিত তীরভূমি।
নোণা—লবণাক্ত।
রায়ভাটি বা সারভাটি—শেষ ভাঁটা; যখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়।
ভা'ল ফিরোনো—নৌকার মুখ ফিরাইয়া গতি পরিবর্ত্তন করা।
ডক্—বৃষ্টি (সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ভাষা)।
তুভোন্—তুফান।
ম্যাঘ—মেঘ।
ঝড়—ঝড়।

শব্দ	প্রতিশব্দ

ভাড়া—ভাড়া। [ভাড়া পাওয়াকে মাঝিরা সাধারণতঃ ভাড়া বাঁধা কহে। যথা,—ভাড়া বাঁধ্‌তে পারিছিস্ ভাই ?]
মুহোড় বাতাস—প্রতিকূল বাতাস।
পিঠেন বাতাস—অনুকূল বাতাস।
মাঝি—যে হাল ধরে।
মাল্লা—দাঁড়ি বা অন্যান্য সকলে।
চড়নদার—পুরুষ যাত্রী।
শোয়ারি—স্ত্রী-যাত্রী।
বাঁধ্‌লা—খালের বা নদীর মুখের বাঁধ।
পয়ান—খালের মুখে যে বাঁধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতর ঢুকিবার পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান।
কাচি চর—নূতন মাটি পড়িয়া সম্প্রতি যে চর গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে; কাঁচা চর।
ঘোলা—পলি। যথা,—এবার বানে প্রায় এক হাত ঘোলা ফেলিছে।
মোট মাটারি—যাত্রীর জিনিষ পত্র।
বা'র দেওয়া—নৌকাকে নদীর ভিতর (কূল হইতে) বাহির করিয়া আনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব

নাথধর্ম্মের বহু তথ্যপূর্ণ 'অনাদিপুরাণ' বা অনাদিচরিত্র, 'হাড়মালা গ্রন্থ', 'যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি 'কলমীপুথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম দুইখানি বহি 'খাইবাম', 'ভজিলু', 'ব্রম্ব', 'হৈআ' প্রভৃতি শিশু বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কারে ভূষিত। 'যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা সংস্কৃত, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন্‌ও কাহার দ্বারা লিখিত, বলা যায় না; তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, ঐগুলি অন্য বহির নকল এবং পুথিলেখক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" বলিয়া রচনাতে কোনও ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'যোগিতন্ত্রকলা' নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। উহাতে নাথযোগি-গণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার চেয়ে বিশেষ অধিক কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

তখন— "নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গজেশ্বর॥
না ছিল চন্দ্র সূর্য্য শর্গে ইন্দ্রশর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥
না ছিল অগ্নি পানি না ছিল হুর্ত্তাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল॥ †

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে'র মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর আদি অন্ত, 'রূপ রেখ' নাই, তিনি "উদয় না হইছে না জাইব অস্ত।" কিন্তু তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তিনি পরম গুণবান্‌, তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলের দাতা এবং 'সমাই'কের পালক। তিনি 'সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'সর্ব্ব-সংহারক'। কিন্তু তিনি কে? তাঁর নাম কি? "শেই অলেকনাথ আছয়ে গুশ্বর।"

শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিতা বলিলেন,—আলো হউক, আর আলো হইয়া গেল। অনাদিপুরাণেও—

"হেনকালে অলেকনাথ করিলেক মন।
সত্যজুগ শৃজিতে মনে হইল য়েইখন॥"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল, বানানগুলি যত দূর সম্ভব, সংশোধিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, মূলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা উচিত।—লেখক।

শ্রুতিতে 'নৈরাকার রাত্রি'র গভীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম জল এবং পরে আলো সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাথধর্ম্মে প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিয়া অলেকনাথের সৃষ্টি করার পক্ষে কি সুবিধা হইল, অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর অলেকনাথ "ইচ্ছা হনে 'অনাদ্য' সৃজিলা আচম্বিতে।" তাঁহার ইচ্ছা, 'অনাদ্যে'র উপর সৃষ্টি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাদ্যকে সৃজন করিয়া অলেকনাথ "নৈরাকার রাত্রি হনে দিবস নিকালিলা" ও "সাত দিবসের নাম নির্ণয় করিলা।" প্রথম বারের নাম সোমবার, সেই দিন অনাদির জন্ম হইয়াছিল। 'অনাদ্য' বা 'অনাদিধর্ম্মনাথ' সৃষ্ট হইয়াই 'বলে মুই মুই।' ইহাতে অলেকনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

"মুই মুই করি কর্ব বড় দাপ।
অখনে সৃজিছি তরে আমি তর বাপ॥"

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও বলিবার অনেক ছিল,—

"অনাদি বলয়ে প্রভু সৃজিলা আমারে।
কিরূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে॥
হেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কেঅ।
ধরিবারে লক্ষ নাই পুজিবারে দেয়॥"

'হাড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক একইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে 'অলেকনাথ' নয়, তিনি 'নিরঞ্জন গোঁসাই'। তিনি প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি প্রথমেই—

"মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে॥" *

সে যাহা হউক, অনাদির উত্তরে অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়া দিলেন—"শূন্যরূপে থাকি আমি শূন্যে অধিষ্ঠান।" (হাড়মালা)। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কার করার সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই, তিনি অনাদিকে শাপ দিয়া ফেলিলেন;—

"শিদ্ধি না হইল পিণ্ড পড়িব তুমার॥
শৃষ্টি শৃজিবাঅ তুমি বড় দুক্ষ পাইআ।
তাকে শংহারিব আমি শিবরূপ শৃজিআ॥
শিবরূপে য়েকজন করিমু শৃজন।
আদ্যিরূপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ॥"

---

* হিন্দুস্থানী নাথ যোগিগণের নিকট নিম্নলিখিতরূপ সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়,—'জলাময় রহে যব মহী এসংসারা, হাবর জঙ্গম মহী একাকারা, আদি মহাপুরুষকো জন্ম, মহাজন্ম ভবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাকায় শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোস্বামী তিন অর্বুত বৎসর, এসা সময়মে প্রভুকো মুখমে উঠে হাইতি, তিস্‌মে জনম লিয়ে উলুপকী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঙ্গনেছে নিরঞ্জন আঁখ মেলকো চাহিয়ে, সম্মুখমে উলুপকী দেখনেকো পাইয়ে।' ইত্যাদি।

হাড়মালা গ্রন্থে নিরঞ্জন গোঁসাই 'শিবরূপ শৃজিআ' সংহার করেন নাই, সংহার করিবার জন্ত তিনি 'কাল' সৃজন করিয়াছেন। অলেকনাথ শাপ দিয়া অনাদিকে "আপে জুগ আপে জোগি আপে আপ ধ্যাই" প্রভৃতি তত্ত্বকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, জানিবার জন্ত অলেকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অলেকনাথ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মনাম ব্রহ্মভেদ'ও শুনাইয়াছিলেন। অনাদিনাথ—

"য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে।
শূর্ণ্যেতে রহিল ব'সিয়ে তোমারো স্থানে॥
শূণ্যে শৃজিলায় প্রভু তুমার গোচর।"

এই কথা শুনিয়া অলেকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন আর সেই অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদাস্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ এই অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া 'অজেরোৰ্ব্বল (?) হবে' গঙ্গার সৃষ্টি করিলেন ও অনাদির জটার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া, অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন,—

"আদি দেবি শৃজিছি তুমার লাগি শক্তি।
গঙ্গা দেবি শৃজিছি আদির অঙ্গে গতি॥
আদিয়ে অনাদ্যি:য় শৃষ্টি নির্ম্মিছি।
দুইয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি॥"

সৃষ্টি করার ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া অলেকনাথ চলিয়া গেলেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব, সৃষ্টিকার্য্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, তখনই অলেকনাথ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ সৃষ্টিকার্য্য আপাততঃ নষ্টিক (Gnostic) দর্শনের মতানুযায়ী বোধ হইতেছে। *

অলেকনাথের কৃপায় কাকেতুকাদেবী ওরফে আদিদেবী জীবিতা হইলেন, এবং আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্ট হইল, সূর্য্যে লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাসুকি ও পাতাল সৃজন করা হইল, বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার 'কটের উপর

* "—Some lesser God had made the world,
But had not force to shape it as he would,
Till the High God behold it from beyond
And enter it and make it beautiful"—Tennyson.

তিন কুল (ত্রিকোণ ?)' পৃথিবী স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ দুই প্রকার তারা সৃজন করা হইল।

"তবে ধর্ম্মে মুষ্টি কশাইআ চাইলা।
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই মুর্ত্তি দেখিলা॥
তবে অনাদ্যে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা।
উর্দ্ধমুখ মহাদ্যেব তথায় দেখিলা॥
হস্ত হনে তিন পুত্র থইলা তিন স্থানে।"

"হাড়মালা"য় কিন্তু নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদিকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেই "শিবশক্তি বিদ্যমান" হইলেন ও হরি ব্রহ্মা তারপর সৃষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব হইতে পৃথক্ ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক্ দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"আমার অং (অঙ্গ ?) শিব অং জানিয় আপনে।
*　　*　　*　　*
শিব অং সিদ্ধি অং যেই অং তুমি।
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্যি ধর্ম্মনাথ।
শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ॥"

আমরা আরও দেখিতে পাইব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিয়পুত্র ও পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু হইয়াছিলেন।

অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা তিনজন "চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে," এমতাবস্থায় "অস্থলভিতর" পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদিনাথ আদিদেবীর সহিত পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারীর বেশে ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, তিনি পাঁচ দিনের উপবাসী, এবং "অপুড়া পৃথিবী (?) দেয় ভুজনের ঠাই।" ব্রহ্মা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও শুনেন না, তিনি "অপুড়া পৃথিবী" কোথায় পাইবেন ? তাঁহার যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রহ্মাগ্নি দিয়া ব্রহ্মচারীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণব-বেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া অনাদিনাথ একই প্রার্থনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর "মহাজুগেশ্বর"-বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,—

"য়েত শুনিআ শিব জুক্তি করে মনে।
পিত্তা পরে কেয় নাই লয়ে মর মনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন করিলেন,—

"তিন জটা আছে আমার শিরের উপর।
বন্দন ভুজন তথা কয়হ শর্ত্তর॥"

পুত্রের ব্যবহারে অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার গুপ্ত মন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু ভজিয়া, অনাদি ধর্ম্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিলেন, এবং অনাদি ধর্ম্মনাথকে 'আদেশ'* জানাইলেন।

তারপর অনাদিধর্ম্ম আদিদেবীর 'তনু' হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌরীদেবীকে সৃজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে লইয়া "কুটেশ্বরে" গমন করিলেন। সেখানে অনাদিনাথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভাণ্ড ও দেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া, নিজের শরীর হইতে "অগ্নি পানি নিকালিয়া", "চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। সমস্ত দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে "শ্রীপত্রে" অন্ন দেওয়া হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্ম্মনাথ। ভোজনান্তে শিব বলিলেন,—এখন অন্ন ভোজনান্তে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব অন্নের শ্রীজন।" তখন "অনাহেতু ভীমনাথে মারিলেক ছিটা," আর অন্ন সৃষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া, গাছ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই, তখন—

"ধর্ম্মের আজ্ঞায়ে দেবি দুগ্ধ ছিটি দিলা।
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিলা॥"

এখন অনাদিধর্ম্মনাথ, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৃষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ, গঙ্গা গৌরী তাঁহাদের "শাতমায়"। অতঃপর শিবকে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করা হইল। শিব 'ধর্ম্মের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,' 'শাধি ব্রহ্মজ্ঞান' গৌরীকে 'কোলে' ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, "অন্তকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভজিবা তুমাতে।" অতঃপর শিবের বীর্য্য হইতে 'কুলনাথে'র জন্ম ও গৌরীর বীর্য্য হইতে 'বিন্দুবতী'র জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া শিব, কুলনাথের সহিত বিন্দুবতীর বিবাহ দিলেন, এবং কুলনাথকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া "শিব গোত্র, নাথ পৌদ্যত" দিলেন। †

* 'আদেশ' শব্দ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও নাথযোগিগণের কোনও উৎসবাদিতে বহু লোক জড় হইলে, যিনি সভার লোক মিলিত হওয়ার পরে আসিতেন, তিনি সভায় লোকজনকে মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ কিম্বা নমস্কারাদি না করিয়া "সবাইর (=সবার) পদে আদেশ" বলিয়া সভায় আসন গ্রহণ করিতেন।

† যোগিতন্ত্রকল্পমতে শিব বা অনাদি যোগিনীকে বিবাহ করেন, এবং আদ্যনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠক, শিব যাজক।

তারপর অনাদিধর্ম্ম, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া, অলক্ষিতে দক্ষিণ-সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া এক অক্ষয় বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, 'জন্মেজয় রাজা' (যমরাজা ?) ও চিত্রগুপ্ত সৃজন করিলেন এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘর্ম্ম হইতে পবন, চন্দনবৃক্ষ প্রভৃতি সৃজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন-স্বরূপ তিন তাল জন্মিল; সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজকে বটবৃক্ষের নীচে বসাইয়া জম্বুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপ পুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন করিলেন। তারপর তাঁহার জটার মল হইতে যে 'হরমুল বৃক্ষ' উৎপন্ন হইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ম্মনাথ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কূলে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন অনাদি, মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই ঘৃণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরূপ প্রাণী এখনও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা—এই ভাবিয়া জলে সাঁতার দিয়া গিয়া তিনি সেই গো-মূর্ত্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহা দেখিয়া, শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিধর্ম্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণুর আচার "ভাশা পুড়াগাড়া" এবং শিব গর্ত্ত খুঁড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাঁহারা এখন পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশমত তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনাদিকে যখন দাহ করা হইল, তখন তাঁহার নাভি ভস্মীভূত হয় নাই। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং রাঘব উহা ভক্ষণ করে। তারপর—

"রাঘবের পেট কাটি মীন নিকলিলা।
নাভি হনে মিননাথ জন্ম হইলা॥" *

---

* মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে অন্যত্র অন্যরূপ উল্লেখ আছে। গণ্ডযোগে এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে ভক্ষণ করে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীর—

"তুম্মি কেনে ভর গোসাঞি আম্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥"—গোরক্ষবিজয়

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গিতে বসিয়া পার্ব্বতীকে যোগশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখন—

"মাৎস্যরূপ ধরি তথা মীনযোচন্দর।
টঙ্গির লাবাতে রহে বোগাল সুন্দর॥"—গোরক্ষবিজয়। (পর পৃষ্ঠে)

অনাদির পেট ফাটিয়া চৌরঙ্গী* সিদ্ধার জন্ম হইল। অগ্নির জ্বালের তেজ হইতে জালকুড়ি-সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণফাটি বা কানিফা, চর্ম্ম হইতে চর্ম্মনাথ, ধূম্র হইতে ধূম্রনাথ, পা হইতে পাগলনাথ, নাভিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং—

"শ্রীগুলি ফুটি নিকলিছইন শ্রীনাথ।
অনন্তকুটি সিদ্ধার গুরু শ্রীগোরক্ষনাথ॥"

অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইল। যোগিতন্ত্র-কলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় † এবং তাঁহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিণকনাথ, জঙ্ঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জানু হইতে পাগলানাথ, বাহু হইতে ভূকটিনাথ, গুহ্য হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। তাঁহার হাড় হইতে হাড়িপা ও চর্ম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়।

গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্য সিদ্ধার মত নহেন, তিনি অলেকনাথের স্বরূপ। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"যেই কালে তুমার অং (অঙ্গ ?) আমি ছুড়ি জাইবা।
তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা॥
আমার নাম গুরু গোরক ধরিবা।
গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা।"

পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্তুষ্ট হইয়া তখন অলেকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, "নিলবেদ" ও "শোসম্বেদে"র ‡ তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্মশানের মাটি খুঁড়িতে আদেশ করিলেন।

এবং পার্ব্বতী যখন নিদ্রালসা হইয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, তখন ঐ বালক রাঘবের পেট হইতে "হুঁ হুঁ" বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন মহাদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট চিরিয়া বাহির করেন।

* চৌরঙ্গী—হাড়িপা কালুপার সমসাময়িক একজন সিদ্ধা। বিশ্বকোষকারকের মতে এই সিদ্ধার নাম হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডের নাম হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই নাথসিদ্ধা কলিকাতার কালীঘাটের কালীর স্থাপক ও পূজক ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিকটে কোথায় নাকি তাঁহার আশ্রম ছিল।

† একখানি কলমী পদ্মাপুরাণে আছে—"মাথা ফুটি বাহির হইলা শ্রীগোলকনাথ।" গোলক স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল।

‡ আমরা এতকাল চারি বেদের কথাই জানিতাম। কিন্তু যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদিপুরাণে নিলবেদ ও শোসবেদ নামে আরও দুইখানা বেদের উল্লেখ পাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয় অন্য কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যোগিতন্ত্রকলা ও বেদমাল নামক আর একখানা ক্ষুদ্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাইলাম,—

মাটি খুঁড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্তু পাইলেন, তদ্দ্বারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অলঙ্কার-ভূষণ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন, নাভির দ্বারা কর্ণের কুণ্ডল, নাসিকা দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বারা হস্তের "দ্বাদশ" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, শিবের গলায় বাসুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে নিজ মস্তকের লাল টুপী * পরাইয়া দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্মশানের ভস্ম হইতে "ভস্ম্যা" (বৃষ ?) সৃজন করিলেন এবং শিব সেই বৃষে চড়িয়া কুটেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে "শ্রীকবিলাশ" হইতে আসিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধা, রাগ রাগিণী, বাসুকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথকে শিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না। শ্রাদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণ কেবা য়েতে।"

শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগুরু গোরকনাথ পুরইত য়েথাতে ॥
হস্ত পদ নাই তার বিন্দু হংশ কলা।
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা ॥
বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হৈলা।
তাহানে কেয় দেখিতে না পাইলা ॥
কিঞ্চিৎ ধ্যানে শুন আমার সাক্ষাতে।
য়েতেক মর্ম্মভেদ কইলাম তুমাতে ॥"

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥"—যোগিতন্ত্রকলা।
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে হুসঘনা বেদ উৎপন্ন ॥"—বেদমালা।

এই দুই অদ্ভুতপ্রকৃতির নামবিশিষ্ট বেদদ্বয়ের বিবরণ যদি কেহ কোথাও পাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।—লেখক।

* নাদপৈতা আজকালও নাথযোগিগণ ধারণ করেন, এবং স্থানে স্থানে অধুনাও অনেকে লাল টুপী ও কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী পর্য্যটক de la valles ভ্রমণ-কাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"He (Yogiraj) had a golden bead hanging from his ear as big as a musket-bullet ; and had a little red cap like those worn by Italian-galley slaves." (J. Tal-boys Wheeler's A Short History of India, Burma and Nepal.) 116-117.

সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, পিণ্ডের অন্ন শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত-গণকে ভোজন করাইবার জন্ত "ভাণ্ডারার" সামগ্রী আনান হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন,—

"তুমি চাইরে মিলি রন্দন করউকা ইহাতে।"

অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্ন ব্যঞ্জনের অর্ঘ্য দেওয়া হইল। অতঃপর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল এবং তারপর সকলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাস এই। এখন সৃষ্টি ত হইল। সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না। তখন—

"পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে।
রবি মিশাইল বায়ে বায় মিশাই আকাশেতে॥
কলসী ভাঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশে।
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা আকাশে॥
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তেন অভিপ্রায়ে।
শরূপ মিশাইব তেন নাথগুরুর পায়ে॥"

শ্রীরাজমোহন নাথ

—o—

"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা

ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন,—

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ অনাদি-পুরাণ, হাড়মালাগ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা নামক তিনখানি গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়া, নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃতে ও অপর দুইখানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুথির 'নিগমন' বা সমাপ্তি অংশে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে হয়, ইহা আজকালের, নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বা cosmology বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক তাহা নাই; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা বা রূপকচ্ছলে সরল, সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় বর্ণিত আছে মাত্র। এই পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস, মর্ত্ত্য-পাতাল, স্থাবর-জঙ্গমাদি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকারা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকস্বরূপ। তাঁহার দয়াতেই বিশ্বভুবনের সৃষ্টি হয়, জল স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয়, মনুষ্য ও মনুষ্যসভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে নাসদীয় সূক্ত নাথসৃষ্টি-কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অঘমর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্ম্মাদি সূক্তের উপদেশও বিদ্যমান আছে। শুধু তাহাই নহে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সৃষ্টিকথার প্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্পষ্ট উক্ত আছে—পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র অলেখ নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাঁহারা এবং প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপতঃ একই।

প্রোক্ত নাথ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় শিরোমণি। প্রবন্ধের অবলম্বিত পুথির মধ্যে তাঁহাকে 'অনন্ত কুটি সিদ্ধার গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। এই প্রশংসা নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকালে, পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নাথপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ

---

* ১০ই ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই দেওয়া হইল।—সম্পাদক।

কেহ বামাচার হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হঠযোগী ছিলেন। শিবপদ সকলেরই প্রার্থিত বস্তু ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধগণ হাড়ুপা, কাণফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রেই স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ-ধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে কামিনী-কাঞ্চন-মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য। কিন্তু মীননাথ নিজে মিথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে গোরক্ষনাথের গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস, গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধর্ম্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে। পরে একই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন-পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সম্মিলন, সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব্ববিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিদ্যমান আছে। নাথ-সৃষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধ সাহিত্য-দর্শন নহে। বৈদিক সাহিত্য বা বেদান্তই ইহার মূলে নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈব-জাতীয় বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতে ও বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও সাধন-পন্থার সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই এক ভাবে না এক ভাবে বৈদিক পরা বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমাণ পুথি-গুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃযজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে পুত্র ব্যতীত অন্ত পুরোহিতের প্রয়োজন কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্ আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের ধর্ম্মাদর্শমতে নাথসৃষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ থাকিতে পারে না; বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতেই রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্ম্মভুক্ত হইয়া পড়েন এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা church গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাত্মক সাংখ্যভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমাজ গঠন নাথধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্বের" সহিত ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখাইয়া নাথধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশেষতঃ পুরুষসূক্ত, প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই; সুতরাং ঋগ্বেদমূলক হইলে নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অধিক পুরাতন হইতে পারে না। নাথধর্ম্ম বেদমূলক না হওয়াই সম্ভব। বেলুচিস্তানে, খাদারে ও গান্দাভে এবং সিন্ধুদেশে, সেহ্বানে ও সক্করে মুসলমান নাথপন্থী আছে। সিন্ধুদেশে সনাতনপন্থী, শিখ ও হিন্দু নাথপন্থী আছে। ইহারা অনন্ত জ্যোতির উপাসনা করে এবং প্রদীপ

দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখে। রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের সেরিকা, ভর্ত্তরি ও ইন্দোর রাজ্যের হুদাখেড়ি নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে এইরূপ অনন্ত জ্যোতিঃ বা প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখা হয়। রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথপন্থীদের মধ্যে অগ্নি বা অনন্ত জ্যোতির উপাসনাই প্রবল। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথধর্ম্মে সাকার অগ্নির উপাসনার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বাঙ্গালার নাথপন্থীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। *পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের নব প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালা দেশের নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতিঃ প্রজ্বালিত রাখে না। এই বিষয়ে পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বভারতের বা বাঙ্গালার নাথধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখা যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ;* তাহাতে নিরঞ্জন কর্ত্তৃক অন্ধকার বা শূন্য হইতে অগ্নির বা আলোকের উৎপত্তির কথা আছে। সে উপাখ্যান পূর্ব্বদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথপন্থীরা বলে যে, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নাথসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই জন্য পশ্চিম-ভারতের নাথসম্প্রদায়ের গুরুগণ ভর্ত্তৃহরি বা ভর্ত্তরি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বভারতের নাথধর্ম্ম গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, ইহা আদিম নাথধর্ম্ম নহে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

আজ নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা শুনিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু মুসলমান নাথপন্থীদের কথা বলিয়াছেন। মুসলমান নাথপন্থীদের কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আজ নূতন জিনিষ শেখা গেল। ‘প্রবাসী’তে আমি নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সেই উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের ন্যায় যোধপুরেও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেখানকার ‘দরবার লাইব্রেরী’তে ‘গোরখবোধ’ নামে একখানি পুথি দেখিতে পাই। তাহার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই মেলে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, গোরক্ষনাথ যে একজনই ছিলেন, তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত শিষ্যেরা যেমন শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বোধ হয়, গোরক্ষের পরবর্ত্তী অনেক নাথসাধুও গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষায় লিখিত ভাষ্য সমেত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম ‘জ্ঞানেশ্বরী’। গ্রন্থকারের নাম জ্ঞানেশ্বর, গ্রন্থের রচনা ১২৯০ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকে গোরক্ষনাথের নাম আছে, আরও লেখা আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সুতরাং এ হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। নানক গোরখের তর্ক ব্যাপারও খুব প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া গোরখনাথের সময় সম্বন্ধে বহু মতই প্রচলিত। এইরূপ নানা ব্যাপার দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ একজন নন।

ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। দত্তগোরক্ষসংবাদ, জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, বিবেক-মার্ত্তণ্ড, নবনাথভক্তিসার—আরও অনেক বই আছে। এগুলি লইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলিতে হইবে।

নাথেরা হঠযোগী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া ইহাদের ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের গ্রন্থে বা মতে বৈদিক, বৌদ্ধ বা নানকপন্থী প্রভৃতি মতবাদ দেখিলেই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বেদমূলক, বৌদ্ধমত-মূলক, তাহা নহে। এরূপ করিলে বরং আমরা ভুলই করিব। আমি নির্ব্বিবাদে বিলাতী মত অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই না যে, পুরুষসূক্ত অপ্রাচীন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, নাথধর্ম্মের উৎপত্তি পশ্চিমে। কিন্তু বাঙ্গালায় যে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ইহাও বলা যায় না। মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ, উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্র-নাথের 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বরিশালের চৈন্দোর লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, এইটাই যে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কালস্রোতে, স্থান ও গুরুভেদে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি পাঠ করিয়া তাহার নির্ণয় করা দরকার।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—

প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, হয় ত অদ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তজ্জন্য প্রবন্ধপাঠক ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং আলোচনাকারী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পরিষদের কোন আগামী অধিবেশনে আমাদিগকে শুনাইবেন। প্রবন্ধোক্ত পুথির সঙ্গে হয় ত পশ্চিম দেশের নাথধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যকার আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নাসদীয় সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টির কথা আছে এবং তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। বেদে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত নাথধর্ম্মের "নিরঞ্জনে"র ত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু বেদে ব্রহ্মের "নিরঞ্জন" সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। তার পর গোরক্ষ-নাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও হিন্দুধর্ম্মের সহিত মেলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সরমা বলেন দেবি না কর কন্দন।
অবশ্য বাচিবে তোমার শ্রীরামলক্ষন ॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২৫।২—২৬।১)

ধাম্মিক বিভিসন দিআ গেল সাপ।
তে কারনে পাই আমি এত মনস্তাপ ॥
ধাম্মিক ভাই ছিল ধম্মের সারথি।
রাজলক্ষি ছারিল তারে মাল্য লাথি ॥
কুরি চক্ষু বহিয়া পরিছে লহধারা।
বাপের কান্দনে কান্দে কুমার তিসিরা ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বির।
বাপের কন্দন যুনি কেহ নহে স্থির ॥
এই মত পুত্র সকলের হইল দুক।
য়তিকা বিক্রমে কহে বাপের সমুক ॥
অনেক করিলে তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥
অমর হইল খুড়া তপস্বার গুনে।
ব্রহ্মার প্রসাদে খুড়া সব সাস্ত জানে ॥
সাস্ত অনুসারে খুড়া কহিলেন হিত।
ধাম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত ॥
তোমা হইতে ব্রথা খুড়া গৌরব রাখে।
হেন জনে লাথি মেলে সভাখণ্ড দেখে ॥
আপদ পরিলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
দুখ না ভাবিহ বাপ বুঝাইতে হিত ॥
না কাদ না কাদ বাপা না ছাড় নিস্বাষ।
দেবতারা যুনিলে করিবে উপহাষ ॥
আজি [রন] করিবারে জাব চারি জন।
মারিব প্রধান রাম জত কপিগন ॥
(পৃ০ ৪৬।২—৪৭।১)

শেষ,—

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল বানি।
আগে বির ইন্দ্রজিত সাজিল আপনি ॥
আগে পাছে বান্ধিলে রন টোপর।
সনার উপরে হাড় দেখিতে যুন্দর ॥
সোনাময় চালনা বান্ধিল কটীদেষে।
তুন গোটা কসিয়া বান্ধিল বাম পাষে ॥
রাবনের দুখে হইল সুখের সমান।
সাজিয়ে সমরে জায় পুত্র প্রধান ॥
হান হান কাট কাট রাক্ষসের রব।
ইন্দ্রজিত বিরে তাহা আনন্দ উচ্ছব ॥
জুদ্ধ করিবারে জায় কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞ সজ্য লয়্যা রাক্ষষ ধায় চতুভিত ॥
সর পত্র বিথ্রাইয়া ছাইল মেদনি।
মন্ত্র পর্য়া যজ্ঞকুণ্ডে জালিল য়াগুনি ॥
রক্ত বস্ত্র রক্ত মাল্য জাবরায়্যা ঘ্রতে।
দষ হাজার ব্রাহ্মন হোমের চতুভিতে ॥
য়াতব তণ্ডুল জব হুনে পৌটি পৌটি।
ঘ্রতে জাবরায়্যা ফেলে যজ্ঞের জত কাটি।
সহস্র সহস্র ঘড়া ঘ্রত লয়্যা চলে।
ব্রহ্মা আসি মুত্তিমান হইল হেন কালে ॥
সাক্ষাত জে য়গ্নিদেব হইল য়দিষ্টান[১]।
য়হে বির ইন্দ্রজিত বর মাগ দান ॥
ইন্দ্রজিত বলিছে আমারে দেহ বর।
জুঝিয়া বধিএ জেন নর বানর ॥
এ কথা যুনিয়া ব্রহ্মা না করিলা য়ান।
বর দিয়া তাহারে হইলা য়দিষ্টান[১] ॥
রথে য়ারহন করিল ইন্দ্রজিত।
হাকারিয়া সজ্ঞ ধাইল চতুভিত ॥
বর পাইয়া জুদ্ধে করিল গমন।[২]
দক্ষিন দুয়ারে ভাই কোন জন জাগে।
পরিচয় করহ দারুন নিসাভাগে ॥

১। 'অন্তর্দ্ধান' হইবে বোধ হয়।
২। ইহার মেলকটি ছাড় পড়িয়াছে।

রাছিল তারক বির রাত্রজাগরনে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥
রঙ্গদ দুবরাজ জাগে ইন্দ্রর নাতি।
কোন পরিচয় চাহ নিশাভাগ রাতি ॥
রঙ্গদের নামেতে রধিক কোপে জলে।
চথ চথ বানগুলা দক্ষিন দারে ফেলে ॥
বিসকুণ্ডে ডুবাইয়া চক চক বান।
বানর বিন্দিয়া বির করে খান খান ॥
মেঘের রারে থাকি জোঝে বির মেঘনাদ।

৭৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ১৫, ১৭, ১৯-২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩১-৪৪, ৪৬-৪৮, ৫০, ৫১। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

নল নিল আদি করি জত শেনাপতি ॥
বন্দনা গাহীতে মোর হইবে অনুক্ষণ।
শঙ্খেপে বন্দিব আমি ই তিন ভুবণ ॥
বন্দনার মর্দ্ধে মোর জে দেবে এরায়।
কুটী কুটী প্রণাম মোর শেই দেবের পায় ॥
আইশ বলি রঘুনাথ আশনে কর অদিষ্ঠান।
শংহাত করিয়া আন বির হনুমান ॥
তোমার জন্নে কেবল উপলক্ষ্য আমী।
আশনে আশীয়া রঘুনাথ অদিষ্ঠান হও তুমি॥
আশন ছারিয়া জদি থাক অর্ন্ন ঠাই।
আর কি বলিব রাম তোমার দোগাই ॥
শোন শোন ভক্ত লোক হইয়া একমন।
লঙ্কাকাণ্ডের কথা কহি শোন দিয়া মন ॥
শ্রীরামচরণে ভক্তি রহুক শর্ব্বক্ষণ।
একমন হইয়া শোন গিত রামায়ণ ॥
ভবশীন্ধু তরিতে তরনি রামনাম।
এ নামে পাষণ্ড জেবা বিধি তারে বাম ॥
শ্লোক ছন্দে বাল্মীক রচিল রামায়ণ।
পাচালী করি কীর্ত্তিবাষ বুঝাইল শর্ব্বজণ ॥
বন্দ গেল শাগর কটক হইল পার।
দিশে দিশে রাবণ রাজার টোটে অহঙ্কার
চিন্তিত হইয়া রাবণ ভাবে মনে মনে।
সুক শারণ দুই চর ডাক দিয়া রাণে ॥
সুক শারণ বলি তোমা চরের প্রধান।
রামের কটক চশ্চীয়া আইশ বিদ্যমান॥
গাছ পাথরে বান্দা গেল শাগর গম্ভীর।
ত্রীভুবণে হেন কর্ম্ম করে কোন বির ॥
শ্রীরাম লক্ষণ রার বিভিশনের মতি।
ভাল মতে জানিয়া আইশ জত শেনাপতি।
রাজার বচণ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজা ডাহিন করিআ[১] আশী চলে হরশীতে

মধ্য,—

নাগপাশে মুক্ত হইল শ্রীরাম গোশাঞী।
রাম জয় করিয়া শব্দ হইল তথাই ॥
গরুড় হতে এড়াইলা দারুন বন্দন।
এক গুন ছিল বল হইল দিগুন ॥
নাগপাশ মুক্ত হইলা জগতের নাথ।
গরুড়ের স্থানে রাম জোর করি হাত ॥
বন্ধু নহো বান্ধব নহো নহো মোর মিত।
কি কারনে করিলা তুমী আমার এত হিত ॥
কোন দেসে বৈস পক্ষী দেব অবতার।
কি কারনে মোর এত করিলা উপকার ॥
গড়ুর বলেন রাম তুমী আমার মিত।

১। ডাহিন করিআ—প্রদক্ষিণ করিয়া।

তে কারনে করিলাম তোমার এত হিত ॥
সবংসে মারিলা যদি লঙ্কার রাবন।
তবে সে কহিব আমী এহার বিবরন ॥
এক বাক্য রাম আমী কহি তোমার স্থানে।
আর দুই বার বেটা বুঝিবে তোমার সনে ॥
তাহার যুদ্ধে সর্ব্বজন হইও সাবধান।
কি করিতে পারে তোমা রাক্ষস পরান ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উরিল আকাষ।
রাম সম্বাশীয়া পক্ষি গেল নিজ দেশ ॥

(পৃ: ২৯।২)

শেষ,—

লাচারি ॥

আহা ভাই কুম্ভকর্ন রে ॥ ধুয়া ॥

সুনিয়া রাবণরাজা করে আহাকার।
প্রাণের দোশর ভাই না দেখীলাম আর ॥
কাচা ঘুমে চেতাইয়া পাঠাইলাম তোমারে।
মোর দোশে গেলা ভাই তুমি জমঘরে ॥
ডাইন হাত পরিল মোর শুন্য হইল বুক।
বন্দু বান্দব কান্দে বৈরির কৌতুক ॥
জাহার শহাএ মুই জিনিলাম দেবগন।
কাচা ঘুমে চেতাইয়া বধিলাম জিবণ ॥
আজি সুন্ন হইল মোর নিদ্রার চৌআরি।
বির শুন্ন হইল মোর কণক লঙ্কাপুরি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর।
সুখে নিদ্রা জাও আজু শঙ্কের ঘুচুক ডর ॥
দেব দানব জিনিলা ভাই বধিল মানুশে।
নিশ্চয়ে জানিলাম রাম বধিব শবংশে ॥
মরিয়া না মরে রাম দুর্জ্জিএ হইল বৈরি।
নিশ্চয়ে জানিলাম মোর মজিব লঙ্কাপুরি ॥
বড় বড় বির পরিল লঙ্কাপুরির শার।
চিন্তিআ উপাএ মুই না দেখীলাম আর ॥
কুম্ভকর্ন মরণে রাবণ জিবণের ছারে আশ।
রাবণ রাজার ক্রন্দন রচিল কির্ত্তিবাশ ॥•॥

পয়ার ॥

চিন্তীয়া রাবণ রাজা না দেখে নিস্তার।
হেন কালে আশীল রাজার ত্রীশীরা কুমার ॥
বাপ কাতর দেখা পুত্রের হইল দুঃখ।
ত্রীশীরা বিক্রম করে রাজার শমুখ ॥
ত্রীশীরার বিক্রম দেখীয়া রাজ [া] হরশীত।
আর তিণ পুত্র তাহার আশীল তরিত ॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকায়া বির।
জাহার বানের তেজে পর্ব্বত জাএ চির।
রাজার আদেশ পাইয়া চারি কুমার লরে।
রাজ অভরণ তাহার সর্ব্ব অঙ্গে পরে ॥
নাণা অলঙ্কারে রাজা করিল ভুশীত।

৭৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৩½। ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪৫, (পুথির দুই পাশ গলিয়া যাওয়ায় পাতা মেল করিতে পারা যায় নাই)। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

—রোল সুনিঞা রাবনের ধেয়ান।
অভিমানে খসে রাজার হাথের গুআ পান ॥
সমুখে আছিল রাজার সেনাপতি।
জুঝিবারে পাঁচে রাজা বেকতি বেকতি ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিল আমি সপ্ত পাতাল।
আমার নামে দেবগনের কাঁপে কালে হাল ॥
সকল দেব দানব আমাকে ডরেডরে থাটে।
ছার বানর বেটা আসিঞা এত দুর চাঠে ॥

জত জত লোক বৈসে এ তিন ভুবনে।
কোন জন স্থির হব আমার বিগ্নমানে॥
হেন জন কহী জে বলে মোর স্থানে।
বলিঞা জাইতে পারে আমার সন্নিধানে॥
ইন্দ্রজীত বলেঁ। বাপু হাথের ধর পান।
মুখের কালি ঘুচাহ বাপু সাধিঞা মান॥
ঘোড়া হাথি রথ নেহ সাজিঞা জুঝার।
একশ্বর মারিঞা দেহ চারি দুআর॥
অবধান করিঞা বাপু আপনে করহ রন।
আগু অঙ্গদ মারিহ পাছে আন জন॥
লড়ীল রে ইন্দ্রজীত বাপের আড়তি।
লেখা জোখা নাহি জত লড়ে জোদ্ধাপতি॥
ঘোড়া হাথি লড়িল করিঞা হুড়াহুড়ি।
নানা অস্ত্র লঞা পাইকের রড়ারড়ি॥
ইন্দ্রজীত জুদ্ধে লড়ে জয় জয় নাদে।
নানা রাজবাদ্য বাজে পঞ্চ সবদে॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়াতে বাজে সোনার বিঘুকি
খাণ্ডাইত জোদ্ধ[া] লড়ে জুঝার ধানুকি॥
কোঙর ভাগ পাত্র ভাগ লড়ে সারি সারি।
নানা রাজবাদ্য বাজে শুনিতে দুর্দ্দুরি॥
ঘোড়া হাথি রথের চাল জেন উভে সঞ্চরে।
চিহ্ন চণ্ডা ছত্র গগণমণ্ডল ভরে॥
কটক জুঝিঞা জায় ভূমি আকাসে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে॥
(পৃ° ২৫।১)

মধ্য,—

বীর করুণা রাগ॥
তাল হএ রে হেহে।
না হা রে ওরে রাজা ও হয় হয় কৌশল্যানন্দন
রাম বন্দিব হে॥ ধ্রু॥
বাপের ক্রন্দন শুনিঞা পোএর বড় দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সমুখ॥
বিস্তর তপ কৈলে তুমি আমর হবার তরে।
তোমায় হৈতে বিভীষণ আমর ব্রহ্মার বরে॥
আমর হৈল বিভীষণ আপনার গুণে।
ব্রহ্মার প্রসাদে বীর সর্ব্ব সাস্ত্র জানে॥
হেন জনাকে লাথি মার সভার ভীতরে।
বৈরী তোলাইঞা আনে তোমার উপরে॥
সুভ দসা হইলে বুদ্ধি হএ বিপরীত।
বিপদ পড়িলে বুদ্ধি হয়এ পণ্ডীত॥
সাস্ত্রের অনুমানে বলে রাজ্যের হীত।
ধর্ম্মচরিত্র বিভীষণ বিচারে পণ্ডিত॥
তুমি পুজিত হৈলা অজয় সেলে।
তৃভুবন জিনিবারে পার তুমি হেলে॥
পুষ্পক রথ পাইলে ব্রহ্মার বরে।
অফুট কবচ সোভে তোমার কলেবরে॥
অজয় ধনুক ধর অজগর বান।
অজয় রাক্ষসের বৈরী না ধরে টান॥
খাণ্ডার চোট মার জদি পর্ব্বত কাটে।
হাথে জাঠা জুঝ জদি বৈরী নাহি আটে॥
জৌতুক করিঞা সেল দিল ময়দানব রাজে।
জারে সেল এড় তারে অবস্য বাজে॥
নরক অসুর জেন মারিল গদাধর।
অজয় অসুর জেন মারিল পুরন্দর॥
গরুড়ের মুখে জেন ছটপটায় সাপ।
রাম লক্ষন মারিঞা তোমার খণ্ডাইবু তাপ॥
ত্রিশিরার বিক্রম রাবন পড়িহাসে।
মরিঞা জিল জেন রাবন রাজা বাসে॥
ত্রিশিরার বিক্রম শুনিঞা রাবন হরসীত।
আর তিন বেটা দর্প করে বিপরীত॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকা বীর।
জার নামে দেব দানব রনে নহে স্থীর॥
চারি বেটা কোপে গর্জ্জে জেন কাল সাপ।
তৃভুবন সহিতে নারে জাহার প্রতাপ॥

অন্তরিক্ষ গতি সব যমের দোষর।
ব্রহ্মার বরে সর্ব্বশাস্ত্র তাহার গোচর॥
চারি বীরের বিক্রমে রাবন তৃভুবন জিনী।
চারি বীরের পরাজয় কথাও নাহি শুনি॥
রাজপ্রসাদ সে চারি বীরে পরি।
পুষ্প চন্দন পরে সুগন্ধি কস্তুরি॥
চিত্র বিচিত্র কেহো পরে রাঙ্গা পাটের খুনি।
মেঘডম্বর পরে কেহো নাম কালঝিনি॥
ধবল খুনি পরে কেহো নাম গঙ্গাজল।
সুবর্ন্নরেখা পরে কেহো নেত পিঙ্গল॥
কনক কঙ্কন কারো সোভে ভুজদণ্ড।
সর্ব্বগাত্র চন্দন লেপে দেখিতে সুরঙ্গ॥
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন চন্দ্রের তার।
হৃদয়ে লম্বিত সোভে গজমোতি হার॥
নানা রত্নে রচিত কাঞ্চনের অভরন।
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন সূর্য্যের কীরন॥
সুবর্ন্ন মানিকে সোভে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
শিরে জাপ্যমালা সোভে মাথার খোপরি॥
মাথায় মকুট নানা চিত্র লেখন।
নানা বর্ন্নে সোভা করে মাথার অভরন॥
সুবর্ন্নের সাহা সোভে সুবর্ন্নের টোপর।
পারিজাত মালা সোভে গন্ধে [মনোহর]॥

(পৃ০ ৬৯।১-২)

৮০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬১-৯৪, ১১১-১১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

——তপ করিলে লোকপাল।
তমু বলিতে নারিবে রাম মহীমা তোমার॥
তুমি সভারে জান রাম তোমারে কেবা জানে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমায় না পান ধেয়ানে॥
এত স্তব করিল জদি রাবননন্দন।
বলিতে লাগিলা রাম প্রসন্ন বদন॥
রাম বলেন জে দেখি আমি তোমার চরিত্র।
তোমারে মারিতে আমার নহেত উচিত॥
পুনুর্ব্বার বলে বির শ্রীরামের চরণে।
তুমি না মারিলে আমি তরিব কেমনে॥
তুমি জদি বধ মোরে আপনার হাথে।
সগর্গবাস জাইব চড়িয়া দিব্য রথে॥
রাম বলেন লক্ষন আমি কভূ নহি আন।
লক্ষণের বানে পড়িলে পাইবে বিষ্ণুস্থান॥
আমিবধ্য নহ তুমি মারিব কেমনে।
লক্ষণের বধ্য তুমি জুঝ তার স্থানে॥
সন্তুশ্‌ট হইল বির শ্রীরামের কথায়।
জে আজ্ঞা বলিয়া হাথ দিলেন মাথায়॥
লাফ দিয়া অতিকা চড়িল গিয়া রথে।
প্রচণ্ড ধনুক বান লইলেক হাথে॥

মধ্য,—

বিভিসন বলে সুন কমললোচন।
অক্ষয় কবজ জানে রাবনের নন্দন॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গলে।
অতিকার মরণ হয় তাহাই আনিলে।
আখি ঘুরাইয়া কহে পবননন্দন।
এতক্ষণ না বলিষ চণ্ডাল বিভিসন
হনুমান বলে সুন রাম গুনমুনি।
আজ্ঞা কর অক্ষয় কবজ আমি আনি॥
শ্রীরাম বলেন বাছা উপজুক্ত হয়।
তোমার বিক্রমে আমার সর্ব্বত্রে জয়॥

প্রণাম হইল বির শ্রীরামের পায়।
তপস্বির বেস ধরিয়া রণস্থলে জায় ॥
সিরে জটা ধরিলেক দুর্ব্বল সন্যাসি।
অস্তবাড় লাগিয়াছে দেখি উপবাসি ॥
রক্তবসন পরিধান কুমণ্ডল হাথে।
তৈলবর্জ্জিত তনু খিন জেন অতিথ তাথে ॥
রক্তচন্দনের ফোটা লল্লাটে সোভিত।
রুদ্রাক্ষির মালা গলে দুলিছে লম্বিত ॥
হাথে নিল জাপ্য মালা চক্ষে প্রেমধারা।
তন্ত্র মন্ত্র কিছু নাহিক মুখ নাড়া সারা ॥
অতিকার কাছে বির উর্ত্তরিল আসি।
অতিকা প্রণাম করে দেখিয়া সন্যাসি ॥
হাথ তুলিয়া অতিকারে করেন কল্যাণ।
পুত্রসোক পাইয়া আমি আইলাম তোমার স্থান ॥
বারাণসে ঘর আমার দেসান্তরে ফিরি।
বৃদ্ধকালে তনু খিন পুত্রসোকে মরি ॥
ব্রাহ্মণি আমারে গালি দেয় অভিরত।
দেসান্তরে ফিরিয়া তুমি পাপ করিলে কতো।
হইলে পুত্র জমে লয় তোর অপকর্ম্মে।
পাপে জর্ম্মাইলে পুত্র মরিল বিধর্ম্মে ॥
ব্রাহ্মনির বচনে আমার হইল রোস।
তুমি কর ঘরে পাপ মোরে দেহ দোষ ॥
একাকিনি ঘরে থাকি পাপে দিলে মন।
তোর পাপে জায় পুত্র জমের ভুবন ॥
চারি পুত্র তিন কন্যা লয়্যা গেল জমে।
পুত্রসোকে প্রাণ দহে কান্দি রাত্রিদিনে ॥
গুরুভক্তি ধর্ম্মসিল দেখিলাম তোমারে।
পুত্র রক্ষার হেতু এক ভিক্ষা দেহ মোরে ॥
সন্যাসির কথা সুনি বলে অতিকায়।
কোন ভিক্ষা দিলে তোমার পুত্র রক্ষা পায় ॥
সন্যাসি বলেন তুমি ধর্ম্মসিল অতি।
পরম বৈষ্ণব দেখী বিষ্ণুতে ভকতি ॥
সন্যাসি বলেন আগে সত্য কর তুমি।
পুত্র রক্ষার হেতু তবে দান মাগি আমি ॥
অতিকা বলেন সত্য করিলাম না করিব আন
জাহা চাহ তাহাই তোমারে দিব দান ॥
অক্ষয় কবজখানি আছে তোমার গলে।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় তাহাই দান দিলে ॥
এত সুনি অতিকা ভাবেন মনে মন।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় আমার কারন।
ব্রাহ্মনেরে রক্ষা কর্য্যা আমি জদি মরি
জিবন সার্থক হয় জাইব স্বর্গপুরি ॥
মরণের ভয় জদী দান নাহি দিব।
সত্য লঙ্গিলে তবে নরক ভুঞ্জিব ॥
এত বির অতিকা মনেতে তোলপাড়ে।
অক্ষয় কবজ বির গলে হইতে ছিঁড়ে ॥
প্রনাম করিয়া দিল সন্যাসীর হাথে।
সন্যাসি পাইয়া তাহা বন্দিলেক মাথে ॥
অতিকার ঠাঞি বির হইয়া বিদায়।
রনস্থল হইতে রামের কাছে জায় ॥

(পৃ০ ৬৩।২—৬৪।২)

সাক্ষাতে অগ্নি মোরে হয় বিত্তমান।
ইন্দ্রজিতের সমুখে কে হইবে আগুয়ান ॥
চারি দুয়ারেতে আছে জতেক সেনাপতি।
সকল ঠাট মারিয়া পাড়িব আজিকার রাতি ॥
এত জদি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ্য রাণ্ডি আসিয়া হইল বিত্তমান ॥
সারি দিয়া রাণ্ডি সব জোড় করিল হাথ।
আমরা কিছু বলি সুন রাক্ষসের নাথ ॥
আমরা আসিয়াছি কিছু বলিবার তরে।
হিদয় বাক্য নাহী বলি তোমার মায়ের ডরে ॥
বন্ধু বান্ধব পড়িল জতেক খামীলোক।
ক্রুদ্ধ করিয়া মরিল তারা বড় পাইয়ু সোক ॥

কান্দিবার বেলা নাহি রাণ্ডি সভের মেলা।
জাবদ না হয় রাণ্ডের ভোজনের বেলা।।
ভোজনকালে রাণ্ডি সভের বাজে হুড়াহুড়ি।
এক রাণ্ডের তরে চাহি লক্ষ্যে লক্ষ্যে হাঁড়ি।।
রাত্রিদিনে কান্দে রাণ্ডি দুঃখ ভাবে চিত্তে।
তোমার স্ত্রি সভে থাকুক জর্ম্ম আইয়াতে।।
লক্ষ্মি সিতাদেবি জাইবেন রামের সাত।
কোন স্ত্রির সক্তি পাইব রঘুনাথ।।
নয় হাজার দেবের কন্যা স্বর্গবিদ্যাধরি।
জর্ম্ম আইয়াতে থাকুক আসির্ব্বাদ করি।।
সুর্পনখার রাণ্ডি দেখ অই তোমার পিসি।
রাক্ষসি হইয়া ও জে হইল মানুসি।।
আতি বড় জানে রাণ্ডি কুলের কাঁথার।
এথা হইতে ধরিতে গেল রাম ভাতার।।
আপনা না জানে রাণ্ডি পাকিল মাথার কেশ।
রাম ভাতার ধরিতে রাণ্ডি ধরে নানা বেস।।
ভাল করিল লক্ষ্মণ ঠাকুর দর্প করিল চুর।
নাক কান গেল এখন হয়্যাছে খুখুর।।
সঙ্করে কি করিবে আর কি করিবে পার্ব্বতি।
এক রাণ্ডে মজাইল লঙ্কার বসতি।।
পার্ব্বতি সঙ্কর পুজে রাজাত রাবন।
এখন তারা রাখিতে না পারে দুই জন।।
এতেক বলিয়া কান্দে বিরভাগের রানি।
ধারা শ্রাবন জেন রাণ্ডের চক্ষে পড়ে পানি।।
রাণ্ডের ক্রন্দনে ইন্দ্রজিতের বিসাদ।
রাণ্ডের প্রবোধ দেয় কুমার মেঘনাদ।।

(পৃঃ ৬৯।১—২)

চারি দুয়ারের ঠাট পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাখা গেল হনুমান রাক্ষস বিভিসন।।
অজর অমর হইল বির ব্রহ্মার বরে।
দুই বির রক্ষা পাইল এতেক মাগুন্তরে।।
টিঙ্গিয়া গুলিঞা গোঁহে জুক্তি করিল সার।
কেবা মরিল কেবা আছে করি আসই বিচার।।
হাথেতে দিয়াটি করিয়া দুই মর্ত্তাবিরে।
বানর কটক দেখিয়া বেড়ায় চারি দুয়ারে।।
সুগ্রিব পড়িয়াছে লয়্যা রাজ্যখণ্ড।
ছত্তিস কুটির সেনাপতির গড়াগড়ি জায় মুণ্ড।।
দক্ষিণ দুয়ারে পড়িয়াছে অঙ্গদের থানা।
মহিন্দ্র দিবিন্দ্র অঙ্গদ পড়্যাছে তিন জনা।।
পুর্ব্ব দুয়ারে পড়িয়াছে নি॰॰ সেনাপতি।
আসি কুটি বানর পড়্যাছে তাহার সংহতি।।
পশ্চিম দুয়ারে গেল দুই মহাজন।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন হয়্যা অচেতন।।
সম্বাদ প্রবোধ নাহি দুই ভাই মুর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিত।।
চারি দুয়ারে বেড়াইয়া নিখড়ি করিল দুইজনে
সাটি সহস্র বানর পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বানে।।
হাথেতে দিয়টি করিয়া দেখে জাম্বুবান।
চক্ষু মিলিতে নারে বুড়া করিছে ধেয়ান।।
জাম্বুবান বলে মোর বুকে লক্ষ্য বান।
চক্ষু মিলিতে নারি মোর কপালে পড়ে টান।।
অনুমানে জানিনু তুমি বিভিসন।
বিভিসন আসিয়াছ আমা সম্ভাসন।।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত তুমি লোকবৎসল।
হনুমান বিরের তুমি কহত কুসল।।
বাপ পবন জার মা ত অঞ্জনা।
হেন বির এড়ায় জদি এসব জন্ত্রনা।।
বিভিসন বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বানে তোর ছর্ম্ম হইল মাত।।
সুগ্রিব রাজা পড়্যাছে অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি।
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অব্যাহাত।।
রাম লক্ষ্মন পড়িয়াছেন জগতে বাখান।
হেন সমে না চিন্ত তুমি রামের কল্যান।।
এবে সে জানিনু ভল্লুক তোমার চরিত্র।

হনুমান বই তোমার কে করিবে হিত ॥
জাম্বুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি টুটে।
হনুমান জিইলে সভার জীবন নেউটে ॥
অচেতনে বানর সব আছি বা না আছি।
তেঞি আগে আমি হনুমানের বাত্তা পুঁছি ॥
বিভিসন বলে তুমি ব্রহ্ম গেয়ান।
তোমা সম্ভাসনে আসিয়াছে হনুমান ॥
(পৃ০ ৭০।২-৭৫।১)

শেষ,—

সক্তিসেল আরম্ভ ॥

বিরবাহু পড়িল জদি সুনিল রাবণ।
সিংহাসন এড়িয়া বৈসে বিরসবদন ॥
অভিমানে ধ্যানে বৈসে লঙ্কার অধিকারি।
ঘরে ঘরে কান্দে সব বিরভাগের নারি ॥
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহো বলে স্বামি পড়িল সংগ্রাম ভিতর ॥
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল গোঁয়াতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল জুর্দ্ধপতি ॥
খেজান সুর্পনখা তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
আমা সভার রাণ্ডি করিয়া সাধিলি কোন কাজ ॥
সুর্পনখা রাণ্ডি আইল রাক্ষস বিনাসে।
সকল রাক্ষস খাইয়া রাবন খাইবে সেষে ॥
রাবন হেন কুপুরুষ জথা নাহি দেখি।
সেই দেসে গিয়া বল বঞ্চিব সব সখি ॥
ত্রিলোকের কলরব উঠিল গভির।
অভিমানে জুঝিতে রাবন চলে ধিরে ধির ॥
কোপানলে জায় রাজা জুঝিবার মনে।
সর্ব্বাঙ্গ ভুসিত রাজার নানা অভরনে ॥
কুটি কুটি অস্ত্র সাজিল দুই পাসে।
দস হাজার স্ত্রি আসিয়া রাজারে বেউসে ॥
জুঝিবারে জায় রাজা পরম কোরধে।
হেন কালে মন্দদরি রাবনে বিরোধে ॥
আপন কুবুর্দ্ধে রাজা করিলে সর্ব্বনাষ।
এখন রামের সিতা দিয়া রাখ গ্রিহবাষ ॥
মরন নিকট তাহার কি করে ঔসধে।
না রহে রাবণ মন্দদরির বিরোধে ॥
রাবন বলে জে জে বির ধনুক ধরিতে জানে
ছোট বড় বির সভে চল আমার সনে ॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া পড়ে জুঝিবার সাড়া।
ঘরে ঘরে পাইক লড়ে জাঠি ঝগড়া ॥
এগার সত বিহন্দের বাহির হইল রাবন।
সাজন রথ—

৮১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২১/২×৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৯, ১১, ১৩—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং র[ঘু] পতিং।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে. রঘুনন্দনং ॥
কটক হইলা পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইআ রহে সুগ্রিব আপনে ॥
জুড়হস্থে বলে তবে মন্ত্রি জাম্বুমান;
এক নিবেদন করি কর অবধান ॥
সিন্ধু বান্ধি পার হইলা কমললচন।
অবেস্য পাইব বার্ত্তা রাজা দসানন ॥
সাগর হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রৈক্ষক ॥
জাম্বুমানের বাক্য সুনিআ রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত ॥
রাম বলে সুন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাতি ॥

কটক রাখিতে ভার করে যেই জন।
সেই বিরে করৌক আজি রাত্রি জাগরন॥

মধ্য,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি॥

কান্দে [রাজা] বিভিসন।
কান্দে বির মাথে দিআ হাত।
সর্ব্ব সুন্য ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ॥১॥
সরন লইলু প্রভু বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাহি রাবন আমার বৈরি॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস অধিপতি।
মুই অধম কথা গিআ করিমু বসতি॥৩॥
তুমার চ[র]ন বিনে গতি নাহি আর।
কি ছুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থান[১]॥৪॥
দুস্ট সহদর মর রাজা লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ প্রভু হইলু দেসান্তর॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ ভথতি।
সত্রু মারি আইস প্রভু রাম রঘুপতি॥৬॥
কিত্তিবাসে বোলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসন কর অব্যাহতি॥৭॥

পদবন্ধ॥

রাম রাম ডাকি কান্দে রাজা বিভিসন।
রাক্ষসে হরিআ নিল শ্রীরাম লক্ষন॥১॥
কেমতে হরিআ নিল মনে ভাবি চায়ে।
সর্জ্জা বিচারিআ রামের কিছু নাহি পায়॥২॥
ধনুবান দেখে রামের সয়নের স্থান।
কান্দি কান্দি চলে জথা আছে হনুমান॥৩॥
বিভিসনে বোলে সুন পবননন্দন।
গড় বান্ধি বসি আছ কুন প্রয়জন॥
নিদ্রা অচেতন হইছে জত সেনাপতি।
সয়নের স্থানে না দেখীলু রঘুপতি॥
নিস্তব্ধ হইআ রাছে জত সেনাগন।
সর্জ্জাতে না দেখিলু মুই শ্রীরাম লক্ষন॥
বিভিসনের বাক্য সুনি পড়ে ব্রর্জ্জাঘাত।
হনুমান বিরে কান্দে মাথে দিআ হাত॥
সাহস করিআ মুই লঙ্গিলু সাগর।
রাখিতে নারিলু মুই রাম রঘুবর॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল হনুমানের কান্দন॥

নাচাড়ি॥

কান্দে বির হনুমান প্রভু রাম করি ধ্যান
কথা গেলা কমললচন।
কেনে বিধি হেন কৈল্য কে তুমা হরিআ নিল
না দেখীলে তেজিমু জিবন॥১॥
সর্ব্ব রাত্রি জাগরন কেনে কৈলু অকারন
কি বলিবা সুর্জ্যের নন্দন।
সুনি সব বিরগনে ভর্শ্চিবেক জনে জনে
কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে॥
লেজুড়ে বান্ধিলু গড় ত্রিভুবনে হইল ডর
সুবেলা পর্ব্বত জুড়িআ।
বাউ সঞ্চরিতে নারে পক্ষি জাইতে নাহি পারে
হেন গড়ে কে নিল হরিআ॥
কি করিমু কথা জাইমু কাতে জুক্তি জিজ্ঞাসীমু
কে মরে দিবেক উদ্দেসীয়া।
উদ্দেস না হএ জদি সুন প্রভু গুননিধি
প্রান দিমু রগ্নি প্রবেশীআ॥

(পৃ° ১৪।১—১৫।২)

নাচাড়ি॥ রাগ পঠমঞ্জরি॥

বান মারি বালি রাজ সুগ্রিবরে দিলা রাজ
সঙ্গে করি সব কপিগন।
সাগর বান্ধিলা সেতু রাবনের বধ হেতু
নিদ্রা তেজ কমললচন॥১॥

১। 'নিস্তার' হইবে।

শ্রীরাম দেখিআ কান্দে হনুমান নানা ছান্দে
বহু বহু দুক্ষ ভাবি মনে।
তুমি বিষ্ণু অবতার ত্রিভুবনে তুমি সার
বন্দি তুমি হইছ কি কারনে ॥২॥
সুর্জ্জ বংসের নাথ কেনে হেন বির্ত্তান্ত
মায়ানিদ্রা জায় কি কারন।
জর্ম্ম লভিলা হরি বধিতে দেবের বৈরি
আপনা পাসর কি কারন ॥৩॥
কবি কির্ত্তিবাসে ভনে সুন বির হনুমানে
বের্থা চিন্তা কর কি কারনে।
বসি এই সিঙ্গাসন মার অহিরাবন
উদ্ধার কর শ্রীরাম লক্ষন ॥
(পৃ' ২১।১—২)

৮২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪×৫ ইঞ্চ। পত্রসংখ্যা, ৮-৯, ১১-৪৫, ৪৭-৫০; ইহার পর কএকখানি পত্রাঙ্কহীন পাতা আছে। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—দেখি আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কা ॥
আপনার দোষে সেই মজাইল পুরি।
আমি কি বলেছি আন রামের সুন্দরি ॥
তপস্তা করিল রাবণ দশ হাজার বৎসর।
অমর হৈতে ব্রহ্মার ঠাঞি মাগে বর ॥
দুরন্ত দেখিয়া ব্রহ্মা না কৈল অমর।
মারিবারে নিজজিল নর্রি আর বানর ॥
আপনি জর্ম্মিলা বিষ্ণু দশরথের ঘরে।
কৌসল্যার গর্ব্ভে জর্ম্ম বিষ্ণু অবতারে ॥
জারে দরসন দিল অলংঘ্য শাগর।
পিষ্ট পাতিয়া নিল গাছ আর পাথর ॥
তারে বিপক্ষ দেখ সকল সংশার।
হেন কালে কিবা করিব নির্ভয় তার
দৈবের নিবন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কাপুরি ॥
সঙ্করের বচনে অভয়া কোপে জলে।
আমি রাক্ষস রাখিব দেখি কেবা মারে ॥
দেবির কোপে ত্রিভুবন টলমল করে।
এক পা লাগিল গিয়া কুম্ভির উপরে ॥
লাফ দিয়া উঠে দেবী সিংহের উপর।
মাথার মকুট লাগে গগণমণ্ডল ॥
দেবা দেবীর কোন্দল দেখিয়া দেবগণ।
তবে না মরিল আর রাক্ষসের গণ ॥
রাবণের অনুকুল হইল ভবানি।
দেবি সম্বোধিতে জায় দেব শুলোপানি ॥
দেবের আদেশে নড়ে দেব মহেস্বর।
হেন কালে আইল নারদ মুনিবর ॥
নারদ বলেন মামা কোথাকে গমন।
স্ত্রীকে জে ভজে তার ব্রথাই জিবন ॥
আপন গৌরব কেন ঘুচাবে আপনি।
এক বোলে প্রবোধিয়া আনিব ভবানি ॥
নারদ বলে কোথাকারে করিয়াছ শাজ।
কৌতুকে হাসিছে সকল দেবের সমাজ ॥
কি কারণে রামচন্দ্রে দিলে মনোস্তাপ।
সেই হেতু শিব তোমার হইতে চাহে বাপ ॥
বিনোদরের পুত্রের শুনিয়া এত বানি।
কোপ তেজি ফিরিয়া আইল কাত্যায়নি ॥
পার্ব্বতি সঙ্কর বৈসে দেবগণের পাষে।
দেবা দেবীর কোন্দল রচিল কির্ত্তিবাসে ॥

মধ্য,—

রণ জয় না হয় লক্ষণ ভাবেন মনে মনে।
হেন কালে লক্ষণের কানে কহেন পবনে ;

অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না আনিলে বধ করিবে কাহাকে॥
ইহা বলি যাত্রা কৈল অদিতিকুমার।
শুনিয়া লক্ষণ বড় ভাবিত অপার॥
হেন কালে হনুমান জোড় করিয়া হাথ।
কি কারণে মলিন মুখ রঘুবংশনাথ॥
লক্ষণ বলেন শুন বাপু পবননন্দন।
রণ জয় না হয় তেই ভাবি মনে মন॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না য়ানিলে বধ কে করে উহাকে॥
হনুমান বলে ইহা বইতো নহে আর।
অক্ষয় কবজ এনে দিব আছে আমার ভার॥
এতো যুনি হাসিলেন লক্ষণ গুণমনি।
বুকে আছে কবজ কেমনে আনিবে তুমি॥
হনুমান বলে আমি জাই মহাশয়।
আসির্ব্বাদ কর জেন কার্য্য সির্দ্ধ হয়॥
পথে জেতে হনুমান ভাবে মনে মনে।
বানর বেশে গেলে মোরে কবজ দিবে কেনে॥
নানা মায়া ধরিতে পারে পবননন্দন।
সাক্ষ্যাত হইল জেন এক ব্রর্দ্ধ ব্রাহ্মণ॥
কুস বোঝা লইল হাথে বালক পরিধান।
দির্ঘ নথ দাড়ি তপর্স্বি মুর্ত্তিমান॥
হাথে কুসের অঙ্গুরি মাথাতে চুল নাই।
নড়িভরে জাত্রা কৈল বুর্দ্ধ জে গোশাঞি॥
জেখানে অতিকা আছে রথের উপরে।
সেইখানে জাত্রা কৈল পবনকোঙরে॥

ইত্যাদি (পৃ॰ ৩৪।১)

রণ করিতে কে জাইবে ভাবে মনে মন॥
মকরাক্ষ মহাবিরে আনিল সত্তর।
মকরাক্ষ প্রণমিল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
নর বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতার শত্রু বধ করে সাধে পিতার ধার॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন।
এথনি মারিব শত্রু শ্রীরাম লক্ষণ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য॥
মন্ত্রনাতে মন্ত্রি তুমি বলে বলবান।
লঙ্কাপুরে বির নাহি তোমার সমান॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রনা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার॥
বড়ই ধাম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করিবে গোরুর উপর॥
নব নব বৎস সব রথে লএ তোলে।
রথের চৌদিগে ধেনু বান্ধে পালে পালে॥
মনরথ হয় হস্তি দুর করে সব।
রথের জোগাণ দিল চারিটা বৃষভ॥ ইত্যাদি

(পৃ॰ ৪১।১)

শেষ,—

রামের তরে বিরূপ আমি বলিব বিস্তর।
তবে জেন আমায় বধেন রাম ধনুর্দ্ধর॥
এত বলি বিরবাহু হইল আগুয়ান।
হস্তির উপরে চড়িয়া লইল ধনুর্ব্বান॥
আজি প্রাণ লইব তোর চোখ চোখ বানে।
জুর্দ্ধ না করিবে রাম ভয় পাইলে মনে॥
জত বড় বুবুর্দ্ধি তুমি তাহা আমি জানি।
স্ত্রী লইয়া অরণ্যে ভ্রমিয়া বেড়ায় তুমি॥
স্ত্রীবধ কৈলে তুমি তাড়কা মারিয়া।[১]
তোমা হেন দুরহ বেটা সর্ব্বলোকে জানে।

১। ইহার পরের পঙক্তি ছাড় হইয়াছে।

রার্য্যে না থুইল বাপে পাঠাইল বনে॥
ভরথেরে রার্য্য দিল সভা বিগুমানে।
কোন লাজে অজুধ্যায় করিবে গমনে॥
এতেক বিরূপ জদি বিরবাহু বলে।
বিস্মৃত হইয়া রাম বলেন তাহারে॥
স্তুতি করিয়া সর্ব আমায় বল যে রাক্ষস।
এখন কেনে বল বেটা বচন কর্কস॥
বিভিষণ বলে গোসাঞী না জানহ তুমি।
ইহার বিত্তান্ত গোসাঞি ভালে জানি আমি॥
বিরবাহুর জত গুণ কহিতে না পারি।
ইহা সমান সাধু লোক নাহি লঙ্কাপুরি॥
রাম বলেন বিভিষণ সুনহ বচন।
জুর্দ্ধ করিতে চাহে বির কি করি এখন॥
বিভিষণ বলে গোসাঞি সকল জানি আমি।
ইহার উত্তর শ্রীরাম কি বলিব আমি॥
সন্মুখ হইয়া জেবা জুর্দ্ধ কতে চায়।
তারে জুর্দ্ধ নাহি দিলে বড় দোস হয়॥
(পৃ০ ৫০।২)

৮৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৮-১৩৩, ১৩৯-১৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২-১৩ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

—সারথী জোগায় ততক্ষন॥
কনকে রচিত রথ মানিকের চাকা।
রথের চতুর্দ্দিগে সোভে ধ্বজ পতকা॥
সোনার মানুসের মুণ্ড চিহ্ন রথের ধ্বজে।
চারি ভিতে পুষ্পের মালা সোনার ঘণ্টা বাজে॥
রথের উপর চড়ে রাবন ধনুকে দিয়া চড়া।
পবনবেগে সারথি চালাইয়া দিল ঘোড়া॥
রনে প্রবেস করিল রাবন দস কন্দে।
দষ পাঁচ বানে রাবন সেনাপতি বিন্দে॥
গন্ধমাদন সেনাপতি বানরে বাখানে।
তারে বৈমুখ করিল আঠার গোটা বানে॥
পাঁচাইষ বানে ফুটিল কুমুদ মহাবির।
আসি বানে ফুটিল জাম্বুবানের শরির॥
ইন্দ্রগাল দধিগাল বিন্ধিল সর্ব্বরি বানে।
দুই হাজার বানে সুগ্রিব বিন্ধিল রাবনে॥
আসি বানে ফুটিল কুমার অঙ্গদ।
একটী বানে নল বির হইল নিসব্দ॥
জুগান্তরের অগ্নি জেন সংসার জে পোড়ে।
রাবন দেখিয়া বানর কটক পলায় উভরড়ে॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা ত রাবনে।
মিথ্যা রনে কার্য্য নাহি বানরের সনে॥
রথ চালাইয়া দেহ রাম লক্ষনের কাছে।
রাম লক্ষন মারিয়া বানর মারিব পাছে॥
রাবনের আজ্ঞা পাইয়া সারথি সাবধান।
রথ চালাইয়া গেল রামের বিগুমান॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥

সোনার কলস চারি কোনে রন জাঠি মাঝখানে
চারি ভিতে সোনার আকড়া।
রথের অশ্টখান চাকা সোনাখান লাগে ঢাকা
বাউ বেগে চলে অশ্ট ঘোড়া॥
জখন করয়ে রাগ কেহ নাহি পায় লাগ
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িআলি।
স্বর্গ হইতে আইল রথ আগু ছাইল দেবপথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজুলি॥
রথ আইল রনমাঝে সত সহস্র ঘণ্টা বাজে
বাজে নানা দেবের বাজন।
নানা রত্ন চারি ভিত রথ আইল আচম্বিত
চমকিত হইলা বানরগন॥

ইন্দ্রের মাতুলি রথে সোনার আকড়া হাথে
নানা অলঙ্কারে [বি] ভূসিত।
চড়িয়া ত দিব্য রথে রহিল রামের অগ্রেতে
সুন রাম জগতপুজিত॥
রাবন রথে তুমি খিতি দেখিয়া [ত] সুরপতি
রথ পাঠাইল তরাতরি।
লাফ দিয়া রথে চড় রাবন রাজা কাট মার
বিষ্ময় কেন করহ মুরারি॥
সোনার টোপর অভরন গায় পরিয়া কর রন
ইন্দ্রের লহ ত ধনুক বান।
মাতুলিনামে আমি জানি সর্ব্বলোকে সভে চিনি
কেন গোঁসাঞি মনে চিন্ত আন॥
রাম বলেন বিভিসন মোর বাক্যে দেহ মন
কার রথ দেখি ত আকাসে।
বিভিসন বলে জানি আমি ইন্দ্রের রথ চড় তুমি
নাচাড়ি [রচি] লা কির্ত্তিবা[সে]স ॥০॥
(পৃ° ১২৯।১)

সুবর্ন্নের পিঁড়িতে বসিলা চারি জন।
সোনার থালে অর্ন্ন সিতা করেন পরিসন॥
শ্রীরামেরে অর্ন্ন দিলা সুবর্ন্নের থালে।
তবে অর্ন্ন দিলা সিতা ভরথের কোলে॥
রামের বামে বসিয়াছিলেন ঠাকুর লক্ষন।
সোনার থালে অর্ন্ন দিয়া সিতার গমন॥
ভরথের ডাহিনে বস্যাছেন শত্রুঘন।
সোনার থালে অর্ন্ন সিতা করেন পরিসন॥
নারায়ন বলিয়া অর্ন্ন কৈলা নিবেদন।
হরসিতে চারি ভাই করেন ভোজন॥
জেঞি মাত্র অর্ন্ন দিলা লক্ষনের কোলে।
হেঁটমাথা করিয়া লক্ষন রহেন ভূমিতলে॥
আকস্মাৎ হাঁসিয়া উঠিলেন লক্ষন।
থাল আছাড়িয়া সিতা করেন গমন॥
মাথায় ঘা মারেন সিতা করেন ক্রন্দন।
আমারে দেখীয়া কেন হাঁসিলা লক্ষন॥
কোন অপরাধ করিলাম দেওরের স্থানে।
আমারে দেখিয়া লক্ষন হাঁসিলেন কেনে॥
কপালে ঘা মারেন সিতা কান্দেন উত্তরোলে।
হাঁসিয়া লক্ষন হেঁট মাথা করেন ভূমিতলে॥
রাম বলেন সুন বলি ভাই রে লক্ষন।
ইহার বৃত্তান্ত ভাই কহ বিবরন॥
লক্ষন বলেন প্রভু কর অবধান।
তোমার আগে মিথ্যা কহিব কভু নহে আন॥
চৌর্দ্দ বৎসর বোনেতে ছিলাম তিন জন।
দেসে দেসে তিন জন করিলাম ভ্রমন॥
তপস্বি হইয়া ঠাকুরানি ফিরিলা বোনে বোন।
লক্ষির দুঃখ দেখিয়া অধিক পোড়ে মন॥
অর্ন্ন বেঞ্জন আমার আনিঞা দিলেন কোলে।
সেই দুঃখ খণ্ডরিয়া চাহিলাম ভূমিতলে॥
সুবেষ দেখিলাম আজি সিতা ঠাকুরানি।
বোনবাসের দুঃখ খণ্ডরিয়া হাঁসিলাম আপনি॥
সিতা ঠাকুরানির দুঃখে আমার উঠিল আগুনি
হেন হরিসে বিসাদ ক্রন্দন করেন কেনি॥
এই কথা সত্য গোঁসাঞি আর কথা নহে।
সিতার দুঃখের কথা লক্ষন রামের আগে কহে॥
কহিতে কহিতে লক্ষনের লোহে ভরে আঁখি।
সুনিঞা লক্ষনের কথা রাম হইলা সুখি॥
ভোজন করিতে নিদ্রা হইল অধিষ্টান।
কথা কহিতে কহিতে লক্ষনের হরিল গেয়ান॥
শ্রীরাম বলেন সিতা না কর ক্রন্দন।
তোমার দুঃখ খণ্ডরিয়া বিসাদ লক্ষন॥
রাজমহিসি হইলে তুমি পরম সুবেসে।
লক্ষির লক্ষ্যন দেখিয়া লক্ষন ভাই হাঁসে॥
এত সুনি সিতাদেবি পৃত হইলা মন।
আকস্মাৎ হাঁসিলা লক্ষন এই সে কারন॥
(পৃ° ১৪৭।২-১৪৮।১)

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাদেবী-প্রদত্ত হার-ছিন্নের উপাখ্যান নাই।

শেষ,—

সুগ্রীব রাজা দেখিয়া রামের হাস্য জে বদন।
হাথ পসারিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন ॥
আমার কারনে মিতা বড় পাইলে দুঃখ।
আর বার দেখাইয় তবে পাইব সুখ ॥
বিভিসন দেখিয়া রাম করেন আদর।
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর ॥
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চজন।
পাঁচ ভাই একে ঠাঞী করিব পৃওজন ॥
নানা ভোগ ভুঞ্জে ঠাট পাইয়া আদর।
দুই মাষ ছিল জক্ষ্য রাক্ষষ বানর ॥
গোহা আসিয়া শ্রীরামেরে নোঙাইল মাথা।
উঠিয়া কোল দিলা রাম এ নহে অন্যথা ॥
নানা রত্নে গোহারে রাম করিলা ভূসিত।
রঘুনাথের দান পাইয়া গোহা হরসিত ॥
গোহা বলে রঘুনাথ সুন নিবেদন।
পুর্ব্ব জনমে আমি ছিলাম ব্রাহ্মন ॥
লমুস মুনি নাম ছিল পুর্ব্ব জনমে।
ভর্গব মুনির কমুণ্ডুল চুরি করি……॥

(পৃঃ ১৫১।২)

৮৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—২৮।১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীহট্ট।

আরম্ভ,—

দেখিতে সুন্দর জেন চলিছে তিমির ॥
রথখান সাজাইআ নিলেক সারথি।
সেই রথে চড়িলেক বির মহারথি ॥
চলিবার কালে মনে হইল স্মরন।
মাওঁ সম্মাসিআ রনে করিমু গমন ॥
শ্রীরাম সহিতে জুর্দ্ধ বড়ই বিসম।
লক্ষনে জানিএ তার বড় পরাক্রম ॥
বিসেষে রামের হাতে জদি আজি মরি।
দিব্য রথে চড়ি জাইমু বৈকুণ্ঠ নগরি ॥
এতেকে জানিএ আমি জিবন সাফল।
সমরে পড়িলে হৈব দেহার সাফল ॥
এতো ভাবি চলে বির মাএর মন্দিরে।
সারথিএ রথ লৈআ গেল অন্তস্পুরে ॥
মাএর নিকটে গিয়া রাবননন্দন।
ভক্তি করি মাএর চরন করিল মর্দ্দন ॥
হস্থ জুড় করি বিরে লাগে বুলিবারে।
বাপে আজ্ঞা করিআছে জাইতে সমরে ॥
আসির্ব্বাদ কর মাওঁ জুর্দ্ধে জাই আমি।
শ্রীরাম লক্ষন জেন আজি দিনে জিনি ॥
হেন আসির্ব্বাদ মাওঁ দিবা থ আমারে।
এহি নিমিত্য আসিআছি তুমার গোচরে ॥
পুত্রের বচন সুনি হৈমাবতি নারি।
গলাতে ধরিআ কান্দে পুত্র পুত্র বোলি ॥
কার বুলে জাও পুত্র জুর্দ্ধের সাদে।
সব বির ক্ষেয় হইল শ্রীরামের বাদে ॥
জুর্দ্ধে না জাইও পুত্র জুর্দ্ধ কর ক্ষেমা।
শ্রীরামের জুর্দ্ধ সুনি পাসরি আপনা ॥
বির ক্ষেয় দেখি মর নিতি পুড়ে [মন]।
বির সবের নারি কান্দে প্রতি জনে জন ॥
তর বাপ রাজা হৈআ ধর্ম্মে নাহি মতি।
বিনে দুসে হরিলেক রামের জুবতি ॥
কবাট দিআ তুমি পুত্র থৈমু নিআ ঘরে।
কি করিতে পারে রাবন থাকিআ বাহিরে ॥

আপনার প্রান রাখ প্রান বড় ধন।
শ্রীরামের জুর্দ্ধে তুমি না কর গমন॥
না জাহ না জাহ পুত্র দারুন সমরে।
জেই রনে জায় সেই ফিরি না আইসে ঘরে॥
(পৃ° ৩১।-৪১।)

মধ্য,—

নাচাড়ি রাগ পঠমঞ্জরি॥
তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ নিবেদন করু সাক্ষাত
তুমি কিত্তি বোলে সর্ব্ব জনে।
তুমি দেব হরি হর আমি জাতি নিসাচর
তারে আমি নইলু সর [ে]ন॥ ১॥
বানি কমলাপতি ত্রিদেসের অধিপতি
তুমা ভাবে দেব পুরন্দরে।
আমি ছারে কিবা জানি আপনে বৈকুণ্ঠমনি
তুমা গুন কে কহি [ে]ত পারে॥২॥
তুমি রাম রঘুবর ত্রিলক্ষের ইশ্বর
জৈজ্ঞ বর মকে দিবা দান।
তুমি রঘুর কুমর বিরবাহু নাম মর
সুন প্রভু করু নিবেদন॥ ৩॥
তুমি ত্রিলক্ষের সার তুমি পরে নাহি আর
মুক্তি দান দিবাথ আমারে।
পতিত নিস্থার হেতু তুমা নাম হইল সেতু
ভব ভএ পার কর মরে॥৪॥
কহে কবি কিত্তিবাস রামের চরনে আস
এবে সুনি রাম[র] বিভুল।
করি উর্দ্ধ দুই হাত পুলকিত রঘুনাথ
রাক্ষস ধরিআ দিলা কুল॥
(পৃ° ১২১২-১৩১২)

শেষ,—

মাও মোর হেমোবতি হয় বড় সতি।
একমনে পুজা করে সঙ্কর পার্ব্বতি॥
তাহান কৃপা আছে আমার সরিরে।
সেই কারনে বান না ফুটে অঙ্গেতে॥
অক্ষয় কবচ আছে আমার সরিরে॥
সেই হেতু বান সব না ফুটে সরিরে॥
কবচের ছিদ্রে চাইআ হান বানগন।
তবে সে মিত্যু হৈব দৈবের লিখন॥
পসুপতি বান মারি ধরিবাথ[১] আমারে।
বির ছিদ্র সব কথা কহিলু তুমারে॥
(পৃ° ২৮।১)

৮৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৮, ২৪-২৭,৩০-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

প্রথম দুইখানি পাতা আদিকাণ্ডের, উহাতে সগরবংশ ধ্বংস হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

সর্গ মত্ত দেখিলে তবে দেখিবে পাতালে॥
প্রীথিবির কম্মকার য়ানে নৃপবর।
চারি ক্রোস করি কৈল কোদালি পরিসর॥
এমন কোদালি ধরে সাগরকুমার।
মেদনি কুঁড়িয়া চলে বলে মার মার॥
কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া তারা করিল সাগর।
কুঁড়িতে কুঁড়িতে গেল পাতাল ভিতর॥
একাদসি তিথি আর ব্রহস্পতিবার।
স্রবনা নক্ষত্র য়াইল কপিলের দ্যার॥
দুরে থাকিয়া তারা সর্ব্বত্রেতে চাই।
কপিলের সমুখে ঘোড়া দেখিবারে পাই॥
ভাই ভাই দেখায় তারা দিয়া হাতসান।
ঘোড়া চুরি করি মুনি করিচে ধেয়ান॥

১। 'বধিবাথ' হইবে।

সব সহদর তারা দিয়া এক সায়।
মারিল কোদালি বাড়ি মনির মাথায় ॥
এক বাড়িতে মনির ধ্যান নাহি নড়ে।
পুনুর্ব্বার মাইণ্য বাড়ি মনিরাজের ঘাড়ে ॥
ক্রধ করি চাহিলেন কপিল মহারিসি।
সাটি সহস্রেক ভাই হইল ভস্মরাসি ॥
দুতে য়াসি সমাচার কহিল রাজারে।
তবু জজ্ঞ করিছে সাগর নৃপবরে ॥
য়সুমঞ্জা পুত্রে বনবাস দিয়াছিল।
দুত পাঠাইয়া রাজা তারে য়ানাইল ॥
ঘোড়া য়ানিবারে তারে পাঠায় রাজন।
জাইয়া সে মনির সেবায় দিল মন ॥
মানাতে মারিল মনি সাগরকুমার।
দুতে য়াসি রাজারে কহিল সমাচার ॥
তবু যজ্ঞ না ছাড়িল সাগর নৃপতি।
ডাক দিয়া য়ানিলেক য়ংসুমান নাতি ॥
রাজা বলে য়ংসুমান জাহত চলিয়া।
কপিলের স্থানে বাছা ঘোড়া য়ান গিয়া ॥
য়ংসুমান গিয়া মনির সেবায় দিল মন।
সেবায় হইল তুষ্ট কপিল তথন ॥
জানিলাম তুমি বট সাগরের নাতি।
তুষ্ট হইলাম তোমার দেখিয়া ভকতি ॥
য়ংসুমানে মনিরাজ ঘোড়া দিল দান।
রাজারে লইয়া ঘোড়া দিল য়ংসুমান ॥
জজ্ঞে পুন দিলেন সাগর নরপতি।
ভাগ করি নিলেন য়দ্ধেক য়মরাবতি ॥
য়জধ্যায় য়ংসুমান হইল্যা নৃপতি।
দুই নারি বিভা কৈল্য পরম জুবতি ॥
তা সভারে লয়্যা রাজা থাকেন কৌতুকে।
য়ংসুমান রাজা জে মরিল য়পুত্রকে ॥
য়রাজক হইল রাজ্য য়জধ্যা ভবন।
জার জেবা মনে লয় করে সেই জন ॥
জেষ্ট ভাই না মানে না মানে বাপ মা।
বধু হয়্যা সাসুড়িকে তুলে দেখায় পা ॥
ডাকা চুরি করে রাজ্যে করে বলাবল।
সিষ্টের বিনাস হয় দুষ্টের প্রবল ॥
এমন হইল রার্জ্য য়জধ্যানগরে।
এমন কেহ নাহি জে বুঝিয়া শাস্তি করে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
শ্রীরামপিরিতে হরি বল সব্ব জন ॥ * ॥
সাটী সহস্র য়ার য়ংসুমানের নারি।
একত্র হইয়া স্নান করিবারে নড়ি ॥
সিব য়ার দুর্গা জাএন সুন্য পথে।
বিধবা দেখিয়া দুর্গা লাগিলা কহিতে ॥
গৌরি কহেন সুন সুন মহেস ঠাকুর।
সকল বিধবা কেন দেখিয়া প্রচুর ॥
দুর্গারে কহেন তবে মহাদেব হাসি।
কপিলের সাঁপে পতি হইল ভস্যরাসি ॥
দেবি বলে সুর্জ্যবংসে নাহিক রাজন।
তোমায় য়ামার পুজা করিবে কোন জন ॥
দেবি বলে সভাকারে দেহ পুত্র বর।
বিধবার কি পুত্র হয় কহে মহেশ্বর ॥
দেবি বলে পুত্র হয় স্বামি সম্ভাসনে।
তবে তোমার পুত্রদাতা বল কোন জনে ॥
মরে রাজ্য ক[রি তবে] দেব ত্রিলোচন।
সভাকার পুত্র হয় দেখুক সব্বজন ॥
পাব্বতির বচনে সিবের মহালজ্জা।
এক পুত্র দোহার হব বলে মহাতেজা ॥
কামদেবে মহাদেব য়ানিলা ডাকিয়া।
য়ংসুমানের ধরি য়ঙ্গে তুমি বৈস গিয়া ॥
পঞ্চ স্বরে গিয়া বাজে দু নারির গায়।
সভামাজে দুই নারি মহালজ্জা পায় ॥
স্নান করি ভোজন সয়ন য়বসেসে।
একত্রে সয়ন দোঁহে করিলেন হরিসে ॥

য়লস উদ্দিসে দোঁহে রতিরঙ্গবতি।
য়ংমুমানের ছোট নারি হল্য গর্ব্ভবতি॥
(পৃ° ১৭।১-২)

মধ্য,—

রথে চড়িয়া য়াইল রাক্ষস বিদ্যুতমালি।
মদিরা মাংস খাইয়া আইল মহাবলি॥
হনুমান দেখিয়া বান জুড়িল ধনুকে।
তিন লক্ষ্য বান মারে হনুমানের বুকে॥
বান খাইয়া হনুমান তিলেক নাহি বেথে।
লাক দিয়া পড়ে গিয়া বিদ্যুতমালির রথে॥
রথে চড়ি বিদ্যুতমালির ধরিলেক চুলে।
হাথেতে ধরিয়া টেন্যা ফেলে ভুমিতলে॥
পাক দুই তিন দিয়া মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর্ন হইল হাড়॥
পড়িল বিদ্যুতমালি কটকে তরাস।
ভয়ে হনুমানের কেহো নাহি জায় পাস॥
(পৃ° ২৪।১)

শেষ,—

নাগপাসে রঘুনাথ হইলা কাতর।
বুদ্ধি বল হারাইল সকল বানর॥
তথা গিয়া কহ তুমি রঘুনাথের স্থানে।
গরুড় পক্ষ্য হাকারিতে কহ রামের কানে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিষ্ণুর ধরে তেজ।
নাগপাস মুক্ত করিতে সেই রামের বেজ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পাইয়া নড়ে দেবতা পবন।
রামের কানে গরুড় গরুড় করাল্য স্বরণ॥
আপনা পাসরি রাম সহেন জাতন।
আপনার বাহন গরুড় করহ স্বরণ॥
রাম য়ার পবনে দুই জনে কানাকানি।
গরুড় স্বরিতে রাম হইল সাবধানি॥
গরুড় স্বোঙরেন রাম বিষ্ণু অবতার।
গড়ুরের লবাটে গিয়া পড়িল টক্কার॥

জম্বুদিপের পারে গরুড় কুসদিপে চরে।
গিলেছিল অজাগর উগরিয়া পেলে॥
আইল জে পক্ষ্যরাজ গগনে করিয়া উড়া।
পাকসাটে উড়িয়া পড়ে পর্ব্বতের চুড়া॥
দিগদিগান্তরের পাথর ভাঙ্গে পাখের টানে।
মার মার সব্দ জেন পড়িছে ঝগ্রনে॥
আকাসে উঠিয়া লাগে সুনি মড়মড়ি।
পাক ঠেকিয়া গাছ পড়ে সুনি চড়চড়ি॥
দস জোজন থাকিতে লাগে গরুড়ের হাই।
গলার বন্দন এড়িয়া সাপ মাথা তুল্যা চাই॥
নিকটেতে জেই আইল গরুড়ের নিস্বাস।
রাম লক্ষনের ঘুচে বন্দন নাগপাস॥

৮৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
আগে বন্দো অজোধ্যা পশ্চাতে নন্দিগ্রাম।
তবেত বন্দিলাম প্রভু রামের জর্ম্মস্থান॥
তবেত বন্দিলাম মুঞি বাল্মিকের চরন;
জেই মুনি করিলেন গিত রামায়ন॥
ফুলিয়া সমাজে বন্দোম পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
জাহা হইতে হইল গিত রামায়ন প্রকাষ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কন্ঠে কেলি করেন দেবি স্বরেস্বতি॥
তবেত বন্দিলাম মুঞি গঙ্গা ভাগিরথি।
জাহা দরসনে লোক পায় ত মুকতি॥
সুর্য্যবংস আদি বন্দো দসরথ রাজা।
দেবলোকে নরলোকে কৈল জার পুজা॥

কৌসুল্যা কৈকই বন্দো সুমিত্রা সুন্দরি।
ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো রামের আজ্ঞাকারি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দিলাম পুরন্দর।
কুবের বরুন বন্দো জোড় করি কর॥
সুগ্রিব অঙ্গদ [বন্দো আর] জাম্বুবান।
শ্রীরামের কটকে বন্দো বির হনুমান॥
আইস বাপু হনুমান পবননন্দন।
আসরে আসিয়া সুন গিত রামায়ন॥
জতক্ষন আসরে শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ জদি শ্রীরামের দোহাই॥
ঋসি মুনি তপস্বি বন্দো জত স্বর্গবাসি।
গয়া গঙ্গা গোদাবৈরি তির্থ বারানসি॥
শ্রীহরিদ্বারিকা বন্দো মথুরা বৃন্দাবন।
গকুল পৈরাগ কাসি শ্রীপুরু[স]র্ত্তম॥
গনপতি আদি বন্দোম দেবিত পার্ব্বতি।
সিতা লক্ষি বন্দিলাম ভবে স্বরেস্বতি॥
সর্ব্বদেবগন বন্দো সর্ব্বদেবিগন।
শ্রষ্টি স্থিতি বিনাসে জেবা করেন পালন॥
অন্ত্রের গুরু বন্দিলাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের চরন।
জাহা হইতে অধ্যায় করিলাম গিত রামায়ন॥
জর্ম্মদাতা জনক জননি খোলা দাই।
ভারথ ভিতরে বন্দো জায়গর নাঞি॥
বিপ্রের চরন বন্দো করি পরিহার।
জগাই মাধাই বন্দো বৈষ্ণবের সার॥
বন্দিলাম জতেক দেব করিয়া প্রনতি।
নায়েকের উন্নতি বাড়াই রঘুপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত জর্ম্মিল সুবক্ষনে।
জাহার প্রসাদে লোক রামায়ন সুনে॥

শেষ,—

উত্তর দুয়ারে কারে না জায় প্রভিত।
আপনি রহিল রাজা চাহিয়া উর্দ্ধর ভিত॥
সাগরের পার আছে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বাহিয়া পলাইবে সকল বানর॥
ছত্তিষ কুটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়্যা।
আপনি রহিল রাজা উর্দ্ধর ভিত চায়্যা॥
ঐসদ আনিতে থুইল বির হনুমান।
বুর্দ্ধি বলিতে থুইল মন্ত্রি জাম্বুবান॥
প্রহরি করিয়া থুইল রাক্ষস বিভিসন।
চারি দুয়ারে আপনি রাজা বেড়ায় ঘনে ঘন॥
জে দুয়ারে দেখে ঠাট বলেতে টুটন।
দুনা করিয়া দেয় তারে তিন গুন ভিড়ন॥
চারি দুয়ারের বানর কটক জুড়িলে আওয়াষ।
চারি দুয়ারের পাঁচালি রচিলা কিৰ্ত্তিবাস॥

৮৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৭-২৮, ৩৬-৩৮, ৪৭-৪৯। প্রতি পত্রে ৯-১১পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাক্ষস জাতি নিসাচর না চিন আপন পর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
রাম অভিকার করি রাজ্য দিবেন মন্দদরি
বিভিসন লঙ্কায় পুজিত॥
সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
ভজ গিয়া রামের চরন।
আপনি দোলা কান্ধে করি দেয়গা রামের সুন্দরি
তবে তোর রহিবে জিবন॥
হেন মোর করে মন তোর সনে করি রন
ক্রোধ করিবেন কোমললোচন।
রামচন্দ্রের অভিকার তোরে করিবেন সংহার
ব্যর্থ [না] হবে রামের বচন॥

সুনিঞা অঙ্গদের বানি পাত্র মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বসি অতি ধিরে ধিরে কার্য্য চিন্তে বিরে বিরে
কিত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার॥

শেষ,—

লক্ষন বলেন রাম তোমার জুর্দ্ধ থাকুক।
মারিব রাবন বৈসে দেখহ কৌতুক॥
রাম বলেন লক্ষন তুমি জে ছাওয়ালমতি।
রাবনের সঙ্গে জুর্দ্ধ না হয় জুগতি॥
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
হেন জনার সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সাহস॥
তমু আগুসরেন লক্ষন পুরিয়া সন্ধান।
হেন কালে লক্ষনেরে বলেন হনুমান॥
জোড়হাথে বলে……পবননন্দন।
সেবক থাকিতে ঠাকুর করিবেন রন॥
লক্ষনের পদধুলি লইলেন মাথে।
[লাফ দিয়া] উঠিলেন রাবনের রথে॥
সম্মুখে ডাড়ায় বির পরমসন্ধানি।
সারথির লইল কাড়ি হাথের পাচুনি॥
ত্রিভুবন জিনিলে বেটা পাইয়া কার বর।
এক চাপড়ে জে পাঠাব জে জমঘর॥
রাবন বলিছে অরে বির হনুমান।
জত সক্তি থাকে তোর তত সক্তি হান॥
হনু বলে আমার বল বুঝিবে এখন।
পুর্ব্বে চড় মারিলাম নাইক স্মরন॥
অক্ষয় কুমার মার্য্যা পোড়াইলাম সোকে।
সে সোক রাবন তোর আজ্য আছে বুকে॥

৮৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪¾। পত্র, ৬—৯, ১১—১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

কুপিল হনুমান রাক্ষস নেহালে।
হনুমানের বিক্রম দেখিয়া মহি পালায় ডরে॥
হাথে গণ্ডিবানে ধাঞা আইসে রাজা বিভিসন।
সাবধানে রাখিহ দ্বার পবননন্দন॥
জয় জয় করিয়া চলিল বানরগন।
বসিষ্ঠ বামদেবরূপে দিল দরসন॥
দ্বার ছাড় হনুমান দেখিব শ্রীরাম।
বংসের পুরোহিত আমরা করিব কল্যান॥
হনুমান বলে কিসের মায়া আমার সন্নিধানে।
নিকট আইলে এক মুটুকিতে লইব পরানে॥
হেন কালে জয়ধ্বনি দিল বিভিসন।
ডরাইলা মহি তখন হইল অদর্সন॥
আগে পাছে দিয়টী জলে বানর সব জাগে।
পাছে বানর সব জায় বিভিসন আগে॥
হনুমান জাগাইয়া চলিলা বিভিসন।
জনকরূপে আসিয়া মহি দিল দরসন॥
মিথিলা তেজিয়া আইলাঙ সুন হনুমান।
তুমি দ্বার ছাড়িয়া দিলে দেখিব শ্রীরাম॥
অনেক দিবস দেখি নাই কমললোচন।
তোমার প্রসাদে বাপা করিব সম্ভাসন॥
হনুমান বলে এত দিন তুমি ছিল্যা কোথা।
অসোকবন ভিতরে আগে দেখ গিয়া সিতা॥
আমার ঠাঞি কিসের মায়া সব করিব চুর।
বিভিসন আইলা মহি পালাইলা দুর॥
বিভিসন আড় হইলে মহি দেই দেখা।
ভরথ সত্রুঘনরূপে তবে দিল দেখা॥
রাম আন তাহারে দেখিব পবননন্দন।
একদৃষ্টে চাহে বির শুনে মনে মন॥

অশ্রুমুখে কান্দে ভরথ সুন হনুমান।
রাম লক্ষ্মন দেখাহ বাছা রাখহ পরান॥
হনুমান বলে খানেক থাক আপুন বিভিসন।
এখন দেখাব তোমাকে কমললোচন॥
জয় জয় করিয়া বানর কটক আইসে।
দেখিয়া মহি তবে পালাইল তরাসে॥
হনুমান বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
না জানি মায়া করিয়া আইসে কোন জন॥
তুমি আদেখ হইলে আমারে দেই দেখা।
বিভিসন বলে দ্বার ছাড়িলে প্রভুর নাহিক রক্ষা॥
সাবধানে থাকিহ পবননন্দন।
হাথে গণ্ডিবানে চলিলা রাক্ষস বিভিসন॥

মধ্য,—

আনন্দিতে মহি পুজিল উগ্রচণ্ডা।
ছাগল মহিস ধরে কেহ আনে খাণ্ডা॥
অন্ত[ঃ]পুরের বাহির হইল সপ্তেক দাসী।
কাখে করিআছে সোনার সহস্র কলসি॥
বিচিত্র হার পরে সোনার হার কেজুর।
খুদ্র ঘন্টি কাছে কেহো পাএ নপুর॥
সিন্দুর কজ্জল সব আর উল্লসিত।
তুতার গুন শ্বরে কেহ ঝুমুরি গাএ গীত॥
গড়ের বাহির হয়্যা গেলা সরোবরে।
দেখিল মর্কট এক অশ্বত উপরে॥
কাখে কলসি সব মর্কট দেখে ঘাটে।
হাসিয়া গেলেন সভে মর্কটের নিকটে॥
একদৃষ্টে সভে মর্কট নেহালে।
ভাবুকি মারিয়া হনুমান বুলে ডালে ডালে॥
সভে বলে মহি আনিঞাছে রাজার নন্দন।
অশ্বিনিকুমার দেবরাজ নারায়ন॥
তাহা সভার মা কেমনে প্রান ধরে।
দুটী মনুস্য আনিয়াছে রাজা হানিবার তরে॥

আর আশ্চর্য্য দেখ গাছের ডালে।
হেন অপরূপ বানর না দেখি কোন কালে
দুই আশ্চর্য্য আমরা দেখিল এতদিনে।
গাছের ডালে হনুমান এসব কথা সুনে॥
সুনিঞা হরিস হইলা পবননন্দন।
সেই দুই জন বটেন শ্রীরাম লক্ষ্মন॥
হরিসে স্ত্রি সব মর্কট নেহালে।
অনেক কালের বুড়ি আইল হেন বেলে॥
বানর দেখিয়া বুড়িকে লাগীল তরাস।
কি সুখে হরিস হয় আজি রার্য্য হব নাস॥
বানর নহে দেখ অই সাক্ষাত জম।
কে সহিবে অই মর্কটের বিক্রম॥
মনুস্য বানরে এখন দেখ বিসম্বাদ।
আজি অবস্য রার্য্য পড়িব প্রমাদ॥
পুর্ব্বকথা তোমরা সুন হয়্যা সাবধান।
কিত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড করিল বাখান॥

(পৃ০ ৯১২)

৮৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৩—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত

আরম্ভ,—

রাবণের চরে তুমি হও আমার চর।
ভাগ্যমতে দেখুক পুন না করিহ ডর॥
বিভিষণে রাজ্য দিব কনক লঙ্কাপুরি।
রাণি করে দিব তার স্ত্রি মন্দোদরি॥
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর।
রাবণ রাজা ভেট গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
নড়িতে চলিতে নারে ফিরাইতে পাষ।
রাজার আগে বাত্রা কহে ঘন বহে শ্বাষ॥

রাজার আগে দুই চর সুঞাইল মাথা।
জে দেখিল যে যুনিল কটকের কথা॥
রামের কটকে রাজা আগুলিল বাট।
ধরিয়া সকল বিরে বলে মার কাট॥
বিভীষণ বান্ধিয়া নিল কাটীবার মনে।
বৈইরিহাথে মরে জিলাম শ্রীরামের গুনে॥
রাম লক্ষন যুগ্রিব রাক্ষষ বিভিসন।
দেব অবতার রাজ এই চারিজন॥
কটকের কাজ্য আছে এই চারি জনে।
লঙ্কা জিনিতে পারে হেন লয় মনে॥
মানুসের চুড়ামুনি শ্রীরাম লক্ষন।
রাক্ষসের চুড়ামুনি ধাম্মিক বিভিষন॥
জত বানর আসিয়াছে গাছের নাই পাতা।
একা রাম লক্ষনে জিনিব অন্থের কি কথা॥
ত্রিভুবনে স্বহায় হয় অষ্ট লোকপাল।
তবু রাম জিনিতে নারিবে বিক্রমে বিসাল॥
দস জোজন সেতবন্ধ আড়েতে প্রসর।
দির্ঘে সতক জোজন ভাসে গাচ পাথর॥
উত্তর কুলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিন কুলে।
পার হইয়া লঙ্কায় গড় বেড়িল বানরে॥
কাল কাল বানর জেন মেঘ অন্ধকার।
দেখিয়া ডরাইল দেহ পর্ব্বত আকার॥
গৌর বরন্ন বানর সব জেন হরিতাল।
দেখিতে যুন্দর রূপ বিক্রমে বিসাল॥
সেত রক্ত নিল পিত দেখিতে কৌতুক।
রনে পসিলে বিপক্ষের কেড়ে খায় বুক॥
স্যাম বরন্ন বানর সব জেন পক্ষ সুয়া।
উড়িতে প্রিবিন জেন কাঁকলাসি গুয়া॥
এক চাপে বানর লেগেছে পিষ্টে পিষ্টে।
য়োর নাই পাই রাজা জত দেখি দিষ্টে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের সুরস পাচালি।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত প্রথম সিকলি॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়া রাজা রাজকার্য্য চিন্তে।
বানরের সিংহনাদ উঠে আচম্বিতে॥
সিংহনাদ সুনিয়া কাঁপিল লঙ্কাপুরি।
হ্বিদয়ে কম্পিত রাজা মুখে দম্ভ করি॥
বানরের মাংসে উদর ভরিবে রাক্ষস।
রাম লক্ষন মারিলে সংসারে ভরে জস॥
রাবন বড়াক্রি করে রাক্ষসে না বাসে।
বানরের প্রতাপে অন্তরে প্রাণ সুসে॥
পুত্রে দুখ দেখিয়া মাএর মনে চিন্তা।
কাল হয়া লঙ্কার ভিতর সামাইল সিতা॥
নিকসা নাম ধরে সেই রাবণের মা বুড়ি।
পুত্রকে বুঝাতে হিত জায় গুড়ি গুড়ি॥
সভাকে অধিক পুড়ে মাএর পরান।
লাজ ভয় ছাড়িয়া কহি তোমার বিদ্দমান॥
কার বোল নাহি সুন গর্ব্ব অহঙ্কারে।
তেঁই ভাল মন্দ কেহ নাহি কহে ডরে॥
মানুসি বটএ সিতা নহে বিদ্ধাধরি।
সিতা হেনো কত আছে পরমসুন্দরি॥
দৈবে বিমুখ বাপু দেখি বিপরিত।
এত স্ত্রী থাকিতে সিতাএ মজে চিত॥
ধন জন নষ্ট কর সকল রাষ্যখণ্ড।
কোণ্ডর ভাগ বহাইবে রণের প্রচণ্ড॥
জটা ধরে বাকল পরে ফিরে বনে ডালে।
কত ধোন পাবে বাপু রামেরে জিনিলে॥
লঙ্কা পুড়ে রাক্ষস মারে বির হনুমান।
হেন কত জনা আছে তাহার সমান॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারিল এক কাঁড়ে।
হেন রাম আসি বাপু লঙ্কাপুরি বেড়ে॥
একেশ্বর ছিল এবে কটক বিস্তর।
কোথা হৈতে আসি মেলে এতেক বানর॥
রামের বিক্রমের কেহ ওর নাহি পায়।

ইহা বুঝি বিভিসন তার পাসে জায় ॥
বিভিসন তোমায় ঘরের জানে সন্ধি।
লঙ্কা বিনাসিতে সেই রামে দিল বুদ্ধি॥
রামের গুনে বন্দি হইল বোনের বানর
তোমার গুনে ঘর ছাড়ে ভাই সহদর ॥

ঐরাবত বাহনে আইল পুরন্দর।
মকর বাহনে আইলা বরুন জলেশ্বর॥
অক্ষ বাহনে আইলা কুবির ধনেশ্বর।
হরিন বাহনে আইলা রতিকুমার (?)॥
বলদ বাহনে আইলা দেব প্রষুপতি।

৯০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষনপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আস্তকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস।
লঙ্কাকাণ্ড রচিতে করিলা প্রকাশ॥
লঙ্কাকাণ্ডের কথা অম্রিতের সার।
লেখা জোখা নাহি তার কটক বানর॥
কতেক হইরাছে পার কতেক হইতে আছে পার।
লিখিবার কাজ থাকুক দেখিতে অপার॥
ফেলিলে শরিষা মুট নাহি জায় তল।
কটক চচ্চিয়া বেড়ায় চর দুই জন॥
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষ্যষ বিভিশনে।
রাক্ষ্যশের মায়া রাক্ষষে ভাল জানে॥
চিনিঞা দুই চরে ধরিল বিভিসনে।
মহাভয় পাইল চর ভাবে মনে মনে॥

শেষ,—

রাম রাবনে জদি দড় বাজিবে রন।
কৌতুক দেখিতে আইলা জতেক দেবগন॥
হংস কেলি করে মউরে ধরিছে পেখম।
ব্রহ্মা কার্ত্তিক তারা আইল দুই জন॥
ইন্দুরেথে বেড়ায় তথা হইয়া পিরিতি।
সস্‌টী দেবী আইলা আর গনপতি॥

৯১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৪, ৪৮-৫৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

তার হাথির কান্দে চড়িয়া তারে মারে চড়॥
চড় চাপড়ে তার ঠিকরিল আখি।
পড়িল তপন বির দুই কটকে দেখি॥
রথে চড়িয়া আইল রাক্ষষ বিদ্যুৎমালি।
গরু মানুষ দিয়া জার ভোজন বিয়ালি॥
হনুমান মহাবির দেখিয়া সমুখে।
তিন সত বান মারে হনুমানের বুকে॥
বান খাইয়া হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে॥
চুলে ধরিয়া তারে মারিল পাছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া পাড়ে চুর করিয়া হাড়॥
সুকর্ম্ম নামে রাক্ষষ আইলা দেখিতে রূপস।
একেবারে মস্ত পীয়ে সাত সত কলষ॥
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে সানা।
বানরের ভিতরে বির আসিয়া দিল হানা॥

শেষ,—

সেল পাট এড়িল রাবন দিয়া হুহুকার।
সর্ব্ব মত্য পাতালে লাগীল চমৎকার॥
নানা অস্ত্র এড়েন লক্ষন সেল কাটিবারে।
লোহার বাবড়ি মারে অস্ত্র নাহি ফিরে॥

রাখা না জায় সেল ব্রহ্মার বরে।
পবনবেগে পড়িল সেল লক্ষনের উপরে॥
পড়িলা লক্ষন বির রঘুবংসের নাথ।
লক্ষনে মারিয়া সেল গেল রাবনের হাথ॥
অচেতন হইয়া ভূমিতে লোটায়ে লক্ষন।
রথে হইতে উলিয়াসিয়া ধরিল রাবন॥
রথে করিয়া লক্ষনেরে লঙ্কারে লইতে চায়।
কুড়ি হাথে নাড়ে চাড়ে নাড়ন না জায়॥
নাড়িতে নারিল লক্ষনের কলেবর।
মনে সাত পাঁচ তখন চিন্তে লঙ্কেশ্বর॥
হিমালয় কইলাষ আর তুলিল মন্দার।
তাহা হইতে অধিক বাসোঁ মানুষ বেটার ভার॥
কৈলাষ পর্ব্বত আমি তুলিল কুড়ি হাথে।
মানুষ বেটার শরির আমি না পারি নাড়িতে॥
লক্ষন নাড়িতে নারে রাবন গুনে অপমান।

৯২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৪-১২৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

এতেক বলিয়া বির চালিলা তুরিত।
মাথায় পর্ব্বৎ নন্দিগ্রাম উপনিত॥
অগ্রহায়ন মাস তায় পুন্নমাসি তিথি।
সভা করি বস্যাছেন ভরত মহামতি॥
হস্তি ঘোড়া সকল দেখেন জুতে জুতে।
অড়াজা পাইক তারা চলে চারি ভিতে॥
সয় সামন্ত সব দেখে লাখে লাখে।
মাথায় পর্ব্বৎ বির অন্তরিক্ষে থাকে॥
সোনার সিংহাসন তায় পট্টবস্ত্র পাতি।
তাহার উপর পাদুই ভরথ ধরে দণ্ড ছাতি॥
সক্রর্ঘন পাদুএ দেন গন্ধ চন্দন।
রামের পাদুই জেন বিষ্টু আরাধন॥
চারি ভিতে মুনিগন করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবন শব্দ জয় জয় শুনি॥
অষ্টমূর্ত্তি বসিয়াছেন জতেক ব্রাহ্মন।
সারি দিয়া বস্যাছে জতেক প্রজাগন॥
হেন কালে হইল তথা ঘোর অন্ধকার।
সভা সহিত ভরথে লাগিল চমৎকার॥
মৃগচর্ম্মে বসিয়াছেন ভরথ কুমার।
পুন্নমাসি রাত্রে কেন হইল অন্ধকার॥
ভরথ বলে জজ্ঞধুর্ম্ম উঠে অনক্ষন।
জজ্ঞধুর্ম্ম পিতে গড়ুরের আগোমন॥
রামের পাদুই লজ্যা জায় কোন জন।
আজি যোনে কোন জনার নিকট মরন॥
আবাল কালে খেলাইতাম ছাবালের সঙ্গে।
লোহার ত বাটুল আছে রামারত সঙ্গে॥
সতেক মোন লোহাতে হয় বাটুল নির্ম্মান।
হেন বাটুল ভরথ বির পুরিল সন্ধান॥

শেষ,—

শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
পর্ব্বৎ লয়্যা জাহ বাছা গন্ধমাদন॥
দেবের পর্ব্বৎ হয় দেবপুর ভোগে।
পর্ব্বৎ না গেলে দেবের পাবে রমুজোগে॥
পর্ব্বৎ লইয়া বির করিলেক মাথে।
রামকে প্রনাম করি চলিলেক পথে॥
ক্ষেনমাত্র গেলো বির গন্ধমাদন।
জেখানে পর্ব্বৎ ছিল রাখিল তখন॥
হনুমান বলে কেন রপোজন রাখি।
রাম নাম মন্ত্র পড়্যা জিয়াইয়া দেখি॥
রাম নাম অমৃত সুধা কৈল বরিসন।
হাহা হুহু রাজা আদি পাইল জিবন॥

জিবন পাইয়া বিরে করিছে স্তবন।
সংসারে রহিল জস পবননন্দন ॥
গন্ধর্ব্ব জিয়ায়া জাত্রা চলিল য়াপার।
সবা গোটা দেখে জেন সকল সংসার ॥
রামের কাছে হনুমান জোড় করেন হাত।
রাম বলেন য়াইস বাছা য়ামার সাক্ষাৎ ॥
শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
এস্ত বাছা কোলে করি জুড়াকু জিবন ॥
নির্দ্ধন তপস্বি য়ামি হেথা নাহি ধন।
এক প্রসাদ দিতে পারি জদি লহ য়ালিঙ্গন ॥
আমা ভক্ত হও বাছা পরম সুস্থির।
জেই তুমি সেই য়ামি একুই স্বরির।
একবার জদি কর য়জোধ্যার রাজা।
চারি ভাই একোত্রে তোমার করিবত পুজা ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য সিতল।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গিত হরি বলহ সকল ॥

৯৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২৪×৪১ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রিপদী ॥

মোর নাম মেঘনাদ দেবসনে করি বাদ
ইন্দ্র জিনিলাম ইন্দ্রজিত।
সগ্‌র্গ মত্ত অধপুরে রনে মরে কেহো নারে
ত্রিভুবনে করে মোকে ভিত্ত ॥
সাগরের পারে ঘর বাস মোর লঙ্কাপুর
লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
মারিব বানর রনে শ্রীরাম লক্ষ'ন বানে
তবে জাব পিতা সন্নিধান ॥
বানর মানুসে মেলা কি জানি জুদ্ধের কলা
সাগর বান্ধিল অহঙ্কারে।
রাক্ষসের সংগ্রাম জানে বাদ করে তার সনে
আজি তার নাইক নিস্তার ॥
সুগ্রিবের খুড়াকে মারি জাইব আপন পুরি
পিতাকে জোগাব নিয়ে ডালি।
রাম না জাইব দেসে আজি বন্দো নাগপাসে
কপি মারি খণ্ডাইব সলি ॥
লুফিয়া ধনুকখান বান ধরে খরসান
ত্রিভুবন কম্পিত অন্তরে।
ইন্দ্রজিত মায়ারনে রাম ইহা নাঞি জানে
ডাকিয়া বলেন উচ্চাস্বরে ॥
পালায় বানরচয় রনে কেহো স্থির লয়
সুনি মাত্র ধনুকে টঙ্কার।
ছাড়িয়া রাজা[র] ডর গেল দেস দেসান্তর
দেখিতে নাঞিক কেহ আর ॥
রাম লক্ষনের বানে ইন্দ্রজিতে নাই জিনে
মিথ্যা বুলে করিয়া প্রত্যাস।
সরেসতি অধিষ্টান সর্ব্বলোকের বাখান
লাচাড়ি রচিল কিত্তীবাস ॥

শেষ,—

হস্তিকান্ধে বাজে দামা সঘোনে ঘোসন।
ইন্দ্র[জি]তে জিনিলেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
আজি হইতে নিদ্রা জায় কার নাই ডর।
জএর পতকা লঙ্কা দিল ঘরে ঘর ॥
এত বুনি সভার মঙ্গল হুলাহুলি।
স্ত্রি পুরুস নাচে সভে আউদড় চুলি ॥
ঘরকে রাবন রাজা পাঠাইল বেটা।
ডাক দিয়া আনিলেন বুহিনি ত্রিজটা ॥
তোমাকে বলিয়া ভগ্নী রাক্ষসি প্রধান।
হাথ পাতি লহ গো প্রসাদ গুয়াপান ॥

আমার বচনে সিতা না পাত্যাবে মন।
দেখুক আপনো চক্ষু শ্রীরাম লক্ষ্ন ॥
দেখাও আকাসপথে পুষ্পরথখানে।
পড়িল দেওর স্বামি ইন্দ্রজিতের বানে ॥
প্রসাদ তাম্বুল দিল তারে বাটা বাটা।
সিতাকে বুঝাতে জান বুহিনি ত্রিজটা ॥
রথে চড়াইল সিতা জনকের বালি।
রাম লক্ষনে দেখাইছে তুলিয়া অঙ্গলি ॥
রথে চড়াইয়া সিতা ভ্রময়ে আকাসে।
স্বামি দেওর দেখিয়া কান্দেন করুন ভাসে ॥
আচম্বিতে পড়িলেন দুই সহোদর।
চারি ভিতে বেড়িয়া কান্দে সকল বানর ॥
নেহালিয়া দেখে স্বামি লক্ষন দেয়র।
করুনে কান্দেন সিতা রথের উপর ॥
সুবর্ন্নের খাট পাট তাহে নেত তুলি।
তাহা তেজি প্রভু কেন লোটাইছ ধুলি ॥
পুষ্পক মালা পর তুমি সুগন্ধি কস্তুরি।
হেন দেহ হইল প্রভু ধুলাতে ধুসরী ॥
অসক কিংসোক জেন দেহ হইল জুতি।
অকারুনে রাণ্ড কৈলে জানকি জুবতি ॥
হেন বির নাঞি প্রভু তইলক্য ভিতরে।
তোমাকে জিনিঞা রনে আসিবেক ঘরে ॥
তোমার বিহনে নাহি রাখিব জিবনে।
মরিব জহোর খায়্যা অসোকের বনে ॥
মন মুরচিয়া কেন নাই গেলে ঘরে।
কোন কার্জ্জে প্রান দিলে দুই সহদরে ॥
মাতা পিতা নাই এথা সস্থর সাসুড়ি।
কোন জনে তোমারে ডাহিবে নাড়ি পড়ি ॥
কিত্তিবাস গাইল লঙ্কাকাণ্ডের গিত।

৯৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪/৮ × ৪৩/৮ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাবন বলেন ক্ষেতিতলে রাম হইল কি।
এবার রামের হাথে কদাচিত জি ॥
রাবন বলে ক্ষেতিতলে জা শুনি নাই ইহা।
নর বানরে সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া ॥
জা সুনি নাই তাই হৈল আর বা কিবা হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আমার কোন কার্য্যে নয় ॥
এতকাল তোমা সোভাকে খাওল্যাম রাজভোগে।
জুগির থানে কুড়া গণ্ডা মাঙ্গি কোনকালে[১] ॥
আপন পোউরস রাখ ধর পান নে।
রাম লক্ষন দুই বেটাকে বেন্ধা এনে দে ॥
রাজারে আসীষ করিছে জত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি ॥
সিতা লঞা কর ক্রিড়া আনন্দিত মনে।
আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষনে ॥
তিভুবন স্বহায় করা রাম জদি আনে।
তবু সিতা নারিব নিতে আমা সভা বিস্তমানে ॥
সেগুলাকে ভয় করি নাই সকল বনের পসু।
এক চড়ে মেরা্যা দিব ঘরপড়া না আসুক ॥
সেই বেটা প্রোধান তার সব কটকের সার।
সেই আইলে মহারাজা রক্ষা নাই আর ॥
সেই ভুলালেক বিভিসনাকে নানা কথা কয়্যা।
সেই সাগর বান্ধিলেক গাছ পাথর বয়্যা ॥
জত দেখ মহারাজা সব চক্র তারি।
সেই থাকিতে কেহ রাখিতে নারিবে রামের নারি ॥

১। "কাজে" হইবে কি?

শেষ,—

দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড ॥
শিরে জটাভার রামের বাকল উতরি।
বস্যাছেন মহাশয় বিরাসন করি ॥
হনুমান জাম্বুবান সুগ্রিব বিভিসন।
হেন কালে আইল তথা বালির নন্দন ॥
দিবন্ধ শাসনে বস্যাছেন নারায়নে।
সম্ভ্রমে করিল রামের চরন বন্দনে ॥
লক্ষনের পদধুলি বন্দিলেন শিরে।
প্রনাম করিল গিয়া খুড়া মহাবিরে ॥
হনুমান পৃভিতি জতেক ছিল বস্যা।
অঙ্গদের সম্বাষ করিল সভে এসে ॥
রাবনের মাথার মকুট দিল ডালি।
কহিল সকল জত দিয়াছেন গালি ॥
খাটে হইতে জটে ধর্য়া ফেল্যাছিলাম ভূঞে।
পশ্চাতে সে সব কথা সুনিবে লোক মুঞে ॥
তাহার আবস্তা করিআছি কহি করপুটে।
চুরি কর্য়া এনেচি তার মাথার মোকুটে ॥
প্রিতয় না জান রান অঙ্গদের বোলে।
মোকুট দিলেন অঙ্গদ বিভিসনের কোলে ॥
বিভিসন বলেন গোসাঞি সুন রঘুমনি।
রাবনের মকুট বটে ইহা আমি জানি ॥
আনন্দে অ[ব]ধি নাই প্রভুরঘুনাথ।

৯৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{২}$×৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৫,৭—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৬ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হনুমানের কথা সুনি জাম্ববানে কহে।
গোসাই হনুমানকে জাই[তে]সে উচিত পুন নহে ॥
রাবন বোলিবে এহী বানরা আসি প্রীতি জাতে।
বুজি ইহা বহি বির নাহি সুগ্রীবের সাথে ॥
বালির তনয় আছে কোন অর্থে উন।
অঙ্গদকে পাঠাইয়া দেও বলিবে চতুর্গুন ॥
জার বাপে খাওাইল তাকে সাত সমুদ্রের পানি।
তার পুত্র সভাতে জাইতে কবে ভয় মানি ॥
ক্রোধে অঙ্গদ জাম্ববানের দিগে চাএ।
বৃর্দ্ধি পাগল হইতে বুদ্ধি লোপ্ত পায় ॥
হনুমান বহি বির নাহি জানিয়াছে খুড়া।
নিরর্থক পাচাল পারিয়া মরিচ কেনরে বুড়া ॥
হনুমান বলবান নিব্বল সমাই।
নিমির্থ রহিছি মোরা দেসেকে চলিয়া জাই ॥
চল রে আমরা জাই রামকে কহিয়া।
উর্দ্ধাড়িবেন সিতা খুড়া হনুমানকে লইয়া ॥
বুঝীলান জানকিনাথ অঙ্গদের ক্রোধ।
সকরুন বানি কিছু বলিলা প্রবোধ ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সোন রে অঙ্গদ।
কুকার্য্যে করিছি আমি তোর পিতা বধ ॥
প্রানের অধিক তোকে দেখী সেহী হতে।
মোর ইচ্ছা নাহি তোকে সঙ্কটে পাঠাইতে ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সুন যুবরাজ।
নখছেঁদ হইলে কুঠারের কিবা কাজ ॥
কি কাজ অঙ্কুসে জদি হাতে ফল পাই।
সেবক হইতে কাজ আপনে কেনে জাই ॥
ঘরের সেবক তোমার পবনকুমার।
সেবক উন্নতি হৈলে মহিমা তোমার ॥

শেষ,—

অহর্ল্যা পাসান হৈয়া ছিল দৈবদোসে।
মুক্ত হইয়া গেল জার চরন পরসে ॥
তুই জা কামনা করিষ তর্ত্ত না জানিয়া।
তেই বলি রামের চরন ভজ অভাগীয়া ॥

তুই আমার বাক্য সুন রে ভাড়ুআ গুরু।
তুই হইআছ মোর বাপের কির্ত্তী কল্পতরু॥
অতএব কথকাল থাকিলে ভাল হয়।
নহে পুনি এত কথা ভাল মুনিশে কয়॥
জম্বাপীঅ বটি য়ামি প্রভু রামের চর।
তথাপী বংসের রক্ষা করিয়া জাও তর॥
তবে জদি তুই মোরে করিষ প্রলাপি।
তবে তুলি য়াছারিব মোর বেটী পাপী॥
সে জে দুত ভুত নহে৷ ঘর পোড়াইয়া জাব।
বালির বেটা অঙ্গদ আমী ঘারের রক্ত খাব॥
আসিছি রামের আজ্ঞায় ভাল চাস ত ওঠ।
লাথির চোটে ভাঙ্গীব তোর মাথার মকুট॥
তোরে এক লাথি মারি ফেলিব ভুমিত।
কি করিতে পারে তোর পুত্র ইন্দ্রজীত।
ভাই তোর কুম্বকর্ন্ন বির করিয়া লিথীস।
রাম ধনুকে বান লইলে কি যে তা দেখীস॥
এহি তোর সেনাপতি য়াছে লাখে লাখে।

৯৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৬ সাল। সম্পূর্ণ।

৯৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪, ৭-৮, ১৫-১৯। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় সন ১২৩৪ সাল লেখা আছে। খণ্ডিত। মধ্য,—

চলিল চন্দ্রজিত বির রনে দিতে হানা।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাপীছে সর্ব্ব জনা॥
সর্ন্ন সামন্ত নয়। বির জুঝিবারে লড়ে।
মা মন্দদরির তরে তখন মনে পড়ে॥
সম্ভাসিব বলি মা পার্ব্তুষ বিহানে।
জুঝিবার হুড়াহুড় তখন পড়ে মনে॥
অসন্তাষে জাই জদী সংগ্রাম ভিতর।
আহার পানি ছাড়িবেন মা কান্দীবেন বিস্তর॥
সর্ন্ন সামন্ত বির থুইয়া দুয়ারে।
মা সম্ভাসিতে গেলা ভিতর অন্তম্পুরে॥
সোনার পাচর ঘর সোনার আওয়ারি।
য়েগার সং ব্রহস্রের ভিতর রানি মন্দদরি॥
ভক্তাভাবে পুজে মহাদেব পার্ব্বতি।
গন্ধ চন্দন পুষ্প ব্রতের জালে বাতি॥
ডাহীনে বহারি সব বামেতে ঝিয়ারি।
দষ হাজার সতিন বেড়ি রানি মন্দদরি॥
নয় হাজার আছে মেঘনাদের রমান।
তিন লক্ষ অছে সর্ন্ন সামন্তের রানি॥
ইন্দ্রজিত দেখিতে হইল স্ত্রি সভের মেলা।
গগনমণ্ডলে জেন উদয় চন্দ্রকলা॥
হেনকালে ইন্দ্রজিত দাণ্ডায় মায়ের আগে।
চরনের ধুলা লইয়া থুইল মাথার পাগে॥
আস্তে বেস্তে মন্দদরি ধরে পুত্রের হাথে।
আসির্ব্বাদ করি রানি চুম্বু দিল মাথে॥
অনেক তপ করিনু পুজিনু উমা মহেস্বরে।
সেই তপের ফলে তোমা ধরিনু উদরে॥
তোমা পুত্র প্রসবিয়া হৈনু মোক্ষ রানি॥
চেড়ি হয়্যা খাটে দশ হাজার সতিনি॥
বাপের দুলাল তুমি মায়ের পরান।

কাহা জুক্তি যুনিয়া জুর্দ্ধে কর‍্যাছ পয়াণ ॥
রাক্ষস কটক বনে রাম মানুষ তপস্বি।
জাহার বানে পড়িলে পুনু ফিরিয়া না আসি ॥
হেন রামের সনে বাপু করিতে চাহ রন।
মানুষ নহে রামচন্দ্র আপনি নারায়ণ ॥
পরদার মোহা পাপ করে কোণ রাজা।
পরস্ত্রি হরে তোর পাপ নাহি করে লজ্জা ॥
কোটী কোটী দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রি থাকীতে তবু পরদার করে ॥
সিতাদেবি আনে রামের বুক উপাড়ি।
সংসারের বানর লয়্যা রাম সাজে ধাড়ি ॥
একেশ্বর হনুমান সাগর হৈল পার।
লঙ্কাপুরি পোড়াইয়া করিল ছারখার ॥
আছিল তো বিভিসন মন্ত্রনাসাগর।
তারে লাথি মারিলেক সভার ভিতর ॥
পরস্ত্রি আনে তাহার নাহি অভিমান।
এখন জুঝিতে কেন পাঠায় আর জন ॥
তোমা পুত্র রাখিব আমি কপাট দিয়া দুয়ারে।
কি করিতে পারে রাম থাকীয়া বাহীরে ॥
সোনার চাঙ্গড়া ফিরাকু পড়ুক ঘোসনা।
আজী হইতে জুর্দ্ধ নাহি জুর্দ্ধ হইল মানা ॥
মন্দোদরি জত বলে বচন যুনি রোসে।
মায়ের কথা যুনিয়া বির মেঘনাথ হাসে ॥
ত্রিভুবন পুজিত মাগো হেন আমার বাপ।
ইন্দ্র জম জিনিয়া বাপার দুজ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া জয় আমার বাপের তেজে।
হেন বাপ নিন্দা কর স্ত্রিসভার মাঝে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া মাগো ইন্দ্রের ইন্দ্রাণি।
সচি হইতে অনেক গুনে তুমি ঠাকুরাণি ॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার বামা বচন।
স্বয়ামি নিন্দা কর মাগো কীসের কারণ ॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালে আছেন জত জন।
পরদার পাপ নাহি করে কোন জন ॥
ইন্দ্র যুরপতিরাজ সকল দেবের সার।
অহল্যা গৌতমের স্ত্রিকে করে পরদার ॥
সবে বলে ইন্দ্ররাজা দেবের উত্তম।
জার পরদারে অহল্যা হইল পাসান ॥
পরদার করে চন্দ্র ব্রহস্পতির ঘরে।
গুরুপত্নি পাইয়া চন্দ্র পরদার করে ॥
সংসার আল করে চন্দ্র জগত উপরে।
পরদার পাপ তার কী করিতে পারে ॥
জগতের প্রানধন দেবতা পবন।
বলে ধরি বানরিরে করিল গমন ॥
কোন দেবতার মা গো নাহি অপরাদ ॥
সবে মাত্র দেখ মোর বাপের অপরাদ ॥
দেবগন হয়্যা এত করে অবিচার।
পরদারে পাপ নাহি পুরুসের অঙ্গভার ॥
মানুষ বেটা হয়্যা সেই রণে বিপরিত।
তার স্ত্রি আনিয়াছে বাপা কোন অনুচিত ॥
রাক্ষস কটক মারিয়া রাম কুলের হৈল বৈরি
ভাল করিল বাপা তার আনিলেক নারি ॥
অগ্নীর সেবা করিব মাগো এই হইল বেলা।
তাহে জজ্ঞ করি মাতা নাম নিকুম্ভিলা ॥
সাক্ষাত হইবে অগ্নী মোর বিদ্যমান।
ইন্দ্রজীতের সমুখে অগ্নী হইবে অধিষ্ঠান ॥
চারি দুয়ারে আছে রামের জত সেনাপতি।
সকল টাক মারিব আমী আজীকার রাতি ॥

(পৃ॰ ১৫।২-১৭।১)

৯৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২-৮।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪১ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

অতিকা বলিছে বাপ কাথে তুমার ডর।
হেটমাথে বসি কেন সিহাসনের উপর॥
কত রাজা জিনিঞাছ দেব পুরন্দর।
কাথে না জিনিঞাছ বাপ সংসার ভি[ত]র॥
হাথে ধরিয়া পুত্রেরে বসাইল সিহাসনে।
কোলে করিয়া বলে রাজা মধুর বচনে॥
রাবন বলে ওরে বাপু কাহে নাই ডর।
নর বানরে বাপু অড়িল আ[থা]ন্তর॥
দসরথনন্দন মুনশ্ব দুই বেটা।
বাকল পরিধান রাম মাথায় ধরে জটা॥
বাকল পরিধান রাম মুর্ত্তিমান তপশ্বি।
সঙ্গে করিয়া নঞা বুলে পরমরূপসি॥
ত্রিভুবনে দেখি নাই এমন সুন্দরি।
সুর্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষন বির॥
কোপে হরিয়া আনিলাম তাহার নারি।
বানর সঙ্গে ভেদ করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
নিদ্রা না জায় সুগ্রিব বালি রাজার ডরে।
বেলে মারিয়া রাম সুগ্রিবে রাজা করে॥
বিভিসন ভাই ছিল মন্তির অধিষ্টান।
আমাকে ছাড়িয়া গেছে রঘুনাথের স্থান॥
মন্তনা করিয়া করিল সাগর বন্দন।
পার হঞা এল রাম জত বানরগন॥
হাথে ধনুর্ব্বান রাম মাথায় জটাধারি।
বানর স্বহায় করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
জত জত বির গেল রন করিবারে।
বাহুড়িয়া কোন বির না য়াইল ঘরে॥

বিভীষণের উপদেশে হনুমান্ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবেশে অতিকায়ের নিকট হইতে অক্ষয় কবচ সংগ্রহের কথা আছে (পৃ০ ৬১২-৭১২)।

৯৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ; প্রথম পাতাখানি অন্য পুথির।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

বিশটু পুজা করিছেন তরনি বশীয়া।
দ্ধেন গতে আছেন মুনি আনন্দিত হইয়া॥
তুলশীর মালা কণ্ঠে অতি যুদ্ধমতি।
হেনকালে অতিকায় আইলা শারথি॥
শারথির মুখেতে সুনিলা বিবরন।
পেয়েছে অতিকা বির শ্রীরাম চরণ॥
অনেক করিয়া আমিহ আছিয়া তব রনে (?)।
শ্বরির তেজিব গিয়া শ্রীরামের বানে॥
কিন্তু মোর মনেতে শন্দেহ বড় হয়।
মোরে কেন দয়া করিবেন মহাশয়॥
জন্মিলাঙ বৈরিপক্ষ রাক্ষশের কুলে।
মোর স্থান হব কেন চর[ন] কমলে॥
জে হকু ভাগ্যেতে রনে করিব গমন।
এত বলি চলি গেলা ভেটিতে রাবন॥
তনয়ের শোকে রাজা পরে ভূমিতলে।
মহাবির তরণী গেলেন হেন কালে॥
জনকের জেষ্ট ভাই রাজ্যের প্রধান।
রাজ ব্যেবহারে তারে করিলা প্রনাম
সোকাকুল রাজা তারে নারিল চিনিতে।
তরনি বিদায় মাগে রাজার সাক্ষাতে॥

তরনির বোল যুনি বলেন রাবন।
বংশের তিলক থাক করিতে তর্প্পন॥
এক সত পুত্র মৈল্য পোউত্ত বিসাসয়।
নর বানরের হাথে সব হইলা ক্ষয়॥
ভাত্রিপুত্র রবধি মরিলা সর্ব্বজন।
তুমি থাক আমি মৈলো করিতে তর্প্পন॥
বিসেসে বৈষ্টব তুমি জানে সর্ব্বজনে।
পরকালে মুক্ত হব তোমার তর্প্পনে॥

মধ্য,—

জুড়িআ জু গ্যল পানি বাক্য যুন রঘুমুনি
আমি দিন হিন কুলাঙ্গার।
জন্মিলাঙ রাক্ষসকুলে নিজ পূর্ব্ব পাপফলে
না জানিলু মহিমা তোমার॥
তুমি অনাথের গতি কৃপা কর রঘুপতি
দেবাযুর নরে কিবা জানে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম
দয়া কর আপনার গুনে॥
তুমি মিন রূপ ধরি উদ্ধারিলে বেদ চারি
ধরনি ধরিলে পীষ্টপর।
দন্তেতে ধরিলে ক্ষিতি স্তম্বপরে কৈলে স্থিতি
বিদির্ন্ন কস্যপ দুরাচার॥
ছলেতে বামন হঞা বলিরে ছলিল গিয়া
ধরনি ধরিলে হাথে হাথে।
বলিরে ভগুনা করি নিলে রসাতল পুরি
দুআরি হইলে হরসিতে॥
সাধিলে দেবের কাম ছল্মরূপী ভৃগুরাম
নিক্ষেত্তি করিলে মেদনি।
বধিতে রাক্ষসগন রামরূপ নারায়ন
আমি মুর্থ কি বলিতে জানি॥
দুর কর অভিরোস ক্ষেমহ দাসের দোস
স্মরন লইলু রাজা পায়।
বলিতে চক্ষেতে ধারা বয় অবাক হইআ রয়
চাঁদমুখ ঘন ঘন চায়॥
ভাল মন্দ নাই জানি নিজ গুনে রঘুমুনি
রাথ বলি ছাড়েন নিশ্বাস।
দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভনে রাঘবের শ্রীচরণে
বন্দিআ পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাস॥ (পৃ° ৭।২-৮।১)

শেষ,—

তবে মুণ্ড লঞা জায় বির হনুমান।
তরনির মুণ্ড সদা জপে রাম নাম॥
বৃসবে ডাকিয়া শিব বলেন বচন।
তরনির মাথা গোটা আনহ এখন॥
বুঝিনু বিধাতা মোরে প্রসন্ন হইল।
পঞ্চমুখ ছিল বিধি ছয় মুখ দিল॥
হনুমান ডাকি বলে সদাশিব ঠাঞি।
এথা মাথা রাথিতে প্রভুর আজ্ঞা নাই॥
এত বলি মুণ্ডগোটা ফেলে গঙ্গাজলে।
গঙ্গাজলে পড়ি মাথা রাম রাম বলে॥
মাথা রাথি হনুমান করিলা গমন।
জথায় শ্রীরামচন্দ্র দিলা দরসন॥
এথানে তরনি বির চড়ি দির্ব্ব রথে।
বৈকণ্টে চলিআ জায় হাসিতে হাসিতে॥
প্রভু সম মুর্ত্তি বির ধরি ততক্ষনে।
দ্বিভুজ শ্যামল মুর্ত্তি বনমালা গলে॥
আনন্দে প্রভুর পদ পাইলা তরনি।
এথানে বানর করে রাম জয় ধ্বনি॥
ভগ্নদুত কহে (গিআ) রাবন গোচর।
হত হইলা তরনি সেন যুনে লঙ্কেশ্বর॥
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িলা তথন।
পুত্র পোউর্ত্ত ভার্ত্তা নাই করিতে তর্প্পন॥
এতেক বলিআ রাজা ধরনি লোটায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

—

১০০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরনীসেন বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

তরনি জননি আগে সম্ভ্রমে বিদায় মাগে
স্থন মাতা করি নিবেদন।
নিবেদন বির বলে অবশ্য জাইব রনে
দেখিবারে রাজিবলোচন॥
তব গর্ব্ভে জন্ম লয়া কেবল জন্তনা দিয়া
ভুঝিবারে করিলাম গমন।
অভাগার ভাগ্য জত দুখ পাই তত তত
ক্ষেমা কর করি নিবেদন॥
গর্ব্ভেতে ধারন কৈলে প্রসববেদনা পাইলে
পরিস নারিলে বারে বারে।
করাইলে স্থন পান পড়াইলে দিব্য গ্রান
আমি জাই ছাড়িয়া তোমারে॥
জদি তব আজ্ঞা পাই রাম দরসনে জাই
মোনে [মোর আছে] বড় সাধ।
চরন কোমলে কই তনএর জজ্ঞ নই
কেবল করিলাম তোমায় বধ॥
এই বড় অভিলাস হইব তোমার দাষ
জদি আজ্ঞা করহ আমাকে।[১]
তুমি গো পরমগুরু গর্ব্ভধারি কল্পতরু
আমি জাই করিবারে রন।
বিরের বচন স্থনি কহেন বিময় বানি
স্থন স্থন আমার বচন॥
সদা তুমি সাবধান আছএ পরম জ্ঞান
পাবে পুত্র রাম দরসন।
নরকে উদ্ধার করে পুত্র বলি তাহারে[২]
স্থন মাতা কহি তব পায়॥
স্থনিঞা পুত্রের কথা মোনেতে পাইল বেথা
নাচারি রচিল কিত্তিবাস॥

(পৃ° ৩১-২)

শেষ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর।
তরনি পড়িল বাত্রা স্থন লঙ্কেশ্বর॥
স্থনিআ রাবন রাজা ছারেন নিশ্বাস।
তরনির পালা সায় গাইল কিত্তিবাস॥

১। মেলকটি নাই

২। ইহার পর ৯৯ সংখ্যক পুথিতে এইরূপ আছে,—

স্থন মাতা কহি তব ঠাঞি।
না কহ এমোন কথা সক্ত মোর মাতা পীতা
উর্দ্ধার করিতে কিছু নাই।
স্থনিঞা পুত্রের কথা রানি করে হেট মাথা
অবিরত ছাড়েন নিশ্বাস।
দ্বিজ মধুকণ্টে ভনে * * * * * *
বন্দিআ পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

ত্রিংশ বার্ষিক প্রথম বিশেষ অধিবেশন

১২ই শ্রাবণ ১৩৩০, ২৮এ জুলাই ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

'বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা' বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

এই দিন উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, সভার অধিবেশন হয় নাই।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।
৬।৬।৩০	

স্থগিত প্রথম বিশেষ অধিবেশন

১৬ই শ্রাবণ ১৩৩০, ১লা আগষ্ট ১৯২৩, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

'বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা' বিষয়ে বক্তৃতা (প্রথমাংশ)। বক্তা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে 'বিদ্যাপতি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি চণ্ডীদাস, মিথিলার জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণের পদের আলোচনা করিলেন।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।
৬।৬।৩০	

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৯এ শ্রাবণ ১৩৩০, ৪ঠা আগষ্ট ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

'বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা' (শেষাংশ)। বক্তা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে 'বিদ্যাপতি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা' বিষয়ের শেষাংশ বক্তৃতা করিলেন। অদ্যকার বক্তৃতায় তিনি প্রথম বক্তৃতার ন্যায় চণ্ডীদাস, মিথিলার গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি এবং চৈতন্যের আবির্ভাব, মুসলমান বৈষ্ণব-কবি, ভণিতাশূন্য পদ, বাল্য-লীলার পদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রাচীন কবিগণের ভাষাগত বা শব্দগত বৈশিষ্ট্য তিনি যেরূপ নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, সেইরূপ ভাবগত বৈশিষ্ট্যও যদি সেই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার হয়।

জনৈক ছাত্র বলিলেন যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে ৩।৪ জন গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি রামচন্দ্র সেনের পুত্র গোবিন্দ সেন, তাঁহাকে অন্যান্য গোবিন্দদাস হইতে কি ভাবে পৃথক্ করা যাইবে? এই গোবিন্দ সেনও মিথিলার বহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং ভাবের ভিতরেও মিথিলার গোবিন্দদাসের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও অদ্যকার আলোচ্য পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পরের সহিত দেখা হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক; বোধ হয়, দেখা হইলেও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস দুইজন ছিলেন। এক, কি দুইজন ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিধা রহিয়া গেল। তিনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাহির করিতে প্রয়াস পাইলে সুখের বিষয় হয়। জ্ঞানদাস এত ভাল লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহার ভিতরেও আবার এতটা হেঁয়ালি ভাবেরও যে লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। বক্তা মহাশয় রায়-শেখরের বেশ অনুরাগী, তাঁহাকে তিনি বেশ উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে

শ্রীকৃষ্ণের "বাল্য-লীলা" বর্ণিত আছে, তাহা বক্তার মতে যে একেবারে কাল্পনিক, তাহা নহে। কারণ, এই সকল প্রসঙ্গ ভাগবতেও পাওয়া যায়। মেনকা প্রভৃতির ভিতরেও বাৎসল্যভাব ছিল কি না, তাহা, তিনি আশা করেন, বক্তা মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যদি অন্যকার বর্ণিত কবিগণের বিষয়ে এক একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তৎপরে, তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
৬।৬।৩০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯এ ভাদ্র ১৩৩০, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বিদ্যাপতি" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

বিদ্যাপতি একজন কবি, পণ্ডিত, রাজকর্ম্মচারী, সেনাপতি ও নানা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব এবং সহজিয়ারা সহজিয়া-মতাবলম্বী বলিয়া জানিলেও তিনি যথার্থ ভারতবর্ষের ও বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, এবং গঙ্গার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল ও তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ভূ-পরিক্রমা (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত), পুরুষ-পরীক্ষা, লিখনাবলী প্রভৃতি আরও নানা-বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাৎকালিক মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্তপ্রায় হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন বিষয়ে তিনি একজন অগ্রগণ্য নেতার কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই রাজকর্ম্মচারী, মন্ত্রী এবং প্রামাণ্য গ্রন্থকার ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ১৭৯ বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলেন যে, তিনি ১০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতির পদে লখিমাদেবীর ভণিতা দেখিয়া সহজিয়ারা তাঁহাকে সহজ-মতাবলম্বী বলিয়া স্থির করে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পদে আরও অনেক বড় বড় রাজা ও রাণী এবং ত্রিহুত অঞ্চলের অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর পরিবারের ভণিতা আছে। তিনি ঐ সকল ব্যক্তিদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া যে যে গান রচনা করিতেন, সেই সেই গানে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে প্রায়ই ফরমাইস-মাফিক কবিতা লিখিতে হইত। ইহার পর বিদ্যাপতির পদ-সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিয়া, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলেন যে, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না এবং তিনি কীর্ত্তন হিসাবেও পদ-রচনা করেন নাই। তিনি শিব ও গঙ্গার জন্য যেরূপ পদ লিখিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের পদও সেই ভাবেই লিখিয়াছেন; সেই পদ কীর্ত্তনিয়ারা তাহাদের কীর্ত্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতির অনেক ফরমাইসি পদ আছে, তাহাও রাধাকৃষ্ণের পদ বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে আজ অনেক নূতন কথা জানিতে পারা গেল। কিন্তু তাঁহার একটি বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ফরমাইসি পদ রচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পদে যেরূপ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেগুলি যে অন্যের ফরমাইস-মাফিক্ রচিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং একাল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার গানে মুগ্ধ। বিদ্যাপতি স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিলেও তাঁহার পদই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে, ইহাই যেন বোধ হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় আজ উপস্থিত থাকিলে তাঁহার শিষ্যের মত আজ,তাঁহার সন্দেহগুলির তিনি ভঞ্জন করিয়া লইতেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবেরা বেদ মানিতেন, কিন্তু পড়িতেন না। এ কথাটিও যেন ভাল লাগিতেছে না। এই বলিয়া তিনি পুনরায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
৬।৬।৩০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৩০এ ভাদ্র ১৩৩০, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা 'আহুঠ, আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী" এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা"। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক গত ২৯শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইল এবং তাহা গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন বাঙ্গালা 'আহুঠ' 'আউট' এবং সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধোল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করিলেন। (এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩০শ।৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বাবু বলিলেন যে, 'আউট হাত' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম তিনি সানন্দে স্বীকার করিতেছেন। সুকুর মহম্মদের গোপীচান্দের সন্ন্যাসে 'আউট হাতে' অর্থ—৩॥০ হাত।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, "আহুঠ" শব্দের অন্য রূপ "ঔট"। আপ্পাজী কাশীনাথের-রচিত Marathi Grammarএ ইহার উদাহরণ এইরূপ পাওয়া যায়, "সাঠ ঔট দাহোত্রী দৌন," অর্থাৎ "৬০ + ৩½ = ২১০"। এইরূপ অন্যান্য ভাষাতেও "আহুঠ" শব্দের রূপান্তর পাওয়া যায়; তিনি সেগুলিরও কিছু কিছু উদাহরণ দিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে, প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লেখক মহাশয় বলেন যে, প্রাকৃত ভাষায় রচিত পদ-গীতিই বাঙ্গালা পদের আদিম যুগ ও উৎপত্তিস্থল। জয়দেবের গীতগোবিন্দও প্রাকৃত পদের অনুসরণে অথবা হয় ত প্রাকৃত ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার পর, চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া গোবিন্দদাসের পদের ভাষা বিশেষভাবে আলোচনাপূর্ব্বক লেখক বলিয়াছেন যে, গোবিন্দদাসও তাঁহার পদাবলীতে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাপতির বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিদ্যাপতিরও কিছু ভাব ও ভাষা তাঁহার পদাবলীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন "আমি প্রবন্ধটী মনোযোগ দিয়া শুনিলাম, কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। প্রবন্ধ-লেখক যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, প্রায় ৬।৭ শত বৎসরের ভাষার ইতিহাস লইয়া বিচার করিতে হয়। প্রবন্ধ-লেখক 'প্রাকৃত প্রভাব', 'প্রাকৃত ধারা' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, 'প্রাকৃত'-অর্থে আমরা কি বুঝি, সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা কর্ত্তব্য। মোটামুটী, বুদ্ধদেবের সময়ে আদি-যুগের আর্য্যভাষা, বা ছান্দস, বা 'সংস্কৃত' হইতে প্রাকৃত-ভাষার পার্থক্য লোকের চোখে ঠেকিতে থাকে; অন্ততঃ পূর্ব্ব-ভারতে। বুদ্ধদেবের সময় আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। তাহার পূর্ব্বে প্রাকৃতের উদ্ভব (অন্ততঃ পূর্ব্ব-ভারতে)। মোটামুটী, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ১০০০ পর্য্যন্ত ষোলশ' বছর ধরিয়া প্রাকৃত যুগ। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পরে আধুনিক ভাষার উদ্ভব। এই ষোল শত বৎসর ধরিয়া আর্য্যভাষার প্রগতির ইতিহাসকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যায়; [১] আদিম যুগের প্রাকৃত—যাহার নিদর্শন অশোক অনুশাসনের ভাষায়, ও পালিতে পাওয়া যায়; দেশভেদে ইহার রূপ—উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য; [২] সন্ধি-যুগের প্রাকৃত—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অনুশাসনাবলীতে ইহার নিদর্শন পাই; [৩] মধ্য-যুগের প্রাকৃত—সংস্কৃত নাটকে, জৈন গ্রন্থে যে প্রাকৃত পাই; দেশভেদে ইহার রূপ শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী প্রভৃতি; [৪] এবং অন্ত্য-যুগের প্রাকৃত বা 'অপভ্রংশ', যাহা হইতে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির উদ্ভব। দেশভেদে নানাপ্রকার 'অপভ্রংশ', যেমন শৌরসেনী অপভ্রংশ, যাহা হইতে হিন্দীর উৎপত্তি; মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গলা উদ্ভূত হয়।

চর্য্যাপদের ভাষায় বাঙ্গালার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। এই ভাষা আর 'প্রাকৃত'

নহে, ইহাতে প্রাকৃতের দ্বিরবস্থিত ব্যঞ্জনগুলিকে ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন কর্ম্ম > কম্ম > কাম; এই বিশেষত্ব আধুনিক আর্য্যভাষার, প্রাকৃতের নহে। খ্রীষ্টীয় ১১০০ সালের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে, ইহা চর্য্যাপদ হইতে বুঝা যায়। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বর প্রণীত 'অভিলাষার্থ-চিন্তামণি' গ্রন্থ হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়; ঐ বই খ্রীষ্টীয় ১১২৯ সালে লেখা।

"যখন প্রথম বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছিল, তখন শৌরসেনী অপভ্রংশের রেওয়াজ বাঙ্গালায় ছিল, বাঙ্গালাদেশের কবি কানু সরহ প্রভৃতি মাতৃভাষা বাঙ্গালায় চর্য্যা লিখিয়াছেন, আবার পশ্চিমা শৌরসেনী-অপভ্রংশেও পদ ও দোহা লিখিয়াছেন। শৌরসেনী অপভ্রংশ, 'প্রাকৃত' ও আধুনিক ভাষার সন্ধিক্ষণে; সাহিত্যের ভাষা হিসাবে সমগ্র আর্য্য-ভারতে ব্যবহৃত হইত। ইহার কিছু কিছু প্রভাব বাঙ্গালায়ও আসিয়া গিয়াছে। শৌরসেনী অপভ্রংশের এক অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ হইতেছে শৌরসেনী-অপভ্রষ্ট বা 'অবহট্‌ঠ' নামযুত ভাষা; পরে ইহা হইতে ব্রজভাখা-হিন্দীর উৎপত্তি। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থ, যাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে, চিতোরের রাজা হাম্মীরের পরে গ্রথিত হয়, তাহাতে অবহট্‌ঠের বা প্রাচীন হিন্দীর কবিতার সংগ্রহ আছে। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'এর ভাষাকে (দুই একটী কবিতার ভাষা ছাড়া) ঠিক প্রাকৃত বলা চলে না।

"প্রাচীন যুগের ভাষায় তদ্ভব শব্দের আধিক্য বেশী ছিল। পরে বহু তদ্ভব পদ সংস্কৃত তৎসম কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। প্রাচীন কোনও বইয়ে তদ্ভব পদের বাহুল্য দেখিয়া তাহাকে 'প্রাকৃত' বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তাহার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

"আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভবের পরেও, শৌরসেনী অপভ্রংশে (বা অবহট্‌ঠে) কবিতা লেখা চলিত। কতকটা সাহিত্যিকদের হিন্দীর মত, বা রাষ্ট্র-ভাষার মত। বাঙ্গালী জয়দেব খুব সম্ভব এই পশ্চিমা অপভ্রংশেই তাঁহার গীতগোবিন্দের ২৪টী গান বা পদ রচনা করেন, পরে তাহাকে সংস্কৃত করিয়া লওয়া হয়; এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দেওয়া যায়। বিদ্যাপতি নিজ মাতৃভাষা মৈথিলে তাঁহার অমূল্য পদরাজি লেখেন, আবার তিনি পশ্চিমা ভাষা অবহট্‌ঠেও কবিতা এবং কাব্যও লেখেন।

"বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় রচিত গান বাঙ্গালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায়-মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙ্গালীদের ভাল লাগায়, তাঁহারা উহা গাইতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ চর্চ্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হইবার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে, বাঙ্গালীর মুখে অল্পকালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধি রহিল না; মৈথিলে বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ ঘটিল, এবং এই মিশ্র ভাষায় দুই চারিটী অবহট্‌ঠ ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তাহা না মৈথিল, না বাঙ্গালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙ্গালাদেশে লোকের কাছে এই মিশ্র ভাষার একটা নামকরণ হইল; ব্রজমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া এই পদ, এই জন্য ইহার

নাম হইল 'ব্রজবুলী'। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূলের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপভেদ ও মথুরা-আগরা অঞ্চলে প্রচলিত 'ব্রজভাখা' হইতে এই 'ব্রজবুলী', সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। 'ব্রজবুলী' হিন্দী নয়, 'ব্রজভাখা'ই হিন্দী; 'ব্রজবুলী' প্রাকৃত প্রভাবে জাত বাঙ্গালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি-বাঙ্গালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট, কৃত্রিম ভাষা। দুই-একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ :—

"বাঙ্গালা 'আমি দেখিলাম', বা 'দেখিলুম,—লুঁ,—নু' (='দেখ'+'ইল'+'আম', বা 'উম্, উঁ'); মৈথিল 'হম দেখলহুঁ', বা প্রাচীন কবিতার ভাষায়, 'হম পেখলহুঁ, পেখলুঁ' ('দেখ' বা 'পেখ'+'অল'+'অহুঁ'); ব্রজবুলীতে, 'হম পেখনু' (='দেখিনু'+'পেখলুঁ', দুইয়ের মিশ্রণে) কিন্তু ব্রজভাখা বা পশ্চিমা-হিন্দীতে, 'মৈঁ দেখ্যৌ', হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বা উর্দুতে মৈঁনে দেখা'; পশ্চিমা অপভ্রংশে 'মইঁ দেখিঅউ', মাগধী অপভ্রংশে *'মইঁ দেক্‌খিল্ল'।

"তদ্রূপ বাঙ্গালা—'আমি চলিলুঁ, চলিনু, গেলুঁ, গেনু'; মৈথিলী—'হম চললহুঁ, গেলহুঁ'; ব্রজবুলী—'হম চলনু, চললুঁ, গেলুঁ'। কিন্তু ব্রজভাষা—হোঁ চল্যৌ, গয়ৌ', হিন্দুস্থানী বা হিন্দী 'মৈঁ চলা, গয়া'; পশ্চিমা (শৌরসেনী) অপভ্রংশে—'হঁউ চলিঅউ, চলিউ, গঅউ, গউ'; মাগধী অপভ্রংশে—*'হঁউ চলিল্ল, গইল্ল'।

"কচিৎ পশ্চিমা-হিন্দীর প্রভাবও ব্রজবুলীতে আসিয়া গিয়াছে। ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলের উপর পশ্চিমা-হিন্দীর উৎপত্তি স্থল পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রভাবের মত। যেমন, ব্রজবুলী 'সো চলি গেও'='সে চলিয়া গেল', মৈথিলীতে হইবে 'সে চলি গেল', কিন্তু ব্রজভাখায় 'সো বা সু চলি গয়ৌ'; শৌরসেনী অপভ্রংশে 'সো, সু চলি গঅউ, গউ', কিন্তু মাগধী অপভ্রংশে *'সে, সি, চলিঅ, চলী, চলিয়া গইল্ল'।

"ভাষার রূপের বিশ্লেষ করিলে দেখা যাইবে যে, 'ব্রজবুলী' মৈথিল ও বাঙ্গালার মিশ্রণে ষোড়শ শতকে উদ্ভূত। বহু বাঙ্গালী পদকর্ত্তা, বিদ্যাপতির গানের বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত বিকৃত ভাষাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করায়, ইহা একটী কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষা হিসাবে দাঁড়াইয়া গেল। আসাম ও উড়িষ্যায়ও এই মিশ্র কৃত্রিম ব্রজভাষা ব্যবহৃত হইত।

বিদ্যাপতির ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে স্যর শ্রীযুক্ত জর্জ্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রবন্ধকার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে সর্ব্ব-শেষ অনুসন্ধান পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছেন—বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা' কাব্য আলোচনা ব্যপদেশে। ইহাতে বিদ্যাপতির তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলীর আলোচনায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ আলোচনার উল্লেখ করিতেই হইবে।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।
৬।৬।৩০	

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ সঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায়, সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চট্টগ্রাম-শাখা, চট্টগ্রাম; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ বীডন রো; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫ আপার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত চুণীলাল মিত্র, ১৮ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঃ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, ২১ পাথুরিয়াঘাটা ১ম লেন; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, "বাসন্তী-কার্য্যালয়", ১৪ জগন্নাথ দত্ত ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্ত-বাগীশ, ১১ গুলু ওস্তাগর লেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ, ২৯এ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, হাটখোলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার, ৬৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ লাহা, ৫৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহা, ৫৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত এম এ, বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলের শিক্ষক, রাধানুগর, বর্দ্ধমান। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মিশ্র, চীফ ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, ৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মহম্মদ মোজাম্মেল হক বি এ, ৪০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, সঃ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, ৩৪ থিয়েটার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মৈত্র এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া। শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম এ, ভাটপাড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত ডি এস্‌সি (লণ্ডন), প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর, যাদবপুর, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২৭ বেণেটোলা লেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক; শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে এম এ, অধ্যাপক রিপন কলেজ, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—১। রক্তজবা, ২। বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ, ৩। তিলকের তিরোভাব, ৪। শরণাগতি, ৫। অমিয়-গীতা; শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—৬। অর্ঘ্য; শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—৭। শান্তিলতা, ৮। বাল্যলীলা-সূত্রম্, ৯। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণ বা আসাম ও ঢাকা দক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ; শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী—১০। ভক্তির প্রাণ; শ্রীযুক্ত রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর—১১। সংস্কা-রহস্য; শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—১২। মুক্তার মুক্তি; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১৩। আলমগীর, ১৪। আলিবাবা, ১৫। কিন্নরী, ১৬। চাঁদবিবি, ১৭। দৌলতে দুনিয়া, ১৮। নিয়তি, ১৯। পদ্মিনী, ২০। পলিন, ২১। প্রতাপ আদিত্য, ২২। বরুণা, ২৩। বঙ্গে রাঠোর, ২৪। বাদসাজাদী, ২৫। বাসন্তী, ২৬। বিদুরথ, ২৭। বেদৌরা, ২৮। বৃন্দাবন-বিলাস, ২৯। ভীষ্ম, ৩০। ভূতের বেগার, ৩১। মন্দাকিনী, ৩২। রক্ষ ও রমণী, ৩৩। রঞ্জাবতী, ৩৪। রঘুবীর, ৩৫। রত্নেশ্বরের মন্দিরে, ৩৬। রূপের ডালি, ৩৭। রামানুজ, ৩৮। সপ্তম প্রতিমা, ৩৯। সাবিত্রী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪০। শান্তিজল, ৪১। মাসিক বসুমতী, ১৩৩০ (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা); শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য—৪১। হাসির তোড়া।

The Secretary, Smithsonian Institution—৪২। Villages of the Algonquian, Siouan and Caddoan Tribes west of Mississippi. The Director, Geological Survey of India—৪৩। Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part 3. The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—৪৪। The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1925. The Superintendent, Govt. Printing, India—৪৫। Epigraphia Indica, Vol. XVI. Part VI. April 1922. ৪৬। Do. Vol. XVI. Part VII. July 1922. The Secretary, Museum of Fine Arts, Boston—৪৭। Forty Seventh Annual Report of the Museum of Fine Arts for the year 1922. Le Editeur, Librairie Honore Champion —৪৮। Memoires De La. Societe De Linguistique De Paris. The Registrar, Calcutta University—৪৯। Journal of the Department of Letters. Vol. X, 1923. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—৫০। Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year 1921-22. The Secretary, Smithsonian Institu-

tion—৫১। Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1922. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—৫২। Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XII. শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ—৫৩। Essays Civll and Moral—৫৪। Characters of Shakespear's Plays. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫৪। Tales from Guy De Maupassant. ৫৫। Where Love is there God is also. The Godson. ৫৬। What men live by. What shall it profit a man. ৫৭। The Two Pilgrims. If you neglect the fire you don't put it out. ৫৮। Master and Man. ৫৯। Ivan the Fool. ৬০। The Relations of the Sexes (Count Leo Tolstoy) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু—৬১। Haridasi. The Director General of Observatories—৬২। Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India in 1922-23. The Director, Geological Survey of India—৬৩। Records of the Geological Survey of India 1923. Vol. LV. Part I. The Superintendent, Govt. Printing, India—৬৪। Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1921-22.

গ—পরিশিষ্ট

প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৭১। দময়ন্তী নলের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্যান্য রাজগণ নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দময়ন্তী নলকে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্যান্য নৃপতিগণ আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া, সকলে মিলিয়া নলকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেবতাদের প্রসাদে নল, একসঙ্গে সকলকেই পরাভূত করিলেন। নৃপতিগণ পরাভূত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৭২। কলির অনুরোধে দ্বাপর, অক্ষ অর্থাৎ পাসারূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট গমন করেন এবং কলির প্ররোচনায় নল, পুষ্করের সহিত পাসা খেলায় প্রবৃত্ত হইলে, অক্ষরূপী দ্বাপরের প্রভাবে নল পরাজিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নলকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য কলি, দ্বাপরের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, দ্বাপর প্রথমতঃ কলিকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কলি তাহাতে সম্মত হইল না। তখন দ্বাপর, নলের মত ধার্ম্মিক রাজার বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে পারিব না, এই কথা বলিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া গেলেন। একমাত্র কলির প্রভাবেই নল, পুষ্করের নিকট পরাজিত হইলেন।

মূল মহাভারত

বনপর্ব্বের ৫৮ অধ্যায়ে অক্ষে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করিতে কলি, দ্বাপরকে অনুরোধ করিয়াছে। এবং ৫৯ অধ্যায়ে দ্বাপরের সহিত কলি, নলের নিকটে উপস্থিত হইল বলা হইয়াছে। পরে আর দ্বাপরের কোন উল্লেখ নাই। কলি নিজেই পাসা হইয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল, এইরূপ কথা আছে।

কাশীদাসী মহাভারত

১৩। রাজা নল, বনমধ্যে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি একাকী বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অজগরের সম্মুখে পতিত হন। তাঁহার কাতর চীৎকার-শ্রবণে এক ব্যাধ আসিয়া সাপকে মারিয়া ফেলে। দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পরে ব্যাধ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে, দময়ন্তীর শাপে ব্যাধ ভস্ম হইয়া যায়। পরে তিনি বণিক্‌গণের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে চেদীরাজ সুবাহুর আশ্রয়ে সৈরিন্ধ্রীবেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। দময়ন্তীর পিতৃনিযুক্ত ব্রাহ্মণ চর এইখানে তাঁহার সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া যায়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নল, বনমধ্যে একাকী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি দুঃখিত চিত্তে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি নলের উদ্দেশে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীর পিতা কর্ত্তৃক দময়ন্তীর অন্বেষণে নিযুক্ত চর ও সৈন্যগণ সেই দিকে আসিতেছিল। তাহারা আর্ত্তস্বর শুনিয়া, সত্বর আসিয়া ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলিল ও দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে পিতৃ-সকাশে লইয়া গেল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৪। ও দিকে নল, দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে দাবানলে বেষ্টিত কর্কোটক নামে একটি নাগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে দাবানল হইতে উদ্ধার করেন। এই নাগের দংশনে নল বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হন এবং তাহারই উপদেশ মত তিনি ঋতুপর্ণ রাজার সারথিত্ব স্বীকার করিয়া, সেখানে অবস্থান করেন। পরে ঋতুপর্ণের সহিত বিদর্ভনগরে যাইবার সময় নল, তাঁহার

নিকট হইতে দ্রব্য-সংখ্যা-বিস্তার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্রের তেজে কলি, নল-দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দাবানলের মুখ হইতে নল, একটি সর্পকে উদ্ধার করেন। সর্প ইহাতে পরম কৃতজ্ঞ হইয়া নলকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিল এবং বলিল, পাপিষ্ঠ কলি আপনার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে। আচ্ছা, আমি তাহারে প্রতিশোধ দিতেছি। এই বলিয়া নাগ, নলের পৃষ্ঠে দংশন করিল এবং সেই বিষের জ্বালায় কলি তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন নল, বিকর্ণ নামে এক রাজার দেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রধান অমাত্যরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৬ই আশ্বিন ১৩৩০, ২৩এ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বাসুলীদেবী" এবং (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয়-লিখিত "প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা।" ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পুস্তকপ্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। (গ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৫। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বাসুলীদেবী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাসুলীদেবীর স্বরূপ, নাম, উৎপত্তি ও তিনি কোন্ ধর্ম্মের দেবতা, এই সকল বিষয়ে প্রচলিত মতের আলোচনা এবং বাসুলীদেবীর মূর্ত্তি পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত বাসুলী মূর্ত্তিটি বাগীশ্বরী বা সরস্বতীমূর্ত্তি এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'বাগীশ্বরী' শব্দ অনায়াসে বাসুলীরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "প্রাচীন মূর্ত্তি আলোচনা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। কারণ, ঐ বিষয়ে আমি অনধিকারী। প্রবন্ধ-লেখক বাশুলী দেবীকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা বাগীশ্বরীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহার এই ধারণার মূল হইতেছে,—(১) সরস্বতীর ধ্যান, যেটী পড়িয়া তিনি সরস্বতী পূজার দিন নান্নুরে বাশুলী মন্দিরের পাশে মৃন্ময়ী সরস্বতীর চরণে অঞ্জলি দেন; ঐ ধ্যানে "বাগীশ্বরী" শব্দ আছে। প্রবন্ধকার ঐ ধ্যানটীর কথা আগে জানিতেন না। তিনি অনুমান করেন, ধ্যানটী দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন, এবং বাশুলীই যে বাগীশ্বরী, নান্নুরে তাঁহা কর্ত্তৃক শ্রুত এই ধ্যান-মন্ত্র, তাঁহার বিবেচনায়, সেই স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবন্ধ-পাঠের সময় এই মাত্র আমরা দেখিলাম যে, ধ্যানটী পূজনীয় সভাপতি মহাশয়ের মুখস্থ আছে, এবং এটী প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য, বা কেবলমাত্র নান্নুরে নিবদ্ধ নয়। সুতরাং এই ধ্যানটীকে আশ্রয় করিয়া বাগীশ্বরী-বাশুলীর অভিন্নতা অনুমান করা চলে না। (২) চণ্ডীদাসের ভিটার সংলগ্ন ষষ্ঠীতলার বটগাছের তলায় ভগ্ন মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি। বৌদ্ধ দেবতা-সভায়, মঞ্জুশ্রীর শক্তি হইতেছেন বাগীশ্বরী। নান্নুরে ভগ্ন মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার শক্তি বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব নহে; পরে এই বাগীশ্বরীর স্মৃতি বাশুলী দেবীর নামে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে। এই মূর্ত্তির সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও মত নাই; তবে ইহা খুবই সম্ভবপর মনে হয়। মূর্ত্তি আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মত এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য। (৩) বাগীশ্বরী শব্দের বিকারে বাশুলী। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই মত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। 'বাগীশ্বরী', মাগধী প্রাকৃতে 'বাগীশ্‌শলী', বাইশ্‌শলী', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'বাইশলী', পরে 'বাশলী' (চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত রূপ 'বাসলী'), পরে 'বাশুলী'। এদিকে কোনও গোল আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এ সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়াই চরম কথা বলা চলে না।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

"শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু প্রবন্ধে বিশেষ পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্য-বাদের পাত্র। দুঃখের বিষয়, তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও 'বজ্রেশ্বরী'কে 'বাশুলীতে' পরিণত করা

যায় না। বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর বা মঞ্জুঘোষের অপর নাম। তাঁহার শক্তি সরস্বতী—বাগীশ্বরী নহে। তন্ত্রের ভাসে বাগীশ্বরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গয়া, কাশী, আগরা প্রভৃতি স্থানে বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই আকারগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধোক্ত বাশুলী প্রাচীন নয়। চণ্ডীদাসের বহু পরে এই মূর্ত্তি মন্দিরে বসান হয়। উড়িষ্যায় বাসিসি বা বাসিনী নামে বাশুলী খ্যাত আছেন। চণ্ডীদাস বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্রযান মতাবলম্বী ছিলেন, ইহা আমাদের সভাপতি মহাশয়, বেগুল ও হজ্‌সন সাহেব বলিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

"বাশুলীর ধ্যান দ্বারা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় চণ্ডীদাসকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই হিসাবে আমরা সকলেই বৌদ্ধ। বাশুলী সম্ভবতঃ কোন লৌকিক অনার্য্য দেবতা।"

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বিপিন বাবুর মন্তব্যের উত্তরে বলিলেন,—

"লেখক চণ্ডীদাসকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে বলিয়াছেন, বাশুলী খুব সম্ভব কোনও লৌকিক অনার্য্য দেবতা, পরে ব্রাহ্মণদের হাতে তাঁকে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে অভিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে—ইহা খুবই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ও সহজিয়াদের সঙ্গে দেশের পৌরাণিক ধর্ম্মমতের কি সম্বন্ধ, তাহা, আশা করি, আমরা পূজনীয় সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিতে পাইব।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—

"প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বাশুলীর মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং সে স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন। এ সকল কাজ বড় দুরূহ। বাঙ্গালা দেশের ঠাকুর যে বৌদ্ধ হতে পারে, তাহার জ্ঞান অনেকেরই নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গেট্ সাহেব একটা সার্কুলার ছাপিয়ে বাঙ্গালা দেশে সকল ডেপুটীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাহাতে দেশের নানা স্থানের মূর্ত্তি সম্বন্ধে সকলকে আপন আপন মত ও বিবরণ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। উত্তরে বহু মত পাওয়া গিয়াছিল। রামেন্দ্র বাবুও তাঁহার দেশের কথা লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দপ্তরখানায় এই সব নথি আছে। অনুসন্ধান করে পড়লে অনেক খবর পাওয়া যাবে। তারপর এই ২৩ বৎসর ধরে অনেক বৌদ্ধ দেবতা এসে হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে মিশে গেল—অনাচরণীয়দের ঠাকুরগুলিও এই ভাবে আমাদের মধ্যে এসে পড়ল। সহজিয়া বজ্রযান—কালচক্রযান—এই সকল বিষয়ে অনেকে কিছু জানেন না। এ সকল বিষয়ে কিছু কিছু পুথি আলোচনা করে দেখেছি। অনেক পরিশ্রমে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। সহজযান আগে—বজ্রযান পরে। সহজে স্ত্রী-চিহ্ন নাই। এ সকল কথা অশ্লীল বলা হইয়াছে—বাস্তবিক অশ্লীল নহে।

"বাশুলীর ও বিশালাক্ষীর ধ্যান পাশাপাশি রেখে দেখলে দেখা যায়, দুইটিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মঙ্গলচণ্ডী বাশুলীর অন্যতম আকার (form)."

(খ) দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি

মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন এবং অবশিষ্ট অংশ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অধিবেশনগুলির আহ্বান-পত্র মুদ্রিত ও বিতরিত হওয়ার পরে পরিষদের সদস্য, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ সুকুমার রায় বি এস্‌সি মহাশয়ের অকালে পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই হেতু অদ্যকার কার্য্য-তালিকায় এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। তিনি পরিষদের একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি চিত্র তিনি স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তিনি তাঁহার সঙ্কল্প সফল করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু মৃত মহাত্মার এই সঙ্কল্প কোন মহানুভব ব্যক্তি দ্বারা পূরণ হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সকলের নিকট আবেদন জানাইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, সুকুমার রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য রচনায় ও 'সন্দেশ' সম্পাদনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। বিলাতের Nurse-balladsএর মত তিনি "আবোল-তাবোল" নামক যে কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজি ভাষায় বিলাতের ও এদেশের সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারে বহুদিন হাফ্‌টোন্ ব্লক ও ফটোগ্রাফী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং এদেশে হাফ্‌টোন্ ব্লকের নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ, বরিশাল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চক্রবর্ত্তী, ১৫ সুরী লেন (ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বি এন আর্)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয়, সমঃ—ঐ, সদঃ—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, পোঃ ঘাটনগর, দিনাজপুর; মৌলবী মহম্মদ দিদার বক্স সরদার, বর্ষাইল, নওগাঁ, রাজসাহী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশী শাখা-পরিষৎ সম্পাদক), ৩৫ মিশরী পোখড়া, বেনারস সিটি।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

The Superintendent, Govt. Printing India—১। Epigraphia Indica, Vol. XVII. Part II, April 1923. ২। Annual Report of the Director General of Archaeology in India, 1920-21. ৩। Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 14 (Antiquities of Bhimra and Rajauri). The Director, Geological Survey of India—৪। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Part I. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫। The Modern Review, Vol. XXXIII. Part I. from January to June—৬। Ancient Assyria. ৭। "After this manner pray ye." Le Editeur Librairie 'Ancienne Honore' Champion—৮। Bulletin de la Societe De Linguistique De Paris.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৭৫। অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের নিকট নল গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, চরমুখে দময়ন্তী এই সংবাদ পাইয়া, মাতার সহিত পরামর্শপূর্ব্বক সুদেব নামে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের নিকট রাজার নামে এই মর্ম্মে এক পত্র দিলেন যে, "রাত্রি প্রভাতে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে; দেশ বিদেশের রাজারা পূর্ব্বেই বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাকেও নিমন্ত্রণ করা হইতেছে।" উদ্দেশ্য, ঋতুপর্ণের সারথিরূপে নল যদি যথার্থই সেখানে থাকেন, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনিই ঋতুপর্ণকে লইয়া বিদর্ভে আসিতে পারিবেন; অন্য কেহ পারিবে না। কেন না, নলের ন্যায় সারথি-বিদ্যা পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। অপর দিকে স্বয়ম্বরের কথা একেবারেই মিথ্যা, কেবল নলকে আনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দময়ন্তীর পিতা, দময়ন্তীর অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত-চিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে নলের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্ত্রীদের পরামর্শে স্থির হইল, দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষিত হইবে, তাহা হইলে নল যেখানেই থাকুন, সেই স্বয়ম্বর-সভায় নিশ্চয় আসিবেন।

পরামর্শ অনুসারে পৃথিবীর সকল রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল ; নল যে বিকর্ণ রাজার অমাত্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও নিমন্ত্রিত হইলেন এবং বিদর্ভনগরে স্বয়ম্বরের যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে ঋতুপর্ণের নিকট পত্র প্রেরণের উল্লেখ নাই, দময়ন্তী সুদেবের নিকট মৌখিক ঐ সব কথা বলিয়াছেন।

কাশীদাসী

৭৬। যথাসময়ে নলের সহিত রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভরাজ ভীমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও কুশল প্রশ্নাদির পর ভীম যখন তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি স্বয়ম্বরের কথা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অগত্যা ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছেন বলিলেন। তখন বিদর্ভরাজ তাঁহার অবস্থানের জন্য পৃথক্ প্রাসাদে স্থান দিলেন এবং অন্যান্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাহুক নামধারী নল অশ্বশালায় রথ ও অশ্ব রাখিয়া দিলেন।

সপ্তরী মহাভারত

রাজা বিকর্ণ, দূতমুখে নিমন্ত্রিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে বিদর্ভে যাইবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় নল সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিকর্ণ তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, নল বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে বিদর্ভে লইয়া যাইবার জন্যই রাজা ভীম এইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। তখন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিকর্ণকে বিদর্ভে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া উভয়ে রথারোহণে যাত্রা করিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বিদর্ভে পৌঁছিলেন। সেই সময়ে রাজা ভীম স্বয়ম্বরে সমাগত অন্যান্য রাজগণকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অন্যান্য রাজার ন্যায় বিকর্ণকেও তিনি সমাদরপূর্ব্বক পৃথক্ বাসস্থানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী

৭৭। অশ্বশালায় বাহুক-নামধারী নলের নিকট কেশিনী নামক একজন দূতী পাঠাইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষান্তে দময়ন্তী যখন নিশ্চিতরূপে অবগত হইলেন যে, এই ব্যক্তিই রাজা নল, তখন তিনি মাতার অনুমতি লইয়া, পুত্র কন্যা সহ অশ্বশালায় গিয়া নলের সহিত মিলিত হইলেন।

সপ্তরী মহাভারত

মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক নানারূপ অনুসন্ধানান্তে রাজা ভীম অবগত হইলেন যে, নল জীবিত আছেন, এবং এই স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরদিবস যথাসময়ে স্বয়ম্বর-

সভার অনুষ্ঠান হইলে দময়ন্তী সেই সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অন্যান্য রাজবৃন্দের সহিত ইন্দ্র প্রভৃতি চারিজন লোকপাল নলের আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন দময়ন্তী নলের অদর্শনে নানারূপ বিলাপ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিলে দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গুপ্তবেশে অবস্থিত নলকে বলিলেন যে, দময়ন্তী অতিশয় পবিত্রস্বভাব, ইঁহার কোনও পাপ নাই। অতএব তুমি স্বরূপ ধারণ করিয়া ইঁহার সহিত মিলিত হও। দেবগণের কথা শুনিয়া নল সভামধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলে দময়ন্তী তাঁহার গলে মাল্য অর্পণ করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে একটু পার্থক্য এই যে, দূতী দ্বারা পরীক্ষান্তে পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বাহুক-রূপী নলকে অন্তঃপুরে আনয়নপূর্ব্বক দময়ন্তী তাঁহার সহিত মিলিত হন।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৩ই আশ্বিন ১৩৩০, ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয়-লিখিত "আমাদিগের অয়নাংশ।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় কর্তৃক গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এম্ এ, পি আর এস্, ১২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

৩। ক—পরিশিষ্ট লিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। খ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দেওয়া হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নোক্ত পদক দান করিলেন—

(ক) শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ—ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক।

(খ) „ প্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত এম্ এ—হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক।

(গ) „ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রৌপ্য-পদক।

(ঘ) „ কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ সাহিত্যরত্ন—শশিপদ রৌপ্য-পদক।

(ঙ) „ শৈলেশচন্দ্র রায় বি এ—নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক।

শেষোক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত পদকগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধের নাম জানাইলেন এবং পদকদাতা ও পরীক্ষকগণকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

প্রবন্ধের বিষয়—১ম পদকের জন্য—"বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

২য় „ "জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান"।

৩য় „ "পঞ্চাশটি অপ্রকাশিত প্রবাদ-সংগ্রহ"।

৪র্থ „ "বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন"।

৫ম „ "নবীনচন্দ্রের কাব্যে জরৎকারু চরিত্র"।

পদকদাতা—১ম ও ৫ম পদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ২য় পদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ৩য় পদক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং চতুর্থ পদক দেবালয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পরীক্ষক—১ম প্রবন্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২য় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩য় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৪র্থ প্রবন্ধ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং ৫ম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় পদকদাতা ও পরীক্ষকগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৬। "আমাদিগের অয়নাংশ" নামক প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় উহা পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গ্রন্থে অয়নাংশ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, অয়নাংশ নিরূপণের মূল-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তৎপর তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূল-তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়া, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের মূল-তত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের উপায় সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য দিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Science নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুদিগের অয়নাংশ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লেখক মহাশয়ের নিকট তাঁহার প্রবন্ধটি যুক্তিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় তিনি অদ্যকার প্রবন্ধে সেই প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বাবু অগু সভায় উপস্থিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে তিনি শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত একেন্দ্রবাবুকে এবং প্রবন্ধের ব্যাখ্যার জন্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।
২০।৬।৩০

ক—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক

পুথি

প্রদাতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি—১। নাড়ী-চক্র, ২। নাড়ী-লক্ষণ, জ্বর-লক্ষণ, নাড়ী উৎপত্তি।

পুস্তক—বাঙ্গালা ও ইংরাজী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। এক সত্যে হিন্দু-মুসলমান, (২) A Little Book of Japanese Wisdom. (৩) The Secret of a clear head. (৪) Providence and Faith, এতদ্ব্যতীত তিনি ৪৪ খানি ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তক দান করিয়াছেন। কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৫) প্রাচীন হিন্দু-দণ্ডনীতি; শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ—(৬) স্রোতের ঢেউ, (৭) প্রতিভা; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—(৮) সদ্বৈদ্যকুল-চন্দ্রিকা; The Secretary, Smithsonian Instt. Washington.—(৯) Thirty Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology—1915-16. (১০) Designs on Pre-historic Pottery from the Mimbres Valley, New Mexico. (১১) The Distribution of Evergy in the Spectra of the Sun and Stars. (১২) Some Practical Aspects of Fuel Economy. The Supdt. Govt. Printing, India,—(১৩) Report of the Superintendent, Archaeo-

logical Survey, Burma, for the year ending 31st March, 1923. The Chief-Inspector of Explosives, India,—(১৪) Twenty Fourth Annual Report of the Chief-Inspector of Explosives in India, being his Annual Report for the year ending 31st March 1223.

খ—পরিশিষ্ট

প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৮। রাজা ঋতুপর্ণ যখন শুনিতে পাইলেন যে, বাহুক-নামধারী তাঁহার সারথিই নিষধের অধিপতি রাজা নল, তখন তিনি নলের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনান্তে নানাবিধ ইষ্টালাপপূর্ব্বক অন্য একজন সারথি লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিকর্ণ রাজা দূত দ্বারা নলকে নিজের নিকট ডাকাইয়া আনিলে নল, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিকর্ণও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে বিকর্ণকে নল, পবনমন্ত্র দান করিলে, সেই মন্ত্রে রথ চালাইয়া আকাশ-পথে তিনি দেশে গমন করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। ঋতুপর্ণ, নলকে নিজের নিকট আহ্বান করেন।

ইহার পর সঞ্জয়ী মহাভারতে সংক্ষেপে শকুন্তলার উপাখ্যান আছে। মূল এবং কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। এই উপাখ্যানেও উভয় পুথিতে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।—

কাশীদাসী মহাভারত

১৯। শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনের যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বয়স উপস্থিত হইল, তখন মহর্ষি কণ্ব, কপিতয় শিষ্য দ্বারা সপুত্রা শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, দেবগণ আকাশ-বাণী দ্বারা দুষ্মন্তকে জানাইয়া দিলেন যে, শকুন্তলা তোমার ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বদমন তোমার পুত্র। ইঁহাদিগকে তুমি গ্রহণ কর। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া, দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায়, কণ্ব মুনি, শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুষ্মন্ত, ব্রহ্মশাপে শকুন্তলার সহিত তাঁহার পরিণয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই শকুন্তলার নানাবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াও তিনি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন না। তখন শকুন্তলা রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একাকী অসহায়ভাবে এক প্রান্তরমধ্যে বিলাপ

ও রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার জননী মেনকা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন এবং শকুন্তলা সেইখানে একটি পুত্র প্রসব করেন। কি কারণে, তাহার উল্লেখ নাই—পরে দুষ্মন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর অনুরূপ।

কাশীদাসী মহাভারত

৮০। ইন্দ্রের আদেশে লোমশ মুনি, কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া, তাঁহাকে অর্জ্জুনের কুশল-সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করেন।

সপ্তরী মহাভারত

পাঁচ বৎসর যাবৎ অর্জ্জুনের অদর্শনে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া কাম্যক বন হইতে ধবল পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতেছেন। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে লোমশ মুনি এইখানে আসিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অর্জ্জুনের কুশল-সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে ইন্দ্র ও অর্জ্জুন উভয়ের অনুরোধে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮১। সৌগন্ধিক পুষ্প আনিবার জন্য ভীম, গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়াছেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ঘটোৎকচের সহায়তায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে অবস্থানকালে জটাসুর নামে এক অসুরকে ভীম বিনাশ করেন।

সপ্তরী মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ঘটোৎকচের সাহায্যে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া ভীমের সহিত পুনরায় কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর জরা নামে এক রাক্ষসকে ভীম কাম্যক বনে সংহার করেন।

মূল মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভীমের সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং সেই বদরিকাশ্রমে ভীম কর্ত্তৃক জটাসুর নিহত হয়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২০এ আশ্বিন ১৩৩০, ৭ই অক্টোবর ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়-লিখিত "কৌল-মার্গ-রহস্য" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। কোন নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত না হওয়ায় এ বিষয়ের আলোচনা হইল না।

৩। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। খ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পাটনার বাঙ্গালীগণের নেতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দার্শনিক পণ্ডিত ও বিখ্যাত সাহিত্যিক রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি পাটনার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও মেদিনীপুরের সম্মিলনে দর্শন-শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অতি প্রাচীন সদস্য ছিলেন। এই অধিবেশনের আহ্বান-পত্র মুদ্রিত হইবার পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহা অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়ভুক্ত করিতে পারা যায় নাই। আশা করি, আগামী অধিবেশনে তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। অদ্য এই দুঃসংবাদ জানান হইল মাত্র।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"৺পূর্ণেন্দু বাবুর মৃত্যুতে যে বঙ্গদেশের ও বিশেষভাবে প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের এবং সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমরা তাঁহার অকালমৃত্যুতে বিশেষ শোক-সন্তপ্ত।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন।

একত্রিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্ তাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ (পদত্যাগ করায় পরে) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (অসুস্থতা বশতঃ পদত্যাগ করিবার পরে)
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাহাদুর ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম এস্ ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্য-কলা-সুধাকর ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, এফ সি এস্ (লণ্ডন) ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্ সি ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ ; শ্রীযুত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত জগন্নাথদশক, ইদানীং কেহ দেখিয়াছেন বা উহার অস্তিত্ব জানেন বা ইহা কখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সন ১২৭৪ সালে ৯৬নং আহীরিটোলা ঠিকানায় শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'নিত্যকর্ম্ম' পুস্তকের ৫—৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টকং" দেখিতে পাই। উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। উহার প্রথম শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইল,—

"কদাচিৎ কালিন্দীতটে বিপিন সঙ্গীততরল
মদাভি দশনকমল স্বাদু মধুপং।
মাপস্ত্য ব্রহ্মাম ভবতি গণেশার্চ্চিতপদঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।"

১৩২৮ চৈত্র সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে" দেখিলাম, "কবি বিশ্বম্ভর পানি ও জগন্নাথ-মঙ্গল" প্রবন্ধ-লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলিতেছেন,—জগন্নাথমঙ্গলের সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে "জগন্নাথের স্তব" নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।"

তবেই দেখা গেল, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জগন্নাথ অষ্টক প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ, উহা হইতে প্রকৃত পাঠের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। সন ১৩০১ সালে যে জগন্নাথ অষ্টক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং জানি না, উহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টকের শোধিত সংস্করণ কি না। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার গৃহস্থিত পুথিসমূহের মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাতড়া পাই। ঐ তিনখানিতেই তিনটি জগন্নাথদশক লিখিত, জগন্নাথ অষ্টক নহে। তিনখানি পাতড়ার জগন্নাথদশকের পাঠের মেলন করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থানকালে এই জগন্নাথদশক রচনা করিয়া, ইহা দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে জগন্নাথদশকের দুইটি শ্লোক নৃত্য বাবুর আদর্শ পাতড়ায় নষ্ট হওয়ায় তৎপ্রকাশিত "নিত্যকর্ম্মে" জগন্নাথদশক, জগন্নাথ অষ্টকের রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যে জগন্নাথদশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই,—

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসংসর্গিকবনে
মুদাভীরীনারীবদনকমলস্বাদুমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥

করে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধৎ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবিপিনলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে। ২ ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥
কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসেব্যস্ফুরদমলপঙ্কেরুহপদঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণমুখোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥
পরং ব্রহ্মাপীড্যঃ কমলবদনোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দে রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখী
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈ-
স্তুতঃ প্রাদুর্ভাবং প্রস্তুতপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং মুগ্ধসদয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
বরস্ত্বং সংসারং হততমমসারং সুরপতে
বৃথাভোগাসক্তং সততমপরং দৈবতপথি।
অহং যাচে নিত্যং পরমমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
নচ প্রাপ্যং রাজ্যং নচ কনকমাহো ন বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলবরকাম্যাং বরবধূং।
সদাকালং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥
ঘনশ্যামাকারঃ সুরমধুরধামা ভবপিতা
মহেন্দ্রাদেরাদ্যো বররমণরাধার্পিততনুঃ।
লসৎশ্রীবৎসাঙ্কস্তরুণতুলসীমাল্যসুভগো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৯ ॥

সদানন্দাকারো জগতি জগতাং কিল্বিষহরো
জগন্মূলাধারো জলধিতনয়াসেবিতপদঃ।
জরামৃত্যুধ্বংসী জলদপটলশ্যামলরুচিঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমাবিরচিতং শ্রীজগন্নাথ-দশকং সমাপ্তং॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

ভারতীয় সূদবিদ্যা

আর্য্য ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, পুরাকালে কি দর্শন, কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি কৃষিশিল্প, কি সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা, সকলেরই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূদবিদ্যা অর্থাৎ পাকপ্রণালীর কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিব।

সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা (পাকপ্রণালী) চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম। শাস্ত্রে দেখা যায়, উক্ত সূদবিদ্যায় পুণ্যশ্লোক নলরাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে কুন্তীপুত্র দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন। উক্ত দুই সূদবিদ্যাচার্য্যই পাকপ্রক্রিয়া সাধনার্থ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অতি প্রাচীন ভীমকৃত পাকশাস্ত্র কুত্রাপি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তদপেক্ষায় প্রাচীনতর মহারাজ নলকৃত পাকশাস্ত্র বিশেষ অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্য সেই মহারাজ নলকৃত "পাকদর্পণ" হইতে "মাংসোদন" (পলাউ) পাকের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছি। যাবতীয় সূপকার অপেক্ষা মহারাজ নলের এমনই পাক বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল যে, তাঁহার পাচিত ব্যঞ্জনের স্বাদ অন্যের পাচিত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত।

বনবাসিনী দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে পর, দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুতর চেষ্টায়ও নলের অনুসন্ধান না পাইয়া, অনন্যোপায় হইয়া দময়ন্তীর পিতা ভীম ভূপতি, মহাপতিব্রতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের ছল করিয়া সমস্ত রাজন্যগণকে বিদর্ভ নগরে সমবেত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নলরাজা ঋতুপর্ণ রাজার সারথি-রূপে "বাহুক" নাম ধারণ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ছিলেন। দময়ন্তী প্রচ্ছন্নভাবে সখী কেশিনী দ্বারা নলের পাচিত মাংসোদন আনাইয়া, তাহার সদ্গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া ও সুরস আস্বাদন করিয়া, এই মাংসপাচককেই নল বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলের এমনই পাক-নৈপুণ্য ছিল। যথা,—

> "পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতং। মহানসাৎ শৃতং মাংসমানয়স্বেহ ভামিনি॥
> সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ। অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী॥
> দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন। সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
> প্রাশ্য মত্বা নলং সূতং প্রাক্রোশদ্ভৃশ-দুঃখিতা॥" (মহাভারত, বন—৭৫।২০—২৩)।

অর্থ—হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার তথায় যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত বাহুকের পাচিত মাংস সেই রন্ধনশালা হইতে আনয়ন কর। দময়ন্তীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কেশিনী পুনর্ব্বার ঐ পাকশালায় যাইয়া, সেই উষ্ণ মাংস অপহরণ করিয়া, দ্রুতগতিতে আসিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। পূর্ব্বে দময়ন্তী বহুবারই নলপক্ব মাংসের আস্বাদ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এখন আবার সেই মাংস ভোজন করিয়া, অবিকল সেই আস্বাদ অনুভব করিয়া, ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুককেই নল স্থির করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এতদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নল রাজার সদৃশ পাকবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অতএব অদ্য নল রাজার কৃত "পাকদর্পণ" গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ মাংস পাকের প্রণালী জ্ঞাপন করিতেছি।

মাংসৌদন (পলাউ)

"ছাগমেষশকুন্তাদি-প্রাণিনাং পললং বুধঃ।
সমাদায় পুনস্তস্য ত্বগন্ত্রাণি সমুৎসৃজেৎ॥
তেষামেকতমং মাংসং ক্ষালয়েদ্বারিণা ততঃ।
অস্থিভিঃ সহ সংছিদ্য নিক্ষিপেত্তস্য ভাজনে॥"

অর্থ—পাঠা, মেড়া অথবা অপরাপর পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর চর্ম্ম এবং আঁত পরিত্যাগ করিয়া, তাহার মাংস লইয়া প্রক্ষালন করিবে। পরে অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া পাত্রে রাখিবে।

উৎক্রামোদকের লক্ষণ

"অনাপলং ততো ভাণ্ডে তণ্ডুলস্যোদকং শুভে।
নিধায় শুদ্ধমুদকং সমং কৃত্বাপয়েৎ সুধীঃ॥
তপ্তে পয়সি তন্মাংসং নিক্ষিপেৎ ক্ষালিতং পুনঃ।
পুনশ্চ নিক্ষিপেত্তত্র কুস্তুম্বুরী কুস্তুম্বরীং বুধঃ।
তপ্তে মাংসে পুনঃ সম্যক্‌শোধয়েৎ চিক্কনং বিনা॥
শীতলঞ্চ পুনঃ কৃত্বা কুসুমৈরধিবাসয়েৎ।
ন্যসেচ্চ মৃগনাভিঞ্চ কর্পূরং হিমবারিচ॥
মুহূর্ত্তমেকং সংস্থাপ্য প্রসূনানি পরিত্যজেৎ।"
এতদুৎক্রামমুদকমাহুঃ সূদবিশারদাঃ॥

অর্থ—উৎক্রাম-জলের লক্ষণ—পরিষ্কার পাত্রে তুষ কঙ্করাদি না থাকে, এইরূপ তণ্ডুলের (চেলেনির) জল রাখিবে এবং যে পরিমাণ তণ্ডুলের জল, সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ জল ঐ তণ্ডুল-জলের সহিত মিশাইবে। তৎপরে ঐ জল উষ্ণ করিয়া পূর্ব্বের প্রক্ষালিত মাংস ঢালিয়া দিবে। পুনর্ব্বার তাহাতে কুস্তী (কটফল) ও ধ'নের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে মাংস চিক্কন সুসিদ্ধ না হইতে (পাকস্তু ত্রিবিধো মন্দশ্চিক্কনঃ খরচিক্কনঃ, বাগ্‌ভট কহে), ঈষত্তপ্ত আভাসিদ্ধ হইলে উত্তমরূপে ঐ জল ঢালিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংসগালিত জল শীতল হইলে তাহাতে ফেলিয়া সুবাসিত করিবে। দণ্ড দুই কাল রাখিয়া ঐ পুষ্পগুলি উঠাইয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সাধিত জলকে উৎক্রাম জল কহে। ইহা পাকাচার্য্যদিগের পরিভাষা।

উৎক্রাম শব্দের যোগার্থ

"সর্ব্বোদকাতিক্রমণাৎ উৎকৃষ্টত্বাদিদং পয়ঃ।
রসসর্ব্বস্বরূপত্বাদুৎক্রামমিতি কথ্যতে॥"

অর্থ—নিজের উৎকর্ষগুণে এই জল সকল জলকে অতিক্রম করিয়াছে এবং রসের সর্ব্বস্ব সারভূত, এই জন্ত ইহাকে উৎক্রাম জল কহে।

"ত্রিভাগপূরিতাং স্থালীং তজ্জলৈশ্চ প্রমাণবিৎ।
স্থাপয়েচ্চ তথা চুল্যাং তপ্তে পয়সি বহ্নিনা॥
চতুর্থাংশান্ ক্ষিপেৎ সম্যক্ ক্ষালিতান্ গৌরতণ্ডুলান্।
ঈষৎ পাকে তু সঞ্জাতে সুশুভে শালিতণ্ডুলে॥
আদায় পক্বপললমপক্বমথবামিষং।
জলে বিলীনে তত্তক্তমঙ্গারেষু সমাবিশেৎ॥
ক্ষীরঞ্চ নারিকেলস্য নবং সর্পিস্তথৈবচ।
ন্যসেত্তত্রৈব রম্যাণি কেতকীকুসুমানি চ॥
নিক্ষিপেৎ সকলাংস্তত্র পর্য্যটপ্রমুখোদ্ভবান্।
গন্ধৈঃ কর্পূরকস্তূরীসম্ভবৈশ্চাধিবাসয়েৎ॥
তন্মুখং ছাদয়েৎ সম্যক্ বিধানেন বিচক্ষণঃ।
লিম্পেত্তদ্গন্ধরক্ষার্থং তদ্রন্ধ্রং কণিকৈর্ধ্রুবং॥
আবর্ত্তনং পুনঃ কুর্য্যাদঙ্গারেষ্বেব তান্ পুনঃ।
যাবতা মৃদুভাবং স্যাৎ তাবত্তত্র প্রযোজয়েৎ॥
এবমামিষসম্ভূতং দাপয়েদন্নমীদৃশং।
ইদং রুচিকরং বৃষ্যং পথ্যং লঘু বল-প্রদং॥
ধাতুবৃদ্ধিকরত্বাচ্চ ব্রণদোষান্ প্রশাম্যতি॥"

অর্থ—পূর্ব্বপ্রস্তুত উৎক্রাম জল দ্বারা পাকপাত্রের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে। উনানের উপরে চাপাইয়া জল উষ্ণ হইলে পরে উৎকৃষ্ট শুভ্র তণ্ডুল ধৌত করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে যখন দেখিবে, ঐ তণ্ডুল ঈষৎ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধপক্ব মাংস অথবা কাঁচা মাংস ঐ পাকপাত্রে ঢালিয়া দিবে। সমস্ত জল যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ অন্ন-পাত্র জলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়া, নারিকেলের দুগ্ধ, সদ্যোঘৃত এবং উত্তম কেতকীপুষ্প তাহাতে মিশাইবে এবং পাপর ভাজা প্রভৃতি পিষ্টককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে মিশাইবে এবং কর্পূর, মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে সুবাসিত করিবে। এই সময়ে শরা দ্বারা পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, ময়দা দ্বারা তাহার ফাঁক বন্ধ করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার জলদঙ্গারের উপরে ঐ মাংসপাত্র চাপাইয়া এমন ভাবে অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিবে, যাহাতে সেই মাংসৌদন অতীব কোমল হয়। এইরূপে পলাউ অতীব সুস্বাদু, বীর্য্যবর্দ্ধক, হিতকারী, লঘুপাক, বলবর্দ্ধক, সপ্ত ধাতুর পোষক এবং ব্রণ রোগনাশক জানিবে। মাংসপ্রিয় ধনিগণ একবার এইরূপ প্রণালীতে মাংস পাক করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা[১] ভাষায় অনুজ্ঞা

বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভ্রমার্থে[২] অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে দু'টি রূপ হয়,—

১। তুমি কর। ২। তুমি করিও।

প্রথমটীতে বর্ত্তমান কাল বুঝায়, দ্বিতীয়টীতে ভবিষ্যৎ সূচনা করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। যাহা জান, সত্য করিয়া **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা),

২। সদা সত্য কথা **বলিও** (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)।

তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) কালের রূপের সমান। কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে বিভিন্ন। যেমন—

১। তুই তাহাকে **বলিস্** যে, আমি ভাল আছি। (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)

২। তুই তাহাকে **বল্** যে, আমি ভাল আছি। (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

৩। তুই কি **বলিস্**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

ওদিকে কিন্তু সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষে বর্ত্তমান অনুজ্ঞা ও নিত্য-বর্ত্তমানের রূপ একই। যেমন—

১। তুমি সত্য **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

২। তুমি কি **বল**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

বুঝাইবার জন্য একটী চিত্র দিতেছি :—

তুমি **করিও** } ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান { তুই **করিস্** } ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান { তুমি **কর** } বর্ত্তমান অনুজ্ঞা
কর্ } বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

'না' অর্থ বুঝাইতে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপই ব্যবহার করি। যেমন—

যাহা জানিস্, সত্য করিয়া বল্, মিথ্যা **বলিস্** না।

যাহা জান, সত্য করিয়া বল, মিথ্যা **বলিও** না।

অনুজ্ঞায় মান্যার্থ মধ্যম ও প্রথম পুরুষে—আপনি বা তিনি **করুন**। তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে—সে **করুক**।

এই রূপগুলি বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে পৃথক্। পূর্ব্ববঙ্গে 'করুন' স্থানে নিত্য-বর্ত্তমানের 'করেন' দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান হইতে

১। ব্যুৎপত্তি বা প্রাচীন রূপ অনুসরণে বানান হইবে বাঙ্গালা (প্রাচীন বা° বঙ্গাল, ১৪ শতকের পারসীতে বঙ্গালহ্), উচ্চারণ অনুসারে বাংলা। "বাঙ্গলা" না ব্যুৎপত্তি-সম্মত, না উচ্চারণগত।

২। তুমি সম্ভ্রমার্থ, আপনি মান্যার্থ ও তুই তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষ। আমি এই সংজ্ঞাগুলি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার অসমীয়া ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথক্ কোন রূপ নাই। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে 'তুই', 'তুমি' বাস্তবিক যথাক্রমে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচন। ইংরেজি thee, you এর কিংবা জর্ম্মান্ deu, Sie এর সঙ্গে তুই, তুমির বচন ও প্রয়োগের তুলনা করা যাইতে পারে।

তুই—<তই, (বৌদ্ধ গান)

{তইআ (সপ্তশতকে)}

<তই, তুই, তুএ (প্রাকৃত ; তৃতীয়ায়)

<তয়া, ত্বয়া (পালি ; তৃতীয়ায়)

<ত্বয়া (সংস্কৃত ; তৃতীয়ায়)

অন্য সমজাত (cognate) ভাষার সঙ্গে তুলনায় দেখি—হিন্দী মৈথিলী 'তূ', মারাঠী 'তূঁ', গুজরাটী 'তূঁ', পঞ্জাবী 'তূঁ', শিন্ধী 'তূঁ', নেপালী 'ত'—এ সমস্তই প্রথমার একবচনে। অবশ্য আসামী ভাষার 'তই' ও উড়িয়ার 'তু' বাঙ্গালা 'তুই' পদেরই মত তুচ্ছার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন, এবং আসামী 'তুমি' ও উড়িয়া 'তুম্ভে' বাঙ্গালা 'তুমি' পদেরই মত সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বাং তুমি <তুহ্মি (মধ্যবাঙ্গালায়) <তুম্হে (বৌদ্ধগান) <তুম্হে (অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি, বহুবচনে)। নব্য-হিন্দু-আর্য্য (Neo-Indo-Aryan) ভাষার সহিত তুলনায় মারাঠী 'তুম্হী', গুজরাটী 'তমে', নেপালী 'তিমি', বেদিয়া (Gypsy) 'তুমেন', পাঞ্জাবী 'তুসীঁ', সিন্ধী 'তবহীঁ'—মধ্যম পুরুষের বহুবচনে।

যদি বাঙ্গালা, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃতে চর্-ধাতুর বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের রূপ করা যায়, তবে আমরা দেখিব—

বাং চর্ <প্রা., পা., সং., চর

বাং চর <প্রাচীন বাং., প্রা., চরহ

<পালি চরথ=সং চরত

বাঙ্গালার নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) ও অনুজ্ঞার (লোট) সম্ভ্রমার্থ মধ্যম পুরুষের গোলযোগ পালি-যুগের। পালি চরথ, প্রাকৃত চরহ=সং চরত, চরথ উভয়ই।

নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিলে—বাঙ্গালা 'চর্', আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালী চর্, সিন্ধী চরি, চরু। বাং, চর, উ. চর, পুরুলিয়া চরহ, চর, আস. চরাঁ (চন্দ্রবিন্দু প্রক্ষিপ্ত), নে. চরো, চরে, মা. চরা, হি. পা. গুজ. সিন্ধী চরো (<অপভ্রংশ চরহু)। মারাঠী ও আসামী ভিন্ন এই সমস্ত ভাষায় নিত্যবর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ একই।

এক্ষণে ১ম পুরুষের কথা। বাং সে <অর্দ্ধমাগধী সে (১মা ও ৩য়া) <সং তেন (৩য়া); বাং তিনি <সং তানি (যেমন দিদী <দাদী, তিসী <তসী <অতসী): তুলনায়—বাং সে, উড়িয়া, মৈথিলী সে, আসামী সি, ভোজপুরী সে; হিন্দী, পঞ্জাবী, সিন্ধী ব্রজবুলি সো—সমস্তই একবচন। বাং 'তিনি' মৈথিলী তনি, ভোজপুরী তৈন্হ, ব্রজ. তিনি, পঞ্জাবী. তিনী, সিন্ধী

তিনি, নেপালী তিন্‌হ। এই সমস্তই কর্ত্তা ভিন্ন অন্ত কারকের বহুবচনের শব্দরূপের মূল (stem of oblique cases)।

বাং চরুক <প্রাচীন বাং চরউক <প্রা, চরউ+ক স্বার্থে <সং চরতু।

বাং চরুন <প্রাচীন বাং চরন্ত <প্রা· পা. সং. চরন্ত।

অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে—বাং চরুক, প্রাচীন বাঙ্গালা চরু, চরউ, চরুক, চরউক, আসামী চরক ; মৈথিলী চরু, চরৌক ; উড়িয়া চরু ; মারাঠী চরো, চরু ; নেপালী চরোস্। স্বার্থে "ক" বাং. আ. ও মৈ. ভাষায় দেখা যাইতেছে।

বাং চরুন, প্রাচীন বাঙ্গালা চরন্ত (আসামী চরোক), মৈথিলী চরৌহি, উড়িয়া চরন্ত, মারাঠী চরোৎ, চরুৎ, নেপালী চরুন্।

বাং, আ. উ. নে. ভিন্ন নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষায় প্রথম পুরুষের নিত্য-বর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার রূপ একই। স্বার্থে "ক" মধ্য-বাঙ্গালায় নিত্য-বর্ত্তমান, বর্ত্তমান অনুজ্ঞা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে বিকল্পে ব্যবহৃত হইত ; যেমন সে চরে, চরেক, চরু, চরুক, চরিল, চরিলেক, চরিব, চরিবেক। আধুনিক বাঙ্গালার অনুজ্ঞা হইলে "ক" স্থায়ী হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি কোথা হইতে? প্রথমে নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আসামী ও উড়িয়ায় এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুল্যরূপ কোন পদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পুরবিয়া হিন্দীতে (Hoernlea Eastern Hindi) বাঙ্গালার তুল্যরূপ পাওয়া যায়। যেমন—'চরিহ'।[১] বাঙ্গালার ন্যায় তাহাতেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই অনুজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিন্ধী ভাষায় এবং কখন কখন নব্য-সিন্ধী ভাষায় 'চরিহে' এইরূপ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিন্দী চরিয়ো, প· চরীও।

এক্ষণে ব্যুৎপত্তি হিসাবে, বাং চরিও <চরিহ (প্রাচীন বাং বৌদ্ধগান, কৃষ্ণকীর্ত্তন ইত্যাদি <* চরিহহ <চরিহিহ (অপভ্রংশ, প্রাকৃত) <চরিষ্যথ (সং)।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের রূপ নিত্য-বর্ত্তমানের তুল্য হইলেও তাহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চরিস্ (অনুজ্ঞা) * চরিসি <চরিহসি (বৌদ্ধগান) <চরিহিসি (প্রাকৃত) <চরিষ্যসি (সং)।

চরিস্ (নিত্য-বর্ত্তমান) <চরসি—(প্রাচীন বাঙ্গালা, বৌদ্ধগান, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত)। বৌদ্ধগানে এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

১। 498. The pres. imper. may optionally add the following suff. in the 2nd person ; viz., sing. ইহ and plur. ইহ, e. g., পঢ়িহ *read thou*, পঢ়িহ *read you*. This is a respectful form of the imper. implying request or prayer rather than command, and may be called a *precative*. Sometimes it is used in the sense of a simple future. (Hoernle's Com. Gram. of Gaudian Languages, p. 339).

সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল। (ভুসুকু) ৩১ পৃঃ।
জই তুম্মে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা
নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ (ভুসুকু) ৪০ পৃঃ।

সংস্কৃত ল্‌ট্‌ হইতে উদ্ভূত মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের পদও দেখা যায়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	চরিহে, চরিএ	×
মধ্যম পুরুষ—	*চরিসি	চরিহ
উত্তম পুরুষ—	চরিমো	চরিউ, চরিউ

এইগুলির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, প্রথম পুরুষে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেহো যবেঁ বেকত **করিহে** এহা কাজ।
আহ্মার খাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ॥ ২৫১ পৃঃ
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে॥
আর বার হেন না **করিহে**।
পুরুষের আখি **নিবারিহে**॥ ২৬২ পৃঃ
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে॥
পাছে কাহাঞি মোকে না **দিহে** দোষে॥ ১০০ পৃঃ
যবে কাহ্ন না **মিলিহে** করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥ ৩৩৬ পৃঃ
যবেঁ তোরে **মারিহে** পরাণে।
তবেঁ তোকে রাখিব কোণ জনে। ৬৫ পৃঃ
শুণী কি **বুলিহে** বাপ নান্দে।
বাঁশী হারাইলোঁ মো নিন্দে॥ ৩১৪ পৃঃ
শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করেতেঁ তোহ্মা করিব চীর॥ ৪৩ পৃঃ
সখি সব নিষধ যতনে।
কেহো তার না **কহিএ** মরণে। ২৫৭ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) হইতে—

আইস্থক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ **জাইহে**।—উত্তরকাণ্ড, ১১৭ কলম

উত্তমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেমনে বঞ্চিবোঁ মোঞে একসরী কুঞ্জে। ৩৮৭ পৃঃ
আগু হউ রাধা পাঁছে লইউ আহ্মে ভার। ১৮৩ পৃঃ
এথাঁ আণ সঙ্গে আহ্মে দেখী।
আমৃতে সিঞ্চিউ[১] ছুই আক্ষী॥ ১৯৯ পৃঃ
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে। ১২০ পৃঃ
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন। ১২১ পৃঃ
আনহ সকল সখিজন
মেলী করিউ যুগতী। ১৪১ পৃঃ
সম্ভা পার কর যাইউ মথুরার হাটে। ১৩৫ পৃঃ
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন। ৩৫৪ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে—

বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিউ কথন। উত্তরকাণ্ড, ৫৬ কলম।

চরিএ <চরিহে <* চরিহএ <চরিহই (অপভ্রংশ) <চরিহিই (প্রাকৃত) <চরিষ্যতি (সং)। তুলনায় প্রাচীন-হি. চরিহই, চরিহহি, ব্রজভাষা চরিহৈ, পূরবিয়া-হি. চরী (<*চরিঈ <*চরিহী)[২]। চরিএ পদটী বড় গোলমেলে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তিন প্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়। (১) বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের বহুবচনে। আহ্মি চরিএ=সং অস্মাভিঃ চর্য্যতে। (২) বর্ত্তমান কর্ম্মবাচ্যে চরিএ=সং চর্য্যতে। (৩) ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষে চরিএ=চরিহে=সং চরিষ্যতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিকল্পে হ লোপের দৃষ্টান্ত যথা,—বারহ, বার; গোহারী, গোআরী; খাহ=খাঅ। চরিমু, চরিহিমু, চরিমো <চরিহিমো, (প্রাকৃত) <চরিষ্যাম (সং)। চরিউ, চরিউ <* চরিহু <চরীসু (অপভ্রংশ) <চরিসুসং (প্রাকৃত) <চরিষ্যামি (সংস্কৃত)।

ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুলনায় বাং চরিউ, চরিউ, ব্রজভাষা চরিহৌ (একবচন), মাড়োয়ারী চরহূ (একবচন)[৩]; বাং চরিমু, চরিমো, আসামী চরিম (এক ও বহুবচন), উড়িয়া চরিমি (একবচন), (<প্রাকৃত চরিহিমি)। উড়িয়ার চরিবি পদের বিকারে চরিমি নহে, যেমন Hoernle প্রভৃতি মনে করেন (Hpernle, ৩৬৫ পৃঃ ; Hallam এর Oriya Grammar, ৪৮১ পৃঃ)। সাহিত্যের ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও প্রাদেশিক ভাবে 'চরিমু' ও 'চরিমো' পদের প্রয়োগ আছে। যেমন দিনাজপুরে চরিম্; মালদহে চরমু, রাজবংশী (রঙ্গপুর) চরিম্, চরিমু, চরিমো; ঢাকায় চরুম; সিলহটে চরমু; চাক্‌মায় চরিম; বরিশালে চরমু।

১। * মূলে সিঞ্চউ ছাপার ভুল। টীকায় সিঞ্চিউ দেওয়া হইয়াছে।
২। Gaudian Grammar, ৩৫৩ পৃঃ। ৩। ঐ, ৩৫৮ পৃঃ।

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে 'চরিমু' পদের বহুল ব্যবহার ছিল ;—

দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল।
সেনা সনে রাবণায় করিমু নিম্মুল॥ (কৃত্তিবাস, উত্তরকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ)
শাপ অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তরি।
শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যা নগরী॥ (ঐ, ২৮১ পৃঃ)
কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নুপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ)
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত, ১১৮১ পৃঃ)
আজি তোর গঙ্গায় ফেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
(ঐ, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, ১১৫৬ পৃঃ)
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥ (ঐ, চৈতন্য-চরিতামৃত, ১২২৫ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ হয় ; যেমন, সদা সত্য কথা বলিও, কিংবা সদা সত্য কথা বলিবে।

আসামীতেও এইরূপ[১]। পূরবিয়া হিন্দীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়[২]। এইরূপ প্রয়োগ বাস্তবিক মূলানুযায়ী। কেন না, সং 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বা. আ. পূরবিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ভবিষ্যতের ইব, অব প্রত্যয় আসিয়াছে : বাং চলিব <চলিঅব্ব <চলিতব্য। ভবিষ্যৎ অর্থই বরং এই সব ভাষায় নূতন সৃষ্টি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুস্তক-বিবৃতি

১। Grammatik der Prakrit-sprachen, von R. Pischel.
২। A Comparative Grammar of the Gaudian Languages by A. F. Rudolf Hoernle.
৩। An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part I, Grammar, by G. A. Grierson.
৪। Oriya Grammar by E. C. B. Hallam.
৫। A Simplified Pali Grammar by E. Müller.
৬। অসমীয়া ব্যাকরণ, হেমচন্দ্র বরুয়া-প্রণীত।
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ঐ।

১। অস. ব্যাকরণ—৯১ পৃঃ। ২। Gaudian Grammar, ৩৫৫ পৃঃ, ৫০৮ প্যারা।

Scale - 4½ inches = one mile.
উত্তর
রাধাকুণ্ড জলা
তারাভুলী নদী
হরিকুণ্ড জলা
দলকাকুণ্ড জলা
গড় খাই
গড়ের মৃৎ-প্রাচীর
যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মঠাকুর
এই স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন আছে
জালন্দর বা জালালে পুকুর
বাঘের পুকুর
গড় সুলতানপুর
জালন্দর বা জালালে
বর্ত্তমান চলিত নাম
হনুমান দরজা
ভোবলা বা গড়ভবানীপুর মৌজা
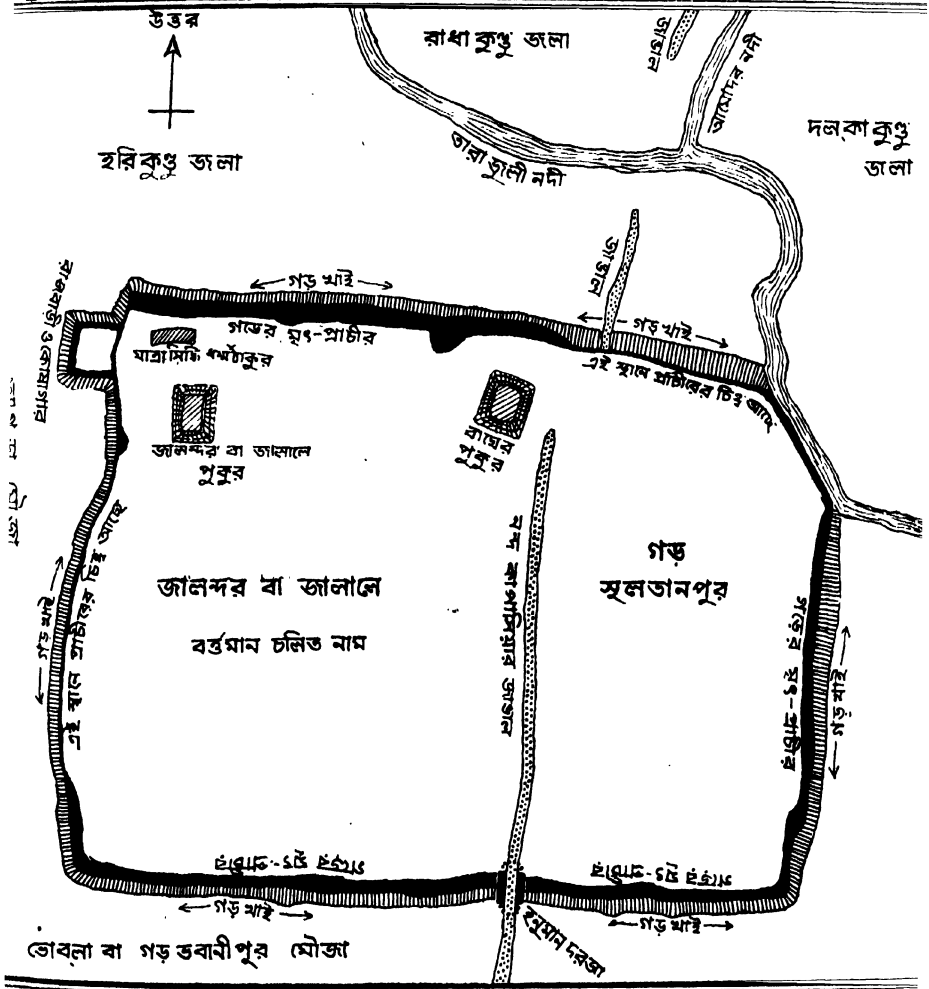
জালন্দার গড়

জালন্দার গড়

(অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে ময়নার রাজা লাউসেনের কামদল বাঘ বধ একটী বিশিষ্ট পালা। লাউসেন, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র; কর্ণসেন ইহার পিতা। ঢেকুরের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রগুলি নিহত হয় এবং বৃদ্ধবয়সে রঞ্জাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া, লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট "ময়নাভুবন" ইনাম পাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। লাউসেন ধর্ম্মের সেবক এবং ধর্ম্মের তথা অন্যান্য দেবতাগণের কৃপা তাঁহার উপর যথেষ্ট। গৌড়েশ্বরের দর্শন কামনায় ময়না হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জালন্দার গড়ে কামদল বাঘ বধ করেন।

কামদল বাঘ বধ পালার উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—জল্লাদ বা জালানশিখর জালন্দার গড়ের রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গিয়া তারাদীঘীর জঙ্গলে একটী শার্দ্দূল-শাবক প্রাপ্ত হইয়া পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন করিতে থাকেন। রূপী বাঘিনীর বেটা কামদল বাঘ দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজা তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কামদল বাঘ ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল; অভিশাপে ব্যাঘ্রজন্ম গ্রহণ করে। জালানশিখর শৈব ছিলেন—তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরপার্ব্বতী ভিক্ষার্থ আগমন করেন। রাজা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভিক্ষা না দিয়া, কুক্কুর "লেলাইয়া" দেন। দেবী কুপিতা হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, কামদল বাঘ নগর ছারখার করিয়া দেয়। রাজা প্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। পরে গৌড়েশ্বরও সদলে ব্যাঘ্র দমনে আসিয়া, ব্যাঘ্ররাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেই অবধি কামদল জালন্দার গড়ে রাজা হইয়া বসে ও অজেয় হইয়া উঠে। লাউসেন পরে তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল একই কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও দশম ও একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনের স্থিতিকাল বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের বর্ণিত অনেক স্থানের ও গড়-বাড়ীর নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। জালন্দার গড়ের সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ লয়েন নাই এবং তাহার অস্তিত্ব দেখাইতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জালন্দার গড়ের নিদর্শন এখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই গ্রামের নাম সুলতানপুর। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত তন্নে বরদার মধ্যে ঐ গণ্ডগ্রামখানি অবস্থিত। ঘাটাল পাকা রাস্তা হইতে বরদার নিকট উত্তর মুখে খড়ার গ্রাম হইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তাটী সুলতানপুর গ্রামে গিয়া শেষ হইয়াছে। তৎপরে ঐ গ্রামের জঙ্গলার মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ রাস্তার কিয়দংশ এখনও দৃষ্ট হয়। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" বলে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে যাবে গৌড়ভুবন॥
ঈশান অখিলখণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিনমাসে তরণী সরণি সুখে যাই॥
বিরাট তনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড় সহর॥

পূর্ব্বোক্ত জাঙ্গালটী যে স্থানে ঘাটালের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তথায় "তেমাথানি" হইয়াছে। এই তেমাথানি হইতে একটী পথ পশ্চিম দিকে যাইয়া "পুরাতন রাণীগঞ্জ সড়কে" (old Ranigunj Road) মিশিয়াছে এবং এই পথ দিয়াই পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া "পশ্চিমে" তীর্থ করিতে যাইত। ঈশান কোণ অভিমুখে পথের আর এক মুখ বরাবর বর্ত্তমান সালকিয়া[১] অবধি গিয়াছে এবং ঐ পথে গৌড় যাইতে হইলে সরস্বতী নদী বাহিয়া গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হইত। উত্তরমুখে বরাবর চলিলে জালন্দার গড় হইয়া শীঘ্র গৌড়ে যাইতে পারা যাইত। তাই লাউসেন কহিলেন,—

বিলম্বে নাহিক কার্য্য শীঘ্র চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই॥
তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে ছুর ছুর॥
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয়॥
আগে ঐ অন্ধকার "জালন্দার গড়"।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥—ইত্যাদি।

সুতরাং এখানে পথের সহিত বর্ণনা মিলিয়াছে। কেবল "জানাবাজ" যাইবার পূর্ব্বে এই "জালন্দার গড়ের" বর্ণনা পাইলে ইহা যে নিশ্চয় সেই জালন্দার গড়, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইত। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র দেওয়া গেল এবং আবশ্যকীয় স্থানগুলি চিহ্নিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত স্থানটী "জালন্দার গড়" বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয় এবং প্রবাদ ও কিম্বদন্তী তথায় লোকের মুখে মুখে আজও পূর্ব্বের ন্যায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ঐ স্থানটী বাগ্দিপ্রধান। এই বাগ্দিদেরই রাজা কামদলকে বাঘ বলিয়া

১। Salkhia as a centre from which four Roads radiated + + + + The fourth connected Salkhia with Tanna Fort and turned west to Sankrail and Amta where it bifurcated—one branch going to Ghatal and Khirpai and the other south-west to Midnapur.—Bengal District Gazetteer.

পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই বাগ্দিরা এক্ষণে সামান্য কৃষিজীবী হইলেও, এখনও তাহারা আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাবান্ মনে করে। কারণ, তাহারা সেখানের "রাজার জাতি"; তাহাদেরই• কামদল বাঘ এককালে ঐ স্থানের অধিপতি ছিল। বাগ্দিদের ব্রাহ্মণ পৃথক্ এবং ঐ ব্রাহ্মণবংশ এখনও রাজপুরোহিত আখ্যায় ভূষিত ও গর্ব্বান্বিত। আমার আরও বিশ্বাস, ঐ স্থানের অনতিদূরে কবিকঙ্কণের "কালকেতুর" লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তাহার রাজধানী গুজরাটের কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি এবং অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা *

বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব যে দিন তাঁহার "কোমল-কান্ত-পদাবলী" গাহিয়া সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার ভাব-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" দর্শনে যদি কোন দেশের প্রাণ নাচিয়া উঠে, তবে সে আমার এই বঙ্গদেশের। এই দেশের জলে স্থলে বাতাসে যেন বৈষ্ণব-গীতিকবিতার সুর মাখান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত "ভক্ত," "ভাগবত," "বৈষ্ণব," "বৈখানস" প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় বা বর্ত্তমানের "শ্রী," "ব্রহ্ম," "রুদ্র" বা "সনক"-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা প্রভুভাবের অনন্তমূর্ত্তি বা নারায়ণমূর্ত্তি বা বড় জোর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবালগোপাল উপাসনায় বাৎসল্য রসেই ভারতীয় মাধুর্য্য-রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-প্রণেতা শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভৃতি দুই চারিজন মহাভাগ্যবান্ সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রণালীবদ্ধভাবে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশই মধুর-রস-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান দেখিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই দেশে প্রকটিত হইয়াছিল। এই দেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উদ্ভব বঙ্গবহির্ভূত কোন প্রদেশে। কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা উপাসনাযুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মই এই দেশের বক্ষোভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবগীতি-কবিতা বাঙ্গালার একবারে নিজস্ব সম্পত্তি, আর এই গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রাণ যতটা মাতিয়া উঠে, এত আর কিছুতেই উঠে না। ইহুদি জাতির প্রাণ লুক্কায়িত যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীসের যেমন ছিল কলা-সাহিত্যের মধ্যে ও রোমের শৃঙ্খলা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, তেমনি মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাণ লুক্কায়িত আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার মধ্যে। তাই কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" দ্বারা বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠা সূচিত হইল। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী মধুর পদাবলীর মধ্যে তাহার অন্তরতম ভাবকে খুঁজিয়া পাইল।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও আবর্ত্তন এতকাল এই জাতীয় জীবনের নিজস্ব ভাবস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল। প্রিয়দর্শী অশোকের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের ভাগ্যচক্র সমগ্র উত্তরাপথের ইতিহাসের সহিত আবর্ত্তিত হইত। গুপ্তবংশের অধঃপতনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপালদেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হয় কামরূপ, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর বা রাষ্ট্রকূটের অধিপতিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইত। পালবংশের শাসনকালেই সমগ্র বঙ্গদেশ যথার্থভাবে নিজস্ব শাসনকর্ত্তা পাইল। পরাক্রম-

---

* ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত।

শালী পালরাজগণ বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা প্রভৃতি বঙ্গদেশের খণ্ডাংশগুলিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশকে একটী রাষ্ট্রীয় একতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম পালরাজগণের কুলধর্ম্ম হওয়ায় প্রজাসাধারণকে এই ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হইলেও ভাবস্বাতন্ত্র্য তখনও বাঙ্গালার লাভ হয় নাই। সেনরাজগণ এই দেশের শৈব ও বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনকে আমরা Hindu Renaissance বা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান নামে অভিহিত করিতে পারি।

পেট্রার্কের ইতালীয় ভাষায় লিখিত লরার প্রতি প্রেমের কবিতাগুলিই যেমন ইউরোপের Renaissanceএর সূচনা করিয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ জয়দেবের কবিতা নব জাগরণের সূত্রপাত করিল। গীতগোবিন্দের পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবরাজিকে যেন ভাষা প্রদান করিল—সে ইহাতে এতই মুগ্ধ হইল যে, এই মধুর ভাবকে জাতীয় জীবনের চরম সাধনারূপে স্থাপিত করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। জয়দেব বাঙ্গালী—তাঁহার কবিতা সংস্কৃত সমাস ও বিভক্তিযুক্ত হইলেও কোমলতায় ও পদসারল্যে তাহা বাঙ্গালাই। জয়দেবের সময় বঙ্গদেশ আত্মানুসন্ধানের পথে দাঁড়াইয়াছিল। জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় জাগরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। 'প্রাকৃতচন্দ্রিকায়' কৃষ্ণ পণ্ডিত (দ্বাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় ভাষাকে স্থান দান করিয়াছেন; তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইতালীর ন্যায় বাঙ্গালীও নবজাগরণের প্রারম্ভে নিজস্ব ভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীর নবজাগরণের যুগ। ঐ সময়ে ইতালী বিদেশীয় আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং স্বদেশীয়গণের গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত। কিন্তু এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও ইতালী একনিষ্ঠভাবে ইউরোপের মুক্তির জন্য সাধনা করিতেছিল। বঙ্গদেশও ঠিক ঐ সময়েই পাঠান আক্রমণ ও অধিকারের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতেছিল।

কিন্তু এই সাধনার দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল। নবজাগরণের আন্দোলন এই অন্তরায়দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শক্তিই সঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে হিন্দুজীবনের এক নব অভ্যুদয়ের চিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জ্ঞানে জাতীয় ভাববিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্ম। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদেও বঙ্গদেশে যে বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ জয়দেবের দশাবতারস্তোত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্তোত্র হইতে পাওয়া যায়। ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বঙ্গে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অঃ তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছিল। মন্ত্রযান ও বজ্রযানের সম্মিলনজাত এক অপধর্ম্ম পালরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অপধর্ম্মের আচার ব্যবহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের উপর এতই কলুষিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্লীলতার স্বাভাবিক ব্যবধান অতি অল্পই রক্ষিত হইত। তথাকথিত বৌদ্ধগণের আচার ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৌদ্ধগণ আলাপের—এমন কি, দর্শনের পর্য্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥ ২৮—৮।

"বাঙ্গালার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "মুসলমানগণের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না।" কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু অভ্যুদয়ের আন্দোলন শুধু মুসলমানগণের উপরই সদ্ধর্ম্মের বিলোপনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না। বঙ্গ-নিকুঞ্জের মধুর পিক চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের গান বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া জনসাধারণের মনোহরণ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব পদাবলীর মোহন ধ্বনিতে বাঙ্গালীর প্রাণের গোপন তন্ত্রী বাজিয়া উঠায় দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মধুর রসের উপাসনার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও ইতিহাসগুলির যথেষ্ট আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ভাষায় না বলিলে দেশবাসী জনসাধারণের প্রাণস্পর্শ করিবে না জানিয়া, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল অনুবাদ হইতে লাগিল। ইহার ফলেও নরনারী হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৌদ্ধতন্ত্রের স্থলে হিন্দুতন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ করিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার প্রচলন দ্বারাও হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া বাঙ্গালা দেশে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল।

হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম্ম। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পর শুধু যে তরবারির সাহায্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অবশ্য অনেকেই রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বা রাজ উৎপীড়নের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক মুসলমান পীর ও তাপসগণের মহান্ ধর্ম্মপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়াও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট জাতিসমূহও উচ্চ সম্মান লাভের আশায় রাজধর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ম হিন্দুসমাজ বদ্ধপরিকর হইল। হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের শিথিলপ্রায় আচার ব্যবহার আবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ম স্মৃতিশাস্ত্রের পুনরালোচনা হইতে লাগিল। প্রাচীন স্মৃতির যে সমস্ত অনুশাসন কালোপযোগী নহে, তাহা বাদ দিয়া ও যে সমস্ত আচার সমাজ রক্ষার জন্ম সবিশেষ প্রয়োজন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভূত করিয়া এক নব্য স্মৃতি রচিত হইতে লাগিল। একদিকে

এই নব্য স্মৃতির সৃষ্টি হয় নাই; দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজকে মুসলমান প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত করিবার যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ হইতেছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্তগণের স্মৃতিনিবন্ধের পুথি আছে। সেই পুথি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রঘুনন্দনের স্মৃতির অধিকাংশই তাঁহার নিজের লেখা নহে। সুতরাং নব্য স্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, বাঙ্গালার নব জাগরণের আন্দোলনের ফল, তাহা প্রমাণিত হইল।

হিন্দুসমাজ শুধু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াই সমাজ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম্মের সংস্পর্শে যে সমস্ত গলদ ঢুকিয়াছিল, তাহাও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নব জাগরণের দিনে বিদূরিত হইল। ১৪৮০ খৃঃ অঃ দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেল নিয়ম প্রচলিত করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য, ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীন-সমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এ দিকে দক্ষিণবঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পরমানন্দ বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান।

পদাবলী, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতির আলোচনা ছাড়া নব্য ন্যায়ের চর্চ্চাও বঙ্গদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের, তথা বাঙ্গালীর নব জাগরণের, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মিথিলা এই নব্য ন্যায়ের আদিস্থান ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মকে যুক্তি দ্বারা পরাভব করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নব জাগরণের আন্দোলন তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াছিল। যথা,—

> তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
> তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
> বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
> দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥—চৈঃ চঃ।

বঙ্গদেশে কিয়ৎকাল বসবাস করিবার পর এই দেশের শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার জানিবার জন্য মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ জন্মিল। মুসলমান অধিপতিগণ উৎসাহ দিয়া মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইলেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন হওয়ায় বাঙ্গালায় নব জাগরণের যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইয়াছিল।

এই নব জাগরণের আন্দোলন ফলে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশব্যাপী এক নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পরিণামে

জাতীয়ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের দেশেও তদ্রূপ বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের জাতীয়ভাব বিকশিত হইল। রঘুনন্দনের স্মৃতি বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার শক্তি-পূজার এক অভিনব সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন। আর কাণভট্ট শিরোমণি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃসম্পাতে নব্য ন্যায়দর্শনকে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ নদীয়ার উপাধি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ শ্রদ্ধা পাইত না, তিনি নদীয়ার উপাধিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাধি করিলেন।

বঙ্গদেশে পীঠস্থান ছাড়া তীর্থ ছিল না—মহাপ্রভু নবদ্বীপকে বঙ্গের তীর্থ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদেশ যে ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজের জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে, নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, তন্ত্র ও বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মদ্বারা তাহাই প্রমাণীকৃত হইল। এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই নব জাগরণের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যা-জগতের এক মহা সমৃদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনার যাথার্থ্য যাহাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তজ্জন্য বঙ্গের নবজাগরণের ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী সামাজিক ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও এই নবজাগরণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নবজাগরণের চিত্র

ইতালীর ফ্লরেন্সের ন্যায় নবদ্বীপ নবজাগরণের আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥—চৈঃ ভাঃ।

ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন দেখা যায়, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া ইতালীতে গমন করিতেন এবং ইতালীতে পাঠ না লইলে তাঁহাদের বিদ্যা

সমাপ্ত হইত না, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণের যুগে নবদ্বীপে পাঠ না লইলে কাহারও বিদ্যা সমাপ্ত হইত না। বিদ্যা-গৌরবে মণ্ডিত নবদ্বীপের উল্লিখিত চিত্রখানির পার্শ্বে পেরিক্লীসের যুগের এথেন্সের চিত্রও কি ম্লান বলিয়া বোধ হয় না? কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে কিরূপ ব্যক্তিগণ দ্বারা শাস্ত্র আলোচিত হইত, তাহা লিখিয়াছেন,—

বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ঃ শরীরিণঃ॥

ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা যে খুব প্রবলভাবে হইত, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "বিরাগ" নবদ্বীপ দর্শন করিয়া বর্ণন করিতেছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূরদূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনঃ তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জ্ঞানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

প্রাচীন ভারতে যেমন অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপলক্ষ্যে প্রবলপরাক্রান্ত কোন রাজা অপর রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন বা অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতিতে মল্লগণকে হারাইয়া মল্লশ্রেষ্ঠ "জগদ্বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ্যালোচনার যুগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য ও তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি লাভ করিতেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় Renaissanceএ ও Scholastic Vogents দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর 'Frier Bacon and Frier Bungay' নামক নাটকে মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী পরাভবের অনুরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেকগুলি দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করি। (১) শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। (২) ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে শ্যামদাস নামে এক দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পাই।

এক দ্বিজ দিগ্বিজয়ী বহু দেশ জিনি।
শান্তিপুরে উপনীত হইলা আপনি॥
বেদপঞ্চানন আখ্যা প্রভুর শুনিঞা।
তাঁহার নিকটে গেলা অতি হর্ষ হৈয়া॥

(৩) প্রেমবিলাসে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট রূপচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা আছে,—

দিগ্বিজয় করি তেঁহো নানা স্থানে যায়।
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচার করয়॥

(৪) নরোত্তমবিলাসে দিগ্বিজয়ী মুরারির সহিত ঠাকুর মহাশয়ের, ব্রাহ্মণ বড়, কি বৈষ্ণব বড়, এই সকল লইয়া তর্কের কথা বর্ণিত আছে।

পরাভব হইয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণবমহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥

(৫) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন দলিল হইতে জানা যায় যে, ১৭১৭ খৃঃ অঃ রাধামোহন ঠাকুর জয়পুরের রাজার প্রেরিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া ব্রজলীলার পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। দেশের ধনিগণও বিদ্যারসে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই এই সমস্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতেন।

পরমসমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মসংস্কার

শুধু বিদ্যার আলোচনাদ্বারা সম্যক্‌ভাবে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। বিদ্যা আলোচনার ফলে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবহেলা-বশতঃ সমাজে দুর্নীতিই প্রকাশ পায়। ইতালীয় Renaissanceএ তাহাই হইয়াছিল, Boccacioর Decameron তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশের অন্তরাত্মাও শুধু বিদ্যার আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥—চৈঃ ভাঃ।

অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি অনুভবী ভক্তগণ যথার্থই উক্ত প্রকার দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। Martin Luther যেমন ইউরোপীয় Renaissanceএর পরিণত ফল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি জাতীয় নবজাগরণপ্রসূত স্বাধীন চিন্তার চরম বিকাশ। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী protest। মানবজন্ম কোন পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বলিয়া সাধারণতঃ এতকাল বিবেচিত হইত। হিন্দুগণ ক্রিয়াকর্ম্ম বা জ্ঞানসাধনা করিয়া হয় স্বর্গলাভ, না হয় মোক্ষলাভ করিয়া মানবজন্ম পরিহার করিতে চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জগতের অবিসম্বাদিত মধ্যস্থ (Medium between God and man) ছিল। মহাপ্রভু প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষা গুণের অধিকার স্থাপন করিলেন। মানবিকতার মহিমা ঘোষণা করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডিদাস গাহিয়াছিলেন,—

শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপরে　　মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবাদের প্রথম কথাই হইতেছে,—

কৃষ্ণের যতেক লীলা　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণুকর　　নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমের রাজ্যে মানব ও ভগবান্ সমভূমিতে দণ্ডায়মান। ভগবান্ মানবের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল—এমন কি, তিনি মানবের দ্বারে প্রেমের ভিখারী।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম"॥—চৈঃ চঃ।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বুঝার পক্ষে মহাপ্রভু মানবকে কি গৌরবময় স্থান দান করিয়া মানবের মনকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। লীলাবাদেই বঙ্গদেশের জাতীয় নবজাগরণের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নবভাবে অনুপ্রাণিত জাতির সামাজিক ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

কোন দেশেই দুই এক শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় না; ভারতবর্ষের ন্যায় সংরক্ষণশীল দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। বাঙ্গালাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুসলমানগণের শাসনের সময়। সুতরাং কালানুসারে (chronologically) (১২০০—১৮০০) এই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনা করার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আর আয়াসসাধ্যও বটে। প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে নির্দেশ করিয়া যাইব।

বাঙ্গালার ধর্ম্ম

ধর্ম্মকেই মধ্যমণির ন্যায় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্ম আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবসাহিত্যে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ইতিহাসের কি উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

বৌদ্ধধর্ম্ম

মহাপ্রভুর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থপর্য্যটনের মধ্যে বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা লিখিত আছে।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণকালে বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত বিচার বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণকে হিন্দুগণ এ সময়ে "পাষণ্ডী" নামে অভিহিত করিতেন।

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা॥
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ মতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥—চৈঃ চঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বৈশ্যগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার ছিল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও সেই কথা পাওয়া যায়।

সংজ্ঞামাত্রবিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণ এ সময়ে সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে যাইয়া নিজেদের আচার্য্যকেই বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন,—

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি ॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য তর্কদ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ও কৃপাদ্বারা বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাব বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু বৌদ্ধগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ আছে।

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন জাপয়েৎ ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিত্যানন্দবংশবিস্তার নামক নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরভদ্র গোস্বামী নাড়ানাড়ী নামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত বহুসংখ্যক নরনারীকে খড়দহে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তান্ত্রিক বামাচার

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বামাচারের প্রাবল্যের নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। শান্তিপুর গমনকালে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এক বামাপন্থী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন।

বামাপন্থী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে ॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ" আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ॥
নগনী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে ॥—চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনূদিত ভক্তমাল গ্রন্থে দেখা যায়,—

কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে ॥
কাঁটাছেড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার ॥

দেশে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব

বামাচার-ধর্ম্মের স্রোত দেশের মধ্যে প্রবল ভাবে বহিতে থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পানদোষ সমাজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তা'ন পিছে॥—চৈঃ ভাঃ।

মদ্যপগণের বর্ণনা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু স্থানে দেখা যায়। দুর্নীতির প্রাবল্যের উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দ দাসের কড়চার একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায়॥
শিশ্নোদরপরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জ্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত॥
যোনিকীট রমণীর মুখ লালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায়॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক কামিনী বালা কামকেলিরত॥
এ কারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া॥

নরোত্তম-বিলাসে প্রাপ্ত খেতুরীর মহোৎসবের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণের ব্যবহারও গোবিন্দদাসের প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ,—

এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ রহে মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥

সাধারণের দুর্নীতির এই চিত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, নিজ ধর্ম্মের মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চিরকালই ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থাকে মসিলিপ্ত করিয়া অঙ্কন করিয়া থাকেন। তবে বহু গ্রন্থে একই অবস্থার বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, এ বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্যাভাস আছে।

শাক্তধর্ম্ম

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শাক্ত ধর্ম্মই জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, যবন রাজা কালীর স্বপ্নাদেশে নবদ্বীপে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে তৎকালীন শাক্তধর্ম্মের প্রভাব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ হইত বলিয়া নবদ্বীপে ভক্তগণ যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইতেন, তখন—

নাগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥—চৈঃ ভাঃ।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি শক্তির লৌকিক প্রকাশগুলিও যথোপচারে পূজিত হইতেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসুলী দেবীকে বৌদ্ধধর্ম্মের বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অনুমান করেন।

শৈবধর্ম্ম

তৎকালে শৈবধর্ম্মের প্রভাবও নিতান্ত কম ছিল না।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মে প্রাণহীনতা ও বৈষ্ণবতার অভাব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গে যে ধর্ম্মই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহা কেবল বাহ্য আচারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত জাতীয় জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারা কেহ না জানয় গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

দেশের চিন্তাশীল ভাবুকসম্প্রদায় এইরূপ ধর্ম্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার

দেশের লোক প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানমার্গের কথা বুঝিতেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব ভাব উন্মাদনা তাঁহাদের নিকট অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া প্রথমে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বঙ্গ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি অল্পকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এক মহাভাবের প্রবল বন্যায় বঙ্গ ও উড়িষ্যা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় নাই, মঠ বা বিহার স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতে হয় নাই—তরবারি ত ধরিতে হয়ই নাই। ভাব যেন সংক্রামক হইয়া দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রচার-পদ্ধতি বুঝা যাইবে।

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেই জন নিজগ্রামে করিলা গমন।
কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দেবে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম ॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥
সেই যাই আর গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হইল সব-দক্ষিণ দেশ ॥—চৈঃ চঃ।

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশে প্রেমধর্ম্ম যাজন করিলেন,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই গোসাঞি কৈল ভক্তি প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ ॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী আচার্য্য নরত্তোম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র গোস্বামীও বঙ্গ উড়িষ্যায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবজগতের পূজা পাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু সাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ না দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন; এইরূপে সমাজসংস্কার হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং, ছয় গোস্বামী ও কতিপয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যশালী মহাজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকালে জনসাধারণের প্রতি সন্ন্যাস উপদেশ করেন নাই; গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কূর্ম্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে,—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥—চৈঃ চঃ।

সৌজাত্য-বিদ্যায় ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাসবান্। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য গুণকর্ম্ম-বিভাগযুক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণব হইবারই সম্ভাবনা অধিক। মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলোপ না পায়, তজ্জন্য সাধনপথে অগ্রসর ভক্ত মহাপুরুষগণকে মহাপ্রভু বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ শেষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন শ্রীঅদ্বৈত ডাকি পুত্রগণে।
নির্জ্জনে কহয়ে অতি মধুর বচনে॥
অহে বৎসগণ সভে স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি আর মধ্য মহাযজ্ঞ।
যেই জন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ॥

অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত বাল্যকাল হইতেই পরম বৈষ্ণব। তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বিগ্রহসেবার পর্য্যন্ত ভার দিলেন না।

অতএব শ্রীবিগ্রহের সেবাদিক ক্রিয়া।
তোমা হৈতে না চলিবে দেখিনু বুঝিয়া॥—অঃ প্রঃ।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বাঙ্গালার সামাজিক জীবনকে ভাঙ্গিয়া সব সন্ন্যাসী করিয়া দিতে চাহেন নাই। বরং তিনি সেই সামাজিক জীবনে প্রেমভক্তির ভাব প্রবেশ করাইয়া সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থার যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন," যে ধর্ম্মে সাধন করিবার প্রণালী হইতেছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সে ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে যে দেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জগাই মাধাইয়ের স্থায় মদ্যপ, চান্দরায় ও তাহার অনুচরগণের স্থায় দস্যুগণকে যে ধর্ম্ম পরম বৈষ্ণব করিতে পারিয়াছে, সে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জনসাধারণের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকারগণ যেন দৈন্য ও বিনয়ের এক একজন অবতার। বৃদ্ধ জরাতুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ "ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ, সভে মোরে করহ সন্তোষ।" বলিয়া সমস্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে পাঠকের নিকট গ্রন্থকারের ঈদৃশ বিনয় প্রকাশ নিতান্তই দুর্লভ। তন্ত্রাচার প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥—চৈঃ চঃ।

ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভু এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিলেন। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসিগণ কিছুকালের জন্য ব্যভিচারাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্মসংঘর্ষে শোণিতপাত ভারতের ইতিহাসে বিরল। তবে মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান—তাই বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণের মধ্যে প্রায়ই কলহ উপস্থিত হইত, যদিও সে কলহ বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য দেবদেবীর নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নিষেধ করিয়া দিলেন।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক।)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের সহিত গণপতি, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মবিরোধে বা ধর্ম্মকলহে যোগদান করিতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির যুগ গত হইবার পর। পরবর্ত্তী কালে রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের বিস্তর আভাস "গোবিন্দ কবিরাজ", "রবীন্দ্রনারায়ণ রায়" প্রভৃতির চরিত্রে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও শাক্তধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে নাই। তবে, পরবর্ত্তী চণ্ডী বা অপর কোন লৌকিক দেবতার মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত মঙ্গলকাব্য জনসমাজে গীত হইত; সুতরাং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দনা থাকায় দেশের উপর বৈষ্ণবপ্রভাব উপলব্ধি করা যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী"তে, ভবানীপ্রসাদ রায়ের "দুর্গামঙ্গলে", রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "শিবায়নে" ও ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত একসঙ্গে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। মহাপ্রভুর জীবনকালেই তাঁহার অবতারত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত মঙ্গলাচরণ পাঠে জানা যায় যে, সাধারণ হিন্দুসমাজ এ মত মানিয়া লইয়াছিল। বৈষ্ণব-সমাজে ত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি-উপাসনাই আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা॥

শাক্ত সাহিত্যে মহাপ্রভু শুধু পূজিত হয়েন নাই—শাক্ত ধর্ম্মের উপর তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাক্ত সাহিত্যের "আগমনী গীতির" বাৎসল্যরস বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালায় শাক্ত ধর্ম্মের সাধ্য বস্তু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

রামপ্রসাদ সেন এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গাহিয়াছেন,—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতি

বৈষ্ণবধর্ম্ম রস-সাধনার ধর্ম্ম। অতি উচ্চাঙ্গের সাধক না হইলে এই ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া রসের বিকারদ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে। তাই মহাপ্রভু সাধারণকে শুধু নামকীর্ত্তনে অধিকারী বলিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়া উপদেশ দিয়াও তিনি রসের বিকার হইতে এক শ্রেণীর লোককে বাঁচাইতে পারেন নাই। ইহারা সহজিয়া বা বাউল নামে এ দেশে পরিচিত। সহজধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের সহিত এই সহজধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া কলুষিত আকার ধারণ করে। পরকীয়া স্ত্রী এই ধর্ম্মের সাধনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। চণ্ডীদাস একজন, কি বহু, সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহজধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই॥

সহজধর্ম্মের পরকীয়াবাদকে মহাপ্রভু সুসংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্রহণ করেন। লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব হইলে রসের পরিপুষ্টি হয়। এই জন্য ভক্তগণ সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা পরকীয়াভাবে স্মরণ মনন করিবেন। কিন্তু এই সাধনায় কোন নারীর প্রয়োজন নাই, তাহা বারংবার ঘোষণা করা হইল।

গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥—চৈঃ চঃ।
পরকীয়াভাবে অতি রসের নির্য্যাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস॥—কর্ণানন্দ।

সুতরাং রক্ত মাংসের দৈহিক ব্যাপারকে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উচ্চাঙ্গের ভজনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ফলে পরকীয়াবাদ ভাবরাজ্যে কি এক অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিয়াছে, তাহা উজ্জ্বলনীলমণি নামক বৈষ্ণব রসশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। কিন্তু দুই শতাব্দীর মধ্যেই এক শ্রেণীর লোকে এই উচ্চভাবের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল। তাহারা মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের নাম দিয়া এক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া চালাইতে লাগিল। ইহারা কি ভাবে বৈষ্ণবগণের পূজনীয়

আচার্য্যবৃন্দকে স্বদলে টানিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রেমদাস-রচিত "আনন্দ-ভৈরবে" লিখিত আছে,—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করেছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন কারণে॥
যদি এহেন বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
বার শত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিবেন কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের ইতিহাস নিহিত আছে। সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছিল যে,—

মানুষের দেহ হয় নিত্যবৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥

—গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চিত্তসংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবানে আত্মসমর্পণযুক্ত যে সাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সেই সাধনাকে সহজিয়াগণ বলিল,—

হাস্তরস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে॥

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সহজিয়াধর্ম্ম বহুলভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থের সংখ্যা দেখিয়াই বঙ্গদেশে ইহার প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে অত্যন্ত হেয়। কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর কাল ইহারাই বৈষ্ণব, বৈরাগী আখ্যায় অভিহিত হওয়ায় অধুনা ভজননিষ্ঠ কোন ভক্তকে ভদ্রসমাজে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আবার বৈষ্ণব শব্দের সদ্ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই উপধর্ম্ম মূল বৈষ্ণবধর্ম্মের কণ্ঠ একেবারে রোধ করিতে পারে নাই।

ক্ষীণভাবে চলিলেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন দিনই বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হয় নাই—হইলে আজ আর বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি আমাদের নয়নগোচর হইত না।

বর্ণাশ্রম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনের সময় ইহার প্রভাব মন্দীভূত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে ধর্ম্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল হিন্দুর জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে প্রোথিত।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরমার্থের চরম অবস্থা বা সাধ্য বস্তু বলিয়া ভারতবর্ষ কখনই ঘোষণা করে নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা আসিলে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরিতন অবস্থায় স্থিত কল্পনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভারতের এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সাধারণ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী হইলেও ইহা মানবের উচ্চতর জাগ্রত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ভাবভক্তির রাজ্যের উচ্চ গ্রামে আসীন ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করার কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরিতন অনেকগুলি সাধনরাজ্যের অবস্থা চরিতামৃতের মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ-সংবাদে লিখিত হইয়াছে। তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে মহাপ্রভু বাহ্য ধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমরাজ্যের জাতিভেদ অন্যপ্রকার,—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥—চৈঃ চঃ।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥—চৈঃ চঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে।

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং।

অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মপরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদের মত নহে। শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধং শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিনং প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া বহু শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন সম্বন্ধে জাতিধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৈষ্ণবতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যাঁহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ, শূদ্র শ্যামানন্দের নিকট ও কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর দাস মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ায় সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ।
পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সব হৈল অগ্নি সম॥

রাজা নরসিংহ পণ্ডিত সহ নরোত্তমের সহিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অবশ্য বিচারে দিগ্বিজয়ী মুরারির পরাভব হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মেলবন্ধন ও নব্যস্মৃতি প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজ পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধপ্লাবন ও মুসলমান অত্যাচারজাত ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইতেছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত সুবুদ্ধি খাঁর উপাখ্যান হইতে আমরা তদানীন্তন সমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারি। সুবুদ্ধি খাঁ হুসেন সাহার প্রভু ছিলেন। হুসেন বাদশা হইয়া স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি খাঁর মুখে জোর করিয়া জল দেন। সুবুদ্ধি খাঁ নিজের দোষ নাই জানিয়াও, জাতিপাত হইয়াছে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ। ষোড়শ শতাব্দী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই আচার হিন্দুসমাজের বুকে এতটা বাজিয়াছিল। জন্মগত অধিকারই যে সময়ে সমস্ত বিষয় নিরূপিত করিতেছিল, সে সময় সাধনরাজ্যেও গুণগত অধিকারকে স্থান দিতে হিন্দুসমাজ পরাঙ্মুখ হইয়াছিল।

লৌকিক ব্যবহারে কিন্তু মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবহেলা করেন নাই। প্রেম সাধনার রাজ্যে জাতিধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও সাধক ভক্ত লৌকিক চেষ্টা ও ব্যবহারের সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব তখন এতটা প্রবল যে, মহাপ্রভু চেষ্টা করিলেও ইহাকে উঠাইয়া দিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন লীলাগ্রন্থে লিখিত নাই। বরং "নিমন্ত্রণ লইল জানি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি কথাই আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া সকল জাতীয় ভক্তই আহার করিয়াছেন—কিন্তু তাহা শ্রীধামের ও প্রসাদের সম্মান প্রদর্শন জন্য। কোন সামাজিক ভোজে সকল জাতি এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, এরূপ কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী যবন-সংসর্গ হেতু নিজকে পতিত মনে করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি সম্মানবশতঃ তিনি মন্দিরের পথে না যাইয়া উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে যাতায়াত করিতেন। স্বয়ং মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিলেও তিনি কাতরভাবে দূরে পড়িয়া থাকিতেন, কদাচ নিকটে যান নাই।

অদ্বৈত-প্রকাশ-রচয়িতা ব্রাহ্মণ ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিতে যান—কিন্তু ব্রাহ্মণ-তনু বিষ্ণুতনু বলিয়া মহাপ্রভু ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। ঈশান তখন উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

> তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
> কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম্ম বিনাশিলা।
> দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধিদাতা॥
> নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নিযোক্তা॥
> এত কহি প্রভু পুনঃ পৈতা দিল মোরে।—অঃ প্রঃ।

লৌকিক ব্যবহারে ভোজন ও বিবাহেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব বংশধর উৎপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অনেক মহাজন পরজীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কিংবা অন্য কোন মহাপ্রভুর ভক্ত স্বজাতীয় ছাড়া অন্য জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা দেখিতে পাই না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় প্রচণ্ড অবধূতও স্বজাতি, এমন কি, স্বশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজনবিচার না থাকিলেও এই জন্য তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। "কুলকল্পতরু" নামক কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

> নিতাইতনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
> স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
> সিন্দুরমধ্য গাঁই আছিল নিতাই।
> অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥

বংশগাঁই হইল করি কুল অপচয়।
উদাসীন হইলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে "বীর" সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রচনা করিল॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয়, ইহা উভয়েরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া তাঁহাদের যে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব ও তাহার নিকট বৈষ্ণবগণের মস্তক অবনত করার কথা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় ঘনশ্যামের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই দুই মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিতসমাজের মত লইতে হইয়াছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে আদানপ্রদানের এই প্রথম উদাহরণ। প্রেম-বিলাস যে বলিয়াছেন,—

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র এই দুই ভূমিতে বাস করা হেতু যখন শ্রেণীভেদ হইয়াছিল, তখন অধুনা রাঢ়দেশবাসীর সহিত বরেন্দ্রদেশবাসীর বিবাহ ত অনেকই হইয়াছে। কেবল তাহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর সহিত বরেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহ বলে না, এই মাত্র। উদ্ধৃত পয়ার উপরিউক্ত বিবাহের সমর্থন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে কোন বিবাহ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস"-প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্যালও এই মত পোষণ করেন।

বৈষ্ণবগণ যে লৌকিক ব্যবহারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অবহেলা করেন না, তাহা বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ করিলেও বুঝা যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের ভক্তিসাধনের ও সদাচারের যাবতীয় কথা লিখিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎকৃত একাদশীতত্ত্ব, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ও আহ্নিক-তত্ত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই গৃহস্থ—সুতরাং তাঁহাদের পুত্রকন্যার উপনয়ন বিবাহাদি প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যদি বর্ণাশ্রম অস্বীকৃত হইত, তবে বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে উপনয়ন বিবাহাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু স্মার্ত্ত বিধান অনুসারে ঐ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়াই বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বলা বাহুল্য, বাউলসম্প্রদায়ের অংশবিশেষের হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টাজাত সংযোগী বৈরাগিগণের মধ্যে বিবাহে যে মালা চন্দন বদল প্রথা আছে, তাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

অনুমোদিত নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

স্মার্ত্ত বিধান অনুসারেও যখন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ নিবেদন করা হইয়া থাকে, তখন উদ্ধৃত বিধি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল নহে, পরন্তু অনুকূল। স্মার্ত্ত বিধানে যাহা সামান্য বিধি, বৈষ্ণব স্মৃতিতে তাহাই বিশেষ বিধি করা হইয়াছে।

প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত ও কুলমর্য্যাদা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব, প্রেমবিলাসের এই অংশ অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৈষ্ণবগ্রন্থের পরিশিষ্টে যে কুলাচার বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভুর উপাসকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব শিথিল হয় নাই।

এই সমস্ত তত্ত্ব ও প্রমাণ ভালভাবে আলোচনা না করিয়াই আধুনিক লেখকগণ এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেন যে, মহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও জাতিধর্ম্মের প্রভাব সমাজে তখন শ্লথ হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম*

হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পাঁচটী মহাযজ্ঞের † অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই যজ্ঞগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ্ঞ, পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান ভূতযজ্ঞ আর অতিথিপূজন নৃযজ্ঞ ‡। প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ জৈনগণের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম্ম বা ছয়টী কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম আছে। সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। জৈন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

দেবপূজা গুরূপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ।
দানং চেতি গৃহস্থানাং ষট্‌ কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥

দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রাধ্যয়ন), সংযম, তপস্যা এবং দান, এই ছয়টী কর্ম্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই ষট্‌-কর্ম্মই জৈনদিগের নিত্যকৃত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাঁহার ধর্ম্মের অন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য্য করুন আর নাই করুন, এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি সম্যগ্‌জ্ঞানী, যিনি বিদ্বান্‌, যিনি সমর্থ, তিনি সম্যক্‌রূপে এই ষট্‌কর্ম্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়া চলিবেন। আর যিনি অল্পজ্ঞ—যিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের অন্ততঃ আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন। কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায়, জৈনদিগের মধ্যে সকলেই যথাশক্তি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণাদির সন্ধ্যাবন্দনাদির মত এইষট্‌কর্ম্ম জৈনদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা এইবার করিব।

দেবপূজা

দেব (চতুর্ব্বিংশতি অতীত জিন বা তীর্থঙ্কর, চতুর্বিংশতি বর্ত্তমান তীর্থঙ্কর এবং চতুর্বিংশতি ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর), গুরু (আচার্য্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুনি প্রভৃতি) ও শাস্ত্র—এই সকলকেই জৈনগণ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

‡ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্‌॥—মনুসংহিতা ৩.৭০।

দেবতাস্থানে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যপূজায় সাধারণতঃ তাঁহারা তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাক্রমসহকারে জল প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা গৃহেই নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের গৃহে এরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী জিনমন্দিরে যাইয়া পূজাকার্য্য সমাধা করেন। একটা কথা এ স্থানে বলা দরকার। জৈনেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না হয় পাষাণময়ী। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্যপূজার সময় যে মন্দিরে যে তীর্থঙ্কর প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজা করা বিধেয়। একসঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজাও করা যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজা করার নাম "সমুচ্চয়চতুর্ব্বিংশতিজিনপূজা।"

জৈনদিগের পূজ্য এই যে জিন বা তীর্থঙ্কর, ইঁহারা মানবরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যাদির প্রভাবে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া সাধারণকে মোক্ষলাভের উপায়সমূহ (বা মোক্ষমার্গ) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মুক্ত পরমাত্মার পূজাকে জৈনাচার্য্যগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীর্থঙ্করগণই প্রত্যেক শ্রাবকের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের আচরণের সর্ব্বথা অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদেরই মত মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। জৈন শাস্ত্রের যে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা জিনপূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈনদিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই—মোক্ষলাভই এই নিত্য জিনপূজার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য—পূজার প্রতিমন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূজাকালে তীর্থঙ্করের উদ্দেশে জলচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় প্রত্যেক স্থলেই এক একটী কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটী নাই। তাঁহারা পূজার প্রারম্ভে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকেন বটে ; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ করিবার সময় কোন কামনা করেন না। কিন্তু জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা পূজা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুক্তির কামনা করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটী স্পষ্ট হইবে।

"ওঁ হ্রীং বৃষভাদিবীরান্তেভ্যো জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্ব্বপামি,......ভবতাপবিনাশায় চন্দনং নির্বপামি,......অক্ষতপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্ নির্বপামি,......কামবাণবিধ্বংসনায় পুষ্পং নির্বপামি,......... ক্ষুধারোগবিনাশনায় নৈবেদ্যং নির্বপামি,...... মোহান্ধকারবিনাশনায় দীপং নির্বপামি,......অষ্টকর্ম্মদহনায় ধূপং নির্বপামি,......মোক্ষফলপ্রাপ্তয়ে ফলং নির্বপামি,......অনর্ঘ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্ঘ্যং নির্বপামি।"

জৈনদিগের এই কামনা সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পূজার্চ্চনাদির সময়

হিন্দুদিগের কামনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় স্বর্গলাভ প্রভৃতি। কিন্তু জৈনগণ দৈনন্দিন দেবপূজার সময়ও এই সকল বিনশ্বর বস্তু কামনা করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনে একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা কদাপি করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারম্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যত দিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য স্বর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তির জন্য মানুষ প্রথমে পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করুক—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ-লাভের জন্য যত্ন করিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে। জৈনগণ তাহার উত্তরে বলিবেন—চিত্তশুদ্ধিই যদি পূজাদির উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা লোকের চিত্ত পূজাদির দিকে আকৃষ্ট করাও যদি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এ উভয় কার্য্যই ত পূজার সময় মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল ইন্দ্রিয়-জয়াদি ও মোক্ষলাভের কামনাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, পূজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারম্ভ হইতেই সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য এই যে চেষ্টা, তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লক্ষ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের যেটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটীর কথা এইরূপ সকল সময়ে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া রাখার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করা হইবে, তাঁহার আবাহন, স্থাপন ও সন্নিধীকরণ * করিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পূজা করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টক বা অষ্টদ্রব্যপূজা। ইহার পর পঞ্চকল্যাণকের অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ অর্চ্চনীয় তীর্থঙ্করের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথা স্মরণ করিয়া এক একটী অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ইহার পর স্তোত্রাদি বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিনমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যেমন এক দেবতার পূজা করিবার সময় মূল পূজার পূর্ব্বে ও পরে গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়, জৈনদিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা যায় না। তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার, এই কয়টী

---

* আবাহন করিবার সময় 'অত্র অবতর অবতর সং বৌষট্', স্থাপন করিবার সময় "অত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠঃ ঠঃ' এবং সন্নিধীকরণের সময় 'অত্র মম সন্নিহিতো ভব ভব বষট্।' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

জেও দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের মধ্যে কিন্তু মাত্র ঐ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে প্রতিদিনই যে সকলে ঐ আটটী দ্রব্যের দ্বারা পূজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিনমন্দিরে যাইয়া জিনদেবের দর্শন ও তাঁহার উদ্দেশে অক্ষত অথবা পুষ্প ও যে কোন একটী ফলমাত্র উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারত পক্ষে প্রায় কোন স্ত্রীপুরুষই বাধা করেন না।

গুরূপাস্তি

যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—বিষয়ের প্রলোভন যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—কামক্রোধাদি যাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিনিয়তই ইঁহাদিগের সেবা করা উচিত, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি *। এইরূপ মুনির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরূপাসনারই অন্তর্গত। তারপর এইরূপ গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট নিজের আচরিত পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত। † এইরূপে গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে এক দিকে যেমন গুরু সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য দিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বলিতে পাপের প্রতি ঘৃণা স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, স্বকৃত পাপের একবার আলোচনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নির্গ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করা এবং সম্যগ্‌দৃষ্টি ও সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ ঐলক, ক্ষুল্লক ‡ ও ব্রহ্মচারীকেই সেবা করা এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করা গুরূপাস্তির অনুকল্পরূপে বিহিত হইয়াছে।

* সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৩। † সাগারধর্ম্মামৃত—৬।১১।

‡ উৎকৃষ্ট জৈন শ্রাবকদিগের মধ্যে দুই ভেদ—(১) ঐলক, (২) ক্ষুল্লক। ক্ষুল্লক অপেক্ষা ঐলকের স্তর উচ্চে। ক্ষুল্লক একখানি কৌপীন ও একখণ্ড ক্ষুদ্র উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট জলপানের জন্য একটী কমণ্ডলু, ভোজনের জন্য একটী পাত্র এবং মাটি হইতে কীটপতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত পিচ্ছিকা থাকে। ক্ষুল্লককে বিশেষ যত্নের সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ঐলককেও মুনিদিগের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাঁহার পক্ষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইবার বিধান আছে। একখানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটী কমণ্ডলু ভিন্ন ঐলকের অন্য কোনও দ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই।

খাদ্য সম্বন্ধে উভয়কেই শ্রাবকের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে শ্রাবক স্বয়ং অভ্যর্থনা না করিলে যাচিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে ইঁহারা ভোজন করেন না।

স্বাধ্যায়

প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথাসাধ্য কিছু সময় জৈনশাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করেন। সুতরাং শাস্ত্রালোচনও যে তাঁহাদের পক্ষে দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যিনি গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিত্রভাবে ভক্তির সহিত ঐ কার্য্য করিতে হইবে, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, অস্নাত অপবিত্র দেহে, অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র স্থানে বসিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন বা আলোচনা করিলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাভ হয় না বলিয়া জৈনশাস্ত্রকারগণ উহা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনদিগের এই স্বাধ্যায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়নমাত্রই বুঝিতে হইবে না। ফলতঃ, শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জৈনশাস্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটী প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাধ্যায় পাঁচ প্রকার—বাচনা স্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়, অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়, আম্নায় স্বাধ্যায় ও ধর্ম্মোপদেশ স্বাধ্যায় *। বিশুদ্ধভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা স্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্রগ্রন্থের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার নাম পৃচ্ছনাস্বাধ্যায়। গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষাস্বাধ্যায়। শুদ্ধভাবে স্পষ্টরূপে (আর্ষ আম্নায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়া) শাস্ত্রগ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম আম্নায়স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্য এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্ম্মোপদেশস্বাধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়ের এই কয়টী ভেদ থাকায় জৈনদিগের মধ্যে দুইটী সুন্দর জিনিষ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—কি অক্ষরজ্ঞ, কি নিরক্ষর—কি উচ্চজাতি, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একপ্রকার স্বাধ্যায় পালন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে যখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিত, স্বাধ্যায়ের এইরূপ নানা ভেদ জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুণ এবং এই স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় জৈনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বহু জটিল ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ—এরূপ লোক

* তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র—৯।২৫।

বোধ হয়, জৈনদিগের মধ্যে ভিন্ন অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুক্তি কি—মুক্তি লাভের উপায় কি, তত্ত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক জৈন শ্রাবকই তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সংযম

জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়সংযম, (২) প্রাণিসংযম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম ইন্দ্রিয়সংযম। আর প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণিসংযম। এই দুই সংযম অভ্যাস করিবার জন্ত প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। 'আজ আমি এই জিনিসটী দেখিব না', 'আজ আমি এই জিনিসটী খাইব না' প্রতিদিন শ্রাবককে এইরূপ একটী একটী (শক্ত্যনুসারে একাধিক) প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই অভ্যস্ত হইবে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনিধর্ম্ম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তপঃ

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্ত প্রতিদিনই যথাশক্তি কিছু না কিছু তপশ্চর্য্যা বা আত্মধ্যানাদির অনুষ্ঠান করাও কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্রিয়ার অর এক নাম সামায়িক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে। "ওঁ নমঃ সিদ্ধেভ্যঃ," "শ্রীবীতরাগায় নমঃ," "ণমো অরহন্তাণং" "ণমো সিদ্ধাণং" ইত্যাদি মন্ত্রের যে কোন একটী যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই তপশ্চর্য্যার মধ্যে আর একটী কার্য্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবক যে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্ত অনুতাপ এবং সেইরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে যাহাতে সঙ্ঘটিত না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্য্যার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে অনেক উপকার হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জৈনাচার্য্যগণ তপস্তার দ্বাদশ প্রকার ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমৌদর্য্য, বৃত্তিপরিসংখ্যান, রস-পরিত্যাগ, বিবিক্তশয্যাসন ও কায়ক্লেশ, এই ছয়টী হইল বাহ্য তপঃ। খাদ্যদ্রব্যাদি বাহ্য বস্তু বিষয়েই এই তপের বিধান; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টী আভ্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশবিধ তপস্তা মুনিগণেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশক্তি ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই জৈনশাস্ত্রের নির্দেশ।

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব। সংযম অভ্যাস করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয়, এই চারি প্রকার ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদিগের যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনদিগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ। উপোষিত অবস্থায় পূজা ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণে (আকণ্ঠ পূর্ণ না করিয়া) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য্য। অধিক পরিমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জন্মায়, তেমনই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। "আজ মাত্র দুই বাড়ীতে যাইব। আহার মিলে ত ভাল; নহিলে উপবাসী থাকিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করার নাম বৃত্তিপরিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, তৈল প্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রসত্যাগ করার নাম রসপরিত্যাগ *। চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিক্তশয্যাসন। শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ। এই সকল তপগুলি সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসাধন প্রভৃতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভোগের মধ্য দিয়া হয় না, এ কথা স্থির নিশ্চিত।

আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যান, ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। স্বাধ্যায়ের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুনি প্রভৃতির সেবা করার নাম বৈয়াবৃত্ত্য। পরিগ্রহপরিত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ।

দান

প্রতিদিন যথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু দান করে এবং যথাশক্তি তপশ্চর্য্যা করে, সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে। † এই জন্যই সাগারধর্ম্মামৃতকার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্রকে (দানাদির দ্বারা) সন্তুষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়া যথাকালে পরিমিত আহার করিবে। ‡

দান করিবার সময়ে সৎপাত্রকেই দান করা উচিত। জৈনাচার্য্যগণের মতে সৎপাত্রের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য, এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্যগ্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রাবক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্যগ্‌দর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পাত্র। উত্তম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফল লাভ হয়; তবে

---

* হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাভ্যাসের জন্যই প্রতিদিন কোনও না কোনও দ্রব্য পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

† সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৯। ‡ সাগারধর্ম্মামৃত—৬।২৩।

উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম বা অধম পাত্রকেই দান করিতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

ইঁহাদের মতে দান চারি প্রকার—অভয়দান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ঔষধদান। এই চারি প্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটী প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রাবকের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ—উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইহাদের সকলের মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ-রক্ষার জন্য যিনি অভয়দান করেন, তিনি কি ই বা দান না করেন অর্থাৎ তাঁহার দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।* অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে অহিংসা-ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহাও এই অভয়দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

শাস্ত্রপাঠেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে—শাস্ত্রপাঠেই ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়, পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পবিত্র করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একান্ত কর্ত্তব্য †। এই শাস্ত্রদানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহার জন্য লোকে ভার্য্যা, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়া লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অখাদ্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সংযত সাধু ব্যক্তিকে সেই আহার দান করা কর্ত্তব্য। ‡

শরীর সুস্থ থাকিলেই তপঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব, এই নিমিত্ত রোগ শান্তির জন্য সাধু ব্যক্তিদিগকে ঔষধ দান করা উচিত। ** এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্ম্যই জৈন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রাবকগণ যথাশক্তি এই সকল দানকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন কষ্ট থাকিতে পারে না—মুনিগণ নিশ্চিন্ত মনে তপশ্চর্য্যাদি কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের যদি কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ পুণ্যার্জ্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈনদিগের এই ষট্‌কর্ম্ম একদিকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্ম্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, বরং তাঁহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, সে কার্য্যে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

* সুভাষিতরত্নসন্দোহ—৪৭৬।
† ঐ— ঐ। —৪৭৭।
‡ ঐ — ঐ। —৪৭৮।
** ঐ — ঐ —৪৭৯।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহার "কৌল-মার্গরহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তন্ত্রোক্ত কৌল সাধনা-প্রণালীর ও কৌলমতের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া লেখক প্রসঙ্গতঃ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ ও প্রাচীন কৌলমতে কোন পার্থক্য নাই—একই ধর্ম্মের দুইটি বিশিষ্ট দিক্ মাত্র। তৎপরে, কৌলাচারের ও পঞ্চ-মকারের প্রতি সাধারণভাবে সকলেরই যে উপেক্ষা দেখা যায়, লেখক তাহারও অপনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর জনৈক শ্রোতা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তন্ত্রের প্রাচীনতা, প্রাচীন বঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিধানমতে সাধনের বিষয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত অটলবাবু অন্যান্য কথার পূর্ব্বে বলিলেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র সাধন-শাস্ত্র, ইহার প্রকাশ্যে বিচার হয় না।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎপরে তন্ত্রের ঐতিহাসিকতা ও অদ্বৈতমতের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন যে, তন্ত্র একটি বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, আধুনিক কুল্লুকভট্টের স্মৃতসংহিতায় আছে যে, শ্রুতি দ্বিবিধা—তান্ত্রিকী ও বৈদিকী। বেদে যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে—আর তন্ত্রোক্ত উপাসনায় অথর্ব্ব বেদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য আছে। তন্ত্রের সাধনার ধারা প্রাচীন কালের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। রোম, গ্রীস্, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানে তন্ত্রের ন্যায় সাধনা প্রচলিত ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়া তন্ত্রের উপাসক দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্রই এই সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের মত সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অদ্বৈত। ৺বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দশখানি প্রধান উপনিষদের তান্ত্রিক ভাষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি

ক—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক

পুথি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত—(১) নৃপকীর্ত্তি-চন্দ্রিকা, (২) ঐ টীকা। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন—(৩) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, (৪) শান্তি-শতক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি—১। যমুনা ১৩২৩, ২। আগমনী ১৩২৬, ৩। বরোয়ারি। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মলিক—৪। শ্রীগোপাল বসু মলিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১ম ভাগ।

The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Dept.—৬। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs, for the year 1922-23. ৭। Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1922-23.

খ—পরিশিষ্ট

প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৮২। অর্জ্জুন, স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মিলিত হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া, ধবল (কৈলাস ?) পর্ব্বতে অবস্থিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহিত অর্জ্জুন মিলিত হয়েন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি সঞ্জয়ী মহাভারতে নূতন—মূলে বা কাশীদাসীতে ইহা নাই।

৮৩। এক দিন দুর্য্যোধন, আচার্য্য দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এমন একটি ফল প্রার্থনা করুন, যে ফল মাটিতে উৎপন্ন বৃক্ষে জাত নহে। দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য—এরূপ ফল যুধিষ্ঠির দিতে পারিবেন না। তখন ক্রুদ্ধ দ্রোণের শাপে তাঁহারা সকলে ভস্মীভূত হইবেন। দ্রোণ, কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া, উক্তরূপ একটি ফল প্রার্থনা করিলে, যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। পরে বলিলেন, আমি যদি যথার্থ ধর্ম্মপুত্র হই, তবে আমার হাতের উপর এখনই একটি বৃক্ষ হউক—অমনি তাঁহার হাতের উপর একটি বৃক্ষ হইল। ভীম বলিলেন,—আমি যদি পবনের পুত্র হই, তবে এই বৃক্ষে ডাল এবং পাতা হউক, তাহাই হইল। এইরূপে অর্জ্জুনের কথায় সেই বৃক্ষে পুষ্প, নকুলের কথায় ফল, সহদেবের কথায় সেই ফলের পুষ্টতা, এবং দ্রৌপদীর কথায় সেই ফল পাকিয়া গেলে, দ্রোণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ফল লইয়া চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

বিরাট পর্ব্ব

কাশীদাসী মহাভারত

৮৪। কোন্ দেশে এক বৎসর কাল অজ্ঞাতভাবে বাস করা যায়, পাণ্ডবগণ এ বিষয়ে

পরামর্শ করিতে বসিলেন। অর্জ্জুন, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, মৎস্য, বাহ্লীক প্রভৃতি কতকগুলি দেশের নাম করিলেন। এবং তন্মধ্যে মৎস্য বা বিরাট রাজার দেশই অজ্ঞাতবাসের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন। কোনও দেশের দোষগুণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কোন্ দেশে অজ্ঞাতভাবে বাস করা যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিয়া অর্জ্জুন এক একটি দেশের নাম উল্লেখপূর্ব্বক সেই দেশের কি দোষ, তাহার উল্লেখ করিতেছেন,—চেদি দেশের রাজা মণিমন্ত, তাঁহার প্রধান সেনাপতি একজন ধীবর, এই জন্ত সে দেশ পরিত্যক্ত হইল। তার দক্ষিণে স্বর্ণকুম্ভ দেশ, রাজার নাম সৈবল—কিন্তু এ দেশে পান ও সুপারি নাই, অতএব এ দেশ ত্যক্ত হইল। তার উত্তরে আর এক দেশ আছে—রাজা সুবাহু। কিন্তু এখানে ক্ষত্রিয়ে দান গ্রহণ করে বলিয়া এ দেশ ত্যক্ত হইল। ইহার পশ্চিমে আর এক দেশ, রাজার নাম শান্তিপন। এখানে প্রত্যেক পুরুষের শত শত স্ত্রী, তাই এখানকার পুরুষ অতি অল্পায়ু। সৌরাষ্ট্র দেশে নীল নামে রাজা, এখানে গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মান নাই, পিতাপুত্রে একসঙ্গে বেশ্যালয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এক সঙ্গে আহার করে। ইহার পর বিরাট রাজার দেশই উপযুক্ত বলিয়া সকলে স্বীকার করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৫। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রদ্বারা একসঙ্গে বাঁধিয়া, বিরাট নগরের অদূরে বনমধ্যস্থ এক শমীবৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়া রাখিলেন এবং নিকটস্থ গোপজাতীয় লোকদিগকে বলিলেন যে, আমাদের বৃদ্ধা জননী পথে আসিতে আসিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ এই বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলাম। কিন্তু বাস্তবিক কোন মৃতদেহ অস্ত্রের সহিত রাখা হইল না।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিরাট নগরের অদূরে শ্মশানের নিকটস্থ শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণ, অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া রাখিলেন এবং সেই বৃক্ষের নিকটে যাহাতে লোকজন না যায়, তজ্জন্য শ্মশান হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়া তাহার সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন।

মূল মহাভারত

শ্মশান হইতে মৃতদেহ আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাকে নিজেদের মাতৃদেহ বলিয়া নিকটস্থ গোপগণের নিকট পাণ্ডবেরা বলেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

২১এ পৌষ ১৩৩০, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর কর্ত্তৃক "হিন্দু বিবাহ-বিধির মূলে সুজন্য-বিদ্যা" (Eugenics) বিষয়ে বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কটক কলেজের বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব্ব উপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর "হিন্দু বিবাহ-বিধির মূলে সুজন্য-বিদ্যা" (Eugenics) বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, মানুষ দুই প্রকার গুণে অলঙ্কৃত, স্বভাব (পৈতৃক) ও পরভাব (সংস্কারাদির দ্বারা উপার্জ্জিত)। স্বভাব গুণের প্রভাব পরভাব গুণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। হিন্দু বিবাহের নিয়মাদি এমনভাবে প্রণয়ন হইয়াছে যে, সন্তান-সন্ততিগণ শ্রেষ্ঠ স্বভাবগুণ প্রাপ্ত হয় ও পরে সংস্কারাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠ গুণ অর্জ্জন করে। এইরূপে সুজন করিবার উপায়ের নাম সুজন্য-বিদ্যা এবং দেশের অভ্যুদয় করিতে হইলে সুজন্য-বিদ্যা বিশেষ প্রয়োজন।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মহাশয়ের

শত বার্ষিক জন্মোৎসব

১২ই মাঘ ১৩৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবিবরের জীবনী আলোচনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত ডাঃ কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের চারি বর্ষবয়স্কা কন্যা শ্রীমতী ইলারাণী সুললিত কণ্ঠে একটি কীর্ত্তন সঙ্গীত গান করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে। তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, মধুসূদনের গুণরাশি উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, "এইবার গল্প; সাদা বাংলায় নিছক গদ্-গদে গল্প; মোটা ডাল ভাত। ললিত বাবুকে পুত্রবৎ দেখি, তাঁর কন্যা নাতিনী। দিদি বল্লেন, আজ শোকের দিন। মেয়ের প্রাণ কিনা, কেঁদে উঠে। আমার চোখের জল ফুরিয়ে গেছে, আমি এটাকে একটা আনন্দের দিন মনে করছি। আনন্দের দিন কেন? না, পূজায় আনন্দ করতে পারি। এখন শোক-সভা বলি, সাহেবরাও তাই বলে—mourning। mourning আমাদের অভিধানে নাই, আমরা সেটা অশৌচ—quarantire বলি, segregation বলি। mourning বলি না, আজ কাল হয়েছে। আর এক জায়গায় বলে এলুম—শোক-সভা টভা নয়। আমাদের জন্মতিথি পূজা আছে, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রাম নবমী, চৈতন্যের জন্মতিথি, রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব। আবার পরশু বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হবে।

"অবশ্য এরূপ আনন্দ বোধ হয় এই প্রথম। কবি বঙ্গদেশে কেন, অনেক দেশেই জন্মেছে, বর্ত্তমান কবিদের মধ্যে গুণে তারিখ ধরে যাকে centenary বলি—এক শত বৎসর কারো হয় নাই; পুত্র কারো হয় নাই, শ্রাদ্ধও করতে হয় নাই, কালিদাস, কৃত্তিবাস, ঈশ্বর গুপ্ত; কারোই না, এই প্রথম হল। হিন্দু স্কুলে হয়েছে। ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে উদ্যোগ হয়েছিল, চারিদিগে হতেছে দেখে তাঁরা বন্ধ রাখেন,—একথা মনে করে আমিও মরতে পারব।

"১৪৩০ সালের মাঘ মাসে যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবার second centenary হবে, তখন অবশ্য centenary কথা থাকবে না, এর ভাল বাংলা কথা তৈয়ার হবে, আর তা করবেন—এই সাহিত্য-পরিষৎ। আর বোধ হয় তখন—১০০ বৎসর পরে খ্রীষ্টান শতাব্দীও এদেশে গণনা থাকবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তখন তাঁর স্মৃতির আদর এমন ভাবে হয়ত করব না, এখন লেখকগণের পূজা করি, তখন কপোতাক্ষীতীর বোধ হয় বাংলার তীর্থস্থল হতে পারে।

"সভাপতি মহাশয় হিন্দুস্কুলে সাগরদাঁড়ীর সৌন্দর্য্যের কথা বলেছেন। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে আর এক মাঘ মাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মতিথি উপলক্ষে ছোট খাট সভায় পুরোহিত-গিরি করি, অমন ভাব, অমন শোভা আজ পাব কোথায়! বাস্তবিক কবিত্বের দেশ, মানুষের চরিত্র গঠিত করতে পরিপোষক দরকার হয়, সত্যই তাই। সে বাড়ী দেখলাম অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে, বাড়ী খালী নয়, তাদের বংশ আছে, মাইকেলের এক ভ্রাতুষ্পুত্র কি ভ্রাতুষ্পৌত্র বলতে পারি না, তিনি আমাদের যত্ন করেছেন, যে ঘরেতে মাইকেল মধুসূদন জন্মেছেন, সেই সুতিকাঘর দেখলাম, পাঁচিল ভেঙ্গে গেছে, ঘর ঠিক নাই, দেয়াল রয়েছে। আর একটা জায়গা দেখলাম, বৈকালে সভা হল, বট বৃক্ষের তলে। মধুসূদন দত্ত যখন দেশে থাকতেন, তখন সেটা তাঁর প্রিয় স্থান ছিল, বাস্তবিক সেখানে বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, তীর্থ করবার উপযুক্ত জায়গা। তরুণ মহাশয়দের বলছি, দেখুন, ১০০ বৎসর পরে আমি থাকব না, তখন আমার আওয়াজ পেলে আপনারা হয় ত রাম রাম বলবেন।

"এখন কতকগুলি কথা উইল করে যাওয়া উচিত। আমাদের একটা কলঙ্ক আছে—মধুসূদন হাসপাতালে মরেন, এখন কলঙ্ক বলে মনে হচ্চে। আমাদের বাংলার—Indiaর নয়—এ কলঙ্ক India বল্লে গালাগালি লাগে। India কি? দিনকতক পর্ত্তুগিজেরা ঐ নাম দিয়েছিল। India বলতে গর্ব্বে ফেটে পড়ি, India Esquire, দাস বোস বল, যত স্বরাজবাদী, তত গোঁফে গোঁফে মুড়া মুড়োচ্ছে। সোজা একটা কথা ভাবতে হয়, আমরা সমালোচনা যা করি, কি সাহিত্যে, কি চরিত্রে, দেশ কাল পাত্র ভাবি না। আজও বিশ্বভারতীর (?) সমালোচনা হয় নাই। ২৫ বৎসর পরে বঙ্কিম বাবুর কি দুর্দ্দশা হবে, ভেবে প্রাণ কেঁদে উঠে। মাইকেল মধুসূদনের সমালোচনা করতে হলে কোন্ সময়ে তিনি জন্মেছেন, সেটা দেখাতে হয়। কিন্তু আমাদের কুটুম্ব হয়েছে কে? মধুসূদন নয়, তাঁর ছেলে পিলে, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, এই সকল ছেলে মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক কুটুম্বিতা আত্মীয়তা জন্মেছে, তাঁর সঙ্গে নয়। তখনকার সময় ভাল ছিল না। তিনিও আমাদের মত বাঙ্গালী ছিলেন না। আমরা যতই অধঃপাতে গিয়া থাকি, যাঁর স্ত্রী খেতে পায় না, তাঁকে দুমুঠা অন্ন দিব না, এমন কথা হতে পারে না। যে দেশ একেবারে ভিখারী হয়েছে, সে দেশেও ততটা হয় না। যতই ভিখারী হউক, অতি উচ্চ স্থান তাঁর ছিল, তিনি কাব্যের দ্বারা নিকটবর্ত্তী হয়েছেন, তখন এত নিকটবর্ত্তী ছিলেন না, ছিলেন দূরে। সূর্য্য দূরে থাকেন, তাঁর গ্রহণ দেখতে হলেও তাঁর পানে চাহিতে পারি না, ভিতরে তাঁর মূর্ত্তি দেখতেমু

হয়, মাইকেল মধুসূদন তেমনি ছিলেন, যত দুর্দ্দশাপন্নই হন, তাঁর শক্তি সাহস আমাদের মত দরিদ্র গৃহস্থের মত ছিল না। সে জন্যও আমরা তাঁর দিকে চাহিতে পারি না।

"তার পর তাঁর ভাগ্য। ভাগ্য-শক্তি ঠিক মাইকেল মধুসূদনকে কোটী টাকা দিলেও থাকত না। এরূপ এক একটা বীর থাকে। এক দিন মহাদেব আর পার্ব্বতী স্বর্গ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখতে পেলেন, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বড় কষ্টে তার দিন চলে যায়, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পার্ব্বতী বল্লেন, প্রভু, তুমি বড় নির্দ্দয়, ব্রাহ্মণ, কষ্ট পাচ্ছে, তাকে কিছু দাও না কেন? মহাদেব বল্লেন, সময় ভাল হলে দিব, এখন দিলেও থাকবে না। কিন্তু মেয়ে মানুষের কথাত, কি করবেন, অগত্যা মহাদেব একখণ্ড সোনা ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণের হঠাৎ কেমন মনে হল, সে ঐ পথটুকু চোখ বুজে চলে গেল। মাইকেল মধুসূদনেরও তাই, থাকবার যো ছিল না। বিদ্যাসাগরের কাছে ২০০৲ টাকা চেয়েছিলেন। কিছুতেই দিবেন না, শেষটা টানাটানি করে কতকগুলি নোট নিয়েই মধুসূদন ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানকে দুইখানা দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত কেমন বাবু তৈয়ারি করে গিয়াছিলেন! মাথাটি আহার করেছেন, রাজা দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর। এঁরা তাঁকে অনেকবার সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু শেষে পারলেন না, উপায় ছিল না। ৩।৪ বৎসর সরস্বতীর ব্যাস চুপ করেছেন, ভালই হয়েছে। টাকা থাকলে আমাদের দেশের লোক কোন রকম চেষ্টা চরিত্রও করে না; ঘরে ভাত থাকতে, ভগ্নীপতির অন্ন থাকতে আর কোথাও যাবেন না। বাঙ্গলা দেশের জাত-কবি কিনা, তা নইলে সরস্বতী আসিতেন না, ঐ চিন্তা হ'লে মোহরের টুনটুন বাজনা যতক্ষণ কানে বাজবে, ততক্ষণ তাঁর বাজনা ভাল লাগে না, হাড় ঢনঢন করলে তাঁর ঝঙ্কার ওঠে। মাইকেল মধুসূদন যদি অমন করে অভাবে না পড়তেন, তা'হলে আর কিছু হত না।

"আর একটা কথা বলব। অন্যায় সমরে সুমিত্রাসুত মারিল মেঘনাদে। অবশ্য বাল্মীকির অনুকরণ ঠিক করেন নাই। অন্যায় কি করে হল? আমার বৌটি চুরি করে নিয়ে গেল, তাকে মারতে গেলেম, এটা হল অন্যায়? ইংরাজি নভেল আমরা পড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে আর একজন পুরুষ একা drawing roomএ বসে হাস্য-কৌতুক রসালাপ করে গেল, স্বামীটী সেখানে গেলে হবে অন্যায়। এ আমাদের দেশে নাই, তাদের দেশে স্ত্রীর সতীত্বের দাম নেয় damage আদায় করে, আমরা বলি কুলে কলঙ্ক দিল। লক্ষণের ভারী অন্যায় হয়েছে।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে একটি কীর্ত্তন গান এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে কতক অংশ আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম এ মহাশয় মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় মধুসূদনের কাব্য হইতে কয়েকটি স্থল আবৃত্তি করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের ভৌম আর একটি সংস্করণ আছে—তাহার নাম উডুম্বর পুষ্প; ইহা

শত বৎসরে একবার ফুটিয়া থাকে। মধুসূদনও সেইরূপে বঙ্গসাহিত্য-বৃক্ষে শত বর্ষ হইল, উডুম্বর পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিলেন। বঙ্গযুবকগণ! তাঁহার একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই—"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি? "মধুসূদন অনেক ভাষায় পণ্ডিত হইয়াও মাতৃভাষাকে কখন ভুলেন নাই।

পরিশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, মাইকেলের আবির্ভাবের ১০০ একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হন। মুসলমানেরা ৭০০ বৎসর বাঙ্গালা দেশ দখল করিলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে যেরূপ মুসলমানী ভাব স্থান পাইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও নাই। তাঁর অন্নদামঙ্গল খাঁটি বাঙ্গালা, বিদ্যাসুন্দর খাঁটি সংস্কৃত, এবং মানসিংহ আরবী, উর্দ্দুর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহার পর ১০০ শত বৎসর অরাজক অবস্থা, এই অবস্থায় সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে না। তবে গান, পাঁচালী, যাত্রা ও পদাবলী হইতে পারে। ভারতের ১০০ বৎসর পরে মাইকেল আসিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিতেন,—তুমি এক ভাষায় পণ্ডিত, আমি ১৮ রকম ভাষায় পণ্ডিত। মাইকেলের একটা দিক্ অনেকেই দেখেন নাই। মহাকবি মহাকাব্য, পদকর্ত্তা পদাবলী এবং নাট্যকার নাটক লেখেন। কিন্তু মধুসূদন একাধারে মহাকাব্য, কবিতা, নাটক, খণ্ডকাব্য, সবই লিখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ছাড়া এরূপ প্রতিভা আর কাহারও দেখা যায় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীমধ্যে কবির চিত্র বিতরণ করা হইয়াছিল।

""আনন্দ-বাজার-পত্রিকা''-সম্পাদক মহাশয় অদ্যকার সভায় বিতরণের জন্য ৫০ খানি "আনন্দ-বাজার-পত্রিকা" দান করিয়াছিলেন। অদ্যকার সংখ্যা মাইকেল-মধুসূদনের স্মরণার্থ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং মধুসূদনের বিষয়ে নানা আলোচনায় উহা পূর্ণ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৩ই মাঘ ১৩৩০, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৪, রবিবার অপরাহ্ণ, ৬টা

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয়-

লিখিত "উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি।" ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ৺রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর, (খ) ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং (গ) ৺রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস-সি মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয় তাঁহার "উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরিষৎ এ পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন পুথি ও স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ও মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও দেশমধ্যে অসংখ্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে—অর্থাভাবে পরিষৎ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। এই কাজের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিষদের বহু হিতৈষী বন্ধু অনেক সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি পরিষদের কোন কোন পরম হিতৈষী সদস্যের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে অদ্যকার প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় উড়িষ্যায় প্রেরিত হন। তিনি প্রধানতঃ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া দুইখানি অমূল্য প্রাচীন পুথির সন্ধান করিয়াছেন। ঐ দুই-খানি পুথির বিষয়ই আজিকার আলোচ্য-বিষয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি অনুসারে পুথি দুইখানি পরিষদের জন্য নকল করা হইতেছে। যে সকল দুষ্প্রাপ্য পুথি পরিষদের পুথিশালায় নাই, সেগুলি স্থানান্তর হইতে নকল করিয়া রাখিতে উক্ত সমিতি আদেশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য অষ্টাদশ বর্ষকাল উড়িষ্যা প্রদেশে ছিলেন। তখনকার সাহিত্যে তাঁহার অনেক কথা পাওয়া যাইবে, তাহা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পুথি নকল হইলে পর প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা চলিতে পারিবে। তবে প্রবন্ধ-লেখক যে সকল সংবাদ দিলেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুথি ও প্রত্নসম্পদ্ সংগ্রহ কার্য্যের জন্য পরিষৎ একটি ভাণ্ডার স্থাপনের সঙ্কল্প বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে, পরিষদের পরম সুহৃদ্ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য সম্পাদকের হস্তে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আশা করা যায়, অন্যান্য হিতৈষী সদস্য তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্ত সত্বরেই অনুসরণ করিয়া পরিষদের উক্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন।

৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত মূল সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঞ্জয়ী মহাভারতের আখ্যানগত পাঠভেদ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ৺রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৺পূর্ণেন্দু বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ পরিচিত। তিনি দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি অতি প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় বহু গুরুতর বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'রামায়ণী কথা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ৺পূর্ণেন্দু বাবুর স্বদেশ-(কান্দী)-বাসিগণ তাঁহার একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষদে উপহার দিবেন।

(খ) সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৺রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয় পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই পরিষদে আসিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে পর তাঁহার জ্বর ক্রমশঃ বেশী হওয়া সত্বেও তিনি প্রথম বর্ষেই ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বর্দ্ধমান ও পাটনাতে যে যে বৎসর হয়, সেই সময় তিনি সম্মিলনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন। পরিষদের জন্য মূর্ত্তি ইষ্টক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও সাহিত্য-শাখার সভ্য থাকিয়া পরিষদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া মাসিক সাহিত্যে ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার আলোচনা সম্পূর্ণ হইল না।

(গ) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু এবং সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং পরিষদের জ্যোতিষ-শাখার সভ্য ছিলেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে তিনি বর্দ্ধমানের উত্তর, বীরভূমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব, মুরশিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম ও নদীয়ার নানাস্থানে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যে নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পরিষৎ-পত্রিকার ১৪শ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭। (ক) সম্পাদক মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

(খ) পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা যতদূর সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, ১৪ বৃদ্ধু ওস্তাগর লেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত রামলাল শেঠ বি এল্, ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, জাড়া, মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১২ ছকু খানসামার লেন, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মল্লিক, ৪৫।১এ বীডন ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ড, ২ সীতানাথ রোড, সিমলা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডবলিউ ডি, ১৭ রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, ১৮ রসা রোড নর্থ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, ২০জি কারবালা-ট্যাঙ্ক লেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বি এ, ২০জি কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, শ্রীযুক্ত টি, আলাম এম এ, বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বি এ, ১৩ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, উকীল, হাজারীবাগ; শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, ৯৫।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্ত পদ্মকুমার চৌধুরী, ৩৩ দেব লেন; শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত, ৩৩।২ বীডন ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, ১০।১ চক্রবেড়ে রোড সাউথ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭ মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট; শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ৩৫।৬।২ পদ্মপুকুর, এল্গিন রোড; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়, সব্ ইন্সপেক্টার অব পুলিস, জিয়াগঞ্জ, মুরসিদাবাদ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসাক, ৬২।১ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মিশ্র, ৬ লুকাস লেন; শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত ডাঃ মৃগাঙ্ককুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড; শ্রীযুক্ত এস্ মুখার্জ্জি, ৭ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, বোধপুর, রাজ-

পুতানা ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস, ৯৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, ৩৮এ জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ২৪ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১১২।এ মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক

পুথি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন—প্রাচশ্চিত্ত-তত্ত্ব।

পুস্তক

উপহার দাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, উপহৃত পুস্তক—১। কায়স্থ পরিচয় (সাধারণ খণ্ড—সামাজিক শিক্ষা প্রণালী)। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দে,—২। ভবী। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৩। কালিকা পুরাণীয় দুর্গাপূজা পদ্ধতি। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি,—৪। নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, ৭ম বর্ষ ১৩৩০, ৫। চালচিত্র, ৬। মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩০, বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩০, ৭। বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১২৫৯ বঙ্গাব্দ), ৮। দেনা পাওনা, ৯। রত্নাকর, ১০। চিকিৎসা-রত্ন (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—১১। উপদেশামৃত (১ম ভাগ), ১২। ঐ ২য় ভাগ। শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল—১৩। আগুসম্বিদ্দায়িনী, ১৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ, ১৫। প্রেমতত্ত্ব পদাবলী, ১৬। পাষণ্ড পীড়া নামক প্রত্যুত্তর, ১৭। রসিক রঞ্জন, ১৮। জ্ঞানাঞ্জন (অসম্পূর্ণ)। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—১৯। নারী তীর্থ। শ্রীযুক্ত প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউসের কর্ম্মকর্ত্তা, চন্দননগর—২০। কমলাকান্তের পত্র, ২১। নতুন রূপকথা, ২২। নবযুগের কথা, ২৩। পূর্ণযোগ। ২৪। স্বরাজের পথে ২৫। দেবজন্ম, ২৬। নারীর কথা, ২৭। অরবিন্দের পত্র, ২৮। জগন্নাথের রথ। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,—২৯। নবযুগের সাধনা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ—৩০। শান্তি। শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ—৩১। বাঙ্গালার বিপ্লববাদ। শ্রীযুক্ত সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক—৩২। কালীতন্ত্রম্। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—৩৩। বেদবাণী, ৩৪। সর্ব্বনাশের নেশা, ৩৫। পারণ। শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পি-এচ ডি—৩৬। পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়), ৩৭। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল প্যাল চৌধুরী—৩৮। হানিফের গুরুদক্ষিণা, ৩৯। লহরীমালা (১ম ও ২য় ভাগ), ৪০। সতীর মন্দির। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি—৪১। অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা, ৪২। মাখ্‌জানে মসিহা বা সহজ হাকিমী দ্রব্যগুণশিক্ষা, ৪৪। চক্রদত্তঃ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—৪৫। সাধনা। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত ৪৬—তন্ত্র-তত্ত্ব রহস্য। শ্রীযুক্ত

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ৪৭—সরল সংস্কৃত পাঠ (১ম ভাগ), ৪৮। ঐ (২য় ভাগ), ৪৯ উদ্ভটসাগর, ১ম সংস্করণ (১ম ২য় অম্ব প্রবাহ, ঐ ২য় সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৫০। নারিকেলের কাতা প্রস্তুত করা, ৫১। মৃত পশুদেহ হইতে চামড়া ছাড়ান ও তাহার সংরক্ষণ। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—৫২। ভারতবর্ষের সহজ ইতিহাস। শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী—৫৩। শ্রীশ্রীরাস তত্ত্বম্ ৫৪। নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৫৫। রঙ্গালয়ের রূপকথা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—৫৬। রাজকন্যা (২ খানি)। শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র লাহা—৫৭। আর্ট ও আহিত্যাগ্নী। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—৫৮। ভুল ভাঙ্গা। রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর—৫৯। মেনকারাণী। The Superintendent, Government Printing, India—৫৯। Epigraphia Indica, Vol. XVII pt. I, January, 1923, ৬০। do. pt. III, July, 1923, ৬১। do. pt. IV, October, 1923, ৬২। Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, relating to certain Indian States from 1911-12 to 1920-21. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—৬৩। Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal, 1922-23 64. Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XIII, 65. Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies 1922, 66. Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency, 1922. 67. Bengal Dist. Gazetteer, Pabna, 1923, 68. Sixty-one Annual Report of the Govt. Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1922-23. 69. Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1923, 70. Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal, 1922-23. 71. Report on the Administration of Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal, 1329 B. S. (1922-23), 72. Annual Report of the Mental Hospitals in Bengal, 1922. Assistant Secretary, Govt. of India, Dept. of Education and Health—73. Indian Historical Commission Proceeding, Vol. V. January, 1923. The Director, Geological Survey, India—74. Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. pt. 4-75. Do. Vol. XV. pt. 3, 76. Memoirs, Geological Survey of India Vol. XLV, pt. 2. The Director of Industries, Bengal—77. Improvements on the Manufacture of Shellac, 78. Calcutta Research Tannery, Small Tannery Schemes,—79. The Manufacture of Coirs. 80. Scheme

for a small cigar factory in Bengal, 80. Results of Experiments in connection with the improvements of hand fly-shuttle looms used by the weavers in Bengal, 182. Suggestions for the constitution of Joint Work's Committee in Industrial concerns in Bengal, 83. Statistics regarding the disposal of animal bye-products, 84. Bleaching of Gangwa wood (Excoccoria Agallocho) in the Manufacture of Matches. The Agricultural Advisor, Govt. of India, Pusa—85. Scientific Reports of the Agricultural Research Instt. Pusa, 1922-23. The Librarian, Imperial Library—86. Report on the Working of the Imperial Library from 1st. Apl. to 31st Mar. 1923. The Secretary, American Anthropological Association—87. Memoirs of the American Anthropological Association, No. 29, 1923. The President, Museum of Fine Arts, Boston—88. The Museum and the Public. The Secretary, Smithsoniam Instt.—89. Annual Report of the Smithsonian Institution, 1921, 90. History of Electrie Light, 91. Report on Co-operative Educational and Research work carried on by the Smithsonian Institution and its Branches, 92. Descriptions of New East Indian Birds of the families Turdidae, Sylviidae, Pycunonotidae and Muscicapidae, 93. Description of an apparently new toothed Cetacean from South Carolina, 94. On the Fossil Crinoid family Catillocrinidae, 95. The Telescoping of the Cetacean skull, 96. Hand Book of American India Languages, Pt. 2. 97. Blood revenge, War and Victory feasts among the Gibaro Indians of Eastern Ecuador. The Publisher, Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee—98. Truth about Nabha. 1923. The Secretary, Watson Museum of Antiquities, Rajkot—99. Anunal Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, 1922-23. The Publisher, Prabartaka Publishing House,—100. The Ideal of Karmayogin, 101. The Renaissance in India, শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—102. The Devalaya—its aims and objects, 103. A Modern Saint of India—Sevabrata Brahmarshi Sasipada Banerji. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—104. Reflections on Women. শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ বি, এম্ এস্সি—105. Map of the City of Calcutta (4 sheets).

গ—পরিশিষ্ট

প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৮৬। প্রথমে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পঞ্চ পাণ্ডব এবং সর্ব্বশেষে দ্রৌপদী বিরাট-ভবনে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

প্রথমে যুধিষ্ঠির ও ভীম, তৎপরে দ্রৌপদী এবং তৎপরে অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব বিরাটালয়ে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

মূল মহাভারত

প্রথমে যুধিষ্ঠির, তৎপরে ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও সর্ব্বশেষে নকুল বিরাট-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৭। কীচক বধের পর কীচকের নিরানব্বই জন ভাই দ্রৌপদীকে কীচকের মৃত্যুর কারণ জানিয়া রাজা বিরাটের অনুমোদনক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত পোড়াইবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া গেল। এ দিকে দ্রৌপদীর আকুল ক্রন্দনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি নগরপ্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা কীচকের নিরানব্বই জন ভাইকে সংহার করিলেন। পরে দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। বিরাট রাজা গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক কীচকের ভ্রাতৃগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভীত ও শোকাকুলিতচিত্তে শবদাহের অনুমতি দিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিরাটের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত দগ্ধ করিবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া অন্যান্য লোকজন সহ কীচকের ৯৯জন ভাই শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছে—এমন সময় দ্রৌপদীর কাতর ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া ভীম প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ হস্তে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্ব আসিতেছে মনে করিয়া কীচকের ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে সম্মুখবর্ত্তী কয়েকজনকে সংহারপূর্ব্বক ভীম, দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে গন্ধর্ব্বের ভয়ে নগরের কোন লোক বাহিরে আসে না। শবানুযাত্রী ও কীচকের ভাইরা গিয়া বিরাট রাজাকে বলিল,—আমরা কীচককে দাহ করিতে পারিলাম না। শ্মশানের কাছে গেলেই গন্ধর্ব্বরাজ বৃক্ষহস্তে আমাদিগকে মারিতে আইসে। অতএব আপনি ইহার ব্যবস্থা করুন। রাজা তখন ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, বল্লব ব্রাহ্মণ (ভীম) ব্যতীত আর কেহ কীচককে দাহ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া বল্লব নামধারী ভীমকে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিলে ভীম রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, বহু লোকজন লইয়া শ্মশানে গেলে সেই লোক-কোলাহল শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধাইয়া আসিবে, অতএব আমার মতে আমি একক গিয়া কীচককে

দাহ করিব এবং আর সকলে একএক জন করিয়া আমাকে ক্রমশঃ কাষ্ঠ দিয়া আসিবে। রাজা এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা হইল এবং ভীম গিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া কীচককে দাহ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কীচকের ভাইরা একএক জন করিয়া কাষ্ঠ লইয়া যেমন ভীমের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, ভীম অমনি প্রত্যেককে ধরিয়া কীচকের চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৯৯ জন ভাইকে কীচকের সহিত পোড়াইয়া মারিয়া, রাজার নিকট গিয়া ভীম বলিলেন যে, আমার নিকট একএক ভার কাষ্ঠ দিয়া কীচকের শোকে তাহার ভাইরা সকলেই চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছে। রাজা শোকাকুলচিত্তে শ্মশানে গিয়া কাতর নয়নে সেই সকল দৃশ্য দর্শন করিলেন।

মূল মহাভারত

ভীম ১০৫ জন উপকীচককে (কীচক-ভ্রাতা বা বান্ধব) বৃক্ষাঘাতে নিহত করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৮। দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশর্ম্মা, বিরাটকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম একাকী গিয়া, সুশর্ম্মার সৈন্যসকল বিনাশপূর্ব্বক দুই হাতে বিরাট ও সুশর্ম্মা দুই জনকে ধরিয়া লইয়া আইসেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজা বিরাটকে সুশর্ম্মা বন্দী করিয়া লইয়া গেলে বিরাটের সৈন্যসকল একত্রিত করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব চারি ভাই সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের শরজালে সুশর্ম্মার রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হইলে, সেই অবসরে বিরাট, সুশর্ম্মার রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নিজ সৈন্যদলে মিলিত হন এবং পরে ভীম সুশর্ম্মাকে বন্দী করিয়া আনেন।

মূল মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী

৮৯। উত্তর-গোগৃহে অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণে কুরুপক্ষের যাবতীয় লোক মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই চারিজন ব্যতীত কুরুপক্ষের অন্য সকলেই অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণে মুগ্ধ হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত আর সকলেই অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণে মোহিত হইয়াছিল। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিবেধ জানিতেন বলিয়া তিনি মুগ্ধ হন নাই।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৬ই মাঘ ১৩৩০, ৩০এ জানুয়ারী ১৯২৪, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

বক্তৃতার বিষয়—উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব।

বক্তা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতী-রমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিলে পণ্ডিত মহাশয় "উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়কে এ বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়ের নাম আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আজ আমাদের প্রথম ঘটিল এবং তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রাণতত্ত্ব বিষয়টি তিনি যেরূপভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য দর্শনেও প্রাণতত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে যে দিন স্থির মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হইবে, সে দিন মানুষ অমর হইতে পারিবে। আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই যে, ঋষিরা প্রাণকে বিশ্বব্যাপী বলিয়াছেন এবং জড়ের সহিত প্রাণের কোন বিরোধ নাই, ইহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং, ইহাও বেদে আছে। বস্তুতঃ গ্রহণ, ত্যাগ ও ধারণ, ইহার একটাও প্রাণ নহে; কেন না, প্রাণের অস্তিত্বেই ঐ ত্রিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। তবে প্রাণ কি? তাহা কিরূপে বলিব? শরীর ব্যবচ্ছেদ করিতে গেলে প্রাণ চলিয়া যায়, তাহাকে ধরা যায় না। অতএব প্রাণের তুলনা প্রাণই; তাহার অপর আর কোন তুলনার জিনিষ নাই। মৃত্যুতে কি প্রাণের বিলোপ হয়? তাহা কে বলিবে? জড়ে ও প্রাণে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক চিন্তা করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন, প্রাণ অর্থে সাড়া। তাহা হইলে বৃক্ষ-শ্রেণীও প্রাণী পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বলেন যে, অণুপরমাণুরও প্রাণ আছে।" এই বলিয়া তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উপনিষদে প্রথম জিনিষ ব্রহ্ম; তৎপরে প্রাণ, মন ও চৈতন্য। যো বৈ মনঃ স প্রাণঃ, ইহাও বেদের অনেক জায়গায় আছে। যদি কৈবল্যজ্ঞানবিশিষ্ট কোন লোক থাকেন, তবে তিনিই মাত্র এ সম্বন্ধে বলিতে পারেন। যাহা হউক, হিন্দুরা যখন এই সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন পৃথিবীতে মাত্র গ্রীকদের মধ্যে আরিষ্টটল ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কেহ বড় আলোচনা করেন নাই। আমরা যাহাকে শরীর বলি, তাহা অসংখ্য "সেল" (cell) বা কোষে গঠিত,—সেই সকল কোষও আবার অসংখ্য জীব। ইহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রাণ, মন ও চৈতন্য, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত না হইলে ইহার কিছুই মীমাংসা হইবে না। পণ্ডিত মহাশয় আজ আমাদিগকে আধ্যাত্মিক প্রাণের কথা শুনাইলেন। আশা করি, ইহার পর তিনি অধিদৈব ও অধিভূত প্রাণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনাইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

পরিশেষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার মনে হয়, উপনিষদে প্রাণতত্ত্বের বিশিষ্ট মূর্ত্তি দেওয়া হয় নাই এই জন্য যে, প্রাণের পরবর্ত্তী আলোচনা আত্মার আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কারণ, আত্মা ও প্রাণ একই জিনিষ। আত্মা সর্ব্বত্রই আছেন; কোন বস্তুই তাঁহা হইতে বিচ্যুত নহে। যে হেতু তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আমাদের শাস্ত্র জড় স্বীকার করেন না। আজকাল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও ক্রমশঃ এই কথা স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, প্রাণতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাদিগকে সুখী করিবেন।" এই বলিয়া তিনি শ্রোতা, বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ মাঘ ১৩৩০, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুবক্তা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবু আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রন্থ লিখিলে অদ্বিতীয় গ্রন্থকার হইতেন। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "বঙ্গবাসীর" কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার তুল্য সম্পাদক অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেই চলে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সর্ব্বপ্রকার সংবাদই তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিকে অতিক্রম করিত না। জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের অনেক পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁহার 'উমা' 'রূপলহরী' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস রহিয়াছে। তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা না করিয়া যদি গ্রন্থকার হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি হইত। তিনি 'আইন-ই-আকবরী'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রকাশ করিতে দেন নাই। তিনি সুবক্তা ও সুরসিক ছিলেন। দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিয়াও তিনি সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। কাহারও প্রতি তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি নাট্যামোদীও ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায় বি এ মহাশয় স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবুর উদ্দেশে রচিত একটা গান গাহিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবু আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত এক সঙ্গে আমরা কাজ করিয়াছি। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতো-মুখী ছিল। তিনি যে বিষয় লিখিতেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া লিখিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার দখল ছিল। তন্ত্র-শাস্ত্র প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায় তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত ও মাতৃভক্ত সন্তান আমি খুব কম দেখিয়াছি। আমি তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, "তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। পাঁচকড়ি বাবুর শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, তিনি সকল বিষয়ের আদি, পুষ্টি ও পরিণতির লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অতি অল্প ব্যক্তিই সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল—অনুবাদে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য সংক্রান্ত বহু বিষয়ে আমরা তাঁহার নিকট সদুপদেশ পাইয়াছি। তিনি সৎসাহসী ছিলেন। কাহারও দোষ দেখিলে তিনি তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। এই সাহিত্য-পরিষদের গঠনের ও পুষ্টির জন্য ও

সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি। তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও অন্যান্য শাখা-সমিতির সভ্য থাকিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজি 'টেলিগ্রাফ', 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'নায়ক' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের পূজ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহার স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।"

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবু আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীত্ব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালীত্ব ছিল বলিয়াই তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। তাঁহার মত বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর মত বলিতে আর একটি মাত্র লোক ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেশ যেন তাঁহার বাঙ্গালীত্ব না ভোলে। তাঁহার ভাল ভাল লেখা সঙ্কলন করিয়া যদি সাহিত্য-পরিষৎ ছাপাইবার ভার লইতে পারেন, তবে আমি যথাশক্তি সাহায্য করিব।"

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সাময়িক পত্রের সুদক্ষ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের, বঙ্গ-সাহিত্যের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন, "সংবাদপত্র সম্পাদনে নিজের মত গোপন রাখিয়া অপর মত প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল। এরূপ লোক আমাদের দেশে বা বিদেশে আছেন কি না, আমি জানি না। দেশের লোক তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক জানিত কি না সন্দেহ। তিনি এ বেলা এক পত্রে একরূপ এবং ওবেলা অন্য পত্রে অন্যরূপ লিখিয়াছেন। পাঁচকড়ি বাবুর মত লোকের অভাব হইলে দেশে general cultureএর অভাব হইবে। তিনি সমাজের খাঁটি ইতিহাস দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পরিষদের অধিবেশনাদিতে উপস্থিত হইতেন এবং সম্মিলনেও যোগদান করিতেন।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে বিপদ সত্ত্বেও আমি আজ এই সভায় আসিয়াছি, তাহার কারণ, স্বর্গীয় সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার গ্রহণ করাই আমার কাজ। আজ শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবুর একখানি তৈলচিত্র যাহাতে পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ভার লইতে আসিয়াছি। আমি যখন বালক, তখন হইতেই পাঁচকড়ি বাবুর সহিত আমার পরিচয়। সাহিত্য-পরিষদের নব-গৃহ প্রবেশের দিন তিনি আঁচল

পাতিয়া পরিষদের জন্ত অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনি বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেই কাজের লোপ হইল। যদি পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধরাশি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিবার অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আমি নতমস্তকে সে ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।"

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহার জন্ত পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পর তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয়, পাঁচকড়ি বাবুর মৃত্যুতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী পিতা মাতা বিদ্যমানে সংসারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পাঁচকড়ি একটি জিনিয়াস্ ছিলেন। এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস যখন লেখা হইবে, তখন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বাঙ্গালা ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত, সংবাদপত্রের সম্পাদনকে যে জীবিকা করিতে পারে—পাঁচকড়িই তাহার পথপ্রদর্শক—তাহা বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকা উচিত। তাঁহার কোন বিদ্যার উপর কথা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বাঙ্গালীকে ভালবাসি—পাঁচকড়ি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ"—ইহা পাঁচকড়ির জীবনে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি আপন দারিদ্র্য গোপন করিতেন না। বিলাসিতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা আজ লুপ্ত হইয়াছে—ইহা দুঃখের বিষয়। সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিয়া একটি বঙ্গভাষার লেখকগণের জীবনী প্রস্তুত করুন—এই আমার প্রস্তাব। জগদীশ্বর তাঁহার পিতা-মাতার অশ্রু মোচন করুন। আপনারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার শান্তির জন্ত প্রার্থনা করুন।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন এবং সমাগত সদস্তগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২০এ মাঘ ১৩৩০, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—পরলোকগত সাহিত্য-সেবী স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন—এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি আজ উপস্থিত হইতে পারিবেন না—এই মর্ম্মে তিনি এক পত্র লিখিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক এই পত্র পঠিত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, অদ্য যাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য এই অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর উদ্দেশে রচিত তাঁহার একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র দ্বারা ৺দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর গুণাবলী আলোচনা করিয়া ঢাকা হইতে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর নানা গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ৺দেবেন্দ্র বাবুর শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সম্পাদিত গীতাখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া। বক্তাকে তিনি সেই ভার দিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা পারেন নাই। যে কয় খণ্ড গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হয়ত তাঁহার প্রচলিত মতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি অকপটে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—এ ক্ষমতা অল্প লোকেরই আছে। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। সাংসারিক শোকে-দুঃখে বিচলিত হইতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই—তাঁহার মধ্যে সমস্ত গুণের বিকাশ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন, "৺দেবেন্দ্র বাবুর অনেক কীর্ত্তির কথা আলোচিত হইল, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহার সম্পাদিত গীতার 'বিজয়া ব্যাখ্যা'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা এই গ্রন্থে জানিতে পারা যাইবে। এই গ্রন্থে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাধকোচিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার জীবনের যাহা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা তিনি এই গ্রন্থে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই গীতা এক-আধ-বছরে পড়িয়া বোঝা যায় না—ইহার তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইলে ও তাহা ধারণ করিতে হইলে বিশ বছরেও কুলায় না। হিন্দু ধর্ম্ম-জীবন ও হিন্দুর চিন্তা সম্বন্ধে এই একখানি মাত্র বই পাওয়া যায়—দ্বিতীয় বই দেখা যায় না। আমি আশা করি, এই বই হিন্দুর ঘরে ঘরে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। আমি তাঁহার সহিত এক সঙ্গে বহুদিন কাটাইয়াছি এবং তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি ও বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। যতদিন জীবিত থাকিব, তাঁহাকে গুরু বলিয়া সর্ব্বদা পূজা করিব। চিত্রের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের ছায়া স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছে—সেই সৌম্য মধুর ভাব সদাই আনন্দরসে ভরপুর, আনন্দময় চিত্ত সকলেই দেখিতে পাইবেন। তিনি মাদারীপুরে যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট প্রত্যহই যাইতাম। তাঁহার মধ্যে কোনরূপ অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি নাই। সকলেরই সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন—তাঁহার চরিত্রে এমন একটা মধুরতা ছিল যে, সকলেই তাহাতে আকৃষ্ট হইত।

"দেশের দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ফলে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি অনেকের ভ্রম ধারণা—অবজ্ঞার ভাব দেখা যাইত। এখন অবশ্য হাওয়া কিছু ফিরিয়াছে বলিতে পারা যায়। আমারও সেইরূপ অবজ্ঞার ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপাতে হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দু আদর্শের প্রতি আমার দৃষ্টি ফিরিয়াছে। তিনি তাঁহার সকল প্রবন্ধেই হিন্দুর আদর্শ ও সভ্যতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের চেষ্টায় আজকাল দেশে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হাওয়া ফিরিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। হিন্দুর বিদ্যা, হিন্দুর সভ্যতার শীর্ষত্ব, হিন্দু-ধর্ম্মের মহত্ত্ব আমি তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করি—আমি আজ যে হিন্দু বলিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি—এ তাঁহারই শিক্ষা ও উপদেশে। আমি প্রার্থনা করি, যেন আমি জন্ম জন্ম এই ভারতে এই বাঙ্গালাতে হিন্দু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "৺দেবেন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। আমি একখানি গীতার সংস্করণ করিয়াছিলাম। পরে, এক্ষণে তিলক মহারাজের গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। কালিদাস বলিয়াছিলেন যে, চিত্র দেখিলেই লোকের ভাষা বোঝা যায়—৺দেবেন্দ্র বাবুর চিত্র দেখিলেই তাঁহার ধীরোদাত্ত ভাব বেশ বোঝা যায়। 'নব্যভারতে' তাঁহার গীতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করি। তখনই তাঁহার মনীষার পরিচয় পাই। যখন মনে হয়, চাকরীতে ঢুকিয়া কি করিয়া তিনি অবসর মত এত বড় গীতার এমন 'বিজয়া ব্যাখ্যা' করিয়াছিলেন—তখনই তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমে মস্তক নত হইয়া আসে। তিলক মহারাজ জেলে বসিয়া গীতা লিখিয়াছিলেন—আর দেবেন্দ্র বাবু চাকরী করিতে করিতে গীতা লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের গৌরব যে, তিনি তিলক মহারাজের পূর্ব্বেই অত বড় গীতার সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিলক মহারাজের গীতাখানি ইংরেজি ভাষায় লিখিত এবং উহা পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও গভীর দার্শনিকতায় পূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেবেন্দ্র বাবুর গীতা যে কত বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ,

তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন না। তিলক মহারাজের গীতাখানি হয়ত অনেকেই পড়িয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালীদের স্বভাব এই যে, ইংরেজি ভাষায় কোন বিষয় পড়িবার আগে বাঙ্গালায় সে সম্বন্ধে কিছু আছে কি না, তাহা তাঁহারা দেখেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে, Woodroffe সাহেবের Is India Civilized বইখানি বোধ হয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়-লিখিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" কেহ হয়ত পড়েন নাই। এই বই পড়িলে দেখা যায়, উড্রফ সাহেবের বইখানি উহার অনুবাদমাত্র। ৺দেবেন্দ্রবাবুর দেশহিতৈষণার কথা [illegible] নাই। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন এবং তিনি Indian Art and Industry [illegible] গঠন করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] সভাপতি মহাশয় [illegible] পুস্তকাপকে [illegible]।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২০এ মাঘ ১৩৩০, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, [illegible]

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-লিখিত "জালন্দার গড়" নামক প্রবন্ধ। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-প্রদত্ত আধার সমেত চারিটি প্রাচীন মথুরার মূর্ত্তি। ৬। বিবিধ।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় তাঁহার লিখিত "জালন্দার গড়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন যে, প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে। উহা প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

২। তৎপরে গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৩। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি আধার সমেত মথুরার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম্ এ, বি এস্‌সি, ৩১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—মৌলবী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ, সুতড়াগড়, শান্তিপুর, নদীয়া; শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন গোস্বামী, পাগলা গোস্বামী বাটী, শান্তিপুর, নদীয়া, শ্রীযুক্ত ডাঃ শচীনাথ প্রামাণিক বি এ, এম্ বি, শান্তিপুর, নদীয়া, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামী, বড় গোস্বামী বাটী, শান্তিপুর, নদীয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, হেড মাষ্টার, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, ১৬ কাশীদত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র, ৪ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্ এম্ এস্, ১৮২এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, খড়দহ, ই, বি, আর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেওয়ান ননীলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, দেওয়ান, বাণসওয়ারা ষ্টেট্, বাণসওয়ারা, রাজপুতানা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্ এ, এম্ বি—উপহৃত পুস্তক—১। প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়, ২। বিষতন্ত্র, ৩। কুমারতন্ত্র, ৪। বিষতন্ত্রম্ (মূল), ৫। রোগবিনিশ্চয় (মূল), ৬। কুমারতন্ত্রম (মূল), ৭। প্রসূতিতন্ত্রম্ (মূল), ৮। শালাক্যতন্ত্রম (মূল)। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার—৯। মেয়েলি হোমিওপ্যাথি, ১০। ক্রীতা। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১১। সচিত্র কলেরা চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—১২। মাছ, ব্যাঙ্, সাপ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ—১৩। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম্ এ, বি এস্‌সি—১৪। An Introduction to the Study of Physics—General Physics, Part I. ১৫। Do Sound, Part II. ১৬। Do. Light, Part IV. ১৭। An Intermediate Course of Practical Physics. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—১৮। Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, 1922-23.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৩এ মাঘ ১৩৩০, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—"জৈনদর্শনে স্যাদ্বাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় "জৈনদর্শনে স্যাদ্বাদ" নামক তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

ভারতীয় দর্শনের দুইটি বিভাগ—বৈদিক ও অবৈদিক। অবৈদিক দর্শনের মধ্যে আবার বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনই প্রধান। "স্যাদ্বাদ" জৈনদর্শনের প্রমাণ বা তর্কশাস্ত্র। উপনিষৎ বলেন—যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ এক নিত্যসত্তাতে পর্য্যবসিত। বৌদ্ধমতে ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ ছাড়া বস্তু আর কিছুই নহে। জৈনেরা বলেন যে, উক্ত প্রত্যেক মতই অর্দ্ধসত্য; উভয়ের সমন্বয় করিলেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারা যায়—তাহা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। পাতঞ্জল দর্শনে

দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা আছে। স্যাদ্‌বাদকার মল্লিসেন উহা স্বীকার করিলেও ধর্ম্ম—ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্য বা একান্ত অনিত্য, ইহার যে-কোন মত স্বীকার করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব হয় না। এইরূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যে জৈনেরা বলেন যে, বস্তু অনেকান্তস্বভাব—তাহার সম্বন্ধে কোন একান্তধর্ম্ম-জ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ সূক্ষ্ম আলোচনান্তে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কোন নয়ই যখন একান্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না, পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করে মাত্র, তখন ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ নিজ নিজ মতকে একান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া নয়াভাস প্রচার করিয়া গিয়াছেন মাত্র। জৈন আচার্য্যগণ এই জন্য উপদেশ করেন যে, "এই বস্তু এইরূপ" এ কথা বলিলে তাহার অন্য রূপের প্রতিষেধ করা হয়, সুতরাং "এ বস্তু হয়ত এইরূপ" এই কথা বলাই অধিক সঙ্গত। ইহারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। অতঃপর প্রবন্ধকার স্যাদ্‌বাদের চরম পরিণতির বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—

"প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং জৈন গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার ভিতর তিনি তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এবং সেগুলি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আশ্রয় লইয়া আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্যাদ্‌বাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ণাকার বলিলেও চলে—তবে Pragmatism সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বক্তব্য। Pragmatism ও জৈন অর্থক্রিয়াকারিত্ব ঠিক একই ব্যাপার কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। Pragmatism সম্বন্ধে William James যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকস্থলে পরিষ্কার নহে—এইরূপ মত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা প্রকাশ করিয়াছেন। মূল কথা, যে সকল বিষয় বিচারের অতীত—ধর্ম্ম-নীতি, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রভৃতি—সেগুলি মনুষ্যসমাজ বহুকাল হইতে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং তাহার প্রভাবে মনুষ্য-সমাজের উন্নতিই হইয়াছে। জ্ঞান-প্রকরণে (Epistemology) এই তিনটি বিষয়ের স্থান Pragmatistরা এই ভাবেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। জৈনেরা ধর্ম্মতত্ত্ব ওরূপভাবে বোঝেন না। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মতত্ত্ব সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। জৈনদর্শন, জীব অজীব, এই দুইটি বিষয়ের ভাগ ও বিভাগে পরিপূর্ণ। এক কর্ম্মেরই তাঁহাদের ১৫৮ প্রকরণ-বিভাগ আছে। কাজেই জৈন দার্শনিকেরা এক ক্ষেত্রের সহিত অপর ক্ষেত্র মিলিত না হয়, এই জন্যই সমুৎসুক। তাঁহাদের সাধারণ দৃষ্টান্ত এই যে, একই মানুষ, সম্বন্ধভেদে পুত্র পিতা ভ্রাতা পিতামহ ইত্যাদি হইতে পারে। যখন আমরা তাঁহাকে পুত্রভাবে ধরি, তখন তিনি এই ভাবে "অস্তি" বা আছেন বলা যাইতে পারে এবং পিতৃভাবে ধরিলে তখন 'নাস্তি' বা নাই বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধকর্ত্তা 'স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী,' 'সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী' প্রভৃতি মূল ও প্রামাণিক জৈন গ্রন্থ হইতে আমাদের স্যাদ্বাদ-বিষয়ক যাবতীয়

ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছেন। তবে অব্যক্তবাদ ও অনির্ব্বচনীয়বাদ যে এক মূল হইতেই উৎপন্ন, তাহা বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিয়া বলিলেন যে, তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ আনন্দিত এবং আশা করা যায় যে, তিনি ভবিষ্যতে পরিষদে এই সম্বন্ধে আরও শুনাইবেন। তিনি যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু — সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩০, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গের কৃতী সুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ সেবক, স্বদেশের নানা হিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গগত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সমগ্র বঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। হৃদয়ের মহত্বে তিনি বঙ্গবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন। গরীব বালকগণের সর্ব্ববিধ শিক্ষার ও আহার এবং রাস-স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি অবাধে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও মোহনীয় কথাবার্ত্তায় ছাত্রগণ বিশেষ উপকৃত হইতেন। তিনি নিরহঙ্কারী ছিলেন; ছোট বড় সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশিতেন। গোপনে তিনি কত

গরীবকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার দেশহিতৈষণার কথা দেশের লোক কখনও ভুলিবে না। তাঁহার 'ভক্তিযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'প্রেম,' 'দুর্গোৎসব' বঙ্গভাষায় অমূল্য গ্রন্থ। তিনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন সাধু ও ভক্ত ছিলেন। এই বলিয়া বক্তা ৺অশ্বিনী বাবুর স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, দেশপূজ্য অশ্বিনী বাবুর বিষয়ে প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাসের নিকট তিনি অনেক ঘটনা শুনিয়াছেন। তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত ও সাধক ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি ভক্তিভাবে তাহা পাঠ করিতেন এবং ছাত্রদেরও সেই উপদেশ দিতেন। তিনি মানুষ গড়িতে পারিতেন—এ বিষয়ে তিনি বঙ্গে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালে তাঁহাকে লোকে রাজার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি করিত।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় অশ্বিনী বাবুর সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবন দেশবাসীর পক্ষে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সত্যের এত প্রিয় ছিলেন—এমন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন যে, আইন পাশ করিয়া ও কিছু দিন আদালতে গিয়া যখন তিনি দেখিলেন, তথায় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আইন-ব্যবসায়ীদের পক্ষে চলা এক প্রকার অসম্ভব, তখনই তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সম্মতি লইয়া সেই আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মানুষ গড়িবার প্রবল ইচ্ছা ও শক্তি এই দিকেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নাম চির-স্মরণীয় করিবার জন্য ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছেলেদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "পূজনীয় অশ্বিনীবাবু দেশের জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা নানাভাবে দেশের ও স্বজাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। কীর্ত্তিমান্ অশ্বিনীকুমারের কীর্ত্তিই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। তাঁহার গুণের উত্তরাধিকারী হইলে দেশ ধন্য হইবে। তাঁহার চরণে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

(১) "বঙ্গদেশের কৃতী সুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ ও প্রতিভাবান্ সেবক, স্বদেশের নানা হিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, উদারহৃদয় স্বনামখ্যাত দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

(২) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে দেশপূজ্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের উপযুক্ত

স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই সভা ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন, "পরিষদের এই অধিবেশনের একটা সার্থকতা আছে। স্বর্গগত অশ্বিনী বাবু পরিষদের পুরাতন সদস্য ছিলেন ও বরিশাল শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক শিক্ষা ও উদ্দীপনা পাইয়াছি। তাঁহার সকল গ্রন্থই গভীর ভাব ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দেশের বহু অনিষ্ট করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে প্রধান অনিষ্ট হইতেছে, বঙ্গ-সাহিত্য হইতে অশ্বিনীকুমারকে অপসৃত করা। কারণ, বঙ্গভঙ্গের পর হইতে তিনি রাজনীতিতেই লিপ্ত হইয়া পড়েন, আর বঙ্গবাণীর সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যদি তাঁহার এইরূপ বিক্ষেপ না ঘটিত, তাহা হইলে 'ভক্তিযোগের' মত আরও গ্রন্থ আমরা পাইতে পারিতাম। অশ্বিনী বাবু ঈশ্বরনিষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি বঙ্গদেশে এমন সময় জন্মিলেন যে, নানাদিক্ হইতে বিক্ষেপ আসিয়া পড়িল। ভগবান্ সাহিত্যিকের সমৃদ্ধ বীজ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেগুলির স্ফুরণ হইলে আমরা ধন্য হইতাম। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহা হইল না। কিন্তু ইহার মধ্যেও মঙ্গলময়ের হাত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন আদর্শ দিলেন। এ আদর্শ—লয়েড জর্জ্জ বা ক্লেমেন্শ প্রকৃতির আদর্শ নয়—ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শ। জনমতের বা হাততালির তিনি কখনও অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহা বলিতেন এবং তাহা করিতেন। তাঁহার মহাপ্রাণতা জাতির কাছে প্রধান দান। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেশে নূতন আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের আমরা স্বজাতি—এই কথা মনে করিয়া আমরা আজ গৌরব অনুভব করিতেছি।"

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই দুই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—

"অশ্বিনীকুমার দত্ত দেশমাতার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। অশ্বিনীকুমার দেশ-সেবায় আপন পায়ার উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পেরেছিলেন। আজ অশ্বিনীকুমার বিহনে দেশের নৌকা তুফানে পড়েছে,—দেশে আজ এমন লোক কেহ নাই যে,—নৌকার হাল ধরে। অশ্বিনীকুমার গৃহী, ত্যাগী, সংযমী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে যদি আপনারা বুঝিতে চাহেন, তাহা হ'লে অশ্বিনীকুমারের মাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে বুঝিতে হবে—এই দুই শক্তির সত্তার সহায়তায় অশ্বিনীকুমার। অশ্বিনীকুমারের ভিত্তি সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা। অশ্বিনীকুমার আইনের দংশন—ব্যাধির বিভীষিকা—শত্রুর রক্তচক্ষু গ্রাহ্য করিতেন না। অশ্বিনীকুমার খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। অশ্বিনীকুমার জাতীয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া—বিজাতীয়ের উপাসনা করিতেন না।

গঙ্গাধর তিলক আপনাদের বন্ধু,—আমার বন্ধু—আমার অগ্রজ—আমার [illegible]—আমার [illegible]—আমার দেবতা—ভারতের বন্ধু—ত্যাগের বন্ধু—সংযমের বন্ধু—সমাজের বন্ধু—[illegible] তিলকের [illegible]। [illegible] বিয়েতে আমার [illegible] আমাদের সেই মায়েদের মেয়েলি শাস্ত্রের কথা—আমাদের মায়েদের মেয়েলি ছড়ার কথা—

"সেই ধান সেই চাল; গিন্নি বিনে আল্ থাল॥"

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি লিট্, এম্ এ মহাশয়-লিখিত "নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত অধিবেশন দুইটির আলোচ্য-বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই সকল প্রাচীন পুথি পাইয়া পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন। এরূপ পুথি অনেক স্থলেই নাই।

৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সম্পাদক মহাশয় অদ্যকার আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার লিখিত "নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর তিনি বলিলেন যে, প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে পর ইহার আলোচনার সুবিধা হইবে। ইহাতে শিখিবার বহু জিনিস রহিয়াছে। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "বাঙ্গালীর এই যে বর্ত্তমান যুগ, ইহাকে আত্মবোধের যুগ বলা যাইতে পারে। দেশের ইতিহাস, মূল ইতিহাস—ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস—রাজকীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন ইতিহাসের আলোচনা আসিয়া বাঙ্গালা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বঙ্গদেশ সাহিত্য-সেবিগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সাহিত্য-পরিষৎ যে এই শ্রেণীর আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্য দেশবাসী পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। অদ্যকার আলোচিত প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্বের যে দিক্ প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু দেখাইয়াছেন, তাহা প্রকৃতই ভাষাতত্ত্বের অনেক বিষয়ে আলোকসম্পাত করিবে। প্রবন্ধটি একটি ধর্ম্মমূলক নাটক অবলম্বন করিয়া লিখিত। সে যুগের অনেক কথাই প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। এই নাটকের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন মাগধীর সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে হয়। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের মধ্যে এই গোপীচন্দ্র নাটকের আলোচনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে অনধিকারী, তথাপি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।" তৎপরে প্রবন্ধ-পাঠের জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু, ২০৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ ক্রীক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় ললিতকুমার মিত্র, ২২৬ আপার সাকু'লার রোড; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র, শিবসাগর, আসাম; শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র, ২২৬ আপার সাকু'লার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নন্দী এম্ ডি, ৩৪।১ বিডন ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—১। ঋগ্‌বেদসংহিতা, ২। বাজসনেয়-সংহিতা (যজুঃ), ৩। সামবিধান ব্রাহ্মণ, ৪। প্রাণতোষণী (তন্ত্রনিবন্ধ), ৫। দান-সাগর (স্মৃতিনিবন্ধ), ৬। প্রাণকৃষ্ণক্রিয়াম্বুধি, ৭। প্রাণকৃষ্ণ বৈষ্ণবামৃত।

পুস্তক

উপহারদাতা :—রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, উপহৃত পুস্তক—১। সঙ্গীত-সোপান। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ পাত্র—২। শান্তি-পথ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সিংহ—৩। নিত্যকৃত্যধ্যানস্তবমালা, ৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—৫। বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়। শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়—৬। সুধাকর গ্রন্থাবলী, ১ম অঞ্জলি, ৭। ঐ ২য় অঞ্জলি, ৮। ঐ ৩য় অঞ্জলি, ৯। ঐ ৪র্থ অঞ্জলি। শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মিত্র—১০। নীতি-সংগ্রহ, ১১। হেমপ্রভা, ১২। ব্রহ্মচারী, ১৩। অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী), ১৪। কৃষ্ণলীলা, ১৫। [illegible], ১৬। রত্নগিরিনন্দিনী, ১৭। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, ১৮। বিষ্ণুপুরাণ ([illegible]), ১৯। আর্য্যদর্শন, ৫ম বর্ষ, ১২৮৫, ২০। ভক্তিযোগ, ২১। বিষবৃক্ষ ও [illegible], ২২। সৌরভ ১ম খণ্ড (১।২।৩ সংখ্যা), ২৩। আমার অশ্রুমালা, ২৪। [illegible], ২৫। বর্ত্তমান ভারত, ২৬। প্রবোধ প্রভাকর, ২৭। বুড়ো বক্কেশ্বরের [illegible], ২৮। [illegible], ২৯। সারদামঙ্গল, ৩০। অপূর্ব্ব বিচার, ৩১। বৃহৎ সন্ধ্যাবিধি, ৩২। [illegible], ৩৩। পিশাচিনী, ৩৪। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, ৩৫। কাশীমাহাত্ম্য, ৩৬। কাশীখণ্ড, ৩৭। নীলদর্পণ, ৩৮। মাধবসাধনম্, ৩৯। দর্পশাতনম্, ৪০। ১খানি [illegible], ৪১। শব্দকোষ—১ম ভাগ, ৪২। ঐ ২য় ভাগ, ৪৩। ঐ ৩য় ভাগ, ৪৪। ঐ [illegible] ভাগ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪৫। মাসিক বসুমতী—১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ১৩২৯, শ্রীযুক্ত [illegible] কোম্পানীর কর্ম্মাধ্যক্ষ—৪৬। ফুলের তোড়া। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মণ—(a) An Instance of Staminody and Multiplication of Petals &c. in Cadava Trifoliata W. & A. (b) A Critical Note on Crotalaria Madurensis W. & C. Candicans W. & A. and (c) A Peculiar Bulb of Allium Sativum Linn. The Registrar, Calcutta University—৪৮। Pre-historic India by Prof. Panchanan Mitra. The Director, Archæolo-

gical Dept. Hyderabad—৪৯। Annual Report of the Archæological Department of His Exalted Highness the Nizam's Dominions, 1330 F, 1920-21 A. D. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—৫০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency. 1922. শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মিত্র—৫১। Ayesha, ৫২। How Like a Woman. ৫৩। Sophia, ৫৪। Sin, ৫৫। The Life and Adventures of Valentine Vox. ৫৬। Round the Red Lamp, ৫৭। Mr. Sponge's Sporting Tour, ৫৮। Three Clerks, ৫৯। The Life of Nelson, ৬০। Autobiography of a Retired Judicial Officer, ৬১। Practical Plane and Solid Geometry, ৬২। Young Lord Stranbigh, ৬৩। Confessions of ৬৪। Forty years Recollections of Life, Literature and 1830-1870, Vol. I, ৬৫। Do. Vol. II. ৬৬। The Suc Act., ৬৭। The Unrepealed Acts of the Governor G 1895, ৬৮। The Calcutta Law Reports, Vol. XIII. Weekly Notes, Vol. I, ৭০। Report of the All-India ence, 1912.

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৯এ ফাল্গুন ১৩৩০, ২রা মার্চ্চ ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷০টা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "অর্থ-শাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-লিখিত "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়",—৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ), (খ) নলিনীনাথ রায় (টালা, কলিকাতা), (গ) ভবানীনাথ রায় (চিথলিয়া, নদীয়া), (ঙ) হৃষীকেশ পাল (কলিকাতা) এবং (চ) সতীশচন্দ্র মিত্র (হাওড়া) মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কবিভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধটি শেষ হইলে তাহার সমালোচনা করা সঙ্গত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকের যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন ও কৌটিল্যের যুগ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া বলিলেন যে, সে যুগের লৌকিক ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার প্রভৃতির জ্ঞান কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এখনকার মত তখনও সমাজের বিভিন্ন স্তর ছিল, সুতরাং কৌটিল্যের উল্লিখিত প্রত্যেক আচার ব্যবহার ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলের দ্বারা অনুসৃত হইত বলিলে ভুল হইবে। কুসংস্কারগুলি সম্ভবতঃ অজ্ঞদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেগুলির উল্লেখ দেখিয়া তখনকার সামাজিক অবস্থার হীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করিয়া বসিলে অন্যায় হইবে।

(খ) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় তাঁহার "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরাকালের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষেই প্রথম হয়, তৎপরে আরব ও তৎপরে ফরাসীরা উহার অনুকরণ করেন। ফরাসী-দের নিকট হইতে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, নালন্দা বিহার ১৫০০ বৎসর ধরিয়া ছিল। উহা বিশেষভাবে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অশোক উহার জন্য বিশেষ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ৪।৫ হাজার ছাত্র একসঙ্গে তথায় বাস করিতেন। সময়ে সময়ে অধ্যাপকের সংখ্যাও প্রায় ১০০০ ছিল। উহার organisationটি বিশেষ সুখ্যাতির বিষয়। মুসলমানেরা যে ভাবে উহার ধ্বংস করেন, তাহার বিবরণ পড়িলে চক্ষে জল আসে।

সভাপতি মহাশয় লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধলেখক

মহাশয় অন্যান্য প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। সে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর এ বিষয়ে আলোচনা করিলে সুবিধা হইবে। তৎপরে তিনি তক্ষশিলা প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তথাকার ছাত্রদের বিষয় কিছু বলেন। এ সকল স্থানে শিক্ষা অত্যন্ত অর্থব্যয়সাধ্য ছিল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি Residential Conventএর মত ছিল। রাজা ও দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণ সেগুলিকে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

৬। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত সদস্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখার প্রস্তাব গৃহীত হইল—(ক) রামগোপালপুরের ৺রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। তিনি নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ শিক্ষার বিস্তারকল্পে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। (খ) ৺নলিনীনাথ রায় মহাশয় নড়াইলের জমীদারবংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। দেশের সেবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত সভ্য হইয়াছিলেন। (গ) ৺কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কলিকাতার অন্যতম প্রধান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। (ঘ) ৺ভবানীনাথ রায় মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যিক ছিলেন। (ঙ) ৺হৃষীকেশ পাল মহাশয় অল্প দিন হইল সদস্য হইয়াছিলেন এবং (চ) ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের পুরাতন বন্ধু ও সদস্য ছিলেন। পরিষৎ যখন অতিশিশু, তখন তিনি শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় যখন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখনও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরিষৎ এই সকল হিতৈষী সদস্যগণের পরলোকগমনে বিশেষ দুঃখিত।

৭। বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, যদি কেহ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের যথোপযুক্ত সূচী প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে একটী সুবর্ণপদক দিবেন। এই প্রস্তাবের জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

সদস্য :—শ্রীযুক্ত ডাঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম বি, চুঁচুড়া। প্র :—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম :—ঐ, সদ :—শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ৩৫।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড, এল্‌গিন

রোড। প্র :—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সম :—ঐ, সদ :—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, ২০ বেথুন রো, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস, ২০ বেথুন রো। প্র :—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সম :—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, সদ :—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, 'সার্ভেন্ট' সম্পাদক, ১ হুজুরী মলস্ লেন। প্র :—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম :—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সদ :—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১ ডালিমতলা লেন। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ঘোষ, ৮ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড। প্র :—শ্রীযুক্ত ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ, সমঃ—ঐ, সদ :—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কর, কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উপহৃত পুথি—১। শঙ্করসংহিতা, ২। (ক) দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা, (খ) রহস্যপ্রকাশ। ৩। (ক) শিবতাণ্ডব, (খ) তন্ত্র-কৌমুদী, (গ) বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র, (ঘ) নির্ব্বাণতন্ত্র। ৪। (ক) কেদারকল্প এবং (খ) বটুক-নাথপদ্ধতি। ৫। (ক) কুলার্ণব—কুলমাহাত্ম্য, (খ) নিরুত্তর তন্ত্র, (গ) যোনিতন্ত্র, (ঘ) বৃহদ্-যোনিতন্ত্র, (ঙ) বীরভদ্র তন্ত্র, (চ) ষট্‌চক্রপ্রকাশ, (ছ) পুরশ্চরণবিধি, (জ) তারাপ্রদীপ ও (ঝ) বৃহদ্ভূতডামর তন্ত্র, ৬। (ক) কালীকুলসর্ব্বস্ব, (খ) জ্ঞানতন্ত্র, (গ) মহাবিদ্যা সহস্রনামস্তোত্র, (ঘ) তারাতন্ত্র, (ঙ) কাত্যায়নীকল্প, ৭। মৎস্যপুরাণ, ৮। (ক) নিগমকল্পদ্রুম, (খ) নিরুত্তরতন্ত্র, (গ) শ্রীক্রমসংহিতা, ৯। রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড), ১০। সিদ্ধনাগার্জ্জুনীয়, ১১। (ক) উড্ডীশ তন্ত্র, (খ) আনন্দলহরী টীকা, (গ) রহস্যার্ণব, (ঘ) ১২। (ক) বীরতন্ত্র, (খ) নিগমকল্পদ্রুম, (গ) কামরত্ন, (ঘ) বিশ্বসার তন্ত্র, (ঙ) চিন্তামণি তন্ত্র, (চ) মুণ্ডমালা তন্ত্র, (ছ) বিলোমমাতৃকাকবচ, (জ) দশমহা-বিদ্যোৎপত্তি, ১৩। কামরূপ নিবন্ধ, ১৪। দুর্গাভক্তিলহরী।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—১। কাঞ্চনমালা। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য —১। হিন্দুরমণী। খান বাহাদুর মৌলবী আহ্‌সান উল্লা—৩। হজরতের রচনাবলী, ৪।, ভক্তের গুণ। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১। স্বভাবকবি গোবিন্দদাস। শ্রীযুক্ত মন্ত্রী, "জ্ঞানমণ্ডল", কাশী—৬। অশোককো ধর্ম্মলক্ষ। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—৭। খেয়ালের খেসারৎ। Director, Geological Survey of India.—৮। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XL. VII. Part 2. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—৯। Triennial Report on the Administration of the Registration Dept. in Bengal for the three years ending 1922. ১০। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispen-

saries under the Government of Bengal for the years 1920, 1921 and 1922. ১১। Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XIV, No. 1, ১২। Do. Index to Vol. XI. Nos. 1, 2, 3, 4, 5. ১৩। Do. Vol. XII. ১৪। Do. Vol. XIII. The Superintendent, Govt. Printing, India—১৫। Statements showing Progress of the Co-operative Movements in India during the years 1922-23.

নবম মাসিক অধিবেশন

৩রা চৈত্র ১৩৩০, ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠে—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "মুরশিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি।" ৬। বিবিধ।

বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রস্তুত না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "মুরশিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি" নামক প্রবন্ধটি সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

প্রবন্ধ পাঠের পর ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা মূল প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা একত্রিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই লিপি হইতে তখনকার সামাজিক ইতিহাসের কিছু চিত্র পাওয়া যাইবে। দেবতার উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভু-সম্পত্তি দান তখনকার সময়ে একটি সুপ্রথা ছিল। মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ কে, তাহা ঐতিহাসিকগণ স্থির করিবেন।

৬। বিবিধ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিত চারিজন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থি-গণের ভোট পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(ক) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
(খ) „ অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
(গ) „ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
(ঘ) „ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎ-পরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক :—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানতরু হালদার, ৯০।১ গ্রে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৩।২এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র রায়, ২ কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পিএচ্ ডি, অধ্যাপক, ঢাকা ইউনিভারসিটি, রমণা, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এম্, টি, কেনেডি এম্ এ, Y.M.C.A., ৮২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, উপহৃত পুস্তক—১। মুক্তির পথ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর—২। সংগীত গোপীচন্দ্র ভরথরী, ৩

ভরথরীচরিত্র, ৪। গোবিন্দচন্দ্র গাথা, ৫। গোপীচন্দ ভরথরী, ৬। গোপীচন্দ (৮ পৃষ্ঠা), ৭। সিহরপী গোপীচন্দ্র, ৮। সঙ্গীত গোপীচন্দ নাটক, ৯। সংগীত গোপীচন্দ, ১০ গোপীচন্দ্র রাজাকো খেয়াল, ১১। নবনাথ ভক্তিসার। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২। মিবার-কলঙ্ক। শ্রীযুক্ত হরিদাস দে—১৩। একাত্ম-বিজ্ঞান বা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার, ১৪। ঐ The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—১৪। Administration Report of the Excise Department, Bengal, 1922-23. India Office Library Catalogue, Vol. II. pt. IV. (Bengali Books Supplement) 1906-1920. The Superintendent, Govt. Printing, India—১৬। Epigraphia Indica, Vol. XVII. Part V. Jan. 1924. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৭। Wisdom Compressed, ১৮। Milton (Sir Walter Raleigh), ১৯। Tennyson (Sir Alfred Lyall), ২০। Akbar (Malleson), ২১। An English Translation of Vidya Sundar. ২২। Upanishadas. শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ—২৩। Seeta.

বিশেষ অধিবেশন

৯ই চৈত্র ১৩৩০, ২২এ মার্চ্চ ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—"জৈনদর্শন" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "জৈনদর্শন" সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (বিগত বর্ষে তিনি এ বিষয়ে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন)।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, "ঋষভনাথ জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জৈনেরা বলেন, বেদের ২।৩ স্থলে ঋষভের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা বেদের যে যে শাখা দেখিয়াছি তাহাতে ঋষভের নাম উল্লেখ

নাই। পৌষ্করসংহিতায় সাত্বত ধর্ম্মে উহার উল্লেখ আছে। ভাগবতেও উল্লেখ আছে। ভাগবত মত শঙ্করাচার্য্যের সময় এবং তৎপূর্ব্বে ছিল। সাত্বত মতমধ্যে ঋষভের নাম পাওয়া যায়।” এই সব কথা উল্লেখপূর্ব্বক তিনি প্রবন্ধকারকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ নহেন। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে জৈনদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্কর। ঋষভদেব ইঁহাদের আদিম। ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ইঁহার উল্লেখ পাই। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। যাঁহার স্পর্শে কোন স্থান তীর্থীকৃত হয়, জৈনেরা তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলেন। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু জৈনমতের প্রাচীনতা, জৈনদের প্রাকৃত বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় দর্শনের অঙ্গীভূত নহে, সেগুলিরও অদ্য আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ জৈনদের চারিত্র্য বিজ্ঞান (এথিক্স) এবং সাধনতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। এ দেশের দর্শনশাস্ত্র সাধন-তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত। দর্শন সংসারতারণে নৌকাস্বরূপ। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু জৈনদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য আগামী বারে বলিবেন। তাঁহাকে এই অনুরোধ যে, তিনি যখন এই বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবেন, তখন তাঁহার আলোচিত জৈনদিগের প্রাকৃত-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চারিত্র্য-বিজ্ঞান, তর্ক-বিজ্ঞান, সাধন-বিজ্ঞান প্রভৃতি যেন স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করেন। নহিলে থলির ভিতর হাতী পুরিলে এ দুরূহ বিষয় বুঝিবার অসুবিধা হইবে।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

১০ই চৈত্র ১৩৩০, ২৩এ মার্চ্চ ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা” এবং (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত “শব্দ সংগ্রহ” [খুলনা জেলার খাঁকিদের

মধ্যে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ] নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" নামক প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (৩১শ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে)।

(খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তাঁহার "শব্দসংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি খুলনা জেলার মাঝিদের মধ্যে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের তালিকা ও তাহাদের অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় খুলনা জেলার মাঝিদের ব্যবহৃত শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সকল শব্দই যে খুলনার, তাহা বলা যায় না; যেহেতু অনেক জেলার মাঝি খুলনা জেলায় যাতায়াত করে। এই জন্য বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ খুলনার শব্দ বলিয়া প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তালিকায় কোন কোন শব্দ বাদ গিয়াছে, যথা—বাঁচের নাও বা বাচারি (যে নৌকায় বাচ খেলা হয়), ঘাটমাঝি (যেখানে নৌকা থাকে)।

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যে নৌকা সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। পদ্মাপুরাণে, ময়মনসিংহ গীতিকায় এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ শব্দ-সম্পদ্ রহিয়াছে। সেগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নৌকা সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, সেগুলির ও অধুনালুপ্ত শব্দগুলির বিস্তৃত তালিকা হওয়া দরকার। এ কার্য্য করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য ভাষার নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আমাদের প্রাচীন কবিগণ এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন যেগুলির অর্থ সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।

ছৈঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
কার হাতে বাঁশ কার হাতে কেরোয়াল।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল॥

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক:—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক:—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য:—শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন; শ্রীযুক্ত গণেশগোবিন্দ বৈষ্ণব ভাগবতভূষণ সাহিত্যরঞ্জন, তেরশ্রী, পোঃ বাঙ্গালা, ঢাকা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু—উপহৃত পুস্তক—১। মায়াপুরী, ২। রমলা। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৩। কল্কিপুরাণ, ৪। পশু-চিকিৎসা, ৫। চিত্রকাব্যম্। শ্রীযুক্ত ডি এস্ এম্ কেয়ামতুল্লা খোন্দকার এণ্ড সন্সস্—৬। এমাম হোছেনের জঙ্গে খতনামা, ৭। মহাম্মদি সুখবর, ৮। জ্ঞানবিকাশ বা ভাব সঙ্গীত, ৯। এজকারুল কেয়ামত বা পদাবলী, ১০। পরশমণি, ১১। আশুশিক্ষা, ১২। এছলাম আলোক বা সুখ সুরমা, ১৩। মধুর ধ্বনী, ১৪। বঙ্গীয় সুসংবাদ, ১৫। আরবী, ফারছী, উর্দ্দু, শিক্ষার পুরাক্ষর, ১৬। গোলজারে কেয়ামত, ১৮। মোসলেম তরণী। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৯। Boy, ২০। Mahatma Gandhi, ২১। Dreams and Realities, ২২। Darshana, ২৩। Young India, 1919-22, ২৪। A Few Thoughts on Education.

একত্রিংশ বার্ষিক

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

২৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, ১২ই জুন ১৯২৪, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর—সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে "স্যর আশুতোষ চৌধুরী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত চারু বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের নানা গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্যর আশুতোষ, দেশের দুর্দ্দিনে দেশবাসী তাঁহার দ্বারস্থ হইলে সাগ্রহে তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দিতেন। দেশের মঙ্গল কামনায় তিনি ধ্যানরত যোগীর ন্যায় আত্মজীবন নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার চরিত্রের বল প্রভূত ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার ছিল তাজা সরল প্রাণ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ অনুষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। স্যর রাসবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতিপদে বৃত হন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের কতখানি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর ভুলিবার নয়। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। পুরাতন "ভারত ও বালক" ও "ভারতী"তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি সরল ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন। ২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "হিন্দু আর্য্য কি না" প্রবন্ধে তাঁহার গবেষণার গম্ভীরতা দেখা গি । ১৯১২ সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু দিন তিনি বিলাতে "ঈগল" পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সামাজিক উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয় শিল্পের প্রতি

তাঁহার অনন্য-সাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্যবহারজীবিরূপে ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজ-রূপে তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। তিনি জানিতেন, মানবতার পূজা ভগবানের আরাধনার নামান্তর—তাই তিনি মানবের সেবার অধিকার পাইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

(এই প্রবন্ধ ১৩৩১ আষাঢ় মাসে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত **প্রথম প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন :—

"বঙ্গের বরেণ্য কৃতী সন্তান, বিনয় ও সৌজন্যের আদর্শ, নানা সদ্গুণের আধার, নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যিক, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, মনীষিবর স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত স্বজনগণের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বহুদিন তিনি নানা সূত্রে সংশ্লিষ্ট এবং নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সম্পর্কে এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য তিনি বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিস্তৃত আলোচনার উপযুক্ত স্থান আজ এখানে নহে। তিনি নানা গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম, জীবে দয়া, বিপন্নের সহায়তার কথা সকলের সুপরিচিত। তিনি আমাদের এই পরিষদের প্রতি কতদূর আকৃষ্ট ছিলেন, তাহার বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। পরিষৎ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন—সেই বৎসর হইতেই তিনি ইহার সদস্য ছিলেন। অর্থদান ও পুস্তকদান ব্যতীত তিনি নানাভাবে ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট-মনোযোগ দিয়াছিলেন। পরিষদের চিত্রশালায় ও মন্দির সাজাইবার জন্য কোন বিদেশী দ্রব্য যাহাতে ব্যবহৃত না হয়, তাহার জন্য তিনি রামেন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তি আজ শোভা পাইতেছে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, এফ আর এস ই মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮৮৬ খৃঃ তিনি আশুতোষকে জানিতে পারেন এবং ১৯০১ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং দেশসেবার প্রণালী জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছেন—পরিষদে রাজনীতির আলোচনা না করাই সমীচীন। কিন্তু জীবত

ব্যক্তির পক্ষে যাহা রাজনীতি, স্বর্গগত মহাত্মাদের সম্বন্ধে তাহাই ত ইতিহাস। ইতিহাসের আলোচনায় কখনও দোষ হইতে পারে না—সাহিত্য-পরিষদেও না। স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয় বর্দ্ধমানের বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সমিতির অভিভাষণে-পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চার ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। দুঃখের বিষয়, কেহই এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক মূল-সূত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। বক্তার মনে হয় যে, মহাত্মাজীর Doctrine of Non-Co-Operationএর ইহা একটি খাঁটি পূর্ব্বাভাস। সে সময়কার রাষ্ট্র-নৈতিক সভাসমিতির কি ব্যবস্থা ছিল, তাহা অনেকেরই স্মরণ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার পৃষ্ঠপোষক। সুরেন্দ্র বাবু ভারত-সভার প্রাণ ও কর্ণধার। উভয় সভাই আবেদন নিবেদন লইয়া ব্যস্ত। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সও সেই প্রচলিত ধারার অনুসরণে দেশের সমস্ত প্রার্থনা-পত্রের উদ্গীরণে পর্য্যবসিত হইতেছিল। এই ভাবে ভূস্বামিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন-চিন্ততা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দেশের এই সব দুর্গতির প্রতিরোধ করিবার জন্য আশুতোষ বাঙ্গালায় একটি স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী মনস্বিসম্প্রদায় গঠনে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃজন করিয়া বঙ্গদেশের চিন্তার ধারার গতি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি ভাবে তিনি সাক্ষাতে ও পরোক্ষে লর্ড কর্জ্জনের Indian Universities Commissionএর এবং বাঙ্গালা-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। সেই সময় যাঁহারা চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রথম সাড়া। তাঁহারই চেষ্টায় খাটোয়াদের সেই নির্ব্বাণোন্মুখ লক্ষ্মী-তুলসী কাপড়ের কল বাঙ্গালায় 'বঙ্গলক্ষ্মী মিলে' পরিণত হয়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য দেশে তখন সাড়া পড়িয়া যায়। ঘরে ঘরে Fly Shuttle ও সুতা সরবরাহ করিবার জন্য নানা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্য স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তিনি নিজ ব্যয়ে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিলেন। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিয়া আসিবার পর চৌধুরী মহাশয় ও আরও চারি জন একটি কারখানা খুলিলেন। সেই কারখানা হইতে এক্ষণে সুবৃহৎ National Tannery দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত বক্তারা তাহা বলিয়াছেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন এবং ওরিয়াণ্টাল আর্ট সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিয়ানো হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবিত, তখন তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও জোয়াকিমকে ছাড়িয়া আবার তানসেনের তানপুরা আর তামিলের বীণ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজের সঙ্গে সুর মিলাইয়া শ্মশান ভারতে রাগরাগিণীর স্বরালাপের সূত্রপাত, করিল। আশুতোষকে হারাইয়া আমরা আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা হারাইলাম।" (এই বক্তৃতা ১৩৩১ আষাঢ় মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে)। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ইহার উন্নতি ও সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য সতত প্রয়াসী স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "স্যর আশুতোষের সহিত আমার শোণিত-সম্বন্ধ—তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সম্পর্কে খুল্লতাত হইতেন। তাঁহার অভাবে দেশের কি হইবে—বঙ্গের কি দশা হইবে এবং আমাদের উত্তর-বঙ্গের কি হইবে, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। শিক্ষায়, সৌজন্যে, পদমর্য্যাদায় তিনি আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। নীরবে কি ভাবে দেশের কাজ করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা আমরা হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া আসিবে কি না সন্দেহ।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, এম্ এল্ সি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমরা এ দেশে মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষা করে আসছি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব সফল করিবার জন্য দেশবাসী যে পরিষৎকে সাহায্য করবেন তাহা আমার বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত চারু বাবু ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। স্যর আশুতোষ বর্দ্ধমানে যাহা বলেছিলেন, তাহা স্পষ্ট সত্য কথা—স্পষ্ট সত্য কথা বলা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। জেনারেল এসেমব্লি কলেজে বিচারপতি নরিস সাহেবের সভাপতিত্বে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এক সভা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র সে বৎসর যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। তিনি ব্যবহার-বিদ্যায় এবং গণিতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পুরাতন দেশীয় কলাবিদ্যার আদর্শ দেশে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—

"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের নিকট অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, স্যর আশুতোষ ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের সমষ্টি ছিলেন। স্থিতিশীলতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল। তিনি natures gentleman ছিলেন এবং তাঁহার চিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ—কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে স্যর আশুতোষ চৌধুরী দান করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার জন্মদিন, ৬৪ বৎসর পূর্ণ হইল। আশা করি, পরিষদের এই মন্তব্যের প্রতিলিপিতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

র্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হিল

সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, "আজ এই শোক-প্রকাশের দিনেও পরিষদের পক্ষ হতে আনন্দ-প্রকাশ করতে হচ্ছে—আজ অনেক পরিচিত মুখ দেখছি ও লোকসমাগমও যথেষ্ট হয়েছে।

"আজ যে ভাব, কাল তাহা উল্টে যাচ্ছে, ভাবের প্রবাহের স্থিরতা নাই। স্যর আশুতোষ বয়সে আমার ছোট ছিলেন—অথচ তিনিই আগে গেলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির বক্তৃতা হতে বুঝতে পারছি—আশুতোষ অনেক কাজ করেছেন।

"দেশে যে নাড়ী এসেছে—ইহা এখনও তর্জ্জনীযুক্ত নাড়ী ইহা বলতে পারি না—ব্রাণ্ডি খাওয়ান নাড়ী। যাঁহারা নীরবে কাজ করেন—এখনও আমরা অনেক সময় তাঁহা-দিগকে লক্ষ্য করতে পারি না। যাঁহারা সেই সব কাজের সম্পাদক আছেন—কেবল তাঁহাদিগকেই দেখি।

"আশু বাবুর গর্ভধারিণী রত্ন-প্রসবিনী। তাঁরা ৬ ভাই—এক একটি রত্ন। আশু বাবু বিলেত থেকে এসে এ পর্য্যন্ত অনেক রোজগার করেছিলেন—কিন্তু তিনি বিলেত ফেরতাদের মত টাকা উড়িয়ে দিতেন না। তাঁর ভিতর খাঁটি বাঙ্গালীর ভাব ছিল। ১৮৯৭ সালে আমি কাশী যাই, তিনিও যান। তাঁহার সহিত এক সঙ্গে ১৮।১৯ দিন কাটাই—সেখানে বিশ্বনাথ, কেদার প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ভক্তিভাবে ও বিশুদ্ধভাবে দেখেছিলেন—তাঁর মধ্যে এতটুকু পেঁয়াজের গন্ধ ছিল না। তাঁহার শিষ্টাচার, মধুর প্রকৃতি, সর্ব্বদা হাসিমুখ কিছুতেই ভোলা যায় না। He was a born gentleman.

"সঙ্গীতকে তিনি কি ভাবে দেখতেন—তা আপনারা সমস্ত শুনলেন। সৌভাগ্যক্রমে সরস্বতীর মত গুণবতী স্ত্রী তিনি পেয়েছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে সঙ্গীত-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল।"

তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের উপযুক্ত পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া পরি-ষৎকে দান করিবেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সকল সদস্যের পত্র আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
২। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর
৩। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

১লা আষাঢ় ১৩৩১, ১৫ই জুন ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য সকলে সমবেত। এই বলিয়া তিনি সকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

১। কাশীর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

২। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিলেন।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর "স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার-মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"বাঙ্গালার বুকভরা ধন, বাঙ্গালীর মাথার মণি, সুস্থকায় আশুতোষ মহাকালের আহ্বানে উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের যাহা কিছু ছিল, দিনে দিনে সমস্ত হারাইয়া আমরা নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হইয়াছি। তথাপি সাত রাজার ধন একটি মাত্র মাণিক আমাদের ছিল। কাল আসিয়া আজ সেই অমূল্য নিধি অপহরণ করিয়া নিল। এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। জীব-জগতে জন্ম ও মরণ চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু যে চলিয়া গেলে দেশের সকলের সব ফুরাইয়া যায়, তাহার যাওয়া কি সাংঘাতিক! হায় দুর্ভাগ্য দেশ! বিধাতার সকলগুলি বজ্র কি তোরই শিরে পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে? আশুতোষ বাল্যাবধি সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি কৃতী ছিলেন, ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়াধীশরূপে তাঁহার উর্দ্ধে স্থান ছিল, কিন্তু এ সকল দিক্ দিয়া তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে ও তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃকবাটের অন্তরালে যে বিশাল হৃদয় ছিল, তাহা ধ্যান-নয়নে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, সরস্বতীর আরাধনায় দেশবাসীর অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃৎকন্দর আলোকিত করিয়া বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যা দূর করিতে

পারিলে, বঙ্গজননীর বহু কোটি সন্তান মানুষ হইবে—তাহাদের দুঃখ দূর হইতে পারিবে। তাই তিনি এই মঙ্গলময় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মঙ্গল-ব্রত পালনে মহাপুরুষ এক দিনের জন্যও কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট হন নাই। একদা এমন দুঃসময় আসিয়াছিল, যেদিন ভারতের প্রধানতম রাজপুরুষের কোপদৃষ্টিপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আশুতোষ তখন সব্যসাচীর ন্যায় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আততায়িগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ইহা সকলেরই সুবিদিত। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় এক হস্তে সারস্বত-কুঞ্জের শত্রু সংহার করিয়াছেন, অপর হস্তে নিপুণ উদ্যানপালের ন্যায় সেই সারস্বত-কুঞ্জের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিত বঙ্গসন্তান, মাতৃভাষাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করাই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষ ধীরে ধীরে ইহার সংস্কার করিয়া আজ বঙ্গসরস্বতীর স্বর্ণসিংহাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন—বঙ্গসন্তান আজ বঙ্গভাষার পরীক্ষা দিয়া শ্রেষ্ঠতম উপাধি গ্রহণ করতঃ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। আশুতোষের অভাবে সদ্যঃসমাবৃত্ত বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের কি অভাব ঘটিল, তাহারা কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইল, তাহা তাহারাই জানে। ইংরাজী শিক্ষার উপাদেয় ফল ছিলেন বাঙ্গালার এই আশুতোষ। ইংরাজের যাহা ভাল, ইংরাজী শিক্ষার যাহা উত্তমতম, তৎসমুদয় আশুতোষ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দুষিতাংশ তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অশনে বসনে, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর একটিও আছে কি না, আমি জানি না। তিনি যে বিদ্যাপীঠ-সংগঠন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণাঙ্গ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই দ্রোণকল্প বীর-ব্রাহ্মণ অকালে স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন। বাঙ্গালার যে ইন্দ্রপাত হইয়া গেল, সেই ইন্দ্রের পুনরাগমনের পথের প্রতি বাঙ্গালা সজল নয়নে চাহিয়া থাকিবে। হে ভূদেব! এই কথা তুমি স্বর্গপুরে বসিয়া স্মরণ করিও।"

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ মহাশয় "৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার-মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"কুশাগ্রবুদ্ধি আশুতোষ এত বড় ছিলেন যে, তাঁহার কৃতকার্য্যগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই, এবং পৃথিবীতেও যে বেশী আছে তাহা মনে হয় না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই এক উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত ছিলেন এবং তপস্বীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে সেই দিনের দর্শনের চেষ্টাতে ব্যাপৃত থাকিতেন যে দিন জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর সভায় ভারতবাসী গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আশুতোষ যে সকল কাজ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—(ক) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চ-

শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, (খ) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়ান্তর্গত করণ, (গ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যসমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে উৎসাহ প্রদানার্থ Indian Vernaculars নামক একটি বিষয় এম্ এ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করণ, (ঘ) ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করণ, (ঙ) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক-বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করণ এবং (চ) জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পাঠ্যের ব্যবস্থা করণ। এতদ্ব্যতীত University Journal of Letters এবং University Journal of Science নামক দুইখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেশবিন্যাস প্রভৃতি বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য, এই আদর্শ তিনি ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে জানাইয়াছিলেন। মাতৃভাষার যথেষ্ট অনুশীলন যে আমাদের দেশে হইতেছে না, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশে মৌলিক গবেষণার যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং যেদিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজ নিজ পরীক্ষাগারে তাঁহাদের শিষ্যদের সহিত মৌলিক গবেষণা-কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইল ও তখন সকলেই আশা করিল, আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মৌলিক গবেষণার সুবিধা পাইবেন। কার্য্যতঃ, তিনি নানা বাধা অতিক্রম করিয়া এ পথ সুগম করিয়া দিয়া দেশের যে কত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা দেশবাসী অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আশুতোষের স্মৃতি-মন্দির এবং তিনি স্বহস্তে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দিলে বাঙ্গালী অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুকে নিজে বরণ করিয়া লইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ভাগবত ঐক্য সাধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা অধ্যয়নের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহার দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়-রূপে পরিণত করিবার জন্য তিনি কোন সৎ পন্থাই ত্যাগ করেন নাই।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তিরোধানে যে কত ক্ষতি অনুভব করিতেছে তাহা পরিষদের হিতৈষিগণ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিষদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। তিনি পরিষদের পক্ষে কাশীরামের মহাভারত সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পরিষৎ যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতখানি চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, অন্যে ততদূর করিয়াছেন কি না সন্দেহ। দেশে যাহাতে বঙ্গভাষার সাহায্যে পঠন ও পাঠন হইতে পারে এবং বঙ্গভাষা শিক্ষার্থিগণের পাঠ্য বিষয়ান্তর্গত হয়, তাহার

জন্য পরিষৎ প্রায় প্রথমাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেও মন্তব্যাদি গৃহীত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ তাঁহারই সহায়তায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন ও পরীক্ষার জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষৎ আশা করিতেন যে, যদি আশুতোষ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। দেশে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার সহিত তুলনায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য এই যে, যে সমস্ত প্রবন্ধ পুরাতন কথার বা অপরের আবিষ্কৃত পুরাতন তথ্যের অনুবৃত্তি বা ব্যাখ্যামাত্র সে সকল প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। যে প্রবন্ধে কোনরূপ নূতন অনুসন্ধানের বা নূতন গবেষণায় আবিষ্কৃত বা নূতন চিন্তায় লব্ধ কোন তথ্যের সংবাদ আছে সেই সকল প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকার উপযুক্ত। পরিষৎ আশা করেন যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন তথ্য বাঙ্গালা ভাষাতে পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দেশে বিদেশে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব বিস্তার করিবে। স্যর আশুতোষ পরিষদের এই বৈশিষ্টের প্রতিধ্বনি করিয়া পাটনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন "অদ্য আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্‌বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে তাহারও চিন্তা করিতে হইবে। * * * তবেই তো বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গ সাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গ সাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণের চিত্ত আমার বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন করিয়া আমরা অনেক অনর্থ ও শিক্ষনীয় বিষয় আয়ত্ব করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য দেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় এবং আবিষ্কার উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষনীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ এতাবৎকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্‌বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।" সেই জন্য মনে হয় আশুতোষের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত অন্য কোন সভাসমিতিরই তত ক্ষতি হয় নাই। কার্য্যবশে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার ও তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়া প্রবন্ধ লেখক নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আশুতোষের সমসাময়িক ছিলেন। স্বামীজী 'কর্ম্মযোগে' যে সকল মূল-সূত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, আশুতোষের কার্য্যেই সেই সকল মূল-সূত্র বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত **প্রথম প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"ভারতবর্ষের এক সময়ের প্রধান জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর, ব্যবহার-শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও প্রাণ-স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাবিস্তারের নির্ঝর, উচ্চতম শিক্ষার প্রধান অভিভাবক, ব্যবহার-শাস্ত্রে নূতন নূতন তত্ত্ব

আবিষ্কারের প্রধান উৎসাহদাতা, বঙ্গভাষার অনুশীলন ও প্রসারকল্পে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নিজ অতুলনীয় শক্তি যিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠানের যিনি পরম হিতৈষী নেতা ও পরামর্শদাতা ছিলেন সেই মনস্বী সহৃদয় মধুরভাষী প্রতিভাবান্ বাণীর বরপুত্র, দেশ-মাতৃকার প্রিয়তম সন্তান, দেশাত্মবোধের প্রধান পুরোহিত বাঙ্গালীর গৌরব, পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোকগমনে বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদন প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আশুতোষের চরিতালেখ্য আঁকিবার সময় এখনও আসে নাই। রবিবারে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—বৃহস্পতিবার সিমলা যাইবার পথে আমার সহিত পাটনা রেল-ষ্টেশনে তাঁহার দেখা হয়। হাসিয়া হাসিয়া কত কথা বলিলেন। সোমবারে অপরাহ্ণে আইন-বৈঠকের ঘরে ঢুকিয়াই শুনিলাম, আশুতোষ চলিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। তিনি আমাদের কর্ম্মজীবনে যে স্থানটা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার তিরোধানে কতটা যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, এখনও আমরা তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম তাঁহার চরিতালেখ্য লিখিবার সময় আসে নাই। আজ স্মরণের দিন, অঙ্কনের দিন নহে।

"আশুতোষের সখ্যের বা সাহচর্য্যের গৌরব আমার নাই। তাঁহার সহিত যখন পরিচয় হইল, তখন দেখিলাম যে, তাঁহার মনীষাই যে বড় তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়টাও খুব উদার ও স্নেহপ্রবণ। পরিবার পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি তাঁহাকে তাঁহার বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে কখন কখনও কর্ত্তব্যের শাণিত-ক্ষুরধার-পথ হইতে স্বল্পবিস্তর বিচ্যুত করিয়াছে, লোকে এই কথা মনে করে। ইহা সত্য হইলেও তাঁহার অনুরাগের আগুনে এই ত্রুটিও বিধাতার চক্ষে হয়ত ভস্ম হইয়া তাঁহার চরিত্রকে নির্ম্মল করিয়াছে। এই অনুরাগে তাঁহার জীবনে এমন একটা মিষ্টতা আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে যে তাঁহার নিকট যাইত, তাহাকেই অল্পবিস্তর আকর্ষণ করিত। তাঁহার প্রকৃতিতে পরকে আপনার করিবার একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও সঙ্কেত ছিল।

"আমরা আশুতোষকে পূর্ব্বে আমল-তন্ত্রের সহায় বলিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। ঘটনা-ক্ষেত্রে তাঁহার বাড়ীতে পরে একদিনের কথাবার্ত্তায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটী পড়িয়া দেখিবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোস ছিল না। প্রাণ খুলিয়া সকল কথা কহিয়া আসিয়াছি।" কার্য্যতঃ এই দিনেই আশুতোষের সঙ্গে আমার কাছাকাছি প্রথম দেখাশুনা। কার্য্যের দ্বারা তাঁহার বিচার

করিলে চলিবে না; তাঁহার নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারাই তাঁহার বাহিরের কর্ম্মজীবনের ভাল মন্দের ওজন করিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহার চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্ম্মের ভাল মন্দের সত্য বিচার কখনও করিতে পারিবেন না। তিনি দেশের দশজন হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচার আচরণে এবং ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া কলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার মূলে তাঁহার তথাকথিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা, আমার মনে হয়, গভীর স্বাজাত্যাভিমানই বেশী বিদ্যমান ছিল।

"আশুতোষ বাংলাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে ভাল বাসিতেন, বাঁকীপুরে বাংলা-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। আশুতোষ বাংলা লেখক না হইয়াও বাংলা সাহিত্যকে কি গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন এই অভিভাষণে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। বংলা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে গভীর আকাঙ্খা ছিল। এই আকাঙ্খার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষাতে আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে বাংলার কর্ম্মজীবন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর মনীষা বৈধব্যগ্রস্ত হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্‌সি ব্যারিষ্টার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, এই অমিততেজ পুরুষশ্রেষ্ঠ মনীষির পরলোকগমনে বঙ্গদেশ শোকে সমাচ্ছন্ন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত **দ্বিতীয় প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষদ্-মন্দিরে রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, স্যর আশুতোষ যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সে দিক দিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণকে উদ্বোধিত করিতে পারিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা হইবে। তাঁহার plain living এবং high thinking এবং তাঁহার patriotismই ছিল জীবনের লক্ষ্য। বহুক্ষেত্রে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। Sadler Commissionএ কিরূপ নির্ভিক চিত্ততা এবং অমিত ও অদম্য তেজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত

আছেন। পরিষৎকে তিনি যে স্নেহ ও ভালবাসিতেন তাহার বহু প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় নিম্নলিখিত **তৃতীয় প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্য্যের জন্য আমাকে ৺রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ীতে কেউ ছিলেন না। আমাকে অনেক বেলা পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা কাজটি গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না দিলে হয় না, আমার দাদার বাড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটী ছেলেকে ডেকে বল্লেন, এঁকে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাত্র ছেলেটি একটী আলমারীর drawer খুল্ল, একখানা সাদা কাপড় ও পরিষ্কার তোয়ালে বের করে নিয়ে "আসুন" বলে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ছেলেটী কে? বল্লেন আমার ভাইয়ের ছেলে, নাম আশুতোষ, ভাল পাশ করেছে। এই ছেলেটী Universityতে first হয়েছিল, আমরা শুনেছিলাম। আমি দেখ্‌লাম, বড় মানুষের ছেলে হয়েও কাপড় গামছা গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, ইউনিভারসিটীর ছেলেদের মধ্যে এরূপ প্রায় পাওয়া যায় না। রাধিকা বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম একে বিলেত পাঠাবেন নাকি? তিনি বল্লেন—বিলেত পাঠাবার মত নাই; যদি হতে হয় এই দেশেই হবে। সেই হতে আশুতোষের প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ হল। ক্রমে আমরা দুইজন Asiatic Societyর member হই ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে। সেই থেকে আমরা দুই জনে একত্রে অনেক সময় সাহিত্যিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

"১৮৮৮ সালে আশুতোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তাঁর নাম হয়েছে; এমন ছেলে University থেকে আর বেরোয় নি। ইলবার্ট সাহেব তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্রমে তাঁর চেষ্টা হল—Universityতে ঢুকবার। কিন্তু প্রথমে হ'ল না, হল আমার। তিনি ছাড়বার পাত্র নন, ইল্‌বার্ট সাহেব ইজিপ্টের Finance Commissioner হয়ে ছিলেন,

সেখান থেকে পত্র আসতে আশু বাবু ১৮৮৯ সালে Fellow হন। তখন এসে আমাকে বল্লেন—আপনি কেন Fellow হয়েছেন জানেন? I knocked and you entered, আমি হই নি বলে আপনি হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখন তুমি কি করবে? তিনি বল্লেন—University উদ্ধার করব। কি করে? Universityর নাম কলকাতা University না রেখে ঢাকা University রাখা উচিত। কারণ, সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু Syndicateএর মেম্বর ছিলেন এবং পি. কে. রায় Registrar ছিলেন। কথা হল, পূর্ব্ববঙ্গ united, পশ্চিমবঙ্গ united নয়; তিনি বল্লেন, পশ্চিমবঙ্গকে united করতে হবে। সে বিষয়ে আমার সহায়তা চাইলেন। আমি বল্লাম এ হতে পারে না, এর মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজের জন্য সব করবে, পরের জন্য কিছুই করবে না। তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে united করবে? তিনি বল্লেন, প্রথমেই আপনাকে Syndicateএ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে বৎসর আমরা তাঁকে Syndicateএ ঢুকিয়ে দিই। তখন তাঁর পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই। ভোট সংগ্রহের ভার অনেকটা আমার উপর পড়ল। আশু বাবু নিজেও canvass করতে গেলেন। আমি নিজে যে কয়জনের ভোট সংগ্রহ করি তাঁদের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল দে, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এঁদের মধ্যে Engineer একজন ছিলেন। আশু বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল Western Bengalকে united করার। প্রথম বৎসরে unity হল না। দুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হল, সকলে আশুতোষের admirer হলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গ দেখলেন, মুখে ঝগড়া করে কিছু হবে না, তাঁরাও মিলে গেলেন। এই সময় আশু বাবুর খুব একটা crisis আসল। আনন্দমোহন বাবুর ছেলেকে Griffith সাহেব অপমানিত করেছিলেন। আশু বাবুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। সে জন্য Griffith সাহেবকে Registrarএর পদ ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গ মিলে গেল। তখন Education Departmentএর চক্ষু ফুটল। আশুতোষ অতি ভয়ঙ্কর লোক, কারুকে মানেন না, এঁকে Syndicate হতে তাড়াতে হবে। তখন Sir Alfred Croft ছিলেন Director of Public Instruction। তেমন মাথাওয়ালা লোক বাংলায় আসেন নি। তিনি সমস্ত লেপ্টানেন্ট গভর্ণরদের unpaid minister ছিলেন। যাঁরা Senateএর সভ্য ছিলেন, তাঁদের Croft চিঠি লিখে পাঠালেন কাকে ভোট দিতে হবে। খবরের কাগজে তা নিয়ে হাঙ্গামা হল। আশুতোষ তার বিরুদ্ধে agitation করালেন, কিন্তু কিছু হল না। সে বার আশুতোষ Syndic হতে পারেন নাই। তাঁর জীবনে সেই একবার elected হতে পারেন নি। তিনি দুঃখিত হলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে গুরুদাস বাবু Dais থেকে নেমে এসে বল্লেন দুঃখিত হবার কারণ নেই, এই রকম হয়ে থাকে, কখনও ফল হয়, কখনও হয় না। আমি তখন তাঁকে বল্লাম Sir A. Croft আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার

বহন করতে পারবেন না। তারপর Senateএর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। যা বল্লাম তাই হল, Croft সাহেব পর বৎসর দেশে চলে গেলেন। আশুতোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। ইউনিভার্সিটীতে তিনি যা করেন তাই হয়। সাহেবেরা অত্যন্ত opposition করেও বড় কিছু করে উঠতে পারেন না। তাঁরা যখন দেখলেন, কোন রকমে এঁর সঙ্গে এঁটে উঠা যায় না, তখন ভাবলেন আইন বদলিয়ে দেওয়া যাক। সুতরাং একটা Commission বসাতে হবে। তার পর Lord Curzon Commission বসালেন, আশুতোষকে Commissionএ নেওয়া হল না। কিন্তু কথা হল, বাংলায় যখন Commission আসবে, তখন তিনি member হবেন, বাংলার বাইরে হবেন না। সে ভাবে আশুতোষ বসলেন। তখন Universityকে officialise করবার যে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাস বাবু note of dissent লিখেছিলেন, বাকী সমস্ত সভ্য officialise করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোষ দুঃখিত হলেন। কিন্তু এমনি কর্ম্মক্ষেত্র, এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, নূতন আইন চালাবার ভার সম্পূর্ণরূপে আশুতোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হল জানি না, কিন্তু যে Lord Curzon তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, আইন করলেন, Commission করলেন, তাঁ হতেই তিনি ইউনিভার্সিটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। তার পর Lord Mintoকে চিঠি লিখলেন, এঁকেই Vice-Chancellor কর। যতদিন Lord Minto ছিলেন, আশুতোষের Vice Chancellorএর পদ অব্যাহত ছিল। Lord Hardingeএর সময় তাঁকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল। দু তিন বৎসর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাধিকারী, Sanderson সাহেব, ডাক্তার নীলরতন সরকার Vice-Chancellorএর পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কাজে গোলমাল হতে লাগল। Lord Ronaldshay দেখলেন, গোলমালে কাজ হবে না, তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর ন্যস্ত করলেন। তখন থেকে আবার গোলযোগ আরম্ভ হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্যাপার করেছিলেন, নিজে আট নয় বৎসর Vice-Chancellorএর পদে থেকে যে scheme তৈরী করেছিলেন, তা চালাবার ভার তাঁর উপর পড়ল। কিন্তু টাকা নেই, গোড়া থেকে টাকা দাও, টাকা দাও। যে টাকা দেবে তার সঙ্গে ঝগড়া হবেই। India Governmentএর সঙ্গে ঝগড়া হল। India Government হাল ছেড়ে দিলেন। সে ভার Bengal Governmentএর হাতে পড়ল। Bengal Government গোড়াতেই দেউলে। আশুতোষও টাকা ছাড়বেন না, সেই ঝগড়া এসে পড়ল Lord Lyttonএর ঘাড়ে। তিনি কি করেন? পরস্পর গালমন্দ হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আর এক জনকে Vice-Chancellor করা হয়। কিন্তু তাঁকেও আশুতোষের হাতে পড়তে হল, আশুতোষ ছাড়া কাজ করা যায় না। ও দিকে টাকা নাই, budgetএর কর্ত্তা বল্লেন টাকা কোথায় পাব? আশুতোষ বল্লেন Covt. দিতে বাধ্য, দেবেন না কেন? এই করতে করতে তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। এখন Universityর কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। আশুতোষ অশ্বথ গাছের মত ছিলেন। সে গাছের আওতায় আর আর যত গাছ ছিল, সব শুকিয়ে গেছে।

৩৷৷০ লাখ টাকার deficit budget, কি করে এ টাকা পূরণ হবে? অনেকের সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। আশুতোষের University career আমি যতদূর জানি, বল্লাম।

"দ্বিতীয় কথা—তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ অনেক দিন থেকে আশুতোষকে এখানে নিয়ে আস্‌তে চেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি। তাঁকে সহকারী সভাপতি করা হয়েছে, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলতেন, শাস্ত্রী মহাশয়, আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন? আমার University ছেড়ে আসবার যো নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে হবে বলুন? আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন, আমাকে বাংলা বইএর একটা Library করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লম্বা লিষ্ট করে দিতাম। বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তাঁর অনুরক্তি ছিল সন্দেহ নাই। সে অনুরক্তির পরিচয় তিনবার পেয়েছি। প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিম বাবু ছিলেন। চেষ্টা করলেন Universityতে বাংলা ঢোকাতে হবে। ইংরেজী সংস্কৃত আছে, বাংলা নেই কেন? তার জন্য উদ্যোগ হল, সভা হল। বাংলায় তখন এমন element ছিলেন, যাঁরা দাঁত আর মুখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। আমরা পারলাম না। তখন স্যর গুরুদাস Vice-Chancellor ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সব ছাপা নেই। আমি সমস্ত শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এমন দিন আসবে, যে দিন সমস্ত পরীক্ষা Entrance, I. A., B. A. বাংলায় দিতে পারা যাবে, এই বলে বাংলা ভাষার গুণ গান করলেন। সেবার Entrance Examinationএ বাংলায় প্রবন্ধ লেখবার অনুমতি হল। তার জন্য স্বতন্ত্র certificate দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বেশী করে বাংলা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন ১৮৯৬।৯৭ সালে। আশুতোষকে এ বিষয়ে বেশী উদ্যোগী করবার জন্য, তিনিই resolution move করবেন, এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে Universityতে B. A. পর্য্যন্ত বাংলা উঠল। যখন নূতন আইন মতে Universityর কার্য্য আরম্ভ হল, তখন ঠিক হল history, mathematics এ সব বাংলায় হবে। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখন M. A. পর্য্যন্ত বাংলা হয়েছে। দেখাদেখি ঢাকা Universityতেও বাংলা হয়েছে।

"আশুতোষ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্য মনে করবেন না সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল, একে তিনি অবজ্ঞা করতেন; তা তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে medal দিয়েছিলেন, তখন সেই কমিটিতে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি থাকবে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, সুতরাং পরিষৎকে তাঁর নিজের মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম ভক্তি করতেন, তা জগৎবিদিত। তাঁকে বিলেতে পাঠাবার চেষ্টা করবার সময় Lord Curzon বলেছিলেন—By my command you go

to your mother and tell her that I command her to allow you go to England, আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—Viceroyএর আমার মাকে হুকুম দিবার ক্ষমতা নেই।

"সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। নিজের কন্যার নামে—যে কন্যার বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল, সে কন্যা যখন মারা যায় তখন তার নামে "কমলা Readership" স্থাপিত হল। মায়ের নামের মেডেলের কমিটিতে যেমন সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নিয়েছিলেন, প্রিয়তমা কন্যার নামের মেডেলের কমিটিতেও সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে কত অন্তরের সহিত ভালবাসতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

"যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য তিনি চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন। সুবিধা হলেই সাহায্য করতেন। অনেক সময় সাহিত্য-পরিষদের কথা শুনে কাজ করতেন সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সে কেবল কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সম্বন্ধ তা নয়, হৃদয়ের সম্বন্ধ।

"আর একটা কথা বলি। না বল্লেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তার একটা লক্ষণ—এই ছেলে পুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে, আমার ছেলেদের নামের শেষে "তোষ", আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে "প্রসাদ"। এটা কি মনে করেন শুধু accident? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল। তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে; এমন কোন কোন কাজ ছিল, তিনি বলেছেন ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে। সুতরাং ঝগড়া এক আধটু হবেই। যদি একজন ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তাকে সরিয়ে দেবেনই, তা না করলে কাজ করা যায় না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্য তাঁকে admire করি; তাঁর কাজের ভিতর ঢুকে যদি সর্ব্বদা তাঁকে oppose করতাম, তা'হলে তিনি অত কাজ করতে পারতেন না। তার পর আর একটা কথা। তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে এসিয়াটিক সোসাইটী "কমলা Readership" কমিটিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হবে। Annandale সাহেব বল্লেন, কমিটিতে এসিয়াটিক সোসাইটীর পক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন। আশুতোষের supporters যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "সে হবে না, হবে না। স্যর আশুতোষ অত্যন্ত বিরক্ত হবেন," একথা শুনে আমাদের Chairman স্যর রাজেন্দ্র বল্লেন, "এ সব কি কথা? তিনি ভার দিয়েছেন তোমরা করবে। আমরা যাঁকে মনোনীত করি তিনিই হবেন, আশুতোষ বিরক্ত হবেন, সে কি কথা?" আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরে এলাম, Secretary বল্লেন, স্যর আশুতোষকে এই সমস্ত কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছেন no better selection could be made। সুতরাং কোথায় অহিনকুলতা? Political ক্ষেত্রে ঝগড়া হলে, যে প্রবল হয় সে দুর্ব্বলকে

সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাজ হয় না। হৃদয়ের ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ, কমলা Readershipএর প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকাশ।

"আশুতোষের মৃত্যুতে বাংলাশুদ্ধ যেমন দুঃখিত, আমি তার থেকে এক বিন্দু কম দুঃখিত হই নি। ২৬শে মে বাড়ীতে একটা কাজকর্ম্ম ছিল, যখন বেরিয়ে এলুম, একটি ছোকরা এসে বল্ল, সতীশ বাবুর কাছে telephone এসেছে। তিনি বল্লেন আশুতোষ মুখার্জ্জি dead। আমি অবাক্ হয়ে রইলাম, তেল মাখছিলাম, হাত মাথা থেকে উঠল না, যেমন ছিল তেমনি রইল। আশুতোষ যেমনটী গিয়েছেন, তেমনটী আর হবে না, আস্তে আস্তে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে।

"আশুতোষ সম্বন্ধে নিজের personal experience বল্লাম। বক্তৃতা করবার ক্ষমতা নাই, plain facts বল্লাম, আর কিছু বলব না, আমাকে মাপ করুন।"

তারপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

১৫ই আষাঢ় ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিবার, প্রাতঃকাল।

এই দিন প্রাতে কবির বহুসংখ্যক ভক্ত এবং সাহিত্যিক লোয়ার সার্কুলার রোড, গবর্মেণ্ট-সিমেট্রিতে কবির সমাধি পার্শ্বে সমবেত হইয়া কবির পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন এবং বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত এচ্ ডব্লিউ বি মরেণো এবং কবির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেব বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া-রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই আষাঢ় ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিবার।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সভাপতি

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬৷৹টার সময় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। নির্দ্ধারিত সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিতভাবে কার্য্যারম্ভ হয়।

১। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

২। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক মহাশয় "মেঘনাদ বধ কাব্য" হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় "মধুসূদনের স্বাদেশিকতা" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আসিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, মধুসূদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাব্য ও কবিতায় ইংরেজী ও ইউরোপের ভাষা ও সাহিত্যের বহু ভাব প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ এচ ডব্লিও বি মরেণো এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় ইংরেজী ভাষায় বলিলেন যে, মাইকেল মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পর পর দুইটী ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি এত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধন অনাবশ্যক ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে সামাজিক বন্ধনমুক্ত হিন্দু সাধুগণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মাইকেল বাঙ্গালার মিল্টন ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে কত বড় মনীষীর উদ্ভব হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে মাইকেলই প্রথম ইউরোপীয় মহিলা বিবাহ করিবার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়া যান। এখনকার বঙ্গসমাজে ইহা সাহসের পরিচয় নহে। দ্বিতীয়বারও তিনি অন্য একটি আংগ্লো ইণ্ডিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন—এই দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহার প্রতি কত অনুরক্তা ছিলেন—তাহা সকলেই জানিত। কবির শেষ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও—সেই সাধ্বী স্ত্রী কত আগ্রহের সহিত স্বামীর সেবা করিতেন। প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর কয় ঘণ্টা মাত্র পরেই এই সতীর পরলোক-

প্রাপ্তি হয়। এই অসামান্তা পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী, বক্তার ন্তায় আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এতদিন তাঁহার সমাধিস্থান কোথায় ছিল, তাহা কাহারও গোচর ছিল না। সম্প্রতি তাঁহাদের চেষ্টায় সে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কবির পার্শ্বেই তিনি শায়িত আছেন। বর্ত্তমান বৎসরেই সে স্থান সংস্কৃত হইয়াছে ও তদুপরি প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে বক্তা, কবির দৌহিত্র—শ্রীমতী হেনরিয়েটা শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র শ্রীযুক্ত বি, এস্, নিস্ (Mr. B. S. Nyss.) সাহেবকে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন।

সভাপতি মহাশয় কবির চিত্র হইতে মাল্য গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেবের গলদেশে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেব বলিলেন যে, তিনি দেশপূজ্য বাঙ্গালী মাতামহের গৌরবে আজ গৌরবান্বিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাতৃস্নেহলাভে বঞ্চিত—যেহেতু, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই—তাঁহার মাতা হেনরিয়েটা শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, যদিও ভাষার দ্বারা মানুষের ভাবের অভিব্যক্তি হয়—তথাপি সময়ে সময়ে ভাষা চিন্তার ধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। মধুসূদনের ক্ষমতাশালী লেখনী বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা, চেতনা ও সাহস দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের" ন্তায় সুমধুর কাব্য লিখিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, তিনি কোমলকান্ত পদও রচনা করিতে পারিতেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ বাহাদুর বলিলেন যে, যদিও মাইকেল বাহ্যতঃ বিদেশী আচরণে ও চালচলনে অভ্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই দেশীয় ভাবে ভরপূর ছিল এবং বাঙ্গালার রীতি নীতি, পূজা অনুষ্ঠান প্রভৃতির স্মৃতি সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে ভাসমান থাকিত। প্যারী সহরে অবস্থানকালে তিনি "কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা" বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির দেশ-প্রীতির বিষয় কিছু বলিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, মাইকেল দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রতীচ্য জগতের সেক্সপীয়র, ডাণ্টে প্রভৃতির ন্তায় বঙ্গদেশে উচ্চশ্রেণীর কবিও জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় কবির নানা গুণের আলোচনা করিলেন।

তৎপরে, হিন্দুস্কুল মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় স্মৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানির বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইল।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন যে, গবর্মেণ্ট সিমেটিতে মাইকেল মধুসূদনের সমাধির চতুর্দ্দিকে যে লৌহ-বেষ্টনী আছে, তাহা বাড়াইয়া মাইকেলের পত্নীর সমাধিস্থানটিকেও ঘিরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্থির হইল, এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

তৎপরে তিনি বলিলেন যে, মাইকেলের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। মাইকেলের সময়ে এবং হয়ত তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেও আজকালকার মত বঙ্গভাষার এত শব্দসম্পদ্ ছিল না। বঙ্গদেশ তখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নব নব ভাবসম্ভার ব্যক্ত করিবার ও ভাষাকে সুগঠিত করিবার শক্তি তাহার কত অপ্রচুর। মাইকেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এই দৈন্য ঘুচিয়াছিল। মাইকেল আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মনে এই শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি সেই সকল জাতির সমতুল্য যে সকল জাতির মধ্যে সেক্সপীয়র ও মিণ্টন প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই কথা ঠিক যে, মাইকেলের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর অতুলনীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য ছিল—কিন্তু তাহা লোকলোচনের অগোচর ছিল। বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদিত "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহে" তাহার প্রথম পরিচয় পায়। ঈশ্বর গুপ্তও বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যে মাইকেলের ন্যায় চেতনা ও দেশপ্রীতির উন্মেষ করিতে পারেন নাই। মাইকেলের দেশাত্মবোধ সুগভীর ছিল। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ তাঁহাকে বিদেশী বিদ্যা ও সভ্যতার অনুশীলন বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয় নাই। তিনি প্রতীচ্যের অনুকরণ করেন—তিনি পশ্চিমা শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা হজম করিয়াছিলেন। অশ্বমেধের ঘোটকের ন্যায় তিনি তাঁহার মনকে যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—কোথাও তাহাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার মানসিক শক্তি দিগ্বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল—এবং মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব সম্পদশালিনী করিল। মাইকেল ইচ্ছা করিতেন না যে, তাঁহার দেশবাসী কূপমণ্ডুক হইয়া বসিয়া থাকে।—যেহেতু এই জন্যই মধ্যযুগে বঙ্গদেশের অত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন হইয়াছিল। অন্য জাতির নিকট এ বিদ্যা ও সভ্যতা শিক্ষা করিবার অধিকার ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিরও আছে। যদি বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ভারতমাতাকে বেশী কিছু দিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ, সে বিদেশ হইতে অনেক জিনিষ আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া। মাইকেল তাঁহার জীবনে এবং তাঁহার লেখায় এই কথাই—এই মহৎ শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৩রা শ্রাবণ ১৩৩১, ১৯এ জুলাই ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬|০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—সভাপতির অভিভাষণ—"হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে তিনি "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" বিষয়ে আলোচনা করিলেন।*

প্রবন্ধ পাঠের পর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ রসায়নাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমরা আজ অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। বাঙ্গালায় তাঁহার মত জ্ঞানবান্ আর কেহ নাই। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রোতা ও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩১, ২০এ জুলাই ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫|০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ৩। একত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৫। একত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন,

*৩১শ ভাগ ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। একত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়-প্রদত্ত ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং ১০। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিগত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, "বিগত বর্ষে পরিষৎ কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিলাম। অবশ্য, এই কার্য্য-বিবরণে কর্ম্মচারিগণের কেবল সুখ্যাতিই করা হয় নাই, তাঁহারা যে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার কথাও যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিষৎ একটি প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য এক দিনেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে বিগত বর্ষে আমরা যে উদ্দেশ্যের পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বলিতে পারা যায়। কার্য্য-বিবরণের মধ্যে আপনারা পরিষদের দেনার পরিমাণ জানিতে পারিলেন। সদস্যগণের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে চাঁদা পাওয়া গেলে ইহা অনায়াসেই পরিশোধ হইতে পারে। "রমেশ-ভবনের" কার্য্য অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইবে। আমরা শুনিলাম যে, ইহার জন্য প্রায় ১২০০০৲ টাকা দেনা রহিয়াছে। আশা করি, সত্বরেই ইহা শোধ হইবার মত টাকা পাওয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, বর্ত্তমান ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হউক। রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "পরিষদের আর্থিক অবনতি, কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা, এবং গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশের অনিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ইহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য পরিষদের ২১ জন সভ্য এক বিশেষ অধিবেশন অহ্বানের প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্যকার সভায় উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি প্রস্তাব করি যে, কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ২।৩ ও ৬ সংখ্যক বিষয় অর্থাৎ ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, একত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও একত্রিংশ

বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন স্থগিত থাকুক।” এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু গ্রন্থাগারের র‍্যাকের জন্য ১০০৲ টাকা দান করিবেন জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা-প্রসন্ন সেন ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পিএচ্ ডি মহাশয়গণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় আয়-ব্যয়-বিবরণের প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে, ঐ হিসাব সংশোধিত না হইলে এই কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ করা যায় না। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুই এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর স্বাক্ষরিত ৫ বৎসর পূর্ব্বের নথি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় হিসাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর মুদ্রিত প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, “ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত করিয়া কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইহাতে কার্য্য-সম্পাদনে বিলম্ব করিয়া পরিষদের অনর্থক ক্ষতি করা হইবে মাত্র। বার্ষিক অধিবেশনই কর্ম্মাধ্যক্ষগণের কার্য্যের দোষগুণ ও পরিষদের অবস্থা বিষয়ে বিচার করিবার উপযুক্ত কাল। ইহার জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশন আহ্বানের কি প্রয়োজন? যদি আপনারা দেখেন যে, পুরাতন কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কার্য্যে শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে আপনারা এই অধিবেশনেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করুন। ইহার জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া কোনই লাভ নাই, বরং বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমি সংশোধিত প্রস্তাব করি যে, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব অদ্যকার সভাতেই আলোচিত হউক।” শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ৫৯ ভোট হওয়ায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

এই সময় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ছাপান আপত্তি পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার কতিপয় আপত্তির উত্তর প্রদান করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া বলেন যে, কলিকাতা প্রদর্শনী হইতে পরিষৎ কোন টাকা পায় নাই। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিলেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই কথার বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের উত্থাপিত আরও কয়েকটী আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আর কিছু কাহারও জানিবার আছে কি না। আর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু ১৩৩১ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা মুলতুবি রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেখান যে, এই আয়-ব্যয় তালিকা প্রস্তুতের সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু ঐ তালিকা মঞ্জুর করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয় ও সদস্যগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পরিষৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে ইহার বিপক্ষে ৪ জন এবং সপক্ষে ৫৪ জন সদস্য ভোট প্রদান করায় ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের, সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত আনুমানিকআয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট উহা পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাধারণ সভায় সরাসরি ভাবে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্য দিয়া গ্রহণ করাই নিয়ম। এই বিষয়ে কিছু আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পরিশিষ্টে সাধারণ-সদস্যতালিকা দ্রষ্টব্য। পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে প্রস্তাব করিলে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। (২) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী।
(৩) „ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী। (৪) „ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্য আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

*১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
*২। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি
*৩। „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
*৪। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
*৫। „ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি
৬। „ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্
*৭। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৮। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
৯। „ মৃণালকান্তি ঘোষ
১০। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১১। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১২। „ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
১৩। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
১৪। „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
১৫। „ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্
১৬। „ অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর
১৭। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্
*১৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
*১৯। „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
২০। „ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ ডি

নিম্নোক্ত ছয় জন শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
(২) „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্
(৩) „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি
(৪) „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
(৬) „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতি—

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
(২) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
(৩) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
(৪) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
(৫) মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই,
(৬) মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর জি সি এস্ আই, কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্
(৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্
(৮) শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
সমর্থক— শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এল্
সমর্থক— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি

সমর্থক— শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর

সমর্থক— শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বসু এম্ এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৭। প্রস্তাবকর্ত্তা উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদক-পদে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রত্যাহার করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই আটজন সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থীদের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুসারে, নিম্নলিখিত ৮ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন—

২১। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
২২। „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
২৩। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ
২৪। „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
২৫। „ রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এল্
২৬। „ বৈদ্যমহোপাধ্যায় গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ
২৭। „ হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
২৮। „ নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

৮। পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তক প্রদর্শনান্তে উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৯। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রসকল প্রতিষ্ঠা করিলেন।—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র। এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদান করিয়াছেন।

(খ) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্রপ্রদাতা—শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

(গ) ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গবাসী" সম্পাদক রায় সাহেব ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্রখানি প্রস্তুত হইয়াছে। ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিবর্ষে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ দান করিয়া থাকেন।

(ঘ) ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। খড়দহের ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় ১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও কায়স্থ-সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুরীতে জগন্নাথ দেব রত্নবেদীর উপর যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ তিনি একলক্ষ শালগ্রাম শিলার দ্বারা রত্নবেদী প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "৫ বৎসর নিয়মের বলে আজ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা গেল না। পরিষদের সভাপতির আসন তাঁহারই প্রাপ্য—বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা আবার তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য আসনে বসাইতে পারিব। তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়াই তাঁহার রিক্ত আসনে রন্ধ্রশোধকরূপে আপনাদের আদেশমত আমাকেই বসিতে হইতেছে।"

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পোঃ কোতরং, ভদ্রকালী, হুগলী; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, ভাইস-চেয়ারম্যান, কোতরং, হুগলী; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম আর এস্ (লণ্ডন), ৬।২ খেলাত ঘোষ লেন;

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠ বি এল্, উকীল, ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সরকার, শুকজোড়া, পোঃ গেলিয়া, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম্ এ, বি এল্, ৮ সার্কুলার রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, উকীল, ছমকা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ, বি এল্, ৮।২এ হাজরা রোড, (জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মৈত্র বি এল্, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন বি এল্, উকীল, ৬ উল্টা-ডাঙ্গা জংশন্ রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১১ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী তালিম উদ্দীন আহম্মদ তারিকুল আলম এম্ এ, বি এল্, সাব-ডিবিশন্যাল অফিসার, বারাসত। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ এম্ এ, বি টি, ৭৫।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, লেক্‌চারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ তারক চ্যাটার্জ্জি লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম্ এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মোজাম্মেল হক্ বি এ, ওরিয়ান্টাল প্রিন্টার্স কোং লিমিটেড, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল বি এল্, ১১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দুলালচাঁদ দাস, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ— শ্রীযুক্ত রামসত্য মুখোপাধ্যায়, নসিগ্রাম, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া হাই স্কুল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ, সম্পাদক—"অমৃত-বাজার-পত্রিকা," ২ আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ১৪২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, বার লাইব্রেরী পাটনা; শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত, "তরুণ" সম্পাদক, বরিশাল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৮।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২১ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গুঁই, ৯।১০।৩১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, উপহৃত পুথি—১। পদার্থদর্শাভিখ্যা। ক্রীত,—২। জাতক-কর্ম্মপদ্ধতি, ৩। তার্জ্জিকসার টীকা, ৪। ভুবনদীপকবৃত্তি, ৫। নিঘণ্টুনামগুণসংগ্রহ, ৬। অভিধানচিন্তামণি—নাম-মালা, ৭। ত্রিশতীবৃত্তি, ৮। গণিত-সার। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী। ৯। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, ১০। অক্রুর আগমন, ১১। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১২। চৈতন্য-মঙ্গল--অন্ত্য খণ্ড, ১৩।১৪। মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ১৫। পাণ্ডব মিলন, ১৬।১৭। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৮। মহাভারত—মৌষলপর্ব্ব, ১৯। মহাভারত—আশ্চর্য্য পর্ব্ব, ২০। দুর্ব্বাসার পারণ, ২১। লক্ষ্মীচরিত্র, ২২। শিবরামের যুদ্ধ, ২৩। গুরুদক্ষিণা, ২৪। প্রহ্লাদচরিত্র, ২৫। ভক্তিচিন্তামণি, ২৬।২৭। গোকুলবিলাস, ২৮। বঞ্চিত রায়ের পালা, ২৯। কাপাসের পালা, ৩০। সীতাহরণ, ৩১। পদাবলী, ৩২। তিলি জাতির কুল আর্য্যা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়—৩৩। ধর্ম্মমঙ্গল, ৩৪। শীতলামঙ্গল। উপহারদাতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব—৩৫। পঞ্জিকাবিবরণসংগ্রহ। শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল,—৩৬। বিদ্যাসুন্দর।

পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রামানুজ চক্রবর্ত্তী, উপহৃত পুস্তক—১। দেববাণী, ১ম প্রচার, ২। ঐ, ২য় প্রচার। শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাক্‌চী সরস্বতী—৩। দেববীণা, ৪। চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫। মাসিক বসুমতী, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩২৯। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা—৬। শিবপুর কলেজ পত্রিকা ১৩১৩।১৫, ৭ সংখ্যা। মৌলভী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্—৭। পারস্য-প্রতিভা। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী—৮। সন্দীপের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—৯। ব্যথার সুখ। ১০। ঘরে পরে। ১১। ভুল। শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী—১২। আসাম-প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক—১৩। সারথি ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ ও ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। ১৪। ইতিহাস ও আলোচনা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১০ম সংখ্যা। ১৫। বালক ১ম ও ৫ম বর্ষ। ১৬। ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত—১৭। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা ৩য় ভাগ, ১৩২৯। ১৮। গন্ধবণিক্ মহাসম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০। ১৯। ঐ সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—২০। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত। ২১। দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি নির্ণয়। ২২। আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২৩। কৈকেয়ী। ২৪। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিবৃতি। শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা—২৫।২৬। পাবনা জেলার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস—২৭। ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ২৮। যোগীগুরু, ২৯। জ্ঞানী গুরু, ৩০। তান্ত্রিক গুরু, ৩১। প্রেমিকগুরু,

৩২। মায়ের কৃপা, ৩৩।৩৪ তত্ত্বমালা ১ম ভাগ, ও ২য় ভাগ, ৩৫। সাধকাষ্টক, ৩৬। বেদান্ত-বিবেক, ৩৭। উপদেশরত্নমালা। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস—৩৮।৩৯। কঙ্ক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৪০। শ্রীচৈতন্য, ৪১। মশার যুদ্ধ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪২। ভারতে বলিপ্রথা, ৪৩। সাধনা। শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৪৪। মাধবাচার্য্য। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র—৪৫।৪৬। স্বরদ-শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ। শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল—৪৭। সরল গঠনতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর—৪৯। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, ১ম ভাগ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ—৫০। আলোচনা-চতুষ্টয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার—৫১।৫২।৫৩। শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর—৫৪। সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার, ৫৫। অনুপমা, ৫৬। তোড়া, ৫৭। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫৮। শনির পাঁচালী। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—৫৯। শাস্ত্রতত্ত্ব—ঋগ্বেদসংহিতা, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম—৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সুর—৬০। বিদ্যাপতি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী—৬১। কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬২।৬৩। সঙ্গীত-সোপান। শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণরক্ষা-সভার সম্পাদক—৬৪। সমাজ-সংস্করণ। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস —৬৫। গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

উপহারদাতা—The Registrar, Calcutta University, উপহৃত পুস্তক—1. Journal of the Department of Letters, Vol. XI. 1924. The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—2. Total Eclipse of the Sun, January, 24, 1925. The Superintendent, Govt. Printing, India—3. Review of Agricultural Operations in India, 1922,24. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—4. Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1922-23. The Superintendent, Government Printing, India—5. Progress of Education in India 1917-1922 (Eighth Quinquennial Review) Vol. I. 6. Epigraphia Indica. Vol. XVII, Part VI. (April 24). 7. Review of the Trade of India in 1922-23. 8. Statistical Tables relating to Banks in India, 1922. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—9. The Kingdom of God is Within you, 10. My Religion, 11. The Tribes on my Frontier, 12. Personality. 13. Glimpses of Bengal, 14. The Eternal Wisdom, 15. Tolstoy, his Life and Writings, 16. Devi Gita, 17. Aggressive Hinduism, 18. Ruskin's Treasuries. The Superintendent, Govt. Printing, India—19. Progress of Education in Bengal, 1917-1922 (6th Quinquennial Review). The Surveyor General of India—20. General Report of the Survey of India during 1922-23. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—21. My Strangest Case. 22. My Master as I saw Him, 23. Haridasi, 24. Hindu Science

of Marriage, 25. Ancient Babylonia. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat—26. Report on Administration of Bengal 1922-23. 27. Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the years 1922-23. The Secretary, Smithsonian Institution—28. Smithsonian Mathematical Formulæ and Tables of Elliptic Functions. 29. Mandan and Hidatsa Music. 30. Excavations in the Chama Valley, New Mexico. The Royal Siamese Consulate General—31. Samantapasadika (Commentary on the Vinayapitaka) Vol. 1. 32. Do. Vol. II. 33. Paramatthajjotika (Commentary on Khuddakapatha of Khuddakanikya) Vol. I. 34-35. Paramatthadipani (Commentaries on the Udanavagga Itivattaka of the Khuddakanikya) Vol. I. 36. Saddhammappajjotika (Commentary on the Maha and Cullanides of the Khuddakanikya) Vol. I. 37. Do. Vol. II. 38. Saddhammapakasini (Commentary on the Patisam Chidamagga of the Khuddakanikya) Vol. I. 39. At-thasalini (Commentary on the Dhammasangini) Vol. 1. 40. Sammohavinodini (Commentary on the Vibhanga of the Abhiddhammapitaka) Vol. I. 41. Paramat-thadipani (Commentary on the Pancappakarana of the Abhiddammapitaka) Vol. I. 42. Visuddhimagga, Vol. I. 43. Do. Vol. II. 44. Do. Vol. III. 45. Abhidhammattha Sangaha and Abhedhammattha Vibhasini in one Vol. The Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science.—46. Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. VIII. Part III. 47. Do. Part IV. The Director, Museum of Fine Arts—48. Forty Eighth Annual Report of the Museum of Fine Arts, Boston, for the year 1923. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—49. Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XIV. No. 2. 50. Do. No. 3. 51. Do. No. 4. 52. No. 5. 53. Twelfth Trienpial Report on Vaccination in Bengal for the years 1920-21, 1921-22 & 1922-23. 54. Bengal Public Health Report, Bengal Sanitary Board Report and the Report of the Chief Engineer, Bengal Health Department for the year 1922. The Director, Geological Survey of India—55. Records of the Geological Survey of India. Vol. LVI. Part I. 1924. The General Manager, Calcutta Exhibition.—56. Official Hand-Book and Guide of the Calcutta Exhibition, December 1923. রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—57. The Scientific and Other Papers. Vol. I. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—58. Annual Report of the Department of Fisheries in Bengal for the year ending 31st March 1923. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—59. Minutes of Evidence of Mr. Jatindra Nath Bose before the Royal Commission on the Public Services. The Superintendent, Government Printing, India—60. Annuul Report of the Board of Scientific Advice for India, for the year 1922-23. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—61. Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal 19-22-31. The Superintendent, Government Printing, Allahabad, U. P.—62. The Third Triennial Report on the Search for Hindi Manuscripts for the years 1912, 1913 & 1914. The Director, Geological Survey of India.—63. Records of the Geological Survey of India, Vol. LV. Part 2 1923.

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অবনতি।

২। কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা।

৩। পুস্তকাগারের বর্ত্তমান অবস্থা।

৪। পরিষদের গ্রন্থ এবং পত্রিকা প্রকাশের বর্ত্তমান অবস্থা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ একুশ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত গত ২৪এ আষাঢ় ১৩৩১ তারিখের পত্র পাঠ করিলেন এবং এই পত্রে উল্লিখিত বিষয়-গুলির আলোচনার জন্য উক্ত পত্রস্বাক্ষরকারিগণকে এবং প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারী মহোদয়েরা পরিষদের উন্নতির জন্যই আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছেন। কারণ, পরিষদের কার্য্যপরিচালনে যদি কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাহার সংশোধন কল্পে সদস্যগণের মতামত বিশেষ উপকারী।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের অনিষ্ট করিবার কাহারও ইচ্ছা নাই—কোন বাঙ্গালীরই সে অভিপ্রায় থাকিতে পারে না। পরিষদের কার্য্যে যে সকল ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাঁহারা তাহারই সংশোধন ইচ্ছা করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার অধি-বেশনের পত্র পান নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং তিনি নিজেও আজকার অধিবেশনের পত্র পান নাই। যদিও সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া অদ্যকার অধিবেশনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনিও পত্র পান নাই।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, যখন কয়েক জন সদস্য পত্র পান নাই, তখন অন্য কোন আলোচনা না হইয়া একটি ছোট সমিতি গঠন করা হউক এবং তাঁহাদিগকে ২ মাস সময় দিয়া তাঁহাদের মন্তব্য জানাইতে অনুরোধ করা হউক। পরে এক বিশেষ অধি-বেশনে সেই মন্তব্য আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই বিশেষ অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত বিষয় ব্যতিরেকে কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হইতে পারে না। যদি কোন নূতন প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা পরিষদের নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অগ্রে উপস্থিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাশয় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান সম্বন্ধে ৫৩ (খ) এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিকার সংক্রান্ত ৪২ (ক) সংখ্যক নিয়ম পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন এবং রুলিং, (Ruling) দিলেন যে, শাখা-সমিতি গঠন সম্পর্কে জ্যোতিষ বাবুর নূতন প্রস্তাব আজ আসিতে পারে না, অতএব বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনা হউক।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত বিষয়গুলির সম্যক্ আলোচনার পূর্ব্বে শাখা-সমিতি গঠনের কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যেমন কয়েকজন পরিষদের কার্য্যের দোষ ধরিতেছেন, তেমনি আরও জন কয়েক এমন আছেন, যাঁহারা সে দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন; অতএব পূর্ব্বে আলোচনার দ্বারা দোষগুলি প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, পরে শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব উঠিতে পারে।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার অধিবেশনের পত্র যখন কয়েক জন সদস্য পান নাই, তখন অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, অদ্য অধিবেশন স্থগিত রাখা সমীচীন নহে। ২।৪ জন সদস্য ডাকঘরের গোলযোগে পত্র পাইতে না পারেন। পত্র পাঠাইবার সময় রীতিমত পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে দূর হইতে হয়ত অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিষদের দোষ নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার আশায় আসিয়াছেন। অতএব অধিবেশনের কার্য্য স্থগিত থাকা কিছুতেই উচিত নয়।

সভাপতি মহাশয় অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাবে ভোট লইলেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৯ জন ও বিপক্ষে ২১ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারীদের অপর কেহ এইবার তাঁহার বক্তব্য বলুন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে অপর কেহ বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, পরিষদের সদস্য-সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। অনেক সদস্য তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, পরিষদে কাজ করিবার কোন স্কোপ্ (Scope) বা ক্ষেত্র তাঁহারা পান না, সেখানে একটা দল আছে—সে দল তাঁহাদিগকে কাজ করিতে দেন না। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অনেকে কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য নাম পাঠাইতে পারেন না—কেন না, বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করেন না। প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিত সম্মতি দিবার নিয়ম থাকায় তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন কি না, এই আশঙ্কায় লিখিত সম্মতি দিতে চাহেন না। ইহাতে পরিষদের

অনিষ্ট হয়। অনেকে বলেন যে, পত্র লিখিলে তাঁহারা সময়মত উত্তর পান না এবং কখন কখনও শাখা-সমিতিগুলির অধিবেশনের আহ্বান-পত্র অধিবেশনের দিনই সভ্যগণ পাইয়া থাকেন। গত বৎসর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সহকারী সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষপদে থাকা তাঁহার সম্মানের হানিকর। এ কথা তিনি কি জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে পরিষদের পুস্তকাগারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লিখিয়াছিলেন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে বৎসরের মধ্যে কোন কাজই দেওয়া হয় নাই। এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া দরকার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ পরস্পর একযোগে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। প্রতিশ্রুত এককালীন দান কর্ম্মাধ্যক্ষগণের অবহেলায় আদায় হয় না। যথা, হাওড়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করার চেষ্টা হয় নাই। এ সকল যাহাতে না হয়, তাহা করা উচিত। আরও শুনা যায় যে, পরিষদের দৈনিক আদায়ের টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট যায় না। সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দরকার-মত সেখান হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করা উচিত। পুস্তকালয়ের দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পরিষদের বাহিরে যাইবে না, এইরূপ নিয়ম আছে; অথচ অন্য লোকে লইয়া যায়। ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত পুস্তকগুলি রাখিবার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই কেন?

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর সভাপতিত্বে বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে, পর বৎসরেই "রমেশ-ভবন" সম্পূর্ণ হইবে। এখনও তাহা হয় নাই। শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি মহাশয় টাকা দিতেছেন না বলিয়া কাজ বন্ধ আছে। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি মহাশয়ের দেখা হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,এ গুজব মিথ্যা। সত্বরে "রমেশ-ভবন" সম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

এই সকল কথা জানাইয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, তাঁহার নিজের মনে যে সকল কথা উঠিয়াছে এবং যে সকল কথা অপরের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিলেন। এক্ষণে এই সকল অভিযোগের প্রতীকার করিয়া যাহাতে পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য সদস্যগণের সমবেতভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নিজে শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি মহাশয়কে টাকার জন্য তাগাদা করিয়াছিলেন। "রমেশ-ভবনের" সংগৃহীত টাকা তাঁহার নিকট ছিল। অধিকাংশ টাকাই তিনি প্রয়োজনমত দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট যাহা তাঁহার কাছে ছিল, তাহাও বোধ হয়, ১৬৷১৭ দিন হইল তিনি দিয়া দিয়াছেন এবং তাহা হইতে কণ্ট্রাক্টারকে তাঁহার প্রাপ্য দেওয়ায় "রমেশ-ভবনের" কার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। "রমেশ-ভবনের" পৃথক্ কমিটি আছে। "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণ ব্যাপারে পরিষদের কোন সংস্রব নাই।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর কোষাধ্যক্ষের নিকট পরিষদের আদায়ী টাকা প্রেরণের

খাতা দেখাইয়া বলিলেন যে,গত কল্য ১৪ই তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট চালান দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্যয়ের জন্ত যে ভাবে requisition বই লেখা হয় ও কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে টাকা আনা হয়, তাহাও দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু খাতাপত্র দেখিলে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করিতে পারিতেন না।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, গত বর্ষের আয়-ব্যয়-তালিকায় দেখা গিয়াছে যে, আয়ের অনুপাতে ব্যয় করা হয় নাই। যে আয় হইয়াছে, তাহার অনুপাতে কর্ম্মচারীদের বেতন বেশী দেওয়া হইয়াছে। এ ভাবে ব্যয় না বাড়াইয়া পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্ত বজেটে বেশী টাকা ধরা উচিত। স্থায়ী-তহবিল হইতে যে টাকা লওয়া হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার সমুচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্থায়ী-তহবিল হইতে ধার এক বৎসরেই সমস্ত লওয়া হয় নাই। স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সময় ৪০০০৲ টাকা লওয়া হইয়াছিল। সে ১০।১২ বৎসর আগেকার কথা। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে এক পয়সাও ধার লওয়া হয় নাই। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ৭০০৲ টাকা মাত্র লওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সে সময় শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু প্রভৃতিও পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, এই যে ৭ হাজার টাকা স্থায়ী-তহবিল হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা শোধ করিতেই হইবে। এই বলিয়া সকল সদস্যকে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বাকী অনাদায়ী টাকা যাহাতে আদায় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "বিশেষ টাকা আদায় করিয়া বিশেষ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। সকলেই চেষ্টা করিলে এ কাজ সহজসাধ্য হয়। এই দেনার জন্ত বাজারে পরিষদের কলঙ্ক রটিয়াছে, ইহার জন্য আমরা সকলেই দায়ী। সকলেই নিজ নিজ বন্ধুবর্গকে পরিষদের পক্ষে অনুরোধ করুন। প্রত্যেক সদস্য ৩৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিলে এই দেনা সহজেই শোধ হইতে পারে।"

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, গ্রন্থাবলী মুদ্রণে ১৩২১ হইতে ১৩৩০ পর্য্যন্ত মোট ৩১২০০৲ টাকা ব্যয় করিবার কথা, তাহার স্থলে পরিষৎ ৩১৪৩৩৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কোন্ বৎসর ৩৬০০৲ টাকা হিসাবে ব্যয় হইয়াছে?

সভাপতি মহাশয়, উত্তরে জানাইলেন যে, এ কয় বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর—শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বের সময় গভর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা গ্রন্থাগারের আসবাব প্রভৃতি খরিদের জন্ত ব্যয় করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল। ১৩২১ সালে ৩৩৩৫৵৬, ১৩২২ সালে ৩০৩০৸৶৯, ১৩২৩ সালে ৫৩৯৪৵৯, ১৩২৪ সালে ৩৯৮৯৲৯, ১৩২৫ সালে ২৫৮৪৸৯, ১৩২৬ সালে ২৪০১৷৶৬, ১৩২৭ সালে ১৯৩৯৷৯, ১৩২৮ সালে ২৭৪৩৷৶, ১৩২৯ সালে ২৩৫৮৶৯ এবং ১৩৩০ সালে ১৯১২৸৵৬ গ্রন্থ প্রকাশে ব্যয় হয়। অতএব মোটের উপর পরিষৎকে দোষ দেওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের সময়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কি ভাবে মাননীয় লায়ন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর গবর্মেণ্টের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গবর্মেণ্টের সর্ত্ত অনুসারে প্রতি বৎসর ছত্রিশ শ' টাকা এক্ষণে ব্যয় করা হয় না কেন?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রতি বৎসর ছত্রিশ শ' টাকা ব্যয় না হইলেও মোটের উপর এ কয় বৎসর নির্দ্ধারিত টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোন বছর কম, আবার কোন বছর বেশী ব্যয় হইয়াছে। ১৩২৭ সালের পর গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত মেয়াদের পর কেন ৩৬ শ' টাকা ব্যয় হয় নাই, তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে প্রতি বৎসর ৩৬ শ' টাকা ব্যয় হয়, তাহার জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ দায়ী: ঐ টাকা ব্যয় করিতেই হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, ১৩৩০ সালে ৩৬শ' টাকা ব্যয় হয় নাই, উপরন্তু ১৭০০৲ টাকা দেনা রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এই দেনা শোধের ও আগামী বৎসর ৩৬০০৲ টাকা ব্যয়ের কি ব্যবস্থা হইবে, জানিতে চাহিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রন্থ মুদ্রণে বর্ত্তমান বর্ষে ৩৬০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এইরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন। গত বর্ষের গ্রন্থ প্রকাশের দেনা ১৭০০৲ টাকাও শোধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, "আমার আরজি পুনরায় আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। পরিষদের লাইব্রেরীর বহু অভাব মোচনের বিষয় আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু গত বার্ষিক অধিবেশনে জানাইয়াছেন যে, তিনি পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার জন্য ১০০৲ দান করিবেন। পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশ বাবুর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য, লাইব্রেরীর জন্য এবং পরিষদের স্থায়ী-তহবিলের দেনা পরিশোধের জন্য আপনারা অগ্রসর হউন। দেনা শোধ না হইলে পরিষৎ দৃঢ়-ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে না।"

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু বলিলেন যে, ৺সারদা বাবুর সময় একবার প্রত্যেক সদস্যকে ৬৲ হিসাবে দান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫০০৲।৬০০৲ টাকা উঠিয়াছিল। সদস্যসংখ্যা না বাড়াইলে আয় বৃদ্ধি হইবে না। দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়া সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় এ কাজের ভার লইলে সহজসাধ্য হয়। ইহাই আয়-বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু সদস্যসংখ্যা হ্রাস হওয়ার কথা বলিয়াছেন। সদস্যগণের টাকা বাকি পড়ার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বহু সদস্যের নাম তালিকা হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু, সভাপতি ও সম্পাদকের উপর সদস্য সংগ্রহের ভার দিতে চাহেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই আমরা পরিষদের সদস্য করিয়াছি—আমাদের তালিকা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। নূতন সদস্য

সংগ্রহের বাধাও অল্প নহে। মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে পরিষদের অযথা কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হওয়ায় অনেকে সদস্য হইতে চাহেন না। পরিষৎ কোন দলবিশেষের নহে। সকলের চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আবার সকলেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। ৺রামেন্দ্র বাবু পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন—সেরূপ কর্ম্মী আমরা কোথা পাইব? আমরা সকলে ত আর রামেন্দ্র বাবু নহি। তবে আমরা সংহত এবং সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে রামেন্দ্র বাবুর অভাব কতক পরিমাণে পূরণ করিতে পারি। সংবাদ-পত্রে যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। যদি সংবাদপত্র-পরিচালকগণ পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সংযতভাবে পরিষদের সমালোচনা করেন, তবে পরিষদের কল্যাণ হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলে অবৈতনিক। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইচ্ছা করিলেই অনেক নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। শুধু সদস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না—ইহার স্থায়িত্বের জন্য অর্থ সংগ্রহও করা চাই। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দেশের লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এখনও সম্যক্ জাগরিত হয় নাই। আমাদের জাতিগত এই স্বভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইবে না। পরিষদের এমন একশত সদস্য এখনও নিশ্চয় আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করিলেই এক বৎসরেই ৭ হাজার টাকা দেনা শোধ করিয়া স্থায়ী তহবিলের জন্য কিছু জমাইয়া দিতে পারেন। আমাদের সম্পাদক মহাশয় ও আরও কেহ কেহ ইতি-মধ্যেই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ইতি-মধ্যেই ৩০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। আমি নিজে দেনা শোধের জন্য ৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। খুব সম্ভব পরিষদের আর এক হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতে আমরা ৫০০৲ পাইতে পারিব।

"আপনাদিগকে আমার অনুরোধ, আপনারা পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যান। পূর্ব্বের দলাদলি ও বিরোধের কথা ভুলিয়া যান। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমিও ঝগড়া করিয়াছি—সে ঝগড়া পরিষদের হিত ভাবিয়াই করিয়াছি। আসুন, সকলে মিলিয়া কাজে অগ্রসর হই। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করুন—আমাদের এখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে—ক্ষেত্রী নাই। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পুনাতে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে তাঁহার অনেক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন। আমি চাই, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পরিষদের ইতিহাস-শাখাকে সজীব করুন। পরিষদের উপর রাগ বা অভিমান করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। কর্ম্মীরা আসুন, কাজ করুন, বঙ্গের এই প্রধানতম প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করুন, বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করুন।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু সভাপতি মহাশয়ের এই আশার বাণীর জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, সংবাদ-পত্রে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান হউক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে ঐরূপ বিজ্ঞপ্তির একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে

অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ খসড়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করিয়া তার পর সংবাদ-পত্রে দেওয়া হইবে।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, জ্যোতিষ বাবু কর্ম্মীর কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আসিবার যে কোন বাধা বিপত্তি আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম্ এ, মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলেই অবৈতনিক, তাঁহারা সকলেই যথাশক্তি পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের মত নিয়মানুসারে হইলে, বোধ হয় উপযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ পাওয়া যাইবে। তখন আর অভিযোগের কারণ থাকিবে না। গণতন্ত্রমূলক নির্ব্বাচন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তিনি এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কি হইল, তাহা তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই। কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, যে পত্রদ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইবার জন্য সদস্যগণকে আহ্বান করা হয়, সে পত্র এবং গত বার্ষিক অধিবেশনের পত্র তিনি পান নাই। আজিকার অধিবেশনের পত্রেও ঠিকানা ভুল ছিল। সংবাদ-পত্রে এ অধিবেশনের সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল, তাহা কেন হয় নাই, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আজিকার এ বিশেষ অধিবেশন সাধারণের জন্য নয় বলিয়া সংবাদ-পত্রে নোটিশ দেওয়া হয় নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ইতিহাসে এইরূপ অধিবেশন এই প্রথম। এইজন্য সংবাদ-পত্রে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, এ শ্রেণীর অধিবেশনের সংবাদ সংবাদ-পত্রে দেওয়ার প্রথা আছে। কেবলমাত্র সদস্যগণকে আসিতে অনুরোধ করিলেই চলিত। যাঁহারা পত্র পান নাই, তাঁহারাও সংবাদ-পত্রে এই অধিবেশনের সংবাদ পাইলে হয় ত আসিতে পারিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গণতন্ত্রের বিষয়ে শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর বেশ পক্ষপাত দেখা গেল। গণতন্ত্রের গণ ও জন সম্বন্ধে,তাঁহার অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ। কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা আজ না হওয়াই ভাল। পরিষদের নিয়মানুসারে ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হয় এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষের লিখিত সম্মতিও জানাইতে হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন—ভালই, না করেন, তাহা প্রস্তাবককে জানান হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনে ইচ্ছামত সেই প্রস্তাব আবার উপস্থিত করিতে পারেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচনের সময় সকল সদস্যকেই সংবাদ দেওয়া হয় ও প্রস্তাবিত সভ্যদিগের বিষয়ে পত্রদ্বারা ভোট লওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মর্য্যাদা কোথায় ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা বোধগম্য হইতেছে না। কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইবার

জন্য লিখিত সম্মতি পাওয়া দুষ্কর হইলে ও শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর মতে অসঙ্গত হইলে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব তিনি দিতে পারেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হাওড়ায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার প্রতিশ্রুত টাকার জন্য রীতিমত তাগাদা করা হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক দুর্ঘটনা ও কন্যার বিবাহ থাকায় তিনি এ পর্য্যন্ত টাকা দিতে পারেন নাই। সত্বরেই দিবেন, এইরূপ জানাইয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি মতে সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি ব্যতীত যদি কোন সদস্য দুষ্প্রাপ্য বই বাহিরে লইয়া গিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি শ্রীযুক্ত হিরণ বাবুর জানা থাকে, তবে তিনি সেই সদস্যের নাম জানাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হিরণ বাবু জানাইলেন যে, বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিনা অনুমতিতে দুষ্প্রাপ্য বই, যথা—হালহেডের গ্রামার লইয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে Bureau of Information বা অনুসন্ধান-সমিতি করা হইয়াছে। সময় সময় বহু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তাঁহাকে অনেক সাহিত্যিক সংবাদ অনুসন্ধান করিয়া জানাইতে হয়। এই জন্য অনেক সময় তাঁহার ঐ শ্রেণীর পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে লইতে হয়। বই লইয়া তিনি পরিষদের চিত্রশালার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেন এবং সেখানেই বই রাখিতেন, বাড়ী লইয়া যান নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক লইয়া কাজ করেন এবং পরিষদে বসিয়াই কাজ করেন। তিনি ঐরূপ পুস্তক বাহিরে লইয়া যান নাই। অতএব সম্পাদক মহাশয়ের এ বিষয়ে কোনই ত্রুটি হয় নাই।

তৎপরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার পর তিনি বলিলেন, অদ্য বহু বিষয়ের আলোচনা হইল। যদি কাহারও কিছু আরও বক্তব্য থাকে, তবে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গোচরে আনিলে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা হইবে। এই বলিয়া তিনি অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবকগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত চুণী বাবু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ — সভাপতি।

পত্রিকা ১৩শ হইতে ১৮শ ফর্ম্মা ভারতমিহির প্রেসে, কার্য্যবিবরণ ৬ষ্ঠ হইতে ১৬শ ফর্ম্মা সুধীর প্রেসে, বিজ্ঞাপন শ্রীপতি প্রেসে এবং মলাট ও ছবি ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

একত্রিংশ ভাগ]　　　　　　　　　　　　　　　　[চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য— সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা ভারতমিহির প্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন কোহিনূর প্রেসে, কার্য্যবিবরণ সুধীর প্রেসে, মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

[৩১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

দীক্ষা গ্রহণ

আজকাল কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই মধ্যে বংশগত গুরুকরণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুকরণে যোগ্যগুরুর অনুসন্ধান শিষ্য করেন না। গুরু, শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কি না, দেখেন না। গুরুর পুত্রই গুরু হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকেই দীক্ষা লইতে হইবে, এই মতের সৃষ্টি কি করিয়া হইল, বলা যায় না। তন্ত্রে যোগ্য গুরুর ও যোগ্য শিষ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি।"

শ্রীজীব টীকায় "লাভো ধনাদিঃ শিষ্যাৎ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরুও দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সহিত এক বৎসর এক সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিলে তবে দীক্ষা দিবেন, এই বিধি আছে।

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাঽন্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিধি থাকা সত্ত্বেও যে বংশানুক্রমিক গুরুকরণ প্রথার কি করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা অনুসন্ধেয়।

হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ জয়দেবের কিছু কাল পরেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। তৎকালীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেশে সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোগল অধিকারের সময়ে রচিত কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কৃষ্ণদাস- (লালদাস নামান্তর) কৃত ভক্তমালের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষা মুসলমান-গণের পরিচয় অধিক পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে অনেক স্থলেই হিন্দুমুসলমানের প্রীতি-বন্ধনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মোগল বাদশাহগণ ও মুর্শীদ কুলি খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় নবাবগণ হিন্দুগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার করিতেন। বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করিবার ফলে উভয় জাতির মধ্যে বহু ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল ও তাহারা পরস্পরকে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। আকবরের উদার শাসননীতির ফলেও হিন্দুমুসলমানের

সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এ সব কথার সাক্ষ্য ইতিহাসও দিয়া থাকে। আমার কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব বৃদ্ধির অপর একটি কারণ মনে হইয়াছে। পরে দেখাইব যে, মহাপ্রভু বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন করিতে আসিবার প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত একটি পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর শত অত্যাচারের পরিবর্ত্তে যে জাতির মহাপুরুষ অত্যাচারি-গণকে সাদর আলিঙ্গন দিয়া প্রেমদান করিলেন, সে জাতির মহত্ব দেখিয়া মুসলমানগণের পক্ষে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পাঠান শাসনকালে রাজনৈতিক অবস্থা

পাঠান শাসনকালে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডই বিভিন্ন নীতিতে শাসিত হইত। বঙ্গের সুলতান প্রবলপরাক্রান্ত হইলে ঐ সমস্ত খণ্ড হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুলতান প্রবলই হউন, দুর্ব্বলই হউন, দেশে যে সামন্ত-শাসনপ্রণালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের পরই এক মুসলমানের অধিকার ছিল।

মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার॥
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ —চৈঃ চঃ।

ফেরিস্তাবর্ণিত বিবরণ পাঠে আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ফেরিস্তা লিখিয়াছে যে, শের শাহ্ বঙ্গরাজ্যকে কতকগুলি সমক্ষমতাপন্ন সামন্তের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কাফি ফজিলেতকে সমগ্র রাজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭—১৫৪০) এ সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। "He subjected to his dominion the whole country as far as Setubandha Rameswar" (Andrew Sterling, T. R. A. A., 1831)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার বঙ্গ আক্রমণের অভিসন্ধির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠে তৎকালীন বঙ্গাধিপের (হুসেন সাহ্ অথবা নসরৎ সাহ্) পরাক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মত আছেন বৎসর দুই চারি।
গৌড়ে উৎকলে তবে পড়িল যে ধাড়ী॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ।
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখে কতক অন্তর॥
ওড্র দেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবে এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগরে গেল করিবারে যুদ্ধ॥—জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল।

রামানন্দ রায়কৃত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভাবের পরিচয় আছে,—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥—১ম অঃ ১০

হুসেন সাহ্ কিন্তু উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন,—

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশ।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

বনবিষ্ণুপুর, মল্লবংশীয় রাজপুতগণের অধীনে মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। জনৈক ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন, এরূপ সুশাসিত দেশ ভূমণ্ডলে নাই। রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু আসিলে তাঁহারা দেশ জলে প্লাবিত করিতে পারিতেন। এই বংশীয় বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দু শাসনকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই ত চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥

রঘুনাথদাসের প্রতি তাহার উক্তি—

তোমার জ্যাঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥—চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ পট্টনায়ক হিরণ্যদাসের ন্যায় আর একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাস হইতে জানা যায় যে, ঠাকুর মহাশয়ের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতুরীর রাজা ছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খানও যশোহর বিভাগের কিয়দংশের শাসনাধিকারী ছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশে" লিখিত আছে, শ্রীহট্ট জেলার—

লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার তাঁহা রাজত্ববিলাস॥

এই সমস্ত রাজা মুসলমান অধিপতিকে কর দিতেন। কর যথাসময়ে না দিতে পারিলে তাঁহাদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত গোপীনাথ পট্টনায়কের দুর্দ্দশা হইতে বুঝা যায়।

এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥—চৈঃ চঃ।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥—চৈঃ চঃ।

অবশ্য পট্টনায়ক প্রতাপরুদ্রের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্য্যাতনপ্রথা মুসলমানগণের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল না। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব বিদ্রোহী চান্দ রায়কে ধরিয়া হাতী দিয়া মারিতে গিয়াছিলেন।

মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে।
বসিলা অনেক লোক মরণ দেখিতে॥—প্রেঃ বিঃ।

করপ্রদানকারী এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসন দেখিয়া মনে হয় যে, পাঠান রাজগণ দেশের আভ্যন্তরীন রাজকার্য্য নিজেরা না করিয়া হিন্দুগণের উপর ভার দিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা Stewart সাহেব বলিয়াছেন,—"The Government of the Afghans in Bengal cannot be said to have been monarchical, but nearly resembled the feudal system introduced by the Goths and Vandals into Europe. It is possible that many of the Afghan officers, averse to business, or frequently called away from their homes to attend their chiefs, farmed

out their estates to the opulent Hindus, who were also permitted to retain the advantages of manufacture and commerce." জন-প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসেও (দুর্গাচন্দ্র সান্যাল) এইরূপ কথা আছে। "বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজত্ব চলিতেছিল।"

রাজদ্রোহ ও দস্যুভয়

এইরূপ করপ্রদানকারী রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রেমবিলাসে রাজমহলের জমীদার চান্দ রায়ের কাহিনী নিম্নলিখিত ভাবে আছে,—

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কতো দিনে হৈল এমন প্রকার॥
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান্ দেখি সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে থানা দেয় গ্রামে।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥

চাঁদরায় স্বাধীন হইয়া রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই,—দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উৎপীড়ন করিয়াছিলেন মাত্র। তৎকালে দস্যুদলে ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ ব্যাড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥
নীলমণি মুখটি আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী॥
পূর্ব্বে তারা চান্দ রায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥—প্রেঃ বিঃ।

পাঠান অধিকারকালে দেশমধ্যে যে শান্তি ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই—

মাধাই করিয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্যপান বিনা আর নাহি যায় কাল॥—চৈঃ ভাঃ।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায় ॥—প্রেমবিলাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলেই দস্যুর উৎপাতের কথা লিখিত আছে। অনেক দস্যু তান্ত্রিক আচারী ছিল।

ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥—চৈঃ ভাঃ।

বহু দূরে গমন করিতে হইলে তখন লোকে জলপথে যাইত। জলদস্যুরও অভাব ছিল না—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল ॥—চৈঃ চঃ।

দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন যে পথঘাট ভীতিসঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে "জাও" বলি লয় প্রাণে ॥—চৈঃ চঃ।

মুসলমানগণের হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার

মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়া লোককে জোর করিয়া মুসলমান করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে,—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে ॥

দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলয়ে আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়ন করে বলিয়া পাগল॥
হেন মতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম তারা সব নষ্ট করে॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে মুসলমানগণ যে প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাই। কিন্তু নবোদিত ধর্ম্মকে বাধা দিতে যাওয়া সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কাজীদলনের বৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু মুসলমান অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া, দলবল সহ মশাল হাতে করিয়া কাজীকে শাস্তি দিতে গমন করিয়াছিলেন।

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥"

মহাপ্রভুকে দেখিয়া কাজি যে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আসিয়া স্তুতিমিনতি করেন, এ কথা পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকে হিন্দু বিদ্রোহিগণের নেতৃরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুসলমান ভক্ত

যাহা হউক, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমানকে প্রেম দান করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান তাঁহার কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাদশাহ্ হুসেন শাহ্ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অনেকগুলি মুসলমান উদ্ধারের কথা লিখিত আছে।

তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী কালে অনেক মুসলমান মহাত্মা মহাপ্রভুপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনা করেন। পদ্মাবৎকাব্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ আলওয়াল, করম আলি, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অনেকটা প্রীতির ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

হিন্দুমুসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও কেশব ছত্রী একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সনাতনের উপর পাতশাহের কতটা নির্ভর ছিল, তাহা চরিতামৃত হইতে জানা যায়।—

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥

মুসলমানগণ হিসাবনিকাশে পটু ছিলেন না বলিয়া হিন্দুগণের সাহায্য লইতেন। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দে মজুমদার, শিকদার প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত উপাধি হিন্দুগণের মুসলমান রাজসরকারের কর্ম্মসূচক। এক একটি বিভাগে মুসলমান আমিন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার অধীনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মজুমদার ও একটি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু শিকদার থাকিতেন। অনেক ব্রাহ্মণের খাঁ উপাধি ছিল—যথা সুবুদ্ধি খাঁ, সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি। মুসলমানগণ কবিরাজী মতেও চিকিৎসিত হইতেন। মুকুন্দ গুপ্ত রাজ-কবিরাজ ছিলেন।

একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥—চৈঃ চঃ।

আজকাল যেমন আমরা ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেছি, সেইরূপ মুসলমান আমলে অনেকে মুসলমান বেশ পরিতেন।

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ পড়ি হাতে কামান ধরিবে॥—জয়ানন্দ।

মহাপ্রভুর পরে যে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ আমরা একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব দলিল হইতে পাই। মুর্শীদ কুলি খাঁর সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া বহু তর্ক হয়। এই তর্কের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবগণ বিচার করা স্থির করিলেন। "বিচার মানিলাম, তাহা পাতশাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল। তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিন তজবিজে হয় না, অতএব বিচার কবুল করিলেন।" জয়পত্রে মুর্শীদ কুলি খাঁর সহি ও মোহর আছে।

কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিক মুসলমানগণের নিকট সাহায্য বা উৎসাহ না পাইলেও সাধারণতঃ বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিকগণকে অর্থ-সাহায্যে উৎসাহিত করিতেন।

কবি বিদ্যাপতি নাশির শাহার কাছে কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার একটি পদের ভণিতায় আছে,—

সে যে নাসিরা সাহ জানে
যারে হানিল মদন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

অর্থনৈতিক অবস্থা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসবের ভূরি বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে দেশের লোকের বিশেষ অর্থকষ্ট ছিল না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও কড়ি দ্বারা কর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় হইত। সনাতন গোস্বামী বহু স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিন মুদ্রায় ভোট-কম্বল পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুকে খুব পরিপাটী করিয়া খাওয়াইবার জন্য চারি আনার অধিক লাগিত না। আট কড়িতেই খাজা ও সন্দেশ পাওয়া যাইত।

রঘুনাথদাস—মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥—চৈঃ চঃ।

ভক্তমালের শ্রীনরসীভক্ত-চরিত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, তৎকালে দেশে এক প্রকার banking system ছিল।

এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেহ লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
কহে সে তুখর বড় দ্বারকার ধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ বেয়াপিয়া।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া॥

দেশে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হইত। রেল ষ্টীমার না থাকায় লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ ত্যাগ করিত। 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষা-প্রণালী

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই সারস্বত-কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার এই যুগে সাধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ সেই উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। ছাত্রগণ গুরুগৃহে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

নবদ্বীপে বহুতর ছাত্রের সমাগম হওয়ায় প্রত্যেক পণ্ডিতেরই অনেকগুলি করিয়া ছাত্র হইয়াছিল—সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পক্ষে সকল ছাত্রকে অন্নদান করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ছাত্রগণ ব্যাকরণ পড়িয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কলাপ ব্যাকরণই সমধিক আদৃত ছিল। নিম্নে তৎকালের দুইটি পাঠ্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

সুবন্ত দশনাকার পড়িল ষট্‌কারক।
সটীক কলাপ পড়ে সভার ব্যাপক॥
নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পঢ়িল একে একে॥—জয়ানন্দ।
শ্রুতিধর প্রভু পড়ে কলাপ ব্যাকরণ।
দৃষ্টিমাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরণ॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥—অঃ প্রঃ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও তৎকালে যথেষ্ট হইত—

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥—চৈঃ ভাঃ।

ছাত্র-জীবন

সে সময়ে ছাত্রগণ স্নান করিতে যাইয়াও পাঠ্য বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করিত। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের এই বিদ্যাকৌতুকলীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধীত বিদ্যার তর্ক হইতে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়াও কলহ হইত।

কেহো বোলে "তোর গুরু, কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বোলে "বোল এই আমি শিষ্য যাঁর॥"—চৈঃ ভাঃ।

বিদ্যা-প্রচার

Renaissance যুগের Florence-এর ন্যায় নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হইলেও, নবদ্বীপ একা এই সুবিধা ভোগ করে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যা পরিবেষণ করিয়া দিয়াছিল। নদীয়ায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গ্রীসের Sophistগণের ন্যায় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গমন করিয়া শিক্ষা দিতেন। মহাপ্রভু এইরূপে পদ্মানদীতীরে যাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছিলেন,—

মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কার ঠাঁই॥—চৈঃ ভাঃ।

সংস্কৃতবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবমালা, মুক্তাচরিত ও দানচরিত নামক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ নরোত্তমদাস ঠাকুর ও রামানন্দ রায় সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্য শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, অলঙ্কারকৌস্তভ, কৃষ্ণ ও গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যশতক সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর সংস্কৃতে গৌরগণার্চ্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষা সকলে লাভ করিতে না পারিলেও, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতে সাধারণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, উপাস্য দেবদেবীগণের লীলা ও স্তুতিবর্ণন-মূলক গান হইত, তাহাতে সকলে শিক্ষালাভ করিত।

এক স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থলে চৈতন্যভাগবত চরিতামৃত কয়॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তার পরে হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণলীলাগান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

ভাষা ও সাহিত্য

সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় দার্শনিক গ্রন্থ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মতস্থেরই অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। জীবনী, দর্শন, গান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, মনোবিজ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিভাগে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্না করিয়া তুলিলেন।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশ বসিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে "ব্রজবুলির" যথেষ্ট মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে তখনও ভাষার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ঈশানের অদ্বৈত-প্রকাশের ভাষার সহিত চৈতন্যভাগবতের ভাষা মিলাইলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান

মহাপ্রভু তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী 'ন শ্রুতিগোচারা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্মরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। "কর্ণানন্দে" শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বহু স্ত্রীশিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরো-ভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না। এই জাহ্নবাদেবী বঙ্গরমণী-কুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। বহু বৎসর ধরিয়া তিনিই বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার আজ্ঞাতেই খেতুরীর মহোৎসবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে, বঙ্গরমণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায়,—

সে দিবসে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥

রন্ধন-পরিবেষণ করিয়া বহু বার তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আমরা যতুনন্দনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যতুনন্দন দাস॥

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেন না, মুসলমান মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা পর্দ্দার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহারা সুবিধামত স্বামী বা আত্মীয়ের সহিত তীর্থযাত্রাও করিতেন।

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা অদ্বৈত সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ দাস সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥—চৈঃ চঃ।

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২৩৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাঁহার লিখিত।

পর্য্যটন

রেলগাড়ী না থাকিলেও লোকে দূরদেশে ভ্রমণ করিত। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর, অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর, চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এবং ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের বহুদূরব্যাপী পর্য্যটনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলেও ভ্রমণকারিগণ গমন করিতেন।

আমি করিলাঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি যত আছে পুরী॥—চৈঃ ভাঃ।

পথে দস্যু-ভয় হেতু পর্য্যটনকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিতেন। এইরূপ একটি দল দেখিয়া ভীত হইয়া রাজদূত প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে,—

পরঃ সহস্রাঃ সহসৈব পারে
চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢ়াঃ।

কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং
শ্রুতৈব কোলাহলমাগতোঽস্মি।—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮অঃ।

সঙ্কীর্ত্তন ও আমোদ-প্রমোদ

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই মহাপ্রভূ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে নূতন নহে—শ্রীমদ্ভাগবতে "কলৌ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" বাক্য আছে। বৌদ্ধগণের দোঁহাও সঙ্কীর্ত্তনরূপে গীত হইত। কিন্তু মহাপ্রভূ সেই সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে নব ভাবের উন্মাদনা দিয়া তাহার নব-প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাটী কীর্ত্তনের রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া খেতুরীর মহোৎসবে ঐ সুরে কীর্ত্তন করেন।

কেহো কহে ঐছে গীতবাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥
কেহ কহে মহাপ্রভূ স্বরূপের মুখে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীত প্রথারক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিত্তে॥
সে সময় তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তমদ্বারে প্রভূ এবে উঘারিল॥—ভক্তি-রত্নাকর।

বঙ্গের জনসাধারণ যে কীর্ত্তনরসে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পরবর্ত্তী কালে উৎপত্তিস্থানানুসারে মনোহরসাহী, রেণেটী ও মন্দারণ নামে আরও তিনটী কীর্ত্তনশাখা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত প্রকার নামকরণ হইতে বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভূর লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কীর্ত্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টিকর্ত্তা। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, সরকার ঠাকুরের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হৈল মনে॥

বৃন্দাবনদাসও অধিবাসের একটি পদে গাহিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।—গীতরত্নাবলী।

অনেকের ধারণা, মহাপ্রভু মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

লোকে চিত্তবিনোদনের জন্ত নাটক অভিনয় করিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক "রুক্মিণী" নাটক অভিনয়ের কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, দানকেলীকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি নাটক আছে।

লোকে পরম আগ্রহের সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগিপাল, মহীপালের গীত গান করিত। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৈর্য্যশালিনী নায়িকার লক্ষণে বানর পোষার কথা দেখা যায়, "হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং"। পাশাখেলা এ দেশে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার বর্ণনা আছে।

রাই যব ধরি জিতই লাগল
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।—গোবিন্দদাস।

ফাগুখেলায় খুব আনন্দ হইত,—

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পিছে॥—নরোত্তমবিলাস।

চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য

চিত্রবিদ্যা দেশে সুপ্রচারিত ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নরনারী অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন—

তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥—যদুনন্দন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও তৎকালীন বাঙ্গালার বহু মন্দির দেশের স্থাপত্য-বিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দির ও মূর্ত্তি-শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে,—

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিবিধায়িনঃ।
শিল্পিনোঽভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈঃ দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ॥

পারিবারিক জীবন

সমাজে দশকর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ছয় মাসের সময় অন্নপ্রশান ও নামকরণ হইত,—

এক দুই তিন করি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কার ভূষিত সোনার কলেবর॥—চৈঃ মঃ।

পাঁচ বৎসরের সময় হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হইত।

পাঁচ বৎসর প্রভুর হইল বয়স।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ॥
মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়।
হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময়॥
আগে দিলা হাতে খড়ি পড়িবার তরে।
যাহে চৌষট্টি বিদ্যা জিহ্বা অগ্রে স্ফূরে॥
তবে করি চূড়াকর্ণ সংযোগ আপার।
নানা বিদ্যাগুীয় আনি করিতে বিচার॥—চৈঃ মঃ।

চূড়াকরণের সময় বেদপাঠ ও যজ্ঞ হইত,—

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥—চৈঃ মঃ॥

উপবীতকালেও যথেষ্ট ধূমধাম হইত,—

যজ্ঞকর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দূর পড়িল॥—চৈঃ মঃ।

সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নরোত্তমের—

বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর।
রূপ দেখি পিতামাতার আনন্দ অন্তর॥
বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে।
বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥—প্রেঃ বিঃ।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বার বৎসর কালে হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—

বৈষ্ণবের অনুরোধে বিবাহ করিল।
কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥—কর্ণানন্দ।

বিবাহে সামাজিক ভোজনের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লেখ নাই।

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে।"

বলিয়া নিমন্ত্রণ হইত এবং নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলে,—

তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্যমালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥

শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বূল দেন একো জনে ॥ —চৈঃ ভাঃ।

আধুনিক কালের ন্যায় তখনও বিবাহের মিছিল বাহির হইত,—

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলেন হইয়া দুই সারি পাটোয়ার॥

বর কন্যার বাটী আসিলে পর নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহাকে বরণ করা হইত,—

হাথেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস॥
আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী।
বর উরখিতে ধনী চলিলা আপুনি॥
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দীপ হাতে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে॥—চৈঃ মঃ।

শুভদৃষ্টির সময়,—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥—চৈঃ ভাঃ।

ভাটগণ আসিয়া বর ও কন্যাকুলের গুণকীর্ত্তন করিত। যথা,—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।—চৈঃ ভাঃ।

বরপণপ্রথা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর বিবাহের সময় আজিকালিকার ন্যায় বরের দর-কষাকষি হয় নাই। বরপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষের নিকট প্রস্তাব গিয়াছিল। তবে কন্যাকর্ত্তা যথেষ্ট যৌতুক বরকে প্রদান করিতেন। যথা,—

তবে দিব্য ধন ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসরে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার বর্ণনা চৈতন্যমঙ্গলে আছে। অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের কোন উদাহরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশচীমাতাকে যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তৎকালে বধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর এই সেবাপরায়ণা মহিলার কাহিনী হইতে বুঝিতে পারি। অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের চিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে সবিশেষ অঙ্কিত হয় নাই। অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছিলেন। বালক নিমাই তাঁহার আহার্য্য তিন বার নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মিশ্রের আক্ষেপ হইতে আমরা অতিথির প্রতি গৃহস্থের যত্নের পরিমাণ অনুমান করিতে পারি।

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥—চৈঃ ভাঃ।

গ্রাম্য-নিবেশ

প্রত্যেক গ্রামই স্বসম্পূর্ণ ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ব্যতীত তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক্, মালাকার, তাম্বূলী, শঙ্খবণিক্ ও সর্ব্বজ্ঞ বাস করিত, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভুর নগরভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষী থাকা আমাদের নিকট বিচিত্র বোধ হইতেও পারে, কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুসমাজ জ্যোতিষীর মত না লইয়া কোন শুভ-কার্য্যে হাত দিতেন না। চণ্ডীদাসেও আছে, শ্রীকৃষ্ণ—

গ্রহবিপ্রের বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে॥

বিলাতী এসেন্স ব্যবহৃত না হইলেও আমাদের দেশে সুগন্ধি দ্রব্যের বা সৌখীনতার অভাব ছিল না। মহাপ্রভুকে গন্ধবণিক্ বলিতেছে,—

আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হিন্দুপল্লীর স্নানের ঘাটের যে মনোহর বর্ণনা আছে, নিজে না পড়িলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। নবদ্বীপের ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ জলে আবক্ষ ডুবিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—কেহ বা তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। হিন্দু কুমারীরা নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে শিবপূজা করিতেছে—মহিলাগণের শাড়ীতে শাড়ীতে ঘাট আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সহরবাসী বাঙ্গালীর নিকট এ মধুর হিন্দুচিত্র কোন স্বপ্ন-রাজ্যের বলিয়া প্রতীত হয়।

বিবিধ

সের শাহ কর্ত্তৃক ডাক-প্রথা স্থাপিত হইলেও সাধারণে তাহা ব্যবহার করিতে পাইত না বা করিত না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে লোক-মারফৎ পত্রাদি প্রেরণের কথাই পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ যে সংস্কৃতেও পত্রাদি লিখিতেন, তাহা কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তৎকালে দেশে মটর-গাড়ী না থাকিলেও ধনিগণের বিলাসবৈভবের কিছু ত্রুটি হইত না।

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহু মতে॥—চৈঃ ভাঃ।

সুসজ্জিত হইবার জন্য পুরুষেও অলঙ্কার পরিত। অলঙ্কারের মধ্যে চৈতন্যভাগবত ও পদাবলী হইতে নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির নাম পাওয়া যায়—সুবর্ণের অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল, নুপুর, মল্ল প্রভৃতি। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ডে নবদ্বীপ-বর্ণনায় তৎকালে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। সৌখীন দ্রব্যসমূহ ঘরে ঘরে ফিরি করিয়া স্ত্রীগণও বিক্রয় করিত। চণ্ডীদাসে আছে,—

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন অমলা বণ্টন
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক কস্তূরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।

পূর্ব্বকালেও দেশী কনসার্ট বাদ্য বাজিত। চৈতন্যমঙ্গলে আছে,—

বীণা বেণুক বিলাস বংশীর নিসান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান॥

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল,—

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর (ভেরী) কাহাল (ঝাঁঝ)।
মৃদঙ্গ গড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের দুড়দুড়ি শুনি যোজনের পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহীনি শবদে॥—চৈঃ মঃ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলে তদানীন্তন খাদ্যসামগ্রীর এমন সকল বর্ণনা আছে যে, পড়িতে পড়িতে প্রসাদ পাইবার দুরন্ত লালসা মনে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের এমন একটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া আমরা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি পালন করিব।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারি দিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকারের শাক. নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড. বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥

নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলী আর কত পিষ্ট ॥
কারিজবড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের কাদম্বরীর তর্জ্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, —আহা! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই ত লেখার গাম্ভীর্য্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গালা ধরেন। এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমোদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্গালায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না, মলাটে লেখা ছিল, "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।" টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান,

সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন—তাঁহার নাম ছিল টেঁকচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালে"র মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকায়" অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্তদর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার "অভেদী"তেও এই রকম দর্শনশাস্ত্রের কথা আছে। মাসিকপত্রিকায় তিনি যে সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছিলেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কি করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চৌচাপটে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দুকলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি বাড়ীতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশী করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপ-পিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেটকাফ কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারীবাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেটকাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারী ও সেখানে যে পবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত শিক্ষিত ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ হল তখন বড় রকম একটা পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজীওয়ালাই বেশী। বাঙ্গালী-সমাজের কোনও বিপদ্ সম্পদ্ উপস্থিত হইলে, একটা বড়

রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাহাতে একহাত আছেনই আছেন। কিন্তু কোথাও প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজীতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভাসমিতির কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই হইত; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের নামে যে কোনও কার্য্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্য্যটীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এ্যানিভারসারি প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য্য ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হেয়ার সাহেব যে কয় বচ্ছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি ষোল বচ্ছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোল বচ্ছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া মানুষ হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পাল্কী করিয়া বাহির হইতেন। পাল্কীতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পাল্কী করিয়া সারা কলিকাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ যে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজী শিখিবার জন্য একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙ্গালী মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের। ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের

ব্রাহ্মসমাজের—সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পড়িতেন ও পুরাণ তর্জ্জমা করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্‌যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্ণমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি "কোলস্‌ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট" সাহেবের জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং "প্রিভেন্‌সন্ অব ক্রুয়েল্টি টু আনিম্যালস্" নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমত যাতে কার্য্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে "স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের" উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।" সেটী চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so strong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only

a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritance In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

Page 7 of the Spiritual Stray Leaves by Peary Chand Mittra.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের নিজের উপকারের জন্য—তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজমের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষায় খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়," ইহা সেই ভাষা—যে হেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দ্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন "নবনারীকুঞ্জ" হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠকচাচা আর বাহুল্য, দুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল—বাবাও মারা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়ীখানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাঙ্গালা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখতে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে—উঁচু নীচু, এবড়োখেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বললেও হয়। তারপর সে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডী। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধু ভাষা, মাজা ঘষা, শুনতে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ

পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। সে ইংরাজী-বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে দুর্ব্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাঙ্গালায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব।— প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজ। মদখোর কথাটা তখনও চলিত ছিল না, এখনও নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্‌খোর চলিত, কিন্তু মদখোর চলিত নহে। বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড় শ্রুতিকটু—বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পাণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশ-দোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ—প্যারীচাঁদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখ্‌চেন—হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন চোখের উপর ভাস্‌ছে। বইগুলি যেন একখানি এলবাম্—তাতে কত কত পুরাণ ছবি রয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে" ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী, পেটীজুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার (Humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক আলঙ্কারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার বড় ভালবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজাভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠক্‌চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু

মণিরামপুরের মাধববাবু, বটপার সাহেব, জান্ সাহেব, ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অম্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, ঠেঁকোবাবু, বাবুসাহেব, লালবুঝকড়, হরদেব তর্কালঙ্কার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা—সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণীও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রথম প্রথম তিনি যেন সাহেবীয়ানার দিকেই বেশী চলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই"। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার "অভেদী," তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" উচ্চ অঙ্গের হিঁদুয়ানী শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিন্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামীর বড় বিরোধী ছিলেন। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্ম্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসমলমানসমাজ, ক্রীষ্টানসমাজ—সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্‌যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্য্যের ভার লওয়া উচিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুরুলিয়ার পাখী

পুরুলিয়াতে লোকে পাখীর খোঁজে আসে না, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার জন্তই আসে; অবশ্ত যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে এখানে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানভূম জেলার অধিবাসী-দিগের কথাও স্বতন্ত্র। আগন্তুক বাঙ্গালী যদি আমাদের মত শীতের প্রারম্ভে অবসরকালে চিত্ত-বিনোদনের জন্ত নিজের স্বাস্থ্যের বা অস্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ আযোধ্যার পাহাড়ে, কাঁসাই নদী-তীরে, রাণীবাঁধে অথবা সাহেববাঁধের বুকের উপরে কুঞ্জবনে পাখীর বিচিত্র জীবনলীলা দেখিয়া আনন্দ পান, তাহা হইলে সেই আনন্দ তাঁহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার পক্ষে কতকটা অনুকূল হইতে পারে। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধ বা শিকারীর চক্ষে এই সমস্ত বন্য বিহঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি না, পাখীকে আমাদের ভোজ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে আর যে ফল পাওয়াই যাক, অনাবিল আনন্দরসটুকু পাওয়া যাইবে না।

মানভূম জেলার প্রায় মাঝখানে এই পুরুলিয়া নগর; ইহার বুকের উপর দিয়া বড় বড় রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত; কোনওটা রাঁচি পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে সংসর্পিত, কোনওটা দক্ষিণে পার্ব্বত্য ভূমির ভিতর দিয়া চৈবাসার দিকে চলিয়া গিয়াছে; একটা প্রশস্ত রাজপথ উত্তরে বরাকরাভিমুখে প্রসারিত; কোনওটা বাঁকুড়ার দিকে, কোনওটা মানবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বড় বড় অশ্বত্থ, শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া, জাম, আম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের শ্রেণী। দক্ষিণে দূরে বাঘমণ্ডী গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তর অত্যন্ত বন্ধুর; মাঝে মাঝে শুষ্কগর্ভ নদীর মত নাতিগভীর দীর্ঘবিসর্পিত 'খাত'; সহরের মধ্যে ও চারিধারে ছোটবড় অনেক-গুলি "বাঁধ",—সাহেব বাঁধ, নাজির বাঁধ, ঢুল্‌মি বাঁধ, বুড়িবাঁধ, ভাটবাঁধ, আরও কত কি বাঁধ-নামধেয় ছোট বড় জলাশয়। সহরের দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদী; আরও দক্ষিণে বাঘমণ্ডী পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্তরেখায় প্রবহমানা সুবর্ণরেখা; দূরে উত্তরে দামোদর; আরও উত্তরে মানভূমের প্রান্তসীমায় বরাকর নদী প্রবহমানা। ভূতত্ত্ববিৎ এখানকার মাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় ত যুগযুগান্তরবিন্যস্ত যে সকল পাথরের কথা তুলিবেন, মানভূম জেলার মৃত্তিকা এবং মৃদ্‌ভেদী পাষাণ ও খনিজপদার্থসংশ্লিষ্ট বিবিধ ভূস্তর-প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন, তাহা পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ কথা বোধ হয়, কেহ কেহ একেবারে স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাষাণের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক যে নিগূঢ় নৈসর্গিক সূত্রে গ্রথিত, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূস্তরবৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম বৃক্ষাদির উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল; ঐ সকল লতা গুল্ম বৃক্ষ আবার বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গের স্বভাবতঃ প্রিয় আশ্রয়স্থল। কাঁসাই-দামোদর-বরাকরধৌত মানভূমের বুকের উপরে, বাঘমণ্ডী-পঞ্চকোট ঝালদে-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; নগরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য ছোট বড় বাঁধ; সর্ব্বত্র বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও মাঠের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ঘন ঝোঁপ; কোথাও ঘন মহুয়া-কেঁদ-

কুসুম-পিয়াল-শিমুল-শিরীষ-হরিতকী-অর্জুন-করঞ্জ-আমলকি-পলাশ-লিপিস-নিমের নিবিড় কানন প্রান্তরভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মানভূমের আদিম অধিবাসী যেমন একান্ত মানভূমেরই সামগ্রী, তেমনই তাহার ভূস্তরের উপরে এই সকল বাঁধের ধারে, নদীতীরে, বৃক্ষশ্রেণীর উপরে, ঝোপে ঝাপে, কাননাভ্যন্তরে যে সকল পাখী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মানভূমী আখ্যায় পরিচয় লাভ করিবার সময় মনে হয় যে, এই সকল কাওয়া-ঢেবচু-হোড়াল-পাঁড়কি-ক্যারক্যাটা-সাম্‌কাহাল-রূপো-কাঁড়োর-বনকুঁকড়ির পক্ষে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনই বিশেষ ভাবে অনুকূল; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত মানভূমেই থাকিবে, পার্শ্ববর্ত্তী সিংভূমে বা ছোটনাগপুরে থাকিতে চাহে না। অনুসন্ধিৎসু, বৃক্ষাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই পক্ষিসংস্থানের ভিতরের কথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। ভূবিদ্যার সহিত উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও বিহঙ্গ-বিদ্যার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই স্থানবিশেষে প্রাণিবিশেষের পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া এই সকল কথার অবতারণা বিজ্ঞান হিসাবে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে; যিনি যে কোনও জেলার যে কোনও জীবের বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন; এই জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা বহুল পরিমাণে ঋণী। পাখীর কথাই ধরা যাক্‌। মানভূমে যে সকল পাখী দেখা যায়, তাহাদের চলাফেরা, উড়াবসা কোনও নিয়মে শৃঙ্খলিত কি না; কোনও কোনও পাখী দিবাভাগে কোনও বিশেষ দিক্‌ হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রত্যহ দিগন্তরে চলিয়া যায় কি না; এই নদী, বাঁধ, গাছ পাথর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট পক্ষিজাতির অবস্থান তাহার জীবন-সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল কি না এবং সিংভূম ছোটনাগপুরে ভূস্তরের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের জীবনযাপনের উপযোগী বৃক্ষাদি বা জলাশয়ের অভাব আছে কি না, এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া পক্ষিবিশেষজ্ঞ করিয়া থাকেন। এ কার্য্যে ব্রতী হইলে কোনও পাখীকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা অন্যত্র অন্য আবেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি মানভূমে তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অন্ততঃ তাঁহার Distribution কোঠায় দৃষ্ট বিহঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন; উপরন্তু যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে পাখীকে অন্যত্র তিনি যাযাবর দেখিয়াছিলেন, এখানে সে স্থায়ী অধিবাসী, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত তথ্য তাঁহাকে যে আনন্দ দান করিবে, তাহার কথা না তুলিলেও ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তিনি পক্ষিবিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন।

মানভূম জেলার ভৌগোলিক অধিষ্ঠান মানচিত্রের ২২°৪৩′ ও ২৩°৪′ উত্তর লম্বিমান্তর বা latitudeএর মধ্যে এবং ৮৫°৪৯′ ও ৮৬°৫৪′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর বা longitudeএর মধ্যে। এই সামান্য ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ নহে। ঋতুবিশেষে এই লম্বিমান্তর ও দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ পাখী আনাগোনা করে, তাহাই প্রথমে অনুসন্ধানের এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জেলার মধ্যে সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি বড় বড় নদীর গতিরেখা, ছোট ছোট হ্রদ এবং ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি, বন জঙ্গল, এই সমস্তই পক্ষি-

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিবরীভূত। তা ছাড়া ইহার চারি পার্শ্বে, এই লঘিমান্তর দ্রাঘিমান্তরের বাহিরে উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে সিংভূম, পূর্ব্বে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলাগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। মানভূম জেলার পাখীর আনাগোনা আলোচনা করিতে বসিলে আশপাশের জেলাগুলি মানভূমের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই মানভূম জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ২৩°২০′ উত্তর লঘিমান্তরের ও ৮৬°২২′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই পুরুলিয়ার পাখীগুলির সহিত মানভূমের অন্তর্গত আশপাশের চারিদিকে গ্রাম নদী পাহাড় জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং বিস্মিত হইলে চলিবে না, যদি মানভূম জেলার কাছাকাছি বাঙ্গালার অথবা ছোটনাগপুরের কোনও পাখীকে মানভূমের মধ্যে, তথা পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার পাখী বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাখীটি কেবল পুরুলিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমের অন্যত্র বা বাহিরে পাওয়া যায় না।

পাখীর তালিকায় প্রথমেই বায়সের নাম করিতে হয়। কাক ঘরে বাহিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসতর্ক গৃহস্থের সযত্নরক্ষিত আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি এবং নিঃশব্দ চৌর্য্যবৃত্তি সকলকে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ডুমরাকুড়ির মত অতি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কাকের অনুপাতে দাঁড়কাক বেশী বলিয়া বোধ হইল। তবে কাকের মত তাহাকে নির্ভীক বলিয়া মনে হইল না। লোকালয়ের কাছে আবর্জ্জনার প্রতি তাহার লোভ বেশী।

বায়স, Corvus splendens

C. macrorhynchus, দাঁড়কাক

আশ্বিনের মাঝামাঝি দেখা গেল যে, সালিকের গৃহস্থালী এবারকার মত শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও অনেক স্থলে শাবকগণ এখনও তাহাদের জনক জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই; মাঠের উপরে খাদ্যের জন্য তাহাদের জননীর অনুসরণ করিতেছে। ধাড়িগুলার পুরাতন পালক খসিয়া গিয়া এখনও নূতন পালক গজায় নাই; বুড়া সালিকের ঘাড়ে রোঁ চাক্ষুষ দেখা গেল, তবে এই রোঁ ঠিক রোম বা লোম নহে, মাথার ও ঘাড়ের অনাবৃত ত্বকে যে কালো কালো খোঁচার মত দেখা যায়, উহা নবীন পতত্রোদ্গমের পূর্ব্বাভাস। বটফল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এ সময়ে প্রচুর; ইহারাও সংখ্যায় খুব বেশী। স্নিগ্ধ প্রভাতে ও প্রখর মধ্যাহ্নে নানা জ্ঞাতি-পরিজন-পরিবৃত হইয়া কল-কোলাহলে রাজপথ ও সাহেববাঁধ মুখরিত করিয়া তোলে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি দেখিতেছি, বুড়া সালিকের ঘাড়ে ঘন পতত্রোদ্গম হইয়াছে, মাথার রং বেশ কাল দাঁড়াইয়াছে; পুচ্ছ এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, পুচ্ছের পালক এখনও ছোট বড়, পুচ্ছপ্রান্তে কোথাও কোথাও শ্বেতবর্ণ প্রকট।

সালিক, Acridotheres tristis

গো-সালিকের বাসা আশ্বিন মাসে অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া গেল; সে সকল বাসা কিন্তু তখন পরিত্যক্ত। শাবকগুলির পালক বাহির হইয়াছে; তাহারা খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে; ভোজ্য কীটের অন্বেষণে গোময়পুরীষাদি ঘাঁটিতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ দেখিলেই ইহাদিগকে সহজে গো-

গো-সালিক, Sturnopastor contra

সালিকের শাবক বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে,—রংটা মোটের উপর মেটে মেটে, অর্থাৎ ধাড়িগুলার মত সাদা রংটা পরিষ্কার সাদা নহে, কালোটাও খুব উজ্জ্বল নহে; ঠোঁট লালচে না হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ; আয়তনে ছোট। প্রধানতঃ কীটভুক্ হইলেও ফলভরাবনত অশ্বত্থ-বট-শাখায় দল বাঁধিয়া অন্যান্য জাতি পরিজনের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে ইহাদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় ইহারা এত বেশী যে, অতি প্রত্যূষেও ইহাদিগকে দলে দলে গাছের উপরে, মাঠে, সাহেব-বাঁধে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এখানে বাঁধের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই সেই সকল বাঁধের কাছাকাছি এই পাখীর সংখ্যাও খুব বেশী; তাহা ছাড়া অনেক নীচু জমি এখন জলাশয়ে পরিণত, সেগুলায় জলচর পাখী যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার চেয়েও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আশে পাশে বিচরণশীল গো-সালিক। অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকাই ইহাদের স্বভাব; এত অধিক গো-সালিকের ঝাঁক পশ্চিম-বাঙ্গালায় এ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া যেখানে রাত্রি যাপন করে, সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের শাখায় অবতরণ করে। মধ্যাহ্নে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখান হইতে সহসা এক ঝাঁক গো-সালিক শূন্যে উড়িয়া কিয়দ্দূরে নামিয়া পড়ে, এরূপ দৃশ্য পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝালদের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ইহাকে দেখিতে পাইলাম না।

পাউই, Sturnia malabarica

পাউই সালিকেরই জাতি, Sturnidæ পরিবারভুক্ত। ইহাদের মাথা ও ঘাড়ের রং সাদাটে, বুক ও পেট লালচে; পিঠের রং ধূসর। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের উড্ডীন গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কীটভুক্ হইলেও ইহারা বন্য ফল খাইতে বড় ভালবাসে; তাই ইহারা বড় বড় বট অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্যান্য সালিকের সহিত অধিকক্ষণ যাপন করে। লোকালয়ে আসিতে ইহারা সঙ্কোচ বোধ করে; সেই জন্য ইহাদের অপরাপর জাতিবর্গের ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।

Temenuchus pagodarum

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণশির পাউইকে অতি অল্পই দেখা যায়। লোকালয়ের মধ্যে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে, বাগানের ঘাসের উপরে এই পাখীকে মাত্র দুই এক বার দেখিতে পাইলাম।

Pastor roseus; A. ginginianus

গোলাপি সালিক ও গাংসালিক আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কোথাও আমাদের চোখে পড়িল না, অথচ ঋতুবিশেষে গোলাপি পাখীটাকে সাহেববাঁধের দ্বীপে বহুল সংখ্যায় দেখা যায়; আর গাংসালিক বোধ করি এখানকার পাখী নহে।

কালো বুলবুল, Molpastes hæmorrhous

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা বুলবুল দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কোনওটাকেই দেখা গেল না। যে কালো বুলবুল পুরুলিয়ার পথের পার্শ্বে বাগানে ঝোঁপের ধারে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই একটা বর্ণবৈষম্য ও দেহায়তনের তারতম্য ধরা পড়ে।

কালো রংটা মাথার উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত না হইয়া স্কন্ধদেশেই থামিয়া গিয়াছে; মোটের উপর পাখীটি তাহার বঙ্গীয় জ্ঞাতির (M. bengalensis) চেয়ে কিছু কম কালো, আয়তনেও সে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

কাংড়া বুলবুলের (Otocompsa emeria) কথা মানভূমের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু নগরে বা নগরোপান্তে অথবা ঝাল্দের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি কাংড়াও আমার নয়নগোচর হইল না। বুলবুল যাযাবর নহে; স্থায়িভাবে স্থানবিশেষে ভারতবর্ষে অবস্থান করে। মানভূমের অধিবাসী হইলে তাহাকে নিশ্চিতই দেখিতে পাইবার কথা।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে জরদ্ বুলবুল (Otocompsa flaviventris) আমাদের চোখে পড়ে, মানভূমের পাহাড়তলী জায়গায় তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; যদিচ একজন মাত্র বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের রচিত তালিকায় সে ঢোলভূমের পক্ষিগণভুক্ত হইয়াছে।

হল্‌দে পাখী

বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার হল্‌দে পাখী আমাদের নিকট পরিচিত,—(১) কৃষ্ণগোকুল (Oriolus melanocephalus), ইহার মাথা, ঘাড় ও গলা কৃষ্ণবর্ণ; (২) কাজলগৌরী (Oriolus indicus), ইহার মাথার পিছনে অর্দ্ধবৃত্তাকার কৃষ্ণরেখা। প্রথমটি বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী; দ্বিতীয়টি কিন্তু যাযাবর। শীত ঋতুতে তাহাকে কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূমে এই দুটিকে ত দেখিতে পাওয়া গেল; তাহা ছাড়া আর একটি হল্‌দে পাখী দৃষ্ট হইল, উহার চোখের কোণে কালো রেখা, কিন্তু মাথাটা সম্পূর্ণ হল্‌দে। এই শেষোক্ত পক্ষীর বৈজ্ঞানিক অভিধা Oriolus kundoo; সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক; সমস্ত দিন বৃক্ষের পত্রান্তরালে ইহাদের কল কূজন শ্রুত হয়; কণ্ঠস্বর যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করা যায় যে, পুংপক্ষীটা হয় ত স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও শাখায় বসিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে।

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণগোকুলের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হইল, যদিচ ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাহার প্রাচুর্য্যের কথা কোনও কোনও বিদেশীয় পক্ষিবিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজল-গৌরী পুরুলিয়ায় নেহাৎ কম নহে; অথচ একজন ইংরাজ মানভূমের কোথাও ইহার দেখা পান নাই, রাজমহল পাহাড়ে দুই একটা দেখিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তদানীন্তন ছোটনাগপুরের কোথাও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানভূম তখন ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল।

মাছরাঙা, Halcyon smyrnensis

মানভূম অঞ্চলে মাছরাঙার চালচলনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই, ঠিক বঙ্গদেশের মত জলাশয়ের ধারে ভক্ষ্য জীবের অপেক্ষায় গাছের উপর বসিয়া থাকিতে অথবা মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়; কখনও বা ভূমির উপরে সঞ্চরমান কৃমিকীট দেখিয়া হয় ত সে গাছ হইতে সহসা অবতরণ করে, অথবা কণ্ঠস্বরে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া বন্ধুর প্রান্তরের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

'সাহেববাঁধ' এবং অন্যান্য জলাশয়ের ধারে মাছরাঙার একটা ক্ষুদ্রকায় জাতিকে মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়। বড় মাছরাঙার মত কৃমিকীট ভক্ষণ করা ইহার অভ্যাস নহে, কেবলমাত্র মৎস্যই ইহার ভক্ষ্য; এই জন্যই বোধ করি, ইহাকে বাঁধের ধারে ভূমির উপর অথবা অনতিউচ্চ গাছের ডাল হইতে অব্যর্থ সন্ধানে জলমধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়।

মাছরাঙা, ছোট
Alcedo ispida

বড় মাছরাঙার মৎস্যশিকার চেষ্টা হাস্যকর; গাছের উচ্চ ডাল হইতে সবেগে বার বার জল-মধ্যে পতিত হইয়াও সে প্রায় একটিও মাছ চঞ্চুপুটে ধরিতে সমর্থ হয় না; তাহার এই ছোট জাতিটি কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু ধরিয়া আনে। কৃমিভুক্ না হইলে বড়টির জীবন ধারণ করা কঠিন হইত; আর এমন অব্যর্থ সন্ধান না থাকিলে ছোটটিও জীবন-সমরে পরাজিত হইত। বর্ণে ও কণ্ঠস্বরে উভয়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তবে ছোটটির কণ্ঠস্বর বড়টির মত তীব্র নহে। এই ছোট মাছরাঙার একটি অত্যন্ত নিকট জাতিকে মানভূমের জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে কখনও কখনও মৎস্য শিকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। এই দুটির মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য বড় বেশী নাই।

Alcedo beavani

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ লাহা

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী

সৈয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুসলমান-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচ্চপদস্থ কবি ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার স্থান ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু তাঁহাকে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার একমাত্র বাজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহা হইতে বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব অনেক প্রাচীন হিন্দু কবির কাব্যের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের এবং ক্ষোভের বিষয় যে, তিনি তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মী এই কবির প্রতি আজও বিমুখ রহিয়াছেন।

বাজার-সংস্করণে পদ্মাবতীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতেছি,—

প্রথমে প্রনাম করি এক করতার ॥
জেই প্রভু জিবদানে স্থাপিল সংসার *
করিল পর্ব্বত আদি য়োতির প্রকাশ ॥
তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস *

দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (১৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) আলাওলের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ॥

উদ্ধৃত অংশে দীনেশবাবু বাজারের পুথির কেবল বানান সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। "পর্ব্বত আদি জ্যোতির" কোন অর্থ হয় না। পাদটীকায় কবি-লাস শব্দের অর্থে তিনি বলিতেছেন,—"কবির লাস অর্থাৎ আদিকবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা।" এই অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাজার-সংস্করণ হিন্দী পদ্মাবতীতে আছে,—

কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাশূ।
কীন্হেসি তিনহি প্রীতি কৈলাশূ ॥ †

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† Asiatic Society of Bengal এর সংস্করণ পদ্মাবতির পাঠ,—

কীন্হেসি প্রথম জোতি পরগাসূ।
কীন্হেসি তেহি পরবত কবিলাসূ ॥

অর্থাৎ তিনি প্রথম জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। (পরে) তাঁহার প্রীতিতে কৈলাশ করিলেন। এখানে কৈলাশ শব্দের অর্থ স্বর্গলোক। এখানে দরবেশ মলিক মুহম্মদ জায়সী ইস্‌লাম শাস্ত্র অনুযায়ী সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই মতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আদি জ্যোতিঃ (নূরে মুহম্মদী) সৃষ্টি করেন। পরে তাঁহার প্রীতির জন্য বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন। অন্য স্থানে হযরতের গুণ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,—

কীন্হেসি পুরুখ এক নিরমরা
নাউঁ মুহম্মদ পুনিউঁ করা॥
প্রথম জোতি বিধি তেহি কই সাজী।
অউ তেহি প্রীতি সিসিটি উপরাজী॥

A. S. B. সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয়, বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

করিল প্রথমে আদি-জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল যেই কবিলাশ॥

ইহার অর্থে বলা হইয়াছে—জিস নে পহিলে জ্যোতিঃস্বরূপ (মহাদেব)কো প্রকাশ কিয়া ঔর তিসকে লিয়ে কৈলাস পর্ব্বতকো কিয়া। (মসলমানোঁ। মেঁ কহাবত হৈ কি হিংদুওঁকা মহাদেব হমারে লোগোঁকা আদম হৈ)। এখানে কবিলাস=কৈলাশকে মহাদেবের কৈলাশ মনে করায় ভ্রম হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু স্থানে কবিলাস স্বর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; যথা,—

সাত সহস হসতী সিংঘলী।
জনু কবিলাস ইরাবতী বলী॥ A. S. B. সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ।

অর্থাৎ সিংহল দেশে সাত সহস্র হস্তী, যেন স্বর্গে (=কবিলাস) বলী ঐরাবত।

উঁচী পঁবঁরী উচ অবাসা।
জনু কবিলাস ইঁদর কর বাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ।

অর্থাৎ উঁচু দেউড়ী, উঁচু আবাস, যেন ইন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গ (=কবিলাস)।

কংচন বিরিখ এক তেহি পাসা।
জস কলপতরু ইঁদর কবিলাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ।

অর্থাৎ তার পাশে এক কাঞ্চন বৃক্ষ, যেমন ইন্দ্রের স্বর্গে (=কবিলাস) কল্পতরু।

বরনউঁ রাজ মঁদির রনিবাসূ।
অছরিন ভরা জানু কবিলাসূ॥ ঐ সংস্করণ, ৭৫ পৃঃ।

অর্থাৎ রাজমন্দির রাণী-নিবাস বর্ণন করি। সেগুলি যেন অপ্সরা-ভরা স্বর্গ (=কবিলাস)। ইত্যাদি বহু স্থানে। A. S. B. সংস্করণের অবলম্বিত দুইখানি পুথিতে 'পরবত' স্থানে 'প্রীতি' আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ। প্রথম জ্যোতি হযরত মুহম্মদ, মহাদেব নহেন। মহাদেব যে আদম, এ কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নাই। আমি যে অর্থ দিয়াছি, তাহা গ্রন্থকারের অন্য শ্লোক দ্বারা সমর্থিত।—লেখক।

পুথির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে,—

কাকে কল্য নির্ব্বলি কাহাকে বলি আর ॥
হাড় হস্তে নিম্মিয়া করায় পুনি হাড় *

দীনেশ বাবুর সংশোধিত পাঠ,—

কাকে কল্য নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড় ॥

তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন,—অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন। এখানে অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। হিন্দী পুস্তকে আছে,—

কীন্হেসি কোই নিভরোসী, কীন্হেসি কোই বরিআর।
ছারহি তই সব কীন্হেসি, পুনি কীন্হেসি সব ছার ॥

—A. S. B. সংস্করণ, ৫ পৃঃ।

অর্থাৎ কাহাকে দুর্ব্বল (নিভরোসী) করিলেন, কাহাকে বলবান্ করিলেন। ধূলি (ছার) হইতে সব তিনি করেন, পুনরায় সকলকে তিনি ধূলি করেন। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

কাকে কৈল নির্ব্বলী, কাহাকে বলী আর।
ছার হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি ছার ॥

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ ॥
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন *
সপ্ত মহি সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত মত ॥
সপ্ত সুন্ন তরী যদি সৃজয় বেকত *
এ সপ্ত সাগর আদি জতো নদা নদী ॥
দিঘী পুস্কর্ণি কুপ অহি হয় যদি *
জতো বিধী নবগৃহ আর বৃক্ষ সাখা ॥
যত লোমা বলি আর জতো পক্ষি পাখা *
পৃথিবীর জতো রেনু স্বর্গে জতো তারা ॥
জিব বস্ত স্বাস আর বরীখের ধারা *
জোগে জোগে বসী জদী অস্তত লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহী হয় *

দীনেশবাবু ইহার কিছু অংশ (সম্ভবতঃ অবোধ্য বিবেচনায়) বর্জ্জন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্ত ভরি যদি সৃজয় জগত॥
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতিএ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

মূল হিন্দীতে আছে,—

অতি অপার করতাকর করনা।
বরনি ন পারই কাহু বরনা॥
সাত সরগ জউঁ কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ॥
জাবঁত জগত সাখ বন ঢাঁখা।
জাবঁত কেস রোবঁ পঁখি পাখা॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাহঁ।*
মেঘ বুঁদ অউ গগন তরাঈঁ॥
সব লিখনী কই লিখু সংসারূ।
লিখি ন জাই গতি সমুদ অপারূ॥ A. S. B. সংস্করণ, ১৩ পৃঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তার কার্য্য অতি অপার। কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? যদি সাত স্বর্গ কাগজ হয় (এবং) ধরিত্রীর সাত সমুদ্র মসী ভরা হয়, (আর) যত জগতের শাখা, বন জঙ্গল, যত কেশ, লোম, পক্ষি-পাখা, যত মাটি বালি, বৃষ্টি-বিন্দু আর গগনের তারা, সব লেখনী করিয়া সংসার লিখিতে থাকে, (তবুও) অপার সমুদ্রের ন্যায় (তাঁহার) গতি লিখা যায় না।

পুথির বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্তশূন্য ভরি যদি সৃজয় কাগত॥

* বাজার সংস্করণে 'জহঁ তাহঁ' স্থানে 'ছুনরাঈ'। A. S. B. সংস্করণের কয়েকটী মূল পুথিতে 'ছুনিয়াঈ' পাঠ আছে। তাহাই মূলের শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি॥
যতবিধ বন গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুতি লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

স্তুতি স্থানে হিন্দী অস্তুতি। এই বর্ণনা কুর্‌আন-শরীফের নিম্নলিখিত আয়ত দুইটার প্রতিধ্বনি,—"এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লার কথা সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।" (সূরাহ লুক্‌মান)। "তুমি বল যে. আমার প্রতিপালকের বচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ সাহায্য আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে।" (সূরাহ কহফ)।

পুথির অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে,—

ললাট উজ্জল শশি পিউ সবরিসে হাঁসি,
কটাক্ষে মুহিত জবাকুল।

বিশুদ্ধ পাঠ হইবে,—

ললাট উজ্জ্বল শশী, পীযূষ বরিষে হাসি,
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।

হায় রে! কোথায় যুবাকুল, আর কোথায় জবাকুল! পরবর্ত্তী সংস্কারক হয় ত জবাফুল করিয়া ফেলিবেন।

পুথির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

হিন্দুস্থানি ভাবে দীপ নাম এহি বলি॥
জম্বো দিপ পক্ষ আর সক্লেশ শুস্থলি *
কুস দিপ এঞ্চু দিপ সপ্তম কহিল॥
পুস্পের দরিয়া দিপ সপ্তমে পুরিল *

এখানে কবি সপ্ত দ্বীপের বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নামগুলি কি চমৎকার মৌলিক! বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ-নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক ও শাল্মলি॥

কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্টম কহিল।
পুষ্কর বলিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল॥

অজ্ঞ লিপিকরের হাতে আজ সৈয়দ আলাওলের কি দুর্দশা হইয়াছে! মূল হিন্দীর সহিত মিলাইয়া এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থল এরূপ আছে, যেখানে প্রাচীন পুথি ব্যতীত প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। দু-একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাজারের পুথির ১০ম পৃষ্ঠায় আছে,—

নানা দেসে নানা লোগ, সুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ;
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল। আরবি মিসীর স্থামি,
তুরুকী হাবেসী রুমি, খোরাসানি উজেগ সকল *
লাহুরী মুলতানী সিন্দি, কাসমিরী দক্ষিনী হিন্দী,
কামরোপি আর বঙ্গদেশি॥ **অহুপিহ**
খুতখওাবি; **কাম্নাই** ময়লা বারি, **আছুন্দরী**
কর্ণাঠ **কবাসি** * বহু সেখ সৈএদজাদা,
মোগল পাঠান জুদ্ধা, রাজপুত্র হিন্দু নানাজাতি॥
অভাসি করমা স্থাম, ত্রিপুরা কুকির নাম,
কতেক কহিব জাতি ২ * আরমানি অলওাজ,
ডিনমার ইংরাজ, **কাণ্টিমান** আর ফ্রান্সিস॥
কামন্নিভ ফাসমাশি, চোলন্দার নসরানী, নানা
জাতি আর **প্রতংশেচ** *

এই উদ্ধৃত অংশের চিহ্নিত শব্দগুলির প্রকৃত পাঠ স্থির করা দুরূহ। পুথির ৯ পৃষ্ঠায় রোসাঙ্গ-রাজের নৌকার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

নানাবর্ণ নৌকা সাজে, নাহি শম ক্ষেতি মাজে,
গল্লিয়া অগন ডিঙ্গা রঙ্গে॥ সমুপা নানান
জাতি, মচুয়া গোরাপ পাতি, জালিয়া নায়রি
নানা রঙ্গে * কোসদা আহুতি ভাল, ফেরাঙ্গির
বজ্রসাল, সাতাইস দাবলা সিংসার। শুন্দর
খেলন রঙ্গি; পিক সব সরি ভঙ্গি, মগদের
নানা বর্ণ আর *

এখানেও সব কথার অর্থবোধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি ব্যতীত ভ্রান্ত পাঠ সংশোধনের উপায় কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আলাওলের কোন হস্তলিখিত পুথি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহেবের নিকট কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে এবং তিনি

একটী আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছুক আছেন জানি। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-বাহুল্য। কয়েকখানি প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি পাইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। আশা করি, চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ, বিশেষতঃ বন্ধুবর আবদুল করিম সাহেব এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কবে বাঙ্গালী মুসলমানের গৌরব এই কবিরত্নের কাব্যের উদ্ধার হইবে, তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য *

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বাঙ্গলা[১] ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না।

সাধারণ অনুজ্ঞা (বা বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞা) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি নির্ণয় তিনি করিয়াছেন (যেমন 'চর্, চর'< 'চর, চরহ' < 'চর, চরথ+চরত'), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে খালি এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে (=আধুনিক সম্ভ্রমসূচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষে) যে 'উন্' প্রত্যয় বাঙ্গলায় আমরা পাই ('চরুন' ='চর্+উন'), তাহা মূলে আদি-আর্য্যভাষার (সংস্কৃতের) '-অন্তু' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই ; সংস্কৃত 'ন্ত' বাঙ্গলায় হয় 'ত'-তে, নয় কেবল 'ত'য়ে পরিণত হইয়া থাকে (যেমন 'দন্ত > দাঁত', 'ত্বরন্ত-> তুরিৎ', 'চলন্ত-> চলিত', 'গৃহ+অন্ত < ঘরত'[=ঘরে], 'অন্তরে > তরে' [৪র্থীতে], ইত্যাদি), 'ন'-য়ে নহে। 'চলন্তি > চলেন, চলন্তু > চলুন'—এখানে 'ন্ত'র 'ন'য়ে পরিণতি হইল কিরূপে? এই 'ন' হইতেছে বিশেষ্য পদের বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়ের প্রভাবে ; সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনে যে '-আনাম্' প্রত্যয় পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা '-আনং, -আন, -আণং, -আণ, -ন, -ণ' রূপে মেলে ; এবং এই '-ন, -ণ' আধুনিক আর্য্যভাষায় বহু স্থলে প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (যেমন ব্রজভাষায় 'ঘোরন, ঘোড়ন', পূর্ব্বী হিন্দীতে 'ঘোড়ন', মৈথিলীতে 'ঘোড়নি' ইত্যাদি)। বাঙ্গলায়ও এই বহুবচনের '-ন' বিদ্যমান ছিল, এবং '-গুলা-ন্', প্রাদেশিক 'গুলাইঁ, লোকাইঁ,

---

* ১৩৩১ সালে ১লা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা' এইরূপ বানান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা না বুৎপত্তিসঙ্গত, না উচ্চারণসঙ্গত ; তিনি 'বাংলা' এইরূপ বানানের পক্ষপাতী। 'বঙ্গাল'>'বাঙ্গাল, বাঙাল' ; 'বঙ্গাল+আ'>'বাঙ্গালা'> আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা' ; 'ঙ্গ' হইতে 'গ' এর লোপে 'ঙ্' উচ্চারণ, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যস্থিত অক্ষরের 'আ'-কারের লোপ। 'ঙ্গ'এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান ; [১] 'ঙ্গ', [২] 'ঙ' ; 'বাঙ্গালা'> 'বা'ঙ্গ্লা', এই বানান বুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুগামী। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের অনুনাসিক প্রলম্বীকরণরূপে ; 'অং'='অঅঁ', 'ইং'='ইইঁ', 'উং'='উউঁ' ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল ; এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় তদ্ভব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ; যেমন 'করণকম্, করণকং'> 'করণয়ং'> মারহাট্টী 'করণেঁ' ; 'চলিত্ব্যকং'> 'চলিঅব্বউং'<গুজরাটী 'চলবুঁ'। আধুনিক যুগের সংস্কৃত উচ্চারণে ও তৎসম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নানা প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নানা বিশিষ্ট নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন দক্ষিণ-ভারতে 'ং'='ম্', 'হংসঃ'='হম্সঃ' ; বঙ্গদেশে 'ং'='ঙ্', 'হংসঃ'='হঙ্শঃ', 'সংস্কৃতম্'='শঙ্শ্ক্রিতম্' ; উত্তর-ভারতে 'ং'='ন্', 'হংসঃ, বংশঃ'='হন্স্, বন্স্', ইত্যাদি। সুতরাং 'বাঙ্গলা, বাঙ্লা' কে 'বাংলা' (অর্থাৎ কিনা 'বাঅঁলা') লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিলে এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয়।

লোকাইন্' প্রভৃতিরূপে এই 'ন'কারের অস্তিত্ব আছে[১]। '-ন্তু, -ন্তু'র 'ন'য়ে পরিবর্ত্তনে এই বিশেষ্য পদের '-ন'-কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মারহাট্টী 'চরোৎ, চরূৎ-তে' দেখা যাইতেছে যে, '-ন্তু'র 'ওৎ, উৎ' -তে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে
সংস্কৃত	চরিষ্যামি	চরিষ্যামঃ	চরিষ্যসি	চরিষ্যথ	চরিষ্যতি	চরিষ্যন্তি
বাঙ্গলা	চরিউঁ, চরিউ	চরিমো	*চরিসি	চরিহ	চরিহে, চরিএ	×

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উৎপত্তি লইয়া আমার ঐকমত্য আছে। যদিও 'চরিএ'র মত 'হ'-কার-বিহীন '-ইএ' যুক্ত পদকে আমার মূলে কর্ম্ম-বাচ্যের পদ বলিয়াই মনে হয়—এক 'হ'কারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মৎপ্রণীত 'বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি)।

কিন্তু উত্তম পুরুষের 'চরিমো, চরিউঁ, চরিউ' এই পদগুলি যে সংস্কৃত 'চরিষ্যামি', চরিষ্যামঃ' হইতে হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। 'চরিমো, চরিউঁ' এইরূপ 'মো' ও 'ইউঁ' প্রত্যয় দুইটীর, একটির সহিত আর একটীর একবচন-বহুবচন সম্পর্ক বা অর্থগত সাদৃশ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল এ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক। অপর, 'মো' বা 'ইমো' প্রত্যয়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুষ্প্রাপ্য—শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের উদ্ধৃত এক 'বঞ্চিমো' (শ্রীকৃ-কীঃ, পৃঃ ৩৮৭) ছাড়া অন্যত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্যান্য ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে 'ইবোঁ' প্রত্যয়ই পাওয়া যাইতেছে—'করিবোঁ, জাণিবোঁ, খাইবোঁ', ইত্যাদি। (এই 'ইবোঁ'র উৎপত্তি এইরূপ : '-ইতব্য' <'ইঅব্‌ব' <'ইব্‌ব' <'ইব',+'হোঁ'<'হউঁ', হাঁউ' <'হর্ং'<'হউং' <হকং<'অহকং'<'অহং' : 'চলিতব্য (ক)+অহ(ক)ম্'<'চলিব(া)+হোঁ'>'চলিবাহোঁ,চলিবহোঁ, চলিবোঁ'।) 'বঞ্চিমো' পদ 'বঞ্চিবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'ইষ্যামঃ—ইষ্যামি'

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ আধুনিক বাঙ্গলার 'তিনি' পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি' হইতে আগত বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 'তানি' কিছুতেই 'তিনি'র মূল হইতে পারে না ; 'তিনি' প্রা° বা° তে 'তিহঁ, তেহঁ' রূপে মেলে ; 'তেহঁ, তিহঁ'='তেন্‌হ, তিন্‌হ'='*তেন, তেন°,'='তাণং' (>প্রাদেশিক বাঙ্গলা 'তান'=তাঁহার)='*তানাম্,' 'তেষাম্' স্থলে ; 'তেহঁ, তিন্‌হ, তেন, তান' প্রভৃতি মূলে এই 'ন'কারযুক্ত ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ ; 'তেহঁ, তেন' পদে 'ই' প্রত্যয়, (যাহার মূল হইতেছে তৃতীয়ার '-এভিঃ>-এহি>-হি' প্রত্যয়) যোগ করিয়া '*তেঁহি, তেনি>তিনি'র উৎপত্তি। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য স্বর বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্রই লুপ্ত ; যেখানে লোপ হয় নাই, সেখানে বিশেষ কারণ আছে, এবং সে কারণগুলির একটিও 'তানি'র মতো পদকে বাঙ্গালায় ই-কারান্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমর্থক নহে।

হইতে যথাক্রমে 'ইমো— ইউ' প্রত্যয়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন; এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রত্যয় বাঙ্গলায় দাঁড়াইল বহুবচন। 'ইমো' প্রত্যয় 'ইবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত, এবং এই 'ইমো' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অতি বিরল; ইহার সহিত 'ইউ'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। 'ইউ'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি "বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯)। 'ইউ' যদি 'ইষ্যামি' (বা 'ইষ্যামঃ') হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা সানুনাসিক রূপ ('ইউঁ') পাইতাম। অবশ্য, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে 'ইউঁ' পাইতেছি; কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, এবং যে পুথি দুইখানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয়স ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ; তখন 'ইউ' এই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়, সে সময়ে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু একটা লিপিকর-প্রমাদ হেতু আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। 'ইষ্যামঃ' হইতে 'ইমো'র উৎপত্তি বিষয়ে দুইটা অন্তরায় আছে—[১] সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তদ্ভব পদে বর্ত্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম' বাঙ্গলায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় 'বঁ' ও পরে কেবলমাত্র 'ঁ' তে পরিণত হয়, যেমন 'ভূমি—ভুঁই, স্বামী—সাঁই, সংক্রম—সাঁকোঁ > সাঁকো, গ্রাম—গাঁ, নাম—নাঁ, না' ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা'=কঃ নাম বংশীং বাদয়তে, স নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে, সেখানে ক্বচিৎ 'ম'কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম—না', মারহাট্টি 'নাঁব', কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'যুক্ত রূপ, 'নাম')।

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা লৃট্-এর পদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম পুরুষের পদ আজকাল বিদ্যমান, '-ইহ > -ইও' প্রত্যয়ান্ত হইয়া। পশ্চিমভারতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষা কনৌজিয়া বুন্দেলী, এবং কতকটা পূর্ব্বী-হিন্দী ও ভোজপুরিয়া ছাড়া অন্যান্য আর্য্যভাষায় ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে; যেমন 'ইতব্য > -ইব, অব'; শতৃর 'অন্ত > অন্দ, অৎ'।

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে '-ইম্, ইমু, মু, মোঁ' প্রত্যয় পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ইবাহোঁ > ইবোঁ' হইতেই জাত; চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত 'বঁ'র 'ম'য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক; 'বোঁ > ৱোঁ > ঙো, ঙ, মো, ম' ইত্যাদি। (প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ঙ'='ৱঁ'।) চন্দ্রবিন্দু না থাকিলেও দুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল 'ব'এর 'ম'এ পরিণতি অন্যত্র সুলভ; তুলনীয়, উড়িয়া 'দেখিবি < দেখিমি' (উত্তম পুরুষে), মগহী 'লেমা, করমা, চলমা < লেবা, করবা, চলবা' (মধ্যম পুরুষে)।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতি-বাবু ঐ প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুই একটী বিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন দুই চারিটী কথা বলিব। আজকাল বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ভাষা-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আর তাঁদের মতই আরও দুই এক জন ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শতগুণে বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে—আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, সুনীতি বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই,—

[১] সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া-বিভক্তির একটু সাদৃশ্য আছে—সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জ্জন দ্বারা উহাদের সরলতা-পাদনের দিকেই সকল অপভ্রংশের গতি—ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির 'ব' (করিব, যাইব, খাইব ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিক 'সে যাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা); 'তুমি যাইবা', 'মুঞি যাইমু' (প্রাচীন বাঙ্গালা) ইত্যাদির direct বা সরল উক্তির পরিবর্ত্তে 'তাহা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক' ('তেন গন্তব্যং'), 'আমা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক ('ময়া গন্তব্যং'), ইত্যাদি indirect ও round-about অর্থাৎ ঘুরাইয়া বলা বাক্য-রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যতের 'সে যাইব,' 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্ত্তৃ-পদে, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া 'তব্য' প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্য্য তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই না; এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তির 'ব'কার উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে।

[২] সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গালা ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি 'ব'-কারের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, 'তব্য' প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষ—তিন পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উত্তম-পুরুষেও 'মুঞি করিমু' স্থলে 'মুঞি করিব' প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেরূপ না হইয়া 'মুঞি করিমু', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের বর্ত্তমানের 'করোমি' 'যামি' ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালার 'করোঁ' 'যাওঁ' 'যাউঁ', 'যাঙ' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃত- ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতেই 'করিমু' 'যামু' ইত্যাদির 'মু' উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ অনুমানই সমীচীন মনে হয়।

[৩] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে ভাবে 'করব+হুঁ = করবহুঁ, করবুঁ, করমু' ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক মনে হয় না। উত্তম-পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়া 'করোঁ' 'করলুঁ' 'করমু' ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ 'মুঞি' উহ্য রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোনও ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ উহ্য রাখিলে—কে কর্ত্তা, সে বিষয়ে অনিবার্য্য সন্দেহ থাকিয়া যায়; এ জন্য 'করব' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের সহিত কর্ত্তৃ-পদ 'হুঁ' (সংস্কৃত 'অহং' শব্দের অপভ্রংশ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহা যোগ করায় এবং প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া-পদের স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃ-পদ-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'করব'—যাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সে করিবে' বা 'তুমি করিবা' দুই-ই হইতে পারে—এরূপ সন্দিগ্ধার্থ ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ করা একান্তই অসম্ভব মনে হয়।

[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি 'ল' যে সংস্কৃতের 'ক্ত' (অতীতের অর্থে কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। বাঙ্গালা অতীতের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তিতেও আমরা 'লোঁ' 'লুঁ' (পরবর্ত্তী সময়ে 'মু') দেখিতে পাই। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অপভ্রংশে 'ল' ব্যতীত 'লোঁ' বা 'লুঁ' আসিতে পারে না; সুতরাং এ স্থলে ল-কারে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের 'অম্' বিভক্তির প্রভাব-সম্ভূত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালার উত্তম-পুরুষের 'করোঁ' 'মরোঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'ওঁ'-কে সংস্কৃত 'মি' বিভক্তি হইতে উদ্ধৃত না বলিয়া উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্ত্তমান ও অতীতের উত্তম-পুরুষের বিভক্তির analogy বা সাদৃশ্য হেতু, বাঙ্গালা ভবিষ্যতের 'মু' বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত 'স্যামি' ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতে উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাবসম্ভূত, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

[৫] শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু সংস্কৃত (ং) অনুস্বারের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না। বাংলার 'বাঙ্গালা' শব্দটাকে কেহই সংস্কৃত অনুস্বারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-আঁ-লা' বলিয়া উচ্চারিত করিবেন না; 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখিলেও নিশ্চিতই উহা 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্‌লা'ই উচ্চারিত হইবে; এ অবস্থায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখার বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এই উত্তর দিলেন,—

রাত্রি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে মোটামুটি এই কয়টী কথা বলিতে চাহি।

[১] সংস্কৃতের অতীতের ক্রিয়াপদগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। প্রাকৃতে ক্বচিৎ একটা আধটা লঙ্, লুঙ্, লিট্-এর পদ দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদের সাহায্যেই অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে এই 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তার

বিশেষণ হয়। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মের বিশেষণ হয় ও কর্ত্তাকে তৃতীয়ায় আনা হয়; যেমন প্রাচীন সংস্কৃতের রীতি অনুসারে—'অহং জগাম, অহং রাজানম্ অপশ্যম্', কিন্তু প্রাকৃতে 'অহং (অহঅং, হকং, হগং, হগে ইত্যাদি) গদো (গও, গদে)', ও 'মএ (=ময়া) রাজা (রাআ, লাযা, লাআ) দেক্‌খিও (বা দিট্‌ঠো, দিশ্‌টে)।' এই 'ত' প্রত্যয়ান্তরূপে স্বার্থে 'ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া বাঙ্গলায় অতীত কালের 'ইল' প্রত্যয় দাঁড়াইল; 'অহঅং গঅ-ইল্ল'<প্রা-বাং 'হউঁ গেল', 'মএ রাজা দেক্‌খিঅইল্ল', প্রা-বাং 'মই রাজা দেখিল'। অর্থাৎ অতীতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ, সকর্ম্মক ক্রিয়ায় সকর্ম্মক কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ। হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে; যেমন ব্রজভাষায়—'হৌঁ গয়ৌ' (হৌঁ=অহং, গয়ৌ=গঅউ=গঅও=গতকঃ), কিন্তু 'মৈঁ রাজা দেখ্যৌ, (মৈঁ=ময়া, দেখ্যৌ=দেক্‌খিঅউ=দেক্‌খি-অও= * দৃক্ষিতকঃ, দৃষ্ট-অর্থে)। তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্য্যাপদ ৫৫) -'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ॥' এখানে 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ'=স্থিতোঽহং—হাঁউ বা হউঁ=অহং; 'মই বুঝিল'=ময়া জ্ঞাতং); একই পদে পাশাপাশি প্রথমার হাঁউ=অহং যোগে অকর্ম্মক অচ্ছ বা আছ ধাতুর সঙ্গে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ ও সকর্ম্মক বুঝ ধাতুর সঙ্গে তৃতীয়ার মই=ময়া যোগে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিঙন্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবার—সকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যে আনিয়া বলিবার রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।

অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, 'তব্য'>'ইব' প্রত্যয়ান্তরূপ ভবিষ্যতের লৃট্ বা তিঙন্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখানে সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভেদ নাই;—উভয় স্থলেই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়, যেমন 'যুষ্মাভিঃ ভবিতব্যং', 'ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা'= প্রাচীন বাঙ্গলায় 'তুম্‌হে হোইব' (চর্য্যা ৫), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (চর্য্যা ২৯)। প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অনুসারে আমরা দেখি—

উত্তম পুরুষ—মই (মুঞি, ইত্যাদি=ময়া), আমি (=অহ্মে, অহ্মহি=অস্মাভিঃ) জাইব, খাইব (=যাতব্যং, খাদিতব্যং)।

মধ্যম পুরুষ—তই (তুঞি ইত্যাদি=ত্বয়া), তুমি (=তুম্‌হে, তুম্‌হহি=যুষ্মাভিঃ) জাইব, খাইব।

প্রথম পুরুষ—সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার 'তেঁ' (=তেন) স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমায় 'সে' ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার পদের অদলবদল প্রা-বাংতে বিরল নহে। প্রা-বাং-র প্রথমার 'হাঁউ' (=অহং)-কে তৃতীয়ার 'মই, মই' (=ময়া) বিতাড়িত করিয়াছে। তদ্রূপ প্রা-বাং-র প্রথমা 'তো', 'তু' (<ত্বং)কে তৃতীয়ার 'তুই' (<ত্বয়া) দূরীভূত করিয়াছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই দেখিতে পাইতেছি। প্রা-বাংতে 'তেঁ জাইব, তেঁ খাইব' রূপই হওয়া স্বাভাবিক, ও প্রাকৃত ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিলে এই রূপই অপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলায় কিরূপ প্রয়োগ ছিল,

আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথমা ও তৃতীয়ার গোলমাল অতীতের ক্রিয়ায় যে প্রাচীন বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাহা সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—যেমন 'হাঁউ সুতেলি'=আমি শুইলাম (চর্য্যা ১৮—এখানে প্রথমার প্রয়োগ), 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ=আমি ছিলাম (চর্য্যা ৩৫—প্রথমার প্রয়োগ); কিন্তু 'মই ঘলিলি হাড়েরি মালী'=আমি হাড়ের মালা ফেলিয়া দিলাম (চর্য্যা ১০—তৃতীয়ার প্রয়োগ), 'মই বুঝিল'=আমি বুঝিলাম (চর্য্যা ৫৫—তৃতীয়ার প্রয়োগ); এরূপ স্থলে হাঁউ' 'মই' দুই বিভিন্ন সুবন্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা স্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ প্রথম পুরুষেও 'সে, তেঁ (=সঃ, তেন)র অদল বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে যে বহুলতররূপে প্রযুক্ত প্রথমার 'সে' যে তৃতীয়ার 'তেঁ'কে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

[২, ৩, ৪] 'মুঞি করিব, আমি করিব' এইরূপ প্রয়োগ প্রা-বাং-তে খুবই দৃষ্ট হয়। যথা—চর্য্যা ৩৬—'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ'=(আমি) জালন্ধরি-পাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; পৃষ্ঠা ১১৪—'তোহ্মার করিব অহ্মে উচিত সমান' (=সম্মান), পৃষ্ঠা ১৮৫—'আহ্মে বহিব তোর ভার', 'আহ্মে সত্য করিব', ইত্যাদি।

কেবল-মাত্র '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বাঙ্গলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান; তুলনা—ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'র্‌ব'=সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় (চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব হইতেই) খালি '-ইল' '-ইব' উত্তম, মধ্যম বা প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। '-ইল, -ইব'র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যে অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হয় কোনও সর্ব্বনাম-পদ, নয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদের অনুকরণে আনীত কোনও বিভক্তি। এইরূপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

উত্তম পুরুষ—অতীতকালে 'কৈল' (=প্রাকৃত কয়-ইল্ল=কৃত+ইল); 'কৈলা+হোঁ'='কৈলাহোঁ' (এই 'হোঁ', প্রাচীন বাঙ্গলার 'হাঁউ' হইতে; তুলনীয়—'হৈলাহোঁ'; প্রা, অসমীয়াতে ='আহোঁ' প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অহুঁ'); তাহা হইতে 'কৈলাওঁ, কৈলাঙ, কৈলোঁ, কৈলো, কৈলুঁ, কৈলুম্' ইত্যাদি; ও এই প্রকার রূপের প্রসারে—'করিলাহোঁ, করিলাওঁ, করিলোঁ, করিলুম্, ক'রলুম, করনু'; 'করিল+আমি'='করিলাম্'।

মধ্যম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলেহেঁ, কৈলাহা' অসমীয়াতে এই প্রকার রূপ পাওয়া যায়; মৈথিলীতে—'কৈলহ, কৈলেঁ, কৈলহি<কৈলেহেঁ'; এখানে 'আহা' <'অং' প্রত্যয়, বর্ত্তমানের ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অনুসরণে; যথা 'চলহ, চলাহা'='চলথ'; এবং 'এহেঁ'='আহা, অহ' প্রত্যয়ে বহুবচনদ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে। [বহুবচন জানাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা '-নৃহ-' আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ—ও এই চন্দ্রবিন্দু বা 'ন' বা 'নৃহ', বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর বহুবচনের '-আনাম্' বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইতে 'কৈলা, কৈলে, কৈলেঁ (=করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যাদি। অনাদরে 'কৈলি' (='কৈল+ই';'ই<হি', সাধারণ অনুজ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয়),>'করিলি'।

প্রথম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলে' (—'এ' প্রত্যয় এখানে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের এ-কার হইতে অনুমিত হয়); 'কৈলান্তি, কৈলান্ত, কৈলেন্ত, কৈলেন' (বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত); 'করিল, করিলে>ক'রলে; করিলেন্ত, করিলেন' ইত্যাদি।

তদ্রূপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে—'মুই, আমি, করিব'; 'করিবাহোঁ>করিবোঁ, করিবুঁ, করিমু, করিম্, ক'রমু'। 'করিব+আমি>করিবাম' (ময়মনসিংহের ভাষায়)।

মধ্যম পুরুষে—'তুই, তুমি, করিব'; 'তুমি করিবাহা, করিবাহেঁ, করিবেহেঁ>করিবা, করিবে, করিবেন'। অনাদরে 'তুই করিবি'।

প্রথম পুরুষ—'সে, তাহারা করিব'; 'করিবে'; 'করিবান্ত, করিবেন্ত, করিবেন'।

'করিবোঁ' পদে 'ব' স্পষ্ট বিদ্যমান। 'করিবোঁ' পদের 'ব' সানুনাসিক ওষ্ঠ্য স্বর 'ওঁ' কারের সহিত যুক্ত হওয়ায় সহজেই 'মো', 'মু' হইয়া যায়; 'করিমো>করিমু, ক'রমু'। কিন্তু 'করিব+আমি'—এখানে স্বরবর্ণটী কণ্ঠ্য অ-কার হওয়ার দরুন, 'ব'এর 'ম'য়েতে পরিবর্ত্তনের দিকে প্রবণতা রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপে 'ওঁ' না থাকায় 'ব'-ই বাহাল আছে।

'কৈলোঁ, করিলোঁ, করিবোঁ'—ইহাদের অনুনাসিক বর্ত্তমানের ক্রিয়ার 'করোঁ, খাওঁ, চলোঁ' প্রভৃতি রূপে যে অনুনাসিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অনুনাসিক সংস্কৃতের '-মি, -মঃ' প্রত্যয়ের বিকারে উৎপন্ন। 'করোমি>* করমি>* করিমি>* করিবিঁ>*করীঁ>করি; কুর্ম্মঃ>* করোমো>* করমো>* করওঁ, করঙ>করোঁ'। ইহা অসম্ভব নহে যে, মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মত অতীতে ও ভবিষ্যতে '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্ত্তমানেরই বিভক্তি 'ওঁ' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটী বড় কথা বলা চলে; 'হোঁ' রূপটী পুরাতন বাঙ্গলায় ও অসমীয়াতে, তথা 'অহুঁ' রূপে মৈথিলীতে আমরা পাইতেছি। আর তদ্ভিন্ন চলিলাম, করিবাম,'> প্রভৃতি পদে স্পষ্টই '-ইল', '-ইব'+'আমি' পাইতেছি। 'চলিবাহোঁ'>'চলিবোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলোঁ' পদে কেবল আধুনিক 'আমি' স্থলে প্রাচীন 'হোঁ, হাঁউ, হউঁ'। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে ব্যাখ্যা চলে যে, 'চলিবোঁ, চলিবাহোঁ; চলিলোঁ, চলিলাহোঁ' এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম 'হোঁ' ও বর্ত্তমানের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের রূপের 'ওঁ', এই দুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে।

[৫] 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা' বানান লইয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়াই পাদটীকায় তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 'বাঙ্গলা'—এই বানানকে 'না ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত, না উচ্চারণ-সঙ্গত' বলিয়াছিলেন। আমি 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা' ও 'বাঙলা' এই তিন প্রকার বানানই লিখিয়া থাকি, অনুস্বার দিয়া লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানকে যে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, দুই দিক্ ধরিয়া

বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমর্থিত করা যায়, তাহা আমার বিশ্বাস ; . এবং সেই জন্ত আমার মন্তব্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার সন্দেহ কয়টী উল্লেখ করিয়া আমার ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 'আমি, হম্' প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা করিব। 'আমি, হম্' সংস্কৃত 'অহম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে। বাঙ্গলায় ও আধুনিক আর্য্যভাষায় সর্ব্বনাম উত্তম পুরুষের উৎপত্তি এই,—

প্রথমা একবচনে—বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্'। প্রাকৃতে এই 'অহম্' শব্দে একটা স্বার্থে 'ক' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল ; তাহাতে হইল 'অহকং'। 'অহকং' অশোক অনুশাসনে 'হকং'রূপে পাওয়া যায়, সাহিত্যের (সংস্কৃত নাটকের) মাগধী প্রাকৃতে 'হকং'এর পরিবর্ত্তন হয় 'হকে, হগে, হগ্গে'। চলিত ভাষায় সমগ্র উত্তরভারতে 'হকং' পদটী, 'হগং, হঅং, হৱং, হউঁ' এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই 'হউঁ' পদটী গুজরাটীতে 'হুঁ', পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা)তে 'হৌঁ', ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে (চর্য্যাপদের ভাষায়) 'হাঁউ' রূপে মেলে (যেমন 'হাঁউ নিরাসী খমন ভতারে' = চর্য্যা ২০ ; 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী' = চর্য্যা ১০ ; 'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' = চর্য্যা ৩৫)। গুজরাটী ও ব্রজভাষাতে 'অহম্—অহকং'-পদ-জাত কর্ত্তৃকারকের একবচনের রূপ 'হুঁ, হৌঁ' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা-ভাষায় লোপ পাইয়াছে।

তৃতীয়া একবচনে—সংস্কৃতে 'ময়া'। প্রাকৃতে ইহা 'মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভ্রংশে 'মই'। বিশেষ্য পদে তৃতীয়ায় সংস্কৃতের '-এন' প্রত্যয় অন্ত্য যুগের প্রাকৃতে 'এং' বা 'এঁ'তে পরিণত হয় ; যেমন 'হস্তেন > হত্থেণং, হত্থেণ > হত্থেং, হত্থেঁ > হাথেঁ, হাথে, হাতে' ; এই বিশেষ্য পদের রূপ হইতে 'এন'-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু, 'মই' পদের উপর প্রভাব করে, তাই 'মইঁ' রূপটি আমরা পাই। এই 'মইঁ' হইতেছে আমাদের বাঙ্গলায় 'মুই, মুঞি, মুঁই, মুহি' ইত্যাদি। হিন্দীর 'মৈঁ'ও এই একই শব্দ।

চতুর্থী একবচনে—'মহ্যম্'। প্রাকৃতে 'মজ্ঝ, মজ্ঝু'। ইহা হইতে হিন্দীর 'মুঝ্' (যেমন 'মুঝ্‌কো' = আমাকে, 'মুঝে' = আমায়)। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মঝু' = আমার।

ষষ্ঠী একবচনে—'মম'। 'মম' ক্রমে 'মৱঁ' ও পরে 'মো' হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'মো' প্রাচীন বাঙ্গলায় মেলে। 'মো'-তে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তি যোগ করিয়া 'মোর'।

প্রথমা বহুবচন—সংস্কৃতে 'বয়ম্'। কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে 'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে 'অম্হে' পদের সৃষ্টি হয়। এই 'অম্হে'

হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা 'আম্হি' (আহ্মি), ও পরে 'আমি'। হিন্দীর 'হম্'ও 'অম্হে' এই পদ হইতে, এবং সাধু হিন্দীতে 'হম্' সদাই বহুবচন।

তৃতীয়া বহুবচন—'অস্মাভিঃ' হইতে প্রাকৃতে 'অম্হেহি' ও 'অম্হহি'। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আম্হে' (আহ্মে), উড়িয়ায় 'আম্ভে'। প্রথমার 'আহ্মি' ও তৃতীয়ার 'আহ্মে' এই দুই রূপ কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই—উভয়েই আধুনিক বাঙ্গলা 'আমি'তে মিলিয়া গিয়াছে।

বহুবচনের অন্য বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখা যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে বাঙ্গলার উত্তমপুরুষের সর্ব্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটী পদ বহুবচনের। যথা,—

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—(অহম্ > অহকং >) হাঁউ [লুপ্ত	(অস্মে > অম্হে > আহ্মি) > আমি
তৃতীয়া—(ময়া > মএ >) মই, মইঁ, মুই	(অস্মাভিঃ > অম্হেহি >) আহ্মে > আমি
চতুর্থী—(মহ্যম্ > মজ্ঝ >) মজ্‌ঝ [ব্রজবুলী]	
ষষ্ঠী—(মম >) মো, মো + র = মোর	

অসমীয়া ভাষায় এখনও 'মই' = একবচনে = আমি, ও 'আমি' = বহুবচনে, আমরা অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি' পদটী একবচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; 'মই, মুই' ও 'আমি'র মধ্যে বচন-ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে নূতন বহুবচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ায়, 'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব,' ও 'মোরা, আমরা'—এই প্রকার বহুবচনের নবীন রূপগুলি সৃষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্' শব্দ একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নূতন বহুবচনের রূপ 'হম-লোগ'এর উদ্ভব।

'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা*

প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে দুর্ব্বল রাজার জন্য কৌটিল্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'অর্থশাস্ত্র' প্রবল বা দুর্ব্বল সকল রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী; ইহাতে যেমন পরাক্রান্ত জয়াভিলাষী রাজার পক্ষে শত্রুজয়ের উপায় বর্ণিত দেখা যায়, তেমনই আবার অসহায় ও অসমর্থ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার তদানীন্তন কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশও লক্ষিত হয়। বরং আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই এই গ্রন্থে অধিক বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

'অর্থশাস্ত্রে' (১২, ১) 'ধর্ম্মবিজয়ী', 'লোভবিজয়ী' ও 'অসুরবিজয়ী' এই তিন প্রকার 'অভিযোক্তা' বা আক্রমণকারীর উল্লেখ আছে। শত্রু নত হইবা মাত্রই 'ধর্ম্মবিজয়ী' রাজা তাঁহার অপকারের চেষ্টা হইতে বিরত হন, অধিকন্তু তাঁহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। 'ভূমি' ও 'অর্থে' 'লোভবিজয়ী'র লোভ; অভিলষিত বস্তু পাইলে তিনি আর আক্রমণ করেন না। কিন্তু ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে প্রাণ হরণ করা 'অসুরবিজয়ী'র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য। ধনাদি উপহার দ্বারা এইরূপ 'অভিযোক্তা'কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি গোপনে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থলে কৌটিল্য অসাধু উপায়ের আশ্রয় লওয়াও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন না; নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণের কবল হইতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি শক্তিহীন রাজার পক্ষে অগত্যা ছল-চাতুরী ও ক্রূর উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। সকল উপায় ব্যর্থ হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 'অগ্নিপতঙ্গে'র ন্যায় সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও 'অর্থশাস্ত্রে' (৭, ১৫) পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সমাদর পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা কৌটিল্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি দণ্ডোপনতের কর্ত্তব্য-বর্ণন কালে (৭, ১৫) বলিয়াছেন,—দুর্ব্ব[illegible] রাজা ধনাদি উপহার সহ দূত পাঠাইয়া প্রবল শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অভয় পাইলে তাঁহার আজ্ঞাবহরূপে সকল বিষয়ে য[illegible] ক্ত [illegible] পকা[illegible] রিবে; আবার 'দণ্ডোপনায়িবৃত্ত' নামক প্রকরণে (৭, ১৬) প্রবল রাজার প্রতি উপদেশ আছে যে, ভীত আশ্রয়প্রার্থীকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে হইবে। 'মণ্ডল'স্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও 'অর্থশাস্ত্রে' 'উপনত'কে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ঐরূপ করিলে উদ্বিগ্ন রাজমণ্ডল উৎপীড়নকারীর বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে।

শক্তিহীন রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য 'অর্থশাস্ত্রে' বহু উপায়ের নির্দ্দেশ আছে। 'যাতব্যবৃত্তি' নামক প্রকরণে (৭, ৪) প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত অশক্ত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। 'হীনশক্তিপূরণ' নামক অপর প্রকরণে (৭, ১৪) ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। আর এক প্রকরণে (৭, ১৫) শক্তিশালীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য

---

* মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৬শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

দুর্ব্বল রাজাকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতে বলা হইয়াছে। 'আবলীয়সম্' নামক সমগ্র অধিকরণটি কেবল 'অবলীয়ান্' অর্থাৎ দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য-কথায় পূর্ণ। এই অধিকরণের অন্তর্গত 'দূতকর্ম্ম', 'মন্ত্রযুদ্ধ', 'সেনামুখ্যবধ' প্রভৃতি নয়টি প্রকরণে নানারূপে শত্রুবঞ্চনার কৌশল বর্ণিত আছে।

উপরিউক্ত প্রকরণগুলির সার মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ ভেদনীতি অবলম্বনে দুর্ব্বল রাজা আক্রমণকারী ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন এবং শত্রু অপেক্ষা অধিক বলশালী রাজার সহায়তা লইয়া কিংবা তাদৃশ সাহায্যের অভাবে আক্রমণকারীর তুল্যবলসম্পন্ন এক বা বহু রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অথবা তাহারও অভাব হইলে তদপেক্ষা হীনবল সহায়ই বহুসংখ্যক সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন। ইহার কোনটিই সুলভ না হইলে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রবল শত্রুর বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তথায় অবস্থানকালে নিজের বন্ধুবর্গ এবং 'মধ্যম' ও 'উদাসীন'কে উক্ত 'অভিযোক্তা'র বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ভেদনীতির সাহায্যে শত্রুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী রাজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, পরপক্ষের রাষ্ট্র, দুর্গ ও স্কন্ধাবারের মধ্যে নানা উপায়ে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এইরূপে বিবিধ কৌশলে অনিষ্ট সাধন দ্বারা শত্রুকে বিব্রত করিয়া অবশেষে চর দ্বারা তাহাকে গোপনে হত্যা করাও কৌটিল্য অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য কেবল নিজ প্রভুর সাম্রাজ্য-নীতির অনুকূলেই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই; তিনি প্রবল ও দুর্ব্বল, উভয় প্রকার রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী করিয়া এই রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া একত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন,—মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর এবং মহারাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বান্ধব-সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই।

সদস্য

১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট—৯ আজীবন—৬, অধ্যাপক—৫, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ ২২৭৮, (কলিকাতা—১২৬৯ ও মফস্বল—১০০৯) মোট—২৩১৮।

(ক) বিশিষ্ট—আলোচ্য বর্ষে মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষ-শেষে বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য—বর্ষারম্ভে পরিষদের ৬ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নূতন কেহ আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে নূতন কোনও ব্যক্তি অধ্যাপক-সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হন নাই। সুতরাং এই সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় ৫ আছে।

(ঘ) মৌলবী-সদস্য—বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, মৌলবী-সদস্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের পর এ পর্য্যন্ত একজনও বঙ্গীয় মুসলমান মৌলবী-সদস্য-পদ গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর নহে এবং তন্মধ্যে মাদ্রাসা বা মোক্তবের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণেরও সংখ্যা বঙ্গদেশে অপ্রচুর নহে। পরিষৎ আশা করেন যে, অচিরে এই সকল জ্ঞানী মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার সেবায় পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে প্রথমে ২০ জন সহায়ক সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন সদস্যের স্থিতিকাল পূর্ণ হাওয়ায় বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং দুই জন সহায়ক-সদস্য তন নির্ব্বাচিতনূ হইয়াছেন। অন্যতম সহায়ক-সদস্য পঞ্চানন

বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় অকালে পরলোকগমন করায় পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ২১ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ১২৬৯ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৯৫ জনের নাম চাঁদা অনাদায় হেতু ও সদস্য-পদ ত্যাগ করার জন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৮ জন সদস্য পরলোকগত হইয়াছেন এবং ৪৫ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১০ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ১৪ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। একজন বিশিষ্ট-সদস্য ও দুইজন সহায়ক-সদস্য হইয়াছেন। এই প্রকার পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতা-বাসী সদস্যের সংখ্যা ১২০২ হইয়াছে।

(২) বর্ষারম্ভে পরিষদের মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ১০০৯ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পদ-ত্যাগ করায় এবং চাঁদা অনাদায় জন্য ২২৩ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং ৩০ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মফস্বল হইতে ১৪ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ১০ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর বর্ষান্তে মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ৮০৫ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট———১০	সাধারণ———২০০৭
আজীবন———৬	কলিকাতা—১২০২
অধ্যাপক———৫	মফস্বল-——৮০৫
মৌলবী——০	————
সহায়ক———২১	২০০৭

মোট ২০৪৯

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী ২০০৭ জন সদস্যের মধ্যে বহুদিন হইতে ৩৪২ জনের নিকট কোন চাঁদা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র ২ জন পুনরায় রীতিমত চাঁদা দিতেছেন।

পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ২৫ জন সাধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের মৃত্যুতেই স্বতন্ত্রভাবে শোক-প্রকাশ করা হইয়াছে। এ স্থলেও পুনরায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

সহায়ক-সদস্য

১। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সাধারণ-সদস্য

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (টালা, কলিকাতা)।
২। অবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল (কলিকাতা)
৩। কালীপ্রসন্ন পাইন (কলিকাতা)।
৪। খগেন্দ্রনাথ দে বি এ, এটর্ণি (কলিকাতা)।
৫। রাজমন্ত্র-প্রবীণ কাব্যানন্দ দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ (কলিকাতা)।
৬। দামোদরদাস বর্ম্মন (কলিকাতা)।
৭। নকড়ি রায় গুপ্ত (কলিকাতা)।
৮। নলিনীনাথ রায় এম্ এল সি (কলিকাতা)।
৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)।
১০। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ (পাটনা)।
১১। প্রিয়নাথ মল্লিক (কলিকাতা)।
১২। ভবানীনাথ রায় (পাবনা)।
১৩। রায় ভূপতিনাথ দাস বাহাদুর এম্ এ, বি এস্‌সি, এফ্ সি এস্ (হুগলী)।
১৪। রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর (রামগোপালপুর)।
১৫। রাখালরাজ রায় এম্ এ (রাজপুত তেঘড়ি, মুরশিদাবাদ)।
১৬। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন (কলিকাতা)।
১৭। ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (কলিকাতা)।
১৮। লক্ষ্মীমোহন মৈত্র (তালন্দ, রাজসাহী)।
১৯। শ্রীনিবাস দাস (কলিকাতা)।
২০। সতীশচন্দ্র মিত্র (হাওড়া)।
২১। সুকুমার রায় বি এস্‌সি (কলিকাতা)।
২২। কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)।
২৩। হেমেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা)।
২৪। কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব (কলিকাতা)।
২৫। হৃষীকেশ পাল (কলিকাতা)

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

আলোচ্য বর্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতেও ক্ষতি অনুভব করিয়া পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষের ৬ই শ্রাবণ তারিখে ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সহকারী

সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যথারীতি গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পর কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপরে ২৯শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত ও গৃহীত হয়। তাহার পর বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরখণ্ড ও খোদিত ইষ্টক প্রদর্শিত এবং পাঁচখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের তারিখ, অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০এ ভাদ্র, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা আহুট, আউট ও সার্দ্ধসংখ্যাবাচক শব্দাবলী—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্। (খ) পদসাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৬ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) চণ্ডীদাস ও বাসুলী-দেবী—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ, ও (খ) প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—আমাদিগের অয়নাংশ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২০এ আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—কৌলমার্গরহস্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৩ই মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পুথি—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২০এ মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—জালন্দার গর্ভ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ক-নাথ রায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৫ই ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৯এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ও (খ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

নবম মাসিক অধিবেশন—৩রা চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—মুরশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—১০ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বাঙ্গালী জাতির অভ্যুত্থা

—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ও (খ) শব্দ-সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৪টি প্রাচীন মথুরার মূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল ;—

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ও ১৯এ শ্রাবণ, বুধ ও শনিবার। এই দুই বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং "বিদ্যাপতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বৈষ্ণব কাব্য অর্থাৎ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর প্রভৃতির পদ" এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৯এ ভাদ্র, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয়-লিখিত "বিদ্যাপতি" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২১এ পৌষ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। এই অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর "হিন্দুর বিবাহে সুজন্ত-বিদ্যা (Eugenics)" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই মাঘ, বুধবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় "উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—১৯এ মাঘ, শনিবার। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায় মহাশয় পাঁচকড়ি বাবুর উদ্দেশে একটি গান করেন এবং কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবুর গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই প্রতিশ্রুতির জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—২৩এ মাঘ, রবিবার। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন; সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্র বাবুর চিত্রাবরণ উন্মোচন করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গগত মহাত্মার নানাবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—২৬এ মাঘ, বুধবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় "জৈনদর্শনে স্যাদ্‌বাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রায় কুমুদলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মৃত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করেন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—৯ই চৈত্র, শনিবার। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "জৈন দর্শন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে ১২ই মাঘ শনিবার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পরিষদের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে মধুসূদনের স্থান কত উচ্চে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই সুবিদিত। ১২৩০ বঙ্গাব্দে কবি এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। আলোচ্য বর্ষের উক্ত তারিখে তাঁহার একশত বার্ষিক জন্মদিন। কবির জীবন-চরিত্র-লেখক এবং পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে পরিষদে এই উৎসবের আয়োজন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে উক্ত দিবস পরিষদে এই জন্মোৎসব-সভার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই

সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। পরিষৎ এই কবির স্মৃতির প্রতি সভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আয়োজন করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবির জীবনী আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের চারি বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী ইলারাণী একটি কীর্ত্তন গান করিলে পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী স্ব স্ব কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় 'ব্রজাঙ্গনা' হইতে কীর্ত্তন গান করেন এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করেন। পরে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মধুসূদনের কাব্য হইতে কয়েকটি স্থান আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন :—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর
„ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
মহারাজাধিরাজ „ স্যর বিজয়চন্দ মহাতাপ বাহাদুর জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্
কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্
রায় „ যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
„ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

গিরিজাকুমার বসু

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই

পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

পরে „ অনাথনাথ ঘোষ

„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের যাবতীয় কর্ম্মভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতি, গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ এবং পরিষদের হিসাব সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রতি চাঁদা আদায় ও অন্যান্য বিষয়ে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়ের উপর মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন সম্বন্ধীয় কার্য্য ন্যস্ত ছিল। দুঃখের বিষয়, বৎসরের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদত্যাগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত ত্রিংশ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য বরাবরই সুশৃঙ্খলচালিত। তিনি বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চিত্রশালার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদভাজন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে গ্রন্থশালার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ বাবু বর্ষের শেষভাগে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ করেন। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'জন্মভূমি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়গণ যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষমধ্যে কর্ম্মোপলক্ষ্যে দিল্লী গমন করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—

(১) সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন, এম্ এ, বি এল
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
রায় " ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
অধ্যাপক " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্
" " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল
" " মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ
" সত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল, এফ জেড্ এস্
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
অধ্যাপক " নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

(২) শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" হরিহর শাস্ত্রী
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির চৌদ্দটি সাধারণ অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং চারিবার সার্কুলার পাঠাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করিয়া কোন কোন কার্য্য সম্পাদন করা হয়।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(১) দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের গ্রন্থ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(২) ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-লিখিত "জগৎ-কথা" প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৩) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর-লিখিত 'শব্দকোষে'র পরিশিষ্ট প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৪) 'সারস্বতিলক' গ্রন্থ প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৫) গ্রন্থাগার হইতে পাঠার্থ পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিন টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৬) 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরণ করা সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের কর্তৃপক্ষের পত্র আলোচিত হয় ও দ্রব্যাদি তাঁহাদের জিম্মায় পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৭) মহিলাগণের গ্রন্থাদি পাঠের ও দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্য মাসে একটি বৃহস্পতিবারে পরিষদ্-মন্দির খুলিয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৮) সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত এসোসিয়েশন, টোল প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থা এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক যে শাখা-সমিতি গঠিত হয়, তাহাতে গবর্মেণ্টের আহ্বানে পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(৯) স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত "কমলা-লেক্‌চারশিপ"এর বিষয় নির্ব্বাচন জন্য গঠিত শাখা-সমিতিতে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(১০) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং চিত্রশালা, পুস্তকালয়, আয়-ব্যয় ও ছাপাখানা, এই আটটি শাখা-সমিতি ব্যতীত, পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি, চাঁদা অনাদায় ও পদত্যাগ পত্র আলোচনার জন্য শাখা-সমিতি, বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিল আলোচনা-সমিতি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন-সমিতি ও বাঙ্গালায় শর্টহ্যাণ্ড লেখার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন

করার বিষয় আলোচিত হয় এবং এ সম্বন্ধে ৺ বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্রগণের সহিত পত্র ব্যবহার করা হয়।

(১২) পরিষদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়।

(১৩) চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে।

(১৪) বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের হিসাব সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, যে সকল ভাণ্ডারের অর্থ কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির আছে, সেই সেই তহবিল হইতে পরিষদের সাধারণ-তহবিলে গৃহীত হাওলাতি টাকার উপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দ হইতে ডাক ঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হারে সুদ দিতে হইবে, এবং সেই সেই তহবিলের ব্যয় (কর্ম্মচারীর বেতন ব্যতীত) সেই সেই তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করা হইবে।

(১৫) পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত "হেমচন্দ্র" নামক গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের মধ্যে উক্ত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান,—এই চারিটি শাখার কার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ স্থিরীকরণ, বিবিধ বিষয়ে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য এই সকল শাখার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।

(ক) সাহিত্য-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার পাঁচটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনগুলিতে ১৫টি প্রবন্ধ অলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ১০টি প্রবন্ধ অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। একটির বিষয়ে এখনও কিছু মীমাংসা হয় নাই। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। চণ্ডীদাস ও বাশুলী দেবী	শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ।
২। বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

প্রবন্ধ	লেখক
৩। পদসাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
৪। প্রাচীন বাঙ্গালা আছট, আউট ও সার্দ্ধসংখ্যাবাচক শব্দাবলী	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।
৫। বিদ্যাপতি	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৬। নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।
৭। উৎকলে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পুথি	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।
৮। শব্দ-সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্।
৯। বাঙ্গালা ভাষার অনুজ্ঞা	মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।
১০। নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত, গ্রন্থাগারের জন্য আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ পুস্তক খরিদ করা হইবে, তাহা এই শাখা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই শাখার অন্যতম সভ্য ৺রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্য এই শাখা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) দর্শন-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনগুলিতে মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলনের উপায় নির্দ্ধারণ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্বন্ধে প্রশাখা-সমিতি গঠন, বিভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম এবং বক্তা ও বক্তৃতার বিষয় প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধ	লেখক
১। কৌলমার্গ-রহস্য	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল।

বক্তা	বক্তৃতার বিষয়—
(১) শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ	উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব
(২) শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ	জৈনদর্শনে "স্যাদ্বাদ"
(৩) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	জৈনদর্শন

(গ) ইতিহাস-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে ৫টি প্রবন্ধ এবং ১ খানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ৪টি প্রবন্ধ মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং একটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 'কামন্দকীয় নীতিসার' গ্রন্থের সম্পাদন-প্রণালী শাখা-সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থ-সম্পাদক, সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পুনরায় গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া দিতে সম্মত না হইলে তাঁহাকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হইবে, স্থির হইয়াছে।

প্রবন্ধ	লেখক
১। জালন্ধার গড়	শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।
২। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।
৩। মুরশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি	শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।
৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জন্য পরিষৎকে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের এবং দেশবাসীর বিশেষ ধন্যবাদভাজন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভগবতরত্ন এম্ এ উড়িষ্যায় অনুসন্ধানের সূচনা করিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই অর্থে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আয়োজন করা যাইবে।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন) মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। এই বর্ষে শাখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

২। আমাদের অন্নদাংশ— ঐ

আলোচ্য বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ১৫০ খানি গ্রন্থ হইতে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক শব্দ রচিত ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল গ্রন্থের সন্ধান করা দুরূহ ব্যাপার। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পরিষৎ-পত্রিকায় এক

বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সন্ধান পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যের জন্য পরিষৎকে সেই সকল গ্রন্থ কিছু দিনের জন্য ধার দিলে বিজ্ঞান-শাখা বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। সম্প্রতি সংগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি অকারাদিক্রমে সাজান হইতেছে। পরে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুরের সম্পাদনে পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য একজন পৃথক্ বেতনভোগী অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন।

ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার এই প্রশাখা-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছে। জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির একজন সভ্য পঞ্চানন বন্দ্যো-পাধ্যায় বি এ মহাশয় পরলোকগমন করায় সমিতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ মহাশয় এই সমিতির নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সমিতির কার্য্য সম্পাদনে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

বিজ্ঞান-শাখার এই প্রশাখা-সমিতির আলোচ্য বর্ষে কোন কাজ হয় নাই। এই শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি।

উপরিউক্ত সমিতিগুলির সভ্য ও আহ্বানকারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। সভ্য-গণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এ বৎসরেও পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা হইতে এবং পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে ১১৩ খানি বিবিধ বিষয়ের পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা খরিদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে ৮ খানি সাহিত্য বিষয়ে ২৪ খানি, দর্শন শাস্ত্রের ৪ খানি, ইতিহাসবিষয়ক ২৫ খানি, দুষ্প্রাপ্য ১৪ খানি এবং বিবিধ বিষয়ে ৩৮ খানি পুস্তক খরিদ করা হয়।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্ম্মচারিগণের বেতন সমেত ১৮৭০৷৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৫০৲ কলিকাতা করপোরেশন হইতে ও অবশিষ্ট পরিষদের সাধারণ-তহবিল হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৯০৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৩ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ৮৬৬ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ২৩৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৩৫ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ২০০ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষমধ্যে সর্ব্বসমেত ১১৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের পুষ্টি-সাধনে যে সকল সদস্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতিপয় গ্রন্থকার ও প্রকাশককে তাঁহাদের প্রণীত বা প্রকাশিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দিবার জন্য আবেদন-পত্র পাঠান হইয়াছিল। ফলে কয়েকজন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন। সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই যথাসম্ভব শীঘ্র যাহাতে পরিষদে উপহার পাওয়া যায়, তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট হইতে ৩৩ খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ (Press List) উপহার পাওয়া গিয়াছে। Director of Industries, Bengal, তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাগুলি পাঠাইয়াছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution হইতে ১৯ খানি পুস্তক-পুস্তিকা যথারীতি উপহার পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার Anthropological Association Museum of Fine Arts, Boston, Naval Observatory এবং ফ্রান্সের Bulletin'de La Societe De Linguistique De Paris তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

চন্দননগরের 'প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউসের' কর্ম্মকর্ত্তা এবং কাশীর "জ্ঞান মণ্ডল" সম্পাদক তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সাগ্রহে উপহার পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রায় বহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত ১০ খানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—(১) সঙ্গীত গোপীচন্দ্র ভরথরী, (২) ভরথরী-চরিত্র, (৩) গোবিন্দচন্দ্র গাথা, (৪) গোপীচন্দ ভরথরী, (৫) গোপীচন্দ, (৬) সিহরপী গোপীচন্দ্র, (৭) সঙ্গীত গোপীচন্দ নাটক, (৮) নবনাথ ভক্তিসার (৯) সঙ্গীত গোপীচন্দ্র ও (১০) গোপীচন্দ্র রাজাকো খেয়াল।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১৩ খানি দৈনিক, ৪২ খানি সাপ্তাহিক, ২ খানি পাক্ষিক, ৬১ খানি মাসিক, ২ খানি দ্বৈমাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর হইতে ইণ্ডিয়া গেজেট আর পাওয়া যাইতেছে না।

Indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বসুমতী, এই তিনখানি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে এবং দৈনিক বসুমতী, বন্দেমাতরম্, নায়ক, The

Englishman, Indian Daily News, এই পাঁচখানি দৈনিক পত্র নগদ মূল্যে ক্রয় করা হইতেছে। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' গ্রন্থাগার হইতে ১৪ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শনার্থ পাঠান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য গ্রন্থগুলি পরিষদের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।

বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং সাময়িক পত্রিকাদির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকার তালিকার পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই প্রেসে দেওয়া হইবে এবং বর্ণানুক্রমিক তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলেই প্রেসে দেওয়া হইবে।

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ৫৷৷০টা হইতে ৭৷৷০টা পর্য্যন্ত সদস্যগণ পুস্তক আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন গবেষণা করিবার জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতেন।

সাধারণে পাঠাগারে বসিয়া যাহাতে পুস্তকাদি পাঠ ও গবেষণা করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুথিশালা

১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল—৪৫৪৯। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৮৫ খানি পুথি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, ১১ খানি সংস্কৃত পুথি ক্রীত হইয়াছে এবং ১ খানি পুথি অন্য স্থান হইতে আনাইয়া নকল করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় ৪৯ খানি, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ২৪ খানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় ৫ খানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় ২ খানি, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় ১ খানি, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব মহাশয় ১ খানি এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল প্রাপ্ত পুথির মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রদত্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত ঋগ্‌বেদসংহিতা, বাজসনেয় সংহিতা, সামবিধান ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য কয়েকখানি তন্ত্রের পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপহাররূপে প্রাপ্ত ৮৫ খানি পুথির মধ্যে ৫৭ খানি সংস্কৃত এবং ২৮ খানি পুথি বাঙ্গালা। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৬৪৬।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি	২৯৫৫
সংস্কৃত „	১৪২৬
অসমীয়া „	৬
ওড়িয়া „	৩

হিন্দী পুথি	২
ফার্সী	১২
তিব্বতীয়,,	২৪৪
ইংরেজী ,,	১
	৪৬৪৬

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন 'বাঙ্গলা পুথির বিবরণের' প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১ হইতে ১০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ৩০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও মহাকবি সঞ্জয় এবং কাশীরামদাসের মহাভারত অবলম্বনে উভয় গ্রন্থের উপাখ্যানগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে পুথিশালা হইতে মাসিক অধিবেশনে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুথিশালা হইতে কলিকাতা প্রদর্শনীতে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রাচীন পুথি প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথি-সংগ্রহ

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে উড়িষ্যা, নেপাল, আসাম প্রভৃতি স্থানে বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত কত যে পুথি রহিয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল পুথি আবিষ্কৃত হইলে বঙ্গসাহিত্যের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইবে। সম্প্রতি উৎকলদেশে পুরীতে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুথি অবলম্বন করিয়া পরিষদের উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় পরিষদের মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ঐ সকল পুথির নকল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত গৌর বাবুর অর্থের দ্বারা সম্প্রতি ঐ সকল বহুমূল্য পুথির নকল করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিমান বাবু স্বয়ং এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। পরিষদের হিতৈষী সদস্যগণ এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য দুষ্প্রাপ্য পুথির সন্ধান দিলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ উপকৃত হইবেন।

চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ষমধ্যে চিত্রশালা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নিরূপিত কার্য্য ব্যতীত ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' পরিষদের দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থার

আলোচনা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে কতিপয় প্রাচীন চিত্র, দলিল, দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে,—

(১) ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈল-চিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

(২) ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং ভ্রাতৃগণ।

(৩) চারিটি রৌপ্য মুদ্রা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন।

(৪) বঙ্গাব্দ ১১১২। ১১ই ভাদ্র তারিখের এক সনন্দ

(৫) „ ১১১২। ২৬ „ „ পাট্টা

(৬) „ ১১১২। ৭ মাঘ „ পাট্টা

(৭) „ ১১১২। ১২ মাঘ „ সনন্দ ও আমলনামা

(৮) „ ১২২৮ এক পত্র।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়।

৯।১০।১১।১২ চারিটি আধার সমেত মথুরার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন (প্লাষ্টার অব পারিসের ছাঁচ)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

বলা বাহুল্য, এই সকল দ্রব্য পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং প্রদাতৃগণ এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

দুঃখের বিষয়, অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য আশানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। বিগত বর্ষে প্রাচীন মুদ্রা খরিদ করিবার জন্য কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ৫১৲ দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে কোনও মুদ্রা খরিদ করিতে পারা যায় নাই এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের চিত্রশালার মুদ্রার তালিকা প্রস্তুতের যে ভার লইয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর "বাস্তুবিদ্যা" নামক শিল্পবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন। বিষয়টি এত জটিল যে, অনেক অংশের সুস্পষ্ট অর্থবোধে অসমর্থ হওয়ায় এ বিষয়ে সাহায্য করিতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তির চেষ্টা করিয়াও তিনি সন্ধান পান নাই।

আশা করা গিয়াছিল যে, আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি তথায় সজ্জিত করিতে পারা যাইবে। চিত্রশালা-সমিতি আরও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, "রমেশ-ভবনের" গৃহে পরিষদের চিত্রশালার সমস্ত দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া একটি সাধারণ প্রদর্শনী খোলা হইবে ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা চিত্রশালা সংক্রান্ত এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা

দেওয়াইবার ব্যবস্থা হইবে। অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন 'রমেশ-ভবন' সম্পূর্ণ না হওয়ায় চিত্রশালা-সমিতির উক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ভিতরের হলের মেঝের পাথর বসান, কার্ণিশ ও সিঁড়ির উপর পাথর বসান এবং জানালা দরজার রং বার্ণিশ হইলেই কাজ সম্পূর্ণ হয়। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার তার বসান পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ মন্দিরের ঐ সকল টুকরা কাজ বাকী রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্ট্রাক্টার মহাশয়গণ রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিলের টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা রমেশ-ভবন কমিটির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকার উপর এষ্টিমেট হইয়াছিল। তন্মধ্যে আঠার হাজার টাকা দিতে পারা গিয়াছে। তহবিলে যে টাকা রহিয়াছে, তাহার উপর এখনও ১২।১৩ হাজার টাকার অভাব রহিয়াছে। ঐ টাকা সংগৃহীত হইলে মন্দির পূর্ণাঙ্গ করিতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ হইলে পর রমেশ-ভবন কমিটির কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে সাহায্য-কারিগণের নাম ও সাহায্যের-পরিমাণ সহ মন্দির নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য নিম্নোক্তরূপে সম্পাদন করা হইয়াছিল।

১। ইঁহাদের স্মৃতি এই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে,—

(ক) কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার।

(খ) রাজা স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—মৃত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর।

(গ) দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাত্রী—মৃত মহাত্মার পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী।

(ঘ) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল এবং (চ) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই দুই জনের ব্রোমাইড চিত্র "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের" অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(চ) চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের একখানি রঞ্জিত ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ও তাঁহার সংগৃহীত অর্থে এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

(ছ) দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে এই চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

২। পূর্ব্বসঙ্কল্পিত স্মৃতি-রক্ষার কার্য্যগুলি এই ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার দিন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার তৈলচিত্রখানি আলোচ্য বর্ষেও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। ইহা শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

(খ) ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র। উহা অদ্যকার অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র। অদ্যকার অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। পূর্ব্বসংগৃহীত অর্থ হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

৩। নিম্নোক্ত মহাশয়গণের নামে যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে আলোচ্য বর্ষে সেই সকল ভাণ্ডারের অবস্থা নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বর্ষশেষে ২৮৬৵৯ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। বর্ষমধ্যে এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরের বিজ্ঞাপিত ৪২৮৵৯ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ৺বঙ্কিম বাবুর কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী মহোদয়ার নিকট হইতে তাঁহার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই।

(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তক বিক্রয় দ্বারা ১৸৶৬ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫২৸৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে বর্ষশেষে ১৭৮৪৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য কোন চাঁদা সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু উৎসবে ১৩৸৵০ ব্যয় হইয়াছিল। বর্ষশেষে ৭৭৷৶০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই, বর্ষশেষে ১৷৶৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৫৷০ হইতে "৫০টি অপ্রকাশিত প্রবাদবাক্য" সংগ্রাহককে ১০৲ মূল্যের একটি রৌপ্যপদক দানের পর এই তহবিলে ৬৫৷০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(জ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই তহবিলে প্রাপ্ত ২০০৲ টাকা কোম্পানীর কাগজের সুদ বাবদ ১০৲ আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ২৩০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত কবির লিখিত অপ্রকাশিত "ওমার খায়ম" প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে এবং কবির উত্তরাধিকারিগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইলে উহা প্রেসে দেওয়া হইবে।

(ঝ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৫০৲ চাঁদা মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র এই অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে ও সেই তৈলচিত্রখানি অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঞ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে এই তহবিলে ৩৪।৵০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। এই অর্থদ্বারা কি করা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্বসংগৃহীত ১০০৲ রহিয়াছে।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্বসংগৃহীত ৫০৲ টাকা রহিয়াছে। স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মভূমি সেনহাটী গ্রামে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া প্রস্তর-ফলক বসাইবার সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছে এবং ফলকও প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। এখনও স্তম্ভ প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কার্য্য শেষ হইতেছে না।

(ঢ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল। কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর এই তহবিলে ২৪৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ণ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল। স্মৃতি-রক্ষার জন্য গঠিত শাখা-সমিতির সভ্যগণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ৪৫৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর নিকট হইতে সম্প্রতি ১০০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে আবশ্যকমত অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পারা যাইবে।

৪। নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্যিকের মধ্যে কয়েকজনের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা সত্বরেই হইবে আশা করা যায়। অনেকের চিত্র প্রস্তুত করিবার উপযোগী ফটো সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশেরই স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সহৃদয় সদস্যগণের অনেকেই ইচ্ছা করিলে এক এক জন এক এক জন সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছেন।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (গ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ঘ) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঙ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (চ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,,

(ছ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (জ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (ঝ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঞ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, (ট) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঠ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ড) প্রাণনাথ দত্ত, (ঢ) অদ্বৈতচরণ আঢ্য (ণ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ত) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং (থ) রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় শীঘ্রই পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

৫। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(ক) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। একখানি তৈলচিত্র হইবে স্থির হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) অশ্বিনীকুমার দত্ত। একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পরিষদের অনুরোধে মৃত মহাত্মার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(গ) প্রাণতোষিণীতন্ত্র-প্রণেতা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হওয়ায় মৃত মহাত্মার বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অদ্যকার অধিবেশনে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উল্লিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল মহোদয় অর্থ ও চিত্রাদি দান করিয়া এবং সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বা দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালী, বাঁকুড়া কোতুলপুর এবং বাঁশবেড়েতে পরিষদের নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। ঐ সকল প্রস্তাবকর্ত্তার সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে চন্দ্রকোণায় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ শাখার অস্তিত্ব লোপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল-পরিষদের অনুসরণে স্থানীয় নানাবিধ সাহিত্যিক অনুসন্ধানের জন্যই বিভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবেই কোন কার্য্য হয় না বলিয়া শাখার অস্তিত্ব লোপ হয়। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে নানা রত্নের সঞ্চয় হইতে পারে এবং মাতৃভাষানুরক্ত ব্যক্তিগণ তজ্জন্য সামান্য পরিশ্রম করিলেই চলিতে পারে। দেশের এই নব জাগরণের দিনে বঙ্গবাসী এ ভাবে পিছাইয়া পড়িলে বাস্তবিকই নিরুৎসাহ হইতে হয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বঙ্গবাসিগণ নবীন উদ্যমে স্থানে স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপন করিয়া দেশমধ্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলনে যত্নপর হইবেন।

পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, কাশী, গৌহাটী, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, নদীয়া, উত্তরপাড়া, ভাগলপুর প্রভৃতির কার্য্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য শাখা যাহাতে ভবিষ্যতে সজাগ হইয়া উঠে, তজ্জন্য তাহাদের পরিচালকগণের নিকট সম্পাদক বিনীত অনুরোধ জানাইতেছেন। আনন্দের বিষয় যে, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে মেদিনীপুর-শাখা মূল-পরিষদের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

ছাত্রসভা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। এ বৎসর ছাত্রসভ্যগণের কোন অধিবেশন হয় নাই। নানা পারিবারিক অসুবিধায় পড়িয়া ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় এই সভার বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষে একজন ছাত্র ছাত্র-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

বিগত বর্ষে পরিষদের কতিপয় নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আসিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত শাখা-সমিতি সেগুলি আলোচনা করিয়াছেন। আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সেই মন্তব্য উপস্থিত করা হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেগুলি আলোচনা করিয়া সাধারণ-সদস্যগণের নিকট সে বিষয়ে মন্তব্য চাহিবেন।

ছাপাখানা সমিতি

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে এই সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে এ বৎসর মুদ্রণবিভাগীয় কার্য্য-সকল যথাসাধ্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে। চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা এবং তৎসহ পরিষদের বার্ষিক ও মাসিক কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসর 'উদ্ভিদ্-জ্ঞান' গ্রন্থের ১ম পর্ব্ব সূচী ও পরিশিষ্ট, পারিভাষিক শব্দ-সূচী অর্থ সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড (১—১০) ১০ ফর্ম্মা, সংকীর্ত্তনামৃত (১—২) ২ ফর্ম্মা, ন্যায়দর্শন ৩য় খণ্ড (৭—১৭) ১১ ফর্ম্মা, ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড (১—৫) ৫ ফর্ম্মা, সাধক-রঞ্জন (১—২) ২ ফর্ম্মা, রসকদম্ব (১—৫) ৫ ফর্ম্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল (৬—১২) ৭ ফর্ম্মা, মুদ্রিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্-জ্ঞান ২য় খণ্ড, পারিভাষিক শব্দের সূচী প্রস্তুত না হওয়ায় মুদ্রণ শেষ হয় নাই। লেখমালানুক্রমণী গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

ঐ সকল গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যতীত এই সমিতিতে ছাপাখানার বিল মঞ্জুর, ছাপাখানা নির্ব্বাচন, দর নির্ণয়, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ছাপাখানা-সমিতির সভ্য-মহোদয়গণের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইয়া গত বর্ষে এই বিভাগীয় কার্য্য-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন। উঁহারা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ১৩৪৯৭৸৶২ টাকা এবং ব্যয় ১৩০৮৯৵১১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের ও বিশিষ্ট ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত ১৮১৯৸৶৯ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত এবং কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাক টিকিট ধরিয়া) বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের মোট ১২২৮৵০ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত, কার্য্যালয়ে নগদ ও ডাক টিকিট মজুত ধরিয়া) উদ্বৃত্ত ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সর্ব্ববিধ আয় অপেক্ষা ৫৯১৷৷৭ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বজেটের ধৃত টাকার মধ্যে ২২৫০৸৵০ টাকা চাঁদা আদায় কম হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের নিকট বকেয়া ও বর্ত্তমান বর্ষের দরুন ৮০৯৫৷৷৶ টাকা চাঁদা অনাদায়ী রহিয়াছে। বাকী চাঁদার অন্ততঃ কতক অংশ অথবা বর্ত্তমান বর্ষের দেয় পুরা চাঁদার টাকা আদায় হইলেও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের ঋণ অনেক কমিতে পারিত। চাঁদা অনাদায় বা কম আদায়ের পক্ষে নিম্নোক্ত হেতুগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (ক) গ্রন্থাগারে ৩৲ তিন টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সদস্যগণকে পাঠার্থ পুস্তক দেওয়ার প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে প্রায় তিন শত সদস্য এই প্রথার প্রতিবাদস্বরূপ চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন এবং ৭৩ জন সদস্য এই হেতু পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত চাঁদা অনাদায় হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৩১২ জন সদস্যের নাম বাদ দিয়াছেন। (খ) কলিকাতায় চাঁদা আদায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সম্বৎসর কোন কার্য্য না করায় আদায় বিভাগের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। এই অসুবিধার মধ্যে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় আদায়ের কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা সহর ও মফস্বলে ২০০৭ ছিল দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৪০০ সদস্যের নিকট নিয়মিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট সদস্যের নিকট হইতে আদৌ চাঁদা পাওয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত দেশের দুর্ব্বৎসর জন্য চাঁদা আদায় আশানুরূপ সহজসাধ্য বা সন্তোষজনক হয় নাই। এইরূপে বর্ষশেষে সদস্যগণের নিকট ৮০৯৫৲ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে। সদস্যগণের নিকট যে চাঁদার টাকা অনাদায় রহিয়াছে, তজ্জন্য পরিষৎ যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াও তাহা আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। সদস্যগণের দেয় চাঁদার টাকার উপরই পরিষদের জীবন নির্ভর করিতেছে এবং এই চাঁদার টাকার ভরসাতেই পরিষৎ বর্ষারম্ভে যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ষশেষে নিয়মিত চাঁদার টাকা আদায় না হইলে পরিষৎকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বার্ষিক চাঁদার টাকা যাহাতে বর্ষমধ্যেই আদায় হইয়া যায়, তজ্জন্য পরিষৎ সদস্যগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আরও সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ নিজ দেয় চাঁদা বা প্রতিশ্রুত দান যেন বর্ষমধ্যেই প্রদান করিয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় বাণী-

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কার্য্যে আমাদিগকে সহায়তা করেন। আশা করি, পরিষদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও সদস্যগণের নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ বিফল হইবে না।

পূর্ব্ব বৎসরে পরিষদ্ মন্দির মেরামতের কথা আপনাদিগের গোচরে আনা হইয়াছিল। মন্দির মেরামতের কার্য্য কতক পরিমাণে হইয়াছে। কিন্তু কন্ট্রাক্টার এখনও তাঁহার বিলের প্রাপ্য পান নাই। অর্থাভাবে পরিষদ্ মন্দিরের আরও কয়েকটি অত্যাবশ্যক কার্য্য সমাধা করিতে পারা যাইতেছে না। মন্দির মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকার একটি দান ব্যতীত আর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। গৃহ-নির্ম্মাণের সময় পরিষদের যে সকল হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি এই সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিশ্রুতির টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে মন্দির মেরামতের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করা হইবে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন।

পরিষদের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে সকল টাকা এখনও অনাদায়ী রহিয়াছে, সেই সকল টাকা যাহাতে আদায় হইতে পারে তজ্জন্য পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত তিনি পরিষদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে আমরা আশা করি যে, তাঁহার চেষ্টা পরিষদের নানা উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবে, এজন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিষদের অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে যাওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথ বাবু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনসমূহে উপস্থিত থাকিয়া সমিতির যে সকল সভ্য কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

১। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ দান করিয়াছেন।

২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য ৫০৲ দান করিয়াছেন এবং তিনি পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুই দানের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী

৩। শ্রীযুক্ত জটলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন।

এই সকল অর্থ ও চিত্র দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারে বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ১৬০০৲ কোম্পানীর কাগজের সুদ ৫৯।০ টাকা, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ এবং উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ ১৩।০ টাকা, মোট ৭২৸০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, সহৃদয় বঙ্গবাসী এই ভাণ্ডার স্ফীত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ সাহিত্যিক ও তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পরিচালনে ঐ বর্ষে ত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখার অনুমোদিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ১৫টি প্রবন্ধ এই ত্রিংশ ভাগে রহিয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির ও তাহাদের লেখকগণের নাম দেওয়া গেল।

প্রাচীন-সাহিত্য—(১) উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় পুথি।—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।

সাহিত্য—(১) সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও আখ্যায়িকা,—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্।

দর্শন—(১) জৈন দর্শনে স্যাদ্‌বাদ (১ম অংশ), শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ।

ইতিহাস—(১-২) অর্থ-শাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ), এবং (৩) অর্থ-শাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (৪, আসামের নানা কথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ। (৫) পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, (৬) ঐ প্রবন্ধের আলোচনা—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

ভাষাতত্ত্ব—(১) প্রাচীন বাঙ্গালা 'আহুট', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যাবাচক শব্দাবলী—এবং (২) বাঙ্গালা ভাষার কর্ম্ম ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

বিজ্ঞান—(১) যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—(১) আলোক বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা, এবং (২) চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, (৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নাদ-বিজ্ঞান)—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি।

শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রাচীন সাহিত্য ১, সাহিত্য ১, দর্শন ১, ইতিহাস ৬, ভাষাতত্ত্ব ২, বিজ্ঞান ১ এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ৩।

গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিয়াছিল,—

১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড)—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

২। শ্রীসংকীর্ত্তনামৃত—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৩। ন্যায়দর্শন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

৪। উদ্ভিদ্‌জ্ঞান (১।২ পর্ব্ব)—সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্।

৫। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

৬। রসকদম্ব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

৭। সাধক-রঞ্জন—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৮। লেখমালানুক্রমণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

৯। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড) সঙ্কলয়িতা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

ইহার মধ্যে উদ্ভিদ্‌-জ্ঞান ১ম পর্ব্ব, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড এবং লেখমালানুক্রমণী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আজকাল সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে দিন দিন কত আলোক সম্পাত হইতেছে। এই অনুসন্ধান-কার্য্য বিপুল অর্থসাপেক্ষ। বঙ্গদেশে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' এ বিষয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' ও আরও অনেক অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থাভাবে পরিষৎ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। যদিও পূর্ব্বে কতিপয় হিতৈষী সদস্য স্বব্যয়ে এবং পরিষদের ব্যয়ে বঙ্গের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তথাপি সে সকল অনুসন্ধান পর্য্যাপ্ত নহে—। তাহা সকলেই স্বীকার করেন। পরিষদের এই অভাব লক্ষ্য করিয়া বিগত বর্ষে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষেও শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্দেশ্যে ও প্রাচীন

পুথি উদ্ধারের জন্ম ৫০০৲ দান করিয়াছেন। এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বঙ্গের লুপ্ত গৌরব—সাহিত্যে-শিল্পে বঙ্গমাতার পূর্ণ সম্পদ্ উদ্ধারের জন্ম পরিষৎকে অর্থ-সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য শ্রীযুক্ত অধর বাবুর প্রদত্ত অর্থের সুদ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন নাই।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য প্রবন্ধ লিখিতে সাধারণকে আহ্বান করা হয়। বহুদিন ধরিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে, অথচ উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। এই জন্য প্রবন্ধের বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, তদ্বিষয়ে সম্পাদক পদক ও পুরস্কারদাতৃগণের সহিত আলোচনা করিবেন। এই সমস্ত কারণে পদক ও পুরস্কারের বিজ্ঞাপন আলোচ্য বর্ষে দিতে পারা যায় নাই।

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

(২) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক। বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

(৩) রামগোপাল রৌপ্য-পদক। বিষয়—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

(৪) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বিষয়—বাঙ্গালার গীতিকাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

(৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক(খ)। বিষয়—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী চরিত্র।

(৬) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক। বিষয়—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

(৭) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)। বিষয়—শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,—

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের স্চী প্রণয়ন জন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিবেন।

(২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শত বার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য মাইকেলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখককে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় 'দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী পদক' নামে এক রৌপ্য-পদক দিবেন।

এই দুই পদক দানের প্রস্তাবের জন্য দাতৃগণের নিকট পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষের আবেদনের ফলে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ইং ১৯২৩।২৪ সালের জন্য পরিষৎ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত করপোরেশন হইতে পরিষদের গ্রন্থাগারে পূর্ব্ব বর্ষের এবারেও ৬৫০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ ১৩৩১ তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের জন্মভূমিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি, এটর্ণি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় সম্পাদক হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। মূল সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, এবার সাহিত্যিকগণের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

উপসংহার

সংক্ষেপে পরিষদের ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ অদ্যকার বার্ষিক সভায় উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্যবিবরণ হইতে পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য সকল দিক্ দিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটী নূতন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

[১] পরিষদের কার্য্যালয়ে প্রথম বর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নথি, খাতাপত্র প্রভৃতি আছে, অনেক সময় ঐ সমস্ত পুরাতন নথি বাহির করিয়া দেখিয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু সেগুলি খুঁজিবার সময় পরিষদের কর্ম্মচারীদের বড়ই হয়রাণ হইতে হইত। নথি সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও সময়মত উত্তর পাওয়া যাইত না। এইরূপ বহু অসুবিধা হইত এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা দূর করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে নথি ও খাতাপত্রাদির একটী বিস্তৃত Index বা সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কার্য্যালয়ের নথিপত্রাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

[২] মাসিক অধিবেশনে পাঠ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহাতে সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণের আলোচনায় সুবিধা হয় তজ্জন্য আলোচ্য বর্ষ হইতে অধিবেশনের পত্রে প্রবন্ধের নামের সহিত তাহার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[৩] পুথিশালায় পাঁচ হাজার পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ক্রমিক-সংখ্যা দিয়া পুথি-গুলির একটী তালিকাও আছে। কিন্তু কাহাকেও কোন বিশেষ বিষয়ের পুথি দেখিতে হইলে সমস্ত তালিকা না খুঁজিলে সে বিষয়ের পুথির অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় থাকে না। কিন্তু যদি বিষয়ানুসারে একটী সূচী (Subject Catalogue) থাকে তাহা হইলে অনুসন্ধানকারীর কার্য্যের সুবিধা হয়। এ বৎসর পরিষৎ বাঙ্গালা পুথির এইরূপ একটী সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর একটী কার্য্যে পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য পুথিশালায় রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুথির নকল করাইয়া পরিষদের পুথিশালায় রাখিবার জন্য চেষ্টা হই-তেছে। এ বৎসর সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রঘুনন্দনের পুরুষোত্তম-তত্ত্বের দুষ্প্রাপ্য পুথির অনু-লিপি পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের ধন্যবাদভাজন।

[৪] বাঙ্গালা দেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নাল ব্যতীত কোন পত্রিকার বিষয়-সূচী (Subject Index) দিবার ব্যবস্থা নাই। বিষয়-সূচীর উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সূচী থাকিলে গবেষণাকারীর অনুসন্ধানের সুবিধা হয়। আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা ত্রিশ বৎসর বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে পত্রিকার এক বৎসর পূর্ণ হইলে পত্রিকার এক বৎসরের ৪ সংখ্যার বিষয়-সূচী প্রকাশিত হইত না। সুখের বিষয়, এ বৎসর ১৩২৯ বঙ্গাব্দের পত্রিকার বিষয়-সূচী প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের পত্রিকারও বিষয়-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে, শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

[৫] দেখা যাইতেছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিষৎ-পত্রিকার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। অনেক বিশিষ্ট স্থান হইতে আমরা বিনিময়ে পত্রিকা পাইয়া থাকি ও পাইবার আশা রাখি। ইউরোপের পত্রাদিতে পরিষৎ-পত্রিকার উল্লেখও দেখা যায়। পরিষদের গবেষণার সহিত বিদেশী মনীষীদের পরিচিত রাখিবার জন্য এ বৎসর পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম ইংরেজিতে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

[৬] বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে সাহিত্যিক গবেষণায় সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ Bureau of Information বা অনুসন্ধান-সমিতিরূপে আলোচ্য বর্ষে প্রায় পঞ্চাশ জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীকে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ সাহিত্যিক-গণকে প্রবন্ধ, পুস্তক বা সংবাদাদির সন্ধান দিতে সকল সময়ই প্রস্তুত। এ বৎসর যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সাহিত্যিক সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদিগকে সংবাদদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

[৭] পরিভাষা-সঙ্কলনের কার্য্যের সূচনা পরিষৎ অনেক দিন হইতেই করিয়াছেন। কিন্তু এতদিন কর্ম্মীর অভাবে এই কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সুখের বিষয়, বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এবার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আপনাদের নিকট উপস্থিত করা যাইবে।

পরিষদের অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিষদের কি কি বিষয়ে অভাব তাহাও আপনাদিগকে জানান উচিত মনে করি। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে পরিষদের কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটী জিনিসের আবশ্যক—প্রথম উপযুক্ত কর্ম্মী, দ্বিতীয়—অর্থ। বঙ্গদেশে বাণী ও লক্ষ্মীর কৃপাভাজন বঙ্গবাণীর সুসন্তানের অভাব নাই। তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা এই বাণী-মন্দিরে সমবেত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ সামর্থ্য ও সুবিধা অনুসারে বঙ্গবাণীর সেবায় তৎপর হউন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজের নিকট বরেণ্য স্থান লাভ করুক। আর পরিষৎ যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাহার অনেকগুলি এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা একটু সচেষ্ট হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করুন।

পরিশেষে একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। এই এক বৎসর কাল সম্পাদকরূপে পরিষদের সেবা করিতে গিয়া আমার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আপনাদের নিকটও আমি ক্ষমা প্রার্থী। পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে পরিষদের যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সদস্য, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্য আমাকে পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়াছেন এবং পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত পরিষদের গুরুভার বহন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব হইত না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কার্য্যব্যপদেশে হয়ত অনেক সময় তাঁহাদের সহিত আমার মতভেদ হইয়া থাকিবে; আমি আশা করি, তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে যেন ক্ষমা করেন। তাঁহাদের উপদেশ, উৎসাহ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া তাঁহারা আগামী বর্ষে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে—মাতৃভাষার সেবাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হউন এবং ভাষাজননীর সর্ব্বাঙ্গীন সম্পদ্ বৃদ্ধি করুন—এই প্রার্থনা জানাইয়া এই কার্য্যবিবরণের পরিসমাপ্তি করিলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির   শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বঙ্গাব্দ ১৩৩১, ৪ঠা শ্রাবণ।   সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার—সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-নাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(গ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ্ ডি; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি—সভাপতি, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ

দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এম্ এ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

[ঙ] ফলিত-জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

[চ] চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)।

[ছ] পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু এম বি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই (গ্রন্থাধ্যক্ষ), পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—আহ্বানকারী (গ্রন্থাধ্যক্ষ)।

[জ] চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, (এডিন), শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

[ঝ] ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

[ঞ] আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, এফ জেড এস, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী।

[ট] কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবী কাজি নজরুল ইস্‌লাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

[ঠ] নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—আহ্বানকারী।

[ড] সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি—১৪শ বর্ষ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি এ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, মৌলভী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ।

[ঢ] আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি সমিতির কার্য্যকরী সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সহকারী সম্পাদক।

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। Forward.
৫। The Indian Mirror.
৬। আনন্দ-বাজার-পত্রিকা
৭। স্বরাজ
৮। স্বদেশ
৯। হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Mussalman.
৩। The Telegraph.
৪। The World and the New Dispensation.
৫। আত্মশক্তি
৬। এডুকেশন গেজেট
৭। খুল্‌না-বাসী
৮। গৌড়-দূত
৯। গৌড়ীয়
১০। চারুমিহির
১১। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১২। ছোল্‌তান
১৩। জাগরণ
১৪। ঢাকা-প্রকাশ
১৫। নব-সজ্ঘ
১৬। নীহার
১৭। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৮। পল্লীবাসী
১৯। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২০। বঙ্গবাসী
২১। বঙ্গরত্ন
২২। বরিশাল-হিতৈষী
২৩। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৪। বসুমতী
২৫। বাঁকুড়া-দর্পণ
২৬। বাঁশরী
২৭। বিজলী
২৮। বীরভূম-বার্ত্তা
২৯। ময়মনসিংহ-সমাচার

৩০। মালদহ-সমাচার
৩১। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩২। মোহাম্মদী
৩৩। যুগান্তর
৩৪। যুগবার্ত্তা
৩৫। শঙ্খ
৩৬। শিক্ষা-সমাচার
৩৭। শিশির
৩৮। সচিত্র শিশির
৩৯। শ্রীকৃষ্ণ
৪০। সঞ্জয়
৪১। সঞ্জীবনী
৪২। সময়
৪৩। স্বরাজ
৪৪। সোনার বাংলা
৪৫। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। ধর্ম্মতত্ত্ব

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Calcutta Medical Journal.
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। Devalaya Review.
৬। Health and Happiness.
৭। Industry.
৮। Indian Medical Record.
৯। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১০। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১১। The Mahamandal Magazine.
১২। Success.
১৩। The Vedanta Kesari.
১৪। অর্চ্চনা
১৫। আমার দেশ
১৬। আর্য্যদর্পণ
১৭। আয়ুর্ব্বেদ
১৮। আলোচনা
১৯। ইস্‌লাম-দর্শন
২০। উৎসব
২১। উদ্বোধন
২২। উপাসনা
২৩। কায়স্থ
২৪। কায়স্থ-পত্রিকা
২৫। কায়স্থ-সমাজ
২৬। কৃষক
২৭। কৃষি-সম্পদ্
২৮। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা
২৯। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩০। জন্মভূমি
৩১। তরুণ
৩২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৩। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৪। ত্রিশূল
৩৫। ধর্ম্মপ্রচারক
৩৬। নব্যভারত
৩৭। পরিচারিকা
৩৮। প্রজাপতি
৩৯। প্রবর্ত্তক
৪০। প্রভাতী
৪১। প্রতিভা
৪২। প্রবাসী

৪৩। প্রাচী

৪৪। বঙ্গবাণী

৪৫। ব্রহ্মবাদী

৪৬। ব্রহ্মবিদ্যা

৪৭। ব্রাহ্মণসমাজ

৪৮। ভক্তি

৪৯। ভারতবর্ষ

৫০। ভারতী

৫১। মাতৃ-মন্দির

৫২। মাধবী

৫৩। মাধুকরী

৫৪। মানসী ও মর্ম্মবাণী

৫৫। মাহিষ্য-সমাজ

৫৬। যমুনা

৫৭। যোগিসখা

৫৮। শিক্ষক

৫৯। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক

৬০। সন্দেশ

৬১। সরস্বতী (হিন্দী

৬২। সাহিত্য

৬৩। সাহিত্য-সংবাদ

৬৪। সুবর্ণবণিক্-সমাচার

৬৫। সৌরভ, ৬৬। স্বাস্থ্য-সমাচার

৬৭। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। প্রভাতী [বসন্ত সংখ্যার পর মাসিক আকারে]

২। Museum of Fine Arts Bulletin. Boston.

৩। সাম্যবাদী

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা

২। সাহিত্য-সংহিতা

৩। সংস্কৃত-ভারতী

৪। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)

৫। Quarterly Journal of the Mythic Society.

৬। বঙ্গ-সাহিত্য

৭। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী)

৮। কংসবণিক্ পত্রিকা

কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অবস্থায় গণনা করিয়া পাওয়া গেল উদ্বৃত্ত
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	২১	২	১৯	৬	১৩
২।	রসমঞ্জরী	১৬	২	১৪	০	১৪
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৬৬	০	০	৬৬	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৮	২	১৬	২	১৪
৫।	বনমালীদাসের জয়দেব-চরিত্র	৬৮	৬	৬২	২	৬০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৬৮	১০	৫৮	০	৫৮
৭।	জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	১৯	২	১৭	১	১৬
৮।	ধর্ম্ম-মঙ্গল	২৭	২	২৫	৪	২১
৯।	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৫	২	২৩	৪	১৯
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৪	২	২২	০	২২
১১।	কাশী-পরিক্রমা	২৪	২	২২	০	২২
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	৯৩	১১	৮২	৫	৭৭
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব ১ম	৬	০	৬	০	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২২	০	২২	০	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৭৮	৮	৭০	০	৭০
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	৩০	১	২৯	২	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬২	৭	৫৫	৭	৪৮
১৮।	শূন্যপুরাণ	২০	১	১৯	৫	১৪
১৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমা	২	০	২	০	২
২০।	শতপথব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	২৯	০	২৯	০	২৯
২১।	” ২য় ”	২৬	০	২৬	৬	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বসু	২৮	০	২৮	০	২৮
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৮	০	৩৮	৫	৩৩
২৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	১৪৬০	১৪	১৪৪৬	২০	১৪২৬+১১
২৫।	মায়াপুরী	১৮৬	১৪	১৭২	৭	১৬৫
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়-শিক্ষা	৬৮	৩	৬৫	০	৩৫+১১
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৪	০	২৪	৮	১৬
২৮।	কবি হেমচন্দ্র	২০১	১	২০০	১০০	১০০

কার্য্য-বিবরণ

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অব করিয়া প উদ্বৃত্ত
২৯।	শ্রীভাষ্য ১ম	১	০	১	০	১
৩০।	" ২য়	২৬	১	২৫	৪	২১
৩১।	" ৩য়	৪২	১	৪১	৪	৩৭
৩২।	" ৪র্থ	৪৪	১	৪৩	৩	৪০
৩৩।	" ৫ম	৫৫	০	৫৫	০	৫৫
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম	১	০	১	০	১
৩৫।	" ২য়	৩৭	২	৩৫	১৫	২০
৩৬।	" ৩য়	২১৪	২	২১২	১৫৪	৫৮
৩৭।	" ৪র্থ	২৩৪	৪	২৩০	৫	২২৫
৩৮।	শব্দকোষ ১ম	৬০	৩	৫৭	৭	৫১
৩৯।	" ২য়	৭২	৩	৬৯	৭	৬২
৪০।	" ৩য়	৯৩	৩	৯০	৩	৮৭
৪১।	" ৪র্থ	১৯৯	৩	১৯৬	২১	১৭৫
৪২।	ব্যাকরণ	৪৮	০	৪৮	০	৪৮
৪৩।	ব্রতকথা	৭	১	৬	০	৬
৪৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	২১	১	২০	০	
		৬৩	২	৬১	০	৬১
৪৬।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৬৭	১২	১৫৫	০	১৫৫
৪৭।	প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ১ম সং	৪৭	০	৪৭	০	৪৭+১৬
৪৮।	ঐ " ২য় সং	৬১	১	৬০	০	৬০+৯০
৪৯।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং	২৪১৬	১২	২৪০৪	১২৯	২২৭৫
৫০।	দুর্গামঙ্গল	১৪৯	১৩	১৩৬	০	১৩৬
৫১।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১ম	৮৬৩	৫	৮৫৮	০	৮৫৮
৫২।	ঐ ২য়	৮৫৭	৫	৮৫২	০	৮৫২
৫৩।	ঐ ৩য়	৮৩৫	৭	৮২৮	০	৮২৮
৫৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৭	০	২৭	১৭	১০
৫৫।	তীর্থমঙ্গল	৪০০	১২	৩৮৮	২	৩৮৬
৫৬।	মৃগলুব্ধ	৫৮৬	১১	৫৭৫	০	৫৭৫
৫৭।	সত্যনারায়ণের পুথি	৭৬	০	৭৬	৫	৭১

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অবস্থায় গণনা করিয়া পাওয়া গেল উদ্বৃত্ত
৫৮।	পদকল্পতরু ১ম খণ্ড	৭৮৪	৪৯	৭৩৫	১৪৪	৫৯১
৫৯।	,, ২য় খণ্ড	১৫১৭	৪৭	১৪৭০	০	১৪৭০
৬০।	,, ৩য় খণ্ড	১৫৭৯	৫০	১৫২৯	০	১৫২৯+৩৮
৬১।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪৩৩	১২	৪২১	০	৪২১
৬২।	তীর্থভ্রমণ	২৭৬	১৩	২৬৩	৬	২৫৭
৬৩।	গঙ্গামঙ্গল	৯৩	১১	৮২	০	৮২+৪
৬৪।	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	১৩৪	১৯	১১৫	০	১১৫+৫০
৬৫।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৩৮৩	৩	৩৮০	০	৩৮০+২২
৬৬।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৭৭	১	৭৬	০	৭৬+২৪
৬৭।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৪৫৪	৬১	৩৯৩	৫	৩৮৮
৬৮।	জ্ঞানসাগর	১৬০	১২	১৪৮	০	১৪৮
৬৯।	সারদামঙ্গল	১৭৭	১২	১৬৫	৬	১৫৯
৭০।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৫৪	১৪	১৪০	০	১৪০
৭১।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১৬৯	১	১৬৮	৪৫	১২৩
৭২।	ন্যায়দর্শন ১ম	৫৩৫	৪৮	৪৮৭	৭	৪৮০
৭৩।	ঐ ২য়	৭৮৫	৪৭	৭৩৮	৭	৭৩১
৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৪২২	১২	৪১০	১৫	৩৯৫
৭৫।	সর্ব্বসংবাদিনী	৮৯৬	২০	৮৭৬	১৫	৮৬১
৭৬।	মনোবিজ্ঞান	৮৮৭	১৪	৮৭৩	২৩	৮৫০
৭৭।	গোরক্ষ-বিজয়	৬৮৭	৫	৬৮২	০	৬৮২
৭৮।	চিত্রশালার তালিকা	৫৯৭	৬	৫৯১	০	৫৯১
৭৯।	উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ১ম খণ্ড	৯৭২	১০	৯৬২		৯৬২

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।
৩।৪।৩১

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
৬।৪।৩১

দ্বাত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য— সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন কোহিনূর প্রেসে, প্রাচীন পুথির বিবরণ বেঙ্গল প্রিণ্টার্স দ্বারা, মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতে প্রায় ডবল-কলমে ৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃত-বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an outcome of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master-poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদ-রত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী, অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
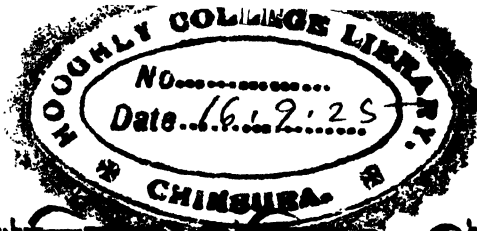
-: o :-

পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরি-বংশ'*

চারি পাঁচ বৎসর হইল, পাবনার সরকারী উকিল বন্ধুবর রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সৌজন্যে কবি ভবানন্দের রচিত 'হরি-বংশ' নামক বৃহৎ পুথিখানা আমাদের হস্তগত হয়। আমরা ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় ঐ পুথিখানার একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু উহার অল্প কিছু দিন পর হইতেই ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ঐ পুথির বিবরণ বেশীর ভাগই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে আপনারা পূর্ব্ব-বঙ্গে সমাগত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে আধুনিক সময়ে দুই একজন শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন কালে তেমন কোনও শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভবানন্দের 'হরি-বংশ' পুথিখানা পাইয়া, উহার আলোচনা করিয়া আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের এই অজ্ঞাত-প্রায় প্রাচীন কবি, পশ্চিম-বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও, কবি-প্রতিভা ও রচনা-নৈপুণ্যে কবি ভবানন্দের স্থান পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে খুব উচ্চে, এমন কি, সর্ব্ব-উচ্চে নির্দ্দেশ করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; তাই আজ আপনাদিগের সমক্ষে দেড় শত বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক প্রাচীন 'হরি-বংশ' পুথিখানি উপস্থিত করিয়া, উহার সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই।

প্রথমেই বক্তব্য যে, কাব্যখানার নাম 'হরি-বংশ' হইলেও এবং কবি তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় 'নারদীয় পুরাণ' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিলেও এই পুথিখানা অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত 'হরি-বংশ' কিংবা নারদীয় পুরাণের অনুবাদ বা অনুসরণ নহে; হরি-বংশ বা নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধার কোনও উল্লেখ বা তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার কোন প্রসঙ্গই নাই। ভাগবতের বর্ণিত ব্রজ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন গোপিকার উল্লেখ থাকিলেও, ভাগবতের ব্রজ-লীলার সহিত ভবানন্দের বর্ণিত লীলার বিশেষ কোনই সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যেরূপ নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনা-প্রসূত নূতন কাব্য, ভবানন্দের 'হরি-বংশ'ও সেরূপই বটে;

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে (মুন্সিগঞ্জে) সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিতও বর্ণনীয় বিষয়ে 'হরি-বংশের' বিশেষ কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন বঙ্গ-সমাজে উক্ত কবি-দ্বয়ের এই দুঃসাহস-পূর্ণ পুরাণ-বিরোধিতা তাঁহাদের অসাধারণ কবি-কল্পনার পরিচায়ক হইলেও, দুই জনের পক্ষেই এই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভাল হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা হরি-বংশ—কোনও কাব্যই সমাদর লাভ করে নাই ; সে জন্য দুইখানা কাব্যই একরকম বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ; বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার কাব্য উপেক্ষা করিলেও তাঁহার নামটী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ; তাই তাঁহারা বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সঙ্গত রস-ভাব-শুদ্ধ পদাবলী রচনা করিয়া, চণ্ডীদাসের নামে সেগুলিকে চালাইয়া কবির ও নিজেদের মুখ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যখানার সে সৌভাগ্য ঘটে নাই ; তাই ভবানন্দের নাম আর তাঁহার কাব্যখানা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর সম্পাদকতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানি কয়েক বৎসর হইল, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে ; পূর্ব্ব-বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ভবানন্দের বিলুপ্ত-প্রায় এই কাব্যখানিও প্রচারিত হইবে না কি ? আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন-সাহিত্যের প্রকাশকদিগের সুদৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

'হরি-বংশ' কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে ঐ কাব্যখানার সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই চারিটী কথা বলিব। 'হরি-বংশ' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত কেবল সুর-তাল-সংযুক্ত গীত বা পদের দ্বারা পূর্ণ কিংবা উহা উক্ত পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসের মত পদবর্জ্জিত নহে। উহাতে 'পদ-বন্ধ' বা পয়ার ও 'গান-ছন্দ' বা সুর-সংযুক্ত গান অর্থাৎ পদ, উভয়ই পাওয়া যায়। আমাদিগের সংগৃহীত হরি-বংশের প্রাচীনতর ও বৃহত্তর পুঁথিখানিতে পয়ারের শ্লোকসংখ্যা ৪৪০৯ ও পদের সংখ্যা ১২৮। পদগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব পদাবলী-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষিত হয় ; কিন্তু হরি-বংশের মূল বিষয়টী মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত। মহাকাব্য মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত, দুই প্রকারই হইতে পারে ; কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিয়োগান্ত কাব্য-রচনা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ জন্য ভারতের প্রাচীন কাব্যগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই মিলনান্ত সমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-পূর্ণ ব্রজ-লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণের কংস-বধের জন্য মথুরা-গমন দ্বারা যে 'মাথুর' বা বিরহ-লীলার আরম্ভ, তাহা নিতান্তই শোকাবহ বলিয়া "রাধামাধবোদয়"-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কোনও কোনও বৈষ্ণব কবি তাঁহাদিগের গ্রন্থে মাথুর বা বিরহলীলা মোটেই প্রদর্শন করেন নাই। কীর্ত্তন-গায়কেরা শুধু শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্যই মাথুরের পদাবলীর শেষে দুই একটি ভাব-সম্মিলন বা স্বপ্ন-সম্মিলনের পদ গাহিয়া পালা শেষ করিয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বরাগ, মান প্রভৃতি সকল পালার শেষেই মিলনের পদ গাহিবার রীতি আছে। এই পালাগুলি গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া, উহাদিগের সমষ্টি দ্বারা যে

সম্পূর্ণ ব্রজলীলা সংগ্রথিত হইয়াছে, উহাতেও গীতি-কাব্য ব্যতীত মহাকাব্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু ভবানন্দ সেই ব্রজলীলা অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল বিষয়টী সম্পূর্ণ উচ্চাঙ্গের মহাকাব্যের উপযুক্ত। হরিবংশের মূল বিষয়—ভূভার হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ নারায়ণের সহিত ব্রজলীলার অবসানে, তাঁহারই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে বিরহশোকাতুরা তিলোত্তমা-নাম্নী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দেহে বিলয়-প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার এই অচ্ছেদ্য মিলন কবি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ অঙ্গের বিয়োগান্ত কাব্যের ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। আমরা কোনও সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থেই এইরূপ কথা-বস্তু (Plot) দেখিতে পাই নাই ; বোধ হয়, ইহা ভবানন্দেরই কবি-কল্পনা-প্রসূত ; বহু-শ্রুত পৌরাণিক প্রাচীন আখ্যায়িকাটীকে এইরূপ নবীন আকার প্রদান দ্বারা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভবানন্দ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। হরিবংশ কাব্যের বর্ণিত সকল বিষয়ের আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর হইবে না ; তাই শুধু প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসম্ভব কবির ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব ; ভরসা করি, উহা দ্বারা ভবানন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ও তাঁহার কবিত্ব, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষিৎ-কুলজাত জন্মেজয় নৃপতি গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া, মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চারি বেদ বিখ্যাত করিলা মহামুনি।
বিস্তারিয়া হরিবংশ কহ চাহি শুনি॥
ই বড় বিস্ময় মুনি জিজ্ঞাসিব তোমা।
কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন কেনে হৈল তিলোত্তমা॥"

ব্যাসদেব রাজার সেই প্রশ্নের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি।
স্মরণ করিছ ভাল পূর্ব্বের কাহিনী॥
* * *
একচিত্তে শুচি হৈয়া শুন নরেশ্বর।
হরির যথেক গুণ কাব্য-মনোহর॥"

এইরূপে হরিবংশ কাব্যের সূত্রপাত হইল। আমরা দেখিতে পাই, প্রথমেই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা হরির নিকট যাইয়া, তাঁহাকে দানব, অসুর ও দুষ্টদিগের নাশের জন্য স্তব-স্তুতি করায়, তিনি বসুদেবের ঔরসে, দৈবকীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"দেবের স্তুতিয়ে আমি জন্মিব পৃথিবীত।
কোন্ রূপে যাইবা তুমি আমার সহিত॥"

তাঁহারা উত্তর করিলেন,—

"বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু যাইবা পৃথিবীত্।
নিজ রূপে আমি দুই যাইব সহিত ॥"

শ্রীহরি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"গর্ভ-বাস হইলে হইব অবতার।
বিনে গর্ভ-বাসে জন্ম নহিবেক তোমার ॥"

লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীহরির সঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া, পুনরায় সেইরূপ নর-দেহ ধারণের ক্লেশ এড়াইবার জন্য অনেক কান্দাকাটি করিলেন; কিন্তু শ্রীহরি লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকিবেন কি প্রকারে? তাই, তিনি নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনাইয়া লক্ষ্মীর মত জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে বলিলেন,—

"খেদ পরিহর প্রিয়া চিত্ত কর স্থির।
লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর ॥
তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত।
রাধা হেন নাম হৈব জগত-বিখ্যাত ॥
পঞ্চদশ কলা জন্মিব গোপ-ঘরে।
ভৃগুর উরসে (আর) বিমলা-উদরে ॥
এক কলা জন্ম হৈব বিদর্ভ-নগরে।
কাম-দেব জন্ম হৈব তোমার উদরে ॥"

লক্ষ্মীর কৌতূহল জন্মিল; তিনি সবিস্তারে মদনের জন্ম-কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

"কি কার্য্যে হইল মৃত্যু জন্ম হৈল কেনে।
সে সকল কথা প্রভু কহত আপনে ॥"

শ্রীহরি, লক্ষ্মীর নিকট তারকাসুরের বধের জন্য কুমারের জন্মপ্রসঙ্গে মহাদেব কর্ত্তৃক মদনের ভস্মীকরণ, মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপ, রতির প্রতি মহাদেবের অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বর-দান এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া রতিকে আশ্বাস-প্রদান সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। লক্ষ্মী প্রীত হইয়া তাঁহার আপত্তি ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কবি ভবানন্দ অতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য-লীলা বর্ণনা করিয়া, তাঁহার সুবিস্তৃত প্রেম-লীলার অবতারণা করিয়াছেন; আমরা কবির ভাষায়ই উহার পরিচয় দিব।

"তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া।
দৈবকী-উদরে জন্ম লভিলেক গিয়া ॥

গোকুলে (লইয়া) বসুদেবে থুইল তানে।
মহা মহা অসুর মারিল বৃন্দাবনে॥
তার পাছে লক্ষ্মী হৈল পঞ্চদশ কলা।
বৃকভানুর ঘরে জন্ম হইল কমলা॥
এক কলা জনমিল সুগন্ধা-উদরে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতারে॥
আনন্দে আছয়ে হরি নন্দ ঘোষালয়।
সর্ব্বলোকে বোলে তানে যশোদা-তনয়॥
করিয়া বিবিধ কার্য্য দেবের দুষ্কর।
হরিষে গোকুলে বৈসে দেব গদাধর॥
বৃখভানু-সুতা রাধা লক্ষ্মী-অবতার।
শৈশব-কালে তাহান যৌবন-বিস্তার॥
(অনুদিন ভক্তি) করি পূজে নারায়ণ।
হরির চরণ বিনে আর নাহি মন॥
যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল উপায়।
ব্রজে আইহন আনি (বিভা দিতে চায়)॥
যশোদার ভ্রাতা সে পরম রূপবান্।
নন্দের গৌরবে তারে কন্যা দিল দান॥
রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ।
করিলা কপট তাতে দেব নারায়ণ॥
রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেহি দিন।
(সেই দিন হৈতে হৈল) পুরুষত্ব-হীন॥
নপুংসক হৈল যদি ব্রজে আইহন।
রাধিকার সত্য রক্ষা পাইল সে কারণ॥
জল আনিবারে রাধা করিল গমন।
(দেখিল যমুনা)-তীরে শ্রীমধুসূদন॥
বসিয়াছে কানু-আদি বালক সকল।
হেন কালে রাধিকা ভরিতে যায় জল॥

সকল বালক এড়ি গেল রাধার কাছে।
মধুর কোমল বাক্যে সুন্দরীতে পুছে॥

শুন সুবদনি (তুমি মোর নিবেদন)।
জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেও কি কারণ ॥
কাহার কুমারী তুমি কাহার বনিতা।
কোন দেশে বৈস তুমি কেনে আইলা এথা ॥

* * *

তোর মত রূপবতী নাহি ক্ষিতি-তলে।
বিধাতা মিলাইল মোরে পূর্ব্বজন্ম-ফলে ॥
(দেখিয়া তোমার মুখ) কমল-মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ কৈল শশধর ॥
পুনঃ পুনঃ জন্মে চন্দ্র সমান হইতে।
না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিতে ॥
কমল-(বদনে শোভে কিবা) মৃদু হাস।
সরোবর-মধ্যে যেন কমল প্রকাশ ॥
দিন-মণি মিত্র তাত না হৈল সমান।
নিশিতে থাকিতে হৈল পায়্যা অপমান ॥

বান্ধুলি কুসুম রঙ্গ ওষ্ঠ অধর।
অরুণ গঞ্জিয়া বিম্ব গেল দুরন্তর ॥
(কিবা শোভে) ঝলমল শ্রবণ-কুণ্ডলে।
চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থলে ॥

* * *

(নয়নের শোভা হেরি) মনোহর রঙ্গে।
প্রবেশিল বনমাঝে লজ্জায় কুরঙ্গে ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা তোর যেন কাল-সাপ।
কটাক্ষ-সন্ধানে জিনে কন্দর্পের চাপ ॥

* * *

চিকুর চামর জিনি নাহি তার তুল।
দোসর গাঁথনি তাতে মালতীর ফুল ॥

কনক-ডালিম্ব যেন পীন পয়োধর।
অমৃতের ধারা যেন বহে নিরন্তর ॥

হেন মনে (করোঁ তাতে) প্রাণ দেউ ডালি।
কে দিছে তোমারে হেন বিচিত্র কাঁচলি॥
করিছে বিচিত্র চিত্র তাহে নাহি কোপ।
কেবা লিখিয়াছে মোর নিজ দশ-রূপ॥
(সিন্ধু) প্রবেশিয়া বেদ করিলু উদ্ধার।
সেই রূপ কাঁচলিতে দেখিয়ে তোমার॥"

ইত্যাদি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাঁচলির বিচিত্র-সূত্র-গ্রথিত দশাবতার-চিত্রের বর্ণন করিয়া, নিজের মনের গূঢ় লালসাটী প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না এবং কৌশলে সমবেদনা প্রকাশ দ্বারা শ্রীরাধার অনুরাগ উদ্দীপন করার জন্য বলিলেন,—

"মুষ্টিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ কটি তোর।
কেমতে কলস লৈছ ভয় লাগে মোর॥
* * *
মতি-হীন সেই জন অবোধ কেবল।
হেন যুবতীরে দিছে ভরি নিতে জল॥"

কিন্তু—

"যতেক মধুর বোলে নন্দের কোঁয়র।
শুনিয়া সুন্দরী রাধা না দিল উত্তর॥
কাঁখে কুম্ভ (আঁখি ঠারে) জানাইয়া সখী।
বসনে বদন ঢাকি হাসে চন্দ্র-মুখী॥
কটাক্ষে লাবণ্য ভাসে ফিরি ফিরি চাহে।
বুঝিয়া তাহান মন কানু পাছে ধায়ে॥
রাধা আগে আগে যায় কানু যায় পাছে।
লম্ফ দিয়া ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে॥
'এড়' 'এড়' করি রাধা মাগে পরিহার।
কোন্ বিপরীত কর নন্দের কোঁয়ার॥"

অতঃপর হরিবংশে নানা বিচিত্র 'পদ-বন্ধ' ও 'গান-ছন্দ' ব্যাপিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চপলতা চলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়ার স্থান আমাদিগের নাই। কবি ভবানন্দের সংক্ষেপ করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, বিষয় পল্লবিত করার শক্তিও সেইরূপ; তথাপি নিতান্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহার রচনা-কৌশলে সুবিস্তৃত বর্ণনায়ও পাঠকের বিরক্তি জন্মে না; পড়িতেই ইচ্ছা হয়। যাহা হউক, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলেই হউক, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন রূপ ও গুণে নিতান্ত বশীভূত হইয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভি-যোগ শ্রীরাধা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন,—

"কানুর চরিত্রে রাধা শঙ্কিত হৈলা বড়।
মনে মন-কলা খায়ে মুখে বোলে দড় ॥
দেখিয়া কানুর রূপ বেশ মনোহর।
কন্দর্প-বিশিখে তনু করিছে জর্জ্জর ॥
কামিনী-মোহন বেশ ধরিছে কানাই।
অন্তরে বিকল (অতি)মুখে বোলে যাই ॥
কামে অচেতন রাধা প্রাণ নহে স্থির।
মধুর কোমল ভাষে বোলে ধীরে ধীর ॥

* * *

অয়ে নন্দ-সুত তুমি না বুঝিছ ভাল।
গৌরব না রাখ তুমি সহজে ছাওয়াল ॥
সাক্ষাতে ভাগিনা তুমি অন্তর (নাহিক)।
পথে বাটোয়ারি কর বোল ধিকাধিক ॥
কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী।
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥
যদি (আমাতে) তোমার মগ্ন হৈছে মন।
কেনে লজ্জা দিলা দেখাইয়া সখাগণ ॥
সুহৃদ-সম্বাদে হৈত মন-হিত কাজ।
না যুয়ায় হেন স্থানে দিতে মোরে লাজ ॥
এই কথা কৈমু নন্দ যশোদার ঠাই।
তবে কি উত্তর দিবা শুন রে কানাই ॥
মোর নিজ-পতি-জন কেবল দুর্ব্বল।
কহিব তাহার ঠাই আমারে কর বল ॥
শাশুড়ী ননদী মোরে বোলিব পরিবাদ।
বৃন্দাবন ছাড়ি যাইব রহিতে নাহি সাধ ॥
বাপ মাও বোলিবেক রাধা (কলঙ্কিনী)।
যোগিনী হইয়া যাইব গায়ের আগুনি ॥
এড়িয়া দেও রে কালা খাও মোর মাথা।
নিশা-কালে গেলে মন পুরাইমু সর্ব্বথা ॥"

শ্রীরাধার কাতরোক্তি ও প্রেম-প্রতিশ্রুতি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে,—

"(জল লৈয়া তবে) রাধা নিজ ঘরে যায়।
খঞ্জন জিনিয়া গতি ফিরি ফিরি চায় ॥

*　　*　　*

মন্দ মন্দ গতি যায় রাধিকা সুন্দরী।
কানুর বিরহে চাহে ঘন ঘন ফিরি॥
এহি মতে কত দূর গেল শশিমুখী।
উলটিয়া চাহে দেখি কালা হৈল (সুখী)॥
ডাক দিয়া বোলিলেক নন্দের কোঁয়র।
মোর বাক্য সুবদনি অবধান কর॥
দেখিয়া তোমার রূপ প্রাণ শান্ত করি।
বারেক ফিরিয়া (বাক্য শুন ল সুন্দরি)॥"

যাহা হউক, কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হাত ছাড়াইয়া শ্রীরাধা ঘরে আসিলেন বটে,

"তেজিয়া জলের কুম্ভ চিন্তিত অন্তরে।
(হৃদয়ের) উতকণ্ঠা সহিতে না পারে॥
কামে জর্জ্জরিত তনু হই ধন্ধাকার।
কানু বিনে সব শূন্য হৈল শ্রীরাধার॥
শাশুড়ী ননদী তবে দেখি বিপরীত।
(রাধারে প্রবোধ তারা) দেয় কালোচিত॥
তবে নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর।
শুনিয়া যুবতী কিছু না দিল উত্তর॥"

গোকুলের যদু-সেন নামক গোপের স্ত্রী শ্রীমতী রাধার 'প্রেম-সখী' ছিলেন; তিনি আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন; তখন—

"সখীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
(কহিল মরম-কথা) লাজ পরিহরি॥

*　　*　　*

(বরাড়ী রাগ)

অয়ে পরাণ-সই, হের কথা শুন আল মর।
সকল সখীর সঙ্গে　　যমুনা গেছিলু রঙ্গে
জল ভরিয়া আসি ঘর॥ ধ্রু॥
আচম্বিত হেন কালে　　মালতীর মালা গলে
চূড়ায়ে ময়ূর-পুচ্ছ শোভে।
মোতি মালতীর মাল　　শোভা করে (অতি ভাল)
ভ্রমরা না ছাড়ে মধু-লোভে॥

সুরঙ্গ অধরে বাঁশী ঈষত মধুর হাসি
তাহে তাহান শোভমান।
যমুনা উজান ধরে (শুক দাউর মুঞ্জরে)
বন্ধু রাগ ধরিছে যে গান॥
আমার নিকটে আসি বলিল কটাক্ষে হাসি
রতি-দান দেও ত সুন্দরি।
যৌবন না (দিলু ডালি) পাঞ্জর করিয়া খালি
প্রাণ মোর লৈয়া গেল হরি॥
যদি না দেখিমু কানু সহজে ছাড়িমু তনু
প্রাণ রাখিলে নাহি কাজ।
(ললাটে আছিল লেখা) ভাগ্যে সে পাইলু দেখা
তিলেক না কৈলু মুই লাজ॥"

* * *

ও কালার লাগি
সদায়ে আকুল মোর হিয়া।
(যমুনার জলে গিয়া) বন্ধুরে সমুখে থুয়া
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া॥ ধ্রু॥
যে বোলে বলুক লোকে যার মনে যেবা দেখে
ননদিনী বলুক (দুর্ম্মতি)।
(গুরু) গরবিত জনে কুপিত হইয়া মনে
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া
যথা তথা যাইব (মন-সুখে)।
কানুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর
কি করিব গোকুলের লোকে॥"

এইরূপ কয়েকটী বিচিত্র গানের ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণ-সখীর নিকট হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া, শ্রীরাধা অবশেষে বলিলেন,—

"চল সখি আনি দেহ নন্দের তনয়।
তবে সে (বাঁচিব প্রাণে) মোর মনে লয়॥
তুমি সে সুহৃদ্ মোর আর কেহ নাই।
বিরহ-দুঃখের কথা কৈলু তোর ঠাই॥"

সখী প্রথমে রাধার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; বলিলেন,—

"না কর কপট সই ধরিলু চরণে।
কপট বচন ছাড়ি কহ মোর স্থানে॥
তোর মোর এক প্রাণী তনু দুইখানি।
কপট ছাড়িয়া কহ মরম-কাহিনী॥"

তখন—

"রাধা বোলে প্রাণ-সই কহি বিবরণ।
আনিয়া মিলাও মোরে নন্দের নন্দন॥
তুমি বিনে হেন কর্ম্ম কে করিব মোর।
(মদন)-বিশিখে তনু হইল জর্জ্জর॥
চন্দন হৃদয়ে দিলে না হয় শীতল।
মৃত্যু হৈলে তোর শ্রম হইব বিফল॥"

শ্রীমতী সখী শ্রীরাধাকে নানা প্রকারে সমঝাইয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উহাতে কোনও ফল হইল না। তখন তিনি অগত্যা যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে সখাগণের দ্বারা বেষ্টিত দেখিতে পাইয়া, কৌশলে সখীর অবস্থা জানাইবার জন্য হেঁয়ালীর ছন্দে বলিলেন,—

"বিরিঞ্চির নন্দন　　　তার সুত পবন
তার সুত-মিত্র ব্রজ-সুত।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সখীর হেঁয়ালী অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু যে জন্যই হউক, উহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; সুতরাং অগত্যা সখী বিষণ্ণ-বদনে শ্রীরাধার নিকট ফিরিয়া গেলেন, আর যাইয়া বলিলেন,—

"প্রথমে কহিছি আমি দুর্জ্জন কানাই।
ইহার সহিতে প্রেমে কিছু কার্য্য নাই॥
না শুনিয়া মোর বাক্য পাঠাইলা তথা।
যত অপমান দিল কি কহিব কথা॥
বিস্তর প্রকার করি কৈলুম তোর দুখ।
উত্তর না দিল—দেখি ফিরাইল মুখ॥
লজ্জা পাই আইলু মুঞি কহি তোর ঠাই।
তুমি সে বাড়াইলা প্রেম মোর দায় নাই॥"

সখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধা শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; সখীর নানাপ্রকার চেষ্টাতেও যখন তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল না, তখন—

"এক সখী ধায়্যা গিয়া জানাইল সবারে।
দুঃখিত হইয়া গোপী আইলা দেখিবারে ॥
সুন্দরী রাধার স্বামী ননদী শাশুড়ী।
মহা কলরব করে রাধিকারে বেড়ি ॥"

এমন সময়ে দৈবাৎ সেখানে রাধার মাতামহী বড়াই বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনিও নানা উপায়ে নাত্নীর চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন—

"কার্য্য লাগি কথা কহে শ্রীমতী সুন্দরী।
হের আইসে নন্দ-সুত দেখ চক্ষু ভরি ॥
শুনিয়া সখীর বাক্য মধুর কোমল।
চক্ষু মেলি না দেখিয়া কান্দিয়া বিকল ॥
তখনে সকল লোক হরষিত-মন।
যার যার নিজ ঘরে গেল সেহি ক্ষণ ॥
রাধা আদি তিন জন রৈল সেইখানে।
বড়াই পুছিল তান নাতিনীর স্থানে ॥
শুন সুবদনি রাধা বুদ্ধিমতী হও।
কি হেতু মূর্চ্ছিত হৈলা মোর স্থানে কও ॥
চিত্তের মানস তোর পূরিমু নিশ্চয়।
সমগ্র ভাঙ্গিয়া কহ না করিও ভয় ॥"

মাতামহী বড়াই বুড়ীর আশ্বাস পাইয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন,—

"(পঠমঞ্জরী রাগ)

আল বড়াই, শুন মোর দুঃখের বিরহে।
গেছিলু যমুনা-জলে দেখিলু কদম্ব-তলে
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে ॥ ধ্রু ॥
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণখানি
বিদ্যুতের ছটা অভরণ।
দোখলু পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু
তার মধ্যে আবীর শোভন ॥
যুবতী মোহন চূড়া মালতী-কুসুম বেড়া
শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ।
মধুর মধুর বোলি মকরন্দ-লোভে অলি
ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন ॥

বিমল কমল-আঁখি ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি
কটাক্ষ ইষদ মৃদু হাসি।
সুলক্ষণ নখ-চান্দ পাতিছে রমণী-ফান্দ
সুন্দর অধরে পূরে বাঁশী ॥
শুনিয়া বাঁশীর সান যমুনা ধরে উজান
কদম-তলে বসিয়াছে কালা।
পবন স্থকিত হয়ে রবি শশী না চলয়ে
আমি নারী সহজে অবলা ॥
সকল কুসুমে সাজে অভিনব যুবরাজে
অবলা নারীরে জিনে বেশে।
সৌরভ-বিহীন ভালা গলায় গুঞ্জার মালা
আসিয়া ধরিলা মোর কেশে ॥
বিস্তর প্রণতি করি আইলু আপনা পুরী
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে।
দেখিয়া অবধি হনে নিবারিতে নারি মনে
হানিছে মোরে বাণের হৃদয়ে ॥"

বড়াইও আগে শ্রীরাধাকে নিরস্ত করিতেই বিধি-মতে চেষ্টা করিলেন; বলিলেন,

"নন্দের নন্দন সে যে বালক-চরিত।
নহে তোর প্রেম-যোগ্য হও গরবিত ॥
হেন জন সনে প্রেম বাড়াইতে দুষ্কর।
মনে যেহি লয় নাতিন সেহি কর্ম্ম কর ॥
একখানি যুক্তি ভাল শুন ল নাতিন।
গরবিত সনে প্রেম নহে কোন দিন ॥
রাধা বোলে—যদি কৃপা করিলা বড়াই।
অবিলম্বে আনি দেহ সুন্দর কানাই ॥
বিলম্ব না কর বড়াই পড়োঁ পদ-তলে।
তিল-মাত্র ব্যাজ হৈলে ঝাপ দিমু জলে ॥"

অগত্যা বড়াই শ্রীরাধার দৌত্য-কার্য্যে—যমুনার কূলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি তখন একাকী ছিলেন; তাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া চতুরা বড়াই তাঁহার উপর একটা শক্ত চাপান দিয়া কহিলেন,—

"সুহি রাগ।

(কহ রে) নন্দের সুত,
কি কর ঘাটের কূলে বসি।
বনে থাক ধেনু রাখ অগরু চন্দন মাখ
গোকুল মজাইবা হেন বাসি ॥ ধ্রু ॥
বাঁশীটী লইয়া হাতে বসি থাক রাজ-পথে
করি বেশ কদম্বের তলে।
কুল-বধূ গোয়ালিনী যে আইসে ভরিতে পানী
তোর রূপ দেখি তারা ভোলে ॥
পাটে রাজা কংসাসুর (মথুরায়) নহে দূর
মুরলি বাজাও হাসি হাসি।
তুমি সে নাগর বড় রসেত মজিলা দড়
নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥"

পুনশ্চ—

"বড়াই বোলে—শুন কানু আমার বচন।
মোর নাতিনীর প্রাণ লৈলি কি কারণ ॥
কালা বোলে—'শুন বুড়ী আমার উত্তর।
আমি ত না জানি কেবা নাতিন হয়ে তোর ॥
মিথ্যা কথা কহ তুমি কেমন কারণ।
স্ত্রী-বুদ্ধি হেন হেতু বোল দুর্ব্বচন ॥'
পুনরপি বোলে বুড়ি "শুন রে কানাই।
মোর নাতিনীর কথা কহি তোর ঠাই ॥
রাধা গোপী যে হয়ে সে মোহর নাতিন।
জল ভরিবারে আইল যমুনা-পুলিন ॥
আপনা মন্দিরে যায় ভরি লৈয়া জল।
কেন রাজ-পথে গিয়া তারে কর বল ॥
সেই হৈতে ধন্দ নারী তোমার বিরহে।
ক্ষেণে ধরণীতে পড়ে ক্ষেণে মূর্চ্ছা যায়ে ॥
তার দুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদিত।
জানিয়া করহ আজ্ঞা যে হয় উচিত ॥'

শ্রীকৃষ্ণ নিশা-কালে শ্রীরাধার গৃহে অভিসারে গমন করিবেন, এইরূপ সঙ্কেত স্থির করিয়া বড়াই হৃষ্ট-চিত্তে শ্রীরাধার নিকট সমাগত হইল,—

"কহিল সকল কথা রাধিকা-গোচর।
নিশা-কালে আসিবেক নন্দের কোঁয়র ॥
ধন্য ধন্য রাধা তুমি বড় ভাগ্যবতী।
বিধাতা মিলাইল ভাল অনুরূপ পতি ॥"

এখন কিন্তু শ্রীরাধা মাতামহী বড়াইর সহিত একটু রহস্য করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না ; চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধার মত,—

"রাধা বোলে শুন বড়াই কহি তোর ঠাই।
এমত নিষ্ঠুর পতি মোর দায়ে নাই ॥
ভাল হৌক মন্দ হৌক পতি আইহন।
মোর নিজ পতি জান মোর প্রাণ-ধন ॥
এমত দারুণ পতি দায় নাহি মোর।
চল বুড়ী চলি যাও আপনার ঘর ॥
মোর প্রাণ-সই গেল তার বিদ্যমানে।
না দিল উত্তর তারে মনের গুমানে ॥
জন্ম অবধি ভিন্ন পুরুষ না জানি।
কেমতে করিমু পাপ মুঞি অভাগিনী ॥"

বড়াইও সহজ পাত্র নহেন ; রাধার চাতুরী বুঝিতে বড়াইর বিলম্ব হইল না।

"রাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই।
কি বোল বোলিলা রাধা মুখে লাজ নাই ॥
ধরিয়া আমার পাও বোলিলা তখনে।
গর্ব্ব করি কহ এবে মনের গুমানে ॥
তোর মায়ের মাও আমি শুন ল অবলা।
কেমতে ভাঁড়িবা মোরে পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥
চাতুরী করিলা বাক্য আপনার গর্ব্বে।
ভাগিনাকে লৈয়া রতি ভুঞ্জিয়াছ পূর্ব্বে ॥

* * *

অখনে ভাঁড়িবা মোরে এহি মত জ্ঞান।
তোর মনে আমি হতে তুমি বড় স্যান ॥
বড় নষ্ট বুদ্ধি তোর জানিলু অখনে।
আঁখির চালনে পুরুষ লৈয়া যাহ বনে ॥

আমাকে ভাঁড়িবা তুমি কেমন উপায়।
হাসিতে হাসিতে বোলে ঘন-দৃষ্টে চায় ॥"

শ্রীরাধা কিন্তু এত সহজে রহস্য পরিত্যাগ করিলেন না; বড়াইর প্রতি তিনি কপট-রোষ প্রদর্শন করিয়া চোখা চোখা বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বড়াই তাঁহাকে নিজের সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন,—

"সলিলের রেখা যেন নারীর যৌবন।
যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের যতন ॥
কি ছার যৌবন লৈয়া করসি গৌরব।
কুসুম-বিকাশে যেন না রহে সৌরভ ॥
হাস পরিহাস কর অতি বড় রঙ্গে।
মরিতে যৌবন কেবা লৈয়া যাব সঙ্গে ॥"

পুনশ্চ—

"সঞ্চিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন।
সঞ্চিত করি রাখ কেনে নারীর যৌবন ॥
মক্ষিকা-পতঙ্গে যেন সঞ্চয়ে মকরন্দ।
ভাল মতে নাহি জানে কিবা স্বাদ গন্ধ ॥
চতুরে দহিয়া মুখ লৈয়া যায় মধু।
তেমত যৌবন ব্যর্থ যাবে ব্রজ-বধু ॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতক্ষণ সখী শ্রীমতীর নিকটে বসিয়া দিদিমা নাতনীর রহস্য দেখিতেছিলেন, এইবার বড়াইর হইয়া তিনিও শ্রীরাধাকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। শ্রীরাধার রহস্য আর টিঁকিল না।

"সখীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
আন গিয়া গোবিন্দেরে বোলে মৃদু করি ॥
কর লৈয়া মথুরাতে গিয়াছে আইহন।
আজি না আসিলে কানু নাই প্রয়োজন ॥
চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাজ।
অবিলম্বে আনি দেহ ব্রজের যুবরাজ ॥"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে রস-পূর্ণ প্রেম-লীলা আরম্ভ হইল, তাহা কবির ভাষায় অনুসরণ করা একান্তই অসম্ভব; ভবানন্দ যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সেই লীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহার একাংশ প্রদর্শন করারও স্থান নাই। এই প্রেম-লীলা প্রায় সম্পূর্ণই কবি-কল্পিত; ভাগবতের বস্ত্র-হরণ, রাস-লীলা প্রভৃতি বর্ণনা না করিলে শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয়, ভবানন্দ অবান্তর-ঘটনা (Episdoe)রূপে সেগুলিকে নিজের কাব্যে স্থান

দিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ও খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে, ভবানন্দের বর্ণিত এই প্রেম-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীরাধার দেব-ভাব রক্ষিত হয় নাই,—কিন্তু ইহাতে পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমাদের বঙ্গের পল্লী-সমাজের সাধারণ নায়ক ও নায়িকার যে অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার জন্যই কবি আমাদিগের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ণিত দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতিও ভবানন্দের হরি-বংশে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাহাও অবান্তর-ঘটনা মাত্র। হরি-বংশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতিস্বাভাবিক ও সুমধুর প্রেম; কবি ভবানন্দ যেরূপ অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা ও কবি-প্রতিভার সহিত সেই প্রেমের অশেষ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল পদাবলী-সমৃদ্ধ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও বিরল। যাহা হউক, আমরা এখন এই ব্রজ-লীলার বর্ণনা হইতে আরও দুই চারিটী গীত বা গীতাংশ উদ্ধৃত করিয়া, অবশেষে মহাকাব্য হরি-বংশের অতুলনীয় মাথুর বা বিরহ-লীলার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

এক দিন শ্রীরাধা সখী শ্রীমতীর সহিত যমুনায় জল আনিতে গিয়াছেন; চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সখীকে গ্রাহ্য না করিয়াই নানারকম চপলতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাধা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

(গান-ছন্দ)

"না ছুঁইও না ছুঁইও রাধার অঙ্গ
মোর কালা রে
না ছুঁইও না ছুঁইও রাধার অঙ্গ।
একে ত অবলা আমি গঞ্জাবরা থান তুমি
পরশিয়া না কর কলঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
কালা গোরা নাহি সাজে ভজিমু কেমন কাজে
আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ।
বনে থাক ধেনু রাখ গায়ে ত আগর মাখ
যুবতী পাইয়া এত রঙ্গ ॥
আমি গরবিত একে যদি আসি কেহ দেখে
তোমার আমার মান-ভঙ্গ।
সকল নাগরী-লোকে চুণ কালী দিব মুখে
না যুযায় তুমি আমি সঙ্গ ॥"

এইরূপ রস-পূর্ণ নিষেধ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন এবং বেহদ্দ চপলতার অভিনয় করিয়া, অবশেষে রহস্য করার উদ্দেশ্যে কদম্ব-বৃক্ষে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন।

"দেখিতে না দেখে রূপ রাধা আকুলিত।
তরু-ডালে থাকি বাঁশী বায় সুললিত॥
রাধা রাধা বোলি ডাকে মুরলী-সন্ধানে।
রূপ নাহি দেখে রাধা ধন্দ বাঁশীর সানে॥
নাম ধরি ডাকে বাঁশী রূপ নাহি দেখি।
কদম্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্দ্র-মুখী॥"

(গান-ছন্দ লাগুদা রূপলতা মালসী)

"হের রে কদম্ব-তরু,
তুমি নি পাইয়াছ শ্যাম-রায়।
তোমার ডালেত থাকি মোর নাম ধরি ডাকি
নিরবধি বাঁশীটী বাজায়॥ ধ্রু ॥
বসায়্যা আপন ডালে আপনা ফুলের মালে
রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি।
নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকা খানে
অবলা কি হইব মানিনী॥
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর
পদ-ধূলি লাগে তোমার গায়।
যখন বৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় ভুলে
ভাগ্য তোর কহন না যায়॥
* *
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা হৈয়া অধরে মুরলী থুইয়া
সদায়ে হেলান দিয়া থাকে।
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন
কৃপা বড় করিল তোমাকে॥"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অস্থির হইয়া নানা প্রকার খেদোক্তি করিতে লাগিলেন,—

"আমি এমত না জানি রে বন্ধু, এমত না জানি।
দেখিতে না দেখি যেন মৃগ-ব্যাধ খানি॥
মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে।
তবে কি না দেহ দেখা যদি মনে থাকে॥
* * *
বাঁশী নয় বাঁশী নয় মোর মন-মোহনিয়া।
পাষাণ দরবে যার সু-নাদ শুনিয়া॥

* * *

মোর কেহ নাই বন্ধু মোর নাহি কেহ।
সঙ্কেতে বাজাহ বাঁশী দেখা সে না দেহ॥
গলায় গাঁথিয়া দিমু যদি লাগ পায়।
দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নাম গুণ গায়॥

* * *

আমি আর বলিব বা কারে।
পিরিতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে॥
ঘরের বাহির নহি কুলীনের ঝি।
কে জানে আসিয়া দেখে করিমু বা কি॥
দেখিতে না পাইলু আমি ঝুরিয়া যে মরি।
যার লাগি এত কর্ম্ম সেহ প্রাণের বৈরী॥
সমীর না বহে ঘনে তরু কেনে হালে।
কে মারে কদম্ব মেলি থাকি তরু-ডালে॥

* * *

কে আছে বেথিত জন কার কাছে যাব।
কে দিব কানুরে দান কোথা গেলে পাব॥
হিয়ার মাঝে শ্যামের শেল ফুটিছে মরমে।
শুথাসে ডুবিব তোর মনের ভরমে॥
নিকড়িয়া কদম্ব-ফুল কত ফেলি মার।
হোর দেখ চাঁপা-ফুল তাকে দিতে নার॥"

প্রিয়তমার কাতরোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন আর্দ্র হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন।

কবি ভবানন্দ প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিতে এক রকম সিদ্ধ-হস্ত; হাস্য-রস ও বিদ্রূপের চিত্র অঙ্কিত করিতেও তিনি কম নিপুণ নহেন। দান-লীলা, বংশী-হরণ ইত্যাদি বহু স্থলেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা হরিবংশের অন্তর্গত মৃগবতী কন্যার উপাখ্যান হইতে 'বর্ব্বর-ব্যাখ্যান' নামক হাস্য-জনক গল্পটী এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গল্পটী এই,—

"রাজার কুমার আর পাত্রের নন্দন।
মন্ত্রী-কোতোয়াল-সুত এহি চারি জন॥
কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন।
তাথে নমস্কার কৈল হীন এক জন॥

রাজপুত্রে বোলে নমস্কার কৈল মোরে।
কোতোয়াল-সুতে বোলে আমি বিনে কারে॥
পাত্র-সুতে বোলে নমস্কার মোরে কৈল।
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে আমাকে সম্ভাষিল॥
বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল।
যে করিল নমস্কার তার তথা গেল॥
তস্কর বন্ধন যেন করিল গৃহস্থে।
চারি জনে তাহাকে ধরিল হেন মতে॥
মহাভয় পাইয়া সেহি করে পরিহার।
"কি লাগি ধরিছ মোরে কি দোষ আমার॥"
তবে চারি কুমারে বোলিল পুনি পুনি।
"কারে নমস্কার কৈলা কহ চাহি শুনি॥"
হাসিয়া বোলয়ে—"আমি াপেত ঠেকিল।
এমত বর্ব্বর আমি কোথা না দেখিল॥"
চারি সন্তোষিত হেতু বোলে পুনর্ব্বার।
"যে বড় বর্ব্বর তাকে কৈল নমস্কার॥"
চারি জনে বিবাদ হইল অতি দড়।
অন্যে-অন্যে বোলয়ে "বর্ব্বর আমি বড়॥"
সে বোলে—"কেমনে কমু মর্ম্ম না জানিয়া।
কেমত বর্ব্বর কেবা কহ বাখানিয়া॥"
তবে রাজ-পুত্রে কহে আপনার গুণ।
"যেমত বর্ব্বর আমি ভাল মতে শুন॥
শিশু-কালে বাপে মোরে করাইল বিয়া।
শ্বশুর-বাড়ীতে স্ত্রী আসিল রাখিয়া॥
যুবা হৈলে দরশন নাহি তার মোর।
অন্যের ঔরসে পুত্র হৈল তার ঘর॥
পুত্র হৈছে বিবরণ শুনি লোকমুখে।
দান-ধর্ম্ম বাদ্য-ভাণ্ড করিলু কৌতুকে॥
পুত্রোৎসব-আনন্দ মুঞি করিলু নির্ভর।
লোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥
এক রাত্রি না রহিছে বনিতার সঙ্গ।
জারজ-পুত্রের লাগি করে এমত রঙ্গ॥

আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দড় ।
আমি বহি বর্ব্বর নাহিক আর বড় ॥"
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে শুনি রাজ-পুত্রের কথা ।
বিস্তারিয়া কহি শুন মোর বর্ব্বরতা ॥
বাস-স্থান নির্জ্জনে আছিল আমার ।
আশ-পড়শী তথা কেহ নাহি আর ॥
কালোচিতে হৈল পুত্র—শিশু না দেখিল ।
বাপ মাও ডাকিবারে কোথা না শিখিল ॥
পড়শীর পুত্র নাহি ডাকিব বাপ মাও ।
দেখাদেখি বালকে শিখিব সেহি রাও ॥
মন দুঃখে দহে মোর দৈবের বিপাকে ।
কেমতে শিখিব রাও এহিত বালকে ॥
বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার ।
দুই জনে শিখাইল রাও করিবার ॥
স্ত্রী মোকে বাপ ডাকে আমি ডাকি মাও ।
তাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও ॥
শুনিয়া লোকের হাস্য হৈল অতি দড় ।
লোকে বোলে এহি বেটা বর্ব্বর অতি বড় ॥
রমণীকে মাও ডাকিব বিদ্যমান ।
সেহি সে বর্ব্বর হবে আমার সমান ॥"
তবে কোতোয়াল সুতে লাগে কহিবার ।
"অখনে কহিব যে আমার সমাচার ॥
এক দিন নগর ভ্রমিয়া আইলু ঘরে ।
না ছিল রস্তার পাত ভাত খাইবারে ॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র তস্করের ভয়ে ।
চাঙ্গের উপরে আছে খসান না যায়ে ॥
ইহাতে হইল বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার ।
বাহিরে না যায় কেহ পত্র কাটিবার ॥
তবে আমি একখানি কথা কৈলু তাত ।
যে আজি রাও কাড়ে সে কাটিব পাত ॥
ইহাক শুনিয়া কেহ না কৈল উত্তর ।
প্রদীপ উজ্জ্বল আছে ঘরের ভিতর ॥

এহি ছিদ্র পায়্যা তবে চোর আইল ধরে।
লাঁফ দিয়া উঠে মোর কান্ধের উপরে॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র থুইয়াছিল চাঙ্গে।
মোর কান্ধে উঠিয়া পাড়িয়া নিল সাঙ্গে॥
পত্র কাটিবার ডরে রাও নাহি কাড়ি।
কান্ধে উঠি চোরে যত রঙ্গ নিল পাড়ি॥
এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর।
তারা বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥"
তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে।
"তোমরা সমান নহ আমার সহিতে॥
এক দিন মোর স্ত্রী পরম-সুন্দরী।
চরণে অলক্ত দিয়া বৈসে মান করি॥
আমি তাকে কহিলাম জল আন গিয়া।
সে বোলে পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুয়্যা॥
চিন্তিয়া চাহিল আমি বুদ্ধির সাগর।
আপনার স্ত্রী লইল কান্ধের উপর॥
কাঁখেত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল।
জল আনিতে কান্ধে হৈতে পড়ি মৈল॥
ইহা দেখি সব মতিমন্ত যত নর।
মোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥
আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দৃঢ়।
আমি বহি বর্ব্বর নাহি আর বড়॥"
এতেক শুনিয়া সেহি বোলিল তখন।
"কেহ ঘাটী নহ যে—সমান চারি জন॥"
চারি বর্ব্বরেরে কৈল চারি নমস্কার।
যত্ন করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার॥

এখন হরি-বংশের শেষ-লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এক দিন রজনীতে নানারূপ বিলাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—

"আসিছে কংসের দূত আমারে নিবার।
কি করিমু প্রাণেশ্বরি কর অঙ্গীকার॥
ছাড়িয়া না যায় মোরে দারুণ কংস-চর।
তোমাকে ছাড়িয়া যামু এহি দুঃখ মোর॥

তথা গেলে ব্যাজ মোর সহজেই নাই।
কংসকে মারিয়া পুনি আসিমু এহি ঠাই॥"

তখন—

"সবিশেষ কথা শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে।
কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে॥"

শ্রীরাধা সহজে এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না; বলিলেন,—

"ব্রহ্মা হর পুরন্দর কাঁপে যার ডরে।
তারে কি নিবার পারে কংস-অনুচরে॥"

*   *   *

কানু বোলে—"শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর।
গিয়া-মাত্র আসিবাম ব্যাজ নাহি মোর॥
শোক না ভাবিও প্রিয়া কমল-নয়ানি।
এক-চিত্তে হরষিতে দিয়ার মেলানি॥
আসিমু তোমার এথা দিন দুই ব্যাজ।
হাসিয়া মেলানি দেহ না করিও লাজ॥"
পুনরপি বোলে রাধা "শুন প্রাণেশ্বর।
তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর॥"
তাহা শুনি গোবিন্দে বোলেন মধুর বাক্যে।
"মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্যে॥
আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রূর।
হাসিয়া মেলানি দেহ যাই মধুপুর॥"

*   *   *

এহি মতে বার বার বোলে যদু-পতি।
তত ক্ষণে স্বরূপ জানিলা রসবতী॥

*   *   *

সকরুণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিষাদ।
কেমন কুক্ষণে মোর পড়িল প্রমাদ॥
আচম্বিত কথা মুঞি শুনিল শ্রবণে
প্রাণ মোর স্থির নহে—বিকলিত মনে॥
বিষাদ ভাবিয়া গোবিন্দের পায়ে ধরি
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে রাধিকা সুন্দরী॥"

(গান-ছন্দ ভাটিয়ারী রাগ)

"স্বরূপে কহিবা বন্ধু স্বরূপে কহিবা।
দড় নাকি প্রাণ-নাথ মধু-পুরে যাইবা॥
মুখেত অমৃত তোমার অন্তরেত বিষ।
অখনে জানিল তোমার অন্তরে কুলিশ॥
মধু-পুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া।
কেবল শরীরখানি মোর ঠাই থুয়্যা॥"

অতঃপর হরি-বংশে নানা সুরের দশ বারোটী পদে শ্রীরাধার যে করুণ ক্রন্দন চলিয়াছে, উহার ২।৪টি পঙ্‌ক্তি করিয়া উদ্ধৃত করিলে ভবানন্দের প্রতি অবিচার করা হইবে; তাই আমরা অগত্যা সংক্ষেপে প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিব।

"এহি মত সুবদনী বিলাপিয়া কান্দে।
কর্ম্ম-দোষ আপনার বিধাতাক নিন্দে॥
গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়া শুন চন্দ্র-মুখি।
তোমার বিরহে আমি বড় দুখে দুখী॥
হাসিয়া না বোল যদি যাইতে মধু-পুর।
রহিব নিকটে তোর যাইব অক্রূর॥
তবে গুণবতী রাধা চিন্তে মনে মনে।
বিরস হইলে প্রভু কি কাজ জীবনে॥
মৃদু মধু-স্বরে বোলে শুন যুব-রাজ।
তুরিতে আসিহ মাত্র না করিহ ব্যাজ॥
এত শুনি যদু-পতি হরষিত-মন।
প্রেম-ভাবে রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন॥

* * *

এহি মতে হইল রজনী অবসান।
মাগেন মেলানি হরি রাধিকার স্থান॥

* * *

রাধা বোলে যদি প্রভু নাহি বাস ভান।
স্মরণ-পূর্ব্বক মোরে দেহ পদ-চীন॥
যদি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুরে।
তাক দেখি বিরহ-আনল যাইব দূরে॥
রাধার বিরহ শুনি মাধুরী জন্মিল।
কণ্ঠ হৈতে কৌস্তুভ-মণি খসাইয়া দিল॥

কৌস্তুভ পাইয়া রাধা হরষিত-মন।
কর-যোড় করি তবে বন্দিল চরণ॥
গলাগলি করি কৃষ্ণ করিলা বিদায়।
রাধারে মোহিত করি মধুপুরে যায়॥

পিতা মাতা ও বন্ধু-বর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যূষে অক্রূরের রথে মধুপুরীতে প্রস্থান করিয়াছেন,—

"গোকুল ছাড়িলা যদি প্রভু নারায়ণ।
সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ॥

*   *   *

আছিল কুসুমময় শ্রীবৃন্দাবন।
সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ॥
না করে ঝঙ্কার-শব্দ মধুকর সবে।
কোকিলে পঞ্চম তেজি রহিল নীরবে॥
মলয়া-পবন বায়ু না বহে তখন।
ময়ূরে বিরস হৈয়া ছাড়িল পেখন॥
যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল।
থাকিতে যৌবন গর্ব্ব তথাপি টুটিল॥

*   *   *

শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া শ্রীরাধার শোকের সাগর আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এত দিনে শ্রীরাধার শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি বহিরঙ্গ লোকেরাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীরাধা লক্ষ্মীরই অবতার, তাঁহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের কোনও প্রভুত্ব নাই; তাই তখন তাঁহারাও অন্তরঙ্গ সখীদিগের সহিত মিলিয়া শ্রীরাধাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা কিন্তু—

"ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে গড়াগড়ি বাহে।
ভাবিয়া বিষাদ রাধা কান্দে উচ্চ রায়ে॥
সকরুণ-ভাবে কান্দে বিলাপ করিয়া।
ত্রিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া॥
এক ঠাঞি স্বর্গ-বাসী হৈয়া দেব-গণ।
রহিয়া নীরবে তারা শুনয়ে কান্দন॥
পাতালের নাগ আর দৈত্য-লোক শুনে।
সর্ব্ব-লোকের অশ্রু-পাত হয় সকরুণে॥

কাননের পশু-গণে শুনে উর্দ্ধ-মুখে।
ধেনু বৎসে তৃণ পানি নাহি খায় দুখে॥
কল-রব না করে যত পক্ষী বিহঙ্গম।
রাধার করুণায়ে পিকে তেজিল পঞ্চম॥
ধরণী বিদার হয়ে সেহি বিলাপ শুনি।
সমাধি তেজিয়া ধ্যান-ভঙ্গ হয় মুনি॥
যমুনা-কল্লোল টুটে স্রোত বহে ধীর।
না চলে রবির ঘোড়া সূর্য্য হৈল স্থির॥

* * *

গোকুলে আছিল যত গোপের বনিতা।
রাধার ক্রন্দন শুনি আসিলেক তথা॥
যশোদা রোহিণী আদি যতেক গোপিনী।
বিমলা আইল তবে রাধার জননী॥

* * *

কান্দিতে কান্দিত সব হৈয়া আকুলিত।
নিশি অবসান হৈল রাধার পুরীত॥
আঁখিতে পোহাইল নিশি শোকাকুল হৈয়া।
প্রভাতে গেলেন ঘরে বিষাদ ভাবিয়া॥
একাকী রহিলা রাধা হৈয়া বিরহিত।
ঝুরিতে দারুণ শোকে হইল মোহিত॥"

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিয়া পিতা মাতার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক উগ্রসেনকে মথুরার রাজত্ব প্রদান করিলেন। গোকুল হইতে নন্দ প্রভৃতি যে গোপ-গণ কংসের আহ্বানে মথুরায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া রাজ-কর প্রদানপূর্ব্বক সায়ংকালে গোকুলে ফিরিয়া আসিলেন। এই অভাবনীয় নূতন ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাগমনের আশা তিরোহিত হওয়ায় গোকুল-বাসীরা অপার শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

"শোকেত আকুল রাধা কান্দে নিরবধি।
দুইটী আঁখির জলে বহি যায় নদী॥
শয়ন ভোজন নাহি নাহি গৃহ-কাম।
আকুলী হইয়া রাধা কান্দে অবিশ্রাম॥
এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন হৈল।
ঘোর নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল॥

পরিধান করিয়াছে সুপীত বসন।
নব-জলধর-অঙ্গ কৌস্তুভ-ভূষণ ॥
কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর।
কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর।
ললাটে চন্দন তাথে আবিরের বিন্দু।
রাহু-গরাসেত যেন দিন-মণি ইন্দু ॥

*   *   *

সর্ব্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিঙ্কিণী।
রাঙ্গা-পদে সুমধুর বঙ্করাজ-ধ্বনি ॥
ইন্দ্র-ধনু জিনি ভুরু কামের কামান।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে বরিখয়ে চোখা বাণ ॥
সুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরারি।
রাধার বিছানে আসি বসিলা শ্রীহরি ॥

*   *   *

মেলিল নয়ন রাধা নিশি অবসানে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে না দেখিয়া তানে ॥"

এই স্বপ্ন-দর্শনে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ আবার যেন নবীন হইল। সখী শ্রীমতী শ্রীরাধাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, রজনী-শেষের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না; শ্রীরাধার প্রাণ-কান্ত আবার নিশ্চিতই অবিলম্বে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। যদি তিনি দুই চারি দিনের মধ্যে সেখানে না আসেন, তাহা হইলে শ্রীমতী সখী নিজে মথুরায় যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। এ দিকে—

"উদ্ধবের ঘরে আসি প্রভু নারায়ণ।
আচম্বিতে রাধিকারে হইল স্মরণ ॥
সর্ব্ব-ভূতময় প্রভু লীন তিন লোকে।
অভিপ্রায়ে জানিলেন রাধার যত দুখে ॥
এহি বোলি উদ্ধবের হস্তেত ধরিয়া।
কহিতে লাগিল প্রভু বিনয় করিয়া ॥
শুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর।
তোমার অব্যক্ত কিছু গুপ্ত নাহি মোর ॥
গোকুলেত রাধা আছে মোর অনুভাবে।
তথা গিয়া শান্ত করি আসিবা উদ্ধবে ॥

বিনয় করিয়া কৈও সুন্দরীর ঠাই।
অবিলম্বে আসি আমি কিছু ব্যাজ নাই॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভক্ত-প্রবর উদ্ধব গোকুলে যাইয়া আগে নন্দ ও যশোদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরে শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন।

"হইল ঘোষণা যুড়ি গোকুল-নগরী।
রাধারে সান্ত্বিতে দূত পাঠাইছে হরি॥
তাক শুনি গোকুলের যতেক যুবতী।
রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে শীঘ্র-গতি॥
শ্রীমতী মহোদা কৈল রাধিকার ঠাঞি।
উদ্ধবে সান্ত্বিতে তোরে পাঠাইছে গোসাঞি॥
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মন।
উঠিয়া বসিল কিছু প্রসন্ন বদন॥"

আইহন ওরফে আয়ান অভ্যর্থনা করিয়া উদ্ধবকে শ্রীরাধার মন্দিরের ভিতর লইয়া গেলেন।

"শ্রীমতী মহোদা আদি নারী চারি ভিত।
মধ্যে বসিয়াছে রাধা শোকাকুল-চিত॥
মলিন বস্ত্র পরি আছে শোকে বিরহিণী।
নবীন মেঘেত যেন দেখিয়ে দামিনী॥
চারি দিকে বেষ্টিত সকল গোপ-দারা।
চন্দ্রের নিকটে যেন শোভিয়াছে তারা॥
অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিল শ্রীরাধারে।
সম্ভ্রমে ভূমিত পড়ি দণ্ডবত করে॥

* * *

ভক্তি-পুরস্কারে যদি বন্দিল চরণ।
লক্ষ্মী-রূপ উদ্ধবে দেখিল সেহি ক্ষণ॥
প্রণতি করিয়া উদ্ধব করিলেক স্তব।
'নমো মহাজননি নমো অনুভব॥
নমো সিন্ধু-সুতা নমো কমলা-সুন্দরি।
বিষ্ণু-প্রিয়া বৃন্দাবনি নমো সুরেশ্বরি॥
সর্ব্ব-জীব-তত্ত্বময়ি নাহি আদি অন্ত।
চরণ-পঙ্কজে মোর প্রণাম অনন্ত॥'

তুষ্ট হৈয়া বোলে রাধা কোমল বচন।
এত ক্লেশ পাও বাপু কিসের কারণ॥
উঠ উঠ আরে বাপ করেঁ৷ পরিহার।
কহ কহ শুনি প্রভুর কুশল সমাচার॥
উদ্ধবে প্রণাম করি কৈলা নিবেদন।
কুশলে আছেন প্রভু শ্রীমধুসূদন॥
মোরে পাঠাইছে মাও তোমা সান্ত্বিবার।
আসিবেন অবিলম্বে ব্যাজ নাহি আর॥

* * *

সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাখান।
পরিহরি রাজ-কার্য্য বিরহিত-জ্ঞান॥
কত নিবেদিমু মাও তোমার চরণে।
চিন্তিত না হৈও মাও আসিব আপনে॥
উদ্ধবের মুখে রাধা এহি কথা শুনি।
নম্র-ভাবে কান্দিয়া বোলেন সুবদনী॥

(গান—ছন্দ গান্ধার)

"শুন প্রাণের উদ্ধব,
কত বা কহিব বিবরণ।
যখনে ছাড়িল বন্ধু—বিফল জীবন॥ ধ্রু॥
নিশি দিশি অবিরত প্রাণখানি ঝুরে।
অখনেও বোল প্রভু রৈল মধু-পুরে॥
যাইতে কহিল হৈব দিন দুই চারি।
ভুলিয়া রহিল বাসি পায়্যা বর-নারী॥
জানিলোঁ জানিলোঁ বন্ধু আর না আসিব।
ঝুরিতে বিরহে মোর তনুখানি যাইব॥"

এই ভাবে আবার নানা সুরের নানা পদে শ্রীরাধা উদ্ধবের নিকট বিরহ-কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন; উদ্ধবও যথা-সাধ্য সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যে জন্যই হউক, তাঁহার ব্রজে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না; বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছয়টী ঋতু একে একে আগত ও অতীত হইল; শ্রীরাধা প্রাচীন কালের অন্যান্য বিরহিণীদিগের মত প্রিয়-সখীর নিকট "বার-মাস্যা" দুঃখের কাহিনী কহিয়া কহিয়া প্রিয়তমের দর্শন-আশায় সপ্তদশ মাস জীবন রক্ষা করিয়া রহিলেন; আর বুঝি জীবন থাকে না; শ্রীরাধার সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া

সখী শ্রীমতী নিজেই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাত্রা করিলেন ;—কিছু দূরে যাইয়াই একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

দ্বিজে বোলে 'লোক আর মথুরা না রয়।
জরাসন্ধে পুরিয়া করিল ভস্মময় ॥
প্রজাগণ লৈয়া হরি সমুদ্র ভিতর।
করিছে নির্ম্মাণ তথা দ্বারকা-নগর ॥
রুক্মিণী আদি বিভা করিছে অষ্ট জন।
সংসারের দুষ্ট যত করিল নিধন ॥
আমি যাই দ্বারকাতে দেখা করিবার।
কহিল তোমাতে মথুরার সমাচার ॥'
তাহা শুনি শ্রীমতী বোলয়ে হরষিতে।
'আমিও যাইব দ্বিজ তোমার সহিতে ॥'
এহিরূপে দুইজন গেল দ্বারকাত।
অদ্ভুত নগর তবে দেখিল সাক্ষাত ॥
দ্বিধা নাহি স্ত্রী-লোক যাইতে অন্তঃপুর।
রুক্মিণীর পুরে গেল হরিষ প্রচুর ॥
দেখিল রুক্মিণী দেবী অতি মনোরমা।
তেনি হৈতে সুন্দরী দেখিল সত্যভামা ॥
এহি মতে ভ্রমিয়া যে শ্রীমতী দেখিল।
প্রভুর কার্য্য না দেখি বিকল হইল ॥
সভা করি বসিছেন দেব নারায়ণ।
চতুর্দ্দিগে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥
অন্তরে ত থাকি চায়্যা রহিল শ্রীমতী।
সর্ব্ব-ভূতময় প্রভু জানিল সম্প্রতি ॥
উদ্ধবেরে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ।
শ্রীমতীর নিকটে গেলেন সেহি ক্ষণ ॥
দেখিয়া প্রভুর পদ শ্রীমতী সুন্দরী।
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি ॥
প্রভু বোলেন—'করিয়াছ সাহস অপার।
কহ প্রিয়া রাধার কুশল সমাচার ॥'
শ্রীমতী বোলয়ে—'এহি রাধার সন্দেশ।
চাহিতে তোমার পথ তনু হৈল শেষ ॥

জিজ্ঞাসিলা যৎকিঞ্চিৎ কহি সমাচার।
সহজে সজীবে লাগ না পাইবা রাধার ॥"

সময় পাইয়া শ্রীমতী সবিস্তারে বিরহিণী শ্রীরাধার করুণ কাহিনী বর্ণন করিলেন; সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেও যথাসাধ্য তীব্র ভৎ´সনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; পরিশেষে বলিলেন,—

"যদ্যপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে।
কি কথা কহিমু গিয়া রাধার গোচরে ॥
ভরসায়ে রহিয়াছে অভাগিনী রাধা।
আসিবার কালে কেনে না পড়িল বাধা ॥
কোন লাজে যাইমু মুঞি গোকুল-নগর।
জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর ॥
এহি লাজে না দেখিমু রাধা হেন সখী।
তোমার উপরে বধ দিমু বিষ ভখি ॥
তোমার দোষ নাহি আমি জানিলু এখন।
কেমত কুমতি নারী বান্ধিয়াছে মন ॥
যত নারী রাধার দাসীর যোগ্য নয়।
তেহুঁ আজ্ঞা-কারী হৈছ এহি সে বিস্ময় ॥"
কান্দিয়া শ্রীমতী কহে করুণা-বচন।
লজ্জিত হইয়া বোলে দৈবকী-নন্দন ॥
'শুন' হের চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর।
যত কিছু কহিয়াছ নহে অনাকর ॥
কিন্তু একখানি কথা শুন লো সুন্দরি।
ভাই উদ্ধবেরে তুমি নেও সঙ্গে করি ॥
বিনয় করিয়া তুমি কৈও সুন্দরীত।
ক্রোধ ক্ষেমা করি যেন আইসেন তুরিত ॥'

শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অনুসারেই পর দিবস প্রাতে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া উদ্ধব গোকুলে যাত্রা করিলেন।

"দিন-অবসানে উদ্ধব গোকুলেত আসি।
শ্রীমতীর মন্দিরে বঞ্চিল সেহি নিশি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গেল রাধিকার ঘর।
সুন্দরী শ্রীমতী আগে গেল একেশ্বর ॥
মহোদা বোলয়ে হের উঠ গুণবতি।
মধু-পুরী হৈতে আইল সুন্দরীশ্রীমতী ॥

নয়ন মেলিয়া রাধা পরিহরি নিন্দ।
কহে—'প্রাণ-সখি কোথা রহিছে গোবিন্দ ॥'

(গান-ছন্দ নাগোদা)

"কহ কহ প্রাণ-সখি প্রাণ করোঁ স্থির।
শুনিয়া কুশল-বার্ত্তা জুড়াউক শরীর ॥
ভরসে রাখিলু তনু পাতিয়ান দিয়া।
আনিবার বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়া ॥
করিছ সাহস বড় মোর হিত লাগি।
বিলম্ব করিয়া কেনে হও বধ-ভাগী ॥'

*   *   *

এহি মতে কান্দে রাধা বিষাদ ভাবিয়া।
শ্রীমতী বোলয়ে কিছু লজ্জিত হইয়া ॥
ক্ষেণেকে বোলয়ে 'সখি কি পুছ আমারে।
আসিছে উদ্ধব তোমা নিবার অন্তরে ॥
উদ্ধবে শুনিয়া তবে এহি বিবরণ।
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ ॥
প্রণতি-পূর্ব্বকে পরিহার করি বোলে।
"হইছে প্রভুর আজ্ঞা যাইতা আমা উলে ॥'
শুনিয়া পুরুষ নারী গোকুলের লোকে।
একত্র হইয়া সবে কান্দে মন-দুখে ॥
গোবিন্দের গমনে গোকুল হৈল ভিন্ন।
আছিল সুন্দরী রাধা এহি মাত্র চিহ্ন ॥
রাধা তথা গেলে হরি হইব নিষ্ঠুর।
এত দিনে গোকুলের লক্ষ্মী গেল দূর ॥
পাপিষ্ঠ শ্রীমতী কোন্ কর্ম্ম কৈল গিয়া।
সকল গোয়ালে কান্দে বিষাদ ভাবিয়া ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও ব্যাজ কর কেনে।
অবিলম্বে রথে আইস ক্ষেমা করি মনে ॥'
অন্তরে হরিষ রাধা অঙ্গ পুলকিত।
উত্তর দিবার শক্তি নাহি কদাচিৎ ॥
পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন।
'প্রত্যুত্তর না দেও মাও কেমন কারণ ॥'

রাধা বোলে 'মুঞি হৈছুঁ যেমত কুলিশ।
তোমারে দিবার রত্ন নাহিক সদৃশ ॥
আশীর্ব্বাদ করেঁা বাপু শুন সাবধানে।
কল্যাণে রাখুক তোমা প্রভু ভগবানে ॥'
পুলক-উদ্গাম-চারু হৈয়া সুবদনী।
গ্রীবা হৈতে খসাইলা কৌস্তুভ-মণি ॥
উদ্ধবেরে মণি তবে দিলেন সুন্দরী।
পুটাঞ্জলি করি লৈল মস্তকেত ধরি ॥
ভক্তিয়ে উদ্ধব কহে যোড় করি হাত।
'এহি মণি দিও মাতা প্রভুর সাক্ষাত ॥
আপনার গলে মাও রাখহ এখন।
অবিলম্বে বিমানে করহ আরোহণ ॥'
তখনে সুন্দরী রাধা হরষিত হৈয়া।
শাশুড়ীর আগে কহে পদ-ধূলি লৈয়া ॥
'ক্ষেমিও সকল মোর যত অবিনয়।'
আইহনেরে সম্বোধিয়া এহি কথা কয় ॥
কান্দিয়া তখনে মায়ে পুত্রে কহে কথা।
'স্নান করি বেশ ধরি তবে যাও তথা ॥'
রাধা বোলে—'বেশে মোর কোন্ প্রয়োজন।
এহি মতে দেখি গিয়া প্রভুর চরণ ॥'
শাশুরীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাষিয়া।
রথে আরোহিল রাধা হরষিত হৈয়া ॥
শ্রীমতী যশোদা স্থানে কহিল সুন্দরী।
'আমারে দেখিও গিয়া দ্বারকা-নগরী ॥'
ননদী সখীর গলে ধরিয়া সুন্দরী।
ক্রমে ক্রমে সম্ভাষিল যত গোপ-নারী ॥
বিষাদ ভাবিয়া শোকে কান্দে ব্রজ-সবে।
তখনে বিমান তবে চালায় উদ্ধবে ॥

*   *   *

এহি মতে অস্ত-গিরি গেল দিবাকর।
উদ্ধব মিলিল গিয়া দ্বারকা-নগর ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও শুন নিবেদন।

বিদ্যমানে দেখ এহি প্রভুর ভুবন ॥'
রাধা বোলে—'শুন বাপ আমার উত্তর।
পদ-ব্রজে যাইমু আমি প্রভুর গোচর ॥'
তাক শুনি উদ্ধবে রথ রহাইল।
তখনে সুন্দরী রাধা হাটিয়া চলিল ॥
রাধার শরীর-তেজে জ্বলে পুরীখান।
বপু তপ্ত-কাঞ্চন যে দেখিতে সমান ॥
অগ্নি-উল্কা হেন রাধা দেখে সর্ব্ব-জনে।
অনিমিখ-নয়নে দেখিল তত ক্ষণে ॥
সত্যভামার মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ।
আসিল সুন্দরী রাধা জানিল তখন ॥
গোবিন্দে বোলয়ে 'শুন দেবি সত্যভামা।
আসিল মোর প্রাণেশ্বরী সেহি তিলোত্তমা ॥'
সত্যভামা বোলে 'প্রভু এথা আন গিয়া।
আমি-সবে দেখি তানে নয়ন ভরিয়া ॥'
গোবিন্দ বোলেন 'শুন অনুব্রজি আনি।
পরিণামে দেখি দুঃখী হইবা কামিনি ॥'
সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে।
অনুব্রজি আনিতে গোবিন্দ যাই রঙ্গে ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও শুন নিবেদন।
নারী-গণ লৈয়া দেখ আইসে নারায়ণ ॥
এহি অষ্ট সুন্দরী বিবাহ করিছাঞি।
তোমার সম্ভ্রমে তানা আপনে আসিছাঞি ॥'
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মনে।
মন্দ মন্দ চলি যাই খঞ্জন-গমনে ॥
হেন কালে যদুপতি দেখিল রাধারে।
অবল শরীর ক্ষীণ হাটিতে না পারে ॥
কালা বস্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত।
শ্রীমতীর কথাখানি জন্মিল প্রতীত ॥
রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥

শরীরের তেজ বর্ণ উল্কার সমান।
তপ্ত-কাঞ্চন হেন জলে পুরীখান॥
নানা মতে শোভিয়াছে অঙ্গের অভরণ।
কৌস্তুভ-দীপিত-ক্রমে জলে দুই স্তন॥
ভবানীরে জিনে রূপ হেন তিলোত্তমা।
হেরিয়া মূর্চ্ছিত নারী আদি সত্যভামা॥

*   *   *

রুক্মিণী আদি অষ্ট নারী রৈল সেহি স্থান।
একেশ্বর গেল হরি রাধা বিদ্যমান॥

*   *   *

প্রভুর রাতুল-পদ দেখি সুবদনী।
তপনের তাপে যেন উনায় কাঁচা ননী॥
দেখিয়া সুন্দরী রাধা পুলকিত অতি।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে তিতে বসুমতী॥
প্রদক্ষিণ সপ্ত বার করিয়া সুন্দরী।
কোকিলার স্বরে কহে দণ্ডবত করি॥
'অয়ে প্রভু নারায়ণ শুন নিবেদন।
সপ্তদশ মাসে আজি হৈল দরশন॥
হৈনত ভরসা মোর না আছিল মনে।
ভজিমু দুইখানি তোমার রাতুল চরণে॥'
প্রভুর কমল-পদে দিয়া দুই হাত।
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধা হয় অশ্রু-পাত॥
'বিরহ-জ্বালায়ে নিশি-দিসি পুড়ি মরোঁ।
নম অবিবেক-সিন্ধু নমস্কার করোঁ॥
কঠিন হৃদয় তোর কুলিশ-আকার।
সত্য-হীন মিথ্যা-বাদী করোঁ নমস্কার॥'

*   *   *

এহি মতে শশি-মুখী রাজা-পদে ধরি।
বিবিধ কাতর বোলে দণ্ডবত করি॥
প্রণাম করিতে তেজ বাড়িল প্রচুর।
মলিন-কুবেশ রাধার সব হৈল দূর॥
প্রচণ্ড অঙ্গের তেজ সেহি ক্ষণ হৈল।

সহিতে না পারে উদ্ধব দূর হৈয়া রৈল ॥
সায়ং-কালে সেহি তেজে জ্বলে পুরীখান।
দ্বারকানিবাসী লোক ত্রাসে কম্পমান ॥
আপনা অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে।
সর্ব্ব-লোকের তনু দহে রাধিকার তেজে ॥”

* * *

সুন্দরী রাধার কোপ দেখি অতি বড়।
ব্যস্ত হৈয়া শ্রীহরির চিন্তা হৈল দড় ॥
পুটাঞ্জলি করি বোলে শ্রীমধুসূদন।
‘শুন হের চন্দ্র-মুখী মোর নিবেদন ॥
আমা হৈতে পর-দার হৈয়াছে বিস্তর।
কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রিয়া মোরে ক্ষেমা কর ॥
এহি রাজ্য সিংহাসন সকলি তোমার।
পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিয়া কর অধিকার ॥
পরিহার করোঁ প্রিয়া চরণেত ধরোঁ।
পুনরপি ভর্ৎস যদি তোর আগে মরোঁ ॥’
এইরূপে হস্ত-যোড়ে বোলে যদুপতি।
তবে প্রত্যুত্তর দিলা রাধা গুণবতী ॥
‘অয়ে প্রভু মুনি-রাজ কপট-সাগর।
তোমার চরিত্র মুঞি জানোঁ পূর্ব্বাপর ॥
ক্ষেমিতে উচিত এবে জানিছু সকল।
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল অন্তরে গরল ॥
জানিছু জানিছু মুঞি তোর যেহি মন।
তবে যে এমত কহ নির্লজ্জ কারণ ॥
সৌতিনের মেলে মুঞি বঞ্চিতে সাহস।
ছাড়িমু পরাণ দড় এহি সে মানস ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ দ্বারকাত মোর বধ।
এহি সে ভাগ্য মোর দেখিলুঁ রাঙ্গা-পদ ॥’
করুণা করিয়া কান্দে রাধা গুণবতী।
রাধার করুণা শুনি দুঃখিত শ্রী-পতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাধা হইল মোহিত।
দেখিয়া শ্রী-পতি হৈলা অত্যন্ত দুঃখিত ॥

কি করিলে কি করিব চিন্তে মনে মন।
আকাশে থাকিয়া চিন্তে যত দেব-গণ ॥
বিরিঞ্চি বোলয়ে—'ইন্দ্র প্রমাদ হইব।
বিষ্ণুরে লইয়া লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে আসিব ॥
না মারিব দুষ্ট-জন না খণ্ডিব ভার।
অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ বাড়িল রাধার ॥
ক্ষেমা নাহি করে কোপে করয়ে রোদন।
আসিব প্রভুরে লৈয়া বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥'
সহস্রাক্ষে বোলে—'শুন কমল আসন।
পরিহার করি কহ প্রভুর চরণ ॥'
তখনেহি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥

ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর বহু স্তব-স্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

"সৃষ্টি-নাশ না করিও প্রভু শক্র-জিৎ।
লক্ষ্মীরে সন্তোষ কর তান মনোহিত ॥"
শ্রী-পতি বোলয়ে 'আত্ম-ইচ্ছা নহে মন।
নিবেদন করি কহ রাধার চরণ ॥'
তখনে বিরিঞ্চি চতুর্ভুর্জ পুট করি।
পরিহার করি বোলে 'শুনহ সুন্দরি ॥
যাবত অনিষ্ট নাশে প্রভু চক্র-পাণি।
তত দিন মহী-তলে রহিবা কামিনি ॥
যেমত বিলাস ভোগ করিছ গোকুলে।
তেমত কৌতুকে বঞ্চ শ্রীহরির উলে ॥'
রাধা বোলে 'তবে আমি রহিবারে পারি।
গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খ-চক্র-ধারী ॥'
হরি বোলে 'আমার আছয়ে এহি মতি।
আপনার স্থানে চলি যাহ প্রজাপতি ॥'
প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিল গমন।
রাধিকার তেজে দহে দ্বারকা-ভুবন ॥
দ্বারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান।
কোথা গেলা রাম কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥
প্রলয়-কালেত যেন দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড।

তেন মতে দহে তেজে অধিক প্রচণ্ড ॥
তিলোত্তমার রূপ-গুণ তেন প্রজ্বলিত।
মনে মনে রাধা-কান্ত হইল চিন্তিত ॥
নিবেদন ব্রহ্মার লোকের প্রতিকার।
শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার ॥
পূর্ব্বে যে রাধার বর হইল স্মরণ।
এতেকে নিশ্চয় কৈল শ্রীমধুসূদন ॥

* * *

মায়ায়ে মোহিত হৈয়া ত্রৈলোক্যের নাথ।
আচম্বিত গোবিন্দের হৈল অশ্রু-পাত ॥
দণ্ডবৎ করি রাধা বন্দিতে হরিরে।
নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥
সেহি ক্ষণে প্রচণ্ড তেজ হইল শীতল।
সর্ব্ব-লোক সন্তোষিত রাধিকা বিকল ॥
তবে ব্রহ্ম-সনাতন হইল বিভোল।
গলে ধরি সুন্দরী রাধারে দিলা কোল ॥
সপ্তদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি।
মগ্ন হৈল হরি-অঙ্গে রাধিকা রূপসী ॥

* * *

শ্রীহরির প্রেম-রসে হৈলা এক-অঙ্গ।
অঙ্গীকার মহাজনের কেনে হৈব ভঙ্গ ॥

আমাদের এই প্রবন্ধ বিষয়-গৌরবে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর আমরা আর ভবানন্দের এই কাব্যখানার বিশেষত্ব ও কবিত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করিব না। হরি-বংশ হইতে যে পয়ার ও পদগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আমাদিগের বিশ্বাস যে, উহা হইতেই ভবানন্দের কাব্যখানির বিশেষত্ব ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উপসংহারে ভবানন্দের দেশ ও কাল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। ভবানন্দের এই বৃহৎ কাব্যখানির মাত্র দুইখানা হস্তলিখিত পুথি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 'ক' চিহ্নিত প্রথম ও প্রাচীনতর পুথিখানা বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের লিখিত; 'খ' চিহ্নিত পুথিখানি বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। (ক) পুথিখানি পাবনায় ও (খ) পুথিখানি কুমিল্লায় পাওয়া গিয়াছে। পুথি দুইখানার মধ্যে পদ ও পয়ারের সংখ্যায় এরূপ বেশকম এবং পাঠের এত অনৈক্য দেখা যায় যে, পুথি দুইখানাকে একই গ্রন্থের দুইটী বিভিন্ন রূপান্তর (version) বলিলেও চলে। (ক) পুথিখানি ময়মনসিংহের অন্তর্গত

সুসঙ্গ পরগণায় ও (খ) পুথিখানি কুমিল্লার অন্তর্গত মিহিরকুল পরগণায় লিখিত হইয়াছিল। উভয় পুথির মধ্যে যে আটত্রিশ বৎসরের ব্যবধান আছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ একখানা বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া, 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া এরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না; সুতরাং (ক) পুথি লিখিত হওয়ারও অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর আগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবি ভবানন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার এই বৃহৎ ও অপূর্ব্ব কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। হরি-বংশ পুথিখানির কোনও প্রতিলিপি এ যাবৎ পশ্চিম-বঙ্গে পাওয়া যায় নাই; প্রণিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধৃত স্থল-গুলিতে যে, পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ দেখা যায়, সেগুলি কেবল লিপি-করদিগের কারিকরি নহে; কেন না, সেগুলি এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, রচনার ভাব ও ছন্দ ঠিক রাখিয়া উহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও শব্দ বসাইতে পারা যায় না। এ জন্য আমরা ভবানন্দকে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বা কুমিল্লার অধিবাসী বলিয়াই অনুমান করি। হরি-বংশের পয়ার ও গীতগুলিতে যে দুই তিন শত ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, উহার কোথায়ও 'দীন ভবানন্দ' ব্যতীত কবি 'দ্বিজ' বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ইহা তাঁহার বিনয়-প্রসূত কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। ভবানন্দের রচনায় তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন সময়ে সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করার জন্য ব্রাহ্মণেতর কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ বৈদ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুশীলন করিতেন; সুতরাং ভবানন্দ ব্রাহ্মণ না হইয়া, বৈদ্য কিংবা অন্য-জাতীয় হওয়াও বিচিত্র নহে। তিনি যেই কালের, যেই দেশের ও যেই জাতির লোকই হউন না কেন, তাঁহার এই 'হরি-বংশ' কাব্য তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অমর ও চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব

(৫)

সামাজিক জীবনের প্রকৃতি

অর্থশাস্ত্র-যুগের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যও অনেক ছিল। মনে হয়, যেন সে সময়ে এখনকার দিনের মত জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। আমাদের সময়ের মত লোকে আমরণ উদরান্নের চিন্তায় কাটাইত না। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেরূপই নিজ সঙ্গতির মধ্যে থাকিয়া অতিচিন্তা বা অতিক্লেশের দাস না হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। কৃষকাদি নিজ নিজ শস্যসম্পদেই জীবননির্ব্বাহের ক্লেশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। শ্রমজীবীরাও অভাব-পীড়িত ছিল না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা উচ্চ রাজকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিত আর শ্রেষ্ঠী ধনীদিগের ত কথাই ছিল না।

নানা কারণে তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। লোকে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিত। আজকালের মত এত উচ্চ আশাও ছিল না। আর বিদেশীয় কুশিক্ষার মোহে নিজ নিজ জীবিকার পথ ছাড়িয়া, চাকুরী বা উচ্চ পদের আশায় নিজ সুখস্বচ্ছন্দ্যের পথে কাঁটা দিত না। বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যও এত প্রবল হয় নাই, আর ব্যবসার নামে দেশের শস্য বা উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির এত ব্যবস্থা ছিল না। দেশের টাকা দেশেই থাকিত। রাজকর্ম্মচারীরাও জিনিসের দর বাঁধিয়া দিতেন। ব্যবসায়ীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন না। তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদির দর বাড়াইতে পারিত না। সরকারও প্রজাসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য আগে দেখিতেন।

লোকে ভোগসুখ করিতেও জানিত। এখনকার মত দারিদ্র্যপীড়নের ফলে নিরানন্দের স্রোত দেশে আসে নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের—এককালীন সেবাই চলিত। ধর্ম্মের নামে এত কাঠোর্য্য আসে নাই। বরঞ্চ অর্থৈষণা দেশে প্রবল ছিল। প্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, দ্বিতীয়ে ধনাগম—গার্হস্থ্যজীবন, আর শেষ বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। মুমুক্ষু বা জ্ঞানপিপাসু লোকে ধর্ম্মস্পৃহার জন্য সংঘাদিতে যোগ দিতেন. আর আর্য্যমতাবলম্বীর দল শেষ বয়সে বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু হইতেন।

ধর্ম্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করার সুবিধাও ছিল না। মধ্য বয়সে কেহ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে রাজকোপে পড়িতে হইত। আর স্ত্রীলোককে সংঘে যোগদান করাইলে বিশেষ দণ্ড হইত। কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিজ পরিবারবর্গের ব্যবস্থা করিয়া তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত। নচেৎ রাজা-

* ১৩৩১।২২এ অগ্রহায়ণ একত্রিংশ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দেশে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজকর্মচারীরা এইরূপ লোককে গ্রহণ করিয়া তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রকৃত বানপ্রস্থীদিগের জন্য রাজ সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। বানপ্রস্থীরা অনেক বিষয়ে অকর ছিলেন। তাঁহাদের জন্য আবার ব্রহ্মসোমারণ্যাদির ব্যবস্থা থাকিত।

এবার সাধারণ গৃহী লোকের জীবনের কথা বলিব। দুঃখের বিষয়, অর্থশাস্ত্রে লোকের দৈনিক জীবনের কোন কথা নাই। আর বাৎস্যায়নের কামসূত্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থেই উহার বর্ণনা নাই। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনা পড়িয়া, অর্থশাস্ত্রের নানা স্থান পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে দৈনিক জীবনের আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ শয্যা হইতে উঠিয়াই লোকে মুখ প্রক্ষালনাদির পর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রাতরাশ আহারান্তে নিজ নিজ বৃত্ত্যানুযায়ী কার্য্যে মনোযোগ করিত। শ্রমজীবীর দল নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ধনীরা বিশ্রম্ভালাপে পূর্ব্বাহ্ণ অতীত করিয়া, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে স্নানাহারে মনোযোগ দিতেন। ধনী দরিদ্র সকলেই নিত্য স্নান করিত (বাৎস্যায়ন বলেন, নিত্যং স্নানং)। আর এই স্নানের আবার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকিত। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্নানাগারের কথার উল্লেখ আছে। আবার লোককে স্নান করাইবার জন্য স্নাপক (বা পালিভাষায় নহাপক) নামক এক শ্রেণীর লোক থাকিত। স্নানকালে ধনী লোকেরা স্নেহচূর্ণাদি নানা প্রকার দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন ও তদন্তে গন্ধাদিতে শরীর লিপ্ত করিতেন।

স্নান ভিন্ন আবার উৎসাদনের ব্যবস্থা ছিল। (বাৎস্যায়ন বলেন,—দ্বিতীয়ং উৎসাদনং)। স্নানান্তে আহারের ব্যবস্থা ছিল। আহারে বিশেষরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের ব্যবস্থা থাকিত। আহারান্তে বিশ্রামের পর দরিদ্র লোকে নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিত। ধনীর দল বা সৌখীন বিলাসীরা নিদ্রায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। তদন্তে তাঁহারা অপরাহ্ণে গোষ্ঠী, মিত্রসমবায়, সমাপানকাদিতে গমন করিয়া, তথায় আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন।

সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথা অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু নাই। তবে রাজপ্রণিধি অধ্যায়ে ও নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে রাজার দিনকৃত্যের অনেক কথাই পাওয়া যায়। উক্ত অধ্যায়দ্বয় হইতে দেখা যায় যে, রাজা প্রত্যহ অতি প্রাতঃকালেই উঠিতেন। প্রত্যূষেই—এমন কি, রাত্রির শেষ অষ্টম ভাগে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসক ও মৌহূর্ত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করার পর সবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণ করিয়া সভায় উপস্থিত হইতেন। প্রথম অষ্টম ভাগে নিজ আয়-ব্যয় চিন্তা করিয়া, দ্বিতীয়ে সভাগৃহে প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগের চিন্তা করিতেন। অতঃপর তৃতীয়ে স্নান ভোজন সমাপন করিতেন। স্নান ভোজনান্তে যথাক্রমে অধ্যক্ষাদির সহিত কার্য্যচিন্তা করিয়া, মন্ত্রী ও চারবর্গের সহিত পরামর্শ, মন্ত্রণাদি সমাপন ও তদন্তে সৈন্যাদি পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতির সহিত সৈন্যাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দিবা শেষ করিতেন।

রাত্রিকালের কর্ত্তব্যও ঐরূপ উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রাত্রির দ্বিতীয় অষ্টম ভাগে স্নান

ভোজন সম্পন্ন হইত। উহার পরের দুই ভাগ অন্তঃপুরে নিদ্রাদিতে কাটাইতেন। আর পঞ্চম ভাগ অতীত হইতে না হইতেই জাগরিত হইয়া স্বকার্য্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন।

রাজজীবনে ও প্রজাসাধারণের জীবনে অবশ্য অনেক প্রভেদ ছিল। বাহির হইতে সুখবিলাস-পূর্ণ প্রতীয়মান হইলেও উক্ত যুগের রাজতন্ত্রের রাজ্যেশ্বর কঠোর জীবনই অতিবাহিত করিতেন। শান্তি জীবনে খুব কমই ছিল। প্রতিনিয়তই রাজ্যরক্ষার চিন্তা, প্রাণরক্ষার চিন্তা প্রভৃতিতে রাজহৃদয় অভিভূত হইত। মন্ত্রী, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, গুপ্তশত্রু, সকল হইতেই রাজার ভয়ের কারণ ছিল। নানা কারণেই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হইত। স্বদেশীয় বা বিদেশীয় গুপ্তশত্রু খাদ্যে বিষ মিশাইতে চেষ্টা করিত। তজ্জন্য খাদ্যের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হইত। অগ্রে খাদ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, উহার বর্ণাদি হইতে উহাতে বিষ আছে কি না, তাহা দেখা হইত। পরে রক্ষিত পশু-পক্ষীকে খাওয়াইয়া উহার নির্দোষিতা প্রমাণিত হইত। রাজঅন্তঃপুরে সর্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বা অগ্নিপ্রয়োগে গুপ্তহত্যার ভয়ও ছিল। তজ্জন্য নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। রাজ্ঞী বা অন্তঃপুরিকাদিগের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ছিল না। তজ্জন্য অন্তঃপুরে নানাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ ষণ্ড বামনাদি প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। বেশ্যা, যবনী, ম্লেচ্ছ রমনীও বিশ্বস্ত প্রহরীর কার্য্য করিত। তাহারা পূর্ব্বে সমস্ত সন্ধান লইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে, তবে রাজা মহিষীবিশেষের গৃহে আসিয়া সুরক্ষিতভাবে কালাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই রাজগণের এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগের ফরাসী রাজ্যে এবং এমন কি, ইদানীন্তন কালের চীনসাম্রাজ্য ও তুর্কসাম্রাজ্যে ঐরূপ ব্যবস্থাই ছিল। যাঁহারা তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব পদচ্যুত সম্রাট্ দ্বিতীয় আবদুল্ হামিদের অন্তঃপুর-জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

সপত্নীবিদ্বেষ-জর্জরিতা বা পুত্রের সিংহাসন-লাভার্থিনী রাজ্ঞীগণও গুপ্তষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীর প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ গুপ্ত হত্যার উদাহরণ-স্বরূপ ভদ্রসেন কারূষ (করূষরাজ্যাধিপতি), বিদূরথ ও জনৈক কাশীরাজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামগুলি বৃহৎসংহিতা, হর্ষচরিত ও অন্য দুই চারিখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সবের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। আত্মরক্ষিক প্রকরণ পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যায়। রাজা প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে দশবর্গীয় প্রহরি-পরিবৃত হইয়া যাইতেন। নানা বেশধারী চারবর্গ আসে-পাশে থাকিত। এইরূপেই রাজার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পুত্রগণ হইতেও বিশেষ ভয় ছিল। পুত্রদমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অন্য অধ্যায়ে বিবৃত আছে। দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবার জীবন সম্পর্কে, সাধারণের আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা প্রভৃতির কথা বলিব।

আহার এখনকার দিনের মতই মিশ্রিত ছিল। অন্নতণ্ডুলাদি, গোধূম বা যব হইতে প্রস্তুত

রুটি বা পিষ্টকাদি ও সঙ্গে শাক ব্যঞ্জনাদি, দুগ্ধ, পায়স, ঘৃত, মাংস, মৎস্য, অম্ল মিষ্টাদি লইয়াই লোকের আহার্য্য হইত। তবে মনে হয় যে, তৎকালের আহার পরিমাণে অধিক ছিল এবং উহাতে মৎস্যমাংসাদি উৎকৃষ্ট আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে ভাগ্যক্রমে আমরা অনেক বিশেষ বিবরণ পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের অধ্যায়ে আমরা আহার্য্য দ্রব্য ও উহার পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি। উক্ত অধ্যায়ে নানা-জাতীয় ধান্য, ফল, স্নেহ, মধু, ক্ষার, শাক লবণাদির কথা বিবৃত হইয়াছে। আরও আমরা জানিতে পারি যে, উৎপন্নের যে অংশ রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন বা রাজক্ষেত্রাদিতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহা প্রতিবৎসরে রাজ-কোষ্ঠাগারে সঞ্চিত হইত। উহার অর্দ্ধাংশ হইতে রাজভৃত্য বা পরিজনাদির ভরণ পোষণ হইত। আর বক্রী অর্দ্ধাংশ প্রজাসাধারণের বিপদাদিতে বা দুর্ভিক্ষাদির কালে প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকিত। অসময়েই উহা ব্যয়িত হইত, নচেৎ নহে। (ততোঽর্দ্ধমাপদর্থং রক্ষেৎ, জানপদানাম্ অর্দ্ধমুপভুঞ্জীত—নবে চানবং শোধয়েৎ)।

এই অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ ভদ্রলোকের তৎকালের আহার্য্য-পরিমাণ দেওয়া আছে। খাদ্য পরিমাণের হিসাবে কৌটিল্য বলেন যে, আর্য্য পুরুষবিশেষের একবার ভোজনের জন্য ১ প্রস্থ চাউলের অন্ন, সিকি প্রস্থ সূপ, আর ১/১৬ প্রস্থ তৈল বা ঘৃত লাগে। * আর নিম্নশ্রেণীর লোকের খাদ্যের জন্য ঐ পরিমাণ চাউল এবং ১/৬ প্রস্থ ঘৃত, তৈল ও সূপ হইলেই হইত। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের ৩/৪ ভাগ খাদ্য পরিমাণ ও বালকাদির পক্ষে অর্দ্ধ হইলেই যথেষ্ট।

অন্ন ঘৃত সূপাদি ভিন্ন দালের বিশেষ ব্যবহারই ছিল। অর্থশাস্ত্রে মুদ্গ, মসূর, কুলত্থ মাষ প্রভৃতি দালের ব্যবহারের ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মৎস্য ও মাংসের ব্যবহারও প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয়। জীবন্ত মৎস্য ভিন্ন শুষ্ক মৎস্যের ব্যবহারের কথা ও উল্লিখিত হইয়াছে। আর মাংসব্যবহার তখনকার দিনে প্রচুরপরিমাণে চলিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অহিংসাবাদের প্রভাবে নিরামিষপ্রিয়তা বা শাক তৃণাদি ভোজনে শীঘ্র স্বর্গলাভের বাসনা তখনও দেশে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিকযুগে মাংসের প্রচুর ব্যবহার অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে। তৎপরবর্ত্তী যুগে জাতকাদিতেও বহু প্রকার মাংসের ব্যবহার দেখা যায়। দুই একটি জাতক পাঠে দেখা যায় যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নানা-জাতীয় পশুর—এমন কি, বৃষ বরাহাদির মাংস ভক্ষণও চলিত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ কোন ভক্তপ্রদত্ত বরাহমাংস ভক্ষণেও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, উক্ত মাংস অতিরিক্ত ভক্ষণে উদরাময়েই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া লিখিত আছে। আর মহাভারতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মাংসই শ্রেষ্ঠ আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বোক্ত নীতিগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, তৎকালে আঢ্যশ্রেণীর লোকের আহার মাংসপ্রধান ছিল। মধ্যবিত্ত লোকে দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রধান আহার করিত আর দরিদ্র লোকেই শাকাদি ভোজনে প্রাণ

* ১ প্রস্থ=৩২পল, ১পল=৪কর্ষ, আর ১কর্ষ=৮০রতি। ইহা হইতেই পরিমাণ বুঝিয়া লউন।

ধারণ করিত ("মাংসপ্রধানমাঢ্যানাং ক্ষীরপ্রধানং মধ্যানাং শাকপ্রধানং দরিদ্রাণাং"। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, দ্রৌপদীর বিবাহ বা উত্তরার বিবাহের বর্ণনায় মাংসের ব্যবহারের বিশেষ বর্ণনা আছে। আর প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার রন্তিদেবের উপাখ্যান ও নিহত গবাদি পশুর রক্তে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ক্রমে অবশ্য অহিংসামতের প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ ঋষিগণ ও ক্রমে জৈন বৌদ্ধাদি উক্ত মতের বহু পোষকতা করেন। মনে হয়, অহিংসার মাহাত্ম্য বর্ণনায়ও লোকে সহজে মাংসাহার হইতে বিরত হয় নাই। আজীবক ও অন্যান্য দলের লোকও অহিংসাকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মাংসাহার একেবারে সহজে বর্জ্জিত হয় নাই।

কৌটিল্যের যুগে মাংসের ভূরি চলন ছিল। যে অধ্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অধ্যায়েই কৌটিল্য মাংস রন্ধনে ঘৃত তৈলাদির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও অকারণ পশুবধের বিরোধী ছিলেন এবং বহু অধ্যায়ে চাতুর্ম্মাস্য, পর্ব্বদিবস ও সন্ধিপ্রভৃতি দিবসে পশু-বধ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এ ভিন্ন তিনি স্ত্রীপশু, বাল (অল্পবয়স্ক) পশু প্রভৃতি বধ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। উত্তরকালে অশোকের অনুশাসনগুলিতেও অবাধ পশুবধ নিষিদ্ধ হয়। তিনি কতকগুলি পশুবধ একেবারে রহিত করেন। আর স্ত্রীপশু বা অল্পবয়স্ক পশুবধ নিষিদ্ধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বাদিতেও পশুবধ নিবারণ করেন। অশোক অহিংসাবাদে বিশ্বাসী হইলেও সহজে মাংসাহার ত্যাগ করেন নাই এবং যদিও উহা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার রন্ধনাগারে ১টি মৃগ, ৩টি ময়ূর ও অন্য কয়েকটি পশু নিয়তই নিহত হইত।

মাংসাহারের ভূরি প্রচলনবশতঃ রাজকর্ম্মচারীরা উত্তম মাংস যাহাতে সরবরাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। সূনাধ্যক্ষ অধ্যায়ে জানা যায় যে, সূনাধ্যক্ষ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা, পচা বা দূষিতমাংস বিক্রয় রদ করিয়া দিতেন। রুগ্ন পশুর মাংসও বাহিরে বিক্রয় হইত না (মৃগপশূনামনস্থিমাংসং সদ্যোহতং বিক্রীণীরন্)। মাংসে ভেজাল দিলে বা দূষিতমাংস বেচিলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। গো ও অন্যান্য কতিপয় পশু অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। (বৎসো বৃষো ধেনুশ্চৈষামবধ্যাঃ)।

মাংসব্যবহার এত প্রচলিত ছিল যে, সে যুগে লোক নানা প্রকার মাংসের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এখনকার হোটেলের ন্যায় বিক্রয় করিত। অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে পাকমাংসিক নামে অভিহিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যায়। পাকমাংসিকদিগের ন্যায় ঔদনিক, আপূপিক প্রভৃতি অন্নবিক্রেতারও বহু স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা বর্ত্তমানের hotel-keeperএর সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্য দুই একটি কথা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে, উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে উহার উল্লেখ পাওয়াও দুর্ঘট হইত। তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোক উক্ত ক্রীত মাংস ব্যবহার করিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন।

মাংসের মধ্যে বোধ হয়, অজ অথবা মেষমাংসেরই ভূরি প্রচলন ছিল। তবে মনে হয় যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বা উচ্ছৃঙ্খলদিগের মধ্যে শূকর বা কুক্কুটমাংসও চলিত। কৌটিল্য কোশাভিসংহরণাধ্যায়ে যোনিপোষকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্তপ্রসঙ্গে কুক্কুট ও শূকরপোষকদিগের কথা বলিয়াছেন। উহা দেখিয়া মনে হয় যে, কুক্কুটমাংসও বেশ ব্যবহৃত হইত। "অভক্ষ্যা গ্রাম্যকুক্কুটাঃ" কথাটি বোধ হয়, শিক্ষিত ও সদাচারী ব্রাহ্মণেই মানিতেন। কেন না, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "কুক্কুটো বল্যানাং" কথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বাৎস্যায়নও গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে কুক্কুটপালন উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও বঙ্গ বা আর্য্যাবর্ত্তের বা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন নিম্নজাতীয় লোকেরা কুক্কুটমাংসে বিরত নহে। শূকরমাংসও ঐরূপ জাতকাদিতে উল্লিখিত আছে। তবে উচ্চ বর্ণে বোধ হয়, উহা ব্যবহার করিতেন না। এখনও রাজপুতানা ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে শিকারলব্ধ বরাহমাংস অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষিত হইয়া থাকে।

সে যুগের মাংসরন্ধনাদির বিষয় অর্থশাস্ত্র বা অন্য গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থাদিতে স্থালীপাক ও শূল্য মাংস উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। শকুন্তলায় শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। আর মৃচ্ছকটিকে বহুবিধ মাংস রন্ধনের উল্লেখ আছে। ঐ সকল যুগেই রচিত নলপাকদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মাংসাহারের পারিপাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই জানা যায়। মাংসৌদন অতি প্রাচীন। এমন কি, অথর্ব্ববেদে উহার বহু উল্লেখ আছে। তবে পরবর্ত্তী যুগে অহিংসাপ্রাধান্যবশতঃ মাংসাহার ও মাংস ব্যবহার অনেক কমিয়া আসে। এখনকার যুগে পলান্নাদি মুসলমানদিগের নিকট গৃহীত বলিয়াই অনেকের ধারণা।

মৎস্যাহারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতি প্রাচীন যুগে ঋগ্বেদাদিতে অবশ্য মৎস্যের বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু কালে উহার ব্যবহার চলিত হয়। মৎস্যবিক্রয়ী কৈবর্ত্তদিগের কথা বৈদিক সাহিত্যে বহু স্থানেই আছে। স্মৃতিতেও বহু স্থানে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মৎস্যের উল্লেখ আছে। জাতকাদিতে মৎস্যাহারের কথা বিলক্ষণই আছে। এমন কি, একটি জাতকের নামই ইল্লীশজাতক। বর্ত্তমানে উত্তর পশ্চিমে অবশ্য মৎস্যাহার ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। এমন কি, বঙ্গদেশী মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবাসীর নিকট অতি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত দেশের পণ্ডিতেরা নিজ দেশীয় আচারেই মোহান্ধ হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

সুরাপান

মৎস্য মাংসাহারের ভূরি প্রচলনের সঙ্গে সুরাপানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কথা অনেকের নিকটই অপ্রীতিকর হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে সকলকেই সুরাপানের কথা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য সুরাপান মহাপাতক বলিয়া গণিত হইত এবং উহাতে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল (সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং

পিবেৎ)। মদ্যপানের বিষময় ফলের উপলব্ধি করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান সামাজিক ইতিহাসেও উহা দেখা যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইউরোপের অনেক দেশেই মদ্যপান ও মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকায় এ বিষয়ে বড়ই কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছে। মদ্য প্রস্তুত—এমন কি, আমদানী করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা এবং বিদেশীর সঙ্গে মদ্য থাকিলে উহা বাজেয়াপ্ত হয়, এ কথা অনেকেই জানেন।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের অবশ্য ঐরূপই আচার। শিষ্ট লোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দিত হন। কেহ বা গোপনে মদ্যপান করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটান। মধ্যযুগে তন্ত্রের দোহাই দিয়া "কারণ সেবা" অনেক শাক্তেরই চলিত। এখন কারণ উঠিয়া গেলেও সভ্য ইংরাজী বিধিতে অনেক শিক্ষিত লোকেই মদ্য পান করেন।

প্রাচীন যুগে অবশ্য বিধিব্যবস্থা বিপরীতই ছিল। বৈদিক যুগে সুরার প্রচলন ছিল। আয়ুর্ব্বেদাদিতে মদ্য, সুরা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। স্বাস্থ্যের জন্য ও উপকারিতার জন্য অনেকেই ঋতুভেদে মদ্যবিশেষ সেবা করিতেন। সাধারণ গৃহী ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির মধ্যে উহা চলিত। সদাচারী ব্রাহ্মণেরা অবশ্য মদ্যপান ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উহা সদাচারবিহীন উচ্চ বর্ণ বা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ চলিত ছিল।

অর্থশাস্ত্রের যুগে মদ্যের এত বহুল প্রচার ছিল যে, সুরাধ্যক্ষ নামে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। নগরের বিশিষ্ট স্থানে, স্কন্ধাবারে ও গ্রাম্য প্রদেশের নানা স্থানেই মদ্যের দোকান ছিল। মদ্য-ব্যবসায়ীদিগকে সরকারের অনুমতি লইয়া, উপযুক্ত করদান করিয়া মদের দোকান খুলিতে হইত। যে কোন পরিমাণে মদ্য বেচার ব্যবস্থা ছিল না। লোকবিশেষে ও পরিমাণানুযায়ী মদ্য বেচিতে অনুমতি দেওয়া হইত। অধিক বেচিলে দণ্ডিত হইতে হইত। অর্দ্ধকুড়ুব, অর্দ্ধ প্রস্থ বা ১ প্রস্থের অধিক মদ কাহাকেও বেচিবার অনুমতি ছিল না। আর মদের দোকানে পুলিসের লোক বা গুপ্তচরেরা বসিয়া মদ্যপায়ীদের আচার ব্যবহার বা প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিত। সন্দেহ স্থলে গ্রেপ্তার করিত। ঐরূপ দূষিত বা পচা মদ বেচিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মদের দোকানগুলিতে নেশার বেশ সুব্যবস্থা ছিল। বসিবার স্থান—আসন শয্যাদির ব্যবস্থা ছিল এবং একাংশে *ফুল, ফল, খাদ্যাদি ও পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল*। পাছে মাতাল অবস্থায় লোকের দ্রব্যালঙ্কারাদি চুরি যায়, তার জন্য পুলিশের লোকে সে সবের হিসাব রাখিত ও দোকানদারকে দায়ী করিত।

অর্থশাস্ত্রে মেদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মৈরেয় ও মধু, এই কয়জাতীয় মদ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাদের প্রস্তুত-বিধিও উল্লিখিত আছে। সাধারণতঃ ধান, গুড় বা চিনি ও সঙ্গে ফল ও মসলাবিশেষ চোঁয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত হইত। নানাপ্রকার উপাদান সঙ্গে দিয়া উহাদের গন্ধ, বর্ণ বা শক্তির আধিক্য করা হইত। সহকার-সুরা, শ্বেতসুরা প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মদ্য বিশেষ সমাদৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মদের ব্যবসায় এখনকার মত রাজহস্তে একচেটিয়া ছিল। তবে পর্ব্ব বা উৎসবাদিতে সামান্য কর দিয়া, লোকে ব্যবহারোপযোগী মদ্য বাটীতে প্রস্তুত করার অনুমতি পাইত। উৎসব, সমাজ ও যাত্রাদিতে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল (উৎসবসমাজযাত্রাসু চতুরহঃ সৌরিকো দেয়ঃ, তেষ্বনুজ্ঞাতান্ প্রহ্‌বণান্তং দৈবসিকমত্যয়ং গৃহ্নীয়াৎ।) এবং ঐগুলিতে মদ্যাদির বহুল ব্যবহার ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকে, বিশেষ কর্ম্মকর, ভৃত্যাদি যে মদ বিশেষ ব্যবহার করিত, তাহা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। আর জাতকের বারুণিজাতক বা ইল্লীশজাতকে উহার প্রমাণ আছে। ইল্লীশজাতকে এক দরিদ্র ব্যক্তি কিছু মদ ও মৎস্য কিনিয়া যাইতেছে, এই চিত্রটি আছে। শকুন্তলা নাটকে ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে আনন্দের সময় মদ্য পানের কথা আছে। ঐ গ্রন্থে নগরপাল রাজশ্যাল ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, উহার পয়সায় মদের দোকানে চলিলেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ মদ্যপ্রস্তুতকারী জাতিরাই রাজতত্ত্বাবধানে মদ্য প্রস্তুত করিত। সুরাকার জাতির উৎপত্তি অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে। অর্থশাস্ত্রে সুরা প্রস্তুত সম্পর্কে উক্ত ব্যবসায়ী বা জাতির উল্লেখ আছে (তজ্জাতিসুরাকিণ্বব্যবহারিভিঃ কারয়েৎ)। আসব অরিষ্টাদি চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থা করিতেন। কৌটিল্যেও উহার উল্লেখ আছে (চিকিৎসকপ্রমাণাঃ প্রত্যেকশো বিকারাণামরিষ্টাঃ)।

ঐ যুগে ভারতের প্রদেশবিশেষ মদ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। কৌটিল্য কাপিশায়ন, হারহূরক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিতেও কপিশা দ্রাক্ষা ও মধু (মদ্যের)র জন্য বিখ্যাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আমোদ প্রমোদ

এই ত গেল আহারাদির কথা। ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু অর্থশাস্ত্রে নাই। অতঃপর আমোদ প্রমোদের কথা বলিব। তৎকালের সমাজে দেশকালানুযায়ী আমোদ প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ধনী ব্যক্তিদিগের সুখ-বিলাসে সময় কাটাইবার জন্য বহুপ্রকার সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। এগুলি বহু নামে অভিহিত ছিল; যথা—সমবায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি। অর্থশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা নাই। তবে বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্রাদি গ্রন্থ ও মহাভারতাদি হইতে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারি। এই বিষয়ে নিম্নলিখিতগুলির কথা বর্ণনা করিব। ১। সমবায় —গোষ্ঠী, সরস্বতীসমাজ। ২। সমাপানক। ৩। উৎসব—সমাজ। ৪। দেবরাত্রি—পুণ্য-রাত্রি। ৫। প্রেক্ষা—যাত্রা, প্রবহন। ৬। দ্যূতাগার—অক্ষাগার, দ্যূতক্রীড়া। ৭। অন্য প্রকার আমোদ—পক্ষিযুদ্ধ, পশুযুদ্ধ, পশুদৌড়ান। ৮। স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে আমোদ প্রমোদ—নৃত্যগীতাদি।

ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের আমোদ প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। উহাদের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিও বিভিন্ন ছিল। দরিদ্র গ্রাম্য জনের জন্য গ্রামে মিলনের স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহা এক স্থলে শালা নামে অভিহিত হইয়াছে।

আর ধর্ম্মবিষয়ক সম্মিলনের জন্য আরামাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক, পরিব্রাজকগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি প্রকৃত ধর্ম্মস্থান—বিহার আরামাদিতে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এমন কোন গ্রন্থাদি নাই, যাহাতে ঐগুলির সম্মিলন ও তাহার উদ্দেশ্যাদি আমরা জানিতে পারি।

উপরে বহুবিধ সমবায়েরই নাম করিয়াছি। এখন উহাদিগকে শ্রেণীভেদে বিভক্ত করিয়া উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি সম্মিলন ছিল স্থায়ী ও ধনিলোকপ্রধান। বাৎস্যায়ন ইহাদিগকে কামী নাগরক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্থায়ী ধনিপ্রধান কামীর আমোদস্থান হিসাবে গোষ্ঠী, সমবায় বা সরস্বতীসমাজ বা সমাপানকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ধনী লোক (সাধারণতঃ) অপরাহ্ণ অতীতে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিলিত হইতেন। সময়ে অহোরাত্রিক উৎসবও চলিত। এখানে বেশ্যা, নটী, নৃত্যগীতকুশলা সুন্দরীরাও উপস্থিত হইত। এখানে কাব্যচর্চ্চা, কলাচর্চ্চা, নৃত্যগীতাদি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। কাব্যসমস্যাপূরণ, কলাসমস্যাপূরণও চলিত।

সমাপানক এক স্থানে বা একের বাটীতে বা ক্রমে এক এক জনের বাটীতে হইত। উহাতে কাব্যকলাদি চর্চ্চার সঙ্গে মদ্য পানাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমাপানক শব্দ যত দূর জানি, অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে বাৎস্যায়নে উহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সেখানে নানাপ্রকার মধু, মৈরেয়, আসব, সুরার ব্যবহার হইত। সঙ্গে বোধ হয়, খাদ্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের ন্যায় বাৎস্যায়নও মধু, সুরা, আসব, মৈরেয় প্রস্তুতের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। বাৎস্যায়ন-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তন্মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, কুক্কুট-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, দোলায় দোলন, সহকারভঞ্জিকাদি নানা প্রকার ক্রীড়ায় কালাতিপাত করার ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ব্বোক্তগুলিকে একরূপ club বা association বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এগুলি ভিন্ন আবার সাময়িক উৎসব বা সমাজের অধিবেশন হইত। উৎসব শব্দের সাধারণ অর্থই আমরা জানি। তবে সমাজ বলিতে বহুপ্রকারে মিলন বুঝায়। সমাজগুলি মাসান্তে বা পক্ষান্তে বা শুভ দিনে সম্মিলিত হইত। অতিপ্রাচীন যুগে বোধ হয়, সমাজের সহিত দেবদেবীবিশেষের পূজার নিকট সম্বন্ধ ছিল। সরস্বতীগৃহে সমাজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার মহাভারতে বারণাবতে পশুপতির সমাজের কথা উল্লিখিত আছে—(পশুপতেঃ সমাজঃ পূজার্থং—মেলকঃ)। সাধারণতঃ সমাজগুলি পূজাকল্পেই অনুষ্ঠিত হইত। এখনও ভজনার্থ মিলন, এই অর্থে সমাজ শব্দ বঙ্গদেশের প্রদেশবিশেষে চলিত আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবিশেষের মুখে শুনিয়াছি যে, আজিও কাটোয়া অঞ্চলে বৈষ্ণবদিগের "সমাজ" হইয়া থাকে। প্রাথমিক পূজা উদ্দেশ্য হইলেও, সমাজগুলি আমোদের স্থানই হইয়া উঠে। জৈন বৌদ্ধ সাহিত্যে সমাজ, সমজ্যা প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতের বহু স্থানে ও হরিবংশে সমাজের

উল্লেখ আছে। সমাজগুলিতে যে মদ্যপান, নৃত্যগীতাদি, ইন্দ্রজাল বা দৈহিক শক্তির প্রদর্শন হইত, তাহা শিগালোবাদসূত্তান্ত হইতে দেখা যায়। আবার অশোকের একটি অনুশাসন হইতে বুঝা যায় যে, সমাজগুলিতে পশুবধ, মদ্যপানাদি ও পান ভোজন চলিত। তজ্জন্যই তিনি এগুলিকে রদ করিবার চেষ্টা করেন। উৎসবগুলিও প্রজ্ঞাত দিবসে হইত। সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এক এক তিথিতে উৎসবাদি হইত। ঘটা (নিবন্ধন) উপলক্ষ্যে বাৎস্যায়ন ও তৎটীকাকার এ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে ঐ সকল দ্রষ্টব্য।

এ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক উৎসবও ছিল। প্রতি মাসেই পর্ব্ব ও সন্ধিদিবসে দেবপূজা, ভূতপূজার ব্যবস্থা ছিল। আর কার্ত্তিকী ও আশ্বিনী পূর্ণিমা ও বসন্তে কোজাগর ও সুবসন্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালে উক্ত সময়গুলিতে বর্ত্তমানের পূজাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সে কথা অন্য স্থানে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমানে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ও দোলযাত্রাদি উহার স্থান লইয়াছে।

এগুলি ভিন্ন দেবরাত্রি, পুণ্যরাত্রি, পঞ্চরাত্রি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। শুভ তিথিতে দেববিশেষের উদ্দেশ্যে আমোদ প্রমোদ চলিত। আবার মড়কাদি হইলে সংকীর্ত্তনাদি, কবন্ধ দহনাদি নানা প্রকারের ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল পূজা, পাঠ, উৎসবাদির সম্পর্কে আখ্যান, প্রেক্ষা, যাত্রা, প্রবহণাদির অনুষ্ঠান হইত। আখ্যানে বোধ হয়, কোন অতীত ঘটনার কথা ব্যাখ্যাত হইত বা কোন দেবতা বা মহাপুরুষের কার্য্যাবলী বিবৃত হইত। প্রেক্ষা—যাহা হইতে আমাদের বর্ত্তমান থিয়েটার প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও অনুষ্ঠান এই সম্পর্কে। এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান ভারতে অতি প্রাচীন। শৈলূষ শব্দ বৈদিক সাহিত্যে (শুক্ল যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায়) ও নট শব্দ পাণিনিতে পাওয়া যায়। আর ভরতনাট্যসূত্রে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন ও তৎসঙ্গে অভিনয়ের কথা লিখিত আছে। ভারতীয় থিয়েটারের উৎপত্তি লইয়া বহু পণ্ডিতই এখন গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এ সম্বন্ধে এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এ কথা বলা যায় যে, প্রেক্ষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে (ব্রহ্মজালসূত্রে ও অন্যান্য স্থানে) প্রেক্ষার কথা বিশদ ভাবেই আছে। অর্থশাস্ত্র পড়িলে মনে হয় যে, প্রেক্ষা অতি সাধারণ জিনিসই ছিল। গ্রামের লোকে প্রেক্ষার অনুষ্ঠান করিত। আর ইহাতে সকলকেই চাঁদা দিতে হইত। কেহ না দিলে দণ্ডিত হইত এবং উহাকে উহা দেখিতে দেওয়া হইত না। এ কথা গ্রাম্যজীবনের বর্ণনায় বলিয়াছি।

যাত্রা ও প্রবহণের কথা অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানেই আছে। তবে উহার বর্ণনা কিছু নাই। মনে হয় যে, উহারা প্রাচীন যুগে চলনশীল অভিনয় বা Pageantএর মত ছিল। এবং বর্ত্তমানের রামলীলা বা সঙের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে।

অন্য প্রকার ক্রীড়া আমোদাদি

এগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। কুহকাদি ও নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বা বাজি দেখান হইত। বংশনর্ত্তকাদি বাঁশের খেলা দেখাইত। চারণাদি গান করিয়া বেড়াইত। কুশীলবাদি স্থলে স্থলে অভিনয় করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিত। সময়ে সময়ে বা স্থানে স্থানে অশ্বাদি পশু দৌড়াইয়া লোকে আনন্দ করিত। Race খেলা ভারতে অতি প্রাচীন। বৈদিক-সাহিত্যে অশ্বের race এর বহু উল্লেখ আছে। তবে কৌটিল্যে উহার বিশেষ উল্লেখ নাই। পশুযুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। পশুযুদ্ধের মধ্যে ষণ্ড বা মেষের লড়াই ও কুক্কুটের লড়াই বিশেষ প্রচলিত ছিল। ষণ্ডের যুদ্ধ এত প্রচলিত ছিল যে, উহা নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে আইন করিয়া, দণ্ড দিয়া উহার প্রচলন কমাইবার চেষ্টা করিতে হইত। ঐরূপ শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী পশুদের যুদ্ধে ব্যাপৃত করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইতে হইত। (২৩৩ পৃষ্ঠা, শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণামন্যোন্যং ঘাতয়তঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ)।

দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে অক্ষশালা স্থাপিত ছিল। কৌটিল্যের সময় দ্যূতাধ্যক্ষ নামে একজন রাজকর্ম্মচারী অক্ষশালায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যেখানে সেখানে উহার আড্ডা থাকিত না। কেহ লুকাইয়া খেলিলে দণ্ডিত হইত। উক্ত ক্রীড়াগারে প্রবেশকালে কিছু প্রবেশ-মূল্য দিতে হইত। আর কেহ বাজী রাখিয়া জিতিলে উহার শতকরা ৫৲ টাকা রাজসরকারে যাইত। খেলায় জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দ্যূতের বিষময় ফল সকলেরই জ্ঞাত ছিল। ঋগ্‌বেদেও যেমন দ্যূতের কুফলের কথা আছে (ঋগ্‌বেদ ১০।৩৪।), অর্থশাস্ত্রেও সেইরূপ দ্যূত একটি প্রধান ব্যসন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কৌটিল্যে উদাহরণস্বরূপ নল ও যুধিষ্ঠিরের উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন যে, দ্যূত হইতেই সংঘে বা রাজকুলে ভেদ উপস্থিত হয় (বিশেষতশ্চ সংঘানাং সংঘধর্ম্মিনাং রাজকুলানাং দ্যূতনিমিত্তো ভেদঃ)।

পরিচ্ছদ

আমোদ প্রমোদের পর পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিব। কারণ, বিশেষ কিছু বলিবার নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতেই আমরা যৎসামান্য কিছু জানি। আর অর্থশাস্ত্রেও সামান্য কিছু আছে। গ্রীকদিগের মতে লোকে (প্রাচ্য মগধের) ধুতি-চাদরই ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিত। ধনীরা অবশ্য রেসমের, ক্ষৌমের বা জরির কাজ-করা বস্ত্র ব্যবহার করিত। বঙ্গদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাশীতে উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। অপরান্ত প্রভৃতি নানা স্থানেও কার্পাস-বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত।

যোদ্ধৃপুরুষেরা কবচ, লৌহ-বর্ম্মাদি ব্যবহার করিতেন, আয়ুধাগার বর্ণনায় উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর শীতবস্ত্রের জন্য ঊর্ণানির্ম্মিত কম্বলাদি হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে নির্ম্মিত হইত। স্ত্রীলোকের বেশভূষার পারিপাট্য ছিল। বহু বর্ণের নানা চিত্রিত বস্ত্র, নানা প্রকার আচ্ছাদন-বস্ত্র ও জামার বহু প্রচার ছিল। স্ত্রীপুরুষের পাদুকা ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল, গ্রন্থান্তরে উহা দেখা যায়। স্মৃতিতে উহার উল্লেখ আছে। তবে অর্থশাস্ত্রে উহার বিশেষ বিবরণ নাই।

গণিকা, বেশ্যা

আমোদ প্রমোদাদির প্রধান অঙ্গস্বরূপ সেই যুগে সমাজে বেশ্যার প্রশস্ত স্থান ছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য উহার নাম হইলে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নাসা কুঞ্চন করিবেন। তবে সে যুগের লোকের মনোবৃত্তি বিপরীতই ছিল। বেশ্যা, বিশেষতঃ গণিকারা সমাজে উচ্চ স্থান পাইত। প্রত্যেক নগরেই গণিকা রাজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমাদৃত হইত। বৌদ্ধ-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই কোশল, বৈশালী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরের প্রধানা বেশ্যার নাম অবগত আছেন। তাহার স্থান এত উচ্চে ছিল যে, ভগবান্ বুদ্ধ অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনেক গণিকা ও বেশ্যা তাঁহার সংঘে স্থান পাইয়াছিল। অভয়মাতা, অর্দ্ধ-কাশী প্রভৃতি গণিকার নাম থেরীগাথায় উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন সভ্যতায়ই গণিকার এইরূপ উচ্চ স্থান দেখা যায়। ব্যাবিলোনিয়ায় গণিকার উচ্চ স্থান ছিল। সীরিয়ায় অনেক স্থানেই স্ত্রীলোকদিগকে জীবনে একবার ধর্ম্মের নামে সাধারণে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইত। সুসভ্য গ্রীসদেশে অ্যাসপেসিয়ার সঙ্গ করিতে সক্রেটিশ ও পেরিক্লিসের ন্যায় লোকে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। উহার গৃহে রাজনীতি, দর্শন ও সমাজনীতির চর্চ্চাও হইত। অ্যাস্পেসিয়া ও সমসাময়িক অনেক গণিকাই সুপণ্ডিত ও সদালাপী ছিল।

বাৎস্যায়নের গণিকাধ্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি স্বৈরিণীদিগকে গণিকা, গর্ভদাসী, বেশ্যা প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া গণিকাদিগকে উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। গণিকারা শিক্ষিতা, কবিত্ব-কুশলা ও কলাভিজ্ঞা হইত বলিয়া বুঝা যায়। সে যুগে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, কবিবর শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিকনাটকে গণিকাদারিকা বসন্তসেনাকে নায়িকা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই বসন্তসেনার রূপ, গুণ, ধন, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অবগত আছেন। চারুদত্তের বিপদবসানে অবন্তীরাজ বসন্তসেনাকে বধূশব্দে আহ্বান করেন।

অর্থশাস্ত্রে গর্ভদাসী, রূপাজীবা ও গণিকার উল্লেখ আছে। গণিকাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য গণিকাধ্যক্ষ নামে একজন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত থাকিতেন। প্রতিনগরেই একজনকে গণিকানামে অভিহিত করিতেন এবং প্রতিগণিকাও একজন থাকিতেন। প্রতিগণিকার উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। গণিকারা রাজতত্ত্বাবধানে থাকিত এবং উহাদের শুল্কাদি রাজা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেহ প্রবঞ্চনা করিলে, উহাদের বিত্তাদি অপহরণ করিলে বা উহাদের

আঘাতাদির দ্বারা রূপ নষ্ট করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইতেন। গণিকাদিগকে সময়ে সময়ে রাজ-সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত এবং রাজাদেশমত শুল্কাদি গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইত। রাজাদেশ লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। বেশ্যা, গণিকাদির রাজসরকারে বিশেষ কর দিতে হইত এবং রূপাজীবারা মাসে দুই দিনের বেতন করস্বরূপ দান করিত। গণিকাদির পুত্রেরাও শিক্ষিত হইয়া কুশীলব বা রঙ্গোপজীবী হইত। আট বৎসর বয়স হইতেই বেশ্যাদিগকে রাজসম্পত্তি বলিয়া রাজার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। ২৪০০০ পণ নিষ্ক্রয় দিলে উহারা স্বাধীন হইতে পারিত। আর যাহারা ঐরূপ নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ হইত, বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা রাজান্তঃপুরে ধাত্রী বা পাচিকা নিযুক্ত হইত।

বেশ্যার সম্পত্তি তাহার মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বেশ্যারা রাজদরবারে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিত, রাজাকে ব্যজন করিত বা সভায় নৃত্যগীতাদি করিত; তজ্জন্য তাহাদের বেতনের ব্যবস্থা ছিল। রাজান্তঃপুরে বা অন্যত্র বেশ্যারা গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইত। বেশ্যাচরের কথা গ্রীক ঐতিহাসিক ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে উল্লিখিত আছে।

বেশ্যাদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের কথা বা সম্পত্তির কথা রাজসরকারে জ্ঞাপন করিতে হইত। উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ্যার সম্পত্তি রাজসরকারে গৃহীত হইত। এ জিনিষ কেবল ভারতেই নহে; মধ্যযুগের অনেক দেশেই ছিল। ফ্রান্স দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে বেশ্যাদিগের আয় হইতে প্রচুর কর লাভ করিতেন।

বাৎস্যায়নে বেশ্যা ও গণিকার অনেক কথাই আছে। উহাদিগের শিক্ষার্থই কাম-সূত্রের গ্রন্থবিশেষ রচিত হয়। দত্তকাচার্য্যের নাম এ হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত। বেশ্যার স্থান ঐ যুগে ও তৎপরবর্ত্তী যুগে উচ্চই ছিল। যাত্রাদির সময় উহাদের দর্শন শুভ বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইত। মিলিন্দ প্রশ্নে কোন এক বেশ্যাকে বহু উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সাধারণের শীল, ব্যভিচার, বিলাসিতা ও সাধারণ লোকবৃত্তাদি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়ার পাখী

(২)

ঘন বৃক্ষলতাগুল্মসমাকীর্ণ যে দ্বীপটি সাহেববাঁধের বুকের উপরে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা বিহঙ্গপ্রেমিক মাত্রেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শিকারীর লোলুপ দৃষ্টিও তাহার উপর প্রথমেই নিপতিত হয়; কিন্তু নগরের সহৃদয় কর্তৃপক্ষীয়গণ বিহঙ্গহননিবারণ কল্পে যে বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই ফলে বক-ষ্টর্ক্-(Stork) পানকৌড়ির দৈনন্দিন জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ তত্রস্থ অধিবাসীর অথবা নবীন আগন্তুকের অবারিতভাবে রহিয়াছে। নৌকা নাই; কাজেই খুব কাছে গিয়া ছবি তুলিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও বাঁধের দক্ষিণ দিকে যে অংশটা কতক দূর পর্য্যন্ত মাটি দিয়া ভরাট করা হইয়াছে, সেখান হইতে ফটো লওয়া যায়। মিউনিসিপ্যালিটি কি উদ্দেশ্যে এই মাটি ভরাট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু ঐ দ্বীপটি অন্তর্হিত হইলে পাখীগুলিকে কি আর ওখানে পাওয়া যাইত? শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই ক্ষোভের সীমা থাকিত না। দূরবীক্ষণের সাহায্য না লইলেও বেশ দেখা যায়, ঐ দ্বীপের ঘন কুঞ্জবনের এক অংশে শুভ্রপত্র বিহঙ্গের সমাবেশ ও অপর অংশে কৃষ্ণকায় পানকৌড়িমুখরিত লতাবিতান; ঊর্দ্ধে হেমন্ত প্রাতের মেঘহীন আকাশ-পথে দীর্ঘকায় ষ্টর্ক্ (Stork)গুলা সুদূর বাঘমুণ্ডি পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে সরল ঋজু গতিতে উড়িয়া আসিয়া চক্রাকারে আবর্ত্তে আবর্ত্তে গতিবেগ মন্দ করিয়া উহাদের মাঝখানে নামিয়া পড়ে; গাই-বকের নীড়গুলির চারিদিকে শাখাপ্রশাখায় উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত অসংখ্য বিহঙ্গ সহসা হয়ত সর্পভীতিবশতঃ অথবা অন্য কোনও আততায়ীর ভয়ে উচ্চ কলরবে প্রান্তর মুখরিত করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে গাছপালা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হয়; একটা পানকৌড়ি কুঞ্জভবন ছাড়িয়া দীঘির উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে চকিতে জলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বাঁধের অপর প্রান্তে দীঘির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীরবেগে অন্তর্হিত হইয়া গেল; আমাদের মাথার উপরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে কোন অলক্ষ্য নীড় হইতে একটি পূর্ণাবয়ব ওয়াক বক-শিশু বাঁধের জলরেখার সীমান্তে সহসা নিপতিত হইয়া, অসহায় ভাবে আমাদের পায়ের কাছে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল;—নিসর্গচিত্রের এমন আয়োজনপ্রাচুর্য্য সাধারণতঃ অন্য কোনও নগরে বা নগরোপান্তে অত্যন্ত বিরল। এখন এই পাখীগুলিকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাক্।

মানভূমের সর্ব্বত্রই বকপরিবারের অন্তর্গত অনেকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে অবস্থায়, যে আবেষ্টনের মধ্যে তাহারা সাধারণতঃ বিচরণ করে, সাহেববাঁধে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। বিভিন্নজাতীয় এতগুলি বকের দলবদ্ধ হইয়া এমনভাবে একত্র অবস্থান অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। গৃহস্থালী আরব্ধ হইয়া গিয়াছে; কোন কোন নীড়স্থ

শাবক আয়তনে ঈষৎ বর্দ্ধিত, কাহারো পতত্র উদ্গত হইয়াছে; কোনও কোনও বকের নীড়রচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই,—স্ত্রীপক্ষী অর্দ্ধরচিত নীড়াভ্যন্তরে উপবিষ্ট, পুংপক্ষী চঞ্চু-পুটে উপকরণসামগ্রী যোগাইয়া দিতেছে; কেহ বা আকস্মিক ভীতিবশতঃ কুঞ্জবন পরিত্যাগ করিতে করিতে ভুক্ত মৎস্যাদি উদ্গার করিয়া ফেলিতেছে। শাবকজনন ঋতুতে একত্র দলবদ্ধ হওয়া ইহাদের রীতি বটে, কিন্তু একই জাতীয় বক প্রায় একই স্থানে একই বৃক্ষে অথবা কাছাকাছি কয়েকটি বৃক্ষশিরে এক প্রকার দল বাঁধিয়া কালযাপন করে। সাহেব-বাঁধে গাইবকের সঙ্গে ওয়াক বক, কাঁক বক একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছে।

গাইবক সংখ্যায় এত অধিক যে, বিনা আয়াসে তাহাকে মাঠে, ঘাটে, জঙ্গলে, পথের ধারে নানা অবস্থায় বিচরণ করিতে অথবা উড়িতে দেখা যায়। বাংলা দেশে এত অধিক সংখ্যায় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। চষা ক্ষেতে অথবা গোচারণের মাঠে রোমন্থনকারী গরুর পশ্চাতে, তাহার অতিসন্নিকটে গাইবক নিঃশঙ্ক বিচরণ করিতে করিতে গোমহিষপদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সঞ্চরমান কীট ভক্ষণ করিতেছে; ধাবমান রেল গাড়ী অথবা মোটর বস্‌এর আকস্মিক আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া এক ঝাঁক গাইবক দোদুল্যমান তোরণস্রকের মত আকাশপথে দীপ্তি পাইতে থাকে; সাহেববাঁধের ঘন কুঞ্জবন তাহাদের শুভ্র পতত্রে খচিত, তাহাদের দাম্পত্য-আনন্দে লীলায়িত। নীড়ের মধ্যে শাবকগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে; নূতন নীড় রচনার চেষ্টা দেখা যাইতেছে না; গার্হস্থ্য জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। কলকূজনমুখরিত গাঢ় সবুজ গাছপালা লতাপাতা দূর হইতে যেন গুচ্ছে গুচ্ছে শুভ্র কুসুমস্তবকনম্র প্রতিভাত হইতে থাকে। ছবি লইবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন; অথচ এত দূর হইতে টেলিফটো লেন্সএর সাহায্যে এই নিসর্গ-চিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করা নিতান্ত সহজ নহে।

গাইবক, Bubulcus cormandus

ওয়াক বক দিবাভাগে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সময় যাপন করে; নিশীথের স্তব্ধতার মধ্যে তাহার "ওয়াক" "ওয়াক" ধ্বনি অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত চকিত করিয়া তোলে। এই নিশাচর বিহঙ্গকে দিনের বেলায় সাহেববাঁধের বৃক্ষশাখায় কিন্তু অন্যান্য বক পরি-জনের মধ্যে বেশ কার্য্যতৎপর দেখা যাইতেছে; মুখে কাঠি কুটা লইয়া স্ত্রী-পক্ষীকে নীড় রচনায় সাহায্য করিতেছে; মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। সাধারণতঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহাদের নীড় রচনা শেষ হইয়া যায় ও ডিম্ব প্রসূত হয়; কার্ত্তিকে নূতন নীড় রচনাচেষ্টা অন্ত কোথাও দেখা গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা জুলাই আগষ্ট মাস ইহাদের গর্ভাধান কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই এখানেও নীড়স্থ ওয়াক বকশিশু দেখিয়া অনুমান হয় যে, ভাদ্র মাসে ওয়াক বকের গৃহস্থালী সুরু হইয়া এখন পর্য্যন্ত তাহার দাম্পত্য-জীবনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ওয়াক বকের যে পূর্ণাবয়ব ছানাটিকে আমরা সাহেববাঁধে পাইলাম, তাহার

ওয়াক বক, Nycticorax griseus

দেহের দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি; পুচ্ছ ১ ইঞ্চি; চঞ্চু ৩·২৫ ইঞ্চি; অঙ্ঘ্রি ৩ ইঞ্চি; পক্ষ ৯ ইঞ্চি। চক্ষু পীতাভ; চঞ্চুর উপরাংশ ঈষৎ লালচে ধূসর, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, নিম্নাংশ হরিতাভ পীত; চোখের পাতা নীল; পদদ্বয়, বক্ষের অনাবৃত নিম্নভাগ ও তলপেট পীতাভ হরিদ্বর্ণ; মাথার উপরে ও কণ্ঠদেশে কয়েকটি সাদা রোম; পুচ্ছ পাংশুল,—অগ্রভাগ সাদা। মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত দেহের সমস্ত উপরিভাগের বর্ণ ধূসর; এই ধূসরতা মস্তকের পুরোভাগে গাঢ়তর হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি তাম্রবর্ণ রেখায় অঙ্কিত। পৃষ্ঠদেশের পতত্রের অগ্রভাগ পীতবর্ণ ত্রিকোণরেখান্বিত। পক্ষ ধূসর কৃষ্ণাভ, লম্বা পালকগুলির অগ্রভাগ সাদা। আমরা তাহাকে একটা পুরাতন চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম; সেই স্থানটি তাহার এমন অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, দিনের বেলায় বাগানের প্রান্তভাগে একটি অনুচ্চ বৃক্ষ-শাখায় তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলেও সে তথা হইতে অবতরণ করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত চেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। সে আহার করিত রাত্রিতে, দিনের বেলা তাহার আহারের কোনও চেষ্টা দেখা যাইত না। সমস্ত দিন সে হয় এ-পা, নয় ও-পার উপর ভর দিয়া নিশ্চল ভাবে হাতলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত এবং চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা পক্ষ কণ্ডূয়ন করিত। এই সমস্ত ব্যাপারে তাহার জাতিগত সংস্কার বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কাঁক বক, সাদা ও লাল, প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে সাহেববাঁধের দ্বীপের পত্রহীন বৃক্ষশাখার উপরে আসিয়া বসিত। সংখ্যায় অধিক নহে; আয়তনে খুব বড়। এ স্থানে ইহার নীড় দেখা গেল না।

কাঁকবক, Ardea cinerea and A. manillensis

কুঁড়োবককে সাহেববাঁধে দেখি নাই, কিন্তু পুরুলিয়ায় অন্যত্র দু একটার দেখা পাওয়া গেল। সে যেন সর্ব্বদাই আত্মগোপনে সচেষ্ট; ঝোপের মধ্যে, বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্তর্হিত হইবার চেষ্টা তাহার প্রবল। নিঃশব্দে উড়িতে উড়িতে সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে না করিতে সে গাছের মধ্যে লুক্কায়িত হয়। দূর হইতে দেখিতে অনেকটা ওয়াক্ বকের মত; মাথার উপরিভাগ ও দুই পাশ কালো; মাথার পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটি সরু কালো ঝুঁটি ঋজুভাবে লম্বমান; কিন্তু ইহার চঞ্চু ওয়াক্ বকের চে'য়ে খুব সরু; ওয়াক্ বকের চেয়ে ইহার গলা লম্বা; বুক ও পেট ভস্মবর্ণ; ওয়াক্ বকের দেহের এই অংশ সাদা। ইহারা সম্পূর্ণ নিশাচর নহে; দিনের বেলায় ইহারা চলাফেরা করিয়া থাকে।

কুঁড়োবক, Butorides Javanica

আমাদের দেশে সব সময়ে সাধারণতঃ জলাশয়ের কাছে, পথে ঘাটে যে বক দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুলিয়ায় তাহারও অভাব নাই। কিন্তু এই অত্যন্ত পরিচিত বকের নীড়ের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। ঝালদের পাহাড়গাত্রে শিলাখণ্ডের উপরে উপবিষ্ট একটা বক ফটো তুলিতে আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল মাত্র।

কোঁচবক, Ardeola grayi

এই সমস্ত বক, গাইবক, ওয়াক বক, কাঁক বক, কুঁড়ো বক ও ইহাদের যে সকল পরিজন-বর্গকে দেখিতে পাওয়া গেল, ইহারা কেহই যাযাবর নহে; ঋতুবিশেষে মানভূম পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের কেহই একেবারে চলিয়া যায় না; ইহারা এখানকার স্থায়ী অধিবাসী; এই-খানেই ইহাদের আহার্য্যসংস্থান, এইখানেই ইহাদের দাম্পত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত। তবে সকলেই যে সাহেববাঁধে বা বুড়িবাঁধে বা অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট জলাশয়সান্নিধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহা নহে। যে গাছ তাহাদের নিবাসবৃক্ষ, তাহার উপরে দলবদ্ধ হইয়া একত্র অনেকগুলি বক থাকে; কিন্তু আহারের অন্বেষণে তাহারা ইতস্ততঃ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া বেড়ায়; ইহা তাহাদের যাযাবরত্বের পরিচায়ক নহে। এমন কি, ইহারা আংশিক ভাবেও যাযাবর নহে।

পানকৌড়িও যাযাবর নহে; এই অল্পপরিসর দ্বীপের উপরে এই সমস্ত গোষ্ঠীবদ্ধ বকের পাশে সে একটি নাতিক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই কুঞ্জবন তাহার আবাসস্থান; এইখানে সে নীড় রচনা করিয়া গৃহস্থালি পাতিয়াছে; শাবকগুলি এখন নিতান্ত শিশু নহে; সুবিস্তীর্ণ সাহেববাঁধে তাহারা যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী পাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা দূরে অন্য জলাশয়ে আহার্য্য অন্বেষণে যায় না, তাহা নহে। খুব ছোট জলাশয়ও তাহারা উপেক্ষা করে না। কিন্তু সংখ্যায় এতগুলি পানকৌড়ির পক্ষে একত্র দলবদ্ধ হইয়া এমন ভাবে কালযাপন করা অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। আলিপুরের চিড়িয়াখানার অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে অবশ্যই পানকৌড়ি ও তাহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় "গয়র" পাখীর (Plotus melano-gaster) যে উপনিবেশ আছে, তাহাও নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু সেখানে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক বিহঙ্গের আনুকূল্যে যে পরিবেষ্টনীর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, পুরুলিয়ার সাহেববাঁধের এই অযত্নসঞ্জাত বন, আর এই বিস্তৃত জলরাশি তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হয়। তীর-ভূমির জলরেখার উপর দিয়া আমাদের এত কাছে ঘেঁসিয়া উড়িতে উড়িতে পানকৌড়ি সহসা জলমধ্যে ডুব দিয়া একেবারে কিছুকালের মত অদৃশ্য হইয়া গেল; তাহাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না; মনে হয়, যেন সে আগন্তুক মানুষের উপস্থিতিতে আদৌ শঙ্কিত নহে; প্রাণভয়ে সে জলমধ্যে নিমজ্জিত হয় নাই; মৎস্যের সন্ধানে সে ডুব দিল মাত্র। পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার সরল দেহযষ্টিটি এমন ভাবে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিল যে, সেখানে কোনও বুদ্‌বুদের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। যদিও তীরের অতি নিকটে নাতিগভীর জলের মধ্যে সে অন্তর্হিত, তবুও আন্দাজে তাহার অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব;—অনেকক্ষণ পরে অনেক দূরে সহসা জলমধ্য হইতে বাহির হইয়া, সে চকিতে আকাশপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণ সে কি করিতেছিল, কত গভীর জলে সাঁতার দিতেছিল, কোন শিকারের অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সফলপ্রযত্ন হইল কি না, এতক্ষণ কি প্রকারে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছিল, একাকী ছিল, না অন্য পানকৌড়ির সহিত জলমধ্যে দল বাঁধিয়া

পানকৌড়ি, Phalacrocorax javanicus

মৎস্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিল; এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত কৌতূহলজনক হইলেও বিপুল রহস্যময়। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতাম মাত্র; সে যখন আমাদের অত্যন্ত কাছে এক হাঁটু জলের মধ্যে অবলীলাক্রমে ডুব দিল, বুদ্‌বুদের চিহ্নমাত্র রাখিয়া গেল না, তখন আর কয়টা পানকৌড়ি জলমধ্যে অন্যত্র নিমজ্জিত হইল, তাহা হিসাব করিয়া দেখিতাম। এতক্ষণ জলমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহারা পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপের কোনও আভাসই পাওয়া গেল না। দলবদ্ধ হইয়া থাকা অথবা কাজ করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কখনও কখনও দেখা যাইত যে, একাধিক পানকৌড়ি ভূমির উপরে নিশ্চলভাবে দাড়াইয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া সিক্ত ডানা শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, তিন রকম পানকৌড়ির মধ্যে পুরুলিয়ায় আমি মাত্র এক রকম দেখিতে পাইলাম; খুব বহুসংখ্যক দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু আয়তনে ইহারা সব চেয়ে ছোট। ইহাদের জাতিবর্গের মধ্যে যেটি আয়তনে সব চেয়ে বড়, সেটি প্রায় তিন ফুট লম্বা; ইহারা কিন্তু পৌনে দু'ফুটের বেশী লম্বা হইবে না। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের যে সকল নীড়, দেখিতে পাওয়া গেল তাহাদের অধিকাংশই তখন পরিত্যক্ত। কার্ত্তিক মাসে ইহাদের গৃহস্থালি একপ্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পানকৌড়ির সঙ্গে "গয়র"কে দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমেও কেহ কেহ উভয় পাখীকেই দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু পুরুলিয়ায় "গয়র" আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

গয়র,
Plotus melanogaster

পুরুলিয়ার সাহেববাঁধে আরও দুইটি জলচর পাখী আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই,— ডুবুরি ও পানপায়রা। পুরুলিয়া হইতে অনেক দূরে যে জলাশয়ে ইহাদিগকে প্রথম দেখিলাম, তাহা অতীব মনোরম। প্রফুল্ল কমলাচ্ছন্ন সরোবরের স্বচ্ছ জলে ইহারা কেলি করিতেছিল। তাহাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর দূর হইতে আমরা শুনিতে পাইলাম। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, কমলদলের মধ্যে পান-পায়রা ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, অলস ভাবে ভাসিতেছে, আবার পদ্মপত্রের উপর দ্রুত পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। মানভূমের লোকেরা ইহাকে "দল-কুঁকড়ি" বলে। যেখানে পদ্মপত্র অপেক্ষাকৃত বিরল, ডুবুরি দম্পতী কয়েকটি শাবক লইয়া ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে; তাহাদের কণ্ঠ হইতে এক প্রকার ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া আবার সহসা থামিয়া যাইতেছে। পান-পায়রাদিগের মধ্যেও ছোট ছোট শাবক জলক্রীড়া করিতেছে। কত নর-নারী এই সরোবরে জল লইতে আসে, স্নান করে, গাত্র মার্জ্জনা করে, ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। ঝালদে বেড়াইতে গিয়া ঠিক এই রকম পদ্মপুকুরে পান-পায়রা ও ডুবুরি দেখিতে পাওয়া গেল। সাহেববাঁধ বা অন্য যে কোনও "বাঁধে" এই প্রকার পদ্মবন নাই, সেখানে ডুবুরি বা পানপায়রা আশ্রয় গ্রহণ করে না।

পান-পায়রা,
Gallinula chloropus

ডুবুরি
Podiceps albipennis

বুড়িবাঁধে পদ্মবন আছে, কিন্তু ডুবুরি পানপায়রা দেখা গেল না; জলপিপির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনেকগুলা জলপিপি সেই প্রকাণ্ডদীঘির উপরে দূরে দূরে ছিল, কিন্তু সবগুলাই একজাতীয়। জলাশয়ের মাঝে মাঝে তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড, তাহার উপরে জলপিপির বাসা; একটা বাসা হইতে তিনটি ডিম্ব সংগ্রহ করা গেল। ডিম্বগুলি অত্যন্ত মসৃণ, বিচিত্র রেখা-সমন্বিত।

জলপিপি, Metopidius indicus

হাড়গিলা এবং তাহার জ্ঞাতিবর্গ Storkজাতীয় যে কয়টা পাখীর দেখা মানভূমে পাওয়া যায়, মাণিকজোড়, মদনটাক, সামকাহাল,—তাহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্তটিকে বিশেষ-ভাবে সাহেববাঁধে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেটি আয়তনে সব চেয়ে ছোট। তাহার চঞ্চুর লক্ষণ দেখিয়া open bill নামকরণ হইয়াছে। চঞ্চু পীতাভ, দেহের উপরিভাগ পাংশুল, ডানা ও পৃষ্ঠের নিম্নাংশ কালো। পাখীটির একটু বিশেষত্ব আছে; প্রত্যহ সকাল বেলায় একই সময়ে কয়েকটি Stork বাঘমণ্ডী পাহাড়ের দিক্ হইতে সোজা উড়িয়া আসিয়া সাহেববাঁধের দ্বীপস্থ বৃক্ষের উপরে নামিয়া বসিত। অপরাহ্নে তাহারা সকলেই প্রায় সে স্থান পরিত্যাগ করিত। প্রথমে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, এখানে ইহারা বাসা করে নাই, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় শাবককে নীড়ের মধ্যে খাওয়াইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ দ্বীপের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি শাবক জন্মিয়াছিল।

হাড়গিলা, Leptoptilus dubius; মানিক জোড় Dissura episcopus; মদনটাক্ Leptoptilus Javaincus সামক-হাল, Anastomus oscitans

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচরণ লাহা

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

—•••—

১০১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর। আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি—

লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন।
সমুখে দাণ্ডাল্য কত পাত্রমিত্রগন ॥
পরাভব পায়্যা রাজা কিছুই না বলে।
অপমানে লঙ্কেশ্বর মাথা নাহি তুলে ॥
বিরভাগ পড়ে রাজা সোকে উত্তরোল।
অন্ত[ঃ]পুরে সুনি ক্রন্দনের গণ্ডগোল ॥
মেঘনাদের সোকে কান্দে তাহার জননি।
ইন্দ্রজিতের সোকে কান্দে দিবস রজনি ॥
কোলাহল সুনিয়া কান্দেন দসানন।
মনে মনে ভাবে রাজা বিসাদিত মন ॥
পতিহত জুবতি মজিয়া সোকানলে।
দিবারাত্রি ভাসে তারা[১] নয়ানের জলে ॥
রন্ধন ভোজন নাঞি কান্দে অবিরত।
বিলাপএ নানাভাতি কহিব সে কত ॥
কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে।
মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে ॥
বিরসুন্য হৈল লঙ্কা তবু নাহি বুঝে।
আমরা ডুবিল মাত্র সোকসিন্ধু মাঝে ॥
সিতারে আনিয়া মজালেক লঙ্কাপুরি।
এত বলি বিলাপএ সকল সুন্দরি ॥
একচিত্তে সুনে তাহা রাজা দসানন।
ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন ॥
পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লঙ্কেশ্বর।
জুবতি ক্রন্দনে রাজা হইল জজ্জর ॥
রাবনে না করে ভয় জত বধুগন।
বিনায়্যা বিনায়্যা সভে করেন ক্রন্দন ॥
কেহ বলে কুথা গেলে রাবনকুমার।
দেবগন নিরানন্দ প্রতাপে তোমার ॥
সচিপতি বান্ধিয়া আনিলে নিকেতনে।
হেন বির ক্ষয় হৈল মানুসের রনে ॥
কেহ বলে হেন সক্তি মানুসের নাঞি।
রামরূপ ধরয়্যা আল্য আপনি গোসাঞি ॥
কেহ বলে সুন্য হৈল এই বাসাঘর।
সব রাছে নাঞি দেখি রাবনকোঙর ॥
কেহ বলে সংসার জিনিল দসানন।
নর বানরের হাথে হইল মরন ॥
কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল।
রাবন জিনিল সভায় বিক্রমে বিসাল ॥

১। পুথিতে 'রাজা' আছে।

ত্রিভুবন বিজয় হৈল রাজা দসানন।
কেহ বলে রাবনে প্রসন্ন ত্রিলোচন॥
ভবানি সঙ্কর কেন এখন না রাখে।
এত বলি জুবতি কান্দএ লাখে লাখে॥

মধ্য,—

সুন সুন মহাশয় আপনার পরিচয়
প্রথমেতে আপনার কথা।
কহি আমি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে
মহাবলি পবন মোর পিতা॥
কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার জিনি রাষ্য অধিকার
সুষাসুত হৈল মহাসুখি॥
পাইয়া বাল্যের ত্রাষ ঋশ্যমুখে কৈলাম বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাইতে নারে।
সাঁপ দিল এক ঋসী অতেব নির্ভয় বাসি
নিবেদিলাম তোমার গোচরে॥
মনেতে জন্মিল বেথা ইবে সুন রাম কথা
জে পাকে পাইলাম দরসন।
জানকি লক্ষ্মন সাথে রাম আইল বনপথে
পঞ্চবটী করিল আশ্রম॥
রামের জন্ম সুর্য্যবংসে দসরথ রাজঅংসে
সুনিলাম লক্ষন বদনে।
রামে রাষ্য দিব রাজা হরসিত জত প্রজা
বনে আইল কৈকৈ বচনে॥
রাজা কৈকৈএর বস না গনিল অপজস
বনে পাঠাইল রঘুমনি।
রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম রূপে উপজিল কাম
সঙ্গে সিতা জনকনন্দিনি॥
পঞ্চবটি বৃক্ষতলে রাম ছিলা কুতুহলে
সুপ্রনখা আইল সেখানে।
দেখিয়া রামের মুর্ত্তি বড় তার হৈল আর্ত্তি
সিতা খাইতে করিলেক মনে॥ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় আরম্ভ হইয়া ২৭ পাতায় শেষ হইয়াছে। উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষ্মণের শক্তি-শেল পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত।

শেষ,—

হনুমান পর্ব্বত রাখিল নিজ স্থানে॥
আকাসে হইল বানি সুন হনুমান।
অবিলম্বে গন্ধর্ব্বের দেহ প্রান দান॥
সুসেন ঔষধ নিতে হনু চিন্যাছিল।
পাতালতা নিঙড়িয়া ছড়াইয়া দিল॥
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব পাইল প্রান দান।
হনুরে মারিতে জায় বলে হান হান॥
পবননন্দন বির উঠিল আকাসে।
পর্ব্বত থুইয়া আল্য শ্রীরামের পাসে॥
পবননন্দন পড়ে শ্রীরামের পায়।
কহেন করুনাবানি কোলে করি তায়।
হনুমান কি দিয়া সুধিব তোমার ধার।
রাম বলেন কি দিয়া করিব উপগার॥
হনু বলে আমি নাই জানি তোমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল সুধ্যা বিভিসনের ধার॥
দেবের দুল্লভ বড় রাম অবতার।
কত জত্নে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥
কিত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
সঙ্কিসেল পুস্তক পুর্ন্ন হৈল এত দুরে।
রাবন বিনে আর বির নাহি লঙ্কাপুরে॥

জে জন গাওায় রাম তোমার মঙ্গল।
আসর সহিত সুখে রাখিবে রাঘব ॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে সর্গ জায় ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে সক্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥

শেষের আট পঙ্‌ক্তি লেখকের যোজনা মনে হয়।

১০২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ। লেখক কনকরাম ধুবী।

শেষ,—

সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল জুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল এক তোলা॥
দেবসক্তি ঔসদি দিলেন নারায়ন।
এই মত্তে লক্ষন বিরের না হইল চেতন॥
সুসেনে বাটিআ ঔসদি করিছিলা ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল আর এক তুলা॥
শ্রীগোরু স্বরিআ অউসদি দিলা নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন॥
শ্রীগুরুর দুহাই জান বের্থ নাই জাএ।
চৈতনা পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাএ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে দিল আর এক তুলা॥
মাতা পিতা স্বরি ঔসদি দিলা নারাঅন।
এই মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন॥
মাতা পীতার দুহাই জান বের্থ নাহি জায়।
ধর্জ্য না হইল লক্ষন গড়াগড়ি বাএ॥
ধর্য্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন।
কুল হনে ভুমে পেলি জুড়িল কান্দন॥
দৈব জুগে ঠেকিল রামের ও রাঙ্গা চরনে।
ব্রত্তিআ উঠিলা তবে সমির্ত্তার নন্দন॥
দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাগিল।
গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল॥
লক্ষন জিলেন রামের পুরিল মনের সাদ।
চৌদিগে বানরগনে করে সিঙ্গনাদ॥
জঅক্কর জঅধনি মঙ্গল আরম্ভন।
সঙ্গে থাকি পুস্ফ বৃষ্টী করে দেবগন॥
কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন।
লক্ষনের সক্তিছেল হইল সমাপ্ত॥

১০৩। রামায়ণ—লঙ্কাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মির্ত্তু হইয়া গেল জমঘর।
দুতে বার্ত্তা কহিতে জায় রাবন গোচর॥
হরিসে বসিছে রাজা সিঙ্গাসন উপরে।
পাত্রমিত্র স্থানে রাজা লাগে কহিবারে॥
জোহ বার জায় পুত্র সেহি বার জিনে।
না জানি বা পুত্র আজি জিনে কতক্ষনে॥
ভয় দুতে বার্ত্তা কয় যুরি দুই কর।
তোমার পুত্র ইন্দ্রজিত গেল জমঘর॥

জে কালে সুনিল রাজা পুত্রে মরন্ন কথা।
সিঙ্গাসনে রৈল পদ্দ ভুমে পরে মাথা॥
অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লঙ্কেস্বর।
পাত্রমিত্র বলে রাজা গেল জমঘর॥
কেহ বলে জমঘরে গেল দসানন।
কেহ বোলে পুত্রসুখে হৈয়াছে বিমন॥
সিতল চন্দন য়ানি কেহ মাথে গায়।
চামরে বাতাস কেহ করে সর্ব্বদায়॥
খেনেকে চৈতন্ন পাইয়া রাজা দসগিরি।
কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পুত্র করি॥

মধ্য,—

লাচারি করুণা রাগ॥

ব্যাকুল ভাইএর পাষে ধনু ফালাইআ বৈষে
সুকে রাম ছারএ নিশ্বাস।
অহে ভাই প্রাণেশ্বর সুকে প্রাণ পোরে মর
তোমার তনু দেখীআ বিনাষ॥
বনে আইলাম তিন জন তাথে এত বিরম্বণ
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথা।
কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ণ
ওট ভাই সুণ মর কথা॥
তর মর এক প্রাণ তনুমাত্র দুইখাণ
বিদাতা শ্রীজিল ভাগে ভাগে।
হেণ ভাই মৈল রণে ধিক মর জিবণে
কি বলীব ভরথের আগে॥ (পৃ০ ৯।১)

১০৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

হনুমানের ঔষধ আনয়ন।

রচয়িত'—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২৳ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

১০৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
ইত্যাদি শ্লোক।

কটক হইলা পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইলা সুগ্রিব প্রজাসনে॥
সিন্ধু বান্ধি পার হৈলা কমললচন।
অবস্য পাইবো বার্ত্তা রাজা দসানন॥
একত্রে হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক॥
জার্ম্বুমান য়াদি বির আনিলা রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত॥
রামে বোলে শুন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি॥
কটক রাখিতে ভার করে জেই জন।
সে বিরে করৌক আজি রাত্রি জাগরন॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥

ভরথে কান্দন করে বিনাইআ নানা স্বরে
কেনে রাম হইলে নিদারুন।
তুমারে দেখিবার কাজে আইলু মুই বনমাঝে
তুমা সনে না হইল দরসন॥১॥
আমার হইল কুদিন না পাইলু তার চির্ন্ন
বনে য়াসি না পাইলু লাগ।
জত দুক্ষ পাইলু বনে কহিমু কাহার সনে
চারিভিথে য়াছে বিরভাগ॥২॥

কি বুদ্ধি করিমু মনে   না চিনে হনুমানে
কি বলিমু হনুমান গোচর।
তুমার সহদর জানি   কৃপা কর জদি খানি
তবে পাই তুমা দরশন ॥৩॥
জদি দ্বার না দেয় ছাড়ি   প্রান দিমু অগ্নি পড়ি
বদ হইমু হনুমান উপর।
কিত্তিবাসে বলে বানি   মায়া বির ছাড় তুমি
তুমি নহে রামের সহদর ॥৪॥ (পৃ০৮।১)

লাচাড়ি ॥

কান্দে কান্দে বিভিসনা রে
কান্দে বির মাথে দিয়া হাত।
সর্ব্ব সুর্ছ ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ ॥১॥
স্বরন লইলু তুমার বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈরি ॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস য়ধিপতি।
মুই পাবিস্ট কথা করিমু বসতি ॥৩॥
তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর।
কি দুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থার ॥৪॥
দুস্ট সহদর মর রাজা লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ মুই হইলুঁ দেসান্তর ॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ কাগুতি।
সত্রু মারি য়াইস রাম জানকির পতি ॥৬॥
কিত্তিবাসে বলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি ॥৭॥
(পৃ০ ১০।১)

শেষ,—

অঙ্গদে বোলে রাবনের বুঝিয়ে চরিত্র।
মন্ত্রনা সোনীতে জুমার হইয়া একত্তিত ॥
এতেক ভাবিয়া তবে বালির নন্দন[১]।
গোপ্ত ভেস রহে গীয়া প্রাচির উপর॥
এইরূপে রহিল গীআ বালির নন্দন।
রন করিবারে য়াজ্ঞা করিল রাবন ॥
হস্থির কান্ধেতে বান্ধে সোবর্নের ধ্যজ।
সুর্য সামস্ত জুঝিতে পড়ে সাজ ॥
পাত্র [মিত্র] য়াসিয়া রাবন রাজা বন্দে।
লাম্পে লাম্পে উঠে সয় হস্থির কান্দে ॥
চতরঙ্গলে য়ারোহিল য়ারসি কুদাড়ি।
রাজার ভাই তাতে আনীলেক চড়ি ॥
সোবর্ণের জাটিথান রাজা পাটে [র] তুলি।
[কু]মার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোলি ॥
পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র য়াপনার।
চারিভেতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥
সুবর্নের নির্ম্মিত রাজসিঙ্গাসন।
তার উপর বসিয়াছে রাজা দশানন ॥
হাথে রাখায়াছে   *   *   *
সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥
ডাইনে তাম্বুল সনে দিয়াছে এক ঝারি।
হেন কালে কুমারভাগ ডাগুাইলা সারি সারি ॥
কুমারভাগে মাথা নয়ায় মাথার [পাগ] খসে।
দুই বিরের পাগে খসি পড়ে দুই পাসে ॥
খঞ্জন জিনিয়া দুইর মকরকুণ্ডল।
মানীক্য জিনিয়া দুইর কর্নের সুভন ॥
কালা চামর জীনী খেশের পরিপাটি।
পৃস্টেতে লাগিয়া য়াছে দিব্য জোতি ॥
এ তিন ভুবনে যাহার ডরে পাত্র ভিত।
য়াগোবড়ি মাথা নয়ায় কুমার ইন্দ্রজিত ॥
শয়াবতি মায় জার রাবন রাজা বাপ।
বিরবাহু মাথা নয়ায় দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিশিরায় মাথা নয়ায় কারিদণ্ডবত।
প্র[হ]স্থ য়াদি রার্জ্জখণ্ডে করে দণ্ডবত ॥
ইতি শ্রীপাতালখণ্ড সমাপ্ত ॥

———

১। 'কুমার' হইবে।

১০৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মৈল বার্ত্তা সোনী মন্দাধরি।
অমনি কান্দিআ উটে পুত্র পুত্র করি॥
পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন।
কান্দীআ চলিছে রাণী জথাতে রাবন॥
কান্দিআ বসীছে রাজা রত্নসীঙ্গাসনে।
হেন কালে রাণী গেল রাবন বির্দ্দমানে॥
রাণী বলে কি কার্য্য করিলে দসগীরি।
সীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কাপুরী॥
অজ৽ীসম্ভবা সীতা জনকদুইতা।
তান সাপে মজিল লঙ্কা আছ দসমাথা॥
জেহি দীন সীতা দেবি আনিলা লঙ্কাতে।
সেহি দিন মজিল লঙ্কা কহিছে তাহাতে॥
তখনে বলীল রাজা দেহ তার কন্যা।
তবে কেনে হইব তোমার অেতেক জন্ত্রনা॥
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল পর্ব্বতের চোড়া।
ডাল বাঙ্গি বিক্ষ জেন হইল লাড়ামোড়া॥
মন্দাধরি বোলে রাজা সোন দিআ মন।
সিতা দীআ ঃাথ তোমার আপনার জিবন॥
এাহ হতে খেমা দেহ লঙ্কার বসত বাস।
দিনে দিনে হইব তোমার কুল জাতি নাস॥
জানীআ না জান রাম সোন মতিহিন।
সবান্দবে সোক ভুক কর কিছো দিন॥

মধ্য,—

এহি মতে উর্দ্ধ্ব পথে করিল গমন।
প্রভু রাম হারাইয়া এত বিড়ম্বন॥
রাম নাম লইয়া বির ছাড়এ নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে গেল উর্দ্ধ্ব কৈলাস॥
উর্দ্ধ্ব দুয়ারে দেখে জত জত ধর্ম্ম।
সাধুজন দেখে তাথে না দেখে রামচন্দ্র॥
গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভুজন।
মাত্রি পিত্রি চরনে শেবা করিছে জেহি জন॥
দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জাঙ্গাল।
উর্দ্ধ্ব দুয়ারে তার ভাল ঠাকুরাল॥
আপনে আশীআ জমে তাহারে শম্ভাশে।
এহি মতে উর্দ্ধ্ব দ্বারে শাদুজন বৈশে॥
তাহাতে না দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
আর কত দুরে বির করিল গমন॥
হরগৌরি দুই জন আছয়ে বশিয়া।
পার্ব্বতি শিবেকে পুছে হনুমান দেখিয়া॥
দুর্গা বোলে শোন শিব আমার বচন।
কি কারনে আইশে এথা পবননন্দন॥
শবে বোলে শোন দুর্গা না জান কারন।
মহিরাবনে হরি নিছে শ্রীরাম লক্ষন॥
হনুমান শমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন।
রাম লক্ষন হারাইয়া করয়ে ভ্রমন॥
পার্ব্বতি বোলেন তার লক্ষন বুজি বাম
আমি হই শিতামুর্ত্তি তোমি হও রাম॥
হেন কালে তথা আইল পবননন্দন।
এহি মতে শন্দান করিলা দুই জন॥
রাম সিতা মুর্ত্তি বির দেখিয়া তথায়।
বোলে রাম সিতা পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়॥
এহি বোলি হনুমান করিল গমন।
হরি হর ভেদ নাই অভেদ শিবরাম॥

হনুমানে বোলে রাম এমত কেনে কৈলা।
সিতাকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িলা॥
আইশ আইশ কান্দে করি তোমরা দুই জন।
তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লক্ষন॥
ইহা বোলি হনুমান লাগিল কান্দিতে।
সিংহাশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে॥
হনুমানে বোলে রাম বড়ই পামর।
আমারে এত দুক্ষ দিয়া হাশ নিরান্তর॥
ইহা বোলি হনুমান পবন কুঞর।
হরগৌরি তোলি লইল মাথার উপর॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
ধাইয়া আশিল তবে শিবের গোচর॥
দ্বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথায়।
আমার ঠাকুর কেনে লইলে মাথায়॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
কুপ করি আশিলেক হনুমান গোচর॥
হনুমানে বোলে আমি হারাইল রাম।
আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিবা কাম॥
এত শোনি নন্দিবির কুপ করি বোলে।
হনুমানকে ধরে বির দুই হাতে গলে॥
হনুমানকে ধরি নন্দি হাশে মনে মন।
রাখিতে না পারে নন্দি চমকিত মন॥
বাহু লাড়া দিআ ধরে পবননন্দন।
হুরাহুরি গরাগরি করে দুই জন॥ (৯১ পত্র)

শেষ,—

রাম লক্ষন লইআ বির করিছে গমন।
জেহিখানে বসী আছে জত বানরগন॥
শ্রীরাম দেখাআ তারা বন্দিল চরন।
আসীর্ব্বাদ করিলেন কমললোচন॥
জয় জয় দিআ নাছে জত বানরগন।
হেনকালে দেখে রামে বান্ধা বিভিসন॥
বন্ধন মোচন করি কমললুচন।
আনন্দ হইআ নাছে রাজা বিভিসন॥
পুথিখানি তিন হাতের লেখা বেশ বুঝা যায়।

১০৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{২}$×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে।
তরুনি পরিল রনে সুন লঙ্কেশ্বরে॥
সুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন।
ভুমে লোটাইয়া কান্দে রাজা দসানন।
অজ্ঞান হইল রাজা পরিল তখন।
পুত্র পৌত্র ভাতি নাহিক দিতে তর্পন॥
মহাসোকে কান্দিতেছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোথা গেলি তরনি প্রানের দোসড়॥
সকল বির পরিলো মোর বির নাহি আর।
দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার॥
কান্দিতে কান্দিতে মনে হইল স্বরন॥
পাতালে আছে পুত্র মহি ত রাবন॥
মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চস্বরে।
কোথা গেলি মহি পুত্র দেখা দেহ মোরে॥
কহিলে আমারে তুমি পূর্ব্বে জে কারন।
বিপত্তে পরিলে আমাএ করিহ স্বরন॥
এত জদি কাতরে বলেন লঙ্কেশ্বর।
টনক পরিল মহির মস্তক উপর॥

শেষ,—

হেন কালে দেবি বলেন সুন প্রভু রাম।
আমি রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান॥
রাম বলেন সুন দেবি আমার বচন।
মহির সোমান পুজা করিবে জগজন॥
যুনিয়া সন্তুষ্ট মাতা হাঁসিতে লাগিলা।
হনুমানে ডেকে রাম তখন বলিলা॥
ক্ষিরগ্রামে লইয়ে দেবির করহ স্থাপন।
তুমি আইলা আমি তবে বধিব রাবন॥
[এ] কথা যুনিয়া হনু করিলো পয়ান।
দেবি লয়ে গেল হনু জথা খিরগ্রাম॥
[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন।
সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন॥
বিস্বকর্ম্মায় হনুমান করিলা স্বরন।
সত্যরে আইলা বিশ্বকর্ম্মা হনুর বিগুমানে॥
হনু বলে দেবিরে হেথা করিব স্থাপন।
দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন।
পাথোর আনিয়া হনু দিল বিগুমান।
[ম]সানে অপুর্ব্ব পুরি করিল নির্ম্মান॥
রাত্রের ভিতরে পুরি ক[রি]লা নির্ম্মান।
বিস্বকর্ম্মা পয়ান করিলা নিজ স্থান॥
দেবি বলেন যুন হনু আমার বচন।
মহিরাবন ··· ··· পুজিবে কোন জন॥
আমার সেবক আমার কাছে দিলে বলিদান।
নরবলি দিয়া করো পুজার বিধান॥
হনুমান বলে মাতা কহিলাম আমি।
বৎষর অন্তর নরবলি পাবে তুমি॥
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই জনে।
মুক্তিপদ পাবে সে তোমা দরসনে॥
জোগাগ্যা বলিয়া মাতা হলো তোমার নাম।
জে তোমায় দেখিবে তার অবস্ত পরিত্রান॥
দেবি বলেন লোকের চাক্ষসে না থাকিবো।
লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবো॥
হনু বলে মাতা তুমি ব্রহ্মা অগোচর।
চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥ * *
দেবিরে রাখিয়া হনু মন্দির ভিতর।
বাহিরে আসিয়া করে তিন স্বরবর॥
হনুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ।
তিন স্থানে মৃত্তিকা তুলিল তিন চাপ॥
তাহারে করিলা বির তিন স্বরবর।
তিন নাম থুইল তার পবনকুমার॥
ধামাতের পুষ্কর্নি বলে থুইল এক নাম।
সর্ব্বেসা বলিয়া নাম রাখিলা এখন॥
ক্ষিরদিঘি বলে থুইলা এক নাম।
জোরহাতে করে হনু দেবির বিগুমান॥
তিন স্বরবর কৈলাম করি নিবেদন।
জাহা ইচ্ছা তাহাই কর জেবা লয় মোন।
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার।
আপনার গুনে পুজা করিহ প্রচার॥
এতো বলি প্রনাম করিলা দেবির পায়।
হাঁসিয়া হনুরে মাতা দিলেন বিদায়॥
জোগাদ্যা বলিয়া বির করিলা স্থাপন।
কতো পাপে মুক্তি হইলা দেবির স্বরন॥
বিদায় হইলা হনুমান দেবির চরনে।
এক লম্ফে আইলা হনু রাম বিগুমানে॥
জোর করে বন্দে বির রামের চরনে।
যুগ্রিব আদি বানর দিলা আলিঙ্গন॥
আপদ এরায় বানর ছারে সিংহনাদ।
যুনিয়া রাবন রাজা গনিল প্রমাদ॥
মহি পুত্র পরিল ধ্যানে জানে দসানন।
তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন॥
হাহাকার করে রাবন ছারিয়া নিস্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তিবাস॥

১০৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামরাবণের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১, ২, ৪, ৫,। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯।১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সভা করি বৈসে রাম কোমললোচন।
বিরভাগ বৈসে জত সুগ্রীব বিভিসন॥
শ্রীরাম বলেন সুন জত রায্যখণ্ড।
রাবন বধিএ বিভিসনে দিব ছত্র দণ্ড॥
হেন কালে হনুমান ছাড়ে সিংহনাদ।
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাদ॥
রাবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে।
পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইলা রাম দরসনে॥
হরগৌরি পুজিতে বসিল লঙ্কেশ্বর।
রাবনের পুজা লইতে আইল সত্তর॥
রাবনের তরে দয়া করিলা ভবানি।
আইল রাবন কাছে জগতজননি॥
পুজা করি প্রনাম করএ দসানন।
এইবার মোরে রক্ষা কর পঞ্চানন॥
শ্রীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে।
সিব বলে হেন বর আমি নারি দিতে॥
রাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি।
এত বলি অন্তর্ধ্যান হন পসুপতি॥
রাবন বলে জানি[লা]ম ইহার কারন।
কাল হয়্যা আইল মোরে নর বানরগন॥
রাবন বলে সুন মাতা করি নিবেদন।
আমা লাগি জাও তুমি সিবের সদন॥
দেবি বলে আমি পুর্ব্বে কহিলাম বিস্তর।
তাহে মোরে ক্রোধ কৈল দেব মহেস্বর॥
রাবন বলে সুন মাতা জগতজননি।
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি॥
রাবনের এত বাক্য সুনিঞা সঙ্করি।
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর জুড়ি॥
ভবানি বলেন সুন দেব পসুপতি।
কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি॥
ধনে প্রানে মজে রাবন শ্রীরামের বানে।
এবার রাবনে রক্ষা কর ত্রিলোচনে॥
দস মুণ্ড কাটী রাবন দিল তোমার পায়।
ছাড়িতে রাবনে নাথ তোমা না জুয়ায়॥
সিব বলে পার্ব্বতি সুনহ বচন।
পাপিষ্ট দুর্ম্মতি বেটা লঙ্কার রাবন॥
নন্দি সাপিল জখন রাবনের তরে।
নর বানরের হাতে রাবন জাব জমঘরে॥

১০৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পার।
পিতিজ্ঞা করেছি রামি রাছে তব ধার॥
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম রাশ্বাস।
সিতাকে রানিতে রামার সির্দ্ধ রভিলাস॥

রাজা হয়া এতেক বলিল বিভিসন।
সিতা বলে শ্রীরামের পড়ে গেল মন ॥
জার নাগি জুদ্ধ করি পাড়িয়া ধনুক।
দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ ॥
সুগ্রিব বিভিসনের সঙ্গে করি রনুমান।
সিতার বাত্রা দিতে রাম পাঠান হনুমান ॥
রাম বলেন সুন বাছা পবননন্দন।
সিতার তত্ত দিতে জাহ রসকের বন ॥
সিতা রাগে কহিবে রামার সমাচার।
সবংসে রাবন রাজা হইল সংহার ॥
রাক্ষস বানর সুখি হইল তৃভুবন।
কালি তুমা নিতে রাসিব ধাম্মিক বিভিসন ॥
রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম।
সিতার নিকটে জাত্রা কৈল হনুমান ॥
ধনুক টানিলে জেন সিগ্র বান ছুটে।
লাফে লাফে গেল রসকবনের নিকটে ॥
সনা রূপায় বান্দিয়াছে রসক গাছের শুড়ি।
তার তলায় বসিয়াছেন জনকঝিয়ারি ॥
অসকের তলে সিতা রতি অনুপাম।
দুটী হাত তুলিয়া সিতা বলে কবে রাসিবে রাম ॥
হনুমান ডাণ্ডাইল সিতার গোচর।
চেড়িগুলা বলে রাইল ঘরপড়া বানর ॥
থরহরি কাপে সভে পাইয়া তরাস।
ভএতে রাক্কুসিগুলা হইল একপাস ॥
গাছের রাড়ে ডাণ্ডাইল হয়া রদরসন।
হেন কালে বানর করে সিতা সম্বাসন ॥
সিতার আগে হনুমান নুয়াইল মাথা।
রবধানে সুন রামের কুসলবারতা ॥
সুগ্রিবের প্রতাপে রার বানরের হানাহানি।
বিভিসনার মন্তনাতে লঙ্কাপুরি জিনি ॥
সবংসে পড়িয়া গেছে রাবনে রাপার।
বংসনাস হইল জখন তোমাকে দিল তাপ ॥

প্রভাতে দেখিবে গিয়া শ্রীরাম লক্ষন।
কালি তুমায় নিতে রাসিব ধার্ম্মিক বিভিসন ॥
দুই ভেএর জয়জুক্ত সুনিয়া কাহিনি।
হরসিতে রাপনা পাসুরে ঠাকুরানি ॥
হনুমানের মুখে সুনি কুসলবারতা।
রসকের বনে সিতা হেট্ট কৈল মাথা ॥
হনু বলে কেন দেখি বিরসবদন।
কুস[ল] বাত্রার উত্তর না পাই কিসের কারন ॥
তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
হেটমাথা করে রাছ দণ্ড দুই চারি ॥
রাবনের মরনে কিবা দুস্থ হইল মনে।
রিদয়ে রবুকি হয়া রাছ তে কারনে ॥
সিতা বলে জে কথা কহিলে মোর পাসে।
রানন্দে বেদেছি মুখ বোল নাই রাইসে ॥
জে কারনে এতখন হেট্ট করি মাথা।
কিবা দিলে সোদ হয় এই করি চিন্তা ॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালে করিয়া অনুমান।
এই বাক্যে হনুমানে কিবা দিব দান ॥
মুনি মুক্তাদি জদি রমুল্য ভাণ্ডার।
তবু এই বচনের নাহি হব ধার ॥
বিক্রয় হইয়া আছেন রভাগিনি সিতা।
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা।
তৃভুবনে তুমার তুলনা নাই দান।
তোমাকে চরনের স্থল দিবেন শ্রীরাম ॥
রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উর্দ্ধার।
অজুধ্যাকে গেলে তোরে দিব গলার হার ॥
হনুমান বলে মা গো কি করিব ধন।
কত লক্ষ ধন সিতা শ্রীরামের চরন ॥

শেষ,—

অগ্নির ভিতরে থাকি না পুড়ে আগুনি।
পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি ॥

অগ্নি বলেন নেহ রাম আপন রমনি।
সিতার দেহে পাপ নাই আমি ভালে জানি॥
জত লোক পাপ কৈল আমার আনলে।
পবিত্র হইলাম তুমার সিতা লক্ষি কোলে॥
সিতার চরিত্রে তুমি হইয় সন্তোস।
জানকিকে দেখি রাম না করিহ রোস॥
প্রভুর চরনে সিতা করিল প্রনাম।
আপনা আপুনি দোস মাগেন শ্রীরাম॥
এক মুখে তুমার গুন কি কহিব আর।
বাপকুল সমুরকুল করিলে উধার॥
নিম্মল সরিরে জস পুন্নিত মেদ্দুনি।
গগনমণ্ডলে জেন কলাহল সুনি॥
সিতার সাহাস গু সর্ব্ব জনে দেখে।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া ডা কল তিন লোকে॥
মরিল স্বরিরে জেন পসিল জিবন।
সিতা দরসনে সভার প্রসন্ন বদন॥
ধন্য ধন্য সিতা গো তুমার ধন্য জিবন।
তুমার জস ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
আপন আপন স্থানে গেল জত দেবগন।
জখনকার জে কাজ্য তাহা জানেন বিভিসন॥
বিস্বকর্ম্মা ডাকিয়া বিভিসন দিল পান।
রাম সিতার বাসঘর করহ নিম্মান॥
সুবর্ন্নের ঘর আর সুবর্ন্নের চোউরি।
রত্নময় খাট পাট নেত পাটের তুলি॥
নব অনুরাগ দুহে জগত মহিতা।
বাসঘরে প্রবেশ করিল রাম সিতা॥
শ্রীরামের পাসে বৈসেন জনকনন্দিনি।
চন্দ্রের সাক্ষাতে জেন বসিল রহিনি॥ * ॥
রাম সিতা দুই জনে রহিল এক ঘরে।
লক্ষি নারায়ন দুহে হইল একত্তরে॥
সয়ন করিল রাম সিতা করি কোলে।
লাজে মুখ ঢাকে সিতা নেতের আঞ্চলে॥
হাস পরিহাস করে দুহে দুহা হেরি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি॥
জানকি সহিত সুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম।
ভমর কমলে জেন মধু করে পান॥
রাত্রি রঙ্গে সিরাঙ্গে কৌতুকে করে কেলি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি॥
রাম সিতার বাসঘর জেই জন সুনে।
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি।
ক্ষেতি সুনিলে হয় মহাজোধাপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম সিতার মিলন॥

———

১১০। রামায়ণ—লঙ্কাকা ।

সীতার উদ্ধার।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪২/২×৪২/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১—৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৮ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

জল ফল আদি করি না করি ভোজণ।
এমতি দেখীব গিআ শ্রীরামচরণ॥
এই কথা বিভিশণ জে কালে শুনিল।
লঙ্কা মর্দ্ধে য়েক দুত পাঠাইয়া দিল॥
কহ জাইয়া দুত জথা আছে মন্দাধরি।
দেশে চলি জায়ে শীতা শ্রীরামশুন্দরি॥
দুত জাইয়া বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ।
করজোরে কহে কথা জত দুতগণ॥
দেশেতে চলিল শীতা শ্রীরামকামিনি।
তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি॥

শীতা দেখীবার জদি তব মণে থাকে।
তরিতগমণে আশী দেখহ তাহাকে ॥
এই কথা মন্দাধরি জে কালে শুণিল।
দশ হাজার রমনি শঙ্গে গমন করিল ॥
এই পুরি মর্দ্ধে নিয়া চৌদল রাখিল।
রাম রাম বলি শীতা গমণ করিল ॥
জাত্রা করি চলিলেক রাজা বিভিশণ।
চৌদল লইয়া শবে করিল গমণ ॥
আণন্দে চলিল তারা জয় শব্দ করি।
হেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥
চৌদল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল।
শ্রীরাম দোহাই দিয়া শমুখেতে গেল ॥
শমুখেতে দাড়াএ গিআ রাণি মন্দাধরি।
চৌদল নামায়ে তথা মহাশব্দ করি ॥
শীতার জে বিস্তমাণে করিআ স্তবণ।
অম্বণ করিআ দোলায় উঠাএ বশণ ॥
মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া।
জাণকি রহীলা তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥
করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ।
হেটমুণ্ড হইয়া মাতা রহিলা কি কারণ ॥
অবলা কামীনি তুমি আমী নহে জাণি।
অপরাদ খেমা কর জণকনন্দিনি ॥
আপনি চলিলা মাতা রাম দরশণ।
পাদপর্দ্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর মণ ॥
আমী ত পাতকি বটী কিছু ণহে জানি।
দআ করি রাখ মাতা জগতজণণি ॥
আমাকে বৈমুখ মাতা হয়ো কি কারণ।
স্বজনে না ছারে দয়া লইলে শরণ ॥

মধ্য,— নাচারি ॥

কান্দে শীতা দির্ঘ রায় ধরি মন্দাধরীর পাঅ
কেণে শাপ দিলা গ জণনি।
বার মাশ দুর্থ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়া
তাথে বাম হইলা আপনি ॥
ণা দেখীল গদাধরে বইমুখত হইলা মোরে
আমী বর পাপী অভাগিনি।
হেন বুঝী প্রভু রাম আমাকে হইলা বাম
এখণেতে ছারিব পরাণি ॥
আদি অন্ত বলি মা তুমী মোরে চিণ ণা
আমী বটি তোমার ণন্দীনি।
অখণে বিধাতা মোরে আনিলেক শংশারে
[তুমী] মোর হইতে জণনি ॥
শোণ মন্দাধরি শতি তুমি হৈলা গর্ব্ভবতি
তাথে আইলেণ নারদ অপনি।
রাজা বিস্তমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়া
অমঙ্গল কণক ভুবণে ॥
মন্দাধরির গর্ব্ভ স্থীতি হইবেক জেই স[তী]
[তার] শ্বামী হইবে প্রকাশ।
তোমার শঙ্গে দরশণ মহা ঘোরতর ত্রণ
তাথে তুমী হইবা বিণাশ ॥
এ কথা শুনিআ রাজা মণেতে ভাবিলা জা জা
বাটিতে চলিলা অন্তশপুরি।
ক্রোধ করি দশ গিরি বলিলা প্রবোদ করি
এই গর্ব্ভ করো * * ॥

ইত্যাদি—(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচারি ॥

শীতা কান্দে দির্ঘ রায় ধরিয়া রামের পাঅ
কেণে মোরে করিলা বর্জ্জণ।
তুমি বিণে লক্ষ্য পাই দাড়াইব কোণ ঠাই
কেণে মোর ণা জারে জিবণ ॥
আশীলাম তোমার ঘরে বঞ্চীত হইলা মোরে
রাজ্য মর্দ্ধে ণা দিলা বশতি।
শকল করিলা ণাশ রার্জ্য ছারি বণবাশ
ণাণামতে কর অবগতি ॥

রার্ষ্য ছারি তোমার আশে আশীলাম বণবাশে
তাথে বিধি বিরম্বণ কৈল মোরে।
শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেছী তোমার ণাম
শদাকাল জাগিছে অন্তরে॥
আমার দুক্ষ্যের কথা বলিয়ে তোমার এথা
দয়া কিছ করোহ আমারে।
আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই
স্থাণ দেও তোমার দাশীরে॥
তুমি গেলা বণান্তরে রাক্ষ্যশে হরিল মোরে
রাখে নিআ অশোকের বণে।
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুগে যুতে
শদাকাল রামণাম মণে॥
তাহাতে রাবণ চেরি পীঠেতে মারয়ে বারি
জিভ্যা টাণে শাড়াশী দিআ।
ত্রজটা রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে
স্থীর মোরে করিল আশীআ॥
মণে দুর্খ শহে ণা তাহাকে বলিল মা
তুমি মোর ধর্ম্মের জণনি।
কি কব তোমার ঠাই দুক্ষ্যের অবধি ণাই
আমী বড় পাপী অভাগিনি॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১১১-২)

শেষ—

শ্রীরামের ক্রোধ দেখী বলিল জাণকি।
কুণ্ডস্থলে রামচন্দ্রের বিক্রম আগে দেখী॥
কুণ্ড হতে তুলি দিয়া চলি জাও তুমি।
রামচন্দ্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি॥
এতেক শুনিয়া অগ্নি হস্তেতে ধরিয়া।
কুণ্ডের পাড়েতে শীতা দিল উঠাইয়া॥
কুণ্ড হতে শীতা তবে জে কালে উঠিল।
আপনা পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল॥
পুর্ন লক্ষ্যী শীতা তান অনেক মহিমা।
দাড়াইয়া রহিল জেণ কাঞ্চণ পৃতিমা॥
মাআ শীতা ভুর হৈয়া শজিব হইল।
পুর্ব্বকথা ভগবানের শ্বরণ পরিল॥
শীতাকে দেখিয়া রাম প্রশন্ন হইল।
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল॥
শীতা বলে কোথায়ে রহিলা হণুমাণ।
শদয়ে হইলা মোরে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
শীতা জাইয়া রাম পাশে তখনে দাড়াইল।
হণুমাণ বির আশী প্রণাম করিল॥
রাম শীতা এক ঠাই হইল মিলন।
রাম রাম ধ্বনি দিল জত বাণরগণ॥
লক্ষ্যণ আশীয়া তবে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তবে জাণকি শ্রীরাম॥
একে একে শর্ব্ব বিরে প্রণাম করিল।
বিভিশণ রাজা তবে দণ্ডবত হইল॥
রাম বোলে শোণ মিত্র শুগ্রিব রাজন।
বিভিশণ করি রাজা জাইআ এইক্ষ্যণ॥
লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশণে।
রাম শীতা মিলণ হইল শোণ শর্ব্ব জণে॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডিতের জর্ম্ম শুভক্ষ্যণ।
এই অধ্যা শাঙ্গ হইল বেদ রামাঅণ॥
ইতি শীতা উর্দ্ধার পুস্তক শমাপ্ত॥

১১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার উদ্ধার পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ + ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ পংক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—

সুনহ সভার পণ্ডিত সুন দিয়া মন।
সিতা দেবির উর্দ্ধার জে গাহাণ রামায়ন॥

রাবন বধিয়া প্রভু রাম গদাধর।
সভা করি বসীলেন বেষ্টীত বানর॥
হরিসে বসীলা প্রভু রাম রঘুমনি।
হনুমানে স্থানে প্রভু বলীলেণ বানি॥
সুন সুন প্রাণপুত্র পবননন্দণ।
সর্ত্তরে চলহ তোমী অসোকের বন॥
জিএ কি মরিছে সীতা না জানি নিশ্চয়।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীআ সীগ্র আন রে তনয়॥
রাম আজ্ঞা পাইয়া তান বন্দীয়া চরন।
সিতা উর্দ্দেসীতে চলে পবননন্দণ॥
পবনগমণে গেল অসুকের বন।
দণ্ডবতে প্রণমিল জানকিচরন॥
প্রসন্ন বদণে সিতা তাকে দিলেণ বর।
যুগে যুগে হনুমাণ হইয় অমর॥
সিতা বলেণ সুন বাপ পবননন্দণ।
কি কর্ম্ম করেন রাম বধিয়া রাবন॥
আমি তাপীণেরে প্রভু করেনি স্মরন।
কুণ কর্ম্ম করে সোগ্রীব ভিবিসণ॥
হণুমাণে বলে মাগ সুন নিবেদণ।
সবংসে বধিল রাম রাজা দসানন।
লঙ্কাপুরে রাজা হৈল বির ভিবিসন॥
সভা করি বসীআছে কমললুচণ॥
আমারে পাঠাইছে মায় তুমা সন্নিদান।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীয়া নিতে তোমার কল্যাণ॥
তুমার কারণে প্রভু সদাএ ব্যাকুল।
তোমার অর্থে নাস হৈল রাক্ষসের কুল॥
আজ্ঞা কর রাম পাসে করিএ গমন।
পুনি আসীবাম তুমা নিবার কারন॥
সিতা বলে সুন পুত্র পবননন্দণ।
রাম স্থাণে কহিয় মর এক নিবেদণ॥
জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা হরন করিয়া।
সেহি রাক্ষসে নিবে মরে কান্দেত করিয়া॥
চল পুত্র হণুমান রাম সন্নীদাণ।
দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ॥

মধ্য—

পার্ব্বতি সহিতে করি দেব ত্রিলুচণ।
রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরসণ॥
সিবে বলে সুণ রাম বলী তোমার ঠাই।
সীতার খরিরে প্রভু কিছো দুস নাই॥
জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি।
সেহি দিন হতে আমি সীতার প্রহরি॥
আমার সেবক হএ রাজা দসানন।
অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥
অণুক্ষণ সীতা রক্ষা করিআছি আমি।
সীতার কারণে সন্দে না করিবা তোমি॥
ভাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি।
তুমার সিশু হৈয়া হরে জনকনন্দীনী॥
ভাল জ্ঞান দিছ তারে সোণ ত্রিলুচণ।
ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥
বর লঞ্য়া পাইলা গৌব রামের বচণে।
এই কালে দসরত আইলা সেহি স্থাণে॥
রথ আরোহণে সীতা হৈল উপস্থীত।
মৃত্য বাপ দেখী রাম হৈলা হরসীত॥
ভক্তিএ বন্দীল রাম পিত্রির চরন।
পাদ্য অর্গ দিলা রাম বসীতে আসন॥
রাম প্রতি দসরথ বলীলা বচণ।
সীতা মাকে দুক্ক রাম দেয় কি কারণ॥
জেহি দিন হতে সীতা নিল দসগীরি।
সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহরি॥
সরূপেঐ জানি আমি সীতার সতির্ত্তা।
সুর্জ্যবংস ধর্ম্ম কৈল জনকদুহিতা॥
ত্রিভুবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে।
মর বাক্যে সীতা লৈয়া চল নিজ দেসে॥

দসরথমোখে সুনি এথেক বচণ।
করযুরে কহে রাম কমললুচণ॥
কিম্বা পরিক্ষাএ জদি দেসে নেহি সীতা।
লুকমোখে অপক্রুত পাইব জথা তথা॥
পতিব্রতা হইলে অগ্নীর কিবা ডর।
অগ্নীসুর্দ্ধ বিনা সীতা না নিবাম ঘর॥

(পৃ· ৬।১)

শেষ—

রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ।
সীতা দিয়া আমার জে রাথহ জিবণ॥
হণুমানে বলে সুন রাম রঘুবির।
সীতা আনি দিলে মরে ধন দিবা কি॥
তোমাকে কি ধন দিব পবনতণয়।
প্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয়॥
হণু বলে প্রীথীবি দিলা কৈলা দর করি।
প্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সাসুরি॥
রঘোনাথ তোমার সাসুরি মকে দিলা।
তোমার সাসুরি মকে দিয়া সাসুরিয়া হৈলা॥
রঘুনাথে বলে সুন পবনতনয়।
এমন দুক্ষের কালে কার্য্য উচিত নয়॥
সীতা দেখি বিনে মর জায়ত পরানি।
আনিয়া দেখায় মরে জনকনন্দীনি॥
হনুমানে বলে ব্রর্ম্মা সুনহ কাহিনি।
সীগ্র নিয়া দেয় সীতা জনকনন্দীনি॥
এত সুনি ব্রর্ম্মা দেব করিল গমন।
সীতা নিয়া দিলা জথা কমললুচণ॥
জথনে হইল দেখা রাম সীতার মিলন।
সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত কবির্ত্তসীরমনি।
সীতার উর্দ্ধার গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই।
জমলুক তরিবারে আর লক্ষ নাই॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীতের অমৃত লাহরি।
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি॥

১১২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

রচয়িতা,—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৬—১৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান বর্দ্ধমান।

আরম্ভ—

রাম বলেন সুন অহে মিতা বিভিসন।
রথ আন দেশে আমী করিব গমন॥
পুস্পক রথ বল্যা করিল স্মরণ।
সেইখানে আইল রথ সতেক জোজন॥
দস জোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষন।
লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদি করে মন॥
ব্রহ্মার বরে রথথান অক্ষয় অব্যয়॥
জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচ্যয়॥
রথ দেখ্যা রঘুনাথ হইলা আনন্দিতা।
রথেতে চড়িলা রাম হস্তে ধরিয়া সিতা॥
লক্ষন উঠিলা গিয়া পুস্পক জে রথে।
রাম সমুখেতে বির ধনুক বান হাতে॥
রথে রামচন্দ্র কটক ভুমীতলে।
সুমধুর বোল রাম কটকেরে বলে॥
সুগ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি।
বিভিসন স্বহায় দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
কোন কোন বিরে আমী করিব বাথান।
ভক্তভাবে মোর ঠাঞি সকল সমান॥
নিজ নিজ দেসে গিয়া করগা ঠাকুরালি।
গলাগালি না দিও না বলো মন্দ বুলি॥

সভাকার ঠাক্রি আমী মাগিলাম মেলানি।
ছলো ছলো করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥

ক্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। (পৃঃ ১২৮)।

মধ্য—

হনুমান চলিলেন মায়ে সম্ভাসিতে ॥
মলয় পর্ব্বতে আইল বির হনুমান।
অঞ্জনার পায়ে বির করিল প্রনাম ॥
মায়েরে দেখিতে আইলা করি বড় সাধ।
কথা না কহিল না কৈল আসির্ব্বাদ ॥
হনুমান বলে মাগো করি নিবেদন।
আসিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন ॥
অঞ্জনা বলেন তোমায় কী কহিব কথা।
তো ধিক্ তোর রাম ধিক্ ধিক্ দেবি সিতা ॥
ধিক্ রে রাক্ষষপতি লঙ্কার রাবন।
তোঙ্গের সমান মুক্ষু নাহি ত্রিভুবন ॥
এ কথা যুনিয়া বলে বির হনুমান।
কহ কহ যুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥
অঞ্জনা বলেন যুন পবননন্দন।
ত্রিভুবন মধ্যে বড় পাগল রাবন ॥
দস হাজার নারি আছে জার অন্তষপুরে।
একা সিতার হেতু কেন সবংসেতে মরে ॥
রামেরে কহিলাম ধিক্ জাহার কারন।
শূদ্রী করিয়াছেন রাম নারায়ন ॥
না জানে জগতে কি সনার মৃগি আছে।
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে ॥
লক্ষিরুপা সিতা বটে জানে ত্রিজগতে।
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভুমিতে ॥
জদী বলে ভন্ন হও লঙ্কার রাবন।
কখন কি বের্থ হয় লক্ষির বচন ॥
তোমারে কহিল ধিক জাহার কারন।
সাগর লজ্ঝিয়া গেলি লঙ্কা ভুবন ॥
এক চড়ে কেন না মারিলা লঙ্কার রাবন।
রামেরে সিতা রামে আনি দিত সেইক্ষন ॥
তোরে গর্ব্ভে ধরিয়া করিলাম কোন কাম।
কত বান খেয়্যাছেন দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
পর্ব্বতের আড়ে ডাড়াও অভাগির ছেলে।
পরাক্রম দেখ মোর দুদ্ধ দি রে গেলে ॥
মহা ক্রোধে অঞ্জনা এড়িল দুদ্ধধার।
মলয় পর্ব্বত ভেদি হইল দুয়ার ॥
অঞ্জনার চরনে করিয়া নমস্কার।
রামের নিকটে আইল পবনকুমার ॥

(পৃঃ ১২৮।২)

শেষ,—

হনুমানে বিদায় করেন রঘুবির।
জেই তুমি সেই আমী একুই স্বরির ॥
জগত ভরিয়া হনু তোর হইল জস।
চারি জুগে আমী তোমার হইলাম বস ॥
এতেক বলিয়া জদী কমললোচন।
কান্দিতে লাগিলা বির পবননন্দন ॥
হনুমান বলে তুমী দয়ার ঠাকুর।
কেমনে বলিলেন হেন বচন নিষ্টুর ॥
একদণ্ড না বাচিব তোমাদরশনে[১]।
নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে ॥
হনুর করুনা যুনি কান্দেন লক্ষন।
এস এস বাছা হনু দি রে আলিঙ্গন ॥
সজল নয়ানে হনু করে প্রনিপাত।
আসির্ব্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়া হাথ ॥
গা তুলিয়া হনুমান করে করপুটে।
স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥
জেই কালে হনুমান মাগিলা মেলানি।
রাম সিতার ক্রন্দনেতে তিতিল মেদনি ॥

১। এখানে সন্ধি হইয়াছে। তোমা+অদরশনে =তোমাদরশনে।

বিভিসন বলে প্রভু রাম রঘুবর।
চরনে রাখিহ প্রভু স্বরনপঞ্জর ॥
নানা রত্ন দিলা সিতা অভরন হার।
দানে শুন্য কৈল রামের অনেক ভাণ্ডার ॥
একে একে ঠাট কটক হইল বিদায়।
বাল্মিক বন্দিয়া গিত কিত্তিবাষ গায় ॥ * ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাম জুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথে রাম ডাক দিয়া আনি ॥
রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহন।
কুবেরের স্থানে তুমি করহ গমন ॥
বায়ুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে।
কুবের বলেন রথ কর অবধানে ॥
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর।
দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর ॥
পুনরুপী জাও তুমি জেথানে রঘুপতি।
তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি ॥
শুনিয়া আইল রথ শ্রীরামের স্থান।
দেবরুপী রথ বটে জানিলেন রাম ॥
বিচিত্র চৌওরা ঘর করিল নির্ম্মান।
তাহাতে রাখিলা রাম পুষ্পক রথখান ॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে পরিপুন্ন হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ * ॥

১১৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭২ মঘী (বঙ্গাব্দ ১২১৭)। সম্পূর্ণ। হস্তাক্ষর পূর্ব্বদেশীয়। মঘী সনের উল্লেখ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

আরম্ভ,—প্রথম দুইখানি পাতা গলিয়া গিয়াছে। ৩এর পাতা, ২য় পৃষ্ঠা, ৬ পঙ্‌ক্তি,—

সুভ লগ্নে রথে রাম সপদ আরোহিল।
তিন সর্গে লঙ্কা রাযো উপরে চলিল ॥
বানর রাক্ষষ লৈয়া আরোহিলা রথ।
পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ ॥
বিভিসনে রথখান চালাএ সর্ব্বরে।
বিযুলি ছটকে জেন নক্ষত্র সঞ্চরে ॥
বাউগতি চলে রথ দবের নির্ম্মান।
আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান ॥
গগন পুরিল সব ঠাটের হুঙ্কারে।
কোটি কোটি হস্তি ঘোরা বহুল ফুকারে ॥
রাসি রাসি গজমুক্তা রাসি রাসি মনি।
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নাচনি ॥
সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর।
হংস চক্রবাক তথা চরে নিরন্তর ॥
লঙ্কাবাসি সকল গন্ধর্ব্বে গাহে গিত।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরি সবে করে নৃত্য ॥
চিন্নচরা পতকাএ ভরিল গগন।
কোটি কোটি বাদ্যকে বাজাএ ঘন ঘন ॥
লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদক্ষিন[১]।
ভুমিতে লাগিল রথ লঙ্কার উপর।
ভুমি হোন্তে অন্তরিক্ষে সথেক প্রহর ॥
কনকের রথখান মনিএ ভুসিত।
তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত ॥
চামরে বাতাস করে সুমিত্রানন্দন।
জিজ্ঞাসিল সিতাদেবি উল্লাসিত মন ॥
কোনখানে রহিছিলা করিআ সিবির।
কোন স্থানে যুদ্ধ কৈল কো কোন বির ॥

১। ইহার মেলক পঙ্‌ক্তিটী নাই।

রনস্থল ভুমিখান চাহি দেখিবার।
কোন কোন স্থানে হৈল কাহার সংহার॥
কোন স্থানে থাকি তুক্ষি লঙ্কা কৈলা দৃষ্টি।
কোন স্থানে ছেদ কৈলা মুণ্ড কথ গুটি॥
কুম্ভকর্ন বিরেযে কাটিলা কোন স্থানে।
এহার নির্ন্নয় মতে কহিবা সন্ধানে॥
শ্রীরামে বোলেন তোক্ষা কহিমু সমস্থ।
আক্ষি রহিলাম এই সুবেল পর্ব্বত॥
তাহাতে বসিয়া আক্ষি কটক পাচিল।
পুর্ব্বদ্বারে যুর্দ্ধ কৈল সেনাপতি নিল॥
চারি দ্বার হোন্তে মুক্ষ দক্ষিন দুয়ার।
তাতে বসি যুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার॥
উর্ত্তর দ্বারে যুর্দ্ধ কৈল বানর ইস্বর।
পশ্চিমে যুঝিল আক্ষি দুই সহোদর॥
এইখানে পরিলেক ছয় গোটা বির।
দেবান্তক নরান্তক আউল ত্রিসির॥
এই দেখ নিকুম্ভিলা নামে জজ্ঞকুণ্ড।
লক্ষ্মনে কাটিল এথা ইন্দ্রজিতের মুণ্ড॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৩।২-৪।১)

অধিকাংশ পুথিতেই রামের প্রত্যাগমন সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত। যথা,—

নাচাড়ি॥ দির্ঘছন্দ॥

রাম বোলে হনুমান তুক্ষি হও আগুয়ান
অজধ্যা করিবা অন্বাশন।
দেবের নির্ম্মান রথ লংঘিয়া গগন পথ
দেখ গিয়া সর্ব্ব বন্ধুগন॥ ১॥
চলহ দণ্ডক বন দেখ গিয়া মুনিগন
পঞ্চবটি পাইমু অভস্য।
শুর্পনখার নাক কান কাটা গেছে জেই স্থান
তথা গিয়া করিমু রহাঁস্য॥ ২॥

গুহ চণ্ডালের দেষ তাতে কর পরবেষ
সেহ এক বার্দ্ধব আক্ষার।
অকালে সারথি পানা করিলেক সেই জনা
নৌকা দিয়া গঙ্গা কৈল পার॥ ৩॥
রাম দেসে আগমন স্বর্গে চলে দেবগন
জার জেই বাহন সহিত।
সর্গেত দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
চলি জাএ অজধ্যা পুরিত॥ ৪॥
বৃসে চরে উমাপতি মুসিকেত গনপতি
সিংহ বাহনে গিরিসুতা।
ময়ূরেত সড়ানন বহু হরসিত মন
নাগপিষ্টে হরের দুহিতা॥ ৫॥
হংশরথে আরোহন চলিলা চতুরানন
ঐরাবতে চরে সুরপতি।
মহিসেত আরোহন চলে রবিনন্দন
ভুত সব করিয়া সঙ্গতি॥ ৬॥
চন্দ্র সুর্য্য রথ সাজে বহুল দুন্দুভি বাজে
গন্ধর্ব্বাদি চলে বির্দ্যাধর।
রাম জয় সবে বোলে গগন ভরিল রোলে
গিত গাহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ৭॥
দেবতা সাজিল জথ তাহা বা কহিব কথ
করিবারে রাম অভিশেক।
সর্গ মর্ত্ত্য অধপুর আনন্দিত সুরাশুর
সব চলে মনের বিবেক॥ ৮॥
রামে বোলে হনুমান তুক্ষি হও আগুয়ান
গগনে কি সুনি হুলুস্থলি।
আকাশে দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
পুষ্টি জেন মেঘে আইশে ধুলি॥ ৯॥
শ্রীরামের বাক্য সুনি হনুমানে বোলে পুনী
তোক্ষার শুনিয়া শুভ বাত।
কোটি কোটি দেবগন ঘুরি চলে গগন
সর্ব্ব দেব জাএ অজধ্যাতে॥১০॥

হাঁসি বোলে রঘুনাথ তুমি জাও অজধ্যাত
জানাইতে ভরতের স্থান।
শুনিয়া রামের বানি বন্দিয়া সারঙ্গপানি
অজধ্যাতে চলে হনুমান ॥ ১১ ॥
উর্ত্তরাকাণ্ডের গীত কির্ত্তিবাস বিরচিত
প্রনমিয়া শ্রীরামের পাএ।
রাম দেসে য়াগমন সঙ্গে চলে দেবগন
সুনি হনু অজধ্যাতে জাএ॥ ১২ ॥ *॥
(পৃঃ ১২।১-২)

নাচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥

অএ মুনি না মারিয় দণ্ডের বারি।
আজ্ঞা কর ধিরে ধিরে হাঠি ॥
অতি মৃদু রাজার কুমারি।
ভয় পাইয়া হইছে কাতরি ॥
রুহিদাস কোল লাগি কান্দে।
দেখি নহি হাটে কোন কালে ॥
ধিরে জাউক হাটিতে ন জানে।
বারানসি পাইব কথ দিনে ॥
ভোগে সোকে হইয়া তপশ্বি।
কথ দিনে পাইব বারানসি ॥
আহ্মি কাঁপি তোহ্মার তরাশে।
রম্ভা জেন কাঁপএ তরাশে ॥
আজি মুই এই শে দিবশে।
মোহারণ্য করিমু প্রবেশে ॥
তোহ্মারে জে সূর্য্য হেন দেখি।
নিকটে ন আইশে সশিমুখি ॥
ভয় পাইয়া হইছে আকুলি।
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুলি ॥
বোলে মুনি তোহ্মার চরণে।
ভয় বর পাইয়াছি মনে ॥
রুহিদাস কান্দএ কোলেরে।
আজ্ঞা কর জাই ধিরে ধিরে ॥

কির্ত্তিবাসের বচন প্রমান।
উর্ত্তরাকাণ্ডে রছে সাবধান ॥ * ॥
(পৃঃ ১০৬.২-১০৭।১)

নাচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥

অএ রাজা কেনে তুহ্মি লোটাও ধরনি।
নগরে বেচিয়া মোরে ধন দেয় ব্রাহ্মনেরে
তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি ॥
আছিলু তোহ্মার মায়া পাসর শে সব দয়া
মনে কিছু না করিয় দুঃক।
রুহিদাস পুত্রেরে ধরিছিলু উদরে
বিধি মোরে হইল বিমুক ॥
মুনিরে দক্ষিণা দিবা শে ধন কথাএ পাইবা
ইষ্ট মিত্র নাহিক সোহাএ।
সুর্য্যবংশের রাজা তুহ্মি তোহ্মা কি বলিব আহ্মি
আহ্মি বিনে নাইক উপাএ ॥
পুত্র পরে নাই ধন পত্নি ছার অকারণ
সি ছারের কোন প্রয়োজন।
রুহিদাস পুত্র লইয়া পাসর আপনা মায়া
তোহ্মাতে করিলু সমর্পণ ॥
তোহ্মার চরনে গতি জর্ম্মে জর্ম্মে তুহ্মি পতি
হেনহি মনের অভিলাশ।
জর্ম্ম হৈল নারি কুলে তোহ্মা পাইলু কর্ম্মফলে
তাতে বিধি করিল নৈরাশ ॥
এই মোরে দেয় বর তোহ্মা পাম জর্ম্মান্তর
এই জর্ম্মে নাই দরশন।
দেবির ক্রন্দন কথা সুনিয়া উপর্জ্জে বেথা
কির্ত্তিবাশে রছিল শোভন ॥*॥
(পৃঃ ১০৭।২-১০৮।১)

নাচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে ॥

কথা গেলা প্রাণ পৃয়া এথ দুঃখ মোরে দিয়া
সোকে মোর দগধে পরাণী।

না দেখি তোহ্মার মুক ধরাইতে না পারি বুক
বিধিএ স্রিয়াএ মোরে কেনো ॥
তুহ্মি সতি পতিব্রতা কি কৈমু তোহ্মার কথা
না দেখিলে দগধে পরানী।
নানা দুঃখ রাত্রি দিনে সেহ কৈল একমনে
তবে তোহ্মা বেচিলু ব্রাহ্মনে ॥
বিকাইলা জেই কালে ব্রাহ্মনে ধরিল চুলে
চাইলা জে কাতর হরিনি।
মনে জথ পাইলা দুঃক না দেখি তোহ্মার মুক
বিধি কেনে রাখিছে পরানী ॥
কথাতে বঞ্চিবা রাত্রি পুত্রের জে সঙ্গতি
ধিক জাউক আহ্মার বচন।
বহু ছিল জলচর ধনহিন বহুতর
বিভা জানি করএ অখন ॥
তুহ্মি ত পাইলা দুঃখ মোর গেল সর্ব্বসুখ
গগনে না শোভে চন্দ্র বিনে।
রাজা চাহে চারিভিৎ কথা গেলা আচুম্বিৎ
কেনে বিধি দুঃখ দেয় মনে ॥
কির্ত্তিবাসে রহে গিৎ রাজা হৈল মুর্চ্ছিৎ
সোকে রাজা কান্দে দুঃখ পাইয়া।
কেনে হেন কৈল বিধি হাত হোনে নিল নিধি
পাথর হোন্তে অধিক মোর হিয়া ॥
পুনি বোলে কির্ত্তিবাশ উর্দ্ধরা কাষ্ঠের আস
সোকে দুঃখে কান্দে বেরাইয়া।
জএ ধর্ম্ম মহাসএ কেনে কান্দ অতিসএ
সোক ছার সাস্ত কর হিয়া ॥
(পৃঃ ১১১।২-১১২।১)

নাচাড়ি ॥
অএ ঘাটিয়াল আজ্ঞা কর মরা পুরিবার।
কিছু বস্ত্র নাই মোরে তোহ্মারে দিবার ॥
প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে।
তভো প্রান না জাএ শসানে ॥
পুত্র মরিল সেই সোখে।
বিধি কৈল এহ্মত বিপাকে ॥
মাও বাপের প্রান শেই জনে।
কথ দুঃখ সহেত পরানে ॥
হরি মোকে দিল এথ তাপ।
না জানি কথ করিআছ পাপ ॥
ঘাটিয়াংকে কহিমু দুঃখের কাইনি।
ধনজনের আহ্মি সে ধনি ॥
ব্রাহ্মনের দাসি কর্ম্ম করি।
অগোচরে কিছু নহি হরি ॥
চাউল সের পাই দুই জনে।
কথা হোন্তে অপর্জ্জি দান ॥
কথা মোর কহিমু তোহ্মাতে।
মোর দুঃখ জানে জগন্নাথে ॥
তিতা বস্ত্রে রহি আহ্মি পানি।
দ্বিতিয় বস্ত্র আর নাই খানী ॥
অর্দ্ধখান ভাঙ্গি দিমু তোহ্মারে।
আজ্ঞা কর মরা পুরিবারে ॥
তোহ্মাতে কহিতে ভয় বাসি।
আহ্মি হরিচন্দ্রের মহিসী ॥
এই পুত্র রাজার কুমার।
বিধি কৈল সকল সংহার ॥
কোন দেসে গেল মোর স্বামি।
পুত্র খাইল এ কাল নাগিনি ॥
পুত্র মোর মারিলেক সাঁপে।
মোর প্রান রহে এথ তাপে ॥
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ।
তোহ্মা স্থানে কহিলু বিশেস ॥
আজ্ঞা কর অগ্নি কার্য্য করি।
কির্ত্তিবাশে রচিল নাচাড়ি ॥
(পৃঃ ১১৫।১-২)

হরিশ্চন্দ্রের করুণ উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত।

নাঙ্কারে প্রায় আদিকাণ্ডের পুথিতেই পাওয়া যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। শেষ—অক্ষর অস্পষ্ট।

১১৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৯৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামঃ॥ অথ উত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে॥
রামং লক্ষ[ণ]নপূর্ব্বজং ইত্যাদি।

ছয়কাণ্ড গাইল শ্রীরামায়ন ভিতরে।
উত্তরা কাণ্ড গাইলে শ্রীরাম দেন বরে॥
উত্তরাকাণ্ড পোথা রামায়ন ভিতর।
ইহাকে স্তুনিলে জমের নাহি অধিকার॥
উত্তরাকাণ্ড স্তুনিলে গৃহস্তের হয় ধন।
আপনে আশীঞা বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন॥
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড।
উত্তরাতে গাইব এবে অমৃতের ভাণ্ড॥
মধু সর্করা জে থাইঞাছে ভাণ্ডে ভাণ্ড।
সাবধান হৈঞা স্তুন উত্তরা [কে] কাণ্ড॥
অজোধ্যাতে রাজা হৈল রাম ধনুর্দ্ধর।
দুষ্ট রাক্ষস মারি ঘুচাইলা ডর॥
সর্ব্ব মুনী বোলেন রাম করিলা পরিত্রান।
অজোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন।
জত জত মুনিগন আছয়ে প্রবীন॥
সকল মুনি আসিঞা হইঞা য়েক ঠাঞী।
রামকে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই॥
এত বলি চতুর্দ্দিগে মুনী আগুসরে।
সকল মুনী চলি গেল শ্রীরামের দুয়ারে॥
রাজ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে নোঙায় মাথা।
জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথা॥

ইহার পর মুনিগণের নামের এক দীর্ঘ তালিকা। তাহার পর অগস্ত্য কর্ত্তৃক লঙ্কার উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি বর্ণিত (পৃঃ ৩। ২—৭। ০)। এইখানে রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শিব কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন এবং শান্তনু কর্ত্তৃক গঙ্গা বর্জ্জন প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে। অনন্তর রাক্ষসগণের জন্ম, কুম্ভকর্ণের তপস্যা, কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় পরে মন্দোদরী তথা অঙ্গদের জন্মবৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বোলেন কথা প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
পাত্র মিত্র লইঞা স্তুনেন রামচন্দ্র॥
অগোস্ত্য বোলেন কথা স্তুন নারায়ণ।
শাবধানে শুন মন্দোদরির জনম॥
ইন্দ্রের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নাম।
পরম সুন্দরি কন্যা সর্ব্বগুণধাম॥
এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে।
নৃত্য দেখি শর্ব্ব দেব হইলা মোহিতে॥
নাচিতে নাচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল।
দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞা উঠিল॥
ইন্দ্র বোলে তাল ভঙ্গ করিলি নৃর্ত্তকি।
পৃথিবিতে জন্ম গিঞা হইঞা মণ্ডুকি॥
এত স্তুনি নৃর্ত্তকি করিল জোড় হাত।
কেমনে পাইব মুক্ত কহ সুরনাথ॥
সাঁপ দিলা শাপান্ত করহ সচিপতি।
কত দিনে ঘুচিবেক আমার দুর্গতি॥
ইন্দ্র বোলে জাহ তুমি বনের ভিতর।
জেই বনে আছেন সৌভদ্র মুনিবর॥

বহু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ।
আমি কি করিব তাহা দৈবের শঞ্জোগ ॥
এতেক সুনিঞা কৈন্ন্যা গমন করিল।
মণ্ডুক রূপেতে আসি বনে প্রবেসিলো ॥
জে বনেতে আছেন শৌভদ্র মুনিবরে।
শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে ॥
হেন মতে থাকে শেই মহামুনি স্থাণ।
মুনির সমিপে বেঙ্গ নাচিঞা বেড়ান ॥
সন্তুষ্ট হইলা মুনি দেখি মণ্ডুকিরে।
মুনি বোলে তুমি নিত্য থাইক মোর ঘরে ॥
দুগ্ধ আবর্ত্তিঞা তপশ্যাতে জাব আমি।
ইহা আবরিঞা বাছা ঘরে থাক তুমি ॥
নৃত্য নৃত্য জান মুনি তপশ্যা করিবারে।
দুগ্ধ জোগাইঞা মেণ্ডুকি শদা থাকে ঘরে ॥
দৈব জোগে এক দিন শর্পে দুগ্ধ খায়।
তাহা দেখি ভেক তবে করে হায় হায় ॥
আমার শাক্ষাতে দুগ্ধ সর্পেতে খাইল।
দুগ্ধ খাইঞা হলাহল ঢালি থুইল ॥
এই দুগ্ধ মুনি জদি আসিঞা খাইব।
বিশের জ্বালাতে মুনি শরীর তেজিব ॥
এত বলি মণ্ডুকি ভাবিঞা মনে মনে।
দুগ্ধমধ্যে প্রবেসিঞা তেজিল জিবনে ॥
তপশ্যা করিঞা জদি মুনি আইল ঘর।
দুগ্ধ আনিবারে মুনি চলিলা শত্বর ॥
দৃষ্ট প্রসারিঞা চাহে দুগ্ধ পানে।
মণ্ডুকি মরিলা মুনি দেখিলা নঞানে ॥
মণ্ডুক তুলিঞা মুনি হাতে করি নিল।
মুনি হস্তে পরসিতে দির্ব্ব কন্যা হৈল ॥
কন্যার পালন করেন মুনি তপোধনে।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা মুনির আশ্রমে ॥
পঞ্চ বৎসরের কন্যা হইল জখন।
কন্যা দেখি সদত চিন্তেন তপোধন ॥

এক দিন ময় দানব আইলা শেই বনে।
মৃগয়া করিঞা রাজা ফিরেন কাননে ॥
অপুত্রক ছিল ময়দানব ইশ্বর।
স্নেহেতে তাহারে কন্যা দিল মুনিবর ॥
কন্যা লইঞা দানব আইলা আপণ ভুবণে।
পালিবারে দিল কন্যা ভার্য্যা বিস্বমাণে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ দানব অধিকারি।
বাছীঞা তাহার নাম থুইল মন্দোদরি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা দানব কুতুহলি।
শেই বণে তপশ্যা করেন নিত্য বালি ॥
এক দিন সুন তার দৈবের কারণে।
ময়দানবের কন্যা গেলা শেইখানে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ বানর রাজা বালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিলা মহাবলি ॥
রহিল বালির বির্য্য কন্যার উদরে।
শেই বির্য্যে গর্ব্ভ তার হইল প্রথরে ॥
কন্যা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
অকুমারি কন্যারে হরিলা কি কারণ ॥
তোমার বির্য্যে পুত্র হৈল আমার উদরে।
এমন জনের বিভা না হবে শংসারে ॥
এ বোল সুনিঞা বোলে কপির ইশ্বর।
তোমাকে করিবেন বিভা লঙ্কার ইশ্বর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিবে বাহুবলে।
তোমাকে করিবে বিভা আনন্দ মঙ্গলে ॥
মন্দোদরি বোলে রাজা কহিয়ে তোমারে।
বাহির হইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥
মহাপুরুশের বির্য্য নষ্ট নহে কদাচন।
জোনি ক্ষেত হৈলে মোর হবে বিড়ম্বন ॥
এত সুনি বালি রাজা মনেতে চিন্তিল।
নখাঘাত দিঞা তার উরু বিদারিল ॥
তাহাতে হইল পুত্র মহা বলবান।
অঙ্গ হইতে হইল অঙ্গদ শেই না

নারায়ণ চিন্তী বালি হস্ত বুলাইল।
জেমন আছিল উরু তেমনি হইল॥
বালি সম্ভাসিঞা মন্দোদরি গেলা ঘর।
পুত্র লইঞা ঘরে গেলা কপির ইশ্বর॥
তারার নিকটে দিল করিতে পালন।
দেখি তারা দেবি হরশীত মন॥
শ্রীবাশ পণ্ডীত কবিত্ত বিচক্ষণ।
রাতে গাইল অঙ্গদ কপির জনম॥ * ॥
(পৃঃ ১৮।১-২)
সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থানা।
অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জনা॥
অজধ্যাতে জায় দুত রামের গোচর।
দিবাতে নক্ষত্র দেখেন রাম গদাধর॥
প্রাচিরে সকুনিগণ ডাকয়ে বিশেষে।
শ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে॥
বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি।
রাত্রিতে সপন দেখেন বড়ই জঞ্জালি॥
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন।
নিরন্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষ্মণ॥
দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
ভাল মন্দ কিছু বার্ত্তা না জানি তাহারে॥
দণ্ডকেতে কার সঙ্গে হৈঞা থাকে দন্দ।
তে কারণে দেখি এথা অরিষ্ট প্রবন্ধ॥
য়েতেক চিন্তীঞা রাম হইলা উম্মনা।
হেন কালে দুত আশী করিছে কল্পনা॥
দুত দেখিঞা কথা পুছে নৃপমুণি।
কহ দেখি দুত লক্ষ্মণের বিবরণে॥
তোমার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভুবণে।
পুর্ব্ব দিগ গিঞাছিল অশ্ব কথক দিনে॥
তথা ঘট নামে দৈত্য করিলে পাসণ্ড।
রাখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া তারে করি দণ্ড॥
প্রান লৈঞা পলাইল দৈত্য পাপমতী।
তবে উত্তর দিগে ঘোড়া গেল শিঘ্রগতি॥
সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাত্রি দিনে।
নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলী অবসানে॥
আগুলিতে নারে ঘোড়া জায় পবন বেগে।
বিষ্ণুপ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে॥
বাল্মীকীর তপোবনে করিল প্রবেশে।
ধরিলেক ঘোড়া সিসু বড়ই হরিশে॥
প্রিয় বাক্য বলিল তারে অনেক প্রকারে।
কদাচ না দিল ঘোড়া দুই মহাবিরে॥
সিসু হৈঞা দুই ভাই হয় বলবান।
সংসারেতে বির নাহি তাহার সমান॥
দণ্ডকেতে অস্ত্র বিষ্টী জুদ্ধ ঘোরতর।
দুই সিসু বান এড়ে দিঞা হুহুঙ্কার॥
বান মুখে জলে জেন জলন্ত অগিনী।
তিন প্রহরে বিনাসিলে য়েক অক্ষোহিনী॥
দুই সিসুর বানে পড়ে শর্ব্ব সেনাগণ।
তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষ্মণ॥
এতেক সুনিঞা রাম হইলা মুর্চ্ছিতে।
অচৈতন্ন হৈঞা রাম পড়িলা ভূমিতে॥
শ্রীরামকে কোলে করি তুলিলা সত্রুঘন।
ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ বলিঞা রাম কান্দেন উচ্চশ্বরে।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দেন গড়াগড়ি পাড়ে॥
একা পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেলা কোথাকারে॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি।
হেন ভাই হারাইলাম পাছে লাগিল বিধি॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ ভাই কেনে আরম্ভিল।
জজ্ঞের কারণে ভাই তোমা হারাইল॥
শর্ব্বগুণনিধি ভাই সভার পরান।
হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রহে পরান॥
বারেক বাহড় ভাই আইষ পুনর্ব্বার।

তোমার শোকে প্রান আর না রহে আমার ॥
নানা বিলাপ করিঞা করিছেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের ক্রন্দনেতে কান্দিছে পাত্র মিত্রগণ ॥
চমৎকার লাগিল শব্দে পাইলেন ত্রাশ।
উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ডীত কির্ত্তিবাশ ॥ * ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ দির্ঘছন্দ ॥

ছুত মুখে সুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যেথা
শোকাকুলে দহিল সরিরে।
ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শ্বরির প্রেম
সিসু ছুষ্টে বধিলে তাহারে ॥
আমি ত দুর্গতি বড় দৈব পাশণ্ড বড়
তিন ভাই থুইঞা ক্ষুদ্রপতি।
শেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল
দিলু তাকে অশ্বের সংহতি ॥
আমা চারি ভাই য়েক দেহ মাত্র ভিন্ন য়েক
নাহি ভিন্ন জিবন সম্পদ।
ভাই লক্ষণ জবে মৈল সভার জিবন গেল
এই দিনে হইল বিপদ ॥
গৌর সরির তার সখি মুখ অবতার
কমল লোচন নটবেশ।
আমার অরণ্যবাশে না থাকিলে ভাই দেশে
মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

শেষ—

জগ্গা স্থান পাইঞা সবে সর্গগ স্থানে বসি।
লক্ষিমুর্ত্তি সিতা দেবি শ্রীরামের স্থানে আসি ॥
ততক্ষণে হইলা রাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
চতুর্ভুজ হইলা রাম দেখে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা আদি জত দেবগণে করে স্তুতি।
চতুর্দ্দস ভূবণের তুমি অধিপতি ॥
প্রজা লোক লইঞা রাম সর্গপুরে আইলা।
এই হইতে উত্তরাকাণ্ড সাঙ্গ হইলা ॥
জে সুনে জে ভণে শ্রীরামের স্বর্গারোহণ।
পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুর্ন্ন ধন জন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন।
একচিত্য হঞা জে সুনে রামায়ণ ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সুনে জেই নরে।
সকল পাপে মুক্ত হইঞা জায় স্বর্গপুরে ॥
শ্রীরামের কথা সুনিলে লক্ষি পুরায় আস।
সপ্তকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তীবাস ॥
ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপ্তঃ ॥
লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ··· ·· ···

ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সরকার মাহামুদাবা[দ] মুতালিকে লস্করপুর ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে।

১১৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪১—২৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

রন করিতে আইলি কি পাইলি দেশে ॥
আমার বচন রাবন না হইব আন।
আপনার দোশে তুমি হারাবে পরান ॥
তোর ছার সনে আমি না করিব রন।
জত তোর মনে আছে করহ রাবন ॥
এতেক বলিল জবে কুবের মহারাজ।
রাবনের আমাত্য জত পাইলেক লাজ ॥
জেষ্ট গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পাসণ্ডা।
কুবেরমস্তকে মারে দারুন গদার বাড়ি ॥

দুই ভাই নিরুপেক্ষ্য করে অস্ত অবতার।
নানা বান দুই ভাই করিল সংহার ॥
অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার।
বরুন বান রাবন রাজা করিল সংহার ॥
রাক্ষসমায়া ধরিলেক রাজা দসানন।
নানা মুর্ত্তী ধরিয়া রাবন রাজা করে রন ॥
ব্যাঘ্ররুপ ধরিয়া কাহাকেয়ো কামড়ায়ে মারে।
বরাহরুপ ধরিয়া কাহাকেও দস্তেতে বিদারে ॥
মেঘরুপ ধরিয়া কাখে ফাফর করে জাড়ে।
পর্ব্বতরুপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥
অশেস রুপেতে রাবন জক্ষ সংহারে।
খালীজুলি হয়া থাকে তাথে জক্ষ পড়ে মরে ॥
নানারুপে জক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড।
জক্ষ্য সব মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
ক্ষেনে ভুমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি।
কুবেরর মুণ্ডে মারে দা[রু]ন গদার বাড়ি ॥
পুষ্পক রথ হইতে কুবের পড়ে ভুমিতলে।
ফু(কা)টীল ষসককা (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে ॥
কুবেরে ধরিয়া কান্দে লয় কুবের অনুচর।
কুবেরে এড়িল লয়া নন্দনবনি ভিতর ॥

মধ্য,—

"দুই ভাএ রনস্থলে হাসিয়া হাসিয়া বুলে
দেখি বড় হইল চিন্তীত ॥"

ইত্যাদি ত্রিপদীটিতে মধুকণ্ঠের ভণিতা পাওয়া যায়। (পৃঃ ২০৪।১)। কিন্তু পরিষৎ-সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাসেরই ভণিতা আছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী,—

রাগ পাটমঞ্জরি ॥

রাম বলেন দুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঞী
দুহেত ফিরিয়া জাহ ঘর।
ঘোড়া আর সত্ত্ব দিয়া তপোবনে যহ গীয়া
প্রসংসা করিব মুনিবর ॥
মকরাক্ষস কুম্ভকন্ন জত রাক্ষস অগ্নিবন্ন
সবংশে মারিল লঙ্কেশ্বর।
মারিচ [দুষণ] খর বধিলাম একেশ্বর
আর জত মাইলাম নিসাচর ॥
রিপুমুখে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম ক্ষার
ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে।
তোমারা সিস্থ দুই জন কেমনে করিব রন
বাল্মীকের ঠাঞী পাব লাজ ॥
এত সুনি উত্তর কহে দুই সহদর
সনমুখে জুড়িয়া দুটী হাত।
তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধন্ন বসুমতি
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ ॥
করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন
জিনিলে নাইক পুরস্কার।
এমন বালক নই বির বংশে জন্ম হই
এখনে পাইবে প্রতিকার ॥
বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি
বিসেষে পরম গুরুজন।
তুমি অস্তে বির বট আগে কেন ধন্ম ঘাট
পশ্চাত করিব আমরা রন ॥
মনে না করিহ রাম না করিমু সংগ্রাম
আমরা ফিরিয়া জাব ঘর।
বাল্মীকের প্রসাদে জননির আশীর্ব্বাদে
তোমার তজ্জনে নাই ডর ॥
ডাকি বলে দুই জনে পুষ্পক রথে রাম শুনে
মুনিগনে লাগীল তরাস।
না আইলে তপবন দুহার না ভাঙ্গে রন
মধু কহে মিঠু মিঠু ভাশ। *॥(পৃঃ ২০৪।১-২)

২১২'২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকণ্ঠের ভণিতাযুক্ত।

শেষ,—

রাম বলেন অজুদ্ধা নগর জত্ত লক্ষনের কুঙরে।
ভাল দেস চিস্ত নহে করিল দণ্ডধরে॥
জে দেসে কোন রাজার নাইক সাশন।
জে দেসে বঞ্চীল [নহে] ঋষি মুনিগন॥
হেন সব দেসের রাজ্রা আনহ লক্ষন।
সেই দুই দেসে রাজা কর দুই জন॥ ইত্যাদি।

•দসরথের বহু দসরথের নাতি।
জাহার গুন সুনিলে হয় সগর্গের বসতি॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল সভার আনন্দ।
পোথীর কাহিনি কৈল সুনিয়া সানন্দ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল নানা ছন্দে পয়ার।
আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার॥
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরকাণ্ড।
সুনিতে সুনিতে নাগে বড় রসভাণ্ড॥
রামায়ন সুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে।
একমন হয়্যা জদি রামায়ন স্তনে॥
জে গায়ায় জে গায় জেবা লেখে রাখে ঘরে।
লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জন্মা জন্মান্তরে॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত রচিল রামায়ন।
নিখিতে রহিল রামের সগ্গ আরোহন॥
ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত বিষয়গত সাদৃশ্য যথেষ্টই আছে।

১১৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১-১৫১। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি
ত্রৈলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলা ডর॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলা পরিত্তান।
যজধ্যাকে গিয়া রামকে করিছে কল্যান॥
সংসারের মুনি গেল রামের দুয়ারে।
দ্যারি সত্তরে গেল রামের গোচরে॥
রাজব্যবহারে স্থারি রামে নোয়ায় মাথা।
জোড় হাত করি বলে মনিগোনের কথা॥
স্বর্গ মত্য পাতালের জত মনি রিষি।
তোমার দ্বারেতে সভে উপনিত য়াসি॥
সোঙসারের মনি ঋসি ডাণ্ডায়া বাহিরে।
আজ্ঞা কর আনি প্রভু তোমার গোচরে॥

রাম-সীতার বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত সুন্দর সাদৃশ্য আছে। (পৃ০ ৭১।২-৭২।২) সীতার বনবাস' দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ ঐক্য দেখা যায় (পৃ০ ৭৩।২-৮০।১, ১০৩।১-১০৫।২)।

শেষ,—

জেন কালে কহেন রাম সভার ভিতর॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার॥
তিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঞি।
আর বার পরক্ষা আমী তব স্থানে চাই॥
পরিক্ষা করহ সিতা তিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোকে চমৎকার লাগে॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
তিভুবনে ঘুচুক আমার অপজস॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে॥

আগ্নি প্রেবেস করেছিলাম তোমার বর্জ্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন সুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস ॥
রাজার গৃহিনি হয়্যা বন সঙ্গে বসি।

১১৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭$\frac{1}{2}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২, ৬-১২, ১৭-২৯, ৩৬, ৩৮-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৫, ৭৭-৮১, ৮৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। খণ্ডিত। হরপ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব।
বৎষ মোহামুনি আইল দেখিত অনুভব ॥
লিখন না জাএ মুনি আসিল অনেক।
... ... হতে আসিল বাল্মিকি ॥
এত মুনি একবারে কোন জনে দেখে।
তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে ॥
মুনি সবের সুনে রামে অপুর্ব্ব কথন।
দুই কোসের পত যুরি বসিছে মুনিগন ॥
দস সহস্র উপবাস তবে (করে) জেই জনা।
সিষ্টি ক্ষএ করিতে পারে এক এক জনা ॥
হেন মুনি আইল গোসাঞি তোমার জে দ্বারে।
আজ্ঞ্যা কর মুনি সব আনি তোমার স্থানে ॥
দ্বারির বচন সুনি রাম মোহাবল।
সত্যরে আনহ মুনি আমার গোচর ॥
সিগ্র করি আন মুনি দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন ॥
রামের বচন সুনি দ্বারি জে সত্যর।
সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর ॥
মুনি সব আসিল জদি শ্রীরাম বির্দ্যমান।
বৈকুণ্ঠ সম্পদ দেখে রাম ভগবান ॥
অজদ্ধ্যা দেখিল জেন বৈকুণ্ঠ নগরি।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্ম সারঙ্গমধারি ॥
দুর্ব্বাধল সাম মুত্তি রূপে মনুহর।
ত্রিলক্ষসোন্দর প্রভু নব জলধর ॥
লক্ষি সরেস্বতি রামের দেখে দুই ভিতে।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্ম ধরে চাড়ি হাতে ॥
মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোন্দর।
বদন সোন্দর চারু জেন সসোধর ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ পটমুঞ্জরি রাগ ॥

অএ ভরথ ভাই তোমা সম বির নাই
সিতার কথা কহি তোমার ঠাই।
দণ্ডকা কানন পথে সঙ্গে লক্ষন তাথে
সোকাকুলি সিতাকে হারাই ॥
মোহারাজা বালি মারি সুগ্রিব রাজা সঙ্গে করি
তবে পাইলুম পবনকুমার।
গেলাম সমুদ্র কুল সোকে ভোকে ব্যাকুল
অতি বড় গহন সাগর ॥
বানমুখে অগ্নি জলে সর্ব্ব জল উথলে
মৎস যাদি কুম্ভির অপার ॥
সমুদ্রের দরসন সাগর কৈল বন্দন
লঙ্কাপুরি করিল প্রবেস ॥
লঙ্কাপুরি কৈল স্থানা রাক্ষসেরে দিল হানা
সংহারিল রাক্ষস সকল ॥
রাবন বিনাস কৈল দেববরি ঘোচাইল
বিবিসন করিল আস্বাস।
সিতা কৈলুম উর্দ্ধার সকলের নিস্তার
অগ্নিতে সিতা করিল প্রবেস ॥

মুর্দ্ধ কৈল হুতাসন সাক্ষি দিল দেবগন
ব্রহ্মা য়াসি কহিল বচন।
আসিয়া জে দসরথে সমর্পিল মর হাতে
তবে সিতা করিলুম গৃহন॥
কোন পক্ষে নাহি উন সিতার জতেক গুন
দোস কিছু য়ামি নহি জানি।
মুই হইলুম লোকবস সিতার হইল যপজস
বহু দুক্ষে য়ানি সিতা রানি॥
হেন সিতা বনবাস জিবনের নাহি য়াস
দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার।
মরিমু সিতার সোকে উপাএ বোলহ মকে
সোকসিন্দু না দেখি নীস্তার॥
শ্রীরাম ভরথ কথা মনে বড় লাগে বেথা
কান্দে রাম ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সরেস্বতির চরন সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥•॥(পৃ• ৭৩।২)

কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। (পৃ• ৭১।১—৭৮।১)।

নাচারি॥

য়াইল মুনি ঘরএ সিতা নাহি নিজালএ
দেখিলেক সর্ব্বএ ভূবন।
পুষ্পরথ বির্দ্দমান দেখিল য়াপনা স্থান
য়স্ত্র সব করে য়বরন॥
দেখিলুম বেবহার ব্যাজ না করিব য়ার
সিসু পাঠাইয়া দিল স্থানে।
মোহামুনি মোহ পাইয়া তপবনে গেল ধাইয়া
য়স্ব এক দেখিল কাননে॥
বাল্মিকে য়াকুল হইল য়স্তে বেস্তে ধাইয়া গেল
দেখিলেক য়গ্নির নিকট[১]।

কুসলব সঙ্গে সিতা পুরিবারে চাহে তথা
প্রচণ্ড জালিয়া মোহানল॥
হেন কালে মোহামুনি ডাকে উর্চ্চসর বানি
কুসলব বলিয়া জানকি।
ধাইয়া গেল হস্তে বেস্তে ধরিল সিতার হস্তে
নিরব হইল মুনি দেখি॥
বাল্মিকে কহেন কথা কহ মকে তত্য কথা
এতেক প্রমাদ কি কারন।
বনে য়াইল কোন জন কিবা হেতু হইল রন
কেবা য়াইল অগ্নির স্মরন॥
সকল কহিল তত্য দ্বারে দেখি কার রথ
য়স্ত্র বস্ত্র কার য়লকার।
গৃহে কেনে ভিন্য রিত কেবা তোমা দিল ভিত
কিবা হেতু চাহ মরিবার॥
সুনিয়া মুনির কথা কান্দিয়া কহিল সিতা
দুই সিসু ভএ কম্পবান।
জোড় হস্তে লব কুসে দাড়াইল মনির পাসে
কহে সিতা সর্ব্ব বিবরন॥
তোমার গমনকালে এই দুই ছাওয়ালে
বলিলা য়াথিতে তপবন।
মর কর্ম্মের দোসে প্রভুর জজ্ঞ য়বিলাসে
এথাএ য়স্ব করিল গমন॥
তপবনে ঘোড়া য়াইল সিসু পাইয়া বান্দিল
ঘোড়ার য়ক্ষক সক্রগন।
বিচারিয়া পাইল ঘোড়া দুই সিসুর খুড়া
তপবনে হইল দরসন॥
কুস লবে না জানিল অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল
সেই তাকে করিল নিধন।
সুনিয়া লক্ষন য়াইল সিসু তাকে নিপাতিল
ভরথ য়াইল তার পাছে॥

১। নিজড় হইবে।

১। কহিবে হইবে।

ভ্রাতিবধ প্রভু সুনি আসিলেক য়াপনি
রাক্ষস বানর সন্য লৈয়া ।
প্রভুরে মারিল রন সুগ্রিব য়ার বিবিসন
সেই রথে আইল চড়িয়া ॥
য়খনে জানিল কাজ পিত্রি বদি পাইল লাজ
দুই সিসু ভাবিল মরন ।
মনের সান্তাপ গেল তোমা দরসন পাইল
যখনে পরিমু হুতাসনে ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১১৪।১-২)

শেষ,—

বার্ত্তা পাইয়া পুর্ব্বের জত প্রজার সন্তুতি ।
অন্তর্দ্ধাত হইয়াছে কুস জে নৃপতি ॥
এই বার্ত্তা পাইয়া লোক হরিস য়ন্তর ।
সত্যরে আনাইল লোক অর্জ্জা নগর ॥
জার জেই অধিকারে বসিল প্রচুর ।
পুরি বেরি লোক য়রন্য হইল দুর ॥
নানা বার্দ্দ মোহৎ[সব] অর্জ্জা নগরি ।
কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ব্ব জনে পরি ॥
জার জে অ[া]শ্রমে গেল জত মুনিগন ।
ভ্রাতিগন ডাক রাজা আনিল সত্যর ॥
লোকে চিন্তা পাইলে হইব অরাজ ।
দেসে দেসে চলি জায় না করিয় ব্যাজ ॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতিগন ।
সকলে করিল তান চরন বন্দন ॥
একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন ।
আলিঙ্গন দিয়া কৈল ললাটে চুম্বন ॥
জার জেই নিজ রাজে চলিল সত্যর ।
অর্জ্জার রাজা হইল কুস ধনুর্দ্ধর ॥
এই মতে নিতি বার্দ্দ নারদে দেখিয়া ।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে সকল কহিয়া ॥
কুসের চরিত্র ধর্ম্ম সুনিল লক্ষন ।
হরিস হইল তবে শ্রীমধুসোধন ॥
বাল্মিকে রচিল সপ্ত কাণ্ড রামায়ন ।
সুনিলে নিকটে নাহি দারুন সমন ॥
সর্ব্ব পাপ হরে রামনাম স্মরনে ।
মৃগ পলাএ জেন ব্রের্ঘ দরসনে ॥
সর্ব্ব দেব হতে শ্রেষ্ট বিষ্ণু এক নাম ।
তাহা হতে শ্রেষ্ট হএ রাম এক নাম ॥
রাম হেন নাম জেবা স্রবনে সুনএ ।
ভবসিন্ধু তরিব সেই জমের নাহি দাএ ॥
গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম ।
[তাহাতে বস]তি করে কির্ত্তিবাস নাম ॥
সেই কির্ত্তি কহে করি রামরসে ধন্দ ।
বাল্মিক শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ [বন্ধ] ॥
রচিলেক কির্ত্তিবাস রামায়ন সপ্তকাণ্ড ।
এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্রা কাণ্ড ॥

ইতি উত্রা কাণ্ড [সমাপ্ত] ॥ * ॥ ইতি সন ১২০৫ তেরিখ ১০ পোউস...সহক্করং শ্রীমানিক্য দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম ছান্দিয়া...পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীবেনুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীজহু দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে শ্রী ভঙ্গ দাস । সাত পুরুস ঃ কস্তব গোত্র ॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবার ॥ কোন গদাধর প্রিয় গদাধর ॥

জএ জগনাথ গৌরাঙ্গ সচির নন্দ[ন] ।
ত্রিভুবনে করে জার চরন বন্দন ॥
রাম অবতারে গোড়া রাবন বদিলা ।
নদিয়ার ভকত সব গোপ সিরজিলা ॥
রাইর ভাবে গোড়া গৌর অবতার ।
হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়া প্রচার ॥

...য় বোসে কহে জোড় করি হাত।
...ই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই জগনাথ।। * ।।

১১৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ।।
আরন্যাতে জানকি হারাএ মহাসয়।
কিস্কিন্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয়।।
সুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার।।
এই ছয় কাণ্ডের কথা উত্তরায় গায়।
উত্তরা সুনিলে রস্বমেধের ফল পায়।।
রাবন বধিআ অজধ্যায় আইলা রাম।
উত্তরায় প্রথম হয় লক্ষন ভোজন।।
সভা কোরি অজধ্যায় বোসি রোঘুবরে।
রামে ঘেরি বোসে জত ভোল্যুক বানরে।।
রাক্ষস মানুস কোপি বোসে একাসনে।
অপূর্ব্ব রামের কির্ত্তি এ তিন ভুবনে।।
সিংহাসন উপরে বোসিএ রোঘুমুনি।
বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি।।
চামর হাতে দাণ্ডাইএ ভরথ সত্রুঘ্ন।
করজোড়ে স্তুতি করে পবননন্দন।।
ছত্র হস্তে নছমন দাণ্ডাএ পশ্চাতে।
রাজকর দেয় প্রজা রামের অগ্রেতে।।
পূর্ব্ব সত্তে পায় হোএ নিদ্রা আর অলস।
আকর্সে লক্ষন বির হোইলা অবস।।
পশ্চাতে দাণ্ডাএ ছিল সুমিত্রাসন্তান।
ছত্র টলে লক্ষন হোইল সাবধান।
পূর্ব্বকথা স্থিতি করে গোউর বরন।
মৃদু মন্দ বদনেতে হাসিলা লক্ষন।।
পোড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে।
আশ্চর্য্য লাগিএ গেল সভাকার মনে।।
কি হেতু লক্ষন হাসে না পারি বুঝিতে।
সকলে বিচার করে আপনার চিতে।।
মনে মনে চিন্তা করে রাজিবলোচন।
আমারে দেখিএ বুঝি হাসিলা লক্ষন।।
চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অজধ্যাতে।
রাজ্জের রাজা হোলাম আমি সভাই থাকিতে

মধ্য,—

অগস্তেরে জিজ্ঞাসা করেন রোঘুবর।
কহ মুনি কি কোরিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
মুনি কন রাঘব কথাতে দেহ মন।
কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন।।
মোধু মাসে বসন্ত বাসাত উপনিত।
কুহু কুহু রবেতে কোকিল গায় গিত।।
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা লাথে লাথে।।
পূর্নমার জোস্না তাথে অতি মনহর।
সুগন্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর।।
না পেএ পৃকিতি রাজা বসে দু[ঃ]খ মনে।
রম্ভা নামা অপচ্ছরা চোলেছে সর্ব্বজানে।।
কুটিল কুন্তলে দির্ঘ বেনাএছে বেনি।
বেনির গঠন জেন কালিএ নাগিনি।।
লল্বাটে সিন্দুর জেন ভানু নিন্দা করে।
চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে।।
মৃগমদ তিলক নাসার অগ্রে রেখা।
ইন্দ্রধোনু ভুরুভঙ্গি শ্রবনেতে ঠেকা।।

নয়ন ভঙ্গিমা জেন খঞ্জন চঞ্চল।
অধরের জুতি জেন পক্ক বিম্বফল ॥
গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে।
বিদ্যুত লোটায় কত হাঁসির হিল্ললে।
জিনিএ হস্তিনিকুম্ভ প্রয়ধর ভার।
তথিমাঝে লম্বিত হোএছে মুক্তাহার ॥
মৃগপোতি নিন্দা কোরি কোটি ঔতি খিনি।
খুদ্র ঘুন্টিকা তাথে বাজিছে কিঙ্কিনি॥
বিচিত্র কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে।
কাঞ্চনপব্বত জেন ঝাপে ইন্দ্রজালে ॥
রামরম্ভা জিনি উরু ঔতি মনহর।
মুধা মুকিরন জিনি লাবন্য মুন্দর ॥
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্ন্ন ভুনি।
চন্দ্রেরে ঘেরেছে যেন নব কাদম্বিনি ॥
মোহএ মহেসরিপু পেএ অঙ্গগন্ধ।
সটপদ্ম ধাইএ আইসে মকরন্দ ॥
তিমির কোরিএ ধংস বোমপথে জায়।
বোসেছিল দসানন দেখিবারে পায় ॥
(পৃঃ ৬৫।১-২)

• •

সোত্রুঘ্ন কাছে জথা বোসি মুনিবর।
বাল্মিক ডাকিছে গিএ কোরি উর্চ্চস্বর ॥
জজমান জন্মীআছে সিঘ্র এস মুনি।
বোসিষ্ট কোরিল জাত্রা আদ্যপান্ত জানি ॥
আনন্দে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
কুটির দুআরে গিএ দিল দরসন ॥
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে।
বাহির কোরিএ আনে মুনিপোত্নিগনে ॥
জেমন রামের মুখ জেমন নয়ন।
জেমত রামের বর্ন্ন জেমত গঠন ॥
বাল্মীকি বোসিষ্ট দোহে একত্রে বোসিএ।
স[ং]গস্কার হেতু জুক্তি বেদ উচ্চারিএ ॥

আনহ গঙ্গার জল করাইব স্নান।
মুনিএ বাল্মীক মুনি মুদিল নয়ন ॥
জোগাসন কোরিএ বসিবামাত্র মুনি।
সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গা মন্দাকিনি ॥
জার্হ্নবি কোহিছে তবে মুন মুনিবর।
আজ্ঞা হৈলে প্রবেসিএ মুতিকার ঘর ॥
উপনিত হৈল গিএ গঙ্গা মন্দাকিনি।
আমি আসিআছি মা জনকনন্দিনি ॥
হেনকালে কুবেরদুত এল্য সেই স্থানে।
প্রনাম কোরিছে আসি মুনির চরনে ॥
আনিআছি সর্ন্ন থাল তুয়া বিদ্যমান।
রামচন্দ্রের পুত্রে ইহায় করাইতে শ্রান ॥
বোসিষ্ট গোসাই পরে বেদ উর্চ্চারিএ।
কোরিলেন নাড়িছেদ আপনে জাইএ ॥
পুত্র কোলে কোরি মাতা জনককুমারি।
কোন্নায় রোদন করেন বোসিষ্টকে হেরি ॥
এ মুক জোদ্যপি আজ হোত অজধ্যায়।
ঘুচিত মনের খেদ মুধাই তোমায় ॥
রামের মনেতে কত জন্মীত আনন্দ।
রত্তন ব্রাহ্মনে কত দিতেন রামচন্দ্র ॥
আমা সম হতভাগি আর কেবা আছে।
মুনিএ বোসিষ্ট কয় জানকির কাছে ॥
আর কেন চিন্তা কর জনকনন্দিনি।
ভাগ্যবতি তুমি বট আমি ভালে জানি ॥
রাজার রানি ছিলে রাজার মা হৈলে জনকঝি।
সন্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি ॥
মুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাস।
উত্তরাকাণ্ডের কথা রচে কিত্তিবাস ॥
পরেতে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
সত্তুঘ্ন নিকটেতে দিল দরসন ॥
বোসিল বোসিষ্ট মুনি সোত্তুঘ্ন কাছে।
অধমুখে বোসি বির মৌন হোএ আছে ॥

জিজ্ঞাসা কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে।
সন্দেহ আমার এক জন্মিআছে মনে॥
সুয্যবংসের পুরহিত এই মাত্র জানি।
আর তুমার জজমান কিরূপ আছে মুনি॥
মুনিএ বোসিষ্ট মুনি লাগিল হাসিতে।
তপবনে মুনিগনে হয় জজাইতে॥
সোত্রুঘ্ন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়।
এক মত আমার মনেতে উদয় হয়॥
পঞ্চ মাস গর্ব্ভবোতি জনকনন্দিনি।
হেন কালে বনবাস দিল রোঘুমুনি॥
এই মত বনবাস সুনেছি শ্রবনে।
জানকিকে রেখে গেছে বিষ্টপদার বনে॥
ভাগ্য বুঝি প্রসন্য হোইল মুনিবর।
সোত্য কথা জিজ্ঞাসিএ তোমার গোচর॥

(পৃঃ ১১৬।১-২)

ত্রিপদি ছন্দ॥ রাগ পঠমঞ্জরি॥

হনুমান জত কহে কৌসল্যা মৌনেতে রহে
কতক্ষনে কোহিছেন রানি।
দুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল
মুখে কয় অর্দ্ধ অর্দ্ধ বানি॥
এস হোনু বোস কাছে বোহু খেদ মন্মে আছে
সকল কোহিব বিস্তারিএ।
মোরে দুখার্নবে ডারি অজর্দ্ধা আন্ধার কোরি
সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ॥
রাবন সংহার কোরি রাম হৈল দণ্ডধারি
পাটেশ্বরি হৈল জনকঝি।
এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় দুখিনির আখি
সুখ জত সোখা কর কি॥
পঞ্চমাস গর্ব্ভবোতি হোইলেন সিতে সোতি
বাড়ি গেল দুগুন আনন্দ।
পঞ্চামৃত দিবার তরে আনিলাম দিজবরে
প্রমাদ ঘটাল্য রামচন্দ্র॥
কে জানে কার মুনি কথা রথে কোরি লএ সিতা
প্রকার কোরিএ দিল বন।
রাম আজ্ঞা ধোরি মাথে চাপিএ পুষ্পক রথে
বনে রাখি আইল লক্ষন॥
কি কোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সার
সিতে বিনে সব সর্ন্ন দেখি।
কর হানি বোক্ষপরে কৌসল্যা রোদন করে
কোথা রৈলে জিবন জানকি॥
হনুমান মুর্ছা হএ ভুমে পড়ে গড়াইএ
হায় রানি কি সুনালি মোরে।
হায় মা জনকঝি উপায় কোরিব কি
হনুমান কান্দে উচ্চস্বরে॥
হোনুমান গোচরে কৌসল্যা প্রবধ করে
কোপে বির ছাড়এ নিস্বাস।
জলধ গজ্জন জিনি নিশ্বাস আতসর্দ্ধনি
*রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥ * ॥*

(পৃঃ ১৩০।১-২)

শেষ,—

ব্রর্থ হনুমান নাম অঞ্জনা গর্ভেতে।
রসাতল অজর্দ্ধা পাঠাব পদাঘাতে॥
পুনর্ব্বার জানকিকে অজর্দ্ধায় আনিব।
পুত্র বোটি জননির পালন কোরিব॥
ইহা কোহি হোনুমান কোরিল গমন।
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন॥
পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল।
নয়নে নিগ্রত হয় জলন্ত আনল॥
নাসার নিস্বাস জেন প্রলয়ের ঝড়।
ঢাকের রগড় জিনি দন্ত কড়মড়॥
সভা মাঝে জাইএ ডাড়ায় হনুমান।
দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান॥
হনুমান জিজ্ঞাসে সুনহ নিল দে।
এমন দুর্ব্বর্দ্ধ তোমায় ঘটাইল কে॥

হনুমান গরবোতি আছিলেন সিতে।
উপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে॥
অধিক আর রামচন্দ্র তোমা'র কব কি।
কাথা হোতে কর্ন পেতে মন্ত্র লএছি॥
তাস্তর বুঝি তবে উঠি রোঘুনাথ।
উঠিএ ধরেন দুটি হোনুমানের হাত॥
যা হোএছে হোনুমান খেমা দায় মনে।
আছেন জনকষুতা বিষ্টুপদায় বনে॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ কোরি আনিব সিতায়।
পুনরূপি হব রানি পুরি অজধ্যায়।
দেবের ঘটন বাছা কে ঘুচাতে পারে।
দুষ্ট বাক্যে বনবাস দিলাম সিতারে॥
না জানে এ সব তত্ত্ব জত কোপিগন।
জনকনন্দিনি সিতায় গিএছেন বন॥
সুবর্ন্ন জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে।
[এ] তত্ত্ব জানি রোদন করএ সর্ব্ব জনে॥
হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন।
ঝর ঝর ওস্তজলে ঝুরে দুনয়ন॥
স্তব্ধ হোএ সভাতে বোসিল হোনুমান।
সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোরে দুনয়ন॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥*॥
বোসিলেন রামচন্দ্র পূর্ন্ন সভা মাঝ।
পুর্ন্নমার চন্দ্রিমা দেখিএ পায় লাজ॥
সোত্রুঘনে আসিবারে লিখিলেন পাতি।
সিঘ্র কোরি জাত্রা করে সুমন্ত্র সারথি॥
পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সমাচার।
ষুত মোধু সাজাইল সহস্তেক ভার॥
অপরঞ্চ দির্ব্ব কত দিল পাঠাইএ।
পশ্চাতে সাজিল বির সসোয়্ন নইএ॥
জয়ধ্বনি দিএ চলে জত সোন্ন্যগন।

১১৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¼×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৬, ৮-১২, ১৮-১১০, ১১২-১৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৪ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

লঙ্কাকাণ্ড গাইল রামের ছত্র নবদণ্ড।
গাইব উত্তরাকাণ্ড অমৃতের ভাণ্ড॥
অমৃত নক্কা জদী খায় ভাণ্ড ভাণ্ড।
তাহা হইতে পৃত হয় সুনিলে উত্তরাকাণ্ড॥
ত্রৈলোক্যবিজয় রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া রাম আইল ঘর॥
মুনি সকল বলে আমরা পাইলাম পরিত্রান।
অজুধ্যাতে গিয়া রামকে করিব কল্যান॥
এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন।
চারি দিগের মুনি আইল অজুধ্যাভুবন॥
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের দুয়ারে।
মুনি বলে সংবাদ জানাও রামের গোচরে॥
মাধব নামে দ্বারি রামে নয়াইল মাথা।
তোমা দেখিতে মুনি আইল তার সুন কথা॥

মধ্য,—

শ্রীরাগেন গিয়তে॥

সিতার সোকেতে রাম ভুমে গড়াগড়ি জান
কোথা গেল সিতা চন্দ্রমুখি।
প্রানের দুর্ল্লভ সিতা নাহি সিতার মাতা পীতা
কিবা দোসে তেজিল জানকি॥
রাজার ঝিয়ারি হয়্যা মোর সঙ্গে বনে গিয়
কতেক বনেতে পাইল দুঃখ।
দারুন রাক্ষস ঔরি তোমারে করিল চুরি
বিপিনেতে নাহি হল্য সুখ॥

সবংসে রাবন মারি তোমার উর্দ্ধার করি
পরিক্ষা লইল লঙ্কায়।
শুদিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘোষে
পামরে পিতিত নাহি জায় ॥
সিতা ত পরম সতি স্বরুপে জানিয়া মতি
লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি।
ঘোর দণ্ডক বনে থুয়্যা আইলে লক্ষনে
কেমনে রহিবে একাকিনি ॥
প্রানের লক্ষন ভাই সিতা থুয়্যা এলি কোন ঠাঞি
জাব আমী সিতার তল্লাসে।
কৌতুক ইঙ্গিতে আমী বুঝিতে নারিলে তুমি
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে ॥
সরিরে নাহিক দয়া সিতাকে নাহিক মায়া
কোথা সিতা পরম সুন্দরি।
চন্দ্রবদনি বিনা কিছু ত না লয় মনে
সোকে প্রান ধরিতে না পারি ॥
সজল লোচন হরি লোহে ঘন বহে বারি
উত্তরি[ল] পরিহরি মহি।
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবভয়
চরনে স্বরন আমী চাহি ॥*॥
লক্ষন কি নিদ্রা রহিব আমী ঘরে।
না দেখিয়া সিতা সতি প্রান কি জান করে ॥
সিতা সিতা বলিয়া রাম পড়িল ভুমিতলে।
সিতার সোকেতে কান্দেন প্রান ব্যাকুলে ॥
কোথা গেলা প্রানসিতা দেহ দরসন।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরে জিবন ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
লক্ষ্মন বলেন গোসাঞি কান্দ কি কারন ॥
লক্ষ্মন বলেন প্রভু কিসের বিলাপ।
প্রজা লয়্যা রাজ্য কর কিসের সন্তাপ ॥
মন স্থির কর গোসাঞি না হও চঞ্চল।
সোক সম্বর গোসাঞি না হও বিকল ॥
এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস।
উত্তরায় রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥*॥

(পৃ০ ৭৮।১-২)

৯৬।১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ আছে।

শেষ,—

বাল্মিক বন্দিয়া গান লব কুশে গায়।
গাইব অজুধ্যাকাণ্ড আদিকাণ্ড সায় ॥
সুখে রাজ্য করে রাজা অজের নন্দন।
মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শত্রুঘন ॥
রামে রাজ্য দিতে হইল রাজার অভিলাস।
রাজ্য না পাইলা রাম গেলা বনবাষ ॥
রাম বনে গেলা তবে কান্দে সর্ব্ব জন।
সোকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ ॥
মধুস্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিনা।
সুনিয়া কান্দেন রাম আর সর্ব্ব জনা ॥
গান সুন্যা রামচন্দ্র হইল বিভোলা।
গায়কে আনিয়া দেহ সনা সহস্র তোলা ॥
ভাণ্ডারি বাটায় কর্য্যা আনি[ল] কাঞ্চন।
গিত রহাইয়া কর্ন ভাই দুই জন ॥
গুটী চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে।
তোমার ধন রাখগা রাম তোমার ভাণ্ডারে ॥
রাম বলেন গান কর মুনির নন্দন।
ভাল পুরান কর্য্যাছেন বাল্মিক তপধন ॥
রাজার সংকার আজ্ঞা করিল ভরথ।
রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্ব্বত ॥

১২০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৮৭। এক এক পৃষ্ঠায়

০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০০ সাল। ণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

হাথে দণ্ড কুমণ্ডলু সর্ব্ব গাত্র রুক্ষ।
তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ॥
অনাহারে থাকয় কেহ বরিষা চারি মাষ।
কোন মুনী সর্ব্ব কাল থাকয় উপবাষ॥
দস সংস্র বচ্ছর কেহ করিছে অনাহার।
অস্তবাড় লাগীয়াছে অস্তী চর্ম্ম সার॥
এত সব মুনী আসীছে তোমার দুয়ারে।
আজ্ঞা কর আনী গোসাঞী তোমার গোচরে॥
রাম বলেন ঝাঁট আন দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্ভাষন॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্তর।
মুনি সব লইয়া গেলা রামের গোচর॥

মধ্য,—

জমের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কুলিল।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর গোচরে॥
তোমার বিদ্যমানে দেবি দেবতা সংহারে।
রাবন মারিয়া দেবের কর প্রতিকার॥
চৌসট্টি জোগিনি আছে দেবির সংহতি।
জুঝীতে জোগীনি সব বড় সিগ্রগতি॥
জুঝিতে জোগিনি সব নানা কাছে কাছে।
রক্ত মাংস খাইয়া উন্মত্ত হইআ নাচে॥
দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে।
সতে সতে রাক্ষস একেক জোগীনি সংহারে॥
রাবন বলে চণ্ডী তুমী কর অবধানে।
জুদ্ধ সমপীয়া তুমী চল নিজস্থানে॥
আমারে জীনিলে তোমার কীছু নাহি কাজ।
তুমি হারিলে চণ্ডী বড় পাবে লাজ॥
রাবনের কথা সুনিঞা চণ্ডীর হইল হাস।
জুদ্ধ সমপিয়া দেবি গেলেন কৈলাস॥

ইত্যাদি (পৃঃ৩৮।২)

শেষ,—

রথ লইয়া গেলা ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
সর্ব্বসম্পদ পায়ে লোক রামনাম স্মঁরনে॥
সরজুর জল গম্ভির পর্ব্বত প্রমান।
সকল সুখাইয়া হইল আঠুর সমান॥
স্থাবর জঙ্গম জত জলের উপর ভাসে।
শরির তেজিয়া লোক গেলা স্বর্গবাসে॥
দিব্য রথে জায়ে সভে দেবদেহ ধরি।
রামের প্রসাদে লোক গেলা স্বর্গপুরি॥
মরনকালে রামনাম বলিব জেই জন।
নিজ শরিরে স্থান তারে দেন নারায়ন॥
ভক্তি অনুরূপ স্থান অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দ লোক পায়েত নিস্তার॥
সকল পৃথিবির লোক গেল স্বর্গবাস।
এতেক দেখিয়া ব্রহ্মাঞে লাগিল তরাস॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করেন স্তুতি।
তোমার নাম স্মরনে গোসাঁঞি পাপির মুকতি॥
আগম পুরান বেদ জত সাস্ত্রগ্রন্থ।
আমি হেনো কোটি ব্রহ্মা না পাইল অন্ত॥
সকল পাপ ঘুচে রামনাম স্মরনে।
পাপমৃগ পালায়ে জেন সিংহ দরসনে॥
চারি বেদ সহস্র নামে জত হয়ে ফল।
এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল॥
রাম নামে রাখিবেক সহস্র ধনুকে।
মাএয়ামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত লোকের চিন্তি হিত।
লোক মহিবারে কৈলা রামায়ন গিত॥
সাত কাণ্ড পুথি কৈলা অমৃতের ভাণ্ড।
সুনিলে খণ্ডে লোকের জমপিড়া দণ্ড॥
রামনাম স্মরন করিআ মরেত চণ্ডাল।
সেঁাশরিরে স্বর্গ জায়ে জর্ম্ম নাহি আর॥

অতয়েব সুন লোক হইয়া একচিত্ত।
অন্য মন ইহাতে না করিবে কদাচিত ॥
সুন সুন আরে ভাই হইয়া একমন।
এত দুরে উত্তরাকাণ্ড হইল সমাপন ॥

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত মিল আছে।

১২১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১, ৫৮-৭৩। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

লব কুসের জুর্দ্ধ লিক্ষিতে ॥
বসিষ্ঠ বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি।
শ্রীরাম ডাকিয়া আনিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি ॥
অশ্বমেধ করিলা রামচন্দ্র গদাধর।
জজ্ঞের ঘোড়া পাঠায়্যা দিয়াছিলা পুরন্দর ॥
মন্ত্রিগনে ডাকিয়া প্রভু রাম রধিপতি।
মুনিগন সঙ্গে লয়্যা করিলা জুগতি ॥
রাম বলেন ঘোড়া কেবা রাখিবেক জতনে।
তোমা বিনে ঘোড়া রাখিতে নারিব অন্য জনে ॥
ঘোড়া রাখিতে নিজোজিলা ঠাকুর লক্ষনে।
জজ্ঞসালে রামচন্দ্র করিলা গমনে ॥
লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার রাদেসে।
বৎসরেক ভ্রমিব রামি ঘোড়ার জে পাসে ॥
নির্ভয় দান মোরে দেহ মহাসয়।
পরম সুখে বেড়াই জেন হইয়া নির্ভয় ॥
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে।
নির্ভয়ে বেড়াব গোসাঞি কেমন সাহসে ॥
লক্ষনের বচন সুনিঞা হাসেন রঘুনাথে।
জয়পত্র লিখিয়া দিলেন লক্ষনের হাথে ॥
এই পত্র দেহ লয়্যা ঘোড়ার লল্লাটে।
জুর্দ্ধ করিতে জেন কেহো নাঞি র্যাটে ॥
শ্রীরামের রাজ্ঞা পায়্যা ঠাকুর লক্ষন।
করিতে লাগিলা তেহো ঘোড়ার সাজন ॥

মধ্য,—

১৯।১, ২২।২, ২৩।২, ২৪।১, ২৪।২, ৩০।১, ৩১।১, ১৭।২, পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

রাগ পাহিড়্যা।

আরে বাছা রার না জাইহ তপোবনে।
জানিঞা সুনিঞা মুনি কেনে দিলেন মেলানি
ঘরে বসি থাক দুই জনে ॥
পুর্ব্বে বিষ্ণু রারাধিয়া প্রিথিবিতে জর্ম্ম লয়্যা
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে।
পিতা বড় নিদারুন করিল দারুন পন
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে ॥
প্রভু দেব নারায়ন এক রংসে চারি জন
ভারথে দুর্ল্লভ জার নাম।
অগোচর চারি বেধ সম নহে অশ্বমেধ
জার নাম লইলে ধর্ম্ম মোক্ষ কাম ॥
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতি
বিধি মোরে করিল নৈরাস।
নাঞি কৈলাঙ অপরাধ দারুন লোকের বাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস ॥
তোমা দুঁহা উদরে ধরি আইলাঙ বনপুরি
না দেখিলাঙ প্রভুর চরন।
তোমা দোহার দেখি মুখ পাসরিলাঙ সব দুখ
সকল দুখ করিলাঙ পাসরন ॥
দাস দাসি জুথে জুথে গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর রাজরার্জ্জেশ্বর।

তোমরা তার তনয় নাঞি দিহ পরিচয়
সঁাপিবেন বাল্মিক মুনিবর ॥
ছুই পুত্রের ধরি হাথে দিলেন য়াপন মাথে
মোর বোল না করিহ আন।
রামে বলিহ উর্ত্তর না বলিহ দুরাক্ষর
মোর বোলে হবে সাবধান ॥
জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয়
সপ্ত মত্র পাঠাইলা বনে।
ছত্র দণ্ড অধিবাস হেন কালে বনবাস
সম্মানে রাখিহ হনুমানে॥
সুনিঞা মাএর ঠাঞি দোহে দোহা পানে চাই
লব কুসে লাগিল তরাস।
বিস্ময় লাগিল মনে দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে
নেচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥*॥
(পৃঃ ১৮২-১৯।১)

শেষ,—
শ্রীরামের অনুচর সব ব্রহ্মার বচন সুনে।
সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্বঁওরনে॥
দুগ্ধ পানেতে জেন সিন্ধুর মোন ভাসে।
শ্রীরাম স্বঁওরনে প্রান ছাড়িয়া রহিলা স্বর্গবাসে॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজিল শ্রীরাম য়বতার।
ব্রহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার॥
চিন্তিয়া গুনিঞা বাল্মিক পাঠাইল স্বরেস্বতি।
তাহাঁর প্রসাদে রামায়ন কৈল বাল্মিক মহাঁমতি॥
পাঠক পোঁথা পড়ে কথক বাখানে।
পোঁথা সুনিবার বেলায় ঘুম য়াদিষ্টানে ॥
কির্ত্তিবাস সৃজিল গিত সুনিতে মোধুর।
জাহার গিত সুনিঞা পাপ জায় দুর ॥
তালে সবদে বাজে নপুর ঝন ঝন।
গিত নাচন সভে সুন রামায়ন ॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা।
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় প্রিথিবির রাজা॥
নানা সম্ভ নানা ধনে বৈস্বের বাড়ে ঘর।
সুদ্র জাতি সুনিলে হয় পুন্ন বিস্তর ॥
সংসার মোহিয়া কির্ত্তিবাসের পাঁচালি।
রামায়ন সুনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি॥
হেন কির্ত্তিবাসে কল্যান করুন দেবগন।
উর্ত্তরকাণ্ড গাইল শ্রীরামের স্বর্গকে গমন ॥
শ্রীরামের চরিত্র জে জন সুনে একমনে।
সর্ব্ব দুর্খ খণ্ডে তার শ্রীরামের কোল্যানে॥
চিনি লবাত সংকারা পিয় ভাণ্ড ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উর্ত্তরকাণ্ড ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে।

১২২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—
দেবসভা রাজসভা আর মুনিগন।
বসিষ্টেরে করিলা রাম জজ্ঞের বরন॥
হোতা হৈল বসিষ্ট ব্রহ্মা পর্দ্দমুনি।
আপোনে সদষ্য হৈল দেব সুলপানি ॥
সিব পরে পরিলেক সদস্তের ভার।
আপোনে ব্যাষমুনি হইল তত্রধার॥
অগ্নি জালিয়া দিল ব্রহ্মা কুণ্ডের মাঝার।
ভারে ভারে জজ্ঞকাষ্ট বিভিন্ন প্রকার ॥
ভারে ঘ্রত ঢালে জেন ঢালে জল।
কুণ্ডমধ্যে বসিলেক আপনে আনল ॥
বেদমন্ত্র পরিয়া মুনি দিয়াছে য়াহুতি।
আহুতি লইয়াছে অগ্নী সপ্ত জিভর্ভা পাতি॥

... আরম্ভ।
... কর্ম্ম ॥
... মুনিগন।
... মুনিয়ে বরন ॥
একচিত্ত হইয়া ভাই সোন আমার কথা।
সোবর্ন্নের তৈজষ দেও সোবয়ে ... .. ॥
মন্দ জেন না বোলে জতেক ব্রর্হ্মনে।
এক ভার সোনা দিবা প্রতি জনে জনে ॥
আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রর্হ্মন।
তাহার ঘরে দিবা ভাই নানাবিধি ধন ॥
আজ্ঞাএ করীলা কার্য্য ঠাকুর লক্ষন।
আগে বিদাএ করিল দারিদ্র ব্রর্হ্মন ॥
ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে।
আপনে কুবির জাহার ভাণ্ডারে ॥
ধন করি আদী বিপ্র করিলা বিদায়।
মুনির বরন লইয়া আসীল সভায় ॥
সোনার থাল সোনার গারু সোনার অলঙ্কার।
এক গোটা সোনার পৈতা সোনা এক ভার ॥
এক জোরা পট্টবস্ত্র জরিত কাঞ্চন।
সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন ॥
বরনের জত দিব্য হনুমানের হাতে।
গমন করিলা বির লক্ষনের সাতে ॥
হনুমানের সঙ্গে লক্ষন সভামধ্যে গেল।
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল ॥
বরনদির্ব্ব লৈয়া পাছে পবননন্দন।
মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন ॥
কোন মুনি উর্দ্ধবাহু কেহ উর্দ্ধরেতা।
কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাহী কথা ॥
কার জটা বিগলিত কার জটাভার।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সুমীত্রাকুমার ॥
ভাবিতে লাগিল লক্ষন আপোনার অন্তরে।
এক হতে আর কম নহে মুনিগন।
কারে থুয়া কারে দিব বরন আসন ॥

কর্ম্ম কার্য্যকালে বিধি এত আপদ ঘটে।
লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেকাইলা সঙ্কটে ॥
দণ্ডে দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ।
এতেক বলিয়া লক্ষন করএ বিলাপ ॥

বিলাপ দির্ঘচ্ছন্দ।

ভাবিতে ভাবিতে লক্ষন স্থির নাহী পায়।
এমত সঙ্কটকালে রাম রহীলা কথাএ ॥
নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর।
সঙ্কটে ঠেকিছি তোমার নিজের নফর ॥
আমার কপালের লেখা কি কব তোমারে।
এমন কাজেতে রাম পাঠাও আমারে ॥
বুঝিবারে না পারি তোমার মনের আষ।
আমা হতে হবে বুঝি সুর্য্যবংস নাষ ॥
বাচিয়া নাহীক কার্য্য এখনে না মরি।
আমি বুঝি জর্ম্মীয়াছীলাম বংসনাষকারি ॥
এক মুনি থুইয়া জদি আর মুনি বরি।
জারে না বরি সে সাপীবত করি ॥
কোন মুনি কম নহে দারুন তপস্বী।
কোপমনে সাপ দিয়া করিব ভষ্যরাসি ॥
আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়।
এই ভয় মনে পাছে বংসনাষ হয় ॥
দৈবজোগে এমন কার্য্য হইয়া উঠে জদি।
সংসারে ঘুসিবে লোকে আমার অক্ষ্যাতি ॥
এই কথা লোক সবে করিব প্রকাষ।
লক্ষন হতে হইলেক সুর্য্যবংস নাষ ॥
এতেক বলিয়া লক্ষন কান্দিয়া বিকল।
বুক বাহীয়া পরে ধারা নয়ানের জল ॥
না বরিয়া মুনিগন জদি জাই ঘরে।
এখনে হাসিব মোরে জত মুনিগনে ॥
হাসিয়া কহীবেক কথা জত জত ঋসি।
বুঝিলাম বুদ্ধীবুর্ন্য লক্ষন তপস্বী ॥

এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাত।
এহাতে উপাএ নাহী বিনে রঘুনাথ॥
মরিব মরিব আমী অবষ্য মরিব।
এমন কালে রাম বিনে আর কারে ডাকিব॥
আইষ আইষ রঘুনাথ এই নিবেদন করি।
নিকটে আইষ রামচন্দ্র · দেখিয়া মরি॥
এমন কালে রঘুনাথ রহীলা কথায়।
এমন সঙ্কটে আমার কি হবে উপায়॥
পুর্ব্বে জদি জানিতাম রাম এমত সঙ্কট।
অভাগীয়া না আসিতাম ইহার নিকট॥
জে কার্য্য হইয়াছে এখন উপাএ করি কি।
আসিয়া নফর রক্ষ্যা কর রঘু জি॥
আপোনে আসিয়া রাম কাষ্য দেও সিমা।
নহে কিন্তু জাবে রামনামের মহীমা॥
একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার।
তবে সে হইতে পারে উপাএ য়েহার॥
ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য।
একা আমী সাইট য়ংষ হইয় কেমত॥
সঙ্কটে করহ রক্ষ্যা বন্দু নারায়ন।
এতেক বলিয়া কান্দে ঠাকুর লক্ষন॥
আইজ জদি হইতে পারি য়ংস বাইট হাজার।
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার॥
রঘুনাথের পাদপদ্য মনে করি সার।
এক লক্ষন হইল অংষ সাইট হাজার॥

(পৃ০ ৩।২-৫।১)

শেষ,—

রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা।
কোনখানে আছে বল মোর প্রানের সিতা॥
মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি।
আমার আশ্রমে য়াছে জনকনন্দীনি॥
অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে।
রথ পাঠাইয়া সিতা লৈয়া আইষ দেশে॥
রাম বলে শোন কথা লক্ষন ধানুকি।
সিগ্র করি আন গীয়া প্রানের জানকী॥
আজ্ঞা পাইয়া তপবনে গেলেন লক্ষন।
সিতাকে লইয়া আইস অজোর্দ্ধা ভোবন॥
এতেক যুনিয়া লক্ষন গমন করিল।
শিতাকে লইয়া লক্ষন দেশেতে আশীল॥
জয় জয় সব্দ হইল ভরিয়া সংসার।
বনিতা সকলে মিলি দেয়ন্তী জোকার॥
আগীয়া বরিয়া সিতা নিলেক গ্রহেতে।
জজ্ঞ পুর্ন্ন দিলা রাম সপত্নী সহীতে॥
রাম শীতা মিলন হইল দুই জনা।
আনন্দে করেন রাম জজ্ঞের দক্ষীনা॥
জজ্ঞ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্দ্ধা নগরি।
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি॥
বালমীক পুরানের কথা কিত্তীবাষে কয়।
অজোর্দ্ধাতে পীতা পুত্রের হইল পরিচয়॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জর্ম্ম শুভক্ষন।
এই অবধি হইল অস্তা সমার্পন॥
সভার চরনে মোর এই নিবেদন করি।
রঘুনাথ আনন্দে সভে বলে হরি হরি॥

ইতি বালমীকী পুরানে উত্তরাকাণ্টে পীতা পুত্রের পরিচয় সমাপ্ত।...এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতি বার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম থানে বেষমগঞ্জের উত্তরে জোহরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহীর পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।

১২৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪ ×

৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

····· রাবনের আগুসার ॥
দক্ষিন কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরি।
মহাদেব সন্ন্যাসি[তে] জায় তরাতরি ॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থানে সোনার সরবন।
রথ সঙ্গে তথি গিয়া ঠেকিল রাবন ॥
বনেতে ঠেকিয়া রথ আগু নাহি সরে।
পাত্র মিত্র লয়্যা রাবন যুমুমান করে ॥
মারিচ রাক্ষস আসি রাবনের কানে কয়।
কুবেরের রথে এক রাক্ষ্যস নাহি রয় ॥
রথ এড়িয়া রথ চালায় রথ নাহি নড়ে।
মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়া গেল ডরে ॥
না জানিস রাবন তুঞি কৈলাশ সিথর।
গৌরি লয়া কেলি হেথা করেন সঙ্কর ॥
দেব দানব কেহ হেথা নাহি য়াইসে ডরে।
হেথা কেন রাবন আইলি মরিবার তরে ॥
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে।
রথ হইতে উলিয়া জায় মোহাদেবের স্থানে ॥
নন্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথা দেখে।
হাথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারথান রাখে ॥[1]
বানরমুখ দেখি মোরে কর উপহাস।
এই বানরমুখে তোর করিবে সর্ব্বনাস।
জে(হে)ন ছারে মারিয়া মোর কোন প্রিওজন।
আপনার দেসে তুঞি মরিবি রাবন ॥

শেষ,—

তবে ইন্দ্র রাবনে দুই জনে হই রন।
ঐরাবতে আইল ইন্দ্র বজ্র লইয়া হাথে।
রাবন সাজিয়া য়াইল দিব্ব রথে ॥
ইন্দ্র হাথে বজ্র করি করএ গর্জ্জন।
যুনিয়া বর্জ্জের শব্দ চিন্তিত রাবন ॥
মহাসব্দে গর্জ্জে বজ্র বিক্রম বিসাল।
সব্দ যুনিয়া সর্গ মর্ত্ত কাপিছে পাতাল ॥
ধাইয়া আইল কুম্ভকর্ন্ন আউদর চুলি।
ইন্দ্রের সমুখে গিয়া রহে মহাবলি ॥
কুম্ভকর্ন্ন [বলে] ইন্দ্র আজি জিবে কোথা।
করিব য়মরাবতির নির্মুল দেবতা ॥
বজ্র বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভাঁড়া।
এড় দেখি বজ্র চিবাইয়া করিব গুড়া ॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ন্ন না কর অহঙ্কার।
বজ্র য়স্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার ॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্জ্জ অস্ত্র এড়ে।
দুই হাথে সাঁপটীয়া গিলিলেক য়াড়ে ॥
বর্জ্জ গিলি কুম্ভকর্ন্ন ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখিয়া দেবতা সব গনিল প্রমাদ ॥

১। ইহার পর খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।

১২৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

অথ শ্রীশ্রীরামায়ন উর্ত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে ॥
শ্রীশ্রীহনুমানের বন্দনা আরম্ভ ॥
বন্দিব অঞ্জনাযুন অসিম জাহার গুন
অতিসয় মহাবল হনু।
ফল ভ্রমে সিসুকালে দিবাকর ধরিলে বলে
জেন রাহু গ্রাষে অর্দ্ধতনু ॥
জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির
জয় জয় বির মহাবল

ত্রিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিংএ, প্রাচীন পুথির বিবরণ বেঙ্গল প্রিণ্টার্স দ্বারা, কার্য্যবিবরণ সুধীর প্রেসে এবং মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩২
বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সি আই ই,

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্-সি, এটর্ণি

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি,

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত

১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির-সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ।

দোলযাত্রার উৎপত্তি *

অনেকে মনে করেন, দোলযাত্রা ও বসন্তোৎসব একই। ফাল্গুন-পূর্ণিমা দোলযাত্রার দিন। ফাল্গুন, বসন্ত ঋতুর মাস; পূর্ণিমা চিরদিন হর্ষদায়ক। শীতের অবসানে মধুময় বসন্তের সমাগমে মনের স্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক। গীত ও রঞ্জিত চূর্ণ ও জল-নিক্ষেপ, তাহারই আনুষঙ্গিক ফল। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে দোলযাত্রা, হোলি নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে হোলি একটা মহা উৎসব।

কিন্তু হোলির এই উৎপত্তি-কল্পনায় অনেক বাধা আছে। (১) বসন্ত ঋতুরাজ বটে, কিন্তু সঙ্গে মদন না থাকিলে বসন্তের রাজ্য চলিত না। দোলের একমাস পরে চৈত্রমাসে মদনোৎসব ও কন্দর্প-পূজা। দোলযাত্রা বসন্তোৎসব হইলে পরে পরে দুইটা মদনোৎসব হইবার কারণ পাওয়া যায় না। (২) উত্তরভারতে যেখানে হোলির ঘটা, সেখানে ফাল্গুন মাস শীত কাল। শীতকালে বসন্তোৎসব হওয়া সম্ভব নয়। (৩) যদি দোলযাত্রার উৎপত্তি প্রাচীন মনে করি, তাহা হইলে আরও বাধা। কারণ, প্রাচীন কালে ফাল্গুন মাস শীত ঋতু ছিল। জ্যোতিষীরা যাহাকে অয়ন-চলন বলেন, সেই অয়ন-চলন হেতু ফাল্গুন মাসে এখন বরং শীতের ন্যূনতা হইয়াছে। (৪) দোলযাত্রা একটা নয়, দুইটা। ফাল্গুন মাসের দোলের একমাস পরে চৈত্রমাসে আবার দোল আছে। ইহাকে চৈত্র-দোল বলে, ফুল-দোলও বলে। এই দোলেরও পৌরাণিক প্রমাণ আছে। দোলযাত্রা যদি বসন্তোৎসব হইত, তাহা হইলে পরে পরে একই উৎসব দুইবার হওয়ার কারণ কি? (৫) আরও এক দোল আছে। এই দোল হিন্দোল নামে খ্যাত। চলিত বাঙ্গালায়, ঝুলন। দোল ও হিন্দোল শব্দের অর্থ এক, একই দুল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা ঝুল ধাতু, সংস্কৃত দুল্ ধাতুর অপভ্রংশ। সুতরাং দোল, হিন্দোল, ঝুলন একই, অর্থ দোলন। দোলযাত্রায় মনে করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ দোল খেলা করেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমার রাত্রে এই খেলা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু ঝুলন হয় শ্রাবণ-পূর্ণিমায়। শ্রাবণের ধারায় কার দোলখেলার ইচ্ছা হইবে? (৬) দোলযাত্রার পূর্ব্বরাত্রে বহ্ন্যুৎসব। লোকে বাঁশ ও খড় দিয়া কখনও ছোট ঘরের আকার, কখনও ধ্বজার আকার, কখনও মেষের আকার করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়, বালক ও গ্রাম্যজনের আনন্দের অবধি থাকে না। ইহাকে 'মেড়া পোড়ান' বলে। সংস্কৃতে বলে চর্চ্চরী, বাঙ্গালায় বলে চাঁচর বা চাঁচড়ী খেলা। বসন্ত-সমাগমে পূর্ণিমার রাত্রে দোলখেলার আনন্দ বুঝিতে পারি, কিন্তু অগ্নি-উৎসব কেন? কেনই বা ইহাকে 'মেড়া পোড়ান' বলে? মহারাষ্ট্র দেশে ও পশ্চিম-ভারতে দোল-পূর্ণিমাকে হুতাশনী বলে। হুতাশনী বলিলে ফাল্গুন-পূর্ণিমা বুঝায়। প্রকৃত অর্থ, হুত—যজ্ঞার্থে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত বলি, অশন—ভোজন, যে তিথিতে অগ্নিকাণ্ড করা হয়, কিংবা যে তিথিতে হুত পশু

* ১৩৩২, ২৮শে আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভোজন করা হয়। এই নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা দেশের 'মেড়া পোড়ান' আর হুতাশনীর হুত একই। দোলখেলার সহিত হুতাশনের সম্বন্ধ কি ? (৭) দোলযাত্রা লইয়া অনেক পৌরাণিক আখ্যান আছে। সে সবের সহিত বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত দোলযাত্রার সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, আখ্যানে বসন্তোৎসবের নামগন্ধ নাই।

আমাদের পাঁজির ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে নববর্ষারম্ভে যে উৎসব হইত, বসন্তোৎসব-সহ দোলযাত্রা তাহার স্মৃতি। এত প্রাচীন কালের উৎসব যে, লোকে তাহার উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে, নানা পৌরাণিক আখ্যানে সম্ভব অসম্ভব মিশাইয়া নানা আকারে স্মৃতিমাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আখ্যানের মধ্যে মূল সত্য এখনও লুপ্ত হয় নাই। এ বিষয়ে পরে বলা যাইবে।

প্রাচীন কাল বলিতে অল্প কাল নয়, দুই এক হাজার বৎসরের গণনা নয়। পরে দেখা যাইবে, এই নববর্ষের আরম্ভ খুঁজিতে চারি পাঁচ হাজার বৎসর অতীতে প্রবেশ করিতে হইবে। এত বৎসর যাহার ব্যবধান, তাহা কদাপি একটী থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ আমরা আরও দুই কালের দুই নববর্ষে উৎসব করিতেছি। আমরা বঙ্গদেশে সৌর মাস গণনা করি এবং সৌর বৈশাখের ১লাকে নববর্ষারম্ভ দিন বলি। এই দিন মহাজন ও বণিক্ নূতন খাতা খুলেন এবং আনন্দোৎসবও করেন। আজি যদি ১লা বৈশাখ ত্যাগ করিয়া ৭ই চৈত্র নববর্ষ আরম্ভ করি, তাহা হইলে ৭ই চৈত্র উৎসব হইবে, পরবর্ত্তী এখনকার ১লা বৈশাখ এবং তখনকার ২৩শে চৈত্র পুনশ্চ উৎসব হইবে। কারণ, স্মৃতি লুপ্ত হইবে না, হেতু না জানিলেও স্মৃতিবশে কৃত্য মনে হইবে। আমাদের পাঁজিতে অনেক পর্ব্ব লেখা আছে, সকলের হেতু লেখা নাই, জানা নাই। অমুক তিথিতে ইহা বিহিত, করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলির মূল যে জ্যোতিষিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন যুগাদি, কল্পাদি, মন্বন্তর, সংক্রান্তি ইত্যাদি। জ্যোতিষী পাঁজি গণিতেন, তাঁহার স্মরণীয় বিশেষ বিশেষ যোগ স্মরণ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কিছু-না-কিছু কৃত্য, কর্ত্তব্য বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা যেখানে সেখানে দেবালয় নির্ম্মাণ করেন নাই, যেখানে সেখানে তীর্থস্থানও হয় নাই। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না করিলে তপস্যার ক্লেশ সহিতে পারা যায় না, পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে মানবের চঞ্চল চিত্তে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই হেতু অসংখ্য দেবালয় ও তীর্থ, অসংখ্য কৃত্য করিয়া সে কালের ধর্ম্মব্যবস্থাপক, লোককে পুণ্যের পথে চলিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন, পুরাণকারেরা সে কালের লোকের জানাশোনা কথায় কবিত্ব মিশাইয়া ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বকালের কথা। তখনকার পাঁজি আর এখনকার পাঁজি এক নয়। পাঁজির কোন কোন বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, অনেক বিষয় অবিকল আছে। সূর্য্যোদয় হইলে দিবস বটে, কিন্তু দিবসের প্রভেদ করিবার কোনও নৈসর্গিক উপায় নাই। সূর্য্য দশ দিন পূর্ব্বে যেমন উঠিয়া যেমন অস্ত গিয়াছিলেন, কালিও তেমনি উঠিয়া তেমনই অস্ত গিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র এরূপ নহেন। কোনও রাত্রে পূর্ণ, কোনও রাত্রে অদৃশ্য, অন্যান্য রাত্রে তাঁহার

ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয়। এই হেতু চন্দ্র হইলেন দিন গণনার ঘড়ীর কাঁটা। অমুক ঘটনা কবে হইয়াছিল? যে রাত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর কত রাত্রি গিয়াছে? আজ দশমী রাত্রি, ইত্যাদি। এইরূপে চন্দ্রের যে দিন পাওয়া গেল, তাহার নাম তিথি। অদ্যাপি সমস্ত ভারতবর্ষে তিথির দ্বারা দিন গণা হইতেছে। বঙ্গদেশে ও অন্য দুই এক স্থানে দিন গণনার আর এক বিধি আছে। কিন্তু সেটার প্রয়োজন বৈষয়িক কর্ম্মে; স্মার্ত্ত কর্ম্মে তিথিই গণ্য। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা ত্রিশ তিথি। পঞ্চদশী তিথিতে অমাবস্যা। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস। কিন্তু দিবসের ন্যায় এখানেও এক মাস হইতে অপর মাসের প্রভেদ করিবার উপায় নাই। সেই পূর্ণচন্দ্র, সেই অমাবস্যা, সেই ক্ষয়বৃদ্ধি। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল? এক বা অনেক তারা লইয়া নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রের সহিত যে নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল, সেই নক্ষত্রের নাম করিলেই মাস বুঝিতে পারা গেল। চিত্রাযুক্ত পূর্ণমাস,—চৈত্র, ফাল্গুনীযুক্ত পূর্ণমাস,—ফাল্গুন, ইত্যাদি। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস নাম, চান্দ্র।

নক্ষত্র পরিচয় হইয়া গেলে সূর্য্যাস্তের সময় কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, কিংবা কোন্ নক্ষত্রের অস্ত হইল, তাহা দেখিতে এবং সূর্য্যের নক্ষত্র জানিতে কষ্ট রহিল না। সূর্য্য এক নক্ষত্র হইতে গিয়া সেই নক্ষত্রে পুনর্ব্বার আসেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। সূর্য্যও প্রত্যহ ঠিক এক স্থান হইতে উঠেন না, এক স্থানে লুক্কায়িত হন না। উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে উত্তর, এইরূপ গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই গমন সূর্য্যের অয়ন; এক অয়ন শেষ করিতে ১৮০ দিন লাগে। দুই অয়নে বৎসর, বৎসরে ৩৬০ দিন।

ত্রিশ তিথিতে মাস। যদি বার মাসে বৎসর হইত, কোনও চিন্তা থাকিত না। প্রকৃত পক্ষে বার মাসে ৩৫৪ দিন, বৎসর পূর্ণ হইতে আরও ছয় তিথি লাগে। কাজেই বৎসরে বৎসরে তিথি অধিক হইতে লাগিল। পঞ্চম বৎসরে একমাস অধিক হইল, দ্বাদশ মাস না হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইল। এই ত্রয়োদশ মাস পরিত্যক্ত হইল, আবার সেই পূর্ব্বের নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য একদা চলিতে লাগিলেন। সুতরাং অমুক মাসে প্রবল শীত, অমুক মাসে বর্ষা, ইত্যাদি বলিতে বিঘ্ন রহিল না। এই চমৎকার কৌশলের গুণে চান্দ্র মাস সৌর মাসের তুল্য হইল। সূর্য্যপথ প্রায় অচল বার ভাগে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কখন্ নূতন বৎসর ধরা হইবে? চারিটি বই সময় নাই। দুই অয়ন সমাপ্তি-কালে, দুই বিষুবে আসিলে। বিষুবদিনে দিবারাত্রি সমান হয়। অয়ন-নিবৃত্তি-দিনে রাত্রি দীর্ঘতম কিংবা হ্রস্বতম হয়। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে এরূপ হয়? সে সে নক্ষত্রের দ্বারা বৎসর চারি সমান ভাগে বিভক্ত হইল। বৎসর আরম্ভ করিতে চারিটীর যে কোন একটি ধরিলেই চলে। চলে বটে, কিন্তু মানুষের মন একটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে আদ্য-কালের কথা হইতেছে, সে কালে আর্য্যগণ ভারতের উত্তরে অতিশয় শীতের দেশে বাস

করিতেন। তাঁহারা সূর্য্যের উত্তরায়ণারম্ভ দিন বৎসরের প্রথম দিন ধরিলেন। কয়েক মাস প্রবল শীত ভোগের পর সূর্য্যের আতপ মনোরম বোধ হয়। তা ছাড়া দক্ষিণায়নারম্ভকালে বর্ষা, বর্ষাকালে লোকে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ পাঁজি লইয়া কত কাল চলিয়াছিল, কে জানে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা, মাস গণনাও চলিয়াছিল। কত কাল পরে কিংবা কবে ইহার পরিবর্ত্তন হইল, তাহাও জানা নাই। পূর্ণিমা ছাড়িয়া অমাবস্যা হইতে মাস আরম্ভ হইল। ফলে যে পূর্ণিমা মাসের আরম্ভ ছিল, সেটা মাসের মাঝে চলিয়া গেল। এ দিকে কিন্তু মাসের নাম পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই রহিল। পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত, এই দুই মাসের কৃষ্ণ পক্ষ সমান, কিন্তু শুক্ল পক্ষের তিথি এক রহিল না, উভয়ের মধ্যে পনর তিথির ব্যবধান ঘটিল। এখানে এই বিসম্বাদে না গিয়া পূর্ণিমাকে মাসের, সুতরাং অয়নের, বিষুবের ও বৎসরের আরম্ভ ধরা যাইবে। অন্য গণনায় পূর্ব্বের অমাবস্যা ধরিতে হইবে।

এক নৈসর্গিক ব্যাপার হেতু পূর্ব্বকালের অয়ন-নক্ষত্র, সুতরাং বিষুব-নক্ষত্র চিরদিন এক রহিল না। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, অয়নদ্বয়, সুতরাং বিষুবদ্বয় মন্দগতিতে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, প্রায় ৭২ বৎসরে এক অংশ সরিয়া যাইতেছে। মাসে ৩০ ত্রিশ অংশ, প্রায় ২৩০০ বৎসরে একমাস পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত দিই। এখন শারদ বিষুব আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে ঘটিতেছে, এককালে ইহা কার্ত্তিক মাসে, এমন কি, অগ্রহায়ণ মাসে পড়িত, এবং প্রায় ২৬,০০০ বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে ছিল। এইরূপ অন্য বিষুব এবং দুই অয়ন। কারণ, দুই বিষুব ও দুই অয়ন পরস্পর ছয় মাস দূরে দূরে, এবং দুই বিষুব দুই অয়নের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তবেই এই চারি বিন্দুর অন্তর তিন মাস করিয়া। অতএব—

১। *আশ্বিন-পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হইলে চৈত্র-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব হইবে; পৌষ-পূর্ণিমায় শীতায়ন, এবং আষাঢ়-পূর্ণিমায় গ্রীষ্মায়ন হইবে।*

২। **কার্ত্তিকে শারদ, বৈশাখে বাসন্ত বিষুব, মাঘে শীত, শ্রাবণে গ্রীষ্ম-অয়ন।**

৩। *অগ্রহায়ণে শারদ, জ্যৈষ্ঠে বাসন্ত বিষুব, ফাল্গুনে শীত, ভাদ্রে গ্রীষ্ম অয়ন।*

এখন মূল প্রস্তাব অনুসরণ করি। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, দোলযাত্রা এক পূর্ব্বকালের নববর্ষ-উৎসব। যদি তাই হয়, সে কালে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় নববর্ষ আরম্ভ হইত। কিন্তু এই মাসে নববর্ষ আরম্ভের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি? লোকমান্য টিলক তাঁহার 'ওরায়ন' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বেদের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, এক সময়ে ফাল্গুন মাসে বর্ষ শেষ ও নববর্ষ আরম্ভ হইত। এই ঘটনা সম্ভব ছিল কি না, দেখি। কারণ, অসম্ভব হইলে বুঝিব, বেদ বুঝিতে ভুল হইয়াছে। উল্লিখিত চারিটি স্থানের কোন্ স্থান ফাল্গুনে পড়িতে পারিত? বাসন্ত বিষুব পড়িতে পারিত না; কারণ, উহা এখন চৈত্রে, সম্মুখে। এই কারণে গ্রীষ্মায়নও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। শারদ বিষুব এখন আশ্বিনে। ফাল্গুনে শারদ বিষুব প্রায় ১২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। বেদের উক্তি এত প্রাচীন না হইতে পারে। অতএব শীতায়ন

অবশিষ্ট থাকিল, এবং অন্য প্রমাণেও আমরা জানি, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে বৎসর আরম্ভ হইত।

কিন্তু ফাল্গুনে শীতায়ন হইলে, শারদ বিষুব নিশ্চয় অগ্রহায়ণে ছিল। অতএব দেখিতেছি, সে কালের ঋতু হইতে এ কালের ঋতু প্রায় দুই মাস পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, দোলযাত্রার তিথি। খ্রীষ্টের প্রায় ৩,০০০ বৎসর পূর্ব্বে, পাঁজির কলিযুগের আদ্যে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় উত্তরায়ন আরম্ভ হইত।

এখন শ্রাবণ মাসে হিন্দোল বা ঝুলনের উৎপত্তি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ভাদ্র মাসে হইত; ফাল্গুন হইতে সপ্তম মাস ভাদ্র। হয় ত পাঁজির পরিবর্ত্তন হেতু বৈশাখাদি ছয় (সৌর) মাসের দিন-পরিমাণ ত্রিশের অধিক হওয়াতে শ্রাবণে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ফাল্গুনে সূর্য্যের যেরূপ গতি ঘটিত, ভাদ্রে বা শ্রাবণে অন্য অয়নস্থানেও অবিকল তাহাই ঘটিত। বৎসর ধরিয়া সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিলে দোলকের গতির সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষতঃ যদি প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সূর্য্যকে একটি জ্যোতিষ্মান্ দোলক বোধ হইবে, কেবল নীচে না দুলিয়া ঊর্দ্ধে দুলিতেছেন, এবং এক দোলন অল্পকালে না হইয়া ছয় মাসে সম্পন্ন হয়। রূপকে বলিতে পারা যায়, সূর্য্য দোলায় বসিয়া দোল খাইতেছেন। যখন দোলক এক দিক্ হইতে অন্য দিকে যাইতে আরম্ভ করে, তখনই দোলন-গতি বুঝিতে পারা যায়, অন্য সময়ে মনে হয়, বুঝি একই দিকে বৃত্তপথে চলিতেছে। আমরা বলি, দোল-যাত্রা। যাত্রা অর্থে গতি, গমন; এবং দোলযাত্রা আর কিছু নয়, দোলন-গতি। উত্তর দেশ হইতে দেখিলে এই দোলন আরও স্পষ্ট বোধ হয়। প্রবল শীতের দিনে এক জ্যোতির্ম্ময় বিম্ব দক্ষিণে নিম্ন আকাশে দেখা যায়। দিনের পর দিন অল্পে অল্পে উপরে উঠিতে থাকেন, তাঁহার তেজও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সময়ে সব শুভ। উত্তর দিকে আসিতে আসিতে, তখনও মাথার উপর হইতে বহু দূরে, অকস্মাৎ স্থির হইয়া গেলেন, যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। দক্ষিণ সীমায় গিয়াও এই অবস্থা, যেন দোলারূঢ় হন।

কিন্তু প্রতি বৎসর এই লীলা ঘটিতে থাকে, প্রতি বৎসরই তিনি দোলারূঢ় হন। সে কালে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় এমন কি অভিনব ব্যাপার হইত যে, তাহা স্মরণীয় হইয়া গেল? ইহার উত্তর পুরাণকারেরা দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফাল্গুন-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন নিবৃত্তি হইলে অগ্রহায়ণ মাসে শারদ বিষুব হইত। বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ, এই নাম চলিত আছে। ইহার অর্থ, হায়ন—বৎসর, বৎসরের অগ্র কি না প্রথম মাস। এ সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হইত। এই কারণ এই মাসের প্রকৃত নাম মার্গশীর্ষ, এবং এই নামই সর্ব্বত্র খ্যাত। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সকল গণনার আদি বলিতে বলিতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ বলিয়াছেন।

আপত্তি উঠিবে, ফাল্গুন-পূর্ণিমায় যদি নববর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে মার্গশীর্ষ-পূর্ণিমায় আবার নববর্ষ আরম্ভ কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু আমরা জানি, একই লোকে একই

কালে ভিন্ন ভিন্ন মাস হইতে বৎসর গণিয়া থাকে। বঙ্গদেশে আমরা সৌর বৈশাখ ১লা নববর্ষ দিন বলি, কিন্তু জ্যোতিষীরা পূর্ব্ববর্ত্তী চান্দ্র চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে গণেন। গ্রাম্যজন কখনও পৌষ (শীত) হইতে, কখনও বর্ষা হইতে (ইহা হইতে বর্ষ অর্থে বৎসর), কখনও দুর্গাপূজা (শরৎ) হইতে বৎসর গণিয়া থাকে। প্রয়োজন কিংবা বিশেষ ঘটনা দেখিয়া একই বৎসরের নানা আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে। বৎসরের পরিমাণ অবশ্য সমান থাকে।

মৃগশিরা নক্ষত্রের আকার দেখিয়া বেদে ও পুরাণে বহু আখ্যান রচিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণে এই নক্ষত্র 'ওরায়ন' ব্যাধ নামে খ্যাত। এইখানে বেদের বৃত্রাসুর বলবান্ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, দক্ষযজ্ঞ ভয়ঙ্কর রুদ্র কর্ত্তৃক নষ্ট হয় এবং দক্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হয়। এইখানে বাতাপির সহোদর ইল্বল নামক অসুর মেষের আকারে অশঙ্কচিত্ত ব্রাহ্মণগণের ভোজ্য হইয়া উদর বিদীর্ণ করিত, এবং শেষে মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক ভুক্ত ও জীর্ণ হয়। এই সকল ও অন্যান্য উপাখ্যানের অর্থ, "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পুস্তকে দেওয়া গিয়াছে। তারা-সমষ্টি নক্ষত্রের আকার নানাবিধ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু যে তারাসমষ্টি লইয়া মৃগশিরা, সেটাকে পশু বা অসুর কল্পনা সহজে আসে। ইহার বাঙ্গালা নাম কালপুরুষ। এই নামেও প্রাচীন ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। ইনি বৎসর গণনা করিতেছেন, বৎসরের নাম প্রজাপতি ছিল।

প্রাচীন কালের কল্পনা ও গল্প পুরাণকার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, হোলাকা বা হোলিকা নামে এক রাক্ষসী ছিল। সে, পূতনার ন্যায়, শিশুদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিত। এই হেতু রাক্ষসীকে দগ্ধ করিয়া মারা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বহ্ন্যুৎসবকে বলে, 'বুড়ী পোড়ানা'। সে বুড়ী এই হোলাকা। এই রাক্ষসীর নাম হইতে দোলযাত্রার নাম হোলি হইয়াছে। এই নাম পুরাতন কোষে নাই। বোধ হয়, এই নাম দেশজ। মহারাষ্ট্রে ঢুণ্ঢা নাম,—অর্থ ভয়ঙ্কর। বোধ হয়, সংস্কৃত ইল্বকা বা হিল্বকা নামের অপভ্রংশে হোলাকা, এবং তাহা হইতে হোলিকা, হোলি। ইল্বকা, কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিতে অবস্থিত তিনটি তারা। লোকে যে রাক্ষসীকে ভয় করিত ও দুর্বাক্য বলিত, তাহার হেতুও আছে। সূর্য্যাস্তকালে পূর্ব্বগগনে হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিত। হয় ত শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগ, এবং এই রোগে শিশু আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইত না। অগ্রহায়ণ মাস সে সময়কার শরৎ-কাল বেদের ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তিনি শত শরৎ দেখিয়া যাইতে পারেন। যেন একটা শরৎ কাটিলে অন্ততঃ এক বৎসর আয়ু থাকিবে। পরে কার্ত্তিক মাস শরৎ হইল, এবং লোকে এই মাসকে 'যম-দ্রংষ্ট্রা' বলিতে লাগিল। শৈশব কালে শ্রীকৃষ্ণও পূতনার হাতে পড়িয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তারা পূতনাকে বালরোগের মধ্যে ধরিয়াছেন। হয় ত আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার মধ্যে প্রাচীন কালের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি মাতৃরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। অথচ সিংহারূঢ়া ; আরণ্য মহিষের আকারের এক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর অসুর বিনাশ করিতেছেন। এ কি, মা ? তাঁহার দশ হস্তে দশ প্রহরণ বুঝিতে পারি, সন্তানের

কল্যাণ কামনায় দশ দিকের শত্রু বধ করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধাভিনয় কেন? বোধ হয়, সেই পূর্ব্বকালের স্মৃতি।

হোলাকা যে কে, তাহা আর এক পুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। হোলাকা সম্বতের ভগিনী। সম্বৎ,—বৎসর; হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর যায়, নূতন আসে। পুরাতনের মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া নূতনকে স্বরাজ্যে স্থাপন করা হয়। এক রাজা থাকিতে অপর রাজা হইতে পারে না। দোলের পূর্ব্বরাত্রের বহ্ন্যুৎসবের অর্থ এই। কার্ত্তিকে দীপালী অমাবস্যাতেও এইরূপ। কিন্তু দীপান্বিতা অমাবস্যা কেবল একটী নয়। আশ্বিন বা মহালয়া অমাবস্যাও দীপান্বিতা। পুরাতন যায়, নূতন আসে। তাহাতেই হর্ষপ্রকাশ। কিন্তু দুঃখ এই, দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রিতে চাঁদের আলো থাকে, চাঁদনী রাত্রি অগ্নিক্রীড়া করিবার যোগ্য নয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্নিক্রীড়া হইত। কালে দোল ও চর্চ্চরী একত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষে এখনও অগ্নিক্রীড়া করা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও তাহাকে 'মেড়া পোড়ানা' বলে।

মাস পূর্ণিমান্ত ধরিয়া উপরের ব্যাখ্যা পাইলাম। যখন মাস অমান্ত হইল, তখন ফাল্গুন-পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় বৎসর শেষ হইতে লাগিল। এই অমাবস্যার নাম মহাশিবরাত্রি। বঙ্গদেশে শিবরাত্রি বলিলে এই কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বুঝায়। কিন্তু শিবরাত্রি একটি নয়, বার মাসে বারটি। শিবরাত্রি বা শুভরাত্রির পর নূতন মাস আরম্ভ। বঙ্গদেশে সৌর মাস-সংক্রান্তি যেমন, চান্দ্র মাস গণনায় শিবরাত্রিও তেমন। কিন্তু দোলের পূর্ব্ব কৃষ্ণচতুর্দ্দশী মহাশিবরাত্রি, সে দিন মাসের শেষ, বৎসরেরও শেষ। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের দীপালী অমাবস্যায় এক কালের বৎসর শেষ হইত। অমান্ত মাস ধরিলে এইরূপ হয়। পূর্ণিমান্ত ধরিলে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায়, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। রাসযাত্রা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মতান্তর আছে। এক মতে রাসপূর্ণিমার নাম ত্রিপুরী পূর্ণিমা। এই দিন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় তারকাসুর বধ করেন। তারকাসুর—অর্থাৎ অসুরাকৃতি তারকাসমষ্টি। দেবসেনাপতির নাম কার্ত্তিকেয় হইবার কারণ এই যে, তাঁহাকে ছয় ভগিনী কৃত্তিকা স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয় তারা। যখন শারদ বিষুব মার্গশীর্ষ-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় হটিয়া আসিয়াছিল, সে সময়ে তারকাসুর বধ হইয়াছিল। তখন শীতায়ন ফাল্গুন-পূর্ণিমায় না হইয়া মাঘী পূর্ণিমায় হইত। সে খ্রীষ্টের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এই কারণেই মাঘ মাস পুণ্যমাস, এমন পুণ্য যে, মহাভারতে কুরুকুলপতি ভীষ্ম সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়াও এই মাসের অপেক্ষায় থাকিয়া ৫৮ দিন পরে দেহত্যাগ করেন। আর এক মতে তারকাসুর নয়, মহিষাসুর বধ হইয়াছিল। দুর্গাদেবী সে অসুরকে বধ করেন। তিনি সিংহবাহিনী; কারণ, ফল্গুনী নক্ষত্র সিংহরাশিতে। এই হেতু মাদ্রাজ অঞ্চলে দোলযাত্রার নাম "সিংগা" অর্থাৎ সিংহমাসের উৎসব। বিহারে ইহার নাম "ফাগুয়া"; কারণ, ফাল্গুন মাসে এই উৎসব। আরও আশ্চর্য্য এই, কোজাগরী পূর্ণিমাতেও এক অসুর, নাম নিকুম্ভ, বালুকার্ণব হইতে সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

আসে। এই কারণে লোকে সে রাত্রি জাগিয়া কাটায়। মানব-মনের এ কি চমৎকার রহস্য, কোন্ পুরাকালের স্মৃতি নানা আকারে অদ্যাপি জাগ্রৎ আছে। যে কারণে অসুর কল্পিত ও হত হইয়াছিল, সে কারণ আর নাই, কিন্তু স্মৃতি আছে। দোলযাত্রায় সেই অসুর মেড্রাসুর বা মেণ্টাসুর নামে খ্যাত। অর্থাৎ মেঢ্র বা মেষের আকারের অসুর। অসুরেরা মায়াবী ছিল, ইচ্ছা মতন আকার ধরিতে পারিত। পদ্মপুরাণ বলেন, অগ্নি মন্থন করিয়া তাহাতে 'পশু' নিক্ষেপ করিবে। পশু, যজ্ঞীয় পশু,—যেমন ছাগ, মেষাদি—যাহার মাংস ভোজন করিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের কথা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে পিঠালির মেষ নির্ম্মিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গে চাঁচর-রাত্রে খড় বাঁশ দিয়া একটা ছোট ঘর করা হয় এবং তাহার ভিতরে সত্য সত্য একটা মেষ রাখা হয়। পরে মেষ বাহির করিয়া লইয়া ঘরে অগ্নিযোগ এবং পরে মেষ বধ করিয়া তাহার মাংস দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে মেষ পোড়াইয়া খাওয়া হইত। মহর্ষি অগস্ত্য বাতাপীর ভাই মেষরূপধারী ইল্বলকে দগ্ধ করিয়া খাইয়াছিলেন কি না, পুরাণকার লেখেন নাই। কিন্তু দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী অগস্ত্য তারা যে মৃগশিরা নক্ষত্রে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও দোলযাত্রায় মেলা বসে। সে মেলায় শর্করার 'মঠ' প্রচুর বিক্রয় হয়। বোধ হয়, এটা সেই মেষের গৃহ এবং গৃহপালিত মেষ উদরসাৎ করা হয়। বস্তুতঃ ইহা বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিবেদি। পূর্ব্বকালে ইট দিয়া নির্ম্মিত হইত। পুরাণ-মতে অরুণোদয়কালে দোলের পূজা, এবং বিগ্রহকে দোলমঞ্চে দক্ষিণমুখ করিয়া স্থাপন করিতে হইবে। কেন অরুণোদয়কালে, তাহা বুঝিতেছি। কারণ, সূর্য্যের উদয় হইলেই নূতন বৎসর। দেববিগ্রহ প্রায়ই দক্ষিণ মুখে রাখা হয় না; কিন্তু এখানে তখনও সূর্য্য দক্ষিণ মুখেই থাকেন।

শ্রাবণ-পূর্ণিমায় ঝুলন, আর এক দোল। এই পূর্ণিমা রাখী পূর্ণিমা। এই দিন হরির নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ হয়, এবং তাহার অনুকরণে লোকে আগামী বর্ষে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে হাতে রক্ষাসূত্র পরে। কেহ কেহ বলেন, রাখীপূর্ণিমা ভাদ্র মাসে। তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই, ফাল্গুনের সপ্তম মাস ভাদ্র। সে যাহা হউক, উপবীত আর কিছু নহে, অখণ্ড অদিতি বা সূর্য্যপথ। ইহা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং সূর্য্য যখন পুরাতন পথ সমাপ্ত করিয়া নূতন পথ ধরেন, তাঁহার নূতন উপবীত হয়।

চৈত্র মাসে তৃতীয় দোল। তিথি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই দোলে বহ্ন্যুৎসব নাই, ঝুলনেও নাই। কারণ, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে মায়াবী অসুর দূরে থাকে, পূর্ব্বআকাশে দৃষ্টিগোচর হয় না। চৈত্র-দোল নিশ্চয় আধুনিক। দোলযাত্রার প্রকৃত অর্থ বিস্মরণের ফল। চৈত্র মাসের প্রাচীন নাম মধুমাস। এই মাসে বৈদিককালে বসন্তোৎসব হইত। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকে যে মদনোৎসব পড়ি, তাহা এই চৈত্র মাসে হইত। দোলযাত্রাকে বসন্তোৎসব মনে করিয়া পরে বসন্তোৎসবকে দোলযাত্রা মনে করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে যে সময় দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই সময় হইতে যে দোলযাত্রা বা রাসযাত্রা প্রচলিত হইয়াছে, এমন নয়। বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের ঋষিগণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, দুই অয়ন ও দুই বিষুব দিনে যজ্ঞ করিতেন। কয়েক বৎসর অন্তরেও যজ্ঞ করিতেন। কয়েক দিবসব্যাপী যজ্ঞও ছিল। সূর্য্যের গতির অনুকরণে সম্পন্ন হইত। যজ্ঞের নানা অভিপ্রায় ছিল। এক অভিপ্রায়, কালগণনা, মাস ঋতু বৎসর গণনা। তখন লেখা পাঁজি ছিল না, অথচ একটা-না-একটা পাঁজি না থাকিলে কৃষিকর্ম্ম ও অন্য বৈষয়িক কর্ম্ম চলে না। যজ্ঞের পূর্ব্বদিন অগ্নিচয়ন করা হইত, এবং যজ্ঞদিনে পশুবলি দেওয়া হইত। কদাচিৎ পুরোডাশ নামক পিষ্টকের বলিও দেওয়া হইত। পরে যখন ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে জ্ঞান-কাণ্ডের প্রাধান্য হইল, পশুযজ্ঞও হ্রাস পাইল। কিন্তু পূর্ব্বকালের স্মৃতি লুপ্ত হইল না, যজ্ঞের রূপান্তর হইল, এবং নূতন উৎসব আরম্ভ হইল। দুর্গাপূজা যে যজ্ঞ, আর যজ্ঞার্থে যে পশুসৃষ্টি, তাহা এই পূজার মন্ত্রেই আছে। কিন্তু যজ্ঞ কেবল ঘৃত দ্বারা হোম নয়, পশু বলিদানের পর সকলে মিলিয়া আনন্দে পশুমাংস ভোজন করিত। যজ্ঞ মাত্রেই সামাজিক উৎসব, সমাজ-বন্ধনের হেতু। এই কারণে দুর্গাপূজা একার উৎসব নয়, শাক্ত বাঙ্গালী মাত্রের সামাজিক উৎসব। বঙ্গের বাহিরে দুর্গাপূজা নাই। কোথাও সরস্বতী পূজা, কোথাও মাত্র নবরাত্রি, ফলমূলাদি দ্বারা পূজা সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরস্বতী পূজা হইলেও বলিদান আছে, যদিও সে বলি পশু নয়। দোলযাত্রাও এইরূপ প্রাচীন কালের যজ্ঞের স্মৃতি। সে স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে। শক্তি পূজা, আদ্যাশক্তির পূজা, যে শক্তি সর্ব্বভূতের চেষ্টার কারণ। বিষ্ণুও সেই সর্ব্বব্যাপী শক্তি, কিন্তু পালনে সে শক্তির প্রকাশ। সুতরাং পশুবলি দোলের আর অঙ্গ নাই, যদিও মেড়া পোড়ান ব্যাপারে সে অঙ্গ বিলুপ্ত হয় নাই।

এখানে দোলযাত্রার যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে হঠাৎ মনে হইতে পারে, ইহা সূর্য্যপূজাবিশেষ। কিন্তু প্রতিমা পূজার তাৎপর্য্য বুঝিলে এই ভ্রম হইবে না। বহুকাল হইতে সূর্য্য, বিষ্ণুর প্রতিমা বা প্রতীক হইয়া আছেন। বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সূর্য্যও পালনকর্ত্তা। বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক ব্যাপ্ত; সূর্য্যও প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ং তিন কালে ত্রিপাদ ক্ষেপণ করেন। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, কিন্তু জড় সূর্য্যকে ধ্যান করেন না। শালগ্রাম শিলা এক খণ্ড গোল কৃষ্ণবর্ণ শিলা, কিন্তু সেই সূর্য্যের, সুতরাং বিষ্ণুর প্রতীকমাত্র। রূপক ব্যতীত যেমন ভাষা নাই, প্রতীক ব্যতীত উপাসনা নাই। ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, যাহাই বলি, প্রতিমা গড়িয়া ধ্যান করি। কিন্তু ইহাও সত্য, অজ্ঞ জনে প্রতিমা ও যাহার প্রতিমা, এই দুই অভেদ করিয়া বসে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার নিন্দা আছে। সে যাহা হউক, সূর্য্য প্রাচীন কাল হইতে বিষ্ণুর প্রতিমা হইয়া আছেন, সূর্য্যজন্য প্রাকৃতিক ঘটনাও বিষ্ণু পূজার উপলক্ষ হইয়াছে। দোলযাত্রা দ্বারা কালচক্র, ঋতুচক্র স্মরণ হয়। এই চক্র এক বৎসরে পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু ছোট বড় আকারে জগৎ-চক্রের পরিবর্ত্তন ধ্যান করিতে বিঘ্ন হয় না।

যখন শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর এক অবতাররূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, বিষ্ণুপ্রতিমা সূর্য্যের কর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইতে লাগিল। কিন্তু সূর্য্যের সকল কর্ম্ম মানবরূপ শ্রীকৃষ্ণে মিলাইতে পারা গেল না। পুরাণকার নানা কৌশল করিলেও শেষে ভগবানের লীলা বলিলেন। তাঁহার বাল্যকালের অনেক কীর্ত্তি বিদ্বান্ সমালোচককে তুষ্ট করিতে পারিল না। কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেন, কেহ ভগবানের লীলা অজ্ঞেয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হয় ত কতকগুলির ব্যাখ্যা সূর্য্যে পাওয়া যাইবে। এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি। শৈশব কালে শ্রীকৃষ্ণ এক জোড়া অর্জ্জুন-গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, একটা শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ভুলিয়াছিল, ফল্গুনী নক্ষত্রের এক বৈদিক নাম অর্জ্জুনী, ফাল্গুনের এক নাম অর্জ্জুন। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া তারা, যেন যমল বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। রোহিণী নক্ষত্রের আকার শকটের তুল্য, এই হেতু রোহিণী-শকট নাম প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে যদি অয়ন ঘটে, রোহিণীতে পূর্ব্বস্থিত বিষুব থাকেই। যদি ফল্গুনী হইতে অয়ন সরিয়া যায়, রোহিণী হইতে বিষুবও সরিয়া যাইবে। এই ঘটনা ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানে বর্ণিত আছে। তখন অগ্রহায়ণ স্থানে কার্ত্তিক প্রথম মাস হইতেছিল। কে জানে, বালকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঙ্গ ও শকটপরিবর্ত্তন এই নৈসর্গিক ঘটনার প্রতিমা নহে?

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের স্থান নয়, উদ্‌ঘাটন আমার সাধ্যও নয়। ইহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রেম ও আনন্দরস ভোগের নিমিত্ত ধাবিত। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা তাঁহার চরিতে প্রচুর উপাদান পাইলেন, এবং স্ব স্ব কল্পনায় সে রস উপভোগও করিতে লাগিলেন। এখানে সম্ভব অসম্ভব বিচারের স্থান নাই। দয়িত জনের কোন্ কর্ম্ম অপ্রিয় হয়? তিনি যদি দোলখেলা করিতে পারেন, রক্তপীতশুক্ল গন্ধচূর্ণক গোপী ও গোপাল-গণের দেহে কেন নিক্ষেপ না করিবেন? রক্তজলনিক্ষেপ প্রেমের অভিনয়ও বটে। যিনি জীবমাত্রকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণ নাম পাইয়াছেন, ভক্ত যে লীলা চায়, সে লীলা দ্বারাই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব জগৎচরাচর যাঁহার লীলা, নিত্য লীলা, দোলও তাঁহার নিত্য লীলা; যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পায়; চিত্তলীলা অন্ধকে বুঝাইবার বস্তু নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র

(মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস)

[৬]

লোক-চরিত্র

মৌর্য্যযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। অতঃপর লোকচরিত্র বা শীল সম্বন্ধে, ও দারিদ্র্য বিলাসিতা প্রভৃতির বিষয় কিছু বলিয়াই উপসংহার করিব। লোকচরিত্র বলিলে জনসাধারণের সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য হইবে, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্র রাজ্যশাসন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই লিখিত; উহাতে সাধারণ লোকের কথা বড় কম। তবে উক্ত গ্রন্থপাঠে তৎকালের লোক-প্রকৃতির বিশেষত্ব কিছু যে জানা যায় না, তাহা নহে। প্রত্যেক যুগেই মানবের মন কোন এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়—কোন এক দিকে ধাবিত হয়। অন্য বৃত্তি গুলি যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে; তবে অন্য একটি দুইটির প্রাবল্যবশতঃ সেগুলির প্রাথর্য্য বড় বুঝিতে পারা যায় না। জগতের ইতিহাসে এইরূপ যুগে যুগে এক একটি ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইগুলিকে যুগধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করা যায়। দেখা যায়, কোন যুগে দেশে ধর্ম্মচর্চ্চার স্রোত বহে—ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে লোক মত্ত হয়। আবার তৎপরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্ম হইতে মন সঞ্চালিত করিয়া অন্য দিকে নিযুক্ত করে। কোন যুগে যুদ্ধ বিগ্রহে, কোন যুগে বা বাণিজ্যে ধন লাভে মানবের মন চালিত হয়। আবার কোন যুগে একেবারে জড়তা আসিয়া পড়ে। বিভিন্ন স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাত, নিরোধ বা প্রবলতা চলিতে থাকে।

অর্থশাস্ত্রের যুগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থশাস্ত্র রচনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই যুগের পূর্ব্বের ও অব্যবহিত পরযুগেরও ইতিহাসে বিশেষত্ব আছে। ইহার পূর্ব্বের যুগে ধর্ম্মের আন্দোলন লইয়া লোকে মাতিয়াছিল। একরূপ বলিতে গেলে বৈদিক যুগের শেষ হইতেই লোকে পরলোক ও ইহ লোকের সুখদুঃখের কারণ প্রভৃতির অনুসন্ধিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিল। জগতের দুঃখ, ইহার নিবারণের উপায় প্রভৃতি নানা বিষয়েই মন চালিত হইয়াছিল। জগৎ যে দুঃখমাত্রেরই স্থান, কর্ম্ম যে কেবল দুঃখেরই কারণ, কর্ম্মফলে যে মানব পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করে, এই সকল বিশ্বাসই মানবের মনে আধিপত্য করিয়াছিল। এই সকলের ফলে দেশে দুঃখবাদ প্রবল হইয়াছিল (Pessimism)।

অবশ্য ইহার বিপরীতবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকও ছিল—চার্ব্বাক ও বার্হস্পত্য-সম্প্রদায়ের কথা সকলেরই বিদিত আছে। ইহাদের প্রকৃতি ইতিহাস বা বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানি না। তবে বিপরীত সম্প্রদায়ের শ্লেষাত্মক নাম বা বিবরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চার্ব্বাক্ [বা চর্ব্বণকারী—ঐরূপ কণাদ বা কণভুক্ ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক নাম উল্লেখযোগ্য] মতাবল-

ন্থীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করিতেন না। পার্থিব ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের মতে যে কোন উপায়ে শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবদেহ বিনাশের সঙ্গেই সব বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগতের নানাবিধ মৌলিক দ্রব্যের সংঘাতেই জীবন বা জ্ঞানের উৎপত্তি। ঈশ্বরাদি কিছুই নাই, ইত্যাদি মতেই তাঁহারা পরিচালিত হইতেন।

এক দিকে যেমন চার্ব্বাকপন্থীরা ছিলেন, তদ্রূপ বিপরীতবাদী পরিব্রাজকাদির দল সংসারকে একেবারে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের চক্ষে কর্ম্মজগতের কোনই স্থান ছিল না। ইঁহারা লোককে গৃহত্যাগ করিতে, সন্ন্যাস লইতে বা কঠোর ভাবে জীবন যাপন করিতে শিখাইতেন। আদিম বৌদ্ধধর্ম্মও এই শ্রেণীর ধর্ম্ম ছিল। উহাতে গৃহী বা গার্হস্থ্যের কোন স্থান ছিল না। উত্তর কালে এই সকল শিক্ষার বিষময় ফলই ফলিয়াছিল। সমাজে উহার প্রভাবে যে দুর্নীতি ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঐ মতের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কৌটিল্য কাঠোর্য্য-বাদের (rigorism) ; প্রতিবাদী প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রগুলিতেও এই প্রতিবাদের মূল পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কৌটিল্যের এ বিষয়ে মতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলেন,—

"ন নিঃসুখঃ স্যাৎ। ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত।" ইত্যাদি

এই হিসাবে অর্থশাস্ত্রের ও অর্থশাস্ত্রকারের স্থান হিন্দু সামাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ। তাঁহার মতে জগতে মানবজীবনে সুখের প্রয়োজন। সুখ ভিন্ন, কামবিহীন জীবন নিঃসার হইয়া পড়ে। মানব কষ্টবৈরাগ্যের ফলে কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। সমাজবিলুপ্ত হয়। উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার সহিত আবার ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। ইহারই ফলে ভারতবাসী রাজনৈতিক জগতে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ম্ম-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকের মানসিক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। লোকে বর্ত্তমান যুগের মত ঐহিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিয়াছিল এবং অনেকটা ধর্ম্মভয়হীনও হইয়া পড়িয়াছিল। লোকচরিত্রে উহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এক দিকে যেমন জড়তার বিলোপ হইয়াছিল, অপর দিকে আবার অর্থৈষণার প্রভাবে অনেকটা নৈতিক অবনতিও ঘটিয়াছিল।

লোকচরিত্রে এই নৈতিক অবনতি পর্য্যালোচনার বিষয়। এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের পাঠকমাত্রেরই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ যুগের অধি-কাংশ রাজনৈতিকের মধ্যে [প্রাচীন অর্থশাস্ত্রকারের] নৈতিকতার একেবারে অভাব দেখা যায়। ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট-সিদ্ধি বা শত্রুনিপাত করিতে সকলেই উদ্যোগী। রাজপুত্র দমনের জন্য কেহ বা উহাদের মদ্যপানাদিতে আসক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কেহ বা মোহচূর্ণাদির দ্বারা উহাদের সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া, আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সকল নীতিকারই ছদ্মবেশধারী চার প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। প্রায় সকল নীতিকারই এ বিষয়ে একমত। এ বিষয়ে কৌটিল্যও বাদ যান নাই। তিনিও ঐ সকল মতের সমর্থন করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিও প্রায় একই মতাবলম্বী। তবে ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও অনেকে তাঁহাকে Machiavellir সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, তথাপি ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ আসনে বসাইতে হয়। সে সব বিষয় অন্য স্থানে আলোচনা করিয়াছি ও করিব।

অবশ্য রাজনৈতিকদিগের প্রকৃতি বা মত লইয়া জনসাধারণের নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করা যায় না। উহাতে সময়ে সময়ে বিশেষ অবিচার বা ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগের লোকের নৈতিক আদর্শ উচ্চ ছিল না। যে সমাজে গুপ্তহত্যা, বিষদান, অগ্নিদান প্রভৃতির স্থান থাকে ও যে সমাজের রাজনৈতিকেরা ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হন না, সে সমাজের লোকের নৈতিক আদর্শ যে বড় উচ্চ নহে, তাহা একবাক্যে বলা যাইতে পারে।

ব্যভিচার

সমাজের যৌন আদর্শও যে বিশেষ উচ্চ ছিল, তাহা নহে। একে ত সমাজে আট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। তাহার উপর আবার হীন বিবাহে বিবাহ-মোক্ষ ও পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ইহা সত্ত্বেও ব্যভিচারের মাত্রা যে বড় কম ছিল, তাহা নহে; অর্থশাস্ত্রপাঠক মাত্রেই ইহা পরিজ্ঞাত আছেন। কৌটিল্য নানাপ্রকার যৌন ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। (কণ্টকশোধনের অতিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কন্যাপ্রকর্ম্ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, বিবাহ-বয়স অতিক্রম করিলে কন্যা পরগামিনী হইলে সমাজে উহা দোষারহ হইত না। তবে সমাজ এই সকল স্থলে প্রাতিলোম্যের জন্য বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নবর্ণা স্ত্রী উচ্চবর্ণের পুরুষে আসক্ত হইলে উহার অবশ্য দণ্ড হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণা স্ত্রী নীচগামিনী হইলে উহার কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। নানা প্রকার কায়িক দণ্ড, রাজদাস্য, এমন কি—ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচারিণীর দণ্ড ত হইতই। গর্ভপাতিনী, স্বামীকে বিষদায়িনী, অগ্নিদাত্রী প্রভৃতির কঠোর দণ্ডে লোকের ঘৃণার ও ভয়ের উদ্রেক হয়।

মোটের উপর মনে হয়, বর্ত্তমানের সমাজ অপেক্ষা ব্যভিচার বিশেষ প্রবল ছিল। নানা শ্রেণীর দূতীর প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রব্রজিতা দূতীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণীজারকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখা হইয়াছে।

ব্যভিচার-বিষয়ক আইন কঠোর হইলেও, ব্যভিচারিণীর স্থান সমাজে হীন হইলেও মনে হয় যে, ব্যভিচার বলিতে আমরা যেরূপ সামান্য অপরাধকে ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন এরূপ কঠোর আদর্শ ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ক্রমশঃ যে সকল অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও তদন্তে উহার সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উহাতে

সমাজে চিরন্তন পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে। সামান্য সামান্য অপরাধ—যাহাতে আমাদের সমাজে পাতিত্য ও ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অর্থদণ্ড মাত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যে দেখা যায়। পরপুরুষসম্ভাষণাদি সামান্য সংগ্রহণাপরাধ স্থলে অর্থদণ্ড মাত্রের ব্যবস্থা আছে। সমাজ ঐরূপ দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইত। তখনকার যুগে এই সকল অপরাধে "রজসা শুধ্যতে নারী" এই ব্যবস্থায় দোষ ক্ষালন হইত। পরপুরুষজনিত গর্ভস্থলে অনেক স্মৃতিকার এক বৎসর অধঃশয্যা ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখনকার যুগে সমাজ উন্নত হইয়াছে। সামাজিক আদর্শও অনেক উচ্চ হইয়াছে। ক্ষেত্রজ পুত্রাদি এখন জারজ বলিয়াই পরিগণিত। কানীন, সহোঢ়, শৌদ্র, গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতির সমাজে কোন স্থানই নাই। কুণ্ড, গোলকাদি সন্তান এখন কেহই নিজের বলিয়া গণ্য করে না। সেই হিসাবে আমরা অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধকে ব্যভিচার ধরিয়া থাকি। তখন আদর্শ হীন ছিল। এখনকার মত সামান্য অপরাধকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না। তখন অসমর্থ পক্ষে কৌটিল্য রাজাকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বিলাসিতা

বিলাসিতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সাধারণ সামাজিক জীবনের আদর্শ হিসাবে উহার পুনরুল্লেখ করিব। লোকের জীবনে বর্ত্তমানের অপেক্ষা ভোগস্পৃহা বলবতী ছিল। লোকে এত দারিদ্র্যের পেষণে থাকিয়া ভোগ ভুলিয়া যায় নাই। জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। কাজেই সময়ও থাকিত। এই সময় অতিবাহনের জন্য নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। ঘোড়দৌড়, পশুযুদ্ধ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, গোষ্ঠ-বিহারাদির কথা উল্লেখ করিয়াছি। নট, নর্ত্তক, গায়ন, বাগ্‌জীবন (ভাঁড়), গল্পকারী প্রভৃতির কথা বলিয়াছি। সমাজে বিলাসিতা প্রবল থাকায় এই সকল শ্রেণীর লোকের স্থান ছিল। উৎসাদনের জন্য সংবাহক (গা টিপিবার লোক), স্নাপক (যাহারা স্নানে সাহায্য করে, রামায়ণে উষ্ণোদকের উল্লেখ আছে), মাল্যকার, আস্তরক প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতেই ইহাদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অভাবে উহারা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

লোক ও বিশ্বাস

তখনকার লোকে আজকালকার মত নানা প্রকার কুসংস্কারাদিতে আস্থা স্থাপন করিত। জ্যোতিষগণনা, ভবিষ্যগণনা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, মারণাদি কার্য্য, অভিচার-ক্রিয়া প্রভৃতিতে তখনকার লোকের বিশেষ আস্থা ছিল। লোকে ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যোনিতে বিশ্বাস করিত। নাগাদির পূজা করিত। নানা প্রকার দেব দেবীর সন্তোষার্থ পূজা উপহারাদি দান করিত।

আবার বিপদাদির সময় লোকে মিলিয়া নানা প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিত। শ্মশানে কবন্ধ-দাহন, শ্মশানে গো,-দোহন, পক্ষরাত্রি, দেবরাত্রি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সাধু ফকিরাদিতে আস্থা তখনও লোকে স্থাপন করিত। নানাবিধ কুসংস্কারও ছিল, লোকে শুভাশুভক্ষণ, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাদি সমস্তই মানিত। দেবপূজা করিত। প্রতিমা গড়িত। সিদ্ধ তাপসাদি দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইত। এ সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; প্রায় একরূপই বলিতে হইবে। তবে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ছিল। খাদ্যাখাদ্য বিচারও করিত; তবে উহা এখনকার মত কঠোর ছিল না।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য, জলাচরণীয়ত্ব

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও সামাজিক সম্বন্ধাদি লইয়াও তখন অনেক মতামত বা ভেদাভেদ ছিল। তবে এখনকার মত উহা এত কঠোর ছিল না। উহার কারণ ও উৎপত্তি প্রসঙ্গক্রমে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে যুগে মৎস্য মাংসাহার বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। জাতকে বরাহমাংস, কুক্কুটমাংস, এমন কি, স্থানবিশেষে বা জাতিবিশেষে, গোমাংসাহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মসূত্রগুলিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে,—

(ক) কতকগুলি পশুর মাংস ও কতকগুলি মূল কন্দ অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অভক্ষ্য পশুর মধ্যে মাংসাশী জন্তু মাত্রই অভক্ষ্য ছিল। নখরবিশিষ্ট জলচর, একক্ষুর-বিশিষ্ট জন্তুরাও অভক্ষ্য পরিগণিত হইত। সাধারণতঃ মেষ ও ছাগ, বন্য বরাহ, শিকারলব্ধ মৃগাদি, শশক, শল্লকী, গোধা ও কতকগুলি জন্তুর মাংস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। গ্রাম্য কুক্কুট-মাংস ধর্ম্মসূত্রে অখাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। ঐরূপ রসুন কবকাদি কতিপয় মূলও অভক্ষ্য বিবেচিত হইত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ কয়েক শ্রেণীর লোকের অন্ন (উহাদের অর্থে প্রস্তুত) অখাদ্য বলিয়া গণিত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে ও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারের মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য; যথা,—গণান্ন, গণিকান্ন, বার্দ্ধুষিকান্ন, শূদ্রান্ন, চিকিৎসাকান্ন ইত্যাদি। ঐরূপ ব্যাধ, পতিত, রজক, তক্ষক, শৌণ্ডিক, পিশুন, ভার্য্যাট প্রভৃতি ব্যক্তির অন্ন পরিত্যাজ্য (গৌতম, ১৪ অধ্যায়)।

(গ) অতঃপর কয়েকটি জাতির স্পৃষ্ট অন্ন জলাদি অভক্ষ্য ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ঘ) ঐরূপ কেশ-কীটাদি-যুক্ত, ধূলি-ভস্মাদিপূর্ণ অন্ন পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণাদির পক্ষে গুরু ভিন্ন অন্যের উচ্ছিষ্টও পরিত্যাজ্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, কালক্রমে সমাজের মধ্যে এই নিয়মগুলি আসিয়াছিল। কতকগুলি স্থলে দেখা যায় যে, সামাজিক অপকার ভয়ে বা স্বাস্থ্যহানির

ভয়ে এই নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যেমন গোমাংস ও বরাহমাংস। কতিপয় স্থলে স্বাস্থ্য-হানির ভয়ে ঐরূপ বিধির উৎপত্তি হইয়াছিল। যেমন চর্ম্মকারাদি নীচকার্য্যরত ব্যক্তির অন্ন। উচ্ছিষ্ট ভোজনও বোধ হয় রোগাশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আবার অনেক স্থলে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ফলে বা অন্য কোন কারণবশতঃ এইরূপ নিষেধের উৎপত্তি। যেমন গণিকান্ন, চিকিৎসক ও সোমবিক্রয়ীর অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন। এই স্থলে সমাজ গণিকাদিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উহাদের অন্নও দুষ্ট বলিয়া গণ্য করিতেন। চিকিৎসক বার্দ্ধুষিকাদি ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের অন্ন অভক্ষ্য হইত। নীচজাতীয় অন্ত্যজদিগকে আর্য্যসমাজ তখন সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। জাতকে চণ্ডাল, পুক্কশ, নিষাদাদি জাতির অন্নপানাদি গ্রহণ জাতিভ্রংশকর বলিয়া গণিত হইত। ইহারা গ্রাম নগরের মধ্যে স্থানই পাইত না; গ্রামের বাহিরে বাস করিত। ঘাতক, পাংশুল, ধাবকাদির কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিত। সমাজ ইহাদিগকে বিধর্ম্মী আর্য্যসমাজবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত করিত।

এইরূপ যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আবার আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ শীল-সদাচারযুক্ত শূদ্রাদি রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইত। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। আপস্তম্বের মতে শূদ্র (২-৩-৯) পাচক অন্নাদি প্রস্তুত করিতে পারে। গৌতমের মতে (১৭ অধ্যায়) অভাবে পড়িলে শূদ্রের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে পারা যায়। আর গোপালক, নাপিত, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শূদ্র, পরিচারকাদিরও অন্ন গৃহীত হইতে পারে (এই মতটি বোধ হয় রঘুনন্দন কর্ত্তৃকও উদাহৃত হইয়াছে)। পুনশ্চ ব্রাহ্মণ পাককার্য্যে নিযুক্ত হইলে উহার পাতিত্য জন্মে, ইহা স্মার্ত্তদিগের মত। এই অবস্থায় মনে হয় যে, এই যুগের মাহানসিক সূপকার, ঔদনিক, পাকমাংসিকাদি শূদ্রজাতীয় ছিল।

পরবর্ত্তী যুগেই বোধ হয়, স্পর্শ-দোষাদি লইয়া কঠোর বিধিসমূহ রচিত হয়। বৌদ্ধ যুগের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাই বোধ হয়, এই সকল প্রতিক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। বৌদ্ধ শিক্ষার ও আচারের ফলে সামাজিক শাসন শিথিল হইলে উহা আবার কঠোর ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। স্পর্শদোষে পাতকাদির কথাও এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। আচারমাহাত্ম্যমূলক পরবর্ত্তী যুগের যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের অংশবিশেষ আমাদের হস্তে আসিয়াছে, সেইগুলিতে উহা বিশদভাবে পরিস্ফুট আছে। নানা কারণেই এইগুলি ঘটিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের ভয়। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

এই সকল কারণেই ব্রাহ্মণাদি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত এই সকল বিধি কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ বিধি অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বাতন্ত্র্য রক্ষণার্থ ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট করণের কল্পেই এইগুলির উদ্ভব হয়। জলাচরনীয়ত্বের মূলেও ঐ সকল কারণ নিহিত রহিয়াছে।

অর্থশাস্ত্রেও এইরূপ কয়েকটি আইন দেখা যায়। এক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, নীচ শূদ্রাদি, ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভোজন করাইলে তাহার বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

অর্থশাস্ত্রের যুগেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় বিশেষই পাওয়া যায়। তবে উহারও আবার বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের মত নির্য্যাতন অত্যাচার বড় বিশেষ হইত না। ধর্ম্মে রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার না থাকায় এ বিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি হইত না।

তবে পাষণ্ড চণ্ডালাদির স্থান সমাজের বাহিরে ছিল। কৌটিল্যের মতে তাহাদিগকে নগরমধ্যে বাস করিতে দেওয়া অনুচিত। আর গ্রামে উহাদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে দেওয়া হইত না (৪৮ পৃষ্ঠা—বানপ্রস্থাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সময়ানুবন্ধে বা নাস্য জনপদমুপনিবিশেত)?

উত্তর কালে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। বৌদ্ধেরা বিষম হিন্দুদ্বেষী হন। এমন কি, ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধেরা বিদেশী শত্রুর সহিত যোগদান করেন। এই বিদ্বেষের ফলেই এই সকল বিধি দিন দিন বাড়িতে থাকে।

কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ

অর্থশাস্ত্রের সামাজিক চিত্র সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও যৎসামান্য পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছি। এখন কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলিব ও প্রসঙ্গক্রমে সে কাল ও এ কালের পার্থক্য ও তাহার মূলীভূত কারণ লইয়া কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিব।

অর্থশাস্ত্র হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ অনেক উচ্চই ছিল। উচ্চ বলিলে যে উহা এখনকার হিসাবে উচ্চ, তাহা নহে। এখন লোক-তন্ত্রবাদের দিন (Democracy)। সর্ব্ব লোকের সাম্য (equality) ও মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার (equal rights) এই যুগের নীতির ভিত্তি। যদি বর্ত্তমান জগতের আদর্শ লইয়া আমাদিগকে কৌটিল্যের স্থান নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া অসম্ভব। এক হিসাবে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পথানুসারী ছিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও বেদপ্রামাণ্যে তাঁহার আস্থাই ছিল। তিনি ভূয়োভূয়ঃই বলিয়াছেন যে,—

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমো লোকে কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
এষ হি রক্ষিতো লোকে প্রসীদতি ন সীদতি ॥

এই সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; প্রাচীন আদর্শ বিলোপ করিতে চাহেন নাই; সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন নাই। নূতন কিছু গড়িয়া প্রাচীন সমাজের বিলোপ করিতে চাহেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ।
স্বধর্ম্মং সন্দধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥

শ্রুতিকে তিনি বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রধানতম স্থানই দিয়াছেন (যথা—ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি-রান্বীক্ষকীতি বিদ্যাঃ)। তাঁহার শাসনবিধিতে ব্রাহ্মণ পরিহারের স্থান আছে, ব্রাহ্মণের অনেক বিশেষ অধিকার আছে। ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়।

সাম্যবাদে অবিশ্বাসী বলিয়াই কিন্তু তাঁহাকে আমরা নির্ম্মম, নির্দ্দয় দণ্ডনীতির পরিপোষক রাজনৈতিক বলিতে পারি না। সাম্যবাদ ভারতবর্ষে কখনই প্রবল হয় নাই—আজিও প্রবল হইতেছে না। অনেকে উহা আমাদের জাতিগত অবনতি বা কুসংস্কারজনিত বলিয়া মনে করেন। উহা কি পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে আরও একটি কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপে সাম্যবাদপ্রচারের অনেকগুলি কারণই ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান (কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে প্রধানতম) কারণ এই যে, উহা রাজনৈতিক হিসাবে, সামাজিক হিসাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের প্রসারের একমাত্র উপায়ই হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ইউরোপীয় দার্শনিক মাত্রেই জীবনের ভোগসুখ লইয়াই জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদের দেশের কর্ম্মবাদ ও কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি ও অবসান ইউরোপে কখনই প্রবল হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক পুনর্জ্জন্মে এত আস্থা কোন কালেই স্থাপন করেন নাই। ইহার ফলে উঁহারা বৈষম্য দেখিলেই উহার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপে এই সংগ্রাম আজিও বিলুপ্ত হয় নাই।

আমাদের দেশে কর্ম্মবাদের প্রভাবে এই বৈষম্য লইয়া লোকে এত ব্যস্ত হয় নাই। এ দেশের মনীষিবৃন্দ একরূপ নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন যে, মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও কখনই প্রত্যেককে সমান সুখে সুখী করিতে পারিবে না। সুখ ও দুঃখ লইয়া যে বৈষম্য, তাহার অনেকটা মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ সদসৎ কর্ম্মেরই ফল।

দ্বিতীয়তঃ এ দেশের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি (Principles of Evolution) বিভিন্ন। ইউরোপের ন্যায় ভারতীয় সমাজে জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য লইয়া এত ভীষণ সমরও হয় নাই। এ দেশে বহুজাতীয় লোকেরই বাস ছিল বা আছে। কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রবল দুর্ব্বলের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া, নিজ শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অপরকে একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে, এ দেশে কখনও তাহা হয় নাই। এক হিসাবে যেমন সাম্যমূলক জাতিগত রাষ্ট্র বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, উহার গঠনের ইতিহাসও তদ্রূপ কদর্য্য। বর্ত্তমানের সীমেতীয় ও ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ রাষ্ট্রপ্রজা মাত্রেরই মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সমতা স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশীয় জাতিমাত্রই তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। আর এই সমতা স্থাপন ও নিজ জাতির প্রাধান্য বিস্তার করিতে গিয়া কত বিশাল জাতির অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভারতীয় আর্য্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে অথচ অন্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে নাই। এক দেশে, এক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর লোক নির্ব্বিবাদে বাস করিয়াছে ও করিতেছে। ফলে আজিও সমাজের অঙ্গের মধ্যে নিম্নস্তরের বহু জাতির লোক স্থান পাইয়াছে; তাহাদের অস্তিত্ব আছে। প্রতীচ্যে তাহা হয় নাই। বিজয়ী জাতিই প্রবল হইয়াছে। বিজিত একেবারে

সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আর বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, ভারতে আজিও বহু সভ্য, অসভ্য, নিম্ন বা উন্নত জাতি পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। আর ইউরোপ বা আমেরিকায় বিজিতের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান বা অন্য যাহারা আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

যে কোন কারণেই হউক, কৌটিল্যে সাম্যবাদ নাই। তবে তাই বলিয়া কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সঙ্কীর্ণ নহে। কৌটিল্যের বহু স্থলেই জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিতে পাই। আর এ ভিন্ন তাঁহার আর একটি গৌরবের কথা এই যে, যে যুগে যবন দার্শনিক এরিষ্টটল দাসত্বের সমর্থন করিয়াছেন, সেই যুগেই কৌটিল্য উহার সমূল উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সুসভ্য ইউরোপে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্ব-প্রথা বহু চেষ্টায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর গৌরবের কথা এই যে, ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতীয় দার্শনিকই উহার উচ্ছেদকল্পে জগতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় লইয়াই কৌটিল্যের সমাজ গঠিত হয় নাই। নিম্ন জাতির লোক মাত্রেরই উহাতে বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মাত্রেরই মত তিনি সমাজকে একটি জীবদেহ মনে করিয়া সকলকেই বিশিষ্ট স্থান দিয়া গিয়াছেন।

প্রজাসাধারণের সহিত রাষ্ট্রশক্তির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। রাজশক্তি কেবল দুষ্টের দমন করিয়াই পর্য্যবসিত হইত না; প্রজাকে সকল প্রকারে সাহায্য করাই ছিল রাজার ও রাজশক্তির আদর্শ। যে যেরূপ শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, রাজা রাজকোষ হইতে তাহার সেইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন রক্ষা, উৎকর্ষের উপায় ও ঐহিক পারত্রিক উন্নতি, সর্ব্ববিষয়েই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছিল। এগুলির সঙ্গে আবার ইউরোপের ন্যায় ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন ও অত্যাচার মিলিত হইত না। রাজা কখনও প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে হাত দিতেন না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে রাজার হস্তক্ষেপের কোন উপায়ই ছিল না।

প্রজার স্বায়ত্ব শাসনের বিশেষ উপায় ছিল। গ্রামে গ্রামবাসিগণ, নগরে নগরবাসিগণ, জাতির মধ্যে মণ্ডলেরা, সঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘমুখ্যেরা কর্তৃত্ব করিতেন। যখন বিপদ্ ইঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইত, তখন রাজা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজপ্রণীত বিধির ফলে সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারের উপায় ছিল না। অত্যাচার হিংসা সবই নিবারিত হইত। ধনবান্ কর্তৃক দরিদ্রের উৎপীড়নও নিবারিত হইত। দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ ও কর্ম্মকর দাসাদির বেতন নির্দ্ধারণাদির কথা বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র লোকহিতৈষণা ও অর্থনৈতিক বিধির উপর স্থাপিত হইয়াছিল।

ক্রমে সেই সকল আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ ভারতবাসীর দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি অশোকের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারত ক্রমে বিদেশী আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও লোকে কর্ম্মজীবন

ভুলে নাই। প্রয়োজনমত সংস্কার করিতে বা নূতন করিয়া গড়িতে পারিত। কিছু কাল পরেই হিন্দুশক্তি আবার উঠিয়াছিল। গুপ্ত, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পাল, সেনাদি নরপতিগণ দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ পুনরভ্যুদয় চিরস্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় সমাজের জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। ভারতবাসী এক একবার মাথা তুলিলেও নানা কারণে নিজের শক্তি বা তেজ অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। ইহার মূলে অনেকগুলি কারণ নিহিত আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সমালোচনা হয় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, অনেক-গুলি কারণেই ভারতবাসী নিজ শক্তির অপচয় করিয়াছে ও করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ এই,—(ক) কর্ম্মজীবনের আদর্শের বিকার, (খ) সামাজিক অবসাদ, (গ) স্বাধীন চিন্তার তিরোভাব, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, (ঙ) বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার ফল।

এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। ইহা ভারতের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই অবগত। ভারতবাসী ক্রমে নিজের শক্তি অপচয় করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মজীবনের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ প্রাচীন আদর্শের দোহাই দিয়া একেবারে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কর্ত্তব্য বিচার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবসাদের সঙ্গে অনেক উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজশক্তির বিলোপে, সমাজ-শক্তি ক্ষীণতর হইয়াছে। সর্ব্ব হিসাবেই এখন দৈন্য আসিয়াছে।

ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে সংশয় আসিয়াছে। আবার মাথা তুলিতে হইলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দুর্নীতির বিলোপ করিতে হইবে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই অভ্যুদয়ের যুগ। আর এখন গতানুগতিক হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুসমাজ পুনরায় গঠিত করিতে হইবে। আর এই পুনর্গঠনে কেবল প্রতীচ্যের আদর্শের অনুকরণে চলিলে হইবে না বা আমাদের নিজস্ব যাহা আছে, তাহার স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে আবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। দেশানুযায়ী সমাজ আবার নূতন করিয়া স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের "সতসঙ্গ"

আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ সহৃদয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নাই, তথাপি বলিতে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয়, আজ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যের অদ্বিতীয় ও অমূল্য রত্ন কবি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলালের "সতসঙ্গ" অর্থাৎ 'দোহা'-ছন্দে রচিত সপ্ত-শত শ্লোক-পূর্ণ হিন্দী কোষ-কাব্যখানি বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে কেবল অপরিচিত রহিয়াছে তাহা নহে, কবি বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্যের নামও বোধ হয়, অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট নূতন মনে হইবে। প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্বন্ধে বাঙ্গালা মাসিক-পত্রে ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলালের এই অতুলনীয় কাব্যের, প্রাচীন ব্রজ-ভাষার অধুনা অপ্রচলন হেতু দুরূহতার জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, উহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিহারীলালের "সতসঙ্গ" কাব্যখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু-সংখ্যক প্রতীচ্য পণ্ডিতের নিকট উহা কিরূপ অসাধারণ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তাঁহারা উহাকে হিন্দীর পাঠক-বর্গের নিকট সুপাঠ্য ও সুবোধ্য করার জন্য কিরূপ অদ্ভুত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদিগের স্বদেশের প্রায় সকল রত্নেরই প্রকৃত পরিচয় আমরা প্রথমে জানিতে পাইয়াছি সাহেবদিগের নিকট হইতে। এ ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে তাহাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না; নিজের কথাই বলিব। যৌবনের প্রারম্ভে যখন কলেজের ডিগ্রী লইয়া বাহির হইলাম, তখন অন্যান্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত হিন্দী-সাহিত্য বলিতে শুধু তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণই বুঝিতাম; হিন্দী-সাহিত্য যে কত বিস্তৃত—উহার গ্রন্থকারের সংখ্যা যে কত অসংখ্য, তাহার কোনও ধারণাই তখন ছিল না। তখন হইতেই বিদ্যাপতির ও অন্যান্য বৈষ্ণব-কবির ব্রজ-বুলি পদাবলী আমাদিগের অতি প্রিয় পাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখন আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ ব্রজ-বুলি ব্রজ-ধামেরই ভাষা এবং উহা হিন্দীরই রূপান্তর। তাই সেই ব্রজ-বুলি বা ব্রজ-ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য হিন্দী কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করার একটা প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু তুলসীদাসী রামায়ণ বা হিন্দী প্রেম-সাগর পড়িয়া আমাদিগের হিন্দী কাব্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না; বাঙ্গালা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় উহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও ভক্তি-কথা-পূর্ণ হইলেও কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য কিংবা বৈষ্ণব-কবিদিগের গীতি-কবিতা যাঁহাদিগের তরল চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাঁহাদের নিকট সে শান্ত-রস-প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল লাগিবে কি প্রকারে?

তাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেম-গীতির ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের আদি-রস-পূর্ণ রস-রচনার মত কোনও হিন্দী কাব্য পড়ার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, আর হিন্দীতে সেরূপ কোনও কাব্য আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠিক এমন সময়ে সাহেবদিগের ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশন্‌ প্রেস হইতে প্রকাশিত অল্প মূল্যের একখানি ইংরাজী পুস্তিকায় ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীদিগের দেশ, জাতি ও ভাষা ইত্যাদির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পড়িতে পড়িতে হিন্দী-সাহিত্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তুলসীদাসের 'রামায়ণ' ও বিহারীলালের 'সতসঈ' কাব্যের প্রশংসা দেখিতে পাইলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসরের আগের কথা—তাই সে পুস্তিকাখানির নাম বা উহাতে লিখিত কথা-গুলি ঠিক মনে নাই; কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, হিন্দী-সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাত্র একটী প্যারায় মধ্যে হিন্দীর অন্য কোন গ্রন্থের নাম-মাত্রও উল্লেখ ছিল না। লেখক বিহারী-লালের 'সতসঈ' কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত এই কিংবদন্তীরও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কবি ঐ সাত শত দোহা রচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিপালক মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে প্রত্যেকটী দোহার পুরস্কারস্বরূপ একটী স্বর্ণময় আশ্‌রফী-মুদ্রার হিসাবে সাত শত আশরফী পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া এক খণ্ড 'সতসঈ' কাব্য সংগ্রহ করার জন্য একান্ত আগ্রহ হইল; কিন্তু কোথাও মুদ্রিত 'সতসঈ' কাব্যের ঠিকানা পাইলাম না। এমন সময়েই এক দিন কলিকাতার বটতলায় মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর খোঁজ করিতে যাইয়া নৃত্যলাল শীলের দ্বারা প্রকাশিত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত "বিহারী-সতসঈ" দেখিতে পাইয়া দুই আনা মূল্যে উহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া আনিলাম। বটতলার মুদ্রা-যন্ত্রের মাহাত্ম্য সকলেই বেশ জানেন; সুতরাং "বিহারী-সতসঈ" কাব্যের এই সুলভ সংস্করণটী যে কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। এই সংস্করণে কেবল দোহাগুলির নিতান্ত অশুদ্ধি-পূর্ণ মূল-মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; টীকা-টিপ্পনী কিছু মাত্র ছিল না; তদ্ভিন্ন হিন্দী গ্রন্থের সনাতন মুদ্রাঙ্কন-রীতি অনুসারে বিভিন্ন শব্দগুলির মধ্যে কোনও ফাঁক না দিয়া,—'মেরী ভব-বাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়' ইত্যাদি স্থলে 'মেরীভববাধাহরৌরাধানাগরিসোয়' ইত্যাদিবৎ মুদ্রিত করায় যে কাব্যকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্সন মহোদয়—'one of the most difficult books in any Indian language' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই কাব্যের মর্ম্ম-গ্রহ করা যে একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তবে তৎপূর্ব্বে হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণ, প্রেম-সাগর, বেতাল-পচিশী প্রভৃতি পাঠ করিয়া হিন্দী ভাষায় একটু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাই খুব সোজা দুই চারিটী দোহার মোটামুটি অর্থ না বুঝিতে পারিলাম, তাহা নহে। ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, বিহারীলাল কবিত্ব-শক্তিতে সংস্কৃত-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যের রচয়িতা অমরু কিংবা গোবর্দ্ধনাচার্য্য হইতে কম নহেন। তাই বিহারী-সতসঈ কাব্যখানা ভাল করিয়া পড়ার জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মিল। আমরা সটীক সংস্করণ

বলিতে যাহা বুঝি, "বিহারী-সতসঈ" কাব্যের সেরূপ কোনও সংস্করণ তখন পাওয়া যাইত না, তাই লক্ষ্ণৌ সহরের প্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থ-প্রকাশক মুন্সী নওলকিশোরের নিকট লিখিয়া এক টাকা মূল্যে কৃষ্ণ কবকৃত টীকা-সম্বলিত 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের যে সংস্করণটী আনাই-লাম, তাহা পড়িয়া আরও হতাশ হইলাম। দেখিলাম, কৃষ্ণ কবি বিহারীলালের দোহার দুরূহ শব্দের অর্থ কিম্বা সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ না লিখিয়া, কেবল ঐ দোহার মর্ম্ম লইয়া সুদীর্ঘ 'কবিত্ত' ও 'সবৈয়া' ছন্দে নিজের কবিত্ব জাহির করিয়াছেন। এ যেন সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের সূত্র-ভাষ্য। স্বল্পাক্ষর সূত্রটীর শব্দার্থ দ্বারা মোটামুটি যাহা বুঝা যায়, ভাষ্যের বাগাড়ম্বরে যেন উহাও গোলমাল হইয়া যায়। দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ-জ্ঞানের জন্য ভাষ্য ও টীকার তর্ক-গহনে প্রবেশ না করিলেই চলে না, কিন্তু কাব্যের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন 'বিহারী-সতসঈ' সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবৃহৎ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,— 'Twenty years ago, I began to translate him in English and after all that time, I have only been convinced of the impossibility of the adequate performance of the task at my hands. As any attempt of mine would spoil the original by weakening its conciseness and by rounding off the polished corners of its many jewels, I shall not venture to give here any examples in English of its beauties.' যেখানে মূলানুযায়ী অনুবাদেই এই দুর্দ্দশা, সেখানে বিহারীলালের দোহার অপরিবর্ত্ত-সহ, সুপ্রযুক্ত কয়েকটী শব্দের পরিবর্ত্তে ভাল-মন্দ অন্ততঃ চতুর্গুণ কথা বলিয়া, উহার মাধুর্য্য বুঝাইতে যাওয়া যে কিরূপ দুঃসাহসের কার্য্য, উহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য। তাই কৃষ্ণ-কবির টীকা (?) বা ছায়া-কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। অগত্যা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পুরাণ-পাঠক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ধরিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামীর প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিহারীলালের দোহার অর্থ বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু আমাদিগের এই চেষ্টাও সফল হইল না। দেখিলাম, পণ্ডিতজী নিজে দোহার অর্থ যেমনই বুঝিয়া থাকুন না কেন, তিনি পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিশব্দ দিয়া বুঝাইতে অক্ষম; তাঁহার ব্যাখ্যায় দোহার যে একটা অস্পষ্ট অর্থ পাওয়া গেল, উহার কতটুকু বিহারীলালের, আর কতটুকু তাঁহার নিজস্ব, তাহা বুঝা গেল না; সুতরাং তাঁহার নিকট আমাদের পাঠ লওয়া বন্ধ করিতে হইল। ইহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আর আমাদিগের 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের চর্চ্চা করার কোনই সুযোগ ঘটে নাই। তার পরে একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে পুরাতন পুস্তকের দোকানে সুলভ মূল্যের ভাল বই তালাস করিতে যাইয়া, বঙ্গবাসী ষ্টিম-মেসিন প্রেসে দেব-নাগর অক্ষরে মুদ্রিত প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের টীকা-সমেত এক খণ্ড "বিহারীকী সতসঈ" দেখিতে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। এক টাকা মূল্যের বইখানি চারি আনা দিয়া খরিদ করিয়া আনিয়া একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই বিহারীর কবিত্ব-রসের আস্বাদ

গ্রহণের জন্য লাগিয়া পড়িলাম। এই সংস্করণটী ১৯৫১ সংবতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৯৬ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্কনের বোধ হয়, দুই এক বৎসর পরেই উহা আমাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। প্রভুদয়ালু পাড়ে 'টাইটেল-পেজ'এ 'মাথুর চতুর্ব্বেদী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি মথুরা-বাসী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রজ-ভাষার উপর তাঁহার বেশ দখল ছিল; তাই ডাক্তার ফ্যালনের প্রকাশিত সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হিন্দী অভিধানেও 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের যে সকল প্রাদেশিক শব্দ ও প্রচরদ্রূপ (idiomatic) বাক্যের অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই, পাঁড়েজীর টীকায় সে সকলের অর্থ এবং সে সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভাষা-তত্ত্বালোচনা (philological discussion) দেখিতে পাইলাম। পাঁড়েজী বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী ব্যাখ্যা-লেখকদিগের ব্যাখ্যা-পদ্ধতির সহিত অপরিচিত ছিলেন না; তাই বাঙ্গালা ছাপাখানার সটীক সংস্কৃত কাব্যের ধরণে মূলের শব্দগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া ছাপাইয়া, প্রথমে দোহার অন্বয়, তার পরে সরল অর্থ এবং অবশেষে শব্দ-ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্যের প্রকৃত পরিচয় দিতে যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার অনেক দোহাই সটীক উদ্ধৃত করিতে হইবে; সুতরাং পাঁড়েজীর টীকার নমুনাস্বরূপ এখানে প্রথম মঙ্গলাচরণের দোহাটী উদ্ধৃত করিলে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে বলিয়া, আমরা উহা বঙ্গাক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম। অতঃপরও এরূপ বঙ্গাক্ষরই ব্যবহার করিব।

মেরী ভব্‌বাধা হরো রাধা নাগরি সোই।
জা-তনকী ঝাঁঈ পরৈ শ্যাম হরিত দুতি হোই॥

অন্বয়,—সোই রাধা নাগরি মেরী ভববাধা হরো,
জা তনকী ঝাঁঈ পরৈ শ্যাম দুতি হরতি হোই।

সরলার্থ,—ৱহী* রাধা নাগরী মেরী সংসারকী যন্ত্রণাকো হরে, জিস্‌কে শরীরকী ছায়া পড়নেসে শ্রীকৃষ্ণকী দ্যুতি হরে ৱর্ণকী হো জাতী হৈ। মঙ্গলাচরণ্‌ হৈ। শ্রীকৃষ্ণকী নীলকমলৱৎ কান্তিমেঁ রাধাজীকী পীতচম্পকৱৎ কান্তিকী ছায়া পড়নেসে শ্রীকৃষ্ণকী দেহদ্যুতি হরিদ্বর্ণকী হো জাতী হৈ, যুগল-মূর্ত্তিকা ধ্যান হৈ। নীলে ঔর পীলেকে সংযোগসে হরা রঙ্গ সিদ্ধ হোতা হৈ। শব্দব্যুৎপত্তি; নাগরি—নাগরী, নগরকী রহনেৱালী, চতুর। ঝাঁঈ—ঝলক, ছায়া॥"

পাঠক দেখিবেন, টীকাটী বেশ সরল। তবে হিন্দী-ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য যেমনটি আবশ্যক—'মেরী,' 'হরো,' 'সোই,' 'তন্‌' প্রভৃতির স্বতন্ত্র অর্থ দেওয়া হয় নাই; তথাপি সরলার্থের সহিত মিলাইয়া পড়িলে মোটামুটি অর্থ বুঝিতে ক্লেশ হয় না।

এটী বোধ হয়, 'বিহারী-সতসঈ'এর একটি অতি প্রাঞ্জল দোহা, কিন্তু পাঁড়েজীর টীকা পড়িয়া দোহার প্রকৃত তাৎপর্য্য তো বুঝা গেল না। শ্যাম বর্ণের উপর পীত বর্ণের ছটা

---

* বাঙ্গালার অন্তঃস্থ 'ব'এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকায় তৎস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর অনুকরণে 'ৱ' অক্ষর (উচ্চারণ ইংরাজী 'wa' বা 'va') ব্যবহৃত হইল। উদ্ধৃত হিন্দী অংশে 'স' এর উচ্চারণ ইংরাজী 's' বৎ হইবে।

পড়িলে উভয় বর্ণের মিশ্রণে যে হরিৎ অর্থাৎ সবুজ কান্তির উদ্ভব হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন; যুগল-মূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ অথচ নূতন স্বভাব-বর্ণনা যে, কবির অসাধারণ মৌলিকতার পরিচায়ক, তাহা বেশ বুঝা গেল; কিন্তু ইহা দ্বারা ভব-পীড়া হরণ সম্বন্ধে শ্রীরাধার বিশেষ শক্তিমত্তা যে কোথায়, তাহা প্রকাশ পাইল না,—শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার নিকটে সেরূপ প্রার্থনারও কোন সার্থকতা বুঝা গেল না; সুতরাং মঙ্গলাচরণের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িল। * 'বিহারী-সতসঈ'এর প্রাচীন ও নবীন নানা টীকা পড়িয়া এখন এ কথা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তখন পাঁড়েজীর টীকার বেশী আর যে কিছু অর্থ থাকিতে পারে, এরূপ মনেই হয় নাই। তবে কতকগুলি দোহায় পাঠ-বিভ্রাটের জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, পাঁড়েজীর ব্যাখ্যাও ভাল লাগিল না। মনে হইল, যেন শুধু দায়ে পড়িয়াই তিনি গোঁজা-মিল্ দিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ব্যাখ্যা বুঝি তাঁহার নিজেরও মনঃপূত হয় নাই। তার পরে পাঁড়েজীর সংস্করণে প্রেসের অথবা দপ্তরীর গোলযোগে ২২৫ হইতে ২৫৬ পর্য্যন্ত পাতাগুলি না থাকায় ৫৯৭ হইতে ৬৮২ সংখ্যক দোহার টীকা পাওয়া যায় নাই।† সুতরাং পাঁড়েজীর প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাঁহার এই টীকা পড়িয়াও আমরা তেমন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। তাঁহার টীকার সাহায্যে বিহারীলালের কাব্যের রসাস্বাদন অনেকটা সুসাধ্য হওয়ায় উহা পূর্ণ-মাত্রায় উপভোগ করার জন্য বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎসুক হইয়া উঠিলাম। কিন্তু 'বিহারী-সতসঈ'এর প্রাচীন কিম্বা নবীন অন্য কোন টীকাই তখন সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই খুঁজিতে যাইয়া সময়ে সময়ে অচিন্তিত-ভাবে কিরূপ অমূল্য ও অপ্রাপ্য গ্রন্থ-রত্ন হস্তগত হয়, তাহা বোধ হয়, অনেক পাঠকেরই অজ্ঞাত নহে; একবার এ অভ্যাস জন্মিলে তাহা কখনও ছাড়ান যায় না; আমাদিগেরও এই বই খোঁজার বাতিক পুরা মাত্রায়ই জন্মিয়াছিল, তাই সুযোগ পাইলেই কলেজ ষ্ট্রীটের পুরাতন-পুস্তকালয়ে গুপ্ত রত্নোদ্ধারের জন্য অভিযান করিতে পশ্চাৎ-পদ হইতাম না। এইরূপ একটা অভিযানে যাইয়া মিষ্টার (তখন ডাক্তার বা স্যর নহে) গ্রিয়ার্সনের প্রণীত "The Modern Vernacular Literature of Hindusthan" নামক দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। এই বহিখানির 'টাইটেল পেজ'এ লেখা আছে,—printed as a Special Number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I for 1888. এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত কোনও গ্রন্থই এক বার ফুরাইলে আর পুনরায় মুদ্রিত হয় না; সুতরাং এই গ্রন্থখানাও এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন মহোদয় Garcin de Tassy প্রণীত "History

* 'মেরী ভব বাধা' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণের দোহার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য পরে যথাস্থলে ব্যাখ্যাত হইবে।

† প্রথমে মনে হইয়াছিল, আমাদের বইখানিই বুঝি শুধু খণ্ডিত; পরে কলিকাতায় ও কাশীতে এই সংস্করণের আরও কয়েকখানা বই দেখিয়াছি। সকলগুলির একই অবস্থা।

of Hindui and Hindūstanī Literature", মুন্সী নওলকিশোরের লক্ষ্ণৌ প্রেস হইতে প্রকাশিত 'শিব সিং সরোজ' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ অবলম্বনে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নয় শত বায়ান্ন জন হিন্দী কবি ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই বহু জ্ঞাতব্য-পূর্ণ বহিখানিতে আমাদিগের প্রিয় কবি বিহারীলালের সম্বন্ধে কি মন্তব্য লিখা আছে, সাগ্রহে বাহির করিয়া পড়িলাম; গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন,—"Bihārī Lāl Chaubé of Braj. Fl 1650 A. D.

Sat., Nir., Rāg. One of the most celebrated authors of India, his fame resting on his *Sat Saī* (Rāg), or collection of seven hundred dôhās, for each line of which he received a reward of a gold *ashrafi* from king *Jai Singh.* The elegance, poetic flavour, and ingenuity of expression in this difficult work are considered to have been unapproached by any other poet. * * * *

Bihārī's poem has been dealt with by innumerable commentators. Its difficulty and ingenuity are so great that it is called a veritable *Akṣara-Kāmadhenu.* The best commentary is that by *Surati Misar* (No. 326) Agarwālā.

* * * *

Amongst those who have commented on the Sat Saī may be mentioned *Chandr* (No. 213), *Gopal Saran* (No. 215). *Surati Misar* (No. 326), *Krish'n* (No. 327), *Karan* (No. 346), *Anwar Khan* (No. 397), *Zalfaqār* (No. 409), *Yusuf Khan* (No. 421), *Raghu Nath* (No. 559), *Lal* (No. 561), *Sardar* (No. 571), *Lallū Ji Lāl* (No. 629), *Ganga Dhar* (No. 811), *Ram Bakhsh* (No. 907).

কৃষ্ণ কবির অদ্ভুত টীকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উহা ছাড়া গ্রিয়ার্সনের উল্লিখিত আর কোনও টীকাই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগেরও যে শোচনীয় অজ্ঞতা আছে, তাহা অনেকটা দূর হওয়ায়, হিন্দী-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের খোঁজ পাইয়া, মুন্সী নওলকিশোরের প্রেস হইতে প্রকাশিত মালিক মহম্মদ জায়সীর সুপ্রসিদ্ধ 'পদ্মাবৎ,' কেশবদাসের 'কবি-প্রিয়া,' উদয়নাথের (কবীন্দ্র) 'রস-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি কাব্যগুলি আনাইয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণের অভাবে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তথাপি 'গ্রন্থস্য গ্রন্থান্তরং টীকা'—এই প্রাচীন সূক্তিটীর উপর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকায়, এই সকল গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করিয়াই একটীর দ্বারা অন্যটীর টীকার কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ ভাবে হিন্দীর কাব্য-চর্চ্চা খুব

বেশী দিন চলিল না। গত দশ বার বৎসর কাল যাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীর সংগ্রহ, সম্পাদন ও আলোচনায় বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া হিন্দী-সাহিত্যের বড় একটা খোঁজ-খবর লইতে পারি নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে হিন্দী-সাহিত্যের গ্রন্থ-ভাণ্ডার কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় দেখিতে পাই, সংযুক্ত প্রদেশের (United Provinces) বিজনৌর জেলার অন্তর্গত নায়কনগলা (পোঃ চান্দপুর) নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহাশয় 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের সমালোচনাত্মক একখানা হিন্দী গ্রন্থ লিখিয়া "শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ-পারিতোষিক-সমিতি" হইতে নগদ ১২০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এই সংবাদটী পড়া মাত্রই ঐ সমালোচনা পড়িবার ইচ্ছা প্রবল লইল। হিন্দী ভাষায় দেব-নাগর অক্ষরে পত্রাদি লিখার তেমন অভ্যাস নাই; পণ্ডিতজী ইংরেজী জানেন কি না, তাহাও জানি না; তাই, অগত্যা কোনও প্রকারে তাঁহার নিকট হিন্দীতে একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের ঠিকানায় ভি-পি ডাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইলাম এবং সাগ্রহে ঐ পুস্তকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ভি-পি পার্শ্বেলের পরিবর্ত্তে রেজেষ্টরী বুক-পোষ্টে ঐ পুস্তক ও প্রত্যুত্তরে একখানা পোষ্ট-কার্ড আগত হইল। পণ্ডিতজী নায়কনগলা হইতে ৬—৫—২৩ তারিখে লিখিলেন,—"আপ্‌কা হিন্দী মেঁ লিখা কৃপা-পত্র পাকর পরম প্রসন্নতা হুঈ, বঙ্গভাষা-ভাষী ঔর্ অংগ্রেজীকে বিদ্বান্ হো কর ভী আপ্ হিন্দীপ্রেমী হৈ, যহ্ জান্‌কর্ 'আশ্চর্য্য' হুআ, অস্তু, "বিহারীকী সতসঈ" (ভূমিকাভাগ) আপ্‌কে হিন্দী-প্রেম্‌কে পুরস্কারমেঁ আপ্‌কো ভেজ্ রহা হূঁ, স্বীকার কীজিয়ে, ইস্‌কা দুস্‌রা ভাগ্ ভী কুছ্ দিনোঁ পীছে ভেজ্ংগা, যহাঁ উস্‌কী কোঈ কাপী নহীঁ হৈ যথাসময় যাদ্ দিলাইএ।" পণ্ডিতজীর এই উদারতায় যেরূপ বিস্মিত ও আপ্যায়িত হইলাম, তেমনি বঙ্গভাষা-ভাষী ইংরেজীনবিশ যে হিন্দীর প্রেমিক ও 'বিহারী-সতসঈ'এর গ্রাহক হইতে পারেন, ইহাতে পণ্ডিতজীকে 'আশ্চর্য্য' হইতে দেখিয়া আমাদিগের দশার কথা ভাবিয়া যথেষ্ট লজ্জিত ও দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। পণ্ডিতজী 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের বিশেষজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের খণ্ডিত সংস্করণের অপ্রাপ্য অংশের কোনও 'পত্তা' দিলেও দিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আরও ভাল কোন সংস্করণের খোঁজ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইতে পারে বিবেচনায় সে সম্বন্ধেও তাঁহার উপদেশ চাহিয়াছিলাম; তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা 'বঙ্গবাসী প্রেস' কল্‌কত্তাসে প্রকাশিত হুঈ হৈ, বহীঁ সে মিলেগী। ডাক্‌টর গ্রিয়র্সন্ দ্বারা সম্পাদিত হোক্‌র (ইংলিশ ভূমিকা সহিত) গবর্ণমেণ্ট প্রেস কল্‌কত্তাসে সতসঈকী "লালচন্দ্রিকা" টীকা প্রকাশিত হুঈ থী অব্ অপ্রাপ্য হৈ, কহীঁসে প্রাপ্ত হো সকে তো লেকর পঢ়িএ। প্রভুদয়ালুকী টীকা অশুদ্ধ হৈ, ভ্রষ্ট হৈ, উস্ পর আস্থা ন কীজিএ।" ইহারই দুই চারি দিন পরে পুনরায় লিখিলেন,—"আপ

ডাক্‌টর্ গ্রিয়র্সন্‌বালা সংস্করণ কহীসে প্রাপ্ত কর্‌কে অবশ্য দেখিয়ে, উস্‌কী অংগ্রেজী ভূমিকা সে সতসঈকে সম্বন্ধমেঁ আপ্‌কো অনেক্ জ্ঞাতব্য বাতেঁ বিদিত হোঁগী। উক্ত সংস্করণ বহুত দিন হুএ গবর্ণমেণ্ট্ কল্‌কত্তে মেঁ ছপা থা, অব্ অপ্রাপ্য হৈ, পর আপ্ চাহেঙ্গে তো কিসী প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় যথা ইম্পিরীয়ল লাইব্রেরী কল্‌কত্তা আদিমেঁ আপ্ উসে পা সকেঙ্গে। উহ আপ্‌কে লিয়ে অবশ্য দ্রষ্টব্য হৈ। প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা অচ্ছী নহীঁ হৈ, বহুত অশুদ্ধ হৈ। * * * এক্ দূসরা টীকাভী বিদ্যার্থিয়োঁকে লিয়ে অচ্ছী নিকলী হৈ— উস্‌কা নাম "বিহারীবোধনী" লালা ভগবান দীনকৃত হৈ। বহ আপ্‌কো "হিন্দী পুস্তক এজেন্সী" ১২৬ হরীসন্ রোড কল্‌কত্তা সে ২৲ রু॰ কো মিলেগী, উসে ভী মঙ্গা লী-জিএ।" কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী হইতে ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের সম্পাদিত 'লাল-চন্দ্রিকা' সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে, তাই হিন্দী-পুস্তক এজেন্সী হইতে ২৷৽ টাকা মূল্যে লালা ভগবান দীনের কৃত 'বিহারীবোধনী' এক খণ্ড আনাইয়া পাঠ করিলাম। দেখিলাম, ইংরেজী ১৯২১ সালে কাশীর 'সাহিত্যসেবা-সদন' কর্তৃক প্রকাশিত 'রত্ন-মালা' গ্রন্থাবলীর ১ম রত্নরূপে উহা কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লালাজী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লালাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাত-নামা অধ্যাপক ; সুতরাং তাঁহার টীকা 'বিদ্যার্থিয়োঁকে লিয়ে অচ্ছী' হওয়ারই কথা ; বস্তুতঃ লালা-জীর এই টীকাতে নব্য ধরণে একটি নাতি-বিস্তৃত ভূমিকা এবং দোহাগুলির সংখ্যা-সূচক অকারাদি-ক্রমে সূচী-পত্র, গ্রন্থ-শেষে অতি-সংক্ষিপ্ত শব্দ-কোষ সংযোজিত হইয়াছে। 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যে আধুনিক হিন্দীর অপ্রচলিত প্রাচীন ব্রজ- ভাষার শব্দ এত অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে যে, শব্দ-কোষটী ইহার অন্ততঃ চতুর্গুণ বড় হইলেও বুঝি অসঙ্গত হইত না। লালা-জী প্রত্যেক দোহার নীচে 'শব্দার্থ', 'ভাবার্থ', 'বিশেষ', 'অলঙ্কার' ইত্যাদি ছোট ছোট হেডিংএ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রভুদয়ালুর পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকার সহিত তুলনা করার জন্য আমরা তাঁহার প্রথম দোহার টীকাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"দো°—মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তন কী ঝাঁঈ পরে স্যাম হরিত দুতি হোয়॥

শব্দার্থ—ভববাধা = জন্ম মরণ কা দুঃখ। জা তন কী = জিসকে শরীর কি। ঝাঁঈ = ছায়া। স্যাম—শ্রীকৃষ্ণ। হরিতদুতি = আনন্দিত।

ভাবার্থ—বে হী রাধা নাগরী মেরে জন্ম মরণ কে দুখোঁ কো দূর করেঁ, জিন্‌কে শরীর কী ছায়া পড়্‌তে হী শ্রীকৃষ্ণ জী ভী (জো স্বয়ং আনন্দমূর্ত্তি হৈঁ) আনন্দিত হো জাতে হৈঁ।

বিশেষ—ইস্ দোহে মেঁ কবি শ্রীরাধিকা জাকো কৃষ্ণ সে ভি বড় কর্ আনন্দদায়িনী শক্তি মান্‌কর্ নিজ্ দুঃখ হরণ্ কী প্রার্থনা কর্‌তা হৈ।

অলঙ্কার—কাব্যলিঙ্গ। (কাব্যলিঙ্গ জহঁ যুক্তি সোঁ অর্থ সমর্থন হোয়)।

(সূচনা)—হমারী সম্মতি মেঁ 'হরিতদুতি' কা অর্থ হোনা চাহয়ে "হরী গঈ হৈ দ্যুতি জিস্‌কী"। ইসী অর্থ সে রাধিকা জীমেঁ 'ভববাধা' হর্‌নে কী শক্তি কা হোনা প্রতিপাদিত হোকর্ 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কার সিদ্ধ হো সকৃতা হৈ।

এই দোহাটী প্রভুদয়ালু পাঁড়ের টীকার সহিত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সেখানে দেখিয়াছি যে, পাঁড়েজী তাঁহার টীকায় শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া, শ্রীরাধার নিকট সংসার-তাপ হরণের প্রার্থনার কোনও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। লালা-জীর সূচনার উক্তি দ্বারা ইহার সুন্দর সমাধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহার মাত্র ছায়ার সাহায্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি অপহৃত হওয়ায় তিনি 'হরিত-দ্যুতি' হইয়া থাকেন, তাঁহার অলৌকিক হরণ-শক্তি এবং উহার প্রভাবে ভক্ত কবির সংসার-তাপ-কালিমা অপহৃত হইবে, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কিন্তু 'হরিত-দ্যুতি' শব্দের শুধু এই একটী মাত্র অর্থই কি কবির অভিপ্রেত? শ্রীরাধার (পীত-বর্ণের) ছায়া-পাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি বিদূরিত হইলে, তৎস্থলে তাঁহার আর একটী কান্তি তো অবশ্যই সঞ্জাত হইবে; সেই কান্তিটী যে কি, তাহা না বলিলে এই বর্ণনা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য থাকিয়া যায়। বিহারীলাল এরূপ অসতর্ক কবি ছিলেন না; তিনি 'হরিত-দ্যুতি' এই শ্লিষ্ট অর্থাৎ বহু-অর্থ-যুক্ত শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা বেশী না হউক, অন্ততঃ 'অপহৃত-কান্তি-যুক্ত' ও 'সবুজ-কান্তি-যুক্ত' এই দুইটী অর্থই যে লক্ষ্য করিয়াছেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ, উহার কোনও একটী অর্থ স্বীকার করিয়া অন্যটী স্বীকার না করিলে অর্থের গুরুতর অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। কোনও কোনও টীকাকারের স্বীকৃত 'আনন্দিত' অর্থ সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা যায় না। ঐ 'আনন্দিত' অর্থ আদৌ কবির অভিপ্রেত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। লালাজীরও বুঝি 'আনন্দিত' অর্থ টী খুব ভাল লাগে নাই, তাই 'ভাবার্থ' বলিয়া প্রাচীন মতের সেই 'আনন্দিত'-অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় সূচনায় 'হমারী সম্মতি মেঁ' বাক্যের দ্বারা নিজের অভীষ্ট ব্যাখ্যাটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পাঁড়েজীর টীকায় যে দোহাগুলির অর্থ আমাদিগের মনঃপূত হয় নাই, লালা-জীর টীকায় সেইগুলির অধিকাংশেরই বেশ সঙ্গত অর্থ জানিতে পারিয়া জ্ঞান-পিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহোদয় কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের সম্পাদিত 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সংগ্রহ করার জন্য উৎসুক হইলাম। পণ্ডিত-জীর সহিত আমাদিগের সেই অবধি পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল; আমরা 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই জানিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ব্যবহার্য্য ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের সংস্করণটী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পাদিত 'সঞ্জীবন-ভাষ্য' দপ্তরীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে নাই—অথচ আমরা উহার জন্য নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তাঁহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের ফাইলকাপিগুলিও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন। পণ্ডিতজীর ভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী, সুবৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আমরা উহার কথা সকলের

শেষে বলিব। তৎপূর্ব্বে 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা ও ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের ভূমিকার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

'লাল-চন্দ্রিকা' টীকাটী কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হিন্দীর অধ্যাপক লাল্লুলাল কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ইংরেজী ১৮১৯ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সহ 'বিহারী-সতসঈ' হিন্দীর অনার-পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। লাল্লুলালের এই সংস্করণ দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য হওয়ায় ডাক্তার গ্রিয়ার্সন মহোদয় ইংরেজী ১৮৯৫ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রেস হইতে উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন করেন। ইহাতে ২১ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ইংরেজী ভূমিকা, হিন্দী-ভাষার সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ (Rhetoric) 'ভাষা-ভূষণ' ও উহার সটীক ইংরেজী অনুবাদ ১১৪ পৃষ্ঠা, উজ্জ্বল লাল কালীতে মুদ্রিত মূল দোহা সহ 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা ২৯৩ পৃষ্ঠা, Additional Notes নামে লাল-চন্দ্রিকার অতিরিক্ত হিন্দী-টীকা ২১ পৃষ্ঠা এবং 'লালচন্দ্রিকা', 'হরিপ্রকাশ,' 'অনবরচন্দ্রিকা,' 'কৃষ্ণদত্ত কবির টীকা,' 'শৃঙ্গার-সপ্তশতী' ও 'রসকৌমুদী' টীকাগুলির স্বীকৃত ক্রম অনুসারে দোহাগুলির সংখ্যা-নির্দ্দেশাত্মক সূচীপত্র ৩৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোটে বৃহৎ আকারের ৪৮৫ পৃষ্ঠা আছে। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। বিহারীলাল সংস্কৃতের কবিদিগের অনুকরণে 'সতসঈ' কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের বর্ণিত নানা প্রকারের 'ধ্বনি' ও অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে টীকার অথবা মূল দোহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ জন্যই গ্রিয়ার্সন যশবন্ত সিংহের রচিত 'ভাষা-ভূষণ' নামক প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নাতিবিস্তৃত হিন্দী অলঙ্কার-গ্রন্থখানির মূল ও সটীক ইংরেজী অনুবাদ 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সম্পাদনে ডাক্তার গ্রিয়ার্সনকে যে কিরূপ অদ্ভুত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা Prefaceএর—"The preparation of this book has been no light task and more than a fair share of my eye-sight lies buried in it" উক্তি হইতেই বুঝা যাইতে পারিবে।

বিহারীর 'সতসঈ' গীতি-কাব্য (Lyric poetry) এবং কোষ-কাব্যের (Detached verses) লক্ষণাক্রান্ত। ইহার বিশেষত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় সংস্কৃত গীতি-কাব্যের আদর্শস্বরূপ ঋক্‌বেদের স্তোত্র-সমূহের এবং কালিদাসের 'মেঘদূত,' 'ঋতুসংহার' ও চৌর-কবির বিরচিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ গীতি-কাব্য হইতে কোষ-কাব্যের বিশেষত্ব দেখাইতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"The lotus bloom of Indian verse is its lyric poetry" * * * "It is however in its detached verses—sonnets if I may use the expression —that the genius of Indian lyric poetry has reached its full perfection. These brief quatrains, miniatures, each portraying by means of a few lines drawn by a master-hand little pictures complete alike in its

nature and in its art, coloured with all the richness which a copious and flexible language could give, attracted the attention of Western admirers at an early stage of the intercourse between Europe and India." কোষ-কাব্যের অতি প্রাচীন আদর্শ প্রাকৃত-ভাষার গাথা-সপ্তশতী বা হাল-সপ্তশতিকা যে ধ্বনি-প্রধান গীতি-কাব্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের অবিদিত নহে। মহাকবি বাণ ভট্ট হর্ষচরিতের প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী শ্রেষ্ঠ কবিদিগের প্রশস্তি-প্রসঙ্গে সাতবাহন ওরফে হাল নৃপতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই কোষ-কাব্যখানির মুক্ত-কণ্ঠে গুণ-কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। * এই প্রাকৃত ভাষার গাথা-সপ্তশতী ও জয়দেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত আদি-রসের অদ্বিতীয় কবি † গোবর্দ্ধন আচার্য্যের 'আর্য্যা-সপ্তশতী'—এই দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যের আদর্শে বিহারীলাল হিন্দী-ভাষায় 'সতসঈ' রচনা করেন, সুতরাং তাঁহার কাব্যের প্রকৃত যাচাই করিতে হইলে প্রাকৃতের গাথা-সপ্তশতী ও সংস্কৃতের আর্য্যা-সপ্তশতীর সহিত বিশেষভাবে তুলনা করা আবশ্যক ; পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মা ব্যতীত প্রাচীন কিংবা নব্য কোন লেখকই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার তুলনাত্মক সমালোচনা এ জন্যই হিন্দী-সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ কাব্য-সমালোচনার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বিহারীলালের কাব্যের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে পণ্ডিতজীর তুলনাত্মক সমালোচনা (ভূমিকা-ভাগ) ও 'সঞ্জীবন-ভাষ্যে'র সাহায্য লওয়া অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর কোনও উপায় নাই ; সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই উহা হইতে বহু স্থল উদ্ধৃত করিতে হইবে ; তৎপূর্ব্বে ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় বহু-ভাষা-বিৎ, সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ভারতের এই অপূর্ব্ব কোষ-কাব্যগুলির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

গ্রিয়ার্সন তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"The oldest and one of the most admired is the Sapta-Śatikā or Seven centuries of Hāla, written somewhere about the fifth century A. D. We have here some seven hundred verses in one of the Prakrit languages, over which critic after critic has exhausted the vocabulary of praise. Professor Weber who first drew attention to this dainty work in 1866 speaks of it as a collection of tiny masterpieces of art, village idylls in the smallest imaginable frames. Dr. Von Schroeder, their latest describer, praises some as purely lyrical and others as resembling the most charming little genre

---

* অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥ – হর্ষচরিতম্।

† শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ * * * ॥ – গীতগোবিন্দম্।

pictures, *proving* once more the talent of the Indians for miniature painting"

* * * * *

"Bihārī-lāl, the author of the 'Sat-saī or Seven Centuries, on which the Lāla-Chandrikā is a commentary was the legitimate successor of Hāla. Like him he wrote in the vernacular of his time seven centuries of verselets, each a complete little poem in itself."

পুনশ্চ—

"Bihārī-lāl has been called the Thompson of India : but I do not think that either he or any of his brother lyric poets of Hindusthan can be usefully campared with any Western poet. I know nothing like his verses in any European language. Let it be remembered that each couplet is complete in itself, and that none of them can contain more than fortyeight syllables, while many of them contain only twenty-six. Each verse must be one whole—an entire picture, —frame and all. These facts will give some idea of the skill necessary for success in this most difficult miniature painting. That he has succeeded is the unanimous verdict of every scholar European or Native who has read the Sat-Saī. I myself was first led to do so by the enthusiastic praises of an old Baptist missionary, a worthy descendant of the great Carey, and during the twenty years, which have since elapsed, I have never failed to find fresh pleasures in its study and fresh beauties in the danity word-colouring of the old master."

পুনশ্চ—"Owing,however, to the extreme conciseness of style rendered necessary by the small scale on which the author worked, it is one of the most difficult books in any Indian language. * * *

"Alliteration, the pun, the paranomasia, in no way makes his verses easy reading and would, indeed, tend to disgust the student brought up in Europe and accustomed to the severer graces of Hellenic poetry, did not the admirable polish and completeness of the whole compensate for the labour involved in ascertaining all his meaning."

বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় প্রাচীন কবির ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা-লাভ ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় প্রতীচ্য মহাত্মগণ নানারূপ অসুবিধার প্রতি দৃক্‌-পাত না করিয়া যে কাব্যের সমগ্র রস হৃদয়ঙ্গম করার আগ্রহে কোনও পরিশ্রমকেই পরিশ্রম বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই, শুধু সেই কাব্যখানির ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালা কোনও অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়ায়, পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ আমরা কি না ভারত-বাসী হইয়াও আমাদিগের এই ব্রজ-বাসী কবি-ভ্রাতার সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য-যুক্ত ও আদ্যোপান্তে ভারতীয় ভাব-পূর্ণ অতুলনীয় কাব্যখানির অনুশীলন করা দূরে থাকুক, উহার সহিত এক প্রকার অপরিচিতই রহিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

পুরুলিয়ার পাখী

(৩)

মানভূমে এত খাল, বিল, দিঘি, বাঁধ যে, সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, ঋতুবিশেষে যাযাবর হংসজাতীয় বিহঙ্গ কি পরিমাণে এখানে আবির্ভূত হয়। পাশ্চাত্য লেখকদিগের পুস্তকে শুধু নয়, স্থানীয় অধিবাসীদিগের মুখে অনেক রকম হাঁসের বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিমঋতুর প্রাক্কালে আমরা কচিৎ দুই একটি হংস পুরুলিয়ায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। দলে দলে তাহাদের আগমন এখনও রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। যে হাঁস দেখিতে পাওয়া গেল, সে যাযাবর নহে; আমরা তাহাকে সরাল বলি। ইংরাজ তাহার নাম দিয়াছেন, Whistling Teal।

সরাল, Dendrocycna javanica

সাহেব বাঁধের সব পাখীর উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। বক, পানকৌড়ি, টর্কের সঙ্গে কুরর, শঙ্খচিল, মাছ-মরালকেও একই বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যাইত। ইহারা সকলেই মৎস্য শিকারে পটু। ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে।

Motacilla alba duknunensis; হুবদ খঞ্জন, M. melanope; M. flava thunbergi

কত খঞ্জন বাঁধের ধারে চরিয়া বেড়াইত, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তিনটি মাত্র বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জন দেখিয়াছিলাম; তাহাদের মধ্যে Pied বা সাদা-কালা মিশ্রণের খঞ্জনই সংখ্যায় অধিক।

টিট্টিভ, Sarcogrammus indicus

টিট্টিভ-জাতীয় কয়েকটি পাখীকে ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য অঞ্চলে জলাশয়ের ধারে দেখিতে পাওয়া গেল।

ডাহুক, Amaurornis phœnicurus

কাদাখোঁচা, Gallinago Cœlestis

পুরুলিয়ায় ডাহুকের কণ্ঠস্বর প্রত্যহই শুনা যাইত, কিন্তু কাদাখোঁচার বড় বেশী সন্ধান পাই নাই।

টুনটুনি, Orthotomus sutorius

বাংলা দেশে টুনটুনি সুপরিচিত। পুরুলিয়ার ছোট বড় বাগানগুলির মধ্যে দিনের বেলায় দুই এক জোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাল্‌দের ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের নীচে ইহাকে দেখা গেল; কিন্তু বিশাল মুক্ত প্রান্তরে বন্ধুর ভূমির উপর টুনটুনি বিচরণ করে না।

দুর্গাটুনটুনি, Arachnecthra asiatica

বাংলায় যে দুই রকম দুর্গাটুনটুনি দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে একটা মানভূমে পাইলাম। তাহার সমস্ত দেহটা কালো; একটা খুব উচুঁ শিরিষ গাছের উপরে ফুলের মধু পান করিতেছিল। এখানে কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বিরল।

অশ্বত্থ, বট, কুসুম, পলাশ গাছের উপরে হরিয়াল দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে; বিশেষতঃ যখন অশ্বত্থ বটের ফল পাকিবার সময় হয়, তখন কোথা হইতে ইহারা এ অঞ্চলের পল্লী ও নগরে সহসা অধিক সংখ্যায় আবির্ভূত হয়। গায়ের রং সবুজ

বলিয়া গাছের পাতার মধ্যে কতকটা আত্মগোপন করার সুবিধা ইহাদের আছে। শিকারী সন্ধান করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলে প্রায়ই একাধিক হরিয়াল প্রতিবারে নিহত হয়; কারণ, ইহারা ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ঝাঁক বাঁধিয়া গাছের উপরে বসে। স্বভাবতঃ ভীরু হইলেও ধাঙ্গড়, কুলি-শ্রেণী মানুষকে তাহারা ভয় করে না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল—যখন দেখা গেল যে, ঝালদের লাক্ষা-চাষে রত ধাঙ্গড়গুলার খুব কাছাকাছি গাছের উপরে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

হরিয়াল, Crocopus chlorogaster

ইহাদের জাতি-সম্পর্কীয় অপরাপর পাখীর তুলনায় ইহারা আয়তনে কিছু বড় এবং এ অঞ্চলে সংখ্যায় কিছু বেশী।

আশ্বিনের শেষে কোকিলের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল না; তবে মাঝে মাঝে দুই একটা স্ত্রী-কোকিলকে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চকিতের ন্যায় উড়িয়া যাইতে দেখা যায়; কচিৎ উচ্চ বৃক্ষশাখার পত্রান্তরালে একটা কোকিলকে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই।

কোকিল, Eudynamis honorata

কোকিলের জাতিবর্গীয় আরও কয়েকটা পরভৃত মানভূমের অধিবাসী; কিন্তু কোনটাই এই সময়ে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বাংলা দেশের মত এখানেও কাণাকোয়ার কণ্ঠস্বর আমাদিগকে আকৃষ্ট করে; সহসা হয় ত ইহাকে ভূমিতে অবতরণ করিয়া ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিতে দেখা যায়; অথবা কোনও বৃক্ষকাণ্ডে আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার লম্বা কালো পুচ্ছটি হয় ত নয়নগোচর হইল, সমগ্র দেহটা কিন্তু ঠিক দেখিতে পাওয়া গেল না।

কাণাকোয়া, Centropus sinensis

এই বংশপত্রবর্ণ লম্বচঞ্চু দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গটিকে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আকাশে উড়িতে দেখা যায়। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল; উড্ডীয়মান ছোট ছোট পোকা ধরিবার জন্য ইহারা অনবরত বৃক্ষশাখা হইতে ইতস্ততঃ আক্রমণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। ভূমির উপরে কোনও ভক্ষ্য কীটকে দেখিতে পাইলে বেগে অবতরণ করিয়া তাহাকে চঞ্চুপুটে লইয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। অনেক সময়ে রেলের ধারে, টেলিগ্রাফের তারে বসিয়া শিকার সন্ধান করে; তীরের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বেগে শিকারের উপর পতিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় সেই তারের উপরে আসিয়া বসে। আশ্বিনের শেষে ইহাদিগকে পুরুলিয়ায় বড় একটা দেখি নাই; এই সময়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হইত। কিন্তু পরে যখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া গেল।

বাঁশ-পাতি, Merops viridis

বাড়ীর আশে পাশে সহরের মধ্যে বাগানে সর্ব্বত্রই চটকের গতিবিধি। ইহারা গৃহস্থের কাছাকাছি থাকে, প্রান্তরে বা বনে জঙ্গলে অত্যন্ত বিরল। সে সব জায়গায় আর একটি চটকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম বন-চড়াই। উচ্চ

চড়াই, Passer domesticus

বৃক্ষশাখা হইতে ইহাদের কলরব বনভূমি মুখরিত করে; দেহটি গৃহচটকের মত নধর ও পরিপুষ্ট নহে; বরং ক্ষীণাঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা; পুংশ্চটকের কণ্ঠদেশে একটি হলুদবর্ণের উজ্জ্বল ফোঁটা থাকে। সহরের মধ্যে ইহাদিগকে যে দেখা যায় না, তাহা নহে; বড় রাস্তার দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর উচ্চ শাখায় কয়েকটাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহাদের কণ্ঠস্বর ঠিক প্রথমোক্ত গৃহচটকের মত নহে; পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোন্ জাতীয় চটক, তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারেন।

বন-চড়াই
Gymnorhis flavicollis

ধুলাচেটা পাখী দেখিতে অনেকটা চড়াইএর মত; চটকের গলদেশের যেমন খানিকটা কালো, ইহারও গলদেশ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত অনেকটা মসীবর্ণ; স্বভাবও কতকটা চড়াইএর মত; ভূমির উপরে বীজাদি খাদ্য আহরণের চেষ্টা করে; ধূলিলিপ্ত হইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে ইহারা পটু। সহরের বাহিরে কাঁসাই নদীর পরপারে আকাশ হইতে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটা পাখী কিছু দূর আকাশে উঠিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই সুন্দর ভঙ্গীতে অনতিদূরে ভূমির উপরে অবতরণ করিতেছে। উর্দ্ধে উঠিবার সময় তাহাদের যত কিছু গান কণ্ঠ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, নিম্নে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা থামিয়া গেল; ভূমিতে নামিয়া তাহারা আহার্য্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল।

ধুলা-চেটা,
Pyrrhulauda grisea

কাঁসাই নদের পোলে উঠিবার রাস্তার দুই ধারে খর্ব্ব লতাগুল্মের ডালে কয়েকটা মুনিয়াকে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। ইহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কোনটা আমার চোখে পড়ে নাই; কেবল লাল মুনিয়াকে (Sporæginthus amandava) খাঁচার মধ্যে পালিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম।

মুনিয়া, পিদ্‌ড়ি,
Munia malabarica

আগিয়া, Mirafra assamica—ইহাকে মাঝে মাঝে ভূমি হইতে শূন্যে উঠিতে উঠিতে গান গাহিতে দেখা যাইত। সংখ্যায় বড় অধিক নহে।

সহরের মধ্যেও প্রায় প্রত্যেক বাগানেই ইহার বিচিত্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রকায়, ধূসরবর্ণ পাখীটি অন্য দুই একটি বিভিন্ন বর্ণের "ক্যার-কেটা" হইতে একটু স্বতন্ত্র। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে, এমন কি, কলিকাতার বড় বড় বাগান বাড়ীতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহারা কীটভুক্; ভূমির উপর হইতে মানুষের অনিষ্টকর কীটাদি মুখে করিয়া ইহারা গাছের উপরে বসিয়া উদরসাৎ করে; এই জন্য এক হিসাবে ইহারা কৃষিজীবী মানুষের বন্ধু। মানভূমে ইহারা স্থায়িভাবে অবস্থান করে।

ক্যারকেটা,
Lanius cristatus

কয়েকটি ছোট বসন্তবৌরি আমার চোখে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় বড় বসন্তবৌরির একটিও আমি দেখিতে পাই নাই। ইহার স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না; বাংলা দেশেও যেমন, এখানেও তেমনই।

বসন্তবৌরি, ছোট,
Xantholæma hæmatocephala

ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কয়েক জাতীয় (species) কাট্‌ঠোক্‌রা মানভূমে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি কিন্তু পুরুলিয়ায় একটাকে দেখি নাই, কিম্বা উহার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাই নাই।

কাঠঠোক্‌রা

গৃধ্র—এই বীভৎস পাখীদের দুইটা জাতি সাধারণতঃ খুব বেশী সংখ্যায় পুরুলিয়ার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়,—রাজগৃধ্র, যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Otogyps Calvus এবং শকুন, Pseudogyps bengalensis। প্রথম পাখীটার দেহ কালো এবং মসৃণ; মাথা এবং ঘাড়ের লোমহীন অনাবৃত ত্বক্ রক্তবর্ণ; পদদ্বয়ও লালবর্ণের। দ্বিতীয় পাখীটার পিঠে সাদা পতত্র আছে; এই জন্য ইংরাজের নিকটে ইহা White-backed vulture নামে পরিচিত। আরও একটা গৃধ্রকে মানভূমের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহার স্বভাব এবং উৎপতনভঙ্গী অপর সমস্ত গৃধ্র হইতে পৃথক্; আকার এবং দৈহিক আয়তনেও সে তাহার অন্যান্য জাতিদের চেয়ে খুব ছোট। গায়ের রং সাদা; ডানাগুলা কাল্‌চে; ঘাড়ের লম্বা লম্বা রোমাবলি লাল্‌চে রংএর। এই পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম Neophron ginginianus। শবভুক্ হইলেও সাধারণতঃ ইহাকে গ্রাম বা নগরের আবর্জ্জনাস্তূপের সান্নিধ্যে বিচরণ করিতে দেখা যায়; প্রায় সঙ্গিহীন থাকে, কচিৎ দুই তিনটা একত্র দৃষ্ট হয়।

কুরর ও মাছ-কোরাল—সাহেব-বাঁধের কুঞ্জবনে ইহাদিগকে বক পানকৌড়ি ষ্টর্কের সঙ্গে প্রায়ই এক বৃক্ষে আসীন দেখা যায়। সাহেব বাঁধে ইহারা প্রচুর শিকার পায়। কুরর অব্যর্থ সন্ধানে পদনখর সাহায্যে জলের মধ্যে হইতে মাছ ধরে এবং মাছ-কোরাল চোরের উপর বাট-পাড়ি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করে। কুররের সাদা মাথা এবং ঘাড়ের মাঝখানে এবং পার্শ্বে ধূসর বর্ণের রেখা আছে; পিঠের রং ধূসর এবং পেটের বর্ণ সাদাটে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Pandion haliaetus। মাছ-কোরালের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ধূসর; মস্তক ও ঘাড়ের দুই পার্শ্ব, কপাল এবং কণ্ঠদেশ সাদা রংএর; পুচ্ছের কিয়দংশও সাদা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Haliaetus leucoryphus.

কুরর, Pandoin haliaetus

মাছমরাল বা মাছ-কোরাল, Haliaetus leucoryphus;

শঙ্খ চিল, Haliaster indus

চিল, Milvus govinda—পুরুলিয়ায় ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সাহেব-বাঁধের দ্বীপে বৃক্ষের উপর তাহাকে রাত্রিযাপন করিতে দেখা যায়।

শঙ্খচিল, Haliastur indus—মানভূমে এই বিহঙ্গের স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। বাংলা দেশের মত খাল বিল ডোবার সান্নিধ্যে ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

শিক্‌রা, Astur badius—ইহা এবং ইহার কয়েকটা জাতিবর্গকে মানভূমের নানা স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাদের সকলের classification বা শ্রেণীবিভাগ যথাযথরূপে নির্ণয় করিবার বড় সুযোগ পাই নাই।

পেচক—পুরুলিয়ায় মাত্র দুই একটা প্যাঁচার সন্ধান পাইলাম; তন্মধ্যে একটা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত কুটুরে প্যাঁচা, Athene brama।

মক্ষিকাভুক্ Muscicapidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যে কয়েকটা বিহঙ্গকে পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া গেল, তাহারা প্রায় সকলেই যাযাবর। তাহারা হিমঋতুর আগমনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদের একটার নাম Siphia parva; পুরুলিয়ায় অনেক বাগানের মধ্যে তাহাদিগকে আহার্য্য সংগ্রহে রত দেখিলাম। আর একটা যাযাবর পাখী, Cyornis rubeculoides এই সময়ে পুরুলিয়ার নানা স্থানে ক্রমাগত আট দশ দিন ধরিয়া আমাদের নজরে আসিতেছিল; কখনও দুইটা বা তিনটা পাখীকে কাছাকাছি দুই তিনটা স্বতন্ত্র বৃক্ষে দেখিলাম। বেশ বুঝা গেল যে, এখন ইহাদের প্রব্রজনের সময় উপস্থিত এবং ইহারা এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পুরুলিয়ায় যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, তাহারা সামান্য কয়েক দিনের জন্য এই সহরের মধ্যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; শীঘ্রই সহর পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদের উপযোগী স্থান খুঁজিয়া লইবে।

টিয়া, Palæornis torquatus

পুরুলিয়ায় টিয়া সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা আমাদের বাংলা দেশের সুপরিচিত টিয়া, কণ্ঠরেখা-সমন্বিত। কিন্তু ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফুলটুশী (P. cyanocephalus) বহুসংখ্যক দেখা গেল; ইংরাজ ইহাকে Blossom-headed parrot বলেন। পুংপক্ষীর মাথাটা লাল, স্ত্রীটার মাথার রং বেগুনে। হরিয়াল (সংস্কৃত হারীত) পাখীর সঙ্গে একই অশ্বথ বা বটবৃক্ষের উপর অবস্থান করিয়া ফল ভক্ষণে ইহাকে রত থাকিতে দেখা যায়।

ছাতারে crateropus canorus

বাংলার সমতল ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বত্র পরিচিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরুলিয়ার পথে ঘাটে মাঠে কোথাও ইহাকে এই ঋতুতে দেখিতে পাইলাম না। ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য জঙ্গলে কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল।

Thamnobia Cambaiensis

ঐ জঙ্গলে আর একটা পাখী দেখিতে পাইলাম,—সাধারণ Indian Robin; আমাদের এই বাংলা দেশে ইহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বেহার অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমে ইহা গৃহস্থের নিকটে সুপরিচিত। বিলাতী Robinএর মত ইহা ঘরের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়ায়। পুরুলিয়ার সহরতলী জায়গায় ইহাকে দেখা গেল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পার্ব্বত্য জঙ্গলে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে।

দোয়েল, copsychus saularis

প্রত্যুষে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাল-গাছের উপরে অথবা পথপার্শ্বস্থ প্রাচীর-গাত্র হইতে বা বাগানের বেড়ার ফাঁকে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় ইহারা অধিক না হইলেও, ছোট বড় সকল বাগানের ঝোপে ঝাপে ইহারা প্রায়ই থাকে। ঠিক যে পুং-পক্ষীটি একাকী থাকে,

তাহা নহে, ইহার অদূরে যে স্ত্রী-পক্ষীটি আপন মনে শিস্ দিতেছে বা আহার্য্য সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেটি ইহার সহচরী।

ঘুঘু—মানভূমে ইহার নাম পাঁড়কি বা পাঁড়ুক। বাংলার তিলে ঘুঘু (Turtur suratensis) এখানে আছে; তাহা ছাড়া আর দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়,—একটির ঘাড়ে কালো রেখা, অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় লাল্চে রংএর ঘুঘু। সকল ঋতুতেই প্রায় ইহাদের নীড়ে ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায়। অক্টোবর মাসের গোড়ায় ইহাদের কয়েকটি শাবক পুরুলিয়ায় ও সুদূর পল্লীমধ্যেও আমাদের নিকট আনীত হইয়াছিল।

ঘুঘু
T. risorius
T. orientalis

পায়রা, গোলা, Columba intermedia—খুব বেশী সংখ্যায় ইহাদিগকে ক্ষেতে ও মাঠে বিচরণ করিতে দেখিলাম।

রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের উপরে, ধান্যক্ষেত্রে, রেল লাইনের ধারে, তারের উপর, বাড়ীর বাগানে, গরুর পিঠের উপরে, ফিঙেকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোনও পাখীর পশ্চাতে ধাবমান ফিঙে প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর হয়; অথবা পত্রান্তরালে আসীন ফিঙের শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বর দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। সব সময়েই যে, সে পাতার গোপন অন্তরালে থাকে, তাহা নহে; তরুশীরে, শাখাগ্রভাগে, বাঁশঝাড়ের ডগায়, বন্ধুর মাঠের উচ্চ ভূখণ্ডে তাহার নিকষ-কৃষ্ণ দেহ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংখ্যায় ইহারা বেশী বলিয়া বোধ হয় না; আহার্য্যান্বেষণে প্রায়ই একাকী নিঃসঙ্গ বিচরণ করে; কখনও বা অনতিদূরে একটি সহচর বা সহচরীকে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে ইহার একাধিক জাতিবর্গ আছে।

ফিঙে, Decrurus ater

বাতাসিয়া, Cypselus affinis—ইংরাজ ইহাকে House Swift আখ্যা দিয়াছেন; বাস্তবিক পুরুলিয়ায় মানববাসে ইহারা যেমন দলে দলে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করে, তাহা দেখিলে এই ইংরাজি নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঘনবিন্যস্ত ঘরের চালের মধ্যে বাতাসিয়া তীরের মত প্রবেশ করে; পাখীটি এত ছোট ও দ্রুতগামী যে, চালের মধ্যে কোন্ রন্ধ্রে সে প্রবেশ করিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অপরাহ্ণকালে গৃহপ্রাঙ্গণে বাগানের উপরে অনেকগুলা বাতাসিয়া দলবদ্ধ হইয়া আমাদের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়াইত। প্রখর রৌদ্রে ইহারা একত্র হইয়া উড়িতে ভালবাসে।

তিতির, Francolinus pondicerianus—পুরুলিয়া হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে ডুমুরা-কুড় গ্রামের মাঠে তিতিরকে দেখা গেল। ঝালদে পাহাড়েও তিতির বিরল নহে।

লাওয়া, Perdicula asiatica—(সংস্কৃত লাবক) মানভূমের অধিবাসী বিহঙ্গ। দুইটি পরিপুষ্ট শাবক লইয়া এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই Phasinidae পরিবারের অনেক পাখী পার্ব্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে যেমন বৈচিত্র্যময়ী, বিহঙ্গজাতিও তেমনি বিচিত্র।

বন্যকুক্কুট (Gallus ferrugineus), ধনেশ (Cophoceros birostris), Cuckoo-Shrike (Campophaga mela noschista) প্রভৃতি নগরে বা নগরোপকণ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহারা বিরল নহে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

সমাস-স্বর

সমাসের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, লৌকিক সংস্কৃতের ন্যায় দীর্ঘ সমাস বৈদিক-সাহিত্যে ছিল না। দুইটী শব্দ মিশিয়া এক হইলেই সমাস হইত। অতি পরিচিত সমস্ত পদের সহিত কচিৎ আরও একটী পদ জুড়িয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ সমাসের সংখ্যা সমগ্র ঋগ্বেদে পাঁচ-সাতটার বেশী পাওয়া যাইবে না। কাদম্বরী ও দশকুমার-চরিতের দীর্ঘ সমাস প্রকৃত ভাষার বিকাশের লক্ষণ নহে। বরং তাহারা ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তখন সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক গতি অবরুদ্ধ হইয়া একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল সমাসে দুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট—(১) এই সকল সমাসের রচয়িতা অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকের বিস্ময় ও ভক্তি কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায়ে আত্মহারা হইয়াছিলেন; এবং (২) ধাতুরূপ, শব্দরূপ ও পদবিন্যাস-প্রণালীর ব্যাকরণ-নির্দ্দিষ্ট জটিলতা বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত সন্ধিও এই শ্রেণীর জিনিস ছিল। প্রত্যেক পদ সন্ধির নিয়মে জুড়িয়া সমগ্র বাক্যটীকে একটী শব্দের ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা আর্য্যভাষার লক্ষণ নহে। আমেরিকার আদিমনিবাসিগণের ভাষায় এই লক্ষণ আছে। এই সকল কারণেই আমাদের ব্যাকরণ-শাসিত সংস্কৃত ভাষা সাধারণের দুরধিগম্য সাহিত্যের ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক পদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বরস্থিতি আছে। কিন্তু যখন দুইটী ভাব একত্র করিবার জন্য দুইটী পদ জুড়িয়া একটী করা হয়, তখন তাহাদের স্বরস্থিতির প্রকৃতি অধিকাংশ স্থলেই বদলাইয়া যায় এবং দুইটী শব্দের একটী স্বর হয়, দুইটী নহে। সমাস হইলেও ইহাই হয় এবং অন্য উপায়ে দুইটী পদ জুড়িলেও (যেমন ক্রিয়ার সহিত উপসর্গের যোগেও) নবগঠিত পদটীর এক স্বর হয়। সুতরাং সমাসের ধর্ম্ম হইল এই যে, তাহাতে পদদ্বয়ের জন্য একটী মাত্র স্বর থাকিবে। কাদম্বরীর ন্যায় সমাস বেদে থাকিলে এই ভাবে সমস্ত পদের একতা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইত। তবে পাণিনির ব্যাকরণের নিয়মে বেদের সমাস রচিত হয় নাই। তাই এখানে সমাসরচনার প্রথম চেষ্টার পরিচয় কতকগুলি আম্রেড়িত ও দ্বন্দ্ব (দেবতাদ্বন্দ্ব) সমাসে পাওয়া যায়। আম্রেড়িত সমাসে সুব্ বিভক্তির লোপ হয় না; দুইটী সুবন্ত পদ একত্র সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের একটীর স্বর লোপ করিলেই আম্রেড়িত সমাস রচিত হয়। যেমন—জহ্যোষাং বরং-বরম্ (ইহাদের ভাল-ভাল লোকগুলিকে নিহত কর); অঙ্গাদ্-অঙ্গাল্-লোম্নো-লোম্নঃ পর্বণি পর্ব্বণি (অঙ্গে-অঙ্গে, লোমে-

লোমে, পর্ব্বে-পর্ব্বে) ; ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃ-শ্বঃ (পুনঃ-পুনঃ, দিন-দিন) ; দিবে-দিবে বা দ্যবি-দ্যবি (দিন-দিন)। এইরূপে তিঙন্তদ্বয়ের যোগও বেদে দেখা যায়—পিবা-পিব (ঋ°), বারে বারে পান কর। যজস্ব-যজস্ব (শ০° ব্রা°), পুনঃ পুনঃ যাগ কর। কিন্তু স্তুহি স্তুহি (ঋ°) (পুনঃ পুনঃ স্তব কর) সমাস নহে ; ইহার দুইটী পদ ও দুইটী স্বর।

ইন্দ্রা-সোমা (ইন্দ্র ও সোম), ইন্দ্রা-বিষ্ণূ, ইন্দ্রা-বৃহস্পতী, অগ্নী-ষোমৌ প্রভৃতি কতকগুলি দ্বন্দ্ব সমাসে উপাদানদ্বয়ের স্বর অক্ষুণ্ণ আছে। কেবল তাহাই নহে, উভয় পদই দ্বিবচনান্ত। বোধ হয়, এই দ্বিবচনেই ইহাদের সমাস-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে ; নতুবা ইহাদিগের একতা-রক্ষা হয় না। দ্যাবা-পৃথিবী ছাড়া চারিবার দিবস্-পৃথিব্যোঃ, এবং অথর্ববেদে দ্যাবা-পৃথিবীভ্যাম্ ও দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ আছে। এই শ্রেণীর কতকগুলি সমস্ত পদে দুই জায়গায় স্বর নাই, অথচ উভয় পদেই দ্বিবচন-চিহ্ন আছে। ইন্দ্রা-পূষ্ণোঃ (কিন্তু ইন্দ্রা-পূষণা), সোমা-পূষভ্যাম্, বাতা-পর্জন্যা, সূর্য্যা-চন্দ্রমসা প্রভৃতি। আবার প্রথম পদে দ্বিবচন-চিহ্নের অভাবও আছে— পর্জন্যবাতা, ইন্দ্র-নাসত্যা, ইন্দ্র-বায়ূ। এই সকল অনিয়মই সজীব ভাষার আত্মবিকাশ-চেষ্টার প্রমাণ ; ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়মে রচনার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নিয়মের বন্ধন ধরিতে না পারিয়া সাধারণ লোকে ভাব প্রকাশের জন্য অন্য সহজ উপায় অবলম্বন করে।

আবার কতকগুলি সমাসে উভয় ভাগে স্বরস্থিতি দেখা যায়—শুনঃ-শেফঃ (কুকুরলেজা), দস্যবে-বৃকঃ (দস্যুর প্রতি বৃক), অপাং-নপাৎ (জলের নাতি), তনূ-নপাৎ (আপনার বংশধর), নরা-শংস (নরের প্রশংসা), নৃ-শংস (ঐ অনুকরণে), নাভা-নেদিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি),আস্-পাত্র (মুখে দিবার পাত্র, গেলাস-স্থানীয়)। ইহা ছাড়া পতি-শব্দ-যুক্ত যাবতীয় সমাসে দুই দুইটী স্বর। বৃহস্-পতি, গ্নাস্-পতি (গ্নাস্-পত্নী), জাস্-পতি, সদস্-পতি (স্থান-পতি) *সদসস্-পতিঃ), বনস্-পতি, রথস্-পতি, নৃংস্-পতি, শচী-পতি (শক্তির মালিক), ইত্যাদি।

অলুক্ সমাসে পূর্ব্বপদের সুব্ বিভক্তি লোপ না পাইয়াও সমাস রচনা করে। স্বর একটী থাকিলে আর সমাসের একতা স্বীকার করিবার পক্ষেও কোনও বাধা থাকে না। দিবো-দাসঃ, ধনং-জয়ঃ, দিবি-ক্ষিৎ (স্বর্গবাসী), দিবি-চরঃ, রায়স্-কামঃ(ধনাকাঙ্ক্ষী), অকস্ত-বিৎ

(যে কাহাকেও চিনে না), উচ্চৈর্-ঘোষঃ, উচ্চৈঃ-শ্রবাঃ, গবিষ্টিরঃ, (গাবিষ্টিরঃ), বলাৎকারঃ।

এই সকল অনিয়মের কথা ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বত্রই সমস্ত পদে একটী মাত্র স্বর। এই একমাত্র সমাস-স্বরের স্থিতি চতুর্বিধ। (১) পদদ্বয়ের প্রথমটীর স্বর বজায় থাকে এবং দ্বিতীয়টীর স্বর লুপ্ত হয়। বহুব্রীহি সমাসে সাধারণতঃ এই নিয়ম। রাজ-পুত্রঃ (রাজা যাহার পুত্র), কিন্তু রাজপুত্রঃ (রাজার পুত্র), ইন্দ্র-জ্যেষ্ঠ (ইন্দ্র যাহার জ্যেষ্ঠ), সহস্র-পাৎ, রুশদ্-বৎসা (উজ্জ্বল-বর্ণ বৎস যাহার)। (২) পদদ্বয়ের দ্বিতীয়টীর স্বর বজায় থাকে, প্রথমটী স্বরবিহীন হয়। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে এই নিয়ম। মহা-ধন (বহু ধন), যাবয়ৎ-সখ (রক্ষাকারী বন্ধু), রঘু-পত্বন্ (যে শীঘ্র উড়িতে পারে), পুরো-যাবন্ (অগ্রগামী), বীলু-পত্বন্ (বল-গামী), জীব-লোক (জীবিতের লোক), গো-ধুম (বাজ-সনেয়িসং গম) শক-ধুম, যম-রাজা, দেব-যান (দেবগণের নিকট যায় যাহা বা যে)। (৩) উভয় পদের স্বরস্থিতি ছাড়িয়া সর্ব্বান্ত্য স্বরে স্বরস্থিতি হয়। এই বিধিরই সাধারণতঃ বহুল প্রয়োগ। প্রাণাপানৌ, ঋক্-সামে, দেবাসুরাঃ, চন্দ্র-তারকম্, ইন্দ্র-ধনুঃ (ইন্দ্রের ধনুঃ), ব্রহ্ম-গবী (ব্রাহ্মণের গাই), দেব-সুমতি (দেবতার অনুগ্রহ), পরো-বরম্ (পর্য্যায়ক্রমে)। (৪) পদদ্বয়ের একতরের স্বরহীনতা ও অন্যতরের স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম। মেধ-সাতি (মেধ = যজ্ঞ), তিল-মিশ্র (তিল), নেমধীতি (নেম = এক, নেমধীতি = বিচ্ছেদ), পূর্ব-চিত্তি (পূর্ব, পূর্ব্ব হইতে জানা, সূচনা), তুবি-গ্রীব (গ্রীবা, যাহার গ্রীবা শক্ত), পুরু-বীর (বীর) খাদি-হস্ত (খাদি = কঙ্কণ, যাহার হাতে খাদি বা বালা আছে), অমৃত (মৃত, সু-বীর (বীর্য্যবান্)।

ক। দ্বন্দ্ব সমাসের স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পরে উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, সমস্ত পদের শেষার্দ্ধে এবং অধিক স্থলে অন্ত্য বর্ণে স্বরস্থিতিই সাধারণ। অজা-বয়ঃ (অজা ও অবি, ছাগ ও মেষসকল), বিদ্যা-কর্ম্মণী (জ্ঞান ও কর্ম্ম), কৃতাকৃতম্ (কৃত ও অকৃত), কেশ-শ্মশ্রু; ভূত-ভবিষ্যম্ (অতীত ও ভবিষ্যৎ), অহো-রাত্রাণি (দিবারাত্রিসমূহ), উক্থার্কা (স্তব ও গান), নীললোহিতম্ (নীল ও লোহিত), তাম্র-ধূম্র (তাম্র ও ধূম্রবর্ণ), প্রিয়াপ্রিয়াণি (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুনিচয়)।

খ। দ্বিগু সমাসের বেশী উদাহরণ নাই। পঞ্চ-কপাল (পঞ্চ কপাল বা পাত্রে প্রস্তুত), দ্বিরাজ (দুই রাজার যুদ্ধ), ত্রিযুগ (তিন যুগ), ত্রিযোজন (তিন যোজন স্থান), ত্রিদিব (তিন স্বর্গ), ষড়হ (ছয় দিন সময়), দশাঙ্গুল (দশ অঙ্গুলি পরিমাণ), সহস্রাহ্ন (সহস্র দিবসের পথ), পঞ্চ যোজন (স্থানের পরিমাণ)।

গ। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ—সমক্ষম্ (চক্ষুর সম্মুখে), অনুস্বধম্ (ইচ্ছানুসারে), অভিপূর্বম্ (পর্য্যায়ক্রমে), আদ্বাদশম্ (দ্বাদশ পর্য্যন্ত), প্রতিদোষম্ (সন্ধ্যাকালে), যথাবশম্ (ইচ্ছানুসারে), যথাকৃতম্ (ব্যবহারানুযায়ী), যথানাম (নামানুযায়ী), যথা-ভাগম্, যথাঙ্গম্, যথাপরু (অঙ্গে অঙ্গে), যত্র কামম্ (যেখানে-ইচ্ছা), যাবন্মাত্রম্, যাবজ্জীবম্, যাবৎ-সবন্ধু (বন্ধু বা জ্ঞাতির সংখ্যা মত), যথাকাম, যথাক্রতু (শক্তি অনুযায়ী), ঋতে কর্ম্মম্ (বিনা কাজে), নানা-রথম্ (নানা রথে), উভয়দ্যুঃ (উপর্য্যুপরি দুই দিন ধরিয়া)।

ঘ। কর্ম্মধারয় সমাসে অন্ত্য স্বরে স্বরস্থিতি। নীলোৎপল, মহর্ষি, রজত-পাত্র, পুরু-ষ্টুত (যাহার অনেক স্তব করা হইয়াছে), পুনর্নব (অভিনব), ক্ষিপ্রশ্যেন, কৃষ্ণ-শকুনি (কৃষ্ণপক্ষী), দক্ষিণাগ্নি, উরুক্ষিতি (বিস্তৃত গৃহ), রাজ-যক্ষ্ম (রোগের রাজা, প্রধান রোগ), বিশ্ব-মানুষ (প্রতি জন, 'বিশ্ব'), বিশ্ব-দেবাঃ।

ঙ। তৎপুরুষ সমাসেও সাধারণতঃ উত্তরপদে ও অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি। পূর্ব্বেই কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

(অ) দ্বিতীয়াতৎপুরুষ—বেদ-বিৎ, পতঙ্গ, হবিরদ, ভুবন-চ্যব (ভূ-বিকম্পী), মধুদুঘ, কামদুঘ, ব্রাত্যব্রুব (যে আপনাকে 'ব্রাত্য' বলে), স্বাদু-ক্ষদ্মন্ (মিষ্টান্নদাতা), বহু-সূবন্ (বহু-প্রসবী), পাপ-কৃত্বন্ (পাপাচারী), মনো-মুষি (মনোচর), পুং-সুবন।"

(আ) তৃতীয়াতৎপুরুষ—তনু-শুভ্র, ইন্দ্র-গুপ্ত, অগ্নি-তপ্ত, পিতৃবিত্ত, রথক্রীত, অগ্নিদগ্ধ (অগ্নি-দগ্ধ), কবিশস্ত (কবি-শস্ত), কবি-প্রশস্ত।

(ই) চতুর্থীতৎপুরুষ—তনু-পান (গাত্ররক্ষা), দেব-হেড়ন (দেবগণের প্রতি ঘৃণা),

গোহিত, দেব-মান (দেবের নিমিত্ত গৃহ, মান), দেব-যজ্ঞ, আস্-পাত্র।

(ঈ) পঞ্চমীতৎপুরুষ—বীর-জাত, শক-ধূম (গোময়ের ধূম)। বৈদিক ভাষায় পঞ্চমী-তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ অতি বিরল।

(উ) ষষ্ঠীতৎপুরুষ—বিশ্পতি, প্রজা-পতি, দেব-হেতি, (দেবগণের অস্ত্র), কেশবর্ধন, আয়ুপ্রতরণ (আয়ুর্বর্দ্ধক), সোম-পাবন্ (সোমপায়ী), বলদাবন্ (বলদাতা), পুংসুবন, যম-সাদন (যমের বাড়ী)।

(ঊ) সপ্তমীতৎপুরুষ—ঋত্বিক্, অক্ষপরাজয় (পাশায় হার), অঙ্গ-জ্বর (অঙ্গে বেদনা), নীবিভার্য (নীবিতে বাহ্য), দ্রু-ষদ্বন্ (বৃক্ষে আসীন), রথ-যাবন্ (রথ-যায়ী), তল্প-শীবন্ (তল্পশায়ী)।

প্রথমার্দ্ধে ও প্রথমাক্ষরে স্বরস্থিতির উদাহরণ—ধন-সাতি (ধনলাভ),সোম-পীতি, দেবহূতি (দেবাভ্যর্থনা), নম-উক্তি ('প্রণাম' উচ্চারণ), হব্য-দাতি (হব্য-প্রদান),দিবিষ্টি।

চ। বহুব্রীহিসমাসে সাধারণতঃ প্রথম পদে স্বরস্থিতি। ঘৃতপৃষ্ঠ (ঘৃতবৎ পৃষ্ঠ যাহার), বিশ্বতো-মুখঃ (সকল দিকে মুখ যাহার), দ্রবদশ্বঃ (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার), জ্যোতী-রথ (জ্যোতি যাহার রথ, জ্যোতিঃ), দদৃশানপবি (দদৃশান, যাহার পবি দেখা যাইতেছে)। বৈদিক-সাহিত্যে প্রাপ্ত বহুব্রীহি সমাসসমূহের আন্দাজ ⅞ ভাগে প্রথমার্দ্ধে স্বরস্থিতি, ⅛ভাগে পরার্দ্ধে স্বরস্থিতি। পুরু-পুত্র (বহু পুত্র যাহার), বহ্বন্ন, আশু-হেষঃ (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার), ঋজুক্রতু (ঋজু কর্ম্মা), বিভু-ক্রতু (বহু-শক্তি), হিরি-শিপ্র (স্বর্ণবর্ণ কপোল যাহার), পৃথু-বুধ্ন (প্রশস্ত ভিত্তি যাহার), চতুরক্ষ (চারি চক্ষু যাহার), ত্রি-বন্ধুর (তিনটী আসনযুক্ত), অষ্টা-বন্ধুর (আটটী আসন যাহার), অভ্রাতৃ (ভ্রাতৃহীন)।

ছ। কতকগুলি অনিয়মিত সমাস—অপ্রতি (প্রতিদ্বন্দ্বিহীন), তুবি-প্রতি (প্রবল বিরোধী), ইতিহাস (ইতি হ আস), কুবিৎস (অজ্ঞাত জন), কুহচিদ্বিৎ (যেখানে পাওয়া যায়), পিতামহ, ততামহ (পিতামহ), রায়স্কামো বিশ্বপ্স্ন্য (ঋ°, সর্ব্বভোগ্য ধনাকাঙ্ক্ষী), মহাধনে অর্ভে (ঋ°, বড় ও ছোট যুদ্ধে), অংহোর্ উরুচক্রিঃ (ঋ° বিপদে সাহায্যকারী,) অহমুত্তরঃ

(আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম যুদ্ধ), অগংপূর্ব (শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাষী)।

জ। সংখ্যাবাচক—একাদশ, দ্বাবিংশতি, ত্রিশতম্ (=১০৩), চতুঃ-সহস্রম্ (=১০০৪), একাশতম্ (=১০১), অষ্টাশতম্ (=১০৮), ত্রিংশচ্ছতম্ (১৩০), অষ্টাবিংশতিশতম্ (১২৮), ত্রি-সপ্ত (২১), ত্রিদশ (৩০), ত্রি-নব (২৭), দ্বাদশং শতম্ (১১২), ষট্‌ষষ্টিং শতম্ (১৬৬), চতুস্ত্রিংশে শতে (২৩৪), দশশতাঃ (১০০০), দ্বিশতম্, দ্বিশতী (২০০), পঞ্চশতানি (৫০০), ত্রীণি সহস্রাণি (৩০০০)।

অব্যয় স্বর

অব্যয় নানাবিধ। সুতরাং স্বরস্থিতিও নানাবিধ।

ক। প্রত্যয়যোগে।

(১) পঞ্চম্যর্থে তস্ প্রত্যয়। অতঃ, ইতঃ, ততঃ, যতঃ, কুতঃ, অমুতঃ, মৎ-তঃ, ইতরতঃ, কতরতঃ। মুখতঃ, অগ্রতঃ, ঋভুতঃ, ঋকৃতঃ হৃত্তঃ, শীরস্তঃ, নস্তঃ, পারতঃ, অন্ততঃ, অন্যতরতঃ, সর্বতঃ, দক্ষিণতঃ, অভীপতঃ, পৎসুতঃ (ঋ° একবার)। অভিতঃ পরিতঃ অন্তিতঃ।

(২) স্থানার্থে ত্র ও ত্রা প্রত্যয়। প্রথমটীর পূর্ব্বাক্ষরে স্বরস্থিতি ও দ্বিতীয়টী স্বয়ং স্বরবান্। অত্র, যত্র, তত্র, কুত্র, অমুত্র, অন্যত্র, বিশ্বত্র, সর্বত্র, উভয়ত্র, ইতরত্র, সমানত্র। অস্মত্রা, সত্রা, পুরুত্রা, বহুত্রা, দক্ষিণত্রা, দেবত্রা, মর্ত্ত্যত্রা, পুরুষত্রা, মনুষ্যত্রা, পাকত্রা, শয়ুত্রা, কুরুপঞ্চালত্রা। হস্ত আ দক্ষিণত্রা (ঋ° দক্ষিণ হস্তে), পথো দেবত্রা যানান্ (ঋ° যে সকল পথ দেবতাদের নিকট যায়)।

(৩) স্থানার্থে হ প্রত্যয়। ইহ, কুহ, বিশ্বহ, বিশ্বহা, বিশ্বাহা (সর্বত্র, সর্বদা)।

(৪) প্রকারার্থে হি প্রত্যয়। উত্তরাহি, দক্ষিণাহি।

(৫) স্থান বা কালনির্দ্দেশ অর্থে তাৎ প্রত্যয়। প্রাকৃতাৎ, উদকৃতাৎ, তাবত্তাৎ। আরাত্তাৎ, উত্তরাত্তাৎ, পরাকাত্তাৎ। পশ্চাতাৎ, অধস্তাৎ, অবস্তাৎ, পরস্তাৎ, পুরস্তাৎ, বহিষ্টাৎ, উপরিষ্টাৎ (স্ কেন? ভবিষ্যপুরাণে 'উদস্তাৎ' আছে)।

(৬) প্রকার অর্থে থ ও থা প্রত্যয়। যথা, তথা, কথা, ইত্থা (কথম্, ইত্থম্ ; শ° ব্রা° ইত্থাৎ), ইমথা (বিরল), অমুথা (বিরল)। অথ, অথা, বিশ্বথা, সর্বথা, অন্যথা, উভয়থা, অপরথা, ইতরথা, যতরথা, যতমথা, পূর্বথা, প্রত্নথা, উর্দ্ধথা, তিরশ্চথা, ঋতুথা, নামথা, এবথা। পূর্বাক্ষরে স্বরস্থিতিই সাধারণ। বথা (=ইব) স্বরবিহীন। তায়বো যথা, (ঋ° চোরগণের ন্যায়)।

(৭) প্রকারার্থে তি প্রত্যয়। ইতি, যতি, ততি, কতি, (কতিপয়)। ইতি শব্দের প্রকারার্থে ব্যবহার—ইত্যগ্রে কৃণ্বত্যথেতি (শত° ব্রা°)=প্রথমে এই দিকে (বা এই ভাবে) কর্ষণ (হলচালনা) করিতেছে, পরে ঐ দিকে (বা ঐ ভাবে)।

(৮) প্রকারার্থে ব প্রত্যয়। ইব (স্বরহীন), এব (এবা), এবম্, এবং বিদ্বান্ (এই জানিয়া)। ইব স্থানে 'ব (পালি-প্রাকৃতে ব, ৰ) অপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়।

(৯) কালার্থে দা, দানীম্, দি। তদা, যদা, কদা, (কদা—ঋ° একবার), ইদা সদা (সদম্), সর্বদা। ইদানীম্, তদানীম্, বিশ্বদানীম্ (বিশ্বদানি,তৈ° ব্রা°, বিশেষণ), যদি, সদাদি (মৈ° সং)।

(১০) প্রকারার্থে ধা। একধা, দ্বিধা, (দ্বিধা, দ্বেধা), ত্রিধা (ত্রেধা), ষড্ঢা (ষোঢ়া, ষড্ধা) দ্বাদশধা, একান্নবিংশতিধা, সহস্রধা, কতিধা, ততিধা বহুধা, পুরুধা, বিশ্বধা, শশ্বধা, যাবদ্ধা, এতাবদ্ধা, মিত্রধা, প্রিয়ধা, (প্রেধা), ঋজুধা, বহির্ধা। অধ, অধা (ও অথ) অদ্ধা (সত্যই), সহ (সধ-)।

(১১) বারার্থে স্। দ্বিঃ, ত্রিঃ, চতুঃ (*চতুস্)।

(১২) বারার্থে কৃৎ, কৃত্বঃ। সকৃৎ, পঞ্চকৃত্বঃ, নবকৃত্বঃ, অপরিমিতকৃত্বঃ, সপ্তকৃত্বঃ, দশকৃত্বঃ, দ্বাদশকৃত্বঃ অষ্টৌ বেব কৃত্বঃ, ত্রিঃকৃত্বঃ, (পালি 'তিক্খত্তুং')। এটী মূলতঃ প্রত্যয় নহে।

(১৩) দিনার্থে দ্যুঃ। অন্যেদ্যুঃ, উভয়েদ্যুঃ, উভয়দ্যুঃ, পূর্বেদ্যুঃ।

(১৪) বীপ্সার্থে শস্। একশঃ (একে একে, এক এক করিয়া), শতশঃ ঋতুশঃ (কালে কালে), অক্ষরশঃ (অক্ষরে অক্ষরে), গণশঃ (গণে গণে), ক্রন্দশঃ (কাঁদি কাঁদি), পরুশ্শঃ

(প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে), তাবচ্ছঃ (সেই পরিমাণে), সর্বশঃ (সবকে সব), মন্মশঃ (মনে মনে)।

(১৫) প্রকারার্থে বৎ। অঙ্গিরস্বৎ (অঙ্গিরার মত), মনুষ্বৎ (মনুর ন্যায়—ঋ°), পূর্ববৎ, জমদগ্নিবৎ, প্রত্নবৎ, পুরাণবৎ। ত্বাবন্ত্ (তোমার মত), মাবন্ত্ (আমার মত)। দ্রবৎ (শীঘ্র)।

(১৬) ভস্মসাৎ, আত্মসাৎ, যস্য ব্রাহ্মণসাৎ সর্বং বিত্তমাসীৎ (মহাভা°) প্রভৃতির 'সাৎ' প্রত্যয় বৈদিক সাহিত্যে নাই। সুতরাং স্বরও নাই।

(১৭) বিবিধ প্রত্যয়। প্রাতর্ (প্রথমে, সকালে), সনুতর্ (দূরে), দক্ষিণিৎ (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা), চিকিত্বিৎ (বিবেচনাপূর্ব্বক), নূনম্ (এক্ষণেই), নানানম্ (নানাভাবে)।

গ কারক বিভক্তি যোগে।

(অ) দ্বিতীয়া—(১) সর্ব্বনাম—যদ্ (যদি, যখন, যাহাতে), তদ্ (তাহা হইলে, তখন), কিম্ (কেন ?, কি ?), ইদম্ (এখন, এখানে), অদস্ (ঐ, ওখানে), কদ্, কম্, স্মদ্, সুমৎ, ইদ্, চেদ্ (যদি), নেদ্ (যদি-না), এদ্, কুবিদ্, কূচিদ্, নকীম্, মাকীম্, আকীম্।

(২) বিশেষ্য—নাম (নামে), সুখম্ (সুখে), কামম্ (ইচ্ছামত), নক্তম্ (রাত্রে) রহস্ (গোপনে, জনান্তিকে, নির্জনে), ওষম (সত্বর)।

(৩) বিশেষণ—সত্যম্ (সত্য-সত্য), চিরম্ (অনেক-কাল), পূর্বম্ (পূর্ব), নিত্যম্ (সতত), ভূয়ঃ (আবার)।

(৪) আতিশয্যে (comparison) তরাম্ ও তমাম্। নতরাম্, উচ্চৈস্তরাম্, জ্যোক্তমাম্। এইগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ান্ত বলা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে নপুংসকলিঙ্গ রূপের সমধিক প্রয়োগ। সংশিতং চিৎ সন্তরং সং শিশাধি (অথ°, যাহা ক্রুত, তাহাকে ক্রুততর কর), বিতরং বি ক্রমস্ব (ঋ° বেশী বেশী লম্বা পা ফেলিয়া চল), প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ (ঋ°—অধিকতর মঙ্গলের পথে তাহাকে পরিচালিত কর), উদ্ এনমুত্তরং নয় (অথ°—ইহাকে অধিকতর উচ্চে লইয়া চল)।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তপন জাহার গুরু ভক্তি মুক্তি প্রতরু
বন্দো বিরের চরনজুগল ॥
জানকির অন্বাষনে প্রভু ভাই দুই জনে
রিষ্যমুখে করিলা গমন।
করিলে রামের হিত সুগ্রিবে করাল্যে মিত
হেন বিরের বন্দিব চরন ॥
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি জানকি ত্রান করি
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন।
রাবনেরে চড় মারি কাঁপাইলে লঙ্কাপুরি
চমৎকার হইলা ত্রিভুবন ॥
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বান্ধিলে সেতু
সমরেতে তুসিলে শ্রীরাম।
জানকির ত্রানকর্ত্তা লক্ষনের প্রানদাতা
হেন বিরে করোঁ পরনাম ॥
রাবন রনের কালে ময় দানবের সেলে
পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন।
আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ত্রিভুবনে
বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥
জয় করি লঙ্কাপুরি বিভিসনে দণ্ডধারি
দেযেরে আনিলে রঘুনাথে।
অভয় পদারবৃন্দে মলয় জে মকরন্দে
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে ॥
হনুমানের চরিত্রগুনে জেবা সুনে একমনে
রোগ দুখ কিছুই না জানে।
রাম তারে হয়েন সুখি বর দেন চন্দ্রমুখি
বাড়ে সেই রামের কল্যানে ॥
দ্বিজ রূপরামের আষ হইব রামের দাষ
খণ্ডাবে অসেষ অপরাধ।
রাম গুন চরিত্র গাইব জে দ্বিবারাত্র
তিল আধ না করিব বাদ ॥
ভণিতার রূপরাম লেখক অথবা রামায়ণ
গানের একজন প্রধান হইবেন।

শ্রীশ্রীরঘুনাথের বন্দনা আরম্ভ ॥

সর্ব্ব আগে বন্দো সিতা রামের চরন ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন ॥
দক্ষিন বামেতে বন্দো ভরত সত্রুঘন।
সিরে ছত্রধারি বন্দো ঠাকুর লক্ষন ॥
রামের দুই মন্ত্রি বন্দো সুগ্রিব জাম্বুবান।
পদতলে বন্দিয়া গাইব বির হনুমান ॥
রামের দুই ভার্য্যা বন্দো লক্ষ্মি সরস্বতি।
তিন দেবতা বিনে লোকের অন্য নাঞি গতি ॥
সরস্বতি ক্রপাতে কবির্ত্ত সভার রঞ্জি।
লক্ষ্মি দেবির ক্রপাতে সদাই সুখে ভুঞ্জি ॥
লব কুষ বন্দো দুই রামের নন্দন।
বিনা নৈয়া বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥
জোড় করে বন্দোহুঁ সে ঘটক চরন।
ক্রপা কর ঘটকরাজ নইলাম স্বরন ॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহস্র বর্ছ্র।
রামকির্ত্তি রচিলা বাল্মিক মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে করিলা রামের অবতার।
হেন মুনির চরনে মোর কোটী নমস্কার ॥
দষরথ রাজা বন্দো রামচন্দ্রের পিতা।
রামরূপ নারায়ন লক্ষ্মিরূপা সিতা ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা কৈকৈই রামের জননি।
মা বলিয়া কোলে জার চাপিলা চক্রপানি ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতি ॥
মুখুটী বংষে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়াসমাঝে কির্ত্তিবাষ জে পণ্ডিত ॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর্য়্যা বেড়ায় বিস্তার উদ্ধার ॥

বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ন প্রকাষ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাষ॥

উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাসের বন্দনা করা হইয়াছে; আবার ভণিতাটিও কৃত্তিবাসের।

শেষ,—

সর্ব্বকাল রাবনের দেবের সঙ্গে বাদ।
দেবতা অসুখি জারে তার পড়িব প্রমাদ॥
বিরোচন রাজার কন্যা নাম বিদ্যুতমালা।
কুম্ভকর্ন বিভা করিল জেন চন্দ্রকলা॥
কন্যা দিঘল বঠে তিন সত জোজন।
সাত সত জোজন দিঘল কুম্ভকর্ন॥
জেন বর তেন কন্যা সোভে দুই জনে।
কুম্ভকর্ন করিল বিভা সেই ত কারনে॥
সয়ম্বরা নামে ছিলা গন্ধর্ব্বকুমারি।
বিভিষন করিল বিভা পরম সুন্দরি॥
মৃগ মারিবার তরে করিল গমনে।
তিন জন আছিল হইল ছয় জনে॥
বিভা করি তিন ভাই করিলা গমন।
লঙ্কায় রাষ্য করে রাবন লৈয়া রাক্ষষগন॥
মন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ।
দেখিয়া দেবতাগন করেন বিষাদ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে জার ডরে॥
মেঘ জেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে।
মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে॥
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ন নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিষ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাবন॥
ত্রিষ জোজন ঘরখান বান্ধিল দিঘল।
দষ জোজন ঘরখান আড়ে পরিষর॥
চারি ক্রোষ ঘরের দুয়ার পরিষর।

১২৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

শ্রীরামের অশ্বমেধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—জত মুনি আইলা জজ্ঞস্থানে॥
জামদগ্নি কৌসিক আইলা পরাসার।
সানন্দ কস্যপ আইলা সান্তনু মুনিবর॥
নারদ মহামুনি আইলা গুনের সাগর।
সুমন্ত পৌলস্ত আইলা পুলস্ব মুনিবর॥
ভরদ্বাজ সুতিক্ষ আইলা দুই বেকতি।
দুর্ব্বাষা মুনি আইলেন মহাক্রোধমতি॥
অত্রি অঙ্গিরা আইলা মহাতপোধন।
মৎস্যকর্ন অগস্ত্য আইলা দুই জন॥

মধ্য,—

জেইখানে রাম তথা আইল দুই জন।
তিন রাম হইল জেন দেখে সর্ব্বজন॥
একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম।
সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম॥
সৈন্য সামন্ত জত প্রধান সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চ মাস সিতার গর্ভ হইল জখন।
হেন কালে সীতারে রাম করিলা বর্জ্জন॥
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইলা বাহিরে।
এই দুই ছাওয়াল হইয়াছে সিতার উদরে॥
রামের তেজ দেখিএ রামের ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই যুক্তি তারা সব অনুমান করে।
সকল মন্ত্রিগন গেল শ্রীরাম গোচরে॥

এই দুই সিসু গোঁসাঞি তোমার তনয়।
পরিচয় লহ গোসাঞি কিবা হয় নয়॥
তোমার তেজ তোমার রূপ তোমার ধনুকবান।
আকৃতি প্রকৃতি দুহে তোমার সমান॥
আপনি ভাবিয়া গোসাঞি চিন্ত মনে মনে।
পঞ্চ মাষ গর্ভ সিতা থুইলে এই বনে॥
সেই গর্ভে জর্ম্মিয়াছে জমক সহোদর।
ত্রিভুবন জি[নি]তে পারে মহাধনুর্দ্ধর॥
চন্দ্র সুর্য্য সর্গ মর্ত্ত পাতাল জদি ছাড়ে।
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে॥
ইহা সভার জুর্দ্ধে কার নাহিক জিবন।
প্রান লইয়া দেশে জাই না করিহ রন॥
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি।
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত্র সারথি॥

(পৃ ১৪।১-২)

শেষ,—

মুনি বলেন সুন সিতা তোমারে কহি আমি।
দুই পুত্র লইয়া শীতা ঘরে চল তুমি॥
শীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন।
তবে মাএ পোএ ঘরে করিব গমন॥
এতেক সুনিঞা মুনি বসিলা ধেয়ানে।
ত্রিভুবনের জত কথা ধেয়ানে মুনি জানে॥
তপবনে কুণ্ড আছে মৃতু সঞ্চারিনি।
ধ্যান করিয়া তাহা আনিলেন মুনি॥
বার বৎসরের জদি মড়ার অস্তির লাগ পায়।
সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়ায়॥
মুনি বলেন আমার বাক্য সুন সিস্যগন।
এই জল ছড়া দেহ সকল তপবন॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক পড়িয়াছে জত দুরে।
তত দুর ছড়া দেহ জমুনার তিরে॥
তারক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মুনি।
তপোবনে ছড়াইল মৃর্ত্ত জিবের পানি।
কটকের হাথ পা আসিয়া লাগে জোড়া।
অসংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্ত জিবের পানি জদি হইল পরসন।
শ্রীরাম লক্ষন জিলা ভরথ সক্রঘন॥

১২৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/৪×৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—১৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আরম্ভ,—

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন।
ব্যাসের বচন সুন বাপ পোএ রন॥
জজ্ঞ পুনা দিবেন রাম জজ্ঞ হৈলে সেষ।
হেন কালে গেল ঘোড়া বালমিকের দেষ॥
পবন বেগে ঘোড়া তবে করেতার তরে।
মুনির তপোবন গেলা জমুনার পারে॥
জে দিন জে হবেক বালমিক সব জানে।
লব কুস দুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলেন লব কু[স] সুন ভাল মতে।
আমি চলিলাম আজি চিত্রকোট পর্ব্বতে॥
তথায় বিলম্ব আমার হবেক অনেক দিন।
তপোবন রাখিয় তোমরা দুই ভাই প্রবিন॥
কার সনে না করিহ বাদ বিসর্ব্বাদ।
মুনি সকল জানে জত পড়িবে প্রমাদ॥
বার সত সিস্য লয়্যা গেলেন বালমিকে।
দুই ভাই তোমরা থেনে বেড়াও কোতুকে॥

মধ্য,—

হরি হরি বলিবে রাম সির্দ্ধি নহে কোন কাম
জজ্ঞ হৈল সংহার কারনে।

তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে
জখন পড়িল ভাই শত্রুঘন ॥
দুই মিত্র দেসে ছিল দুত গিয়া য়ানাইল
নিপ তিন য়ানিল জতনে।
জতে[ক] করিল গন্ত ইবে বের্থ হৈল সর্ব্ব
অকারনে মোর জিবনে॥
সুদিন কুদিন দুই সভে য়ামি তিন ভাই
এই সে বির হনুমান।[১]
সবংসে সাগররাজ বড় বড় কৈল কাজ
ভগিরথ রাজা ধর্ম্মময়।
হেন বংসে জনমীঞা কুল নিন্দা কৈলসিয়া
জিনে মোরে কাহার তনয় ॥
এক কম্মে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়ন্ত বহি
বড় য়পজস রহিল আমার।
দসরথ বাপের ডয়ে দেব গন্ধর্ব্ব কাপে ডরে
সুর্জ্যবংসে তনয় জাহার ॥
বিধির লিখনবসে চারি ভাই একু মাসে
প্রান দিল সিন্ধুর সমরে।
দেখিব কাহার মুখ ঘুচাইব এই দুখ
ত্রিভুবনে য়পজস য়ামার ॥(পৃঃ১৪।২)

শেষ,—

বাল্মিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর।
লব কুস দুই ভাই চলিলা সত্তর ॥
বালমিক মুনি বলেন সুন জাম্ববান।
ডাক দিয়া য়াট বিভিসন হনুমান ॥
তাহারে বহিল বাল্মিক তপোধন।
মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিল জিবন ॥
জিয়াইয়া দিল সভার প্রান দান।
ল[ব] কুস সিতার কথা না কহির রামের স্থান॥
বাপে পোয়ে হেথা জেন নহে দরসন।
দেশে নিঞা আমি করাব সম্ভাসন ॥
লব কুস সিতা মুনিরে নমস্কারি।
বস্ত্র য়লঙ্কার দিয়া চলিলা য়ন্ত[ঃ]পুরি ॥
রাম লক্ষন ভরথ সত্রুঘন বিভিসন।
চারি ভাই দুই মিত্র বন্দে মুনির চরন॥
মরিয়া ছিলাম মুনি তোমার...সাদে।
কোথাকার দুই বালক পাড়িল প্রমাদে।
মুনি বলেন য়ামি না ছিলাম দেসে।
কোথাকার দুই বালক না জানি বিসেষে ॥
ঘোড়া লয়্যা রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান।
সেই দুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিদ্যমান॥
রথ অস্ত্র বস্ত্র মুনি দিল য়ানাইয়া।
জে জাহার য়স্ত্র বস্ত্র লইল চিনিঞা ॥
হেথায় দুই বালকের না পায় দরসন।
দেসে লয়্যা আমি করাব সম্ভাসন ॥
জজ্ঞ পুর্ন দেহো গিয়া জজ্ঞ হৈল সেষ।
সসঙ্গ সামন্ত লয়্যা রাম গেল দেস ॥
পথে জাইতে জুদ্ধের কথা কহে সর্ব্বজন।
এমন বালকের কথা না সুনি কথন ॥
এত দুরে দুই বালকের কথা য়বসান।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের য়দভুত রচন ॥
ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥

১২৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রাম বলেন অর্শ্বমেধ করিলাম সার।
অর্শ্বমেধ জজ্ঞ সম ফল নাহি আর ॥

১। ইহার পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধ হয়।

এত জদী কহিলেন কোমললোচন।
শুনিয়া হরিস হইলা ভরথ লক্ষন ॥
রাম জজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরসিত।
ডাক দিয়ে বিশ্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
রঘুনাথের জজ্ঞস্থান করহ নিম্মান ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেখানে ॥
বিশ্বকর্ম্মায় দেখি হরসিত দুই জন।
জোড় হাতে বিশ্বকর্ম্মা করেন স্তবন ॥
নানা রত্ন আনি দিল বিশ্বকর্ম্মার স্থান।
জজ্ঞসালা বিশ্বকর্ম্মা করেন নিম্মান ॥
ভরথ লক্ষনের টাট দুই অক্ষোহিনি।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিআ জে আনি ॥
ধৌত প্রবাল রত্ন শুনে জেই দিগে।
বহিআ বহিআ আনে চক্ষুর নিমিসে ॥
দিল মনি মানিক্যাদি প্রবাল প্রস্তর।
তিন ক্রোস জুড়ে কুণ্ড করে পরিসর ॥
উভে সভে জজ্ঞকুণ্ড সতেক জোজন।
নানা রত্নে জজ্ঞকুণ্ড করিল গঠন ॥
আসিবেন পিথিবির যত নরবর।
রাজাদের জন্ত করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর ॥
সুবর্ন্নে নির্ম্মিত গজদন্তের চৌকাট।
সুবর্ন্নে নির্ম্মিত সব কৈল খাট পাট ॥
মনিগনের ঘর নিম্মাইল থরে থর।
বসিবার স্থান কৈল পরম সুন্দর ॥
ভক্ষ দ্রব্য নানা জাতি বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা রত্ন ধন লয়্যা পুরিল ভাণ্ডার ॥
দধি দুগ্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার।
আতব তণ্ডুল ধান্স সঙ্খা নাহি তার ॥
এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিম্মান।
নিম্মাইআ বিশ্বকর্ম্মা গেল নিজ স্থান ॥

মধ্য,—

অজোধ্যাতে গিয়া সিতা করিলা প্রবেস।
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেস ॥
সর্ব্ব দেসের লোক আইল অজোধ্যা নগরি।
জয় জয় সুমঙ্গল পড়ে জত নারি ॥
রথে হৈতে ভূমে সিতা নাম্বিলা জখন।
দেখিয়া সিতার রূপ মোহ ত্রিভুবন ॥
দেখিয়া দেবতাগন হইলা হরসিত।
আছুক অন্সের কাজ ব্রহ্ম[া] চমকিত ॥
ধন্স ধন্স রামে সবে করিছে বাখান।
আপনি আসিয়া লক্ষি হৈলা অধিষ্টান ॥
জোড় হাতে রহে সিতা রামের গোচর।
হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই।
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা ত্রিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোক চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
ত্রিভুবনে ঘুচক আমার অপজস ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥
অগ্নি প্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন শুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস ॥
রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্দ্ধে বসি।
ফল মুল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাসি ॥
কোন দোসে রেখেছিলে না জানি বিসেষ।
লবকুস দুই পুত্র পাইলা উর্দ্দেস ॥
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটুত্তর।

তেমনি পরিক্ষা চাহ সভার ভিতর ॥
রাজার মহিসি জারা যুখে আছে ঘরে।
পরিক্ষা লইতে আমি আছি বারে বারে॥
জন্ম জন্মান্তরে গোঁসাই তুমি হবে পতি।
আমার লল্যাটে লেখা ঘটিবে দুর্গতি ॥
আমা হেন নারি তোমার নাহি জেন হয়।
এত বলি দুনয়নে বারিধারা বয় ॥
আমা হৈতে অপজস পেতেছো গোসাই।
এ জনমের মত কিছু মনে করো নাই ॥
এ দাসির জন্যে পুভু পাইলা বহু দুখ।
আর না দেখিতে হবে পাপিঅসির মুখ ॥
এ প্রান তেজিব আমি তব বির্দ্দমানে।
বিদায় মাগিলাম প্রভু তোমার চরনে ॥
যুনিয়া সিতার কথা লোকে লাগে ত্রাস।
হাহাকার করি ষোহে ছাড়য়ে নিস্বাস ॥

(পৃঃ ২৪।২-২৫।১)

শেষ,—

বিষ্টু বলেন যুন ব্রহ্মা আমার বচন।
সংসারের লোক কৈলা সঙ্গে আগমন ॥
আসিয়াছে স্বর্গপুরে আমার বচনে।
সকল পিথিবির লোক রবে কোনখানে ॥
ব্রহ্মা বলেন যুন পুভু আমার উত্তর।
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর ॥
রামনাম মুখে বলে হৈলে পতন।
সে হইবে স্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন ॥
রাম নাম করে জদি মরেত চণ্ডাল।
সে চণ্ডাল স্বর্গপুরে আসিবে তৎকাল ॥
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন।
তাহার লাগিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইয়া বিদায়।
রামনাম জে করে সে চতুর্ব্বর্গ পায় ॥
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহার।
মর্ত্ত লোকে কি হইল সুন আর বার ॥
সরজুর জল ছিল পর্ব্বত প্রমান।
হেন জল কাদা হইল আটুর সমান ॥
হাহাকার করে জন কান্দে রাত্র দিনে।
বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] জন্তু বনে ॥
অসথায় জিব জন্তু সলিলে প্রবেসে।
সরির ছাড়িয়ে সবে চলে স্বর্গবাসে ॥
পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টরূপ ধরি।
রামের প্রসাদে জায় বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
রামায়ন রচিলা বাল্মিক তপোধন।
রামনামের গুনে হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার।
শ্রীরামনামেতে হয় জিবের নিস্তার ॥
লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে।
তাহা তো দেখিয়া ব্রহ্মা চতুর্মুখে হাসে ॥
চতুর্মুখে করে ব্রহ্মা বিষ্টুর স্তবন।
রামনাম তুল্য নাহি নিস্তারের ধন ॥
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
মহিমা না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥
রামায়ন যুনিতে জে করে অভিলাস।
বৈকুণ্ঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবাস ॥
অপুত্র যুনিলে পরে পায় পুত্রবর।
মনবাঞ্ছা পুন্ন হয় যুখে থাকে নর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত।
ভাসা মতে প্রকাসিলা রামায়ন গিত ॥
শ্রীরামকৃর্ত্তন জেন অমৃতের খণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরাকাণ্ড ॥

ইতি লবকুসের জুর্দ্ধ সমাপ্ত হইল……লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ তাস্ত পাটক শ্রীকালাচাঁদ তাস্য সাঃ বঃ দিঘি পরগনে সমরসাহি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুথির নাম 'লবকুশের যুদ্ধ'; কিন্তু আছে

শ্রীরামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে।

১২৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ ইত্যাদি।
জখন জাহা হবে তাহা বাল্মীক মনি জাণে।
লব কুস দুইটী ভাই ডাক দিয়া আণে॥
মোনি বলে সীতার পুত্র রহিলে কথাএ।
লবকুস প্রনমিল বাল্মীকের পায়॥
লব কুসে বলে সুন বাল্মীক তপুধন।
প্রাত[:]কালে আমাকে ডাকিছ কি কারন॥
মোনি বলে শুন তোমরা সীতার নন্দণ।
বন্ননের জজ্ঞ হেতু করিএ গমন॥
কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ।
আদ্য অন্ত জাণে মোনি ঘটীব প্রমাদ॥
তপবন রক্ষা আজি করিবা দুই ভাই।
তপশ্যা করিতে আজি পাতালেত জাই॥
এতেক বলিয়া তবে বাল্মীক চলীলা।
মোনিকে প্রনাম করি ধম্নু হাতে লইলা॥
ধম্নু হাতে দুইটী ভাই করিলা গমণ।
জণণীর চরন জাইয়া করিল বন্দণ॥
মাএর চরণে তবে প্রণাম হইয়া।
ধম্নু হাতে দুই ভাই চলীল মেলা দিয়া॥
তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন।
উদ্দেসে প্রণমিল বাল্মীকের চরন॥
লব পদধুলী কুসে তোলীয়া লইল মাথে।
বিচিত্র ধম্নু বাণ ধরিল বাম হাতে॥
অবেদ সন্ধাণ পোরে বান জত জাণে।
প্রাত[:]কালে ছারিলে বান বৈকালে আইসে টোণে॥
এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন।
অজর্দ্ধাতে সভা করিছে কমললোচণ॥
সত্রোগন গেল জদি মধুরা আশ্রমে।
ভরথ লক্ষন লৈয়া যুক্তি করে রামে॥
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন।
রাজসই জজ্ঞ করিতে লএ আমার মন॥
রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রাহ্মন।
বিনা জজ্ঞে পাপ কভু নহে বিমোচণ॥
বশীষ্টে বলে সুন রাম দয়াময়।
রাজসই জজ্ঞ রাম বর দুক্ষে হয়॥
রাজসই জজ্ঞ পুর্ব্বে কৈল পুরন্দর।
দেবতা মনিস্তে যুর্দ্ধ আছিল বিস্তর॥
এহি জজ্ঞ করিয়াছিল হরিশ্চন্দ্র অধিকারি।
জজ্ঞের দক্ষীণা দিল বেচিয়া পুত্র নারি॥
এহি জজ্ঞ করিআছিল সগর নৃপবর।
ব্রহ্মসাপে মৈল তার সাইট হাজার কুয়র॥
অশ্বমেদ জজ্ঞ করিলে প্রজা লোকের হিত।
সর্ব্ব কার্য্য সীর্দ্ধি হয় মণের বাঞ্ছীত॥
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়।
অশ্বমেদ জজ্ঞ আমি করিব নিশ্চয়॥

মধ্য,—

নাচারি॥

লক্ষন মরন শুনী কান্দে রাম রঘুমনী
দুকাকুলে করি হাহাকার।

বল্মীকের তপুবনে পরিলেক সীসুর বাণে
এ জর্ম্মেতে দেখা নাহি আর ॥
তোমী ভাইর গুন জত আমী আর ব াব কত
জত দুক্ষ পাইলা জে বনে।
হেন গুনের ভাই ছারি ব্রেথা আমী প্রান ধরি
জায় প্রান লক্ষনের সুনে ॥
তোমী জত দুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্ধন কৈলা
বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি।
তোমার সাহষ বলে লঙ্কা জিনীলাম হেলে
উর্দ্ধারিলাম জণককুমারি ॥

* * *

শ্রীরামের কান্দণে · কান্দে পাত্র মিত্রগণে
সুকাকুলে করে হাহাকার।
কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী
জায় সীগ্র যুর্দ্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭।২)
ত্রিপদি ॥
সীতা কান্দে ভুমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী
ধরিয়া রামের দুই পায়।
আহা প্রভু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের
এ বলীয়া ধরনি লুটায় ॥
জখন হৈলা বনাচারি আনিলা সঙ্গেত করি
সর্ব্বক্ষণ রাখীলা সাদরে।
এখন দিয়া বজ্রাঘাত কথা গেলা প্রাণনাথ
সঙ্গে করি নিয়া জায় মরে ॥
দণ্ডক বণেত ছিল রাবণে হরিয়া নিল
তাথে জত করিল ক্রন্দণ।
নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়া
বিক্ষ ধরি দিলা আলীঙ্গণ ॥
লব কুস দুই ভাই তা সমা নিষ্টোর নাই
বজ্র বুক হইয়া নিষ্টোর।
রায়স্তের অভরন নিসেদিল দুই জণ
মুছীলেক সীসের সীন্দুর ॥

এহি মত কল্পনা করি জণকের কুমারি
লুটাইল রামের চরন।
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয়
না কান্দিয় ধর্য্য হয় মণ ॥ (পৃঃ ১১।১)।

শেষ,—

তপুবণে গীয়া মোনি দেখীল নঞাণে।
সর্ব্ব সৈন্ন সমে রাম পরিয়াছে রণে ॥
মন্ত্র পরিয়া মনি দিল জলঝারা।
ওটীয়া বসীল রাম সুর্য্যবংসের চোরা ॥
পোণী জল পরি মোণী ডালীয়া দিল।
হস্তি ঘোরা সর্ব্ব সৈন্ন বর্ত্তিয়া উটীল ॥
চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ।
গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥
শ্রীরামে বলেণ সুণ মনি তপুধন।
বল দেখী দুই সীসু কাহার নন্দণ॥
তোমার জজ্ঞে জাব কাইল সীসু সঙ্গে লৈয়া।
পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়া ॥
লব কুসেকে ডাক দিয়া বলে মহামোনি।
জজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ঘোরা দেয় আণী ॥
ঘোরা লইয়া রামচন্দ্র করিল গমন।
অন্তর্দ্ধা ভুবণে আসী দিল দরসণ ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের অমৃেত লাহরি।
রঘুনাথ আণন্দে সবে বল হরি হরি ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কবির্ত্তসীরমনী।
উর্ত্তরার সেস গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী ॥
শ্রীরামের কাহিণী সুনিলে বারে বুর্দ্ধি।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল লব কুসের বুর্দ্ধ
ইতি লবকুসের যুর্দ্ধ সমাপ্ত ॥
•সক্ষল লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসের দাষ ॥

১২৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

(রাম সহ) লবকুশের বাগযুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি
রাবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন।
রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজা বিভিসন॥
রাজা হইলেন রামচন্দ্র অজুর্দ্ধ্যার পাটে।
দেবাসুর নাগ নর ছত্রতলে খাটে॥
বিরিঞ্চী বাসব বিভূ বৈবসত আদি।
শ্রীরামের পদসেবা করে নিরবদি॥
সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে।
রিক্ষ রাক্ষস কপী বসি স্থানে স্থানে॥
এই মতে আনন্দীত অজুর্দ্ধা নগর।
রাজত্ত করিলেন এগার হাজার বৎসর॥
রামের পালনে প্রজা দুখ নাহি জানে।
বহু ক্ষিরবতি হৈল সব গাভিগনে॥
চতুস্পদ সস্ত * * * বসুমতি।
আনন্দীত সর্ব্বজন সদা সুখ অতি॥
সময়েতে মেঘগন বরিসয়ে নির।
নির্ব্বিরোধে অজুর্দ্ধাতে রাজা রঘুবির॥
দেওান ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্র মহাসয়।
উঠিলেন সর্ব্বজন বলি রাম জয়॥
হেন মতে আনন্দীত রাজা রঘুবির।
একদিন স্নানে গেলা সরজুর তির॥
সরজু নিকটে এক রজকের ঘর।
বাপঘরে গেল ধোবি স্বামি অগোচর॥
পরদিনে ধোবিনি পুনশ্চ আইল ঘরে।
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভাজ্জ্যারে॥
রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি।
তাহাকে আনিলা ঘরে রাজা রঘুমুনি॥
তেমন কলঙ্ক আমি রাখিতে নারিব।
রাম রাজা নই যে পুনশ্চ তোরে নিব॥
সকর্ন্নে সুনিলা রাম এই সব কথা।
নিচ মুখে অপমান সুনি বড় বেথা॥

মধ্য,—

হেন কালে মুনিশীশু দেখিআ লক্ষনে।
সিঘ্রগতি কহে গীয়া বাল্মীক সদনে॥
লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে।
দেখিআ আইলাম মুনি আপন নয়ানে॥
এত সুনি আনন্দীত বাল্মীক তপোধন।
এত দিনে মর গৃহ হইল পুরন॥
রাম রাম বলি মুনি উঠি সীঘ্রগতি।
মুনির শিসুর সঙ্গে জান মহামতি॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সদা জপেন মনে।
লক্ষন সহিত সীতা দেখেন নয়ানে॥
সনমুখেতে দাণ্ডাইলা বাল্মীক তপোধন।
দুই জনে করেন মুনির চরন বন্দন॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসেন কারন।
তুমি দোহে কেবা বট বলহ এখন॥
মির্থ্যা না কহিবে তুমি সর্ত্ত জেন হঅ।
কিবা নাম কোথা ধাম দেহ পরিচয়॥
লক্ষন বলেন গোসাঞী করি নিবেদন।
পরিচয় দিব আমি সুন তপোধন॥
অজ রাজা পীতামহ দসরথ পীতা।
লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা॥
রামের জানকি মুনি দেখ বিগুমানে।
বিনা দোসে রামচন্দ্র পাঠাইলেন বনে॥

ইত্যাদি (পৃঃ৩।২-৪।১)

এক কথা কহি সুন মুনির নন্দন।
তোমরা ঘোড়া দায় জত চায় আনি দিব ধন॥
রত্নমালা গলে দিব হেম চাম্প্যা তাথে।
ফনিমুনি জড়িত করিয়া দিব তাথে॥
হিরাতে বান্দিআ দিব সব তপোবন।
অট্টালিকা পুরিয়া আনিআ দিব ধন॥
লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয়।
কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয়॥
ঘরের লক্ষী পরের বার্কে করিলেন বর্জ্জন।
হেন জনার কথা প্রর্ত্তয় না হঅ কখন॥
লক্ষীছাড়া হলে তার বুর্দ্ধি হঅ হত।
জা ইছা তাই বলে পাগলের মত॥
তুমি জদি মরে গোসাঞী দিতে পার ধন।
তবে কেনে সিতা লক্ষী করিলে বর্জ্জন॥
স্ত্রীকে অর্ন্ন দিতে নার তুমি দিবে ধন।
সেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হঅ ভ্রম॥
ইত্যাদি (পৃঃ২২।২-২৩।১)

শেষ,—

লব কুসে সঙ্গে লইআ বাল্মীক তপোধন।
অজুর্দ্ধ্যাভুবনে গেলা রামের সদন॥
বিনা জন্তো হাথে লইআ ভাই দুই জন।
রামের অর্গে গাইলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে।
... কুসে রামচন্দ্র করিলেন কোলে॥
... শোকেতে কাতর।
...॥
...।
... ব্যাসেতে॥
...ত হইল তবে অজুদ্ধ্যা ভুবন।
...ক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিলেন গমন॥
ছেদ্ধার্ম্মিত হইআ জেবা করয়ে শ্রবন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
সংখেপে কহিল এই কথা পুরাতন
সুনিলে দুর্গতি খণ্ডে পাপ বিমচন॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
উত্তরাকাণ্ডের কথা করিল রচনে॥
নিজ স্থানে জাত্রা কৈল পবননন্দন।
এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান॥

১৩০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১-১৬,১৮-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

ভরথ সক্রঘন বন্দি হৈলা দৈবগতি।
রাম ঠাঞি রথ নঞা আইলা সারথি॥
রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ।
ভরথ সক্রঘন বন্দি সুন রঘুনাথ॥
বিস্তর করিল রন দুই ভাই সনে।
তভু ভরথ বন্দি পড়িলা দুই তাএর বানে॥
হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে।
রথ নঞা আইলাও গোশাঞী তোমার কারনে॥
এতেক সুনিঞা প্রভু কুপিলা শ্রীরাম।
কোপে সর্ব্বাঙ্গে নিকলে কাল ঘাম॥
পুষ্পক রথে রামের পড়িল হাকার।
আনিয়া সাজন রথ জোগায় রথকার॥
ব্রহ্মার স্রীজিত রথ কি কহিব কথা।

রথের উপরে সুভে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা ॥
চারি দিগে সভা করে সেত চামর।
রথের উপরে অস্ত্র তুলিল বিস্তর ॥
ধবল বর্ন্নের ঘোড়ারাজ পবনে গতি।
রথে নঞা জুড়িল রাজহংস গতি ॥
গাএ সানা দিল রাম মাথাএ টোপর।
করে ধরিয়া নিল রাম পুর্ন্ন ধনুসর ॥
রুসিঞা লড়িল রাম রনের বিসাল।
জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞসাল ॥
রাম বলেন বসিষ্ট না ছাড়িয় জজ্ঞস্থান।
দিনে দিনে জজ্ঞ করিহ না করিহ আন ॥
জাত্রা করিয়া লড়িল প্রভু রঘুনাথে।
জয় জয় করিয়া সারথি চালাইল রথে ॥

মধ্য,—

'মুনি[কে] প্রনাম হঞা হাথে গাণ্ডিবান নঞা সর্ত্তরে চলিলা দুই ভাই।' 'বাছা আর না জাইয় তপবনে।' 'জানিঞা সুনিঞা মুনিগনে দিল মেলানি', 'ষুন বির্দ্ধ মহাসয় কহিতে বা কিবা ভয়', 'জানিল জানিল রাম তুমি জত দয়াবান', 'দুই ভাই রনস্থলে হাসিঞা হাসিঞা বলে', 'বড়ই সংসয় মুনি পিতাপুত্রে রন সুনি', 'আজ্ঞা দিল মুনিবর দুই ভাই জায় ঘর' ইত্যাদি ত্রিপদী কয়টি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডে প্রায় ঐরূপই পাওয়া যায়। ১০।২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

শেষ,—

হেথা বাল্মিকি মুনি করিলা গমন।
সিতার বিদ্যমানে আসি দিলা দরসন॥
বাল্মিকের চরনে সিতা হইলা নমস্কার।
জোড় হাথে কহেন সিতা বিনয় বেবহার ॥
তপবোনে নিরন্তর বড় রোল সুনি।
কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি।
দস মাস আছিলাম অসোক বোনের ভিতর।
হারিথ রাক্ষস সব জিনিথ বানর ॥
মুনি বলেন সিতা সুনহ উত্তর।
আর্চ্চয্য কর্ম্ম করিল আজি দুই সহোদর ॥
তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর।
পুষ্পক রথে জজ্জর হইলা রঘুবর ॥
হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে।
এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে ॥
আগে মুনি পাছে সিতা দুই কোঙর।
চারি জনে সান্ধাইল তপবন ভিতর ॥
নানা মায়া জানেন সিতা ঠাকুরানি।
মায়া হইতে হইলা সিতা বৃর্দ্ধ ব্রাহ্মনি ॥
দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে।
ভরথ লক্ষন বন্দি আর সত্রুঘনে ॥
অঙ্গদ আদি দেখিলেন জত কোপিগন।
হেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন ॥
সিতা বলেন যুনহ গোসাঞী কর অবধান।
সভাকে আমার আগে করহ ছাড়ান ॥
সকল কটক পাঠাইবে রামের বিদ্যমান।
সভাকে পাঠায়্যা রেথ বীর হনুমান॥
বন্ধমন্ত্র মুনিরাজের তথন মনে পড়ে।
মুনির আর্জ্ঞায় বানরের বর্দ্ধন সব খুলে ॥
মুনির আর্জ্ঞায় বৃক্ষে ধরে নানা ফল।
ফল মুল খায়্যা বানর হইল সিতল ॥
লব কুস দাণ্ডাইলা হাথ করিয়া জোড়া।
মুনি কহেন বাছা আনিয়া দেহ জজ্ঞের ঘোড়া
বাল্মিকবচন দুহে না করিল আন।
ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিদ্যমান ॥
মুনির চরনে দুহে হৈলা নমস্কার।
জজ্ঞের ঘোড়া পাইয়া সভার আগুসার
সিতার বচন যুনিয়া না করিল আন।
সভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান ॥

মুনির সঙ্গে হনুমান করিলা গমন।
সিতার বিদ্যমানে গেলা পবননন্দন॥
সিতাকে দেখিল গীয়া অস্থিচর্ম্মসার।
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার॥
জেমন দুখি সিতাকে দেখিল তপবনে।
তাহাকে অধিক দুখি রামের বিহনে॥
সিতাকে প্রনাম হনুমান সহস্রেক বার।
আসিব্বাদ দিল সিতা আনন্দ আপার॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষন।
উর্ত্তরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
ইতি লবকুসের পালা কথক সমাপ্ত॥

১৩১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ভরথ সত্রুঘন বন্দি দৈবের সে গতি।
বার্ত্তা দিতে চলিলেন সুমন্ত শারথি॥
জজ্ঞস্থানে বসিঞা আছেন রঘুনাথে।
হেন কালে সুমন্ত দাণ্ডাইল জোড় হাতে॥
সুমন্ত বোলেন প্রভু করি নিবেদন।
আজি সিশুর হাতে পড়িল ভরথ শত্রুঘন॥
এত সুনি রামচন্দ্র পড়িলা ভূমিতলে।
বক্ষ তিতিঞা জায় নঞানের জলে॥
হাহাকার করিঞা কান্দেন রঘুনাথে।
ভাই ভাই বলি কান্দে লোটাঞা ভূমিতে॥
অশ্বমেধ জজ্ঞে হৈল এতেক প্রমাদ।
কে জানিবে জজ্ঞ কৈলে হবে বিশম্বাদ॥
জংবান বোলে প্রভু সুন রঘুনাথ।
তোমার নিকটে বলি করি প্রনিপাত।
আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে।
সিঘ্র করি বিনাসহ রে দুই সিসুরে॥
চল সভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম।
মন্ত্রির বচনে প্রবোধ না মানেন রাম॥
হাহাকার করি রাম কান্দে ভাইএর শোকে।
মুচ্ছিত হইলা বাক্য নাহী শ্বরে মুখে॥
কান্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈল
ক্রোধমুর্ত্তে রামচন্দ্র উঠিঞা বসিল॥
সুমন্তের তরে ডাকি বোলেন নারায়ন।
রথ সর্জ্জ কর যুদ্ধে করিব গমণ॥
এতেক শুনিঞা তবে সুমন্ত শারথী।
সংগ্রামের রথ শাজাইল সিঘ্রগতী॥
সুবর্ন্নের রথখান মানিকের চাকা।
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাকা॥
চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝারা।
চারি ভিতে শোভা করে মনি মানিক হিরা॥
ছাড়িয়া চামর বান্ধে রথের উপর।
ধবল বর্ন্নে অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রথ পর॥
ময়ুরের পুখে করে রথের ছাওনি।
চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিঙ্কীনি॥
নানা অস্ত্র রথ পরে তোলে শারি শারি।
গুহার সাগড়া তোলে ভৃঙ্গারেতে বারি॥
শাজাইঞা রথখান অতি সিঘ্রগতি।
রামের সম্মুখে লৈঞা করিলা প্রনতি॥

মধ্য,—

দেখিয়া সিসুর ঠাম কৌতুকে পুছেন রাম
সিসু কোন বংশে তোমার জনম।
ইথে বড় ধনুদ্ধর বিদিত জাহার পর
জাতি বুদ্ধি পুছে কোন জন॥
জানি হে জানি হে রাম তুমি অত বলবাম
পুনঃ পুন কর বিল্লাপ।

হাথে ধর গাণ্ডীবান পুরো তুমি সন্ধান
তবে আজি বুঝিব প্রতাপ ॥
বৃদ্ধ য়েক জরা নারি তাহাকে রণেতে মারি
বিরপণা জানাইলা ত্রিভুবণে।
অহল্যা পাশান ছিল তাহে তুমি মুক্ত কৈল
গৌতমের সাপান্ত বচনে ॥
তবে বোল নৌকাখানি কাঞ্চন কর‍্যাছি আমি
এ বুদ্ধী পাইলা তুমি কতী।
শৈই ইশ্বরের ইচ্ছা তাহা মনে কর মিছা
শেই কর্ম্মে তোমার কি শক্তী ॥
মিত্র পাত জার শনে তার ভাইএ মার রণে
কে বোলে হে পরম দয়াল।
রাবণ আর কুম্ভকর্ন্ন নাহি গনি এক বর্ন্ন
তারে মারি কর অহঙ্কার ॥
আজি আইশ মোর রনে এই ত সংগ্রাম স্থাণে
এখনে বুঝিব তব বল।
এত সুনি রঘুমুনি কোপে জলে জেন অগ্নি
গাণ্ডীব নইলা মহাবল ॥
কিবা তুই সিসু মারি নহে বা আপনে মরি
এত বলি পুরিল টঙ্কার ?
স্বর্গে দেখে দেবগণ বিস্ময় হইল মন
ত্রিভুবণে নাগে চমৎকার ॥
এত সুনি দুই জণে গাণ্ডীব ধরিঞা টানে
মহাক্রোধে ছাড়িল নিশ্বাস।
লব কুশ দুই বিরে রাম পর অস্ত্র এড়ে
রচিল পণ্ডীত কির্ত্তীবাশ ॥

(পৃঃ৫।১-২)

এথা সিতা রামচন্দ্রে দেখিঞা নঞানে।
মুচ্ছিত হইঞা সিতা পড়িলা তখনে ॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ছাড়িলা আমারে।
অভাগিকে দয়া কি করিবা গদাধরে ॥
আর না দেখিব প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ।
আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাভূবণ ॥
উঠিঞা জানকি পুন চাহে রাম পাণে।
তথা চারি দিগে দৃষ্টী করে নারায়ণে ॥
সিতার বদন রাম দেখিতে পাইল।
হা জানকী বলি রাম কান্দিঞা পড়িল ॥
সিতা সিতা বলি রাম উঠে অচম্বিত।
আখি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে তুরিত ॥
সুনিঞা মুনির বাক্য সিতার গমন।
এথা সিতা না দেখিঞা চিন্তে নারায়ণ ॥
রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল সিতারে।
কোথা গেল সিতা মোর বোল মুনিবরে ॥
মুনি বলে রামচন্দ্র বলিয়ে তোমায়।
বটআড়ে চন্দ্রছায়া দেখিলে মহাশয় ॥
এই বাক্য বলি রামে প্রবোধ করিল।
মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল ॥
অশ্ব মুক্ত করি তবে দিলা মুনিবর।
বাগডোর ধরিঞা লইল অনুচর ॥
রাম বোলে তোমাকে করিলাম নিমন্ত্রন।
জজ্ঞস্থাণে নৈঞা জাবে সিসু দুই জণ ॥
কালি জেন দুই সিসু চলে জজ্ঞস্থাণে।
সিসুমুখে সুনিব অপুর্ব্ব রামায়ণে ॥
এত সুনি মুনিবর বোলেন বচন।
অবস্য লইঞা জাব সিসু দুই জণ ॥
এত সুনি আনন্দিত রাম গদাধর।
বিদায় মাগিলা রাম মুনির গোচর ॥
মুনির চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত।
সসৈন্যেতে রাথ্যোতে চলিলা রঘুনাথ ॥
শ্রীরামে বিদায় করি মুনি গেলা ঘর।
সরজুর পার হৈলা রাম গদাধর ॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত বিবিধ বাজন।
রাম জয় রাম জয় ডাকে শক্তগন ॥
চারি ভিতে সন্যগণ করে কোলাহল।

প্রবেশ করিলা রাম অজোধ্যানগর ॥
দেখিঞা সকল লোক আনন্দীত মন।
আনন্দীত হৈল তবে অজোধ্যাভূষণ ॥
পাত্র মিত্র সংহতি বসিলা গদাধর।
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র মাথার উপর ॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডীত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রামনাম স্মরণে পাপির পাপ বিমোচন ॥ * ॥

১৩২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¼ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রাস পাইয়া রাজা আপনা নেহালে ॥
সঙ্গ সহিত স্ত্রি হৈলাঙ টুটিয়া আইল বলে।
আপন সঙ্গ চিনিতে নারে তাহার মিসালে ॥
মোহাদেবের পায় পড়িয়া কাতরত বোল বলে।
কৃপা কর গোসাঞি মোর সঙ্গ সকলে ॥
উঠ উঠ মহারাজা বলেন মহেশ্বর।
পুরুস এড়িয়া তুমি আর মাগ বর॥
মহাদেবের বচন রাজা সুনিঞা দারুন।
দেবির চরনে পড়িয়া রাজ করেন করুন ॥
দেবি বলে দেবে[র] বোল আন করিতে নারি।
এক মাস পুরুস হবে এক মাস নারি ॥
এক মাস পুরুস হবে আমার বর দানে।
আক্ষেমা না কর রাজা চল আপন স্থানে ॥
পুরুস হয়্যা স্ত্রি হইলাহোঁ নহিব স্মরন।
স্ত্রি হয়্যা পু[রুস] হৈলে হবেক পাস্মরন ॥
জে মাসে হইব সেই সগেয়ান।
পূর্ব্ব মাসের বিত্তান্ত সব হব পাসরন ॥
রাজা বলে মাসেক হব পরম সুন্দরি।
মাসেক পুরুস হব রূপের মাধুরি ॥
পরম সুন্দরি রাজা হইলা দেবিবরে।
রাজ্য ছাড়িয়া বুলে রাজা স্ত্রী অনুচরে ॥
শ্রীরামের কথা শুনিয়া ভরথ লক্ষন হাসে।
অদ্ভুত অদ্ভুত বলিয়া কথাকে প্রসংসে ॥
ভরথ লক্ষন বলেন গোসাঞি বড় উপহাস।
স্ত্রী হয়া কেমতে রাজা বঞ্চে এক মাস ॥
পুরুস হয়া এক মাস কোন মতে বঞ্চে।
এতেক বিপত্য রাজার কত দিনে ঘুচে ॥

প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ হইল রাজার উপাখ্যানে।

পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া আপনার মনে।
হেমগিরি পর্ব্বত সুহুই কাঞ্চনে ॥
সুবর্ণ [পর্ব্বত দেখি লাগে চমৎ] কার।
বিন্দুগিরি তরিয়া ঘোড়া হইলা পার ॥
মেরুপর্ব্বতে গেল লক্ষন ঘোড়ার গমনে।
মেরুপর্ব্বতে রহে ঘোড়া বেলা অবসানে ॥
মেরুপর্ব্বতের নিকটে পশ্চিম সাগর।
পশ্চিম সাগর বুলিয়া ঘোড়া নড়িলা উত্তর ॥
উত্তর দিগ গেল ঘোড়া দেখিতে সুন্দর।
হিমালয় পর্ব্বত গেল ঘোড়া হিমের নগর ॥
পবন বেগে গেলা ঘোড়া আপনার মনে।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বুলে কথক দিনে ॥
নানা দেস ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর।
পূর্ব্ব দিগ গেলা ঘোড়া দেখিতে সুন্দর ॥
পূর্ব্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মূর্ত্তি ধরে।
লক্ষনের কটক দেখিয়া জুঝিতে হাঁকারে ॥
নানা অস্ত্র লয়া লোক জুঝিবারে সাজে।
শ্রীরামের ঘোড়া দেখিয়া সর্ব্বলোকে পুজে ॥

উদয় গিরি পর্ব্বত বুলে উদয় সেখর।
নানা দেস দেখে জোথা উদয় করে দিবাকর॥
পূর্ব্বসাগর বুলিয়া ঘোড়া চলিল দক্ষিনে।
দক্ষিন দিগ বুলে ঘোড়া বন উপবনে॥
তিন দিগ বুলিয়া ঘোড়া আইল দস মাসে।
দক্ষিন বুলে ঘোড়া বৎসর অবসেসে॥
বন উপবন ঘোড়া সকল নগর বুলে।
বেলা অবসান রহিলা সমূর্দ্রের কূলে॥
নানা দব্য মেলিল আসীয়া মোধুর স্বাদ।
সকল দব্য খাইল খণ্ডিল অবসাদ॥
সমুদ্রের কূলে রহিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি।
পরিস্রমে নিদ্রা জায়ে সম্ভ সেনাপতি॥
নাটে গিতে নানা বেসে থাকি নানা বেসে।
ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিত্তিবাসে॥*॥

(৭—১।২।)

উদ্ধৃত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অনেকটা একরূপ। ইহার পর,—

জজ্ঞ করে রোঘুনাথ লয়া মুনিগনে।
হেন বেলা ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে॥
রাম বলেন সুন সকল মুনিগন।
কার্য্য সির্দ্ধ হবেক আমি জানিল কারন॥
জজ্ঞসালাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি।
ধন্ত ধন্ত বলিয়া সভে ঘো[ড়া]কে প্রসংসী॥
জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে।
সকল মুনি আইলা রামের আমন্তনে॥

ইত্যাদি (৭।২।)

এই অংশ মূল আখ্যানের সহিত সংলগ্ন নহে। শেষের পাতাখানি অন্ত পুথির।

১৩৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪১। সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রবির কিরনে হয় পোহাল সর্ব্বরি।
শ্রীরাম লক্ষন আইলা সিতা সঙ্গে করি॥
মুনির আগে বিদায় মাগে দুই ভাই।
আসির্ব্বাদ কর আমরা বোনবাস জাই॥
সোকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ।
প্রবোধ করিয়া দেসে পাঠাইলাম ভরথ॥
ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়া দিব পিণ্ডদান।
মুনিকে গয়ার পথ জিজ্ঞাসিছেন রাম॥
নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়[1]
গোলক ছাড়িয়া প্রভু হইলা অবতার।
তোমা হৈতে নির্ভয় হইবে সংসার॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক বোনে আছএ গাণ্ডার।
জানকিকে রাম না করে চক্ষের আড়॥
ভ্রমন না কর রাম অনেক অনেক দেস।
সঙ্গেতে সুকমলা সিতা পাইবে অনেক ক্লেষ॥
নিকটে থাকিহ ঋষি তপস্বি আশ্রমে।
সিতা সঙ্গে কর্য়া না জেউ দুর বোনে॥
পুজা জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাড়িয়া।
রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চায়্যা॥
প্রনাম করেন রাম ভরদ্বাজের প্রায়।
সকল সিস্য মেলি রামকে করেন বিদায়॥

গয়াকৃত্য শেষ করিয়া রামচন্দ্রের কাশী যাত্রা,—

১। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় পাড়য়াছে।

রামের বিনয় করে জানকি সুন্দরি।
ধিরে চল রামচন্দ্র হাটিতে না পারি ॥
কভু নাই হই রামি কুটির বাহির।
আজি বিশ্রাম কর প্রভু জাব কত দুর ॥
রামচন্দ্র বলে সুন জানকি রূপসি।
সংসারের দুল্লভ স্থান দেখি গিয়া কাসি ॥
(পৃঃ ৭৯-২)

যথাকালে কাশী প্রবেশ,—

সিতা লয়্যা বারানসে করিল প্রবেষ ॥
(পৃঃ ৮।১)

ইহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া কাশীবাসিগণের খেদ। অনন্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ রামাদির মিলন বর্ণিত।

কাসিবাসি লোক দেখ্যা ছাড়য়ে নিস্বাষ।
কোন বিধি করিল রামের বোনবাষ ॥
ধন্য ধন্য কৈকৈ পাসান তোর হিয়া।
কেমনে ধর্য়াছে প্রান বোনবাষ দিয়া ॥
সকলের প্রান রাম নয়নের তারা।
সতিসাধ্য পতিব্রথা ঝুরিছেন তারা ॥
অখিলের নাথ রাম দেবাদ্দিদেবা।
ভবনতে লয়্যা চল করি গিয়া সেবা ॥
বারানসির রাজা সিংহনরপতি।
সুমিত্রার পিতা লক্ষণ জার নাতি ॥
লোকমুখে নিপত্তি সুনিল সম্বাদ।
পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্ব্বাদ ॥
রাম সিতা লক্ষণে করিয়া সম্বাস।
তিন জনার মুখ হেরি ছাড়িল নির্শ্বাস ॥
ধন্ন ধন্ন দসরথ কঠিন তোর হিয়া।
কেমনে বেন্ধ্যাছে প্রান বোনবাস দিয়া ॥
রামকে লইয়া হৈল্য কন্দনের রোল।
সম্বরিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥
রাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে।
চিত্রকুটিতে সংবাদ পাইলাম ভরথের মুখে ॥
মোর সোকে দসরথ তেজেছে পরান।
বিষ্টুপদে আসিয়া করিলাম পিণ্ডদান ॥
চর্দ্দ্য বৎসর আমার নাহি রাজ্যের আস।
এক রাত্রি কাসিতে আমি করিব বাষ ॥
রাম বলে মহারাজা না কর বিসাদ।
বোনবাস করি ইথে দেহ] আসির্ব্বাদ ॥
বিস্তর বলিলাম লক্ষন না রহিল ঘরে।
বোনবাস এলো মোর দুখিবারে ॥
মা সুমিত্রার প্রানধন লক্ষন গুনের ভাই।
মায়ের কোল সর্ম্ম করি বোনে লয়্যা জাই ॥
রাজা বলে রাম জিবনে নাহি আস।
কার বোলে কোথাকারে জাহ বোনবাস ॥
কত দুখ পাবে রাম থাক মোর দেসে।
জানকি লক্ষন লয়্যা না জায় বোনবাস ॥
সংসারের দুল্লভ আমি কাসির রাজা।
গঙ্গাস্নান কর নিত্য কর সিব পুজা ॥
দিব্ব্য স্থান দেখ রাম ভাগিরথির তির।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ বোনাই কুটির ॥
শ্রীরাম বলেন রাজা এ নয় মনেতে।
ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে ॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৮।২-৯।২)

ইহার পর আস্তিক উপাখ্যান ও মাণ্ডব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে চাতকের, মাছরাঙা পাখীর ও মণ্ডুকের উপাখ্যান পাওয়া যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত লক্ষ্মণের মহাদেবের কদলীবনে প্রবেশ, হনুমান্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের বন্ধন, রামের হাতে হনুমানের পরাজয়, শিব-রামের সংগ্রাম এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত।

শেষ,—

আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি।

সনমুখে দেখে রাম রিস্তমুখ গিরি ॥
নানাজাতি বৃক্ষ্য দেখে পর্ব্বত উপর।
ফল ফুলে পরিপুর্ণ অতি মনহর ॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
সারি সারি আছে আর দেবদারু ॥
বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জ্জল।
আম্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥
পর্ব্বত দেখি রাম হৈলা আনন্দিতা।
এই পর্ব্বতে পাইব সুগ্রিব মিতা ॥
পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবান করি আইলা নারায়ন ॥
লক্ষন সহিত উটে গাণ্ডীবান হাথে।
উটিয়া [জান] জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্তমুখে ॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে।
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু হাথে গাণ্ডিবান।
পর্ব্বত উপরে দাণ্ডাইল রাম ॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি।
অরুন নিজ্জিত রাঙ্গা চরন দুখানি ॥
সু[ন]লিত জিনিয়া মৃনাল হাথের দণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষ্যয় তুন বামে কোদণ্ড ॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্চ মদ্ধ দেসের সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা ॥
রিস্তমুখ দেখি প্রভু রামের উল্লাষ।
আরন্ন কাণ্ড গাইল পণ্ডীত কিত্তীবাস ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈলা আরন্ন কাণ্ড ॥
লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই
প০ জাহানাবাদ।

১৩৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩১, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আরন্নেতে জানকি হারালেন মহাসয়।
কিস্কিন্দার মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
হরি হরি বদনে বল সর্ব্বজন।
কিস্কিন্দাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
আকুল হইয়া দুই ভাই জানকির সোকে।
সুগ্রিব অদ্ধাসন রাম করেন রিস্তমুখে ॥
ভুবনমোহন তনু গাণ্ডিবান হাথে।
সুগ্রিব অদ্ধাসন রাম করেন পর্ব্বতে ॥
পঞ্চ বানর সুগ্রিব পর্ব্বতে আছিলা।
দুই ভাইকে দেখি রাজা চমতকার হৈলা ॥
নল নিল সুসেন সম্পাত হনুমান।
পঞ্চ পাত্র লয়্যা রাজা করে অনুমান ॥
রার্জ্য ভুম লয়্যা বালি ক্ষেমা না দিলেক।
মারিবারে তরে দুই বির পাঠাইলেক ॥
নিকট হইলা আসি দুই ধনুকি।
উপদেস না পায় চল লুকাইয়া থাকি ॥
রিস্তমুখে থাকি কেন পরান হারাই।
পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়া জাই ॥
হস্তি ঘোড়া পলায় মহিস গাণ্ডার।
পঞ্চ বানর পলায় নাহিক নিস্তার ॥

মধ্য,—

রাম বুঝাইয়া গেলা ফল আনিবারে।
সর্ন্ন ঘর পায়্যা রাম কান্দে উচ্চ্যস্বরে ॥
পর্ব্বত উপরে কান্দে প্রভু নারায়ন।

অজানুলম্বিত জটা ভুবনমোহন ॥
সঙ্করি সহিত সিব অন্ন পথে চলে।
হেনকালে হরপৃয়া হরিরে নেহালে ॥
অপরূপ পুরূস আশ্চয্য দেখ হোথা।
বিশ্বয় ভাবিয়া সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥
সুন সিব সকল সর্ব্বস্ত হও তুমি।
এক বাক্য এখন জিজ্ঞাসা করি আমি ॥
ঐ দেখ আশ্চয্য অপরূপ কায়।
ধৈয্য ধরিতে নারে ধুলায় লোটায় ॥
দুর্ব্বাদল স্যাম দেখি জুড়াইল দে।
অতএব জিজ্ঞাসা করি ঐ জন কে ॥
হর বলে হে দুর্গা হেমন্তের ঝি।
পরিচয়ে পার্ব্বতি তোমার কাজ কি ॥
অভয়া এতেক সুন্ত্যা আরবার কয়।
ইহার বিত্তান্ত কথা না বলিলে নয় ॥
এত সুনি আরবার কন সুলপানি।
তব নাথ আমি দুর্গা মোর নাথ ঔনি ॥
সুয্যবংস দসরথ রাজার নন্দন।
চারি অংসে আপুনি জর্ম্মেছে নারায়ন ॥
জম্মিলেন জানকি সে জনকের ঘরে।
তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥
পালিতে পিতার সত্য প্রভূ আইল বোন।
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন ॥
লক্ষিরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাবন।
কাতর হইয়া তেঞী করিছেন ক্রন্দন ॥
সুন সদাসিব সব [চরনে] নিবেদি।
অখিল ইশ্বর গুরু তার দুর্থ কি ॥
বির্শনাথ বলিছে বাল্মিক মুনি আছে।
প্রভু না জম্মিতে সে পুরান করাছে ॥
পুথি পুর্ন হেতু হৈলা দুর্ব্বাদল স্যাম।
ভক্তবাঞ্চা পুরাইতে কান্দিছেন রাম ॥
দুর্গা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিএ।
সিতারূপে সিব্র তবে আ স পরিক্ষিএ।
সিব্রগতি সঙ্করি সিতামুর্ত্তি হইল।
জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল ॥

(পৃ০ ১৯২-২০১)

শেষ,—

পাখা সারিয়া বস্যা সম্প[া]তিনন্দন।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥
আমার জস কির্ত্তি থাকুক তিন লোকে।
মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে ॥
অঙ্গদ বলেন সুন আমার কাহিনি।
উপায় করহ সবে সিতার বার্ত্তা জানি ॥
তোমার পিষ্টে মোরা কেমনে হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুম্ভির ॥
বাহুবলে আমরা সমুদ্র হব পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর।
পোড়া পাখে পাখা উঠে বিশ্বয় বানর ॥
পিতা পুত্রে প্রনাম করে বিরভাগের পায়।
পিতা পুত্রে দুই জনে হইল বিদায় ॥
বাপে পুত্রে পক্ষরাজ্ গেলেন উত্তর।
বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল পুথি কিস্কিন্ধাকাণ্ড ॥*॥

লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সা০ শেনাই প০ জাহানাবাদ।

১৩৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪৯, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড গাইলা গিত রামায়ন ভিতর।
পাচ কাণ্ড সুন্দর গিত সুনিতে সুন্দর॥
বাপে পোয়ে পক্ষ্যরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিন সাগর॥
তজ্জন গজ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিছে প্রমাদ॥
জলজন্তু কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে দেবতা বানররূপ আপুনি॥
জলজন্তু দেখি জেন পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান॥

মধ্য,—

এত সুনি উগ্রচণ্ডা কহে হনুমানে।
তুমি সে রামের দাস জানিব কেমনে॥
হনুমান বলে মাতা নিবেদন করি।
এই দেখ শ্রীরামের হাথের অঙ্গরি॥
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার।
হনুমানে উগ্রচণ্ডা কহে পুনর্ব্বার॥
রাবন হরিয়াছে জদি রামচন্দ্রের সিতা।
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ম্বিতা॥
সেই আমি সেই সিতা ইথে নাহি ভেদ।
পুরানে পণ্ডিতমুখে নাহি সুনি বেদ॥
জেই জন উত্তপতি হয় অজনিসম্ভব।
আত্তসক্তি অংসেতে জন্মিব সেই সব॥
সেই সিতা সেই আমি এতে নাহি আন।
কৈলাস চলিলাম আমি তেজি এই স্থান॥
আমারে হরিতে রাবনে দুষ্টমতি।
জানিলাম রাবনে হইয়াছে দুর্ম্মতি॥
রঘুনাথে বলিবে লঙ্কায় নাহি সঙ্কা।
দগ্ধ কর হনুমান রত্নপুরি লঙ্কা॥
এত বলি সিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর।
কৈলাসে চলিলা দেবি জেথানে সঙ্কর॥
(পৃঃ ৮৯২-৯৯১)

অতি মনহর স্থান বিচিত্র গটন।
পঞ্চ পাত্রে বসিয়া আছে বিভিসন।
ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব।
হনুমান বলে এই পরম বৈষ্টম॥
বৈষ্টম হইয়া রামের সিতা নাহি রাখে।
সহশ্রেক তাহার ভুবনে নাহি থাকে॥
অতিকার ভুবনে প্রেবেসিলা হনুমান।
দেখি বিচিত্র আসনে বসি করে [হরি নাম]॥
চন্দনে ভুসিত তুলসির মালা হাথে।
জপিছে হরি[র] নাম তরিতে ভারথে॥
(পৃঃ ১০।১)

লঙ্কাপুরি খুজি কোথাউ না পাইল উর্দ্দিস।
রাজাঅন্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস॥
অতি মনহর দেখে রাজার অন্তপুরি।
দস হাজার ঘর তাহা সোভে সারি সারি॥
তার মর্দ্ধে ঘর এক পরম সুন্দর।
নানা রত্নে ঘরখান করে ঝলমল॥
পুষ্পসজ্যায় হইয়াছে গন্ধ আমদিত।
রত্ন পৃদিপ জলে চারি ভিত॥
দেব দানবের কন্যা জথা জে পায়।
স্ত্রী সজ্যাতে রাবন সুখে নিদ্রা যায়॥
স্ত্রী সকল লয়্যা রাজা নিদ্রা জায় সুখে।
মন্দদরি রানি দেখে রাবন সনমুখে॥
সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি।
রাবনের কোলে জেন এই চন্দ্রামুখি॥
নানা রত্নে ভুসিতা দানবদুহিতা।
হনুমান বলে হবে এই রামের সিতা॥
রাজা হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে।

বনচারি হল্যা হরি জটা বাকল পর্য্যা।
সবংসে মারিবে হরি ধনুর্ব্বান ধর্য্যা ॥
ত্রিভুবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান।
তোমা হইতে পাইলাম দুর্ব্বাদলস্যাম ॥

(পৃঃ ১২।২)

ধার্ম্মিকে পরম ধর্ম্ম রাবন ঔরসে জর্ম্ম
বিরবাহু রাবনকুমার।
মহাবির পরাক্রমে ইন্দ্র কাঁপে জার নামে
মহাবল বির অবতার ॥
বিরবাহু ধর্ম্মসিল পাপ নাহি এক তিল
ত্রিভুবনে বড় পুন্নবান।
বৈষ্ণব জানিয়া আমি জুদ্ধ না করিহ তুমি
আন গিয়া কমল নয়ান ॥
বিরবাহু সুর্দ্ধমতি নিয়মেতে বিপ্র প্রিতি
এক লক্ষ করে হরিনাম।
লক্ষ হরিনাম লয়্যা ব্রাহ্মনে দক্ষিনা দিয়া
তবে বির করে জল পান ॥
রাম বলেন:বিভিসন বৈষ্ণব এমন জন
তবে আমি না করিব রন।
বিভিসনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে পাথি
হেন বিরে দিব আলিঙ্গন ॥
বিরভাগে এত বলি গাণ্ডিবান ভুমে ফেলি
জান রাম বিষ্ণু অবতার।
রামপদ করি য়াস বিরচিল কির্ত্তিবাস
বিরভাগ দেয় জয়কার।*॥

(পৃঃ ৩১।২-৩২।১)

বিভিসন রনস্থলে কাটা মুণ্ড করি কোলে
নয়ানে গলিছে প্রেমধার।
অন্তরে দারুন দুখ চুম্বন করয়ে মুখ
মরি বাছা না দেখিব আর ॥
মুখে মুখ দিয়া কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সুনিতে ভরিল কলেবর।
রূপে গুনে ধন্ন তুমি তোমার লাগিয়া আমি
ঝুরিয়া মরিব নিরন্তর ॥
তোমা পুত্র গুননিধি দিয়া কেন নিলা বিধি
বড় সেল রহিল মরনে।
পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চস্বর করি
কাহার নিসেধ নাহি মানে ॥

(পৃঃ ৮৯।২)

পঞ্চ বৎসরের রাম রূপে গুনে অনুপাম
তাড়কা মারিচ মারে বানে।
কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে
হেলায় পরুসরাম জিনে ॥
রাম থর ধুসন মারে মারিচের বিনাস করে
ক রে কাটিল দুই বাহু।
সরন পসগা পায় ভজ রামের রাঙ্গা পায়
রাখিতে নারিবে তোমা কেহ ॥
হেন নয় মর মন ছাগ বাগে করে রন
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
দুর্জ্জয় লঙ্কার গড়ে কুম্ভকন্ন বির পড়ে
হেন রামকে জিনিবে কেমনে ॥

(পৃঃ ১১৩।২-১১৪।১)

সম্পাতি বলেন মা সুন তোমায় কই।
সম্পাতি আমার নাম সুন তোমায় কই ॥
প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর।
বাদ্যভাণ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর ॥
এত সুনি কন মা জনকনন্দিনি।
বাদ্যের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি ॥
দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি অসকবনে থাকি।
সয়নে সপনে সদা রাম বলে ডাকি ॥
সরমা সিতার বামে বসিয়া আছিল।
সম্পাতিকে দেখে সরমা কহিতে লাগিল ॥
সরমা কহেন সম্পাতি করি পরিহার।
প্রাননাথকে জেয়ে মোর কহগা সমাচার ॥

মহিকে মহারাজা এনেছে স্বরন করা।
রাম লক্ষন দুই জনাকে আনিবেক হয়া ॥
এত সুনি কন মা জনকের ঝি।
সিতা বলে সরমা গো তবে হবে কি ॥
কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়।
সোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায় ॥
সরমা বলেন মা না করিহ সোক।
রামচন্দ্র জম্মিআছেন ছাড়িয়া গোলক ॥
ক্রন্দন সম্বর মা স্তির হয় তুমি।
সংবাদ জানিয়া মা সিগ্র পাঠাই আমি ॥

(পৃঃ ১৫৫।১-২)

জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞি ॥
লক্ষন বলেন মা করি গো বিনয়।
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয় ॥
লক্ষন বলেন সুন জনকের ঝি।
রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আমি করিব কি ॥
এ কথা সুনিয়া সিতা লক্ষনের মুখে।
বর্জ্জাঘাত পড়িল জেন জানকির বুকে ॥
পড়িল কদলি জেন বৈসাখের ঝড়ে।
লক্ষন ছাড়িয়া সিতা মুর্ছা হয়্যা পড়ে ॥
অজ্ঞান হইল সিতা মুখে নাহি রা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়িছে গা ॥
বিস কাঁড়ে ব্যাধ জেন বিন্দিলা হরিনি।
ধুলায় পড়িয়া কান্দে জনকনন্দিনি ॥

(পৃঃ ২০ ।১)

রাম পেয়া রানিরা সব করেন বিসাদ।
ভরথে ডাকিয়া রাম করেন সংবাদ ॥
রাম বলেন সুন ভরথ গুনের ভাই।
মা কৈকৈকে কেন দেখিতে না পাই ॥
সত্রুঘন বলেন মা কাতর লর্জ্জাতে।
ঐ দেখ মা য়েসেছেন সভার পশ্চাতে ॥

জানকি লক্ষন সঙ্গে ধেয়া চলে রাম।
কেকৈয়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম ॥
বাহু পসারিয়া রানি তুলে নিল কোলে।
সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে ॥
রাম বলেন লক্ষন কার মুখ চায়।
মা অচে[ত]ন হয়েছে মুখে জল দেয় ॥
রাম বলেন মা আমার পানে চায়।
চেতন হইয়া মা মুখে চুম্ব খায় ॥
কেকৈ বলেন আমি হয়ে না মরিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম ॥
মা হয়া রাম তোমায় দিলাম আমি দুখ।
দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ ॥
জত দিন বনবাঁস গিয়াছিলে দুই ভাই।
চর্দ্দ বৎস্তর ভরথ আমাকে মা বলে নাই ॥
দিবা রাত্র ভরথ আমায় দেয় গালাগালি।
নগরের মাঝে আমি মাথা নাহি তুলি ॥
কলঙ্ক ঘুচায় বাছা তবে প্রান রাখি।
রাজা হয়ে প্রজা পাল নয়ান ভরে দেখি ॥
রাম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ।
বনবাস করয়া এলাম তোমার আসির্ব্বাদ ॥

(পৃঃ ২৩৪।১-২)

শেষ,—

সত্ত সামন্ত আর অজুধ্যার প্রজা।
সকলে বিদায় করি দিল রাম রাজা ॥
অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন।
রাক্ষস কটকে তাহে রহে বিবিসন ॥
সুবর্ন্নের পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।
আপনার সেনা লয়্যা রহিলা জাম্বুবান ॥
বিচিত্র নির্ম্মান পুরি অতি মোনহর।
সুগ্রিব রহিলা সব লইয়া বানর ॥
গুহক আদি করি জত পারিসাদ।
সকলে দিলেন রাম রাজপ্রসাদ ॥

ভলুক বানর আর অতেক রাক্ষস।
রামের প্রেমে বিরভাগ সভাই হইল বস॥
প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিলা বাসা।
পরম সাদরে সভে করেন জিজ্ঞাসা॥
রামচন্দ্রে[র] আজ্ঞা পায়্যা জত বিরভাগে।
নানা দির্ব্ব দর্য্য জোগায় জাথে জেবা লাগে॥
পিতিরি মাতিরি কুলের জত বন্ধু বান্ধব।
সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব॥
ভরথ সত্রুঘন বিদায় করিল শ্রীহরি।
আনন্দে আইলা রাম সিতা অন্ত[ঃ]পুরি॥
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥ * ॥
ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত॥

০ এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দকুমারি ঠাকুরানি তস্ত পিতা শ্রীযুৎ গোপালচন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল............লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বষু সাং অম্বিকা নেরপাড়া।

১৩৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা—১—১৩৩, ১৩৫, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

আর্দ্দি কবি বন্দিব বাল্মীকের চরন।
সোলক ছন্দে সাত কাণ্ড রচিলা রামায়ন॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহস্র বৎসর।
তার পূর্ব্ব পুথি রচিলেন মুনিবর॥
রাম না জন্মিতে কৈল রাম অবতার।
হেন মুনিপায়ে মোর কোটী নমস্কার॥
রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল।
চল্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল॥
সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলেন পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
তার কণ্টে মুর্ত্তিমান দেখি স্বরেস্বতি॥
জেমন গঙ্গা বয়্যা জায় স্রোত খরসান।
তেমতি রচিলা কবি ভাঙ্গিয়া পুরান॥
কিত্তিবাস রচিলা করি অমৃতের ভাণ্ড।
পুতক্ষে প্রতক্ষে রচিলেন সাত কাণ্ড॥
রাদ্দ কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্যা দেবির বিভা।
অজধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরথে রাঘ্য দিয়া॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা।
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা॥
সভা সহিত কান্দেন রাম করে হাহাকার।
সার্থক সুমিত্রার গর্ব্বে জনম তোমার॥
বাহু পসারিয়া রাম লক্ষনে নিল কোলে।
কত সুরধনি বহে রামের নয়নের জলে॥
সক্তিসেল নাগপাস বানের ঘাথাতে।
কত না পাইলে দুখ গিয়া মোর সাথে॥
রাঘ্য ভুম ছাড়িয়া ছাড়িয়া নিজ নারি।
নানা দুখ পাইল্যা ভাই হয়্যা বনচারি॥
দারুন সেলের চিন্ন তোমা আয়্যার বুকে।
অপজস রামার ঘুসিব সর্ব্ব লোকে॥
সোকে দুখে ভাই তোমার অস্তি চর্ম্ম সার।
তোমা হইতে হইল মোর জানকির উর্দ্ধার॥
ভাল মন্দ আমি কিছু বিচার না করিলাম।
তোমারে না দিয়া রাঘ্য আমি লইলাম॥

গৌহাটী-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম্ এ

অধিবেশন-সংখ্যা—৭। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

১। বৌদ্ধশাসনে রমণী, লেখক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

২। ভুল (ব্যঙ্গাত্মক), লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

৩। মিরি জাতি (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে

৪। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ (জ্যোতিষ-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রত্ন-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

৬। বলডার কাহিনী (পুরাণ কথা), লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

৭। আঙ্গামী নাগা (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস্

৮। কৈলাস পর্ব্বত (ভৌগোলিক-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

৯। মেমি নাগা (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস্

১০। হাস্যরস—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ

১১। বড় গীত (গীত-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে

১২। সূর্য্যোদয় (জ্যোতিষিক), লেখক—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১৩। তিব্বতে মৃতের সৎকার, লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

১৪। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

রঙ্গপুর-শাখা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন—২, বিশিষ্ট—৫, অধ্যাপক—৮, সহায়ক—১৪, সাধারণ—১৪৩, ছাত্র—৩০।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। ভারত-সাহিত্য-সমস্যা (১ম ও ২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

২। সমাজপতির সাহিত্য-সেবা— „ কালীপদ বাগছী

৩। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান (আলোচনা)— „ সুদর্শনচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

৪। গায়ের জোর বনাম মনের জোর— „ গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য

৫। গায়ত্রী নামক উপহৃত পুস্তকের সমালোচনা।

এতদ্ভিন্ন অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শিত হয় এবং ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়।

পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের সুবিধার্থে পরিষৎ একটি মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের আয়—২১৯।৯, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—১৫১৩।৶৬, ব্যয় ২১৫৶৬, উদ্বৃত্ত—১৫১৭।৶৯।

ভাগলপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন এম্ এ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায়

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। নিম্নে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

১। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

২। প্রাচীন ভারতে বহুপতিত্ব—শ্রীযুক্ত নীলমণি আচার্য্য এম্ এ, বি এল

৩। মধুস্মৃতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ বি এল্। মাইকেল মধুসূদনের শতবার্ষিক স্মৃতি-সভায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়।

৪। মাইকেল মধুসূদন (হিন্দী)—শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বর্ম্মা

পুস্তক-সংখ্যা—২৮৮।

গৃহনির্ম্মাণের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে।

বারাণসী-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা—২৩৫, অধিবেশন—মাসিক ৫, বিশেষ ২, মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ,—

১। পঞ্জিকা-বিভ্রাট—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

২। যাস্ক—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

৩। দর্শন-শাস্ত্রে বাঙ্গালীর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য (১ম প্রস্তাব),—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী

৪। ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

৫। নৈষধ-চরিত্র ও শ্রীহর্ষ—শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১ম বিশেষ অধিবেশনে—৺জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, ৺রাজা পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

এম্ এ, বি এল, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়গণের জন্ম শোক-প্রকাশ করা হয়।

২য় বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য "কালিদাসের রচনা বৈদর্ভী, না গৌড়ী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পুস্তক-সংখ্যা—২৩৪৫

শাখার সম্পাদক নিজ ব্যয়ে পরিষদের নামে ত্রৈমাসিক "বঙ্গসাহিত্য" প্রকাশ করিয়াছেন।

বরোদার মহারাজা শাখা-পরিষৎকে এককালীন ১০০৲ দান করিয়াছেন।

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—২৩৭৸১২৷৹, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৬৭৫৲, ব্যয় ৪৪৫।১০, উদ্বৃত্ত—৪৬৭।২৷৹।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ-সদস্য—১২৮, অভিভাবক—১০, অধ্যাপক—৩

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩৬, মাসিক ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৩, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৯, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১২, মন্দির-নির্ম্মাণ-সমিতি ১, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৭, মোট ৭৫।

পঠিত প্রবন্ধ—

১। শক্তিপূজা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল
প্রাণ—　　　„
মৃত্যুর পর　　　„
বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।
জ্যোতিশ্চন্দ্রের জীবনী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন
৬　সত্তবাণী—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ
মাছুরের চাষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি এল
বিজয়ার আলিঙ্গন—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল

পুস্তক-সংখ্যা—১০৩২, প্রাচীন পুথির সংখ্যা—১৪৭, সংগৃহীত মূর্ত্তি ও প্রস্তর-ফলকের নাম—বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি, একটি ভগ্ন মূর্ত্তি ও মুসলমান আমলের শিলালিপি।

শোক-সংবাদ—সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, বি এল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা মহাশয়গণের মৃত্যুতে শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির—মন্দির-নির্ম্মাণ তহবিলে ১১৭৩।২৷৷ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, এবং আরও ৫৮৮৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

মাধবী—শাখা-পরিষৎ 'মাধবী' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল।

শাখা-বিস্তার—চন্দ্রকোণায় এই শাখার প্রশাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

বার্ষিক অধিবেশন—সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করেন।

আয়-ব্যয়—আয় ৩৭৮৵৫, ব্যয় ৩১০।৶, উদ্বৃত্ত ৬৮।৶৫।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল

সদস্য-সংখ্যা—৪০, অধিবেশন-সংখ্যা—১০, এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়,—

১। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশ্চাত্য দেশে আদর লাভের সম্ভাবনা—শ্রীযুক্ত দিলীপ-কুমার রায়

২। তিব্বত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

(অধিবেশনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়)

কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ

৪ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বহির্বাণিজ্য—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ

৫ ভারতের বহির্বাণিজ্য ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রীযুক্ত রায় ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী বাহাদুর

৬ বর্ত্তমান গল্প-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী

৭ কাব্য-রস—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি

৮ রামায়ণ-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ

৯ শ্রীমতী অনুরূপা দেবী-রচিত "মন্ত্র-শক্তি" সমালোচনা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ

১০। পল্লীর মেয়ে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ

একটি অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের বিদায় উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল "বিদায়-সম্ভাষণ" পাঠ করেন। একটি অধিবেশনে ৺অশ্বিনী-কুমার দত্ত এবং ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের জন্য শোক-প্রকাশ করা হয় এবং আর একটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ মহাশয়ের 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্মানিত করা হয়।

রামগোপাল টাউনহলে ও পাবলিক্ লাইব্রেরী-গৃহে শাখার অধিবেশনাদি হয়।

চট্টগ্রাম-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায়

অধিবেশন-সংখ্যা—১৭, প্রবন্ধ-সংখ্যা—২১, সদস্য-সংখ্যা—১২১ এবং পুস্তক-সংখ্যা ৬৩৭।

দিল্লী-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবেশন-সংখ্যা—২, সদস্য-সংখ্যা—২০, আয় ৬০৲, ব্যয় ৫৫।৶১০

শাখার কার্য্যালয় ও পাঠাগার—ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়ের গৃহ।

উত্তরপাড়া (হুগলী)-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

অধিবেশন-সংখ্যা—২, নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

১। সমবায়ের সার্থকতা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

২। সমবায়-সমিতি—শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-সংখ্যা—১৫৫১।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—৩।৶০, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৩০৷৷০, ব্যয় ৩০২৲, উদ্বৃত্ত ৯৶০

শাখার প্রকাশিত "উত্তরপাড়া-বিবরণ" ৪৬ খণ্ড মূল-পরিষদের দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা-শাখা

সভাপতি—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেব-বর্ম্মণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস বি এল

সভ্য-সংখ্যা—১২০, অধিবেশন-সংখ্যা—৭, প্রাচীন পুথির সংখ্যা ১০০। এই শাখা হইতেই "ময়নামতীর গান" সংগৃহীত হয় ও তাহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা নগরে কোন ভদ্রলোকের গৃহে অষ্টকোণ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক পৃষ্ঠে "শ্রীগোপীনাথ সিংহ নৃপস্য" ও অন্য পৃষ্ঠে "শকাব্দা ১৫০৮" খোদিত আছে।

স্থানীয় তত্ত্বজ্ঞান-সমিতি-গৃহে শাখার কার্য্যালয় রহিয়াছে এবং টাউন-হলে সভাদির অধিবেশন হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের চাঁদাদাতৃগণ

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲
শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	৫৲
" " নরেন্দ্রনাথ লাহা	৪৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৲
" প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	২৲
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	২৲
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
" ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
" হেমচন্দ্র সরকার	১৲
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৲
" রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	১৲
" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
" নিবারণচন্দ্র রায়	১৲
" যোগীন্দ্রনাথ বসু	১৲
" নরেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
" জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
" রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	॥০
	৪০॥০

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬৭৪৯/০
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭২৪৻৬
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭৭৬/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩৯৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮১৫।৵৫
৭।	এককালীন দান	২৪০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১৫৩॥৶৬
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৩৬।/০
১০।	বিবিধ আয়	১৫।০
১১।	হাওলাত আদায়	৪৬৩৷৷৯
১২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৭২৸০
১৩।	হাওলাত জমা	৬২৩৲
১৪।	আমানত জমা	২৫৪॥০
১৫।	স্থায়ী তহবিল	১০০৲
১৬।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	২০০৲
		১৩৫৯৭॥৵২

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	১৯১২৸৶৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১১৫৪।/৩
৩।	পুস্তকালয়	১৮৭০।৩
৪।	পুথিশালা	৬৫৯৸৶০
৫।	চিত্রশালা	১৫৬৶৬
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	১৯৯৸/৬
৭।	ডাকমাশুল	১০৮২৸৶৬
৮।	বাড়ী মেরামত	৬৫০৲
৯।	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২৭০॥৶৩
১০।	ইলেক্‌ট্রিক তার বদল ও মেরামতের বিল	১৩০৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	৭৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৮৮৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	১০॥৵০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৮৪॥৶০
১৫।	নূতন আসবাব	১৯॥/০
১৬।	গাড়ীভাড়া	৯৪৸৶৩
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৩৪১॥৶৯
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১১৫॥৵৩
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫৸০
২০।	পদক ও পুরস্কার	৭০৲
২১।	বেতন	৩৩৮১।৵৩
২২।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৫৭৶৩
২৩।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৩১৩॥৯
২৪।	বিবিধ ব্যয়	১১৩/৯
২৫।	হাওলাত দাদন	৪০৯৻৬
২৬।	আমানত শোধ	৩৬৪॥০
২৭।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১০৫॥৵৫
		১৪০৮৯৸৵১১

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৫৬৩৫॥১১

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ

তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর

হইতে জমা) ১২৬৭৪॥৵২

৩৮৩০৮৶১

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের

ব্যয় (বাদ ডাকঘরের গচ্ছিত

জন্ম খরচ) ১৩৯৮৩৫৬

উদ্বৃত্ত ২৪৩২৪।৵৭

উদ্বত্ত টাকার জায়

১। সাধারণ তহবিল ১৩১৩৮/১০

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট

মজুত ১০৬৭৵০

কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক

মহাশয়ের নিকট মজুত ১৫৮।৯

কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট

মজুত ২।৶৩

ডাকঘরে মজুত— ৮৫।৶১০

১৩১৩৮/১০

২। বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২৩০১০॥৯

কোম্পানীর কাগজ

মজুত ১৪৮০০৲

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

টারমিনেবল্ ওয়ার লোন্ ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড ১৫০০৲

ডাকঘরে মজুত ৭১০॥৯

২৩০১০॥৯

২৪৩২৪।৵৭

শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির স্থগিত দ্বাদশ

অধিবেশনের সভাপতি।

১৯।৩।৩১

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক

আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীরামকমল সিংহ

প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক।

২০।২।৩১

১৩৩০ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন——————————৪৭৩৷৷৯
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন——————————৪০৯৻৬

৮৮২৷৷/৩

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—————৪৬৩৷৷৯

৪১৯৻৬

জায়-

১। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—————৬০৲

২। বিরাজুদ্দিন দপ্তরী——————————১০০৲

৩। রমেশ-ভবন কমিটি——————————২৫৯৻৬

৪১৯৻৬

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২০।২।৩১

১৩৩০ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা——————————৩৩৮৷৷০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা——————————২৫৪৷৷০

৫৯৩৲

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ——————৩৬৪৷৷০

২২৮৷৷০

আয়—

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়———৬৲

২। বিদ্যাপতির পদাবলী বিক্রয় জন্য

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র

মহাশয়ের নামে জমা————৭॥০

৩। পাঁচু জমাদার (জামীন স্বরূপ)———৫০৲

৪। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী————৪॥০

(পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যয় জন্য)

৫। পুস্তকালয়ে গচ্ছিত জন্য————১৫৯৲

৬। চাঁদা বাবদ————————১॥০

২২৮॥০

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২০।২।৩১

দ্বাত্রিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, টাইটেল, বিজ্ঞাপন ও কার্য্যবিবরণ আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিংএ, প্রাচীন পুথির বিবরণ বেঙ্গল প্রিণ্টার্স দ্বারা, এবং মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সূরিরত্ন এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সি আই ই,

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন) এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্-সি, এটর্ণি

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি,

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ   রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত

১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ।

হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের "সতসঙ্গ"

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

আমাদিগের সৌভাগ্য যে, পণ্ডিত পদ্মসিংহ মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের পারদর্শী ব্যক্তি বিহারীলালের সমালোচক ও ভাষ্যকার হইয়া হিন্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পণ্ডিতজী রীতিমত ইংরেজীনবিশ না হইলেও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতাই তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগেরও সম-কক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। তাই স্যর গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় বিহারীলালের বিশেষজ্ঞকেও পণ্ডিতজীর তুলনাত্মক সমালোচনা পড়িয়া বলিতে হইয়াছে,—"Full of instructive information. I am much interested in your comparison of the Sat-Sai with Hāla's Sapta-Satika and other works. It throws quite a new light on Bihari"

পণ্ডিতজীর ভূমিকা-ভাগটী ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার আকারের ২৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে 'বক্তব্য' ১৬ পৃষ্ঠা, 'সতসঙ্গকা উত্তব', 'সতসঙ্গকে আদর্শ গ্রন্থ', 'অর্থাপহরণ-বিচার', 'সতসঙ্গকে দোহে' ও 'বিবেচনা-বিনোদ' বিষয়ক আলোচনাপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচনা ১৬ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে গাথা-সপ্তশতী, আর্য্যা-সপ্তশতী, অমরু-শতক, অন্যান্য সংস্কৃত কবি ও উর্দু কবিদিগের কাব্যের সহিত তুলনামূলক 'সতসঙ্গকা সৌষ্ঠব' ৫৭ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে হিন্দী কবি কেশব, সুন্দর, সেনাপতি, তোষনিধি, পদ্মাকর, ঘাসীরাম, কালিদাস ও রসখানের কবিতার সহিত বিহারীর সতসঙ্গ কাব্যের তুলনা, 'অন্যান্য হিন্দী 'সতসঙ্গ' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, 'শৃঙ্গার-সতসঙ্গ', 'বিক্রম-সতসঙ্গ' ও 'রতন-হজারা' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, বিহারীর বিরহ-বর্ণন, অন্যান্য হিন্দী কবিদিগের বিরহ-বর্ণনের সহিত তুলনা, বিহারীলালের কবিত্ব ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য, বিহারীলালের দোষপরিহার ও উপসংহার—এই বিষয়গুলির আলোচনা ১৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। মূলতঃ ইহা বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনা হইলেও ইহা পাঠ করিলে সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ ও কাব্য-রসাস্বাদন করা যায়; সুতরাং যাঁহারা ঐ সকল কাব্যের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পণ্ডিতজীর এই গ্রন্থের ন্যায় উপযোগী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই—ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনায় পণ্ডিতজী যেরূপ অনন্যসাধারণ রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কচিৎ কোনও স্থলে নিরপেক্ষতার শ্লাঘ্য সীমা অতিক্রম করিতে দেখা গেলেও তাঁহার তুলনাত্মক সমালোচনা ও 'সঞ্জীবন ভাষ্য' না পড়িলে 'বিহারী-সতসঙ্গ' কাব্যের সৌন্দর্য্য বেশীর ভাগই সুধী পাঠকেরও অনাস্বাদিত থাকিয়া যাইবে—ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সত্বেও পণ্ডিতজী বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তিনি বহু স্থলেই সত্যের অনুরোধে প্রাচীন টীকা-কারদিগের বহু ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধার জন্যই লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন্ টীকাকারোঁ। নে ইস্ সমুদ্রকো অচ্ছী তরহ্ যথাশক্তি যথাসম্ভব মথ্ ডালা হৈ, নয়ে টীকাকারোঁকে লিয়ে অপ্‌নী সমঝ্ মেঁ কুছ্ ছোড় নহীঁ গয়ে হৈ, প্রাচীন্ টীকাওঁকো দেখ্‌তে হুএ তো যহী মালুম্ হোতা হৈ কি ইস্ খান্‌কে সব রত্ন নিকালে জা চুকে হৈ, অব কুছ্ হাথ্ পল্লে ন পড়েগা, পর্ সরস্বতীকা ভণ্ডার কুছ্ ঐসা অলৌকিক্ ঔর্ অক্ষয় হৈ কি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতকে কথনানুসার্ উস্‌মেঁ কভী কমী নহীঁ হৈ—

> "পশ্যেয়মেকস্য কবেঃ কৃতিং চেৎ
> সারস্বতং কোশমবৈমি রিক্তম্।
> অন্তঃ প্রবিশ্যায়মবেক্ষিতশ্চেৎ
> কোণে প্রবিষ্টা কবি-কোটিরেষা॥"

যহ্ সব কুছ্ সহী সহী, পর্ পহলে বহাঁতক্ পহুঁচ্ হো তব ন?"

পুনশ্চ—'ইস্ ভাষ্যাভাস্‌কী কুৎসিত কন্থা মেঁ কোই চমকৃতা হুআ কীমতী টুক্‌ড়া কহী দিখাই দে তো বহ্ ইন্‌হোঁ কী খান্ যা দূকান্‌কা হৈ। ভ্রান্তি-যুকা ঔর্ অনৌচিত্য-মৎকুণ্‌কা দোষ-দংশ বিদগ্ধতাকে সুকুমার্ শরীর্ মেঁ কহীঁ চুভ্‌তা হুআ প্রতীত্ হো তো উস্‌কে উৎপাদন্‌কা অপরাধোঁ। লেখক্‌কা অজ্ঞান্-প্রস্বেদ হৈ।'

যে তুলনাত্মক সমালোচনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি বিখ্যাত, সেই সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন,—"তুলনাত্মক সমালোচনা" কে তৌর্ পর্ জো কুছ্ লিখা গয়া হৈ উস্‌কী যথার্থতা মেঁ সন্দেহকা পূরা অবকাশ্ হৈ ক্যোঁকি যহ্ মার্গ লেখক্‌কো স্বয়ং ঢূংঢ্ ভালকর্ নির্ম্মাণ্ করনা পড়া হৈ, ইস্ পর্ কিসী "চন্দ্রিকা" যা "প্রকাশ" নে প্রকাশ্ ডালা, ইস্ মেঁ কিসী প্রাচীন যা নবীন্ টীকা সে রত্তী ভর্ যা ইক্ বরাবর্ সহায়তা উসে নহীঁ মিলী। ইস্‌কী ভূলোঁকা উত্তরদায়িত্ব কেবল্ উসী পর্ হৈ। আজ্‌কল্‌কা সুশিক্ষিত্ সমাজ্ প্রাচীন্ টীকাওঁসে কুছ্ ইস্ লিয়ে ভী সন্তুষ্ট নহীঁ হৈ কি উন্ মেঁ তুলনাত্মক সমালোচনা সে কহীঁ ভী কাম্ নহীঁ লিয়া গয়া, বর্ত্তমান্ শিক্ষিত সমাজ্‌কী সন্তুষ্টি কেবল্ শব্দার্থ-ব্যাখ্যা, অলঙ্কার্-নির্দ্দেশ্ ঔর্ শঙ্কা-সমাধান্ সে নহীঁ হোতী, উন্‌কী ইস্ রুচিকা বিচার্ করকে হী ইস্ নবীন্ ঔর্ দুর্গম্ মার্গ মেঁ চল্‌নেকা দুঃসাহস্ কিয়া গয়া হৈ।"

এই সুবিবেচনা ও সত্যপ্রিয়তার জন্যই তিনি তাঁহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের রচনা-পদ্ধতির পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রাচীন্ টীকাওঁসে সত্‌সঈ সঞ্জীবন্‌কী রচনা মেঁ জো অমূল্য সাহায্য মিলা হৈ, বহ্ নামো-ল্লেখপূর্ব্বক্ প্রায়ঃ উন্‌হোঁকে শব্দোঁ। মেঁ, কহী অপ্‌নী ভাষামেঁ লিখ্ দিয়া হৈ। অল-ঙ্কারাদি নির্দ্দেশ্ মেঁ ইন্‌হোঁকে ভাবোঁকো অভিব্যক্ত করনেকে অভিপ্রায়্ সে, কুবলয়ানন্দ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশাদি সংস্কৃত গ্রন্থোঁসে তথা "ভাষা-ভূষণ" আদিসে অবতরণ্ দেকর্

লক্ষণ্ সমন্বয়্ কর্ দিয়া হৈ। 'গাথা-সপ্তশতী', 'আর্য্যাসপ্তশতী' আদি ইস্ বিষয়্‌কে আকর্ গ্রন্থোঁসে দোহোঁকে উপজীব্য পদ্য উদ্ধৃত কর্‌কে যথামতি তুলনাত্মক্ সমালোচনা লিখ দী হৈ। সমানার্থক্ সূক্তিয়াঁ দে দী হৈ।"

বিহারীলালের এক একটী দোহা যে কত গভীর অর্থ-পূর্ণ, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা এখানে পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত মঙ্গলাচরণ-দোহাটীর ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ স্যাম হরিত-দ্যুতি হোয়॥

অর্থ—(সোয়্) বহ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ পরদুঃখ-কাতরা ভক্তবৎসলা (রাধা নাগরি)—নাগরী—ভক্তোঁকে ভয়্ হর্‌নে মেঁ পরম্ প্রবীণ শ্রীরাধিকা জী, (মেরী ভববাধা হরৌ)—মেরে জন্মমরণ্ কী পীড়া ঔর্ সাংসারিক্ দুঃখোঁকা দূর করেঁ। বহ রাধা জী কৈসী হৈঁ—(জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ)—জিস্‌কী কায়াকী কান্তি পড়্‌নেসে (স্যাম্ হরিতদ্যুতি হোয়) শ্রীকৃষ্ণ জী হরে—পরমানন্দিত্ হো জাতে হৈঁ।

"হরা হোনা" মুহাবরে মেঁ প্রসন্ন য়া খুশ্ হোনেকো কহতে হৈ। জৈসে কিসী অত্যন্ত স্নেহ-শীল্ মিত্রকে বিষয়মেঁ কহতে হৈ কি বহ হমেঁ দেখ্ কর্ হরে হো জাতে হৈ।

২—অথবা—জিন্ রাধিকাজীকে পীতবর্ণকী কান্তি পড়্‌নেসে শ্রীকৃষ্ণজীকা শ্যাম্ রঙ্গ্ হরা—(হরে রঙ্গ্‌কা)—হো জাতা হৈ। পীলা ঔর্ নীলা রঙ্গ্ মিল্‌নেসে হরা রঙ্গ্ বন্ জাতা হৈ—য়হ প্রসিদ্ধ হৈ।

হরিত্ রঙ্গ্‌কী ঝাঁই (কান্তি—ছায়া) মেঁ সন্তাপ্-হরণ্‌কা সামর্থ্য সর্ব্বাধিক্ হৈ, ফির্ জিস্ ছায়া সে শ্যাম্ (তমোগুণ) ভী হরিত—দূসরোঁ কে শান্তি দেনেবালা বন্ জাতা হৈ উস্‌কা স্বয়ং ভববাধা হর্‌নেমেঁ অনুপম্ সামর্থ্যশালী হোনা উচিত হী হৈ!

হরিতদ্যুতি ন চম্পকবর্ণা রাধাকী হৈ ঔর্ ন ঘনশ্যাম্‌কী। কিন্তু ইন্ দোনোঁকে—রাধা শ্যাম্‌কে—মেল্‌সে শান্তিপ্রদ হরিতবর্ণকী উৎপত্তি হৈ, ইস্ অর্থ সে কবিকা ভাব য়হ ধ্বনিত হোতা হৈ কি শক্তি-শূন্য ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মবিরহিত শক্তিকী উপাসনা মেঁ শান্তি নহীঁ হৈ। জো ভক্তজন্ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম অথবা সগুণ ব্রহ্মকে উপাসক্ হৈ, বহ ভববাধা সে ছুট্ কর্ শান্তি পাতে হৈ।

৩—অথবা 'হরা হোনা' ঔর্ 'সরস' কহনা, একহী বাত হৈ। জিস্ পদার্থ মেঁ 'রস' হোতা হৈ বহী 'হরা' কহলাতা হৈ। জৈসে 'হরী টহনী' :—

'জামেঁ রস সোই হর্য্যো য়হ জানত সব কোয়্।
গৌর শ্যাম দ্বৈ রঙ্গ্ বিন্ হর্য্যো বনত নহিঁ কোয়্॥"
(নাগরীদাস জী)

ইস্‌সে য়হ ভাব প্রকট হোতা হৈ কি রাধাজীকী ছায়াসে—কৃপাসে—শ্রীকৃষ্ণ 'সরস' হোতে হৈ—'রসিক্ বিহারী'—কহলাতে হৈ।

৪—"জা তনকী ঝাঁঈ—(জিস্ রাধাকে অঙ্গকী কান্তি) শ্যাম্ পরেঁ—(কৃষ্ণকা প্রতিবিম্ব পড়্নে সে) হরিত-দ্যুতি হোই—(হরী) হোতী হৈ।"—য়হ উল্টা—(আধারাধেয়ভাব-বৈপরীত্যাত্মক্) অর্থ—'বিহারীবিহার' কে কর্ত্তা শ্রীব্যাস জীকা হৈ!

"মেরী ভববাধা" শব্দমেঁ উপাসকবোধক "মেরী" পদ্সে—"জগন্নাথস্তায়ং সুরধুনি! সমুদ্ধারসময়ঃ" কে সমান্ অপ্নী অধমাতিশয়তা-দ্যোতন্ দ্বারা ইষ্টদেবকী নিরতিশয় মহিমাকী ধ্বনি নিকল্তী হৈ। অর্থাৎ মুঝ্ জৈসে আদর্শ অধম্কী নিরবধিক্ ভববাধা দূর্ কর্নেমেঁ বহী শ্রীরাধারাণী জী সমর্থ হৈ জিন্কী আরাধনাকে অভিলাষী ইন্দ্রাদিকে উপাস্য দেব ত্রিলোকীনাথ্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ভী রহতে হৈ। জিত্না ভারী পাপী হো উসে পার্ উতার্নেবালা ভী উত্না হী অধিক্ সমর্থ হোনা চাহিয়ে। তথা উপাস্য দেবতা শ্রীরাধা জীকে সাথ্ প্রযুক্ত "নাগরী"—

("নাগরং মুস্তকে শুণ্ঠ্যাং 'বিদগ্ধে' নগরোদ্ভবে।" ইতি মেদিনী।) বিশেষণ্ ভী পাপাপনোদন্পটুতাকা দ্যোতক্ হৈ। জিত্না কষ্টসাধ্য রোগী হো উস্কে লিয়ে উত্না হী দিব্যৌষধ-সম্পন্ন পীযূষপাণি বৈদ্য অপেক্ষিত্ হৈ।

কাব্যপ্রকাশ্কে ধ্বনিপ্রকরণোদাহৃত—

"ত্বামস্মি বচ্মি বিদুষাং সমবায়োঽত্র তিষ্ঠতি।
আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ॥"

পদ্যকে 'ত্বাং' 'অস্মি' 'বিদুষাং' আদি পদোঁকে সমান্ 'মেরী' পদ্মেঁ লক্ষণামূলক্ অবিবক্ষিতবাচ্য অর্থান্তরসংক্রমিত-রূপ্ ধ্বনি হৈ।

কোঈ—"মেরী" পদ্কা অর্থ "মমতা" (পুত্র, মিত্র, কলত্রাদিমেঁ মমত্ব বুদ্ধি) কর্তে হৈ অর্থাৎ "মেরী" মমতারূপ ভববাধাকো হরো। ক্যোঁকি সংসার্মেঁ "মমতা" হী অনর্থোঁকা মূল্ হৈ।"

অতঃপর পণ্ডিতজী 'কুবলয়ানন্দ', 'ভাষা-ভূষণ, প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া এই দোহার 'কাব্য-লিঙ্গ', 'পরিকর', 'হেতু', 'উল্লাস' ও 'শ্লেষাভাস' অলঙ্কারগুলির বিশ্লেষণে দুই পৃষ্ঠার অধিক স্থান পূর্ণ করিয়াছেন; এই অলঙ্কারের বিচার বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ পাঠকের সহজ-বোধ্য কিংবা প্রীতিকর হইবে না বিবেচনায় আমরা পরিত্যাগ করিলাম। পণ্ডিতজী ইহার পরে উক্ত দোহার আরও দুই রকম ভক্তি-রসাত্মক ও তিন রকম আদি-রসাত্মক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"৫—অথবা—জিন্কে তন্কী ঝাঁঈ (জ্যোতিঃ) পড়্নেসে—ধ্যান্মেঁ আনেসে—শ্যামত্ব—"অন্ধকার্বিশিষ্ট তমোগুণ্, য়া হৃদয়ান্ধকার্"—হরিত—দূর—হোকর্ 'দ্যুতি'—প্রকাশ্বিশিষ্ট সত্ত্বগুণ্ চমক্ উঠ্তা হৈ। বহ রাধা মেরী ভববাধা হরো। ইস্ অর্থমেঁ ভী "কাব্যলিঙ্গ" হী অলঙ্কার্ হৈ।

(নোট্ :—য়হাঁ য়হ আশঙ্কা হোতী হৈ কি অপ্নী ঝাঁঈসে শ্রীকৃষ্ণকো হরা কর্না তো ভববাধা হরণকা পোষক্ নহীঁ হৈ, ফির্ অসম্বদ্ধ বিশেষণ্ ক্যোঁ? উত্তর্ য়হ হৈ কি জিস্কী ঝাঁঈ

পড়্নে সে—ধ্যানগোচর্ হোনেসে—শ্যাম্ হরিত্—পাপ্কা হরণ্—হোতা হৈ ঔর্ দ্যুতি হোই—দিব্য দেহ হোতা হৈ"—ব্যাসজী)

৬—অথবা—কহীঁ "রাধানাগর"—ঐসা পাঠ ভী হৈ। ইস্ দশামেঁ শ্রীকৃষ্ণপরক অর্থ—অর্থাৎ য়হ "রাধানাগর" শ্রীকৃষ্ণজী, জিন্‌কী মূর্ত্তিকী ঝলক্ পড়্নে সে—ভক্তজনোঁকে ধ্যান্‌মেঁ শ্যাম্ (কৃষ্ণ) কে আতে হী য়হ (ভক্ত) অপ্‌না রূপ্ তজ্‌কর্ হরি-রূপ্‌কো প্রাপ্ত হো "সারূপ্য মুক্তি" পা জাতে হৈ। ইস্ অর্থমেঁ "তদ্‌গুণালঙ্কার" হৈ।

* * * *

(মঙ্গলাচরণ্‌কা শৃঙ্গার-পরক অর্থ)

বহুত্‌সে সহৃদয় রসিকশিরোমণি ইস্ প্রকার্ রূখে ফীকে ভক্তিভাবনাভরিত্ শ্রোত্রিয়-সমাদৃত্ বিরক্তজিজ্ঞাসুজনোচিত্ মঙ্গলাচরণ্‌কো শুন্ কর্ নাক্ ভোঁ চঢ়াতে হৈ ঔর্ কহতে হৈ কি য়হ "গঙ্গাকী গৈল্‌মেঁ মদারকে গীত" কৈসে! বিহারীসে শৃঙ্গারী কবিকী শৃঙ্গারময়ী রচনা মেঁ, জো পরমবিহারী গোপিকাচীরহারী রাধিকাহৃদয়চারী শ্রীমুরারি ঔর্ বৃষভানুদুলারী শ্রীরাধাপ্যারীকী রহঃকেলিয়োঁকে রহস্যোদ্‌ঘাটনার্থ রচী গয়ী হৈ, ঐসা মঙ্গলাচরণ্ নিতান্ত "অমঙ্গলাচরণ্" হৈ। ঔর্ য়হ 'অমরুশতক' কী শান্ত-রস-পরক্ টীকাকো লক্ষ্য কর্‌কে কহে হুএ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদজীকে শব্দোঁ মেঁ—

"রহসি রতিসময়ে প্রৌঢ়বধূনাং বেদপাঠ ইব সহৃদয়শিরঃশূলমুৎপাদয়তি।"

ঐসে মহানুভবোঁকে সন্তোষার্থ শ্রীহরি কবিনে ইস্ মঙ্গলাচরণ্ কো শৃঙ্গারপক্ষ মেঁ ভী পরিণমিত কিয়া হৈ, সো ভী সুনিয়ে :—

১—অথবা—নায়িকা (শ্রীরাধা) কো মানিনী দেখ্‌কর্ নায়ক (শ্রীকৃষ্ণ) প্রার্থনা (মিন্নত্, .খুশামদ্) কর্‌তে হৈ কি "হে রাধা নাগরি! মেরী ভৌ-(ভয়) বাধা হরৌ, অর্থাৎ তুম্‌হার মান্ (কোপ্—নারা.জগী) দেখ্ কর্ মুঝে ভৌ (ভয়)—হৈ উস্‌সে উৎপন্ন বাধা (দুঃখ) কো হরো। অভিপ্রায়্ য়হ হৈ কি মান্ ছোড়্ প্রসন্ন হো জাও। (অগ্‌লী বাত্ .জরা গোপ্য হৈ, "সভ্য সমাজ" ক্ষমা করে, "অনুবাদী ন দুষ্যতি"—নায়ক মহাত্মা মান্ ছোড়্‌নেকা ঢঙ্ বতাতে হৈ ঔর কামকী বাত্ পর্ আতে হৈ—"ক্যা কর্‌কে, "সোয়"—য়া কো অর্থ হমারে পাশ্ শয়ন্ করিকৈ।" তুম্‌হারে তন্‌কী কান্তি পড়্নে সে হমারা (শ্রীকৃষ্ণকা) জো য়হ শ্যাম শরীর হৈ সো "সানন্দ হোত হৈ॥" ক্যোঁ ন হো? হুআ হী চাহে।

২—অথবা—তুম্‌হারে তনকী ঝাঁঈ (কান্তি) জব্ মিলাপ্‌কে (সমাগম্‌কে) সময়্ হমারে শরীর্ মেঁ পড়্‌তী হৈ তব্ শ্যাম্— শ্যামবর্ণ শৃঙ্গাররস্ য়া (রতিপতি) কাম্—"সো পল্লবিত হোত হৈ।"

কামদেব ঔর্ শৃঙ্গাররস্ দোনোঁকা বর্ণ 'শ্যাম্' হৈ। সো য়হাঁ "সাধ্যবসানা"-লক্ষণা কর্‌কে 'শ্যাম' পদ্ সে শ্যামবর্ণবিশিষ্ট 'কাম্' য়া 'শৃঙ্গার্' কা গ্রহণ কর্‌না চাহিয়ে। "সাধ্যবসানা" লক্ষণাকা লক্ষণ্ য়হ হৈ :—

"বিষয্যন্তঃ কৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা।" বিষয়িণা—আরোপ্যমাণেন, অন্তঃকৃতে—নিগীর্ণে, অন্যস্মিন্—আরোপবিষয়ে সতি, সাধ্যবসানা স্যাৎ—(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয়োল্লাস)।

অর্থাৎ জহাঁ বিষয়িমাত্র—(কেবল 'উপমান' পদ্—পশু আদি) কা নির্দেশ্ কিয়া জায়্, ঔর্ বিষয়্—(উপমেয়, দেবদত্তাদি) কা ন কিয়া জায়্, বহাঁ "সাধ্যবসানা" লক্ষণা হোতী হৈ। জৈসে—"দেবদত্ত পশু জাতা হৈ"—ঐসা ন কহ কর্ "য়হ পশু জাতা হৈ"—ইত্না হী কহা জায়্ তো "সাধ্যবসানা" লক্ষণা হোগী। ক্যোঁকি য়হাঁ বিষয়ী (আরোপ্যমাণ)—'পশু' পদ্সে অন্য (আরোপ-বিষয়)—'দেবদত্ত' নিগীর্ণ—(ছিপা হুআ) হৈ। ইসী প্রকার য়হাঁ প্রকৃত মেঁ 'আরোপ্যমাণ' শ্যামগুণসে 'আরোপ্য' (শ্যাম-বর্ণবিশিষ্ট) 'শৃঙ্গার' য়া 'কাম' লক্ষিত হোতা হৈ।

৩—অথবা—তুম্হে দেখে ঔর্ তুম্সে মিলে বিনা হমেঁ কুছ্ নহীঁ সুঝ্তা, চারোঁ ওর্ অন্ধকার্ হী অন্ধকার্ দীখ্তা হৈ, জব্ তুম্হারী প্রভা পড়্তী হৈ তব্ হী 'শ্যাম হরিত্'=অন্ধকারাবৃত দিশাওঁ মেঁ দ্যুতি—প্রকাশ্ হোতা হৈ। ('দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তাঃ)'।

জিস্ মে অত্যাসক্তি হোতী হৈ উস্কে বিনা সর্বত্র অন্ধকার্ হী প্রতীত্ হোতা হৈ। ভর্তৃহরিজী লিখ্তে হৈ :—

'সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ সৎসু তারারবীন্দুষু।
বিনা মে মৃগশাবাক্ষ্যা তমোভূতমিদং জগৎ॥'

অর্থ—প্রদীপ্, অগ্নি, তারাগণ্, চন্দ্র ঔর্ সূর্য্য—ইন্ সব্ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থোঁকে হোতে হুএ ভী মৃগনয়নী নায়িকাকে বিনা মেরে লিয়ে য়হ সারা সংসার্ অন্ধকারময়্ হো হৈ॥

• 'শৃঙ্গার' রসকী শ্যামবর্ণতামেঁ প্রমাণ :—"শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" (সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ শৃঙ্গার কা বর্ণ "শ্যাম" ঔর্ দেবতা 'বিষ্ণু' হৈ॥

'কাম্' কে শ্যাম্ হোনে মেঁ প্রমাণ্ স্বরূপ হিন্দী কবি 'কালিদাস্' কী য়হ সুন্দর্ সূক্তি সহৃদয়্ পাঠকোঁ কে মনোরঞ্জনার্থ উদ্ধৃত হৈ। কাব্য-মর্ম্মজ্ঞ দেখেঁ কি শৃঙ্গার পক্ষকে দ্বিতীয় অর্থ (তুম্হারে তন্কী ঝাঁঈ জব্ মিলাপ্কে সময়্ হমারে শরীর্ মেঁ পড়্তী হৈ) কা ক্যা হী সাফ শব্দচিত্র ইস্ পদ্যমেঁ খিঁচা হৈ। ইস্সে অচ্ছা কালে গোরেকা মেল্ কহীঁ ন দেখ হোগা!—

"কুন্দনকী ছরী আবনূসকী ছরী সোঁ মিলী
সোনজুহী-মাল্ কৈধোঁ কুবলয়হার্ সোঁ,
কৈধোঁ চন্দ্র-চন্দ্রিকা কলঙ্ক সোঁ কলিত ভঈ,
কৈধোঁ রতি ললিত বলিত ভঈ মার সোঁ।
'কালিদাস' মেঘ মাঁহি দামিনী মিলী হৈ কৈধোঁ
অনল্কী জ্বাল্ মিলী কৈধোঁ ধূম-ধার সোঁ।

কেলি সমৈ কামিনী কন্হৈয়া সোঁ লপটি রহী
কৈধোঁ লপটানী হৈ জুন্হৈয়া অন্ধকার সোঁ ॥"

পণ্ডিতজীর ভাষ্য কিরূপ পাণ্ডিত্য ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা-পূর্ণ, সুধী পাঠক এই একটি দোহার ব্যাখ্যা হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন; সুতরাং আমরা এখানে আর ভাষ্য উদ্ধৃত করিব না; অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে যখন আমরা বিহারীলালের 'সতসঈ' হইতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও লোক-চরিত্রের পরিচায়ক নানা ভাবের বিচিত্র দোহাবলির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তখন বহুসংখ্যক দোহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন টীকা-কারদিগের মত-ভেদের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে পণ্ডিতজীর টীকা হইতে বহু স্থলই উদ্ধৃত করিতে হইবে। আমরা অদ্য পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে আলোচ্য 'সতসঈ' সম্বন্ধে তাঁহার সার-গর্ভ মত উদ্ধৃত করিয়া, 'সতসঈ' কাব্যখানি অনুবাদের অতীত হইলেও হিন্দীভাষায় অজ্ঞ পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য উহার কতকগুলি দোহা, অন্বয় ও বাঙ্গালা শব্দার্থ সহ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"সতসঈকা উদ্ভব

'সতসঈ' ঔর্ 'সতসৈয়া' শব্দ সংস্কৃতকে 'সপ্ত-শতী' ঔর্ 'সপ্তশতিকা' শব্দোঁকা রূপান্তর্ হৈ, জো "সাত্ সৌ পদ্যোঁকা সংগ্রহ" ইস্ অর্থ মেঁ কুছ্ যোগ-রূঢ় সে হো গয়ে হৈ।

বিহারী সে পূর্ব দো সপ্তশতী প্রসিদ্ধ থীঁ; এক্ প্রাকৃত মেঁ সাতবাহন্-সংগৃহীত "গাথা-সপ্তশতী" ঔর্ দূসরী সংস্কৃতমেঁ গোবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীত "আর্য্যা-সপ্তশতী"। যদ্যপি "শ্রীমার্কণ্ডেয়" পুরাণান্তর্গত "দুর্গা-সপ্তশতী" ভী এক সুপ্রসিদ্ধ সপ্তশতী হৈ, পর্ নাম-সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত অন্য বিষয়্ মেঁ সমালোচ্য সতসঈ সে উস্‌সে কুছ্ ভী সাম্য নহীঁ হৈ, ইস্‌লিয়ে ইস্ প্রসঙ্গ মেঁ উস্‌কী চর্চ্চা চলানা অনাবশ্যক্ হৈ। গাথাসপ্তশতী ঔর্ আর্য্যাসপ্তশতী য়ে দোনোঁ হী অপ্‌নে অপ্‌নে রূপ্‌মেঁ নিরালী ঔর্ অদ্বিতীয় হৈ। সদাসে সহৃদয়োঁকে হৃদয়্‌কা হার্ রহী হৈ। ইন্‌মেঁ "গাথাসপ্তশতী" নে বিবেচক বিদ্বানোঁসে অত্যধিক্ আদর্ পায়া হৈ। উস্‌কী আধীসে অধিক্ গাথাএঁ সাহিত্যকা আকর্ গ্রন্থোঁমেঁ উদ্ধৃত হৈ। ধ্বনিপ্রস্থাপনপরমাচার্য্য শ্রীআনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য নে অপ্‌নে "ধ্বন্যালোক" মেঁ, বাগ্দেবতাবতার্ শ্রীমম্মটাচার্য্য নে "কাব্য-প্রকাশ" মেঁ, ঔর্ শ্রীভোজদেব নে "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" মেঁ, গাথাসপ্তশতীকী অনেক্ গাথাএঁ ধ্বনি ঔর্ ব্যঞ্জনাকে উৎকৃষ্ট উদাহরণোঁ মেঁ উদ্ধৃত কর্‌কে গাথাওঁকী সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত্ কর্ দী হৈ। য়ে প্রাকৃতগাথাএঁ বাস্তব মেঁ প্রাচীন্ সাহিত্য-সমুদ্রকে অনর্ঘ রত্ন হৈ। ইন্ প্রাচীন্ প্রাকৃত রত্নোঁকে মুকাবিলে মেঁ অনেক্ সংস্কৃত রত্নোঁকী রচনা সময়্ সময়্ পর্ হুঈ, পর্ ইন্‌কী চমক্ দমক্‌কে সাম্‌নে উন্‌কী জ্যোতি নহীঁ জমী। 'প্রাকৃত' ভাবোঁকো প্রকট্ কর্‌নেকে লিয়ে প্রাকৃত ভাষা হী কুছ্ সমুচিত্ সাধন্ হৈ। "আর্য্যা-সপ্তশতীকে" কর্ত্তা গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে ইস্ বাত্‌কো স্পষ্ট হী স্বীকার্ কিয়া হৈ—

* সোনজুহী—পীলী চমেলী। কুবলয়—নীল কমল। মার—কামদেব। জুন্হৈয়া—জ্যোৎস্না, চাঁদ্‌নী।

"বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যের গগনতলম্॥"—(আ°স°.৫২)।

অর্থাৎ বাণীকা কুছ্ স্বভাব হৈ কি বহ প্রাকৃত কাব্যমেঁ হী সরসতাকো প্রাপ্ত হোতী হৈ ঔর্ মৈঁ উসে বলাৎকার সে সংস্কৃত বনা রহা হুঁ—উলটি গঙ্গা বহা রহা হুঁ—ইস্ লিয়ে যদি বৈসী (প্রাকৃতকে সমান্) স্বাভাবিক্ সরসতা ইস্‌মেঁ ন আ সকে তো ক্ষন্তব্য হৈ। বলাৎকার্‌মেঁ রস্ কহাঁ ?

ইস্ প্রকার্ খুলে শব্দোঁমেঁ প্রাকৃতকী প্রশংসা করনেবালে গোবর্দ্ধনাচার্য্য কোঈ সাধারণ্ কবি ন থে, জগৎপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" কে নির্মাতা জয়দেব নে উন্‌কে বিষয় মেঁ কহা হৈ—

"শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ ০"

অর্থাৎ শৃঙ্গাররসপ্রধান্ উৎকৃষ্ট * কবিতা কর্‌নে মেঁ আচার্য্য গোবর্দ্ধনকা কোঈ প্রতিদ্বন্দ্বী নহীঁ সুনা গয়া—উন্‌কে সমান্ শৃঙ্গাররস্‌কী রচনামেঁ নিপুণ্ কবি ঔর্ কোঈ নহীঁ হৈ। গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে স্বয়ং ভী অপ্‌নী রচনাকী জো খোল্‌কর্ প্রশংসা কী হৈ, জো রচনা-সৌন্দর্য্যকো দেখে কুছ্ অনুচিত নহীঁ হৈ—

"মসৃণপদরীতিগতয়ঃ সজ্জনহৃদয়াভিসারিকাঃ সুরসাঃ।
মদনাদ্বয়োপনিষদো বিশদা গোবর্দ্ধনস্যার্য্যাঃ॥"—(আ°স°,৫১)।

"গাথাসপ্তশতী" কে অনুকরণ্ মেঁ গোবর্দ্ধনাচার্য্য সে পহলে (ঔর্ উন্‌কে পশ্চাৎ ভী) কুছ্ সংস্কৃত কবিয়োঁ নে আর্য্যা ছন্দমেঁ ইস্ ঢঙ্‌কী কাব্যরচনা কী থী, জিস্‌কী ওর্ গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে কঈ জগহ্ ইশারা কিয়া হৈ। পর "আর্য্যাসপ্তশতী"কে সাম্‌নে উন্‌মেঁ সে এক্ ন ঠহর্ সকী।

গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে সমান্ শৃঙ্গারী কবিয়োঁ মেঁ এক্ "অমরুক" কবি ঔর্ হৈ, জিন্‌কা "শতক্" হজারোঁমেঁ এক হৈ, জিস্‌কী অপূর্বতা পর্ মুগ্ধ হোকর্ সাহিত্যপরীক্ষকোঁনে "অমরুকবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধশতায়তে" কহ দিয়া হৈ, অর্থাৎ অমরুক কবিকা এক্ এক্ শ্লোক্ এক্ এক্ গ্রন্থকে সমান্ গম্ভীর্ ভাবোঁ সে ভরা হৈ।

জিস্ শৈলী পর্ প্রাকৃত "গাথাসপ্তশতী" "অমরুশতক" ঔর্ "আর্য্যাসপ্তশতী" কী রচনা

---

* মূলের 'শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়' ইত্যাদির অর্থ পূজারি গোস্বামী লিখিয়াছেন—'শৃঙ্গার এব উত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্য-নায়ক-নায়িকা-প্রায়-বর্ণনস্য রচনৈঃ। সৎ=উৎকৃষ্ট; প্রমেয়=প্রমাণ-যোগ্য; প্রমাণ-সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'সৎপ্রমেয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ অর্থ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ; সাধারণ নায়ক-নায়িকা ব্যতীত দিব্য নায়ক-নায়িকাগণের আদি-রসাত্মক অবস্থা কবির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট হইতে পারে না,—এজন্যেই শৃঙ্গারোত্তরাদি পদের অর্থ—আদিরস-প্রধান সাধারণ নায়ক-নায়িকার বাস্তব (realistic) বর্ণন।—লেখক।

হুঈ হৈ, উসে সাহিত্যকে পরিভাষামেঁ "মুক্তক" কহতে হৈ। "ধ্বন্যালোক" কে তৃতীয় উদ্যোত্ মেঁ কাব্যকে ভেদ্ গিনাতে হুএ শ্রীআনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য নে "মুক্তকং সংস্কৃত-প্রাকৃতাপভ্রংশ-নিবদ্ধম্।" কহ কর্ মুক্তককে ভাষা-ভেদসে তীন্ ভেদ্ কিয়ে হৈ—অর্থাৎ সংস্কৃতনিবদ্ধ, প্রাকৃতনিবদ্ধ, ঔর্ অপভ্রংশনিবদ্ধ।

"মুক্তক" পদকী ব্যাখ্যা শ্রীঅভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য নে ইস্ প্রকার কী হৈ—

"মুক্তমন্যেন নালিঙ্গিতং, তস্য সংজ্ঞায়াং কন্।"

"পূর্ব্বাপরনিরপেক্ষেণাপি হি যেন রসচর্বনা ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্॥"

অর্থাৎ অগ্‌লে পিছ্‌লে পদ্যোঁসে জিস্‌কা সম্বন্ধ ন হো, অপ্‌নে বিষয়কা প্রকট্ করনে মেঁ অকেলা হী সমর্থ হো, ঐসে পদ্যকো 'মুক্তক' কহতে হৈ। জিস্ অকেলেহী পদ্যমেঁ বিভাব, অনুভাব আদি সে পরিপুষ্ট ইত্‌না রস্‌ভরা হো কি উস্‌কে স্বাদসে পাঠক্ তৃপ্ত হো জায়ঁ, সহৃদয়তাকী তৃপ্তিকে লিএ উসে অগ্‌লী পিছ্‌লী কথাকা সহারা ন ঢূঁঢ়্‌না পড়ে, ঐসে অনুঠে পদ্যকা নাম্ "মুক্তক্" হৈ। ইসীকা নাম্ "উদ্ভট্" ভী হৈ, হিন্দী মেঁ ইসে ফুট্‌কর্ কবিতা কহতে হৈঁ। ইসী প্রকার্‌কে পদ্য জিস্‌মেঁ সংগৃহীত হোঁ উসে "কোষ" কহতে হৈঁ। "মুক্তক"কী রচনা কবিত্বশক্তি কী পরাকাষ্ঠা হৈ, মহাকাব্য খণ্ডকাব্য য়া আখ্যায়িকা আদিমেঁ যদি কথানক্‌কা ক্রম্ অচ্ছী তরহ্ বৈঠ্ গয়া তো বাত্ নিভ্ জাতী হৈ, কথানক্‌কী মনোহরতা পাঠক্‌কা ধ্যান্ কবিতাকে গুণদোষ্ পর্ প্রায়ঃ নহীঁ পড়্‌নে দেতী। কথা-কাব্যমেঁ হজার মেঁ দশ বীস্ পদ্য ভী মার্কেকে নিকল্ আয়ে তো বহুত্ হৈ। কথানক্‌কী সুন্দর সংঘটনা, বর্ণনশৈলীকী মনোহরতা ঔর্ সরলতা আদিকে কারণ "কুল্ মিলাকর্" কাব্যকে অচ্ছেপন্‌কা প্রমাণ্‌পত্র মিল্ জাতা হৈ। পরন্তু "মুক্তক্" কী রচনামেঁ কবিকো "গাগর্‌মেঁ সাগর্" ভর্‌না পড়্‌তা হৈ। এক্‌হি পদ্যমেঁ অনেক্ ভাবোঁকা সমাবেশ ঔর্ রস্‌কা সন্নিবেশ কর্‌কে লোকোত্তর চমৎকার্ প্রকট্ কর্‌না পড়্‌তা হৈ। ঐসা কর্‌না সাধারণ কবিকা কাম্ নহীঁ হৈ। ইস্‌কে লিএ কবিকা সিদ্ধসরস্বতীক ঔর্ বশ্যবাক্ হোনা আবশ্যক্ হৈ। মুক্তক্‌কী রচনা মেঁ রস্‌কী অক্ষুণ্ণতা পর্ কবিকো পূরা ধ্যান্ রখ্‌না পড়্‌তা হৈ। ঔর্ য়হী কবিতাকা প্রাণ হৈ। জৈসা কি মুক্তক্‌কে সম্বন্ধমেঁ আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য লিখ্‌তে হৈ—

"মুক্তকেষু হি প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা হ্যমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।"

অর্থাৎ এক্ গ্রন্থমেঁ জিস্ রসস্থাপন্‌কা পূরা প্রবন্ধ কবিকো কর্‌না পড়্‌তা হৈ বহী বাত্ কবিকো এক্ মুক্তক্‌মেঁ লা কর্ রখ্‌নী পড়্‌তী হৈ। জিস্ প্রকার্ অমরুক্ কবিকে "মুক্তক" শৃঙ্গাররস্‌কা প্রবাহ বহানেকে কারণ প্রবন্ধকী (গ্রন্থকী) সমতা প্রাপ্ত কর্‌নেমেঁ প্রসিদ্ধ হৈঁ। "মুক্তক্" মেঁ অলৌকিকতা লানেকে লিএ কবিকো অভিধাসে বহুত্ কম্ ঔর্ ধ্বনি ব্যঞ্জনা সে অধিক্ কাম্ লেনা পড়তা হৈ। বহী উস্‌কে চমৎকার্‌কা মুখ্য হেতু হৈ। ইস

প্রকারকে রসধ্বনিপূর্ণ কাব্যকে নির্মাতা হী বাস্তব মেঁ 'মহাকবি' পদকে সমুচিত্ অধিকারী হৈ। ফির্ উন্‌কী রচনা পরিমাণ্ মেঁ কিতনী হী পরিমিত ক্যোঁ ন হো।

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥" (ধ্বন্যালোক—১।৪)

অর্থাৎ মহাকবিয়োঁকী বাণীমেঁ অভিধীয়মান—বাচ্য অর্থসে অতিরিক্ত "প্রতীয়মান" অর্থ ঐসী চমৎকারক্ বস্তু হৈ—জো কুছ্ ইস্ প্রকার্ চমকৃতী হৈ জিস্ প্রকার অঙ্গনাকে অঙ্গমেঁ হস্তপাদাদি প্রসিদ্ধ অবয়বোঁকে অতিরিক্ত লাবণ্য। ইস্ কারিকাকে "মহাকবীনাম্" পদকী ব্যাখ্যা কর্‌তে হুএ শ্রীঅভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য লিখ্‌তে হৈঁ—

"প্রতীয়মানানুপ্রাণিত-কাব্যনির্ম্মাণনিপুণপ্রতিভা-
ভাজনত্বেনৈব মহাকবিব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ প্রতীয়মান্ অর্থসে যুক্ত কাব্যনির্ম্মাণ্‌কী জিন্‌মেঁ শক্তি হৈ, বহী 'মহাকবি' কহলানেকে অধিকারী হৈ।

ইস্ নির্ণয়কে অনুসার্ 'মহাকবি' কহলানেকে লিএ য়হ্ আবশ্যক্ নহী হৈ কি, সাহিত্য-দর্পণাদিমেঁ বর্ণিত লক্ষণোঁসে যুক্ত 'মহাকাব্য' কা কোই বড়া পোথা বনাবে তভী 'মহাকবি' কহলাবে। রাজশেখরনে তো ইস্ প্রকারকে রসস্বতন্ত্র কবিকো মহাকবিসে ভী বড়ী 'কবিরাজ' কী পদবী দী হৈ। যথা—

"যস্তু তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেষু প্রবন্ধেষু তস্মিংস্তস্মিংশ্চ রসে স্বতন্ত্রঃ স কবিরাজঃ। তে যদি জগত্যপি কতিপয়ে।"

হমারে বিহারী জগত্‌কে উন্‌হীঁ কতিপয় কবিরাজোঁ মেঁ হৈঁ।

বিহারীকে সম্বন্ধ মেঁ লেখ লিখ্‌তে হুএ অব্ তক্ জো কুছ্ য়হ উপর্ লিখা গয়া সো সরসরী তৌরসে অপ্রাসঙ্গিক সা প্রতীত্ হোগা, পর্ ঐসা নহী হৈ; ইস্‌কী য়হাঁ আবশ্যকতা থী। হমেঁ অভী আগে চল্ কর্ 'গাথাসপ্তশতী' 'আর্য্যাসপ্তশতী' ঔর্ 'অমরুশতক' সে খাস্ তৌর্ পর্ বিহারী-সতসঈ কী তুলনা কর্‌নী হৈ, যদি ইস্ তুলনা মেঁ বিহারী পূরে উতর্ জায়ঁ অর্থাৎ বিহারীকী কবিতা ইন্‌কী বরাবরীকী য়া কহী ইন্‌সে বঢ়ী চঢ়ী সিদ্ধ হো জায়, ইন্‌কে মুকাবিলে মেঁ উস্‌কা পল্‌ড়া কহীঁ ঝুক্ জায় তো জো বাত সিদ্ধ হোগী উসে ক্যা অভিধাবৃত্তিসে কহনেকী আবশ্যকতা হোগী!"

* * * *

পহলে সময় মেঁ সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বানোঁনে সতসঈ পর্ সংস্কৃতকে গদ্য ঔর পদ্য মেঁ তিলক্ ঔর

অনুবাদ্ করকে অপ্‌নী গুণগ্রাহিতা প্রকট্ কী হৈ সহী, পর্ ইস্‌সে সংস্কৃতজ্ঞোঁ মেঁ সতসঈ কা যথেষ্ট প্রচার্ নহী হুআ, ঐসে অনুবাদোঁ দ্বারা কবিতা কা মূলতত্ত্ব অবগত করনা অসম্ভব হৈ। বাস্তব মেঁ কবিতা অনুবাদ্ করনেকী চীজ হৈ হী নহীঁ।"

বস্তুতঃ পণ্ডিতজী তাঁহার অপূর্ব্ব তুলনার সমালোচনা দ্বারা বিহারীলালের কবিতা যে কোন অংশে 'গাথা-সপ্তশতী', 'আর্য্যা-সপ্তশতী' বা 'অমরুশতকে'র কবিতা হইতে ন্যূন নহে—অধিকন্তু ব্রজভাষার অতুলনীয় মাধুর্য্য ও ভাব-ব্যঞ্জকতা হেতু বিহারীলালের কবিতায় এক অভিনব ও অপূর্ব্ব আস্বাদন অনুভূত হয়, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই রসাস্বাদন অনুবাদ সাহায্যে সম্ভবপর নহে। তাই সাহিত্য-সেবক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা অবিলম্বে ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা (Lingua franca) হিন্দীর রীতিমত চর্চ্চা আরম্ভ করুন এবং পণ্ডিতজীর সঞ্জীবন-ভাষ্যের * সাহায্যে বিহারীলালের অতুলনীয় সতসঈ কাব্যখানির অনুশীলন ও উহা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়া মৈথিল-কবি বিদ্যাপতির তথাকথিত ব্রজবুলি পদাবলীর ন্যায় ব্রজ-ভাষার অদ্বিতীয় কবি বিহারীলালের দোঁহাবলীও বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ-ভুক্ত করিয়া লইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের রত্ন-মুকুটে একখানা অমূল্য হীরক-খণ্ড সংযোজিত করুন।

আমরা নিম্নে বিহারীলালের 'সতসঈ' কাব্যের নানা স্থান হইতে নানা ভাবের কয়েকটী দোঁহা অন্বয় ও বাঙ্গালা অর্থ সহ উদ্ধৃত করিলাম :—

"মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ স্যাম হরিত-দুতি হোয়॥"

(মঙ্গলাচরণ)। সোয় (সেই) নাগরি (নায়িকা-রত্ন) রাধা (শ্রীরাধা) মেরী (আমার) ভববাধা (সংসার-যাতনা) হরৌ (হরণ করুন্), জা (যাঁহার) তনকী (শরীরের) ঝাঁঈ (কান্তি) পরেঁ (পতিত হইলে) স্যাম (শ্যাম-বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ) হরিত-দুতি (এক-অর্থে—অপহৃত-কান্তি, অন্য অর্থে হরিদ্বর্ণ) হোয় (হয়েন)।

"ছুটী ন সিসুতা কী ঝলক ঝলক্যো জোবন অঙ্গ।
দীপতি দেহ দুহুন মিলি দিপতি তাফতা রঙ্গ॥"

(নায়িকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনা)। সিসুতাকী (শৈশবের) ঝলক (শোভা) ন ছুটী (ছোটে নাই), জোবন (যৌবন) অঙ্গ (অঙ্গে) ঝলক্যো (শোভা দিতে আরম্ভ করিয়াছে), দুহুন (শৈশব ও যৌবন—উভয়ের) মিলি (মিলনে) দীপতি দেহ (দেহের কান্তি) তাফতা রঙ্গ (ধুপছায়া-কাপড়ের ন্যায়) দিপতি (শোভা দিতেছে)।

* "বিহারী-সতসঈ"—সঞ্জীবন-ভাষ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মা প্রণীত। নায়কনগলা। চান্দপুর পোঃ (জিলা—বিজনোর U. P.) ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট ৩।০ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

"ইক ভীজে চহলে পরে বূড়ে বহে হজার।
কিতো ন ঔগুন জগ করত নৈ বৈ চঢ়তী বার॥"

(যৌবন-বর্ণনা)। ইক (এক-জন অর্থাৎ কেহ কেহ) ভীজে (ভিজিয়া যায়), (কেহ কেহ) চহলে পরে (দলদলে কর্দ্দমের ভিতর ঢুকিয়া যায়), (কেহ কেহ) বূড়ে (ডুবিয়া যায়), (আর) হাজার (হাজার হাজার লোক) বহে (ভাসিয়া যায়); চঢ়তী নৈ (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত নদী,) (এবং) চঢ়তী বৈ বার (বৃদ্ধি অর্থাৎ যৌবনের বয়স প্রাপ্ত বালা) কিতে (কত) ঔগুন (দোষ অর্থাৎ অনিষ্ট) ন করত (না জন্মায় ?)।

"কচ সমেটি কর ভুজ উলটি খএ সীস পট ডারি।
কাকো মন বাঁধে ন য়হ জূরো বাঁধনি হারি॥"

(সুন্দরীর কেশ-বন্ধন-বর্ণনা)। কচ (কেশ) কর (কর দ্বারা) সমেটি (সাপ্টাইয়া ধরিয়া), ভুজ (বাহু) উলটি (পাছের দিকে উল্টাইয়া), সীসপট (মাথার কাপড়টুকু) খএ ডারি (কাঁধের উপরে ফেলিয়া), য়হ (এই) জূরো বাঁধনি হারি (কেশ-বন্ধন-কারিণী) কাকো (কাহার) মন ন বাঁধে (মন না বন্ধন করে ?)।

"দৃগন লগত বেধত হিয়ো বিকল করত অঙ্গ আন।
য়ে তেরে সব তেঁ বিষম ঈছন তীছন বান॥"

(নায়িকার প্রতি নায়কের পরিহাস-উক্তি)। দৃগন (নয়ন-যুগলে) লগত (লগ্ন হয়), (কিন্তু) হিয়ো (হৃদয়) বেধত (বিদ্ধ করে) (এবং) আন (অন্য) অঙ্গ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বিকল করত (বিকল করে); (সুতরাং) তেরে (তোমার) তীছন (তীক্ষ্ণ) ঈছন বান (দৃষ্টি-রূপ বাণ) সব তেঁ (সকল প্রকার অস্ত্র হইতে) বিষম (ভয়ানক)।

"ঝূটে জানি ন সংগ্রহে মন মুঁহ নিকসে বৈন।
য়াহী তে মানো কিয়ে বাতন কো বিধি নৈন॥"

(নয়নের ভাষার অপূর্ব্বতার বর্ণন)। মুঁহ নিকসে (মুখ হইতে নির্গত) বৈন (বচন) ঝূঠে (এক-অর্থে—উচ্ছিষ্ট, অন্য অর্থে—মিথ্যা) জানি (জানিয়া), (উহার) সংগ্রহে (গ্রহণে) মন ন (ইচ্ছা হয় না); মানো (মনে হয়) য়াহী তে (এই কারণ হইতেই) বিধি (বিধাতা) বাতন কো (বাক্য কহিবার নিমিত্ত) নৈন (নয়ন) কিয়ে (নির্ম্মাণ করিয়াছেন)।

"কহত নটত রীঝত খিঝত মিলত খিলত লজিয়াত।
ভরে ভৌন মেঁ করত হৈঁ নৈনন হী সোঁ বাত॥"

(নয়নের ভাষা-বর্ণন)। কহত (কথা বলে অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ করে), নটত (মানা করে), রীঝত (হর্ষ প্রকাশ করে), খিঝত (খেদ প্রকাশ করে), মিলত (মিলিত হয়),

খিলত (বিকসিত হয়) (এবং) লজিয়াত (লজ্জিত হয়) ; (এই প্রকারে) ভরে (জন-পূর্ণ) ভৌন মেঁ (ভবনে) নৈনন হীসোঁ (শুধু নেত্র-যুগল দ্বারাই) বাত করত (বাক্য কহে)।

"কঞ্জনয়নি মঞ্জন কিয়ে বৈঠী ব্যোরতি বার।
কচ অঁগুরিন বিচ ডীঠি দৈ নিরখতি নন্দকুমার॥"

(শ্রীরাধার স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন)। কঞ্জনয়নি (কমল-নয়নী) (শ্রীরাধা) মঞ্জন (স্নান) কিয়ে (করিয়া) বৈঠী (বসিয়া) বার (কেশ) ব্যোরতি (আঙ্গুল দিয়া আঁচড়াইতেছেন) (এবং) কচ অঁগুরিন বিচ (কেশ ও আঙ্গুলগুলির মধ্যে) ডীঠি (দৃষ্টি) দৈ (দিয়া) নন্দ-কুমার (নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে) নিরখতি (দেখিতেছেন)।

"বরন বাস সুকুমারতা সব বিধি রহী সমায়।
পঁখুরী লগী গুলাবকী গাল ন জানী জায়॥"

(সুন্দরীর কপোল-বর্ণন)। বরন (বর্ণ) বাস (সুগন্ধ) সুকুমারতা (কোমলতা)—সব বিধি (সকল প্রকারে) সমায় (সমান হইয়া) রহী (রহিয়াছে) ; (সুন্দরীর) গাল (গালে) (যে) গুলাবকী (গোলাপের) পঁখুরী (পাঁপড়ি) লগী (লাগিয়া রহিয়াছে) (উহা) ন জানী জায় (জানা যাইতেছে না)।

"রাতি দিবস হোঁসৈ রহতি মান ন ঠিকু ঠহরায়।
জেতো ঔগুন ঢূঁঢ়িয়ে গুনৈ হাথ পরি জায়॥"

(প্রেম-গর্ব্বিতা নায়িকার সখীর প্রতি উক্তি)। রাতি দিবস (দিবা-রাত্র) হোঁসৈ (প্রবল অভিলাষই) রহতি (থাকে), (কিন্তু) মান ঠিকু (মান করার ঠিকানা) ন ঠহরায় (থাকে না); (কেন না—প্রিয়তমের) জেতো (যত) ঔগুন (দোষ) ঢূঁঢ়িয়ে (তালাস করি) গুনৈ (গুণই শুধু) হাথ (হাতে) পরি জায় (পড়িয়া যায়)।

"কোরি জতন কোউ করো পরৈ ন প্রকৃতিহিঁ বীচ।
নল বল জল উচে চঢ়ে তউ নীচ কো নীচ॥"

(নীচ-স্বভাব-বর্ণন)। কোউ (কেহ) কোরি (কোটি) জতন (যত্ন) করো (করুক) (কিন্তু) প্রকৃতিহিঁ (স্বভাবের বিষয়ে) বীচ (পার্থক্য) ন পরৈ (ঘটে না); (ইহার দৃষ্টান্ত,—) নলবল (নলের জোরে) জল উচে (ঊর্দ্ধে) চঢ়ে (উঠে), তউ (তথাপি অর্থাৎ নল হইতে বহির্গত হইলে) নীচকো নীচ (নীচ হইতে নীচতর হইয়া প্রবাহিত হয়)।

"গিরি তে উঁচে রসিকমন বূড় জহাঁ হজার।
রহে সদা পশু নরন কহঁ প্রেম-পয়োধি পগার॥"

(রসজ্ঞ ও অরসজ্ঞের পার্থক্য)। জহাঁ (যাহাতে) গিরি তে (পর্ব্বত হইতে) উঁচে (উচ্চ) হজার (হাজার হাজার) রসিক মন (রসজ্ঞের মন) বূড় (ডুবিয়া যায়) রহৈ (সেই) প্রেম-পয়োধি (প্রেম-সমুদ্রকে) পশু নরন (অরসজ্ঞ লোকেরা) সদা (সর্ব্বদা) পগার (পগার অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও অগভীর জলাশয়) কহঁ (কহে)।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

[পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

অব্যয় স্বর

(৫) কতকগুলি দুর্ব্বোধ দ্বিতীয়ান্ত অব্যয় শব্দ—তূষ্ণীম্ (নিঃশব্দে), সায়ম্ (সন্ধ্যায়), সাকম্ (সহ), অরম্-অলম (পূর্ণ), ঈষৎ (অল্প), অন্তঃ (অজ্ঞাতসারে), বহিঃ (বাহিরে), মিথু—মিথঃ, মুহু—মুহুঃ, জাতু। মক্ষিক্, নিণিক্, উশধক্, আনুষক্, আয়ুষক্, অনুষ্ঠু, সুষ্ঠু, যুগপৎ।

(৬) দ্রবৎ (—সত্বর, অব্যয়), দ্রবৎ (—ধাবমান, শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ) ; দ্রহ্যৎ (ঋ° এক বার—দৃঢ়ভাবে)।

(আ) তৃতীয়া—(১) সর্ব্বনাম—এনা, অয়া, কয়া, অনা, অমা, অমুয়া।

(২) বিশেষ্য—সহসা (হঠাৎ, সহঃ—বল), দিবা (দিনে)।

(৩) বিশেষণ—দক্ষিণেন, উত্তরেণ, অন্তরেণ, চিরেণ, শনৈঃ, শনকৈঃ, উচ্চৈঃ, পরাচৈঃ (দূরে), তাবিষীভিঃ (জোরে)।

(৪) দুর্ব্বোধ—তিরশ্চতা, দেবতা, বাহুতা, সত্বর্তা (সব ঋ°)। দ্বিতা, তাদীত্না, ঈর্মা, মৃষা, বৃথা, সচা, অস্থা, অধুনা।

(৫) স্বরস্থিতির বিপর্য্যয়বিশিষ্ট তৃতীয়ান্ত পদ—গুহা, অপাকা, আসয়া, কুহয়া, নক্তয়া, স্বপ্নয়া, সমনা, অদত্রয়া, ঋতয়া, উভয়া, সুম্নয়া, দক্ষিণা, মধ্যা, নীচা, প্রাচা, উচ্চা, পশ্চা, তিরশ্চা, বসন্তা, আশুয়া, সাধুয়া, রঘুয়া, ধৃষ্ণুয়া, অনুষ্ঠুয়া, মিথুয়া, উর্বিয়া, ('উর্ব্যা' স্থানে), বিষ্যা (বিশ্বয়া)।

(ই) চতুর্থী—এই বিভক্তিতে অব্যয় শব্দ অতি বিরল। অপরায় (ভবিষ্যতের জন্য, ঋ°), চিরায়।

(ঈ) পঞ্চমী—(১) সর্ব্বনাম—কস্মাৎ (কেন?), অকস্মাৎ (হঠাৎ, বিনাকারণে), আৎ, তাৎ, যাৎ।

(২) বিশেষ্য—আসাৎ, (নিকটে), আরাৎ (দূরে)।

(৩) বিশেষণ—দূরাৎ, নীচাৎ, সাক্ষাৎ, পশ্চাৎ।

(৪) নানাবিধ—অপাকাৎ (দূরে, দূর হইতে), অমাৎ (নিকটে, নিকট হইতে), সনাৎ (বহুকাল হইতে, 'সনা' তৃতীয়ান্ত), উত্তরাৎ, অধরাৎ।

(উ) ষষ্ঠী—উদাহরণ বিরল—অক্তোঃ (রাত্রি-যোগে), বস্তোঃ (দিবাভাগে)।

(ঊ) সপ্তমী—বিশেষণ ও বিশেষ্য—আকে (নিকটে), আরে—দূরে (দূরে), অভিস্বরে, পশ্চাদ্‌ভাগে), অস্তমীকে (স্ব-গৃহে), ঋতে (বিনা), অগ্রে (সম্মুখে), অপরীষু। (সপদি, আদৌ, রহসি, স্থানে, অর্থে, কৃতে)।

(ঋ) প্রথমা—প্রথমান্ত পদও দু'একটী পাওয়া যায়। কিঃ (জিজ্ঞাসাবাচক), মাকিস্ (নিষেধবাচক)।

গ। উপসর্গ—বৈদিক যুগে উপসর্গসমূহের কতকটা স্বাধীন ব্যবহার ছিল। ক্রিয়াপদ হইতে বহু দূরে উপসর্গ প্রযুক্ত হইতে পারিত। ক্রিয়া ও উপসর্গের মধ্যে ব্যবধান ত থাকিতে পারিতই। তাহা ছাড়া ক্রিয়াপদের পরেও বহু দূরে উপসর্গের প্রয়োগ অবিরল। স দেবান্ এ হ বক্ষ্যতি (ঋ°—তিনি দেবগণকে এই দিকে আনিবেন ; আ—বক্ষ্যতি)। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ (অথ°—তিনি যেন আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত করেন ; প্র—তারিষৎ)। তাবা যাতম্ উপ দ্রবৎ (ঋ°—তোমরা দুই জনে শীঘ্র এই দিকে এস ; আ—যাতম্—উপ)। গমদ্ বাজেভিরা স নঃ (ঋ°—যেন তিনি দান বা দেয় বস্তু সহ এখানে আমাদিগের নিকট আসেন ; গমৎ—আ)। লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গের এরূপ প্রয়োগ ছিল না। ক্রিয়ার পূর্ব্বে ক্রিয়ার সহিত জুড়িয়া উপসর্গের ব্যবহার ছিল। উপসর্গের কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। বিনা ক্রিয়ায় উপসর্গের ব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বেদের যুগে উপসর্গসমূহের সম্পর্ক কারক ও ক্রিয়ার সহিত সমান ভাবেই ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহারা কারক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

অনু, অভি (অভি দেবান্ কৃষ্ণঃ), আ, অন্তর্, উপ, প্রতি প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গ কারক-নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। অপ, অব, উদ্, নি, নিস্, পরা, প্র, বি, সম্ কেবল ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হয়, কারক-নির্দ্দেশকরূপে স্বাধীন ব্যবহার ইহাদের নাই। অপি এখন স্বাধীন; প্রশ্নার্থক অব্যয়। ইহার ক্রিয়াবয়িত্ব কাড়িয়া লইয়াছে—"পি'; যেমন পিধান। অব স্থানে "ব' ('বগাহ') থাকিলেও ইহার ভাগ্যে স্বাধীনতা লাভ ঘটে নাই। বৈদিক উপসর্গের আর একটী বৈশিষ্ট্য স্বর-বিষয়ক। স্বরবিষয়ক সাধারণ নিয়ম এই :—

(১) ক্রিয়াপদ বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থলেই স্বরবিহীন।* এই সকল স্বরবিহীন ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে যে উপসর্গ থাকে, তাহা স্বরবান্। কিন্তু একাধিক উপসর্গ থাকিলে ক্রিয়াপদের অতি সমীপস্থ উপসর্গই স্বরবান্ হয়। অন্যত্র স্বর থাকে না।

(২) যদি ক্রিয়াপদে স্বর থাকে, তবে উপসর্গ বা উপসর্গ-সমূহ স্বরবিহীন হইয়া পড়ে।

(৩) অর্থাৎ ক্রিয়া ও উপসর্গ উভয়ে মিলিয়া এক। তাই উভয়ের সম্পত্তি একটী মাত্র স্বর।

(৪) অধীন বাক্যে উপসর্গের স্বর থাকে না। কিন্তু এ সকল বিধি সর্ব্বত্র খাটে না। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই আছে—'আ-যাতম্-উপ', 'গমৎ—আ'। আরও অনেক উদাহরণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।†

উপসর্গের স্বরস্থিতি বিষয়ে আর একটী কথা এই যে, তাহারা সবগুলিই আদ্যুদাত্ত। কেবল 'অভি' অন্ত্যোদাত্ত।‡

উপসর্গসমূহ বিশেষণের ন্যায় তর,-তম,-র,-ম প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ও বিশেষণরূপে এবং সময়ে সময়ে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর, উত্তম, অধর, অধম, অপর, অপম, অবর, অবম, উপর, উপম, অন্তর, অন্তম, নিতরম্, অভিতরম্, অবতরম্, পরাতরম্, পরস্তরম্, অতিতরাম্, অভিতরাম্, অনুতমাম্, প্রতিতরাম্, উত্তরাম্, প্রতরাম্, নিতরাম্, বিতরাম্, সন্তরাম্। এই শেষেরগুলি (তরাম্ যোগে) ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত; সংহিতা-সাহিত্যে অতিবিরল।

উপসর্গের ন্যায় ক্রিয়ার সম্পর্কে বিকাশপ্রাপ্ত উপসর্গের ন্যায় ধর্ম্মবিশিষ্ট কতকগুলি অব্যয়

---

* সা, প, প, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ।

† সা, প, প, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ।

‡ উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্।

পদ—অবস্ (নীচে), অধস্ (অধস্তরাম্), পরস্ (দূরে) (পরস্তরাম্), পুরা, অন্তরা (মধ্যে—অন্তর্+আ ?), অন্তি (নিকটে), সহ, সচা (সহ), বিনা ('বি' উপসর্গের স্বগোত্র, তৃতীয়ান্ত)। পূর্ব্বের উদাহরণের কতকগুলি পদ এই শ্রেণীর।

নিষেধার্থক অ-, অন্- প্রভৃতি উপসর্গ-ধর্ম্মাক্রান্ত কতকগুলি চিরপরাধীন অব্যয় আছে। ইহাদের স্বাধীন ব্যবহার কোথাও নাই। কৃদন্ত, বিশেষ্য বা বিশেষণ সর্ব্ববিধ শব্দের সহিত ইহাদের যোগ হয়। অকুত্র, অপুনঃ, অনেব, অনধঃ। কচিৎ দীর্ঘ উচ্চারণ—আসৎ (অস্তিত্ব-বিহীন), আদেব (দেববিহীন), আরাতি (অরাতি), আতুর (অসুস্থ)।* সর্ব্বনামের সহিত নিষেধার্থক উপসর্গের ব্যবহার বিরল; অতৎ, অকিঞ্চিৎ, অকস্মাৎ। ব্রাহ্মণের ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার সহিতও ইহার ব্যবহার হইয়াছে—অভোকয়ন্তি (দেখে না), অনপূরয়ন্তি (চাহে না)। অসম্ভাবাচক 'ন' ও নিষেধবাচক 'মা' বোধ হয় এই শ্রেণীর নহে। তাহাদের স্বাধীন প্রয়োগই বেশী। সমাস-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ঘ। বিবিধ অব্যয়।

(১) সম্মতি বা নিশ্চয়ার্থক—কিল, খলু, বৈ, বাব (ব্রাহ্মণে), হি (স্বরহীন), হিন, উ, হ, ঘ, সমহ, স্ম, ভল। ইদ্, জাতু, এব।

(২) জিজ্ঞাসাবাচক—কদ্, কুবিদ্, নন্থ, ক, কম্।

(৩) উ-যোগে—অথো, নো, মো, উতো, উপো, প্রো। ইহারা প্রগৃহ্য।

(৪) সম্বোধনে—অঙ্গ, হন্ত (খেদে), ভোঃ, ইত্যাদি।

(৫) উপমাবাচক—ন, (গৌরো ন তৃষিতঃ পিব—ঋ°—তৃষিত মহিষের ন্যায় পান কর), ইব; ব (স্বরহীন), যথা (স্বরহীন)।

(৬) স্থানকালবাচক—স্থ, নূ (নূনম্), ক, অস্ত, সস্তস্, সদিবস্, হ্যস্, শ্বস্, জ্যোক্ (হ্য হইতে), পুনর্।

(৭) নিষেধাদিবাচক—ন, মা, স্থ (নু), নহি (ন+হি), নেদ্ (=নচেৎ), নন্থ, চন, চিন, নকিস্ মাকিস নকীম্ মাকীম্।

---

* বাঙ্গালা ভাষায় এই দীর্ঘ উচ্চারণের বাহুল্য আছে,—আগাছা, আমানব, আধোনী, আদ্ ভো, আকাঁনা, আ-বোঁআ (গরু—un-broken, untrained

(৮) বিবিধ—নানা, নানানম্, সস্বর্ (গোপনে)।

(৯) পাদপূরণে—এই সকল অব্যয়ের এক একটা অর্থ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থবিবৃতির সঙ্গে নানা অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইয়াছে। অবশেষে লৌকিক সংস্কৃতের শেষ যুগে তাহাদের পাদপূরণে ব্যবহার হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে পাদপূরণে অব্যয়ের ব্যবহার ছিল না।

ঙ। অনুবৃত্তিবাচক অব্যয় বা conjunctions—সমাসের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষায় এই শ্রেণীর অব্যয়ের ব্যবহার বেশী নাই। অন্যান্য আর্য্যভাষার ন্যায় নানাবিধ অধীন বাক্যের ব্যবহার সংস্কৃতে নাই। তাহার স্থানে আছে বিবিধ সমাস। তাই এই শ্রেণীর অব্যয়ের সংখ্যা অতি অল্প।

(১) সংযোজক—চ, উত, অপি, ততঃ, তথা, কিংচ, অথ, ইতি, ইত্যাদি।

(২) বিয়োজক—তু, উ (স্বরহীন)।

(৩) সম্ভাবনাবাচক—যদি, চেদ্।

(৪) হেতুবাচক—হি (যেহেতু), যতঃ।

চ। ভাবাধিক্য-বাচক অব্যয় বা interjections—

(১) অঙ্গভঙ্গীর আনুষঙ্গিক—আ, হা, হাহা, অহহ, হে, হৈ, অয়ি, অয়ে, হয়ে, অহো বট্, বত, বত, হিরুক্, হুরুক্।

(২) অনুকরণজাত বা ধ্বন্যাত্মক—চিশ্চা, (বাণের শব্দ), কিকিরা (হৃৎ-স্পন্দন-শব্দ), বাল্, কট্, কষ্, কল্ (= কোনও কিছু ভাঙ্গার শব্দ), ভুক্ (কুকুরের শব্দ), শল্ (পট্ শব্দ), আষ্, হীম্, অস্, হস্।

(৩) বিশেষ্য-বিশেষণাদি-জাত—ভোঃ (ভবৎ শব্দ হইতে), রে (অরি শব্দ হইতে), ধিক্ (দিহ্ ধাতু হইতে ?), কইদ্, দিষ্ট্যা, স্বস্তি, সুষ্ঠু, সাধু। এইগুলির বৈদিক প্রয়োগ নাই।

এই সকল শব্দের আলোচনা কেহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় এইখানেই। সাহিত্যে ইহাদের কচিৎ ব্যবহার। অভিধানে ইহারা পরিত্যক্ত। অথচ ইহাদের অভাবে দৈনন্দিন কার্য্য বন্ধ হয়। এদিকে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছ। কারকনির্দ্দেশক অব্যয়ের (নিপাতাদির) * স্বরস্থিতির কথা স্থানান্তরে হইয়াছে।

* নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ।

তদ্ধিত স্বর

যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয়ে আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল স্থলে প্রায় আদ্যক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই স্বরস্থিতির অগ্রসৃতি বা পশ্চাদ্‌গতি হয়। সাধারণতঃ প্রত্যয়েই স্বর থাকে, তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দসমূহ বিশেষণ বা বস্তুবাচক, ভাববাচক নহে। কিন্তু স্বরস্থিতির নানারূপ ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রত্যয় ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

অ—প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা নানা প্রকার শব্দের সৃষ্টি হয়। কৃদন্তেও অ প্রত্যয়ের ভূরি প্রয়োগ দেখা গিয়াছে।

আয়স (অয়স্), মানস (মনস্), সৌমনস (সুমনস্), ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্), হৈমবত (হিমবত্), আঙ্গিরস (অঙ্গিরস্), হাস্তিন (হস্তিন্), মারুত (মরুৎ), শারদ, বৈরাজ, (বিরাজ্), পৌষ্ণ (পূষন্), মানুষ (অবিচলিত স্বরস্থিতি)। মাঘোন, বার্ত্রঘ্ন, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র (সবিতৃ), দানব (দানু), সৈন্ধব (সিন্ধু), পার্শ্ব (পর্শু, পঞ্জরাস্থি), পার্থিব (পৃথিবী), ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্রাগ্নী), পাঙ্ক্ত (পঙ্‌ক্তি), যামুন (যমুনা), কানীন (কনীন, বালিকা), বারুণ, বৈশ্বদেব (বিশ্বদেব), গার্দ্দভ (গর্দ্দভ), সৌভাগ্য (সুভগ), বাসন্ত (বসন্ত), দৈবোদাস (দিবোদাস)। বৃষণ, উচ্চ, নীচ, পরাচ, তমস, রজস, পয়স, ব্রহ্মবর্চস, সর্ব্ববেদস, পরমেষ্ঠিন প্রভৃতিতে গুণ বৃদ্ধি নাই। পান্ত (শুখো), বসন্ত, হেমন্ত, বেশন্ত, অনূক, অপাক, উপাক, প্রতীক, পরাক, হোত্র, নেত্র, নেষ্ট্র, পোত্র, ধাত্র, ভ্রাত্র, সবিদ্যুত, আব্যুষ, ভূম্য, জাম্পত্য, ত্রয়, দ্বয়, নব, অন্তর (অন্তর), ভেষজ (ভিষজ্), দেব (দিব্)।

য—প্রত্যয়।* দৈব্য (দেব), পালিত্য (পলিত), গ্রৈব্য (গ্রীবা), গার্হপত্য (গৃহপতী), আর্ত্বিজ্য

---

* In a great majority of instances in the oldest language, the *ya* when it follows a consonant is dissyllabic in metrical value, or is to be reduced to *ia*. Thus in R. V., 266 words have *ia* and only 75 have *ya* always : 46 are to be read now with *ia* and now with *ya* ***. As might be expected, the value *ia* is more frequent after a heavy syllable : Thus in R. V. there are 188 examples of *ia* and 27 of *ya* after such a syllable. ***. It must be left for further researches to decide whether in the *ya* are not included more than one suffix, without different accent and different quantity of the i-element : or with an *a* added to a final i of the primitive.—Whitney 1210. a.

(ঋত্বিজ্), সাংগ্রামজিত্য (সংগ্রামজিৎ), আতিথ্য (অতিথি), বৈমনস্য (বিমনস্), বৈশ্য (বিশ্), আধিপত্য (অধিপতি), নৈর্বাধ্য, বৈষ্ণব্যৌ।

য – প্রত্যয়। আদিস্বরের বৃদ্ধিবিহীন।

ক। মৌলিক স্বর। অশ্ব্য (অশ্ব), অঙ্গ্য (অঙ্গ), মুখ্য (মুখ), অব্য (অবি – মেষ), গব্য (গো), বিশ্য (বিশ্ = লাক), দ্বুর্য (দুর্ – দ্বার), নর্য (নৃ), বৃষ্ণ্য (বীর্য্যবান্, বৃষন্) ; স্বরাজ্য (autocracy ; স্বরাজ্), সুবীর্য (বহু-সৈন্য-বান্, সুবীর), বিশ্বজন্য (– সকল লোকের), বিশ্বদেব্য (সকল দেবের), (বিশ্বদেব), ময়ূরশেপ্য (ময়ূর-লেজা)।

খ। প্রথমাক্ষরে পশ্চাদ্গত স্বর। কণ্ঠ্য (কণ্ঠ), স্কন্ধ্য (স্কন্ধ), ব্রত্য, (ব্রত), মেঘ্য (মেঘ), পিত্র্য (পিতৃ), প্রতিজন্য (প্রতিজন – বিপক্ষ)। [হিরণ্যয় (হিরণ্য), গব্যয়, অব্যয়, অব্যয়।]

গ। অন্ত্যোদাত্ত। দিব্য (দিব্), সত্য (সন্ত্), ব্যাঘ্য (ব্যাঘ্র), কব্য (কবি), গ্রাম্য (গ্রাম), সোম্য, অনেনস্য, (অনেনস্), অদক্ষিণ্য (দক্ষিণা)।

ঘ। অন্ত্য-স্বরিত। এই শ্রেণীর শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। বিশ্য (বিশ্), হৃদ্য, বিদ্যুত্য (বিদ্যুৎ), রাজন্য (রাজন্), দোষণ্য (দোষন্ – বাহু), শীর্ষণ্য (শীর্ষন্), কর্মণ্য (কর্মন্), ধন্বন্য (ধন্বন্ = সমভূমি), নমস্য (নমস্) ত্বচস্য (ত্বচস্ = চর্ম্ম), বর্হিষ্য, আয়ুষ্য (আয়ুস্), ভসদ্য (ভসদ্ = পাছা), প্রাচ্য (প্রাঞ্চ্), অর্যম্য (অর্যমন্)॥ হনব্য (হনু), বায়ব্য (বায়ু), পশব্য (পশু), ইষব্য (ইষু), মধব্য (মধু), অপ্সব্য (অপ্সু = জলে, ৭মী), রজ্জব্য (রজ্জু), শরব্যা (শরু, বাণ), নাব্যা, নাব্য (নৌ = নৌকা), প্রাশব্য (প্র + অশ্ ধাতু), ঊর্জব্য (ঊর্জ্ – বৃদ্ধি, ভোজ্য)॥ * জনিতব্য (জনিতৃ + য), কর্তব্য, হিংসিতব্য। বক্তৃ, ধাতৃ, গাতৃ, দাতৃ প্রভৃতির উত্তর য প্রত্যয়ে বক্তব্য, ধাতব্য, গাতব্য, দাতব্য প্রভৃতি শব্দ।

স্বর্গ্য (স্বর্গ), দেবত্য, (দেবতা), প্রপথ্য (প্রপথ – পথপ্রদর্শক), বুধ্ন্য (বুধ্ন – গৃহভিত্তি); জঘন্য (– পশ্চাদ্ভাগীয়,—জঘন,) বরুণ্য (বরুণ), বীর্য (বীর), উদর্য (উদর), উৎস্য (উৎস), উর্বর্য (উর্বরা – কৃষ্টভূমি), স্বাহ্য (স্বাহা)।

...। অধিকক্ষ্য (কক্ষের নিকট), উপপক্ষ্য (পার্শ্বদেশে), আলায় (আলয়), উপতৃণ্য (তৃণসমীপস্থ) ॥

চা অন্ধান্ত্য (নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে), উপমাস্য (প্রতিমাসে), অভিনভ্য (আকাশাভিমুখী), অন্তঃপর্শব্য (পাঁজরার মধ্যে), অধিগর্ত্য (শকটাসনে) ।

কৃদন্তের সহিত প্রভেদবিহীন য-প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত। চৈত্য (চিত), ভব্য, হব্য, মর্জ্য, যোধ্য, মাদ্য, বাচ্য, ভাব্য, প্রশস্য, উপসদ্য, বিহব্য, অনাপ্য, অনপবৃজ্য। ইত্য, স্তুত্য, ভৃত্য। চর্কৃত্য, নব্য, হব্য, অনুকৃত্য। কার্য, সমাপ্য, আদ্য (ভোজ্য), অতিতার্য (অতিতরণীয়), নীবিভার্য (নীবিতে বহনীয়), প্রথম-বাস্য (প্রথমে পরিধেয়); পরিবর্গ্য (পরিবর্জনীয়), অবিমোক্য (বিমোচনের অযোগ্য) । ব্রহ্মজ্যেয়, বসুদেয়, ভাগধেয়, পূর্বপেয়, শতসেয়, অভিভূয়, দেবহূয়, মন্ত্রশ্রুত্য, কর্মকৃত্য, বৃত্রতূর্য, হোতৃবূর্য, অহিহত্য, সত্রসদ্য, শীর্ষভিদ্য, ব্রহ্মচর্য, নৃষহ্য। ঋতোদ্য, সহশেষ্য, সধস্তুত্য। কৃত্যা, বিদ্যা. ইত্যা, অগ্নিচিত্যা, বাজজিত্যা, মুষ্টিহত্যা, দেবযজ্যা। সূর্য (স্ত্রী° সূর্যা), আজ্য, পুষ্য, নভ্য, যুজ্য, গৃধ্য, ঈর্য, অর্য, আর্য, মর্য, মধ্য ॥

ইয় প্রত্যয়। ঈয় প্রত্যয়। অভ্রিয় (অভ্রিয়—মেঘজাত, অভ্র), ক্ষত্রিয় (শক্তিমান্, ক্ষত্র), যজ্ঞিয় (যজ্ঞ), হোত্রিয় (হোত্র), অমিত্রিয় (অমিত্র)। অগ্রিয় (অগ্রিয় অগ্র), ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রের, ইন্দ্র), ক্ষেত্রিয় (ক্ষেত্রবিষয়ক, ক্ষেত্র)। শ্রোত্রিয় (শ্রোত্র—বিদ্যা), ঋত্বিয়, (ঋত্বিয়, সাময়িক, ঋতু) ॥ আর্জিকীয়, গৃহমেধীয়, পর্বতীয় (পর্বত্য), অন্তরাত্রীয়, পঞ্চবাতীয়, মার্জালীয় ॥ দ্বিতীয়, তৃতীয়, তুরীয় ॥

এয় (এয্য) প্রত্যয়। আর্ষেয় (—ঋষিবংশধর, ঋষি), জানশ্রুতেয় (জনশ্রুতির পুত্র), সারমেয় (সরমার বংশ, সরমা), শাতবনেয় (শতবনির বংশধর), রাথজিতেয় (রথজিৎপুত্র)। আস্নেয় (রক্তবিষয়ক, অসন্), বাস্তেয় (বস্তিসম্বন্ধীয়, বস্তি—bladder), পৌরুষেয় (পুরুষ-যোগ্য)। সভেয় (সভা), দিদৃক্ষেয় (দর্শনীয়, দিদৃক্ষা) ॥ ভাগিনেয় ॥ সপথেয্য (সপথ-প্রাপ্ত), সহশেয্য ॥

এন্য প্রত্যয়। অরণ্য॥ বীরেণ্য (পুরুষবান্, বীর), কীর্তেন্য (কীর্তি; স্তুতি)॥ অনভিশস্তেন্য (অভি শাস্তি), বিজেন্য॥ অধিকাংশেই স্বরস্থিতি 'এন্য'। অনেক স্থলে 'এনি অ'। ঈড়েনিঅ, চরেণিঅ, দৃশেনিঅ, ভূবেণ্য, যুধেনিঅ, যংসেন্ত। মর্মজেন্ত, বাবৃধেন্ত, দিদৃক্ষেণ্য, শুশ্রূষেণ্য, পপৃক্ষেণ্য॥

আয্য প্রত্যয়। বহুপায্য (অনেকের পালনকারী), নৃপায্য (নররক্ষক), কুণ্ডপায্য (নাম), পুরুমায্য (নাম), পূর্ব্বপায্য (প্রথম পেয়), মহয়ায্য (উপভোগ). রসায্য (খিট-খিটে, neruons), উত্তমায্য (পর্ব্বতশিখর)। অলায্য, অকায্য, প্রহায্য (দূত), প্রবায্য॥

আয়ন প্রত্যয়। দাক্ষায়ণ, রামায়ণী, আমুষ্যায়ণ (অমুকের অপত্য), স্তম্বায়ন (-যন)। উক্ষ্ণায়ন (ঋ°)। কাণ্বায়ন (সম্বোধন, কণ্ব-পুত্র)। অপত্যার্থ প্রত্যয়॥

আয়ী প্রত্যয়। শব্দসংখ্যা অল্প। অগ্নায়ী (অগ্নি-পত্নী), মনাবী (মনুপত্নী)।

ই প্রত্যয়। প্রথমাক্ষরে স্বর। আগ্নিবেশি, পৌরুকুৎসি, প্রাতরাদনি, সাংবরণি, প্রাহ্রাদি, সারথি॥ তপুষি, শুচন্তি, ভুবন্তি॥

ক প্রত্যয়। বহুল প্রয়োগ। মূলতঃ বিশেষণার্থক, পরে অল্পার্থক (diminutive), তারপর নানা অর্থে প্রয়োগ। উক, অক ও ইক প্রত্যয়ে বোধ হয়, এই 'ক' আছে। অন্তক (অন্ত), বল্হিক (বল্হি; বাল্‌খ্-প্রদেশীয়), আণ্ডিক (অণ্ড, ডিম্ব যাহার আছে), সূচিক (শূচি, সূচি-যুক্ত, বিদ্ধকারী), উর্বারুক (উর্বারু; লাউ বা শসা ফল), পর্যায়িক (পর্য্যায়, ক্রমিক)। একক, দ্বক, ত্রিক, অষ্টক, তৃতীয়ক (তৃতীয় দিবসের)। অস্মাক (আমাদের), যুষ্মাক (তোমাদের), * মমক (আমার), অন্তিক (নিকটবর্ত্তী), অনুক (পরবর্ত্তী), অবকা (উদ্ভিদ্‌বিশেষ), রূপক (রূপ; মূর্ত্তিযুক্ত), বভ্রুক (বভ্রু—পীতবর্ণ)॥ অল্পার্থে। অর্ভক, কনীনক ও কুমারক (বালক), কনীনকা বা কনীনিকা (বালিকা), পাদক (পা), পুত্রক, রাজক (রাজপুত্র), শকুন্তক (ছোট পাখী)। অল্পক, অলকম্ (অলম্)॥

* সর্ব্বনাম স্বর অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ্য ও বিশেষণ সহ। অন্তক (গৃহ), নাসিকা, মক্ষিকা, অবিকা (মেষী), ইষুকা (বাণ), দূরক (দূরস্থ), সর্বক (সব, সমগ্র), ধেনুকা (ধেনু), নগ্নক (নগ্ন), বদ্ধক (বদ্ধ ; বন্দী), অনস্তমিতকে (সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে), বম্রক (পিপীলিকা), অর্ভক (ছোট), শিশুক শিশু), এজৎক (সকম্প), অভিমাদ্যৎক (মত্ততাপ্রাপ্ত), পতয়িষ্ণুক (উড়ন্ত)।

অল্পক (ক্ষুদ্র, অল্প), বিমন্যুক (ক্রোধ-নাশক), বিক্ষিণৎক (নাশকারী), প্রবর্তমানক প্রবর্ত্তনকারক, বিকাসক), বিক্ষীণক (হত, নষ্ট, 'ক্ষীণ')।

অনক্ষিক (চক্ষুহীন), অত্বক (ত্বক্-হীন), অরেতস্ক (বীর্য্যহীন, বীজশূন্য), বহুহস্তিক (বহু হস্তী যার), ইয়ত্তক, ইয়ত্তিকা।

বাসন্তিক (বসন্তকালীন), বার্ষিক (বর্ষাকালীন), হৈমন্তিক, কৈরাতিকা (কিরাতদিগের)॥

অনুনাসিক [ন্ বা ম্] যুক্ত প্রত্যয়।

আন—তকবান, ভৃগবান, বসবান। * ইন্দ্রাণী, বরুণানী ; উশীনরাণী, পুরুকুৎসানী, মুদ্গলানী, ঊর্জানী॥ পতি-পত্নী ; দেবপত্নী, সিন্ধুপত্নী। পরুষ-পরুষ্ণী [কর্কশা, অমসৃণদেহা]। পূর্ব্বোদাহৃত 'ক্নী' প্রত্যয়। *

ঈন—অপাচীন, নীচীন, প্রাচীন, অর্বাচীন [অর্বাচীন], প্রতীচীন (প্রতীচীন), সমীচীন। সংবৎসরীণ, জ্ঞাতকুলীন (যাহার কুল জানা আছে), মাকীন [আমার]।

এন—সামিধেন [স্ত্রী° সামিধেনী]—'সমিধ' হইতে।

ইন—পরমেষ্ঠিন, মলিন। শাকিন, বর্হিন, ভজিন, শুষ্মিণ।

ন, অন—শূরণ [বীরতুল্য], কস্কন, শশ্রণ, দদ্রুণ ; স্ত্রৈণ, চৌত্ন [উত্তেজক], দ্রোণ [দ্রু = কাঠ, গাছ]।

ইম, ত্রিম—খনিত্রিম [খনন দ্বারা কৃত], কৃত্রিম, পূত্রিম, অগ্রিম।

* সা, প, প, ১৩২৯।১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ম—অধম, অপম, অবম, উপম, পরম, মধ্যম, চরম, অন্তম। প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ॥

ম্ন—দ্যুম্ন (উজ্জ্বলতা), নৃম্ন (পুরুষত্ব), নিম্ন (গভীরতা), সুম্ন (মঙ্গল)।

ময় প্রত্যয়। মনস্ময়, নভস্ময়, অয়স্ময়, মৃণ্ময়, তেজোময়, অদোময়, আপোময়, যজুর্ময়, এতন্ময়, বাঙ্ময়, অশ্মন্ময়, হিরণ্ময়, শুময় [উৎকৃষ্ট আকারের], কিম্ময় [কিসের তৈরী]।

র প্রত্যয়। স্বরস্থিতি নানারূপ। পাংসুর [ধূলিময়], অশ্রীর [শ্রীহীন, অশ্লীল], ধূম্র [ধূম্রবর্ণ, ধূম]। আগ্নীধ্র (অগ্নিপ্রজ্বালনকারী, অগ্নীধ্], শাঙ্কুর [শঙ্কু, বধ-যূপ-সদৃশ, হার্ড-কাঠের মত], মেধির [মেধাবী], রথির [রথস্থ], কর্মার [কামার], অচ্ছের [মৈপং]। অপর; অধর, অবর উপর, অন্তর ॥

ল প্রত্যয়। পূর্ব্ব প্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন। বহুল, মধুল, (মধুর), জীবল (চঞ্চল, কর্ম্মঠ, lively), অশ্লীল (অশ্রীর ; অভব্য), মাতুল (মাতৃ হইতে ; মাতৃসম্পর্কীয়)। পরবর্ত্তী যুগের লু প্রত্যয় ইহারই আকার-ভেদ। দয়ালু।

ব প্রত্যয়। অর্ণব (ঊর্ম্মিযুক্ত), কেশব (কেশবান্), রাস্নাব (মেখলাবান্), অজ্রিব (মসৃণ, পিচ্ছিল), শন্তিব (শান্তিকর), শ্রদ্ধিব (শ্রদ্ধা-যোগ্য, বিশ্বাস্ত)।

কৃষীবল (কৃষি হইতে ; কৃষক), ঊর্ণাবল (লোমযুক্ত), রজস্বলা, ক্রবিয় (দারুপাত্র)।

পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা), ভ্রাতৃব্য (ভাই-পো, শত্রু)।

শ প্রত্যয়। রোমশ, লোমশ, এতশ-এতশ, (নানাবর্ণের), অর্বশ-অর্বশ (সত্বর), বভ্রুশ—বভ্রুশ—কপিশ (পীতবর্ণ), যুবশ (যৌবনবান্), বারিশ, হরীমশ, কশ্মশ, [কলশ, গিরিশ, কর্কশ, বালিশ] ॥

ইন্ প্রত্যয়। প্রত্যয় স্বর—'ইন্'। অশ্বিন্ (অশ্বী), ধনিন্, পক্ষিন্, ভগিন্ (ভাগ্যবান্), বজ্রিন্, শিখণ্ডিন্ (শিখাবান্), হস্তিন্ (হস্তদ্বয়বান্), ষোড়শিন্ (ষোড়শবর্ষীয়), গর্দভ-

রাদিন্, ব্রহ্মবর্চসিন্ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট আচারবান্), সাধুদেবিন্ (দক্ষ অক্ষক্রীড়াকারী, ভাগ্যবান্ খেলোআর), কুচিদর্থিন্ (যাহার কাজ সর্ব্বত্র)। মনীষিন্ (মেধাবী), শিখিন্ (শিখাবান্), ঋতায়িন্ (ঋতাবান্)॥ অভিমতিন্, অর্চিন্, খাদিন্, বর্মিন্, খনিন্, রেতিন্ (বীর্য্যবান্), শবসিন্, মনসিন্, বয়সিন্, পরিস্রজিন্ (স্রগ্‌বান্), হিরণিন্॥ প্রশ্নিন্, গর্ভিন্, জূর্ণিন্, ধূমিন্, স্থানিন্, হোমিন্, মৎসরিন্, পরিপন্থিন্, প্রবেপনিন্, অর্কিন্,-ভজিন্,-সঙ্গিন্,-রোকিন্॥ ধন্বায়িন্, স্তকায়িন্, আততায়িন্, প্রতিহিতায়িন্, মরায়িন্, ঋতায়িন্, স্বধায়িন্॥ প্রব্রাজিন্, প্রস্তন্দিন্॥ শাকী, সরী, ইরী (ঋ° এক একবার)॥ বনিন্ (বৃক্ষ, বনস্পতি, সন্ন্যাসী), কপোতিন্ (কপোতবৎ)॥

মিন্ প্রত্যয়। ইস্মিন্, ঋগ্মিন্, বাগ্মিন্। গ্‌=জ্‌=চ্‌॥

বিন্ প্রত্যয়। প্রত্যয় স্বর। ঋগ্বেদে ১০টী বিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ আছে। পরযুগে ইহার অধিক ব্যবহার হইয়াছে। অর্থের হিসাবে বিন্=মিন্=ইন্। নমস্বিন্ (ভক্তিমান্), তপস্বিন্ (তাপযুক্ত), তেজস্বিন্ (উজ্জ্বল), যশস্বিন্, রেতস্বিন্, এনস্বিন্, হরস্বিন্। শতস্বিন্, স্রোতস্বিন্, রূপস্বিন্, অনুপাত ভ্রমে সকারযুক্ত। মাবিন্, মেধাবিন্, মায়াবিন্, সভাবিন্, অষ্ট্রাবিন্ (ডাঙশের বশ, অঙ্কুশের অনুবর্ত্তী), দ্বয়াবিন্ (কুটিল), উভয়াবিন্ (উভয়ের মালিক), আময়াবিন্, আততাবিন্। বাগ্‌বিন্, ধ্রুবদ্‌বিন্, আত্মন্‌বিন্॥

বন্তু প্রত্যয়। মূল শব্দে সাধারণতঃ বিনা পরিবর্ত্তনে স্বরস্থিতি। কেশবন্তু, পুত্রবন্তু, সখিবন্তু, প্রজননবন্তু, পুণ্ডরীকবন্তু, হিরণ্যবন্তু, অপূপবন্তু, রাজন্যবন্তু (ক্ষত্রিয়ের সহিত কৃতবন্ধুত্ব), প্রজাবন্তু, উর্ণাবন্তু, দক্ষিণাবন্তু, সপ্তর্ষিবন্তু, শচীবন্তু, তবিষীবন্তু, পত্নীবন্তু, ধীবন্তু (ভক্তিমান্), দ্যাবাপৃথিবীবন্তু, বিষ্ণুবন্তু (বিষ্ণুর সহিত), হরিবন্তু (স্বর্ণবর্ণ), আবৃবন্তু (যাহা এই দিকে ফিরিতেছে), আশীর্বন্তু (দুগ্ধমিশ্র), স্বর্বন্তু (ঐশ্বর্য্যবান্),

শরদ্বন্ত্ (বহু বৎসরের), পুংস্বন্ত্ (পুরুষবান্), পয়স্বন্ত্ (ধনী), তমস্বন্ত্ (অন্ধকার), ব্রহ্মণ্বন্ত্ (পূজার্চনার সহিত), রোমণ্বন্ত্ (কিন্তু রোমবন্ত্, লোমবন্ত্, বৃত্রহবন্ত্), ককুভ্বন্ত্।

প্রত্যয় স্বর—অগ্নিবন্ত্, রয়িবন্ত্ (ধনী), নৃবন্ত্ (পুরুষত্ববান্), পদ্বন্ত্ (চরণবান্), নস্বন্ত্ (নাক-ওয়ালা), আসন্বন্ত্ (মুখযুক্ত), শীর্ষণ্বন্ত্ (মাথাওয়ালা)।

অশ্বাবন্ত্ (অশ্ববন্ত্), সুতাবন্ত্ (অভিষুত সোমযুক্ত), বৃষ্ণ্যাবন্ত্ (শক্তিমান্, বীর্য্যবান্), শক্তীবন্ত্, স্বধিতীবন্ত্ (পরশু বা কুঠার আছে যার), ঘৃণীবন্ত্ (উষ্ণ), বিষূবন্ত্ (বিভিন্ন প্রকার, বিষু—পৃথক্)।

অনিয়মিত। স্-যুক্ত। ইন্দ্রস্বন্ত্, মহিস্বন্ত্। ন্-যুক্ত। বনস্বন্ত্, বৃধস্বন্ত্, বধস্বন্ত্, গর্তস্বন্ত্, মাংসস্বন্ত্। হ্রস্বমূল। মায়বন্ত্, যাজ্যবন্ত্, পুরোনুবাক্যবন্ত্, আমিক্ষবন্ত্।

অনিয়মিত স্বর। কৃশনাবন্ত্ (কৃশন—মুক্তা ?), অন্তর্বন্ত্ (গর্ভিত), বিষূবন্ত্।

মাবন্ত্ (আমার মত), ঈবন্ত্, কীবন্ত্, নীড়বন্ত্, নীলবন্ত্ (কৃষ্ণবর্ণ), নৃবন্ত্ (পুরুষের ন্যায়), পৃষদ্বন্ত্ (চিহ্নিত, বিন্দু-যুক্ত), কৈতবন্ত্ (রাজকুমারের ন্যায়)।

বিবস্বন্ত্ (বিবস্বন্ত্—উজ্জ্বল, প্রভাবান্), অনুপদস্বন্ত্, অর্বন্ত্, পিপিষ্বন্ত্, যহ্বন্ত্।

পৃষদ্বন্ত্ (পৃষদ্)। তপস্বন্ত্ (লৌকিক সংস্কৃতে তপোবন্ত্), বিদ্যুন্বন্ত্।

বন্ প্রত্যয়। অল্প প্রয়োগ। স্বরস্থিতি অনিয়মিত—প্রায় মূল শব্দের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব-স্বরে। ঋণাবন্—ঋণবন্, ঋতাবন্ (স্ত্রী° ঋতাবরী), ঋমাবন্, ধিতাবন্, সত্যাবন্, সুন্নাবরী, মঘবন্। সূনৃতাবরী, স্বধাবন্ (-বরী)। অমতীবন্, অরাতীবন্, শ্রুষ্টীবন্, মুষীবন্, (কার্ষীবণ)—কৃষীবন্। ধীবন্, অথর্বন্, সমদ্বন্, সহোবন্ (সহাবন্), হার্দ্বন্ (হার্দিবন্), ইদ্ধন্বন্ (ইদ্ধনবন্), সনিত্বন্ (সনিতিবন্)।

বেশী প্রচলিত—ঋতাবন্ (আবেস্তা সাহিত্যে সমধিক প্রচলন), মঘবন্, অথর্বন্।

মন্ত্‌ প্রত্যয়। প্রাচীন সাহিত্যে ইহারও প্রয়োগ অল্প। মূল শব্দের শেষ অক্ষরে সাধারণতঃ স্বরস্থিতি। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রেই স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে মূল শব্দের স্বর অবিকৃত থাকে। কণ্বমন্ত্‌, যবমন্ত্‌ (যব-বহুল), অবিমন্ত্‌ (মেষবান্‌), অশনিমন্ত্‌, ওষধীমন্ত্‌, বাশীমন্ত্‌ (কুঠার সহিত; বাশী—কুঠার), বসুমন্ত্‌ (অনেক ভাল জিনিস যার আছে), মধুমন্ত্‌ (মধুর), ত্বষ্টৃমন্ত্‌ (ত্বষ্টার সহিত), হোতৃমন্ত্‌ (হোতা আছে যে দেশে), আয়ুষ্মন্ত্‌, জ্যোতিষ্মন্ত্‌। উল্কুষীমন্ত্‌ (উল্কার সহিত), পীলুমন্ত্‌, প্রসূমন্ত্‌ (পল্লবযুক্ত), গোমন্ত্‌ (গো-বহুল), গরুত্মন্ত্‌ (পক্ষবান্‌), বিহুত্মন্ত্‌ (হুতি সহ), ককুদ্মন্ত্‌, বিদ্যুন্মন্ত্‌, ককুন্মন্ত্‌, বিরুক্মন্ত্‌, হবিষ্মন্ত্‌।

প্রত্যয় স্বর। অসিমন্ত্‌ (ছুরি অনেক আছে যার), অগ্নিমন্ত্‌, ইষুধিমন্ত্‌, (তূণযুক্ত), পশুমন্ত্‌, বায়ুমন্ত্‌, পিতৃমন্ত্‌ (পিতৃমন্ত্‌—পিতৃগণ সহ), মাতৃমন্ত্‌ (যার মা আছে)। স্বিয়ীমন্ত্‌, এণীমন্ত্‌, হিরীমন্ত্‌, জ্যোতিষীমন্ত্‌, তবিষীমন্ত্‌। আশুমৎ—ক্রিয়াবিশেষণ।

তা প্রত্যয়। প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরে নিয়মিত স্বরস্থিতি। দেবতা, বীরতা, পুরুষতা, অগ্নিতা, অপশুতা (পশুহীনতা), বন্ধুতা, বসুতা, নগ্নতা, সুবীরতা, অনপত্যতা, অগোতা, (গো-হীনতা), অব্রহ্মতা, অপ্রজস্তা (অপত্যের অভাব), সুনৃতা (সুনর হইতে)। মমতা (স্বার্থবত্তা), ত্রেতা (triplicity—ত্রিগুণিততা)। জনতা—জনসমূহ॥

তাতি, তাৎ প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের কেবল বেদেই প্রয়োগ। প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরে সুর। অরিষ্টতাতি (অবিরতা), অযক্ষ্মতাতি (নীরোগতা), গৃভীততাতি (গৃহীত বা বন্দী অবস্থা), জ্যেষ্ঠতাতি (প্রভুত্ব), দেবতাতি (দেবত্ব), বসুতাতি (ধনবত্তা), শংতাতি (শুভ, সৌভাগ্য), সর্বতাতি (সমগ্রতা)। স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম সহ—অস্তুতাতি (গৃহ), দক্ষতাতি (দক্ষতা)। উপরতাৎ, দেবতাৎ, বৃকতাৎ, সত্যতাৎ, সর্বতাৎ—এই কয়টী মাত্র 'তাৎ' প্রত্যয়ের উদাহরণ। সবগুলিই ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের পর তাৎ প্রত্যয় পাওয়া যায় নাই।

ত্ব প্রত্যয়। সর্ব্বত্র প্রত্যয় স্বর। অমৃতত্ব (অমরতা), দেবত্ব, সুভগত্ব (সৌভাগ্য), অহমুত্তরত্ব (আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ), শুচিত্ব, পতিত্ব, তরণিত্ব (অধ্যবসায়, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি), দীর্ঘায়ুত্ব, শত্রুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বৃষত্ব, (বীর্য্যবত্তা), সাত্মত্ব (সং+আত্মা+ত্ব), মঘবত্ব (দানশীলতা), রক্ষত্ব (ইন্দ্রজালবিদ্যা)। অনাগাত্ব, অপ্রজাত্ব, সৌপ্রজাত্ব, সৌভগত্ব, প্রত্যনত্ব, সধনিত্ব, বসতী-বরিত্ব (তৈ° সং), রোহিণিত্ব (তৈ° ব্রা°)।

একত্র ত্ব+তা প্রত্যয়—ইষিতত্বতা (ঋ°=উত্তেজিততা), পুরুষত্বতা (ঋ°—মনুষ্যত্ব)। প্রথমটী একবার, দ্বিতীয়টী দুইবার আছে।

ত্বন প্রত্যয়। প্রয়োগ ঋগ্বেদেই প্রায় সীমাবদ্ধ। অন্ত্যাক্ষরে স্বর। অর্থ—'ত্ব'। কবিত্বন, জনিত্বন, পতিত্বন, মর্ত্যত্বন, মহিত্বন, বৃষত্বন, সখিত্বন।

তর ও তম প্রত্যয়। বৃত্রতর, পুরুতম (ঋ°; স্বরস্থিতি বিধিবিগর্হিত। মৃড়য়ত্তম। শশ্বত্তম, সংবৎসরতম, শততম,+সহস্রতম। কিন্তু রথীতম, রথীতর; শংতম; তবস্তম, তবস্তর; তপস্বিতর, যশস্বিতম; রত্নধাতম। মদিন্তম, বৃষন্তম। সুরভিন্তম, রয়িন্তম, মধুন্তম। অনিয়মিত রূপ। সুরভিষ্টম, তুবিষ্টম। বৎসতর (রী), অশ্বতর, ধেনুষ্টরী, রথন্তর।

থ প্রত্যয়। ততিথ, কতিথ।

তয় প্রত্যয়। একতয়, চতুষ্টয়, দশতয়, বহুতয়।

ত্য প্রত্যয়। নিত্য, অমাত্য। অপত্য, আবিষ্ট্য, সনুত্য, অপ্ত্য, আপ্ত্য।

ত প্রত্যয়। একত, দ্বিত, ত্রিত। মুহূর্ত্ত। অবত (কূপ)।

ন প্রত্যয়। পুরাণ, বিষুণ, সমান।

তন প্রত্যয়। নূতন, নূত্ন, প্রত্ন, সনাতন, সনত্ন, শশ্বতন। প্রাতস্তন।

বৎ প্রত্যয়। অর্বাবৎ, আবৎ, উদ্বৎ, নিবৎ, পরাবৎ, প্রবৎ, সংবৎ।

কট প্রত্যয়। উৎকট, নিকট, বিকট, প্রকট, সংকট—ব্যাকরণে অন্তোদাত্ত। *

বন—নিবন, প্রবণ। আল—অন্তরাল॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* চিতঃ। ৬।১।১৬২। অন্তঃ উদাত্তঃ স্যাৎ। চিতঃ সপ্রকৃতের্বহ্বকজর্থম্। চিতি প্রত্যয়ে সতি প্রকৃতি-প্রত্যয়সমুদায়স্যান্ত উদাত্তো বাচ্য ইত্যর্থঃ। নভন্তামস্তকে সমে (ঋ ৮।৩৯।১)। যকে সরস্বতীমনু (ঋ ৮।২১। ১৮)। তকৎস্বতে (ঋ ১।১৩৩।৪)।

বেঃ শালচ্ শঙ্কটচৌ। ৫।২।২৮। সংপ্রোদশ্চ কটচ্। ৫।২।২৯।

বৌদ্ধদর্শন

[প্রথমাংশ]

প্রাচীন আখ্যায়িকা বা পৌরাণিক তত্ত্বসমূহ মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সকল অপুষ্ট চিন্তা-প্রবাহ হইতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশেও মনীষিগণের মতে আর্য্যজ্ঞান বেদমূলক। বেদসমূহ আর্য্য-জ্ঞানের কোন্ স্তরের বস্তু, তাহা বলা যায় না। ঋক্‌বেদের স্তব, স্তুতি ও প্রার্থনার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রেরণা ও সাহিত্যিক ভাব আছে এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উহার মধ্যে দর্শন ও ইতিহাসের সামগ্রীও দেখিতে পান। অথর্ববেদে রোগের স্তুতি ও যাদুবিদ্যার মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সজীব বস্তুর মত জ্ঞানের পুষ্টি ও বর্দ্ধন আছে; ইহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা আছে। এক একটি ভাব হইতে এক একটি যুগ এবং এক একটি যুগের ভাব হইতে বিভিন্ন আদর্শের উৎপত্তি। জাতীয়-জ্ঞান যুগের ভাবেই রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ইতিহাস। কোন্ সময়ে উপনিষদের আদর্শগুলি ভারত-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক গণনায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা, মানসিক ও প্রাণন-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ, বহু দেবতা ছাড়িয়া এক মহান্ দেবতার অধিষ্ঠান, স্রষ্টা ও সৃষ্টে, আত্মায় ও পরমাত্মায় এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ঐ যুগের প্রধান লক্ষণ। ঐ যুগের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, জগৎ একটা নির্ম্মিত পদার্থ নহে, উহা ক্রমভাবী বা পরিণাম-সাপেক্ষ। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ছাড়া জড়, শরীর, মন ও নীতিবিষয়ক জিজ্ঞাসাও অনেক আছে। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ ঐ সময়ে বিদ্যার অঙ্গের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

উহার পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, শাকটায়ন, গার্গ্যাচার্য্য, যাস্ক, পাণিনি, জৈমিনি প্রভৃতি বড় বড় ভাষা-রহস্যবিৎ—কেহ ধাতুতত্ত্ব, কেহ ধ্বনিতত্ত্ব, কেহ শব্দ-শক্তি লইয়া ভারতের জ্ঞানসম্পৎ বাড়াইতেছেন এবং তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা এখনও জগতে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তবে উঁহারা বেদ-বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই বেদের মর্য্যাদা রাখিয়া ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; স্বাধীন ও প্রমুক্ত ভাবে করেন নাই। তখনও অথর্ব্ব বেদের রূঢ় বিজ্ঞান দেশকে অধিকার করে নাই। জ্ঞান যতদিন প্রাচীন-ভাব লইয়া চলে, তত দিন উহার স্পষ্ট বিকাশ হইতে পারে না।

আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান-প্রচারের ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদিন উহা খৃষ্টীয় বা হিব্রু বিশ্বাসের অনুগামী ছিল, তত দিন বিজ্ঞান মাথা তুলিতে পারে নাই। হিব্রু আখ্যায়িকা বা শাস্ত্রীয় মতের বিরুদ্ধে কাহারও ভাবিবার অধিকারই ছিল না। স্বাধীন মত

প্রচার করিয়া ডেকার্ট, টাইকো ব্রাহী, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। নূতন মত সত্য হইলেও মানুষ বড় পছন্দ করে না। নূতন মত মনের সহিত সাজাইয়া লওয়া মানুষের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। সেই জন্য সাধারণ লোক প্রাচীন বিশ্বাস লইয়া থাকিতে ভালবাসে। সক্রেতিস দেববিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া গ্রীকেরা তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল।

যাহা হউক, এ সকল অবান্তর বিষয়। নূতন মত লইয়া ভারতে কোন কালে বিশেষ বিপ্লব ঘটে নাই। প্রাচীন মতের সহিত নূতন মতের সামঞ্জস্য করার শক্তি ভারতে আছে বলিয়াই বোধ হয়, নূতন মতের জন্য বিশেষ কোনও অশান্তি হয় নাই। উপনিষৎ-যুগের ভাব হইতে একে একে নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন নূতন তত্ত্ব আসিতে লাগিল। ইহাতে জ্ঞানরাজ্যে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বেদ, ব্রাহ্মণ-কর্ম্মকাণ্ড এবং এমন কি, উপনিষৎও নূতন বিশ্বাসের উপযোগী হইল না। নূতন জ্ঞানের আবাসের জন্য প্রকোষ্ঠ-সকল প্রশস্ত করিতে হইল, নূতন বাতায়ন ও রশ্মিপথ খুলিতে হইল।

ভক্তিবাদ ও অবতারবাদ কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বুদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগের বটে, তবে উহার কঙ্কাল প্রথম কি আকারে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহাভারতীয় যুগে একটা বেদ-বিরোধী ভাব ও যাজক-বিদ্বেষ অনুভব করা যায়। কপিলের প্রকৃতি-বাদ বুদ্ধ-পূর্ব্বযুগের বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতিবাদ এক প্রকার আস্তিক্য-নাস্তিক্য-মত এবং উহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচীন ভাবের বিরোধী। বৃহস্পতির মতও খুব প্রাচীন। তাঁহার শিষ্যেরা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে স্পষ্টভাবেই ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচরের ব্যবসা বলিয়াছেন। ইহার পরের স্তরটা ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের যুগ।

বিজ্ঞানযুগে শারীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি মনীষিগণের শারীর তত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান-প্রণালী, উহার লজিক্ ও প্রেরণা সকলই যেন এই যুগের মত। কপিলের প্রকৃতিবাদ (ন্যাচারালিসম্), কণাদের পরমাণুবাদ (থিওরি অব্ ম্যাটার), গোতমের ন্যায় (লজিক্) ও মনস্তত্ত্ব (সাইকোলজি) সকলই ঐ যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। সকল বিষয়েই বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। ঐশী শক্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রাকৃতিক ব্যাপারের কার্য্য, কারণ, ব্যাপ্তি ও সম্বন্ধ অন্বেষণ করাই তখনকার ধরণ হইয়াছিল। প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখাই বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি। "ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রমথবা কিং পূর্ব্বমিতি সংশয়ঃ" অর্থাৎ জ্ঞাতা আগে বা বস্তু আগে, এ বিষয়ে সংশয় আছে। চরকসংহিতার এই শ্লোকাংশ হইতে তখনকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ধরণটাও কতকটা ঐ রকমের। লাপ্লাস্ তাঁহার "মিক্যানিক সেলেস্ত" বা বিশ্বযন্ত্র নামক বিখ্যাত পুস্তকে সৃষ্টিকর্ত্তার উল্লেখ করেন নাই। উহা পূর্ব্বতন প্রথার বিরোধী হওয়াতে সম্রাট্ নেপোলিয়ন লাপ্লাস্‌কে ঐ ত্রুটির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে লাপ্লাস্ উত্তর দেন যে, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে "সৃষ্টিকর্ত্তা-বাদ" আরোপ করার কোনও আবশ্যক হয় নাই।

...পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিম্না-বিরাটের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তখনকার সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্ম্মের একটি নূতন কেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কর্ম্ম-শব্দের নূতন অর্থ আবশ্যক হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বেদ ও উপনিষৎকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তিবেজ্জসুত্ত (সংস্কৃত ত্রৈবিদ্য-সূত্র) হইতে জানা যায়। বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দুই জন ব্রাহ্মণ-পুত্র প্রাচীন রীতি অনুসারে গুরুগৃহে উপনিষদ্-বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের খ্যাতি শুনিয়া, তাঁহার নিকট কোশল দেশে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। অনেক বাদানুবাদের পর বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, নানা ব্রাহ্মণ নানা প্রকার শিক্ষা দেন। অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, ইহাঁদের উপদেশ-প্রণালী প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র। অন্ধেরা পরস্পর বেণীর মত সংযুক্ত হইলেও যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, কোন্‌টা দক্ষিণ, কোন্‌টা উত্তর, কিছুই বুঝিতে পারে না, ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ভাষাও সেইরূপ অন্ধের ভাষা। তাঁহাদের উপদেশ হাস্যাস্পদ এবং উহা কেবল শব্দমাত্র, বৃথা আড়ম্বর ও নিরর্থক। বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সূর্য্য ও সোমের পূজা করেন এবং যে দিকে উহাঁদের উদয় অস্ত হয়, সেই দিক্ যুক্তকরে প্রদক্ষিণ করেন, ইহা তুমি জান।" বাশিষ্ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়"। বুদ্ধ বলিলেন, "তাঁহারা কি সূর্য্য ও সোমের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের সহিত একীভূত হন?" বাশিষ্ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়।" বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, দৃশ্য বস্তুর উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত মিলিত হইতে পারেন না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মকে তাঁহাদের সাত পুরুষ কেহ কখনও দেখেন নাই, সেই ব্রহ্মের সহিত কি করিয়া মিলিত হইবেন? অতএব ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহা অর্থশূন্য নহে কি?"

"মনে কর বাশিষ্ঠ, যদি কোন লোক কোনও সুন্দরীকে না দেখিয়া বলে যে, এই স্থানের শ্রেষ্ঠা রূপসীকে আমি ভালবাসি। অথচ সে তাহার নাম জানে না; সে লম্বা, কি বেঁটে, তাহার বর্ণ কাল, কি গৌর এবং সে কোন্ জনপদে বাস করে, তাহাও জানে না। এরূপ স্থলে সে লোকটির কথাবার্ত্তা মূর্খের মত নহে কি? ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি দেবগণকে না জানিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরই কি ব্রাহ্মণ বলে? এই স্তব, স্তুতি, কামনা ও প্রশংসা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মের সহিত মিলিবেন?"

বুদ্ধ আরও বলিলেন, "আমাদের এই পাঁচ ইন্দ্রিয় কুপথগামী; কিন্তু ত্রিবেদজ্ঞেরা উহাই লইয়া আছেন। তার পর কামনা, দ্বেষ, অলসতা, অহংকার, সংশয়, এই কয়টি আবরণ ও প্রতিবন্ধক ত আছেই। এইগুলিও ত্রিবেদজ্ঞদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। দেখ বাশিষ্ঠ! ব্রহ্ম প্রাচীনগণের মতে দার-শূন্য, রাগ-দ্বেষশূন্য এবং শুদ্ধ; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কি তাহার ঠিক বিপরীত নহেন? এরূপ ব্রাহ্মণ কি করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনটি জ্ঞান বলিতে গেলে শুষ্ক মরুভূমি, জঙ্গল ও বিনাশ।"

এই ভাবের উক্তি ব্রাহ্মণবর্গ প্রভৃতি অপরাপর স্থানেও আছে এবং বুদ্ধদেব

প্রাচীন ধর্ম্মের চিত্র দেখাইয়া বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজকে নিজমত সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে বুদ্ধের সময়ে ভারতের দৃষ্টিকেন্দ্র কিরূপ ছিল, তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। বৈদিক ধর্ম্ম তখন অনুষ্ঠান-প্রধান হইয়াছিল। কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপে প্রাণের পিপাসা মিটে না এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয় না। রস ও জ্ঞানের মিলনে ধর্ম্ম। অনুষ্ঠানে বা কর্ম্মে কতকটা রসের তৃপ্তি হয়, কিন্তু উহাতে জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না। জ্ঞানের তৃপ্তির জন্য প্রাচীনকে আশ্রয় করিয়া সমাজে কতকগুলি নূতন আদর্শ ও নূতন অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম দেখা দিল বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত প্রাচীন-দ্বেষী বলিয়া, বোধ হয়, সার্ব্বজনীন হইতে পারিল না। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ ব্যতীত এই গুরুতর কার্য্য হওয়া সম্ভব ছিল না। বুদ্ধ এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি ভারতের অন্যতম অবতার।

বৌদ্ধ কল্‌চার বাহিরের বস্তু নহে,—ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটা পর্য্যায়, একটা প্রকার বা একটা রূপ। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার মত উহা বিদেশীয় আমদানি নহে। বৌদ্ধ-সভ্যতার মূল ভারতের ভিতরে, উহা বৈদিক তন্ত্রেরই একটা ধারা। বৈদিক নিদিধ্যাসন ও ধ্যান বৌদ্ধ সাধন-তত্ত্বের মূল মন্ত্র। বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা অসদ্‌বাদও বহু-প্রাচীন, উহা বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বের জিনিস। উপনিষদের পারিভাষিক, উপনিষদের ধরণ বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধের জড়তত্ত্ব ও মানস তত্ত্ব উপনিষৎ হইতে লওয়া বলিলে দোষের হয় না। বৌদ্ধের সাধন অঙ্গেরও উৎপত্তি উপনিষৎ হইতে পাওয়া যায়। অপ্, অনল, বায়ু প্রভৃতি জড়তত্ত্ব বেদান্ত-যুগের কল্পনা। নাম-রূপ, চিত্ত, সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান প্রভৃতি বৈদান্তিকের পরিভাষা, * বৌদ্ধসূত্রে ও অভিধর্ম্মের মূল তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপনিষদের শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি অঙ্গ † বৌদ্ধদের শীল ও আচরণ গঠনের প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে প্রজ্ঞা উপনিষদে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, বৌদ্ধ তন্ত্রেও উহার সেই স্থান। বৌদ্ধের "দৃষ্টি" উপনিষদেরই দৃষ্টি। উপনিষৎ মতে হৃদয় মনের স্থান, বৌদ্ধেরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ আরও বৌদ্ধ-মার্গের অনেক বিষয় প্রাচীন হইতে টানা যাইতে পারে এবং যথাস্থানে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ বহু বিস্তৃত। সাময়িক "কলচার" বুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ-প্রণালী য়িহুদী প্রফেট্ বা জরথুস্ত্রের মত নহে। যে সকল দুষ্ট সংস্কার তখন বর্ত্তমান ছিল, তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন। ধর্ম্মের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ, ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, সেই জন্য তিনি শিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি অর্থাৎ চিত্তের ব্যাপার সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সূত্র ও অভিধর্ম্ম মানসিক বিশ্লেষের উপর

* কৌষীতকি ও ঐতরেয়, ৩য় অধ্যায়।

† তৈত্তিরীয়—১ম বল্লী।

প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিক ক্রিয়াসমূহ বৌদ্ধ গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় নিরাকরণ করা হইয়াছে। মনের স্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ, মনসিকার, একাগ্রতা, ধ্যান, কুশল, অকুশল, শীল প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের যথাযথ বর্ণনা আছে। দুঃখের বিষয়, এখনও অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদেই পাওয়া যায়, মূল গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্লভ।

এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েরই আলোচনা হইবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এখন যেমন ছয়খানি দর্শন নির্দ্দিষ্ট আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ বিশেষ কিছুই নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্ম বা জনের ধর্ম্ম; সেই জন্য বোধ হয়, দর্শনের তত আবশ্যক হয় নাই। তবে উহা প্রাচীন ধর্ম্মেরই একটা নবীন ভাব। কাজেই ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগদর্শন উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ দর্শন হইয়াছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগ বিজ্ঞানমূলক, কাজেই উহাতে আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত উভয় সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার। বৌদ্ধদের যেটুকু শুদ্ধ দর্শন আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ দ্বারাই রচিত। উহাঁদের মধ্যে বুদ্ধঘোষ, নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষই প্রধান। নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষ সর্ব্বতোভাবে দার্শনিক এবং বুদ্ধঘোষের টীকাপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার বৌদ্ধ মত প্রচার করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের অনুরুদ্ধের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ একখানি উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ। ইহা ছাড়া বৌদ্ধেরা ন্যায়শাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দিঙ্‌নাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের পরিচয় তিব্বত প্রদেশ হইতে আমরা পাইয়াছি।

এই অবকাশে সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন নূতন মত বাহির হইতেছে। সম্ভবতঃ উহা ব্রাহ্মণ-যুগের তত্ত্ব। অভিব্যক্তি-বাদ সাংখ্যের বিশেষত্ব। মনোবস্তু ও জড় বস্তু, এই উভয়ের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা মিলনে দৃশ্য জগতের উৎপত্তি—এইগুলিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি। বৌদ্ধেরা সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ কিছু কিছু লইয়াছেন, আবার সাংখ্যমত ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রেরও ভিত্তিস্বরূপ। তবে বৌদ্ধেরা স্বভাব-বাদ গ্রহণ করেন নাই।

মানবের জ্ঞান বস্তুতঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন। মনের প্রেরণা অনুসারে আমরা বুদ্ধির দিক্ হইতে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং রসের দিক্ হইতে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ও কলা প্রভৃতির আস্বাদ পাইয়া থাকি। জ্ঞানের হিসাবে দর্শনই মানব-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ। মানুষের অনুভব যতদূর উঠিতে পারে, দর্শন হইতে আমরা তাহাই পাইয়া থাকি। সেই জন্য আমাদের ইতিহাসের দর্শন, ধর্ম্মের দর্শন, আইনের দর্শন প্রভৃতি হইয়াছে। ইহাতে ঐ সকল বিষয়ের মূলতত্ত্বসকল আমরা জানিতে পারি। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই, "তাহার পর কি" ইহা জানিবার ইচ্ছা মানুষের সতত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রমা-জ্ঞান যেখানে শেষ হইয়াছে, দর্শন তাহার উপর দাঁড়াইয়া বাদানুবাদ সৃষ্টি করে। কাব্য যেমন বস্তুর রসের দিক্‌টা মানবের সম্মুখে আনিয়া দেয়, সেইরূপ দর্শন, বস্তুর বুদ্ধির দিক্‌টা আমাদের দেখাইয়া দেয়। কাজেই দর্শন এক প্রকার জ্ঞানাত্মক কাব্য। কাব্য-প্রকৃতি দেহের সৌন্দর্য্য লইয়া

থাকে, দর্শন-প্রকৃতি দেহের গঠন দেখাইয়া দেয়। দৃষ্টি-ভেদে কাব্যের যেমন স্বতন্ত্র আকার, দর্শনেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে। জগতের মূলে কোনও দার্শনিক এক বস্তু দেখেন, কেহ বহু বস্তু দেখেন। কেহ পরমাণুকে নিত্য বলেন, কেহ উহাকে অস্থায়ী বলেন। কেহ দৃশ্য বস্তুসমূহের জাতি স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না। কেহ দুইটি প্রমাণ মানিয়া থাকেন, কেহ বা চারিটি প্রমাণ মানেন। প্রকৃতিকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিবে, তাহার দর্শনও সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের পার্শ্বে বৌদ্ধ-দর্শন নিজের বর্ণ লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দর্শন শব্দে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝিয়া থাকি,—মনস্তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিতত্ত্ব, শুদ্ধদর্শন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব। আধ্যাত্মিক জগতের মূলে মনস্তত্ত্ব। প্রত্যক্ষের ব্যাপার মনস্তত্ত্ব হইতে বুঝা যায় এবং তর্কশাস্ত্র প্রত্যক্ষমূলক। নীতিতত্ত্ব—ইচ্ছা, নির্ব্বাচন ও সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। জ্ঞানবাদ, সত্তাবাদ, সম্বন্ধ, কার্য্যকারণবাদ প্রভৃতি বিষয় শুদ্ধদর্শনের অন্তর্গত। ঈশ্বর, আত্মা, পাপপুণ্য, পরলোক প্রভৃতি বিষয় লইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলে মনস্তত্ত্ব। সেই জন্য বৌদ্ধেরা মন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। মনের তত্ত্ব অন্বেষণ বৌদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগের। সম্ভবতঃ বৌদ্ধেরা উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষ, কার্য্যকারণ-পরীক্ষা প্রভৃতি আন্বীক্ষিকী বৃত্তি বিজ্ঞান-যুগের লক্ষণ। কাজেই ঐ সময়ের লোকদের বুঝাইতে হইলে ধর্ম্মের মূল সংস্কারগুলি সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষ করা আবশ্যক। বুদ্ধদেব তাহা করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য বড় বড় পণ্ডিত বুদ্ধের উপদেশ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধ্যান, সমাধি ও শীল বা চরিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ। এ তিনই মানসিক ক্রিয়ার অধীন; কাজেই মনের বিষয় বুদ্ধদেব অতি গভীর ভাবে শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নব বৌদ্ধেরা বিচারপ্রিয় ছিলেন। প্রতিসম্ভিদা ছাড়া তাঁহারা কোন মত গ্রহণ করিতেন না। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতি-সম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতি-সম্ভিদা, এই চারিটি প্রতিসম্ভিদা তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইত। প্রতিসম্ভিদা শব্দ ইংরাজী "এনালিসিস্" শব্দের অনুরূপ। প্রত্যেক বিষয় বেশ ভাল করিয়া ভেদ করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। বস্তু, তাহার গুণ, তাহার নিরুক্তি, তাহার আভাস উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তবে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইবে। ইহা হইতে বৌদ্ধ-মনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব

হিন্দুজাতি দর্শন-প্রাণ জাতি। মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার একটি বৃহৎ তত্ত্বের মধ্যে লইয়া আসাই দর্শনের কার্য্য। কাজেই বৌদ্ধেরাও সে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহ বৌদ্ধদের অভিধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। অভিধর্ম্ম না বুঝিলে বৌদ্ধদের মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সুত্র-পিটকের বিষয়সমূহ অভিধর্ম্মে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তত্ত্বের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বলিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। শারীরকসূত্রের টীকায় আমরা তিনটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। আবার অভিধর্ম্ম গ্রন্থ কথাবস্তুতে সর্ব্বসমেত সাতাশ আটাশটি সম্প্রদায়ের কথা আছে। সর্ব্বাস্তি-বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশূন্যবাদ অবধি নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ কথাবস্তুতে আমরা দেখিতে পাই। উহাতে আত্মা, বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব, অর্হতের পতন, নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া বাদা-নুবাদ আছে। মাধবাচার্য্য যে সম্প্রদায় কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের জড়জগৎ-প্রত্যয় সম্বন্ধে মতামতই পাওয়া যায়। শূন্যবাদীর মতে বাহ্য ও অন্তর কোন অর্থই নাই। যোগাচার মতে বাহ্যার্থ শূন্যবাদ, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তবে উহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, এবং বৈভাষিক মতে বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অপরাপর বাদীদের ঠিক দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা তাঁহাদের লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় বুঝা যায় না। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং কথাবস্তু হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পূর্ব্বোক্ত কথাবস্তুর সম্প্রদায়সমূহ মাধবাচার্য্যের চারিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। অপরা-পর অধিষ্ঠানের মত, ধর্ম্মও সময়ের সহিত চলিয়া থাকে এবং এই জন্য তাহাতে নূতন ভাব ও নূতন সমাবেশ আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধদের মোটামুটি তিনটি যুগ ধরা যাইতে পারে। সূত্র ও অভিধর্ম্মের যুগ, মিলিন্দ-নাগসেন যুগ এবং অন্ত্যযুগ। প্রত্যেক যুগের সহিত আধ্যাত্মিক বা মানসিক তত্ত্বের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বুদ্ধ মন সম্বন্ধে এরূপ বিচার ও বিভাগ করিয়াছেন যে, আজকালকার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, ব্যবহার-দিক্‌টা বাদে, তাহা অপেক্ষা বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ দেয় না। দার্শনিক বিচার, মজ্‌ঝিম-নিকায়, সংযুত্তনিকায়, দীঘনিকায় প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থে, অভিধর্ম্ম গ্রন্থে এবং প্রজ্ঞাপারমিতা ও ধম্মপদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে বিসুদ্ধিমগ্‌গ, লঙ্কাবতারসূত্র, মাধ্যমিক সূত্র ও অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে তত্ত্ববিচার আছে। বৈদান্তিকের আত্মার সম্বন্ধে বুদ্ধের কি মত, তাহা জানা যায় না। তবে তিনি আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার একটি অখণ্ড বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা চিত্ত। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থবোধক। "চিত্তম্ ইতি পি মনো ইতি পি বিজ্ঞানম্" ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। মানসিক ক্রিয়াসমূহ চিত্ত-ধর্ম্ম অথবা চেতসিক ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানসমূহ বা বিজ্ঞান চিত্তের* অন্তর্গত এবং ইহা ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা (স্মৃতি-জ্ঞান) এবং মনোধাতুও চিত্তের অন্তর্নিবিষ্ট। বেদনা, প্রজ্ঞা ও সংস্কার চেতসিক ব্যাপার। বৌদ্ধদের পঞ্চস্কন্ধ সুপরিচিত। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার, এই কয়টি লইয়া পঞ্চস্কন্ধ। স্কন্ধ অর্থে রাশি। এই পঞ্চস্কন্ধ বুদ্ধ কি ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহা প্রাচীন পঞ্চকোষের অনুপাতে কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধের পরিভাষা উপনিষৎ হইতে লওয়া হইয়াছে। চিত্ত-শব্দও উপনিষৎ হইতে গৃহীত। বাহ্য বস্তু কি করিয়া মনে অধিগত হয়, ইহার এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে নব্য-পাশ্চাত্য দর্শনে কএকটি মত দেখা যায়।† অপরাপর মতের উল্লেখ না করিয়া দুইটি বিরোধী মতের কথা বলিব। এক দলের মতে (এসোসিয়েসনিস্ট) ইন্দ্রিয়জ প্রত্যয় বা সংবেদনসমূহ আপনা হইতে আপনার আকার মনে গড়িয়া লয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড় বস্তুর সন্নিবেশ করিয়া দেয়, সেইরূপ একটা নিয়মবশতঃ রূপ, শব্দ, স্পর্শ, দেশ, কাল প্রভৃতি অনুভবের পর আপনা হইতে সাজান হইয়া থাকে। ইঁহারা মনের কোনও ক্রিয়া স্বীকার করেন না এবং বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে মনে করেন। অপর সম্প্রদায়ের মতে (ক্যান্ট-তন্ত্রে) সংবেদনসমূহ একৈক ভাবে গৃহীত হইয়া উহার দিক্ ও কালের সন্নিবেশ মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সংবেদনসমূহ জড়-প্রেরণা মাত্র। উহার গড়ন ও সজ্জাটা মনই দিয়া থাকে। বৌদ্ধেরাও মনের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মে ও নীতিমার্গে সাধক যে নূতন নূতন দৃষ্টি ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহা মনের শক্তিবশতঃই হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপে হইতে পারে না। বৌদ্ধ নীতি-তত্ত্বের আলোচনায় এ বিষয় পরে দেখান হইবে।

নব্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে, বুদ্ধিমার্গে সেন্‌সেসন্, পার্‌সেপ্‌সন্, কন্‌সেপ্‌সন্ ও থট্, বেদনা-মার্গে প্লেসর্, পেন্, ইমোসন্ ও সেন্‌টিমেণ্ট, ইচ্ছামার্গে উইল্, ডেলিবারেসন্, রেসোলিউসন্, ডিটারমিনেসন্ প্রভৃতি বিভাগ দেখিতে পাই। বৌদ্ধেরাও বুদ্ধিমার্গে রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, সংস্কার ও চিন্তা, বেদনামার্গে—সুখ দুঃখ, অদুঃখ অসুখ, ইচ্ছামার্গে—চেতনা, বিতর্ক, সংকল্প প্রভৃতি বিভাগ করিয়াছেন। ইংরাজী কন্‌সস্‌নেস ও এটেন্‌সন বৌদ্ধদের বিজ্ঞান ও মনসিকার। সতি বা স্মৃতি ও অনুস্মৃতির উল্লেখও দীঘনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে। মনের অলৌকিক শক্তির দিক্‌টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি কোন কোন লেখক এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। যোগ ও একাগ্রতায় মন কতটা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহার আলোচনা ইউরোপে এখনও আরম্ভ হয় নাই।

* Mind proper.

† Pre-established harmony, Common-sense School, Kantian doctrine, Associationist School.

হিন্দু ও বৌদ্ধেরা এ বিষয় যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের এক নূতন চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। চিত্ত নিরোধ করিলে মনের যে নূতন শক্তির উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে অজ্ঞাত তত্ত্বসমূহের যোগ-নেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা হিন্দু জাতির আবিষ্কার এবং পরে উহা অপর কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় শিক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির "হায়ার সাইকোলজির" দৃষ্টি নূতন খুলিয়াছে। বোধ হয়, মাদাম ব্লাভাতস্কি এ বিষয়ে ইউরোপে প্রথম পথপ্রদর্শক। নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ কেবল বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা নূতন তত্ত্ব বাহির হয় না। "ইন্‌টুইসন্‌" বা যোগপ্রতিভা ব্যতীত উচ্চ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতেই সংবেদন বা সেন্‌সেসন্‌সমূহ মনের শক্তি দ্বারাই একত্রিত হইয়া বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। "প্রজ্ঞা" একদিকে মনের একটা অবস্থাবিশেষ, ইংরাজী "কল্‌চার," আবার উহা মনের শক্তিও বটে। চিন্তা ও অনুধ্যান দ্বারা যে অভিনব অবস্থা মনে উদয় হয়, উহাও প্রজ্ঞা এবং যে শক্তির দ্বারা মানস সামগ্রীসমূহ একত্রিত হইয়া জ্ঞান আকারে পরিণত হয়, উহাও প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক উন্নতির অপরাপর নামও বৌদ্ধদের আছে—অভিজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান ইত্যাদি। মূল বৌদ্ধ মতে স্থায়ী নিত্য বস্তু কিছুই নাই, এইরূপ ভাবটাই পাওয়া যায় এবং সর্ব্বশূন্যবাদে ইহার চরম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কাজেই আত্মার স্থান বৌদ্ধতন্ত্রে নাই। বৌদ্ধেরা অহং স্বীকার করিয়াছেন, তবে সে অহং উপনিষদের আত্মা নহে, উহা দার্শনিক ব্যবহার মাত্র। উপনিষদের আত্মা স্থায়ী, নিত্য পদার্থ। এইরূপ ভাবের আত্মা পরবর্ত্তী পুগ্‌গল-বাদী বৌদ্ধেরা মানিয়াছেন এবং আত্মা স্থানে পুগ্‌গল বা পুদ্গল শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান, মনের বা জ্ঞানের একটা স্তর, আবার বিজ্ঞান চিৎও (ইংরাজী কন্‌সস্‌নেস্‌) বটে। বুদ্ধঘোষ, রূপ, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ কএক স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান সকলের পক্ষে একভাবের নহে। একই বিষয় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে বুঝে। এক খণ্ড স্বর্ণ দেখিলে বালক, সাধারণ লোক ও বিশেষজ্ঞ উহা বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকে। ইহার অর্থ, বালক উহা একটা চক্‌চকে জিনিস মাত্র দেখে, বয়স্থ লোক উহা ধাতু বলিয়া বুঝে এবং বিশেষজ্ঞ উহার উৎপত্তি, ব্যবহার ও গুণ জানিতে পারে। একই বিষয়ে জ্ঞানের এইরূপ তারতম্য বুদ্ধঘোষ সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বও উহা মানিয়া থাকে। আবার ভাবের দিক্ হইতেও এইরূপ তারতম্য আছে—ইহাও বৌদ্ধেরা অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যার আগমনে চোর, অনূচান (বেদাধ্যায়ী) ও বিলাসিনীর বিভিন্ন ভাব-প্রেরণা হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তটি হিন্দুর, কি বৌদ্ধদের, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, হিন্দু গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মনের গভীরতত্ত্ব বৈদিক সম্প্রদায় অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধেরা সেই জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া মতত্তত্ত্ব আরও প্রশস্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়।

এই ছোট প্রবন্ধে বৌদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে যথারীতি আলোচনা করা সম্ভব নহে। ইহাতে কেবল এক একটি বিষয় ছুঁইয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের কথা অতি সংক্ষেপে

বলা হইল। মনস্তত্ত্বের সহিত তর্কশাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। নাম-রূপ বা সংজ্ঞা তর্কশাস্ত্রের মূল। নাম ও সংজ্ঞা (কনসেপ্‌ট) ইহারা বস্তুর দুইটা দিক্‌ মাত্র। মনে যে বস্তুর সংস্কার থাকে, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়। নাম হইতে অবয়ব প্রভৃতির উৎপত্তি। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতিও সংস্কারমূলক। বৌদ্ধ-ন্যায়গ্রন্থ ভারতবর্ষে বড় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ন্যায়বিষয়ক পুস্তক তিব্বতে রক্ষিত হইয়াছে। দিঙ্‌নাগাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার ন্যায়ের ইতিহাসে অনেকগুলি নৈয়ায়িকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ এখন তিব্বতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক প্রসঙ্গ—উহা ঠিক তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। উহার এক খণ্ড অনুমানবিষয়ক এবং উহা তর্কশাস্ত্রের মধ্যে ফেলিতে পারা যায়। সমস্ত বৌদ্ধ-ন্যায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তর্ক, বিবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই হইত, সাধারণ ভিক্ষুদের উহাতে অনুরাগ ছিল না; কাজেই উহা সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। মীমাংসক ও গোতমীয় শিষ্যদের উদ্দেশে অনেক বাদানুবাদ আছে। এই উভয় পক্ষের সংগ্রামের ফলে নব্য-ন্যায়ের উৎপত্তি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনেক আগে নব্য ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ব্যাপ্তিবাদ বা "ইন্‌ডক্‌সন"ই নব্য ন্যায়ের বিশেষত্ব। প্রাচীন বা গোতমীয় ন্যায়ের অনুমান-লক্ষণ নব্যেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, হেতু, পক্ষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রাচীনেরা বড় ধরিয়া যান নাই। বোধ হয়, বৌদ্ধেরাই এ বিষয়ের প্রবর্ত্তক। ইহা ছাড়া সম্বন্ধ ও অভাব, এই দুইটি বিষয় তর্কশাস্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ আবশ্যকীয় সামগ্রী। সম্বন্ধ না বুঝিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান জিনিসটাই অপেক্ষামূলক। একটি ব্যাপার বা ঘটনার সহিত অপর একটি ব্যাপার বা ঘটনার কার্য্য-কারণ, আশ্রয়-আশ্রিত, অবয়ব-অবয়বী প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধ বুঝাই জ্ঞান। অভাবও একটা জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান কেবল ভাব লইয়াই নহে, অভাবেরও আমাদের একটা জ্ঞান হয়। নব্যন্যায়ে অভাব লইয়া অনেক আলোচনা আছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায়ে "অভাব" স্থানে "অনুপলব্ধি" হইয়াছে।

বৌদ্ধ ন্যায়ের এবং দর্শনের সংবাদ আমরা হিন্দুগ্রন্থ হইতে পাইয়া থাকি। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায় পূর্ণকলেবরে কেবল একখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ন্যায়বিন্দু-টীকা। ন্যায়বিন্দু ধর্ম্ম-কীর্ত্তির গ্রন্থ। উহার টীকা ধর্ম্মোত্তর রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির মূল রচনা অতি সংক্ষিপ্ত, উহা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মূল রচনার মত অল্প ভাষাতেই লিখিত। তবে ন্যায়-বিন্দুর টীকায় নব্য ন্যায়ের টীকার মত বাহুল্য নাই। খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতকে তর্কশাস্ত্র স্থানে স্থানে ছন্দে লেখা হইত। কুমারিল, জয়ন্ত প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা অনেক বিষয় ছন্দে লিখিয়াছেন। ন্যায়বিন্দুতে তাহা নাই। টীকার ভাষা সুন্দর ও সরল। অল্পের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা

উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে প্রমাণ বা সত্য কাহাকে বলে, তাহার বিচার এবং তাহার পর প্রত্যক্ষলক্ষণ, অনুমান-(স্বার্থ ও পরার্থ) লক্ষণ এবং হেত্বাভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে যোগিপ্রত্যক্ষ ও ভ্রমের বিচারও আছে। বৌদ্ধেরা শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। শব্দপ্রমাণ তাঁহাদের যোগিপ্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান-লক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে কিছু কিছু ইতরবিশেষ আছে। সাংখ্য ও মীমাংসার প্রত্যক্ষ ও ন্যায়ের প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বিষয়ে ঠিক এক নহে। ইউরোপীয় লজিকেও সে তফাত-টুকু দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা পরে বলা যাইবে। তবে অনুমান-লক্ষণে বৈশেষিক ও নব্য ন্যায়ের অনুমোদিত বিষয়সমূহ আছে। তর্কশাস্ত্র নীরস জিনিস; সুতরাং উহার কথা অধিক না বলিয়া মোটামুটি দুই চারিটি জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থিত করিব।

বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ, কল্পনাশূন্য অভ্রান্ত জ্ঞান। কল্পনা শব্দের অর্থ—বাচক বা শব্দ। নাম সংযোগ করিলেই বস্তুর শুদ্ধ জ্ঞানের সহিত অপরাপর জ্ঞান আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় অভিঘাতে বস্তুর যে জ্ঞানটুকু হয়, তাহাই বৌদ্ধমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞানের নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক অবস্থা হিন্দু দর্শনেও গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ন্যায়মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, গোতমীয় ন্যায়মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। গোতমীয় ন্যায়মতে ব্যক্তিজ্ঞান জাতিমান্ অর্থাৎ ব্যক্তিজ্ঞানে জাতিজ্ঞান আগে আসিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে ব্যক্তির জ্ঞান হয়। বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক বস্তুজ্ঞান স্বলক্ষণ-যুক্ত, উহা জাতিজ্ঞানের অধীন নহে। গো-ব্যক্তি স্বলক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তি হইতে জাতির জ্ঞান হয়, জাতি হইতে ব্যক্তির জ্ঞান নহে। জাতি-জ্ঞান অনুমানের বিষয়, বস্তুর স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থক্রিয়াকারিত্ব বস্তুর আর একটা লক্ষণ। বস্তুজ্ঞানের সহিত উহাদ্বারা কি প্রয়োজন সাধন হয়, সে জ্ঞানটাও ঐ সঙ্গে হইয়া থাকে। নব্য পাশ্চাত্য দার্শনিক মতে উহা "প্র্যাগম্যাটিসম্"। আমাদের জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? প্রাগম্যাটিষ্ট বলেন, উহা দ্বারা কি মানব-প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, এইটুকুই জ্ঞানের আবশ্যকতা। যাহা হউক, জ্ঞান কিছু পরিমাণে অর্থক্রিয়াসাপেক্ষ হইতে পারে। মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য, জীবন রক্ষার জন্য বস্তুর গুণাগুণ জানার দরকার হয়; কিন্তু তাই বলিয়া জীবের জ্ঞানের উৎপত্তি যে ঐ জন্যই হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বৌদ্ধমতে অনুমান দুইপ্রকার,—স্বার্থ ও পরার্থ। প্রাচীনেরাও এই দুই ভাগ ধরিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য নব্য ন্যায়ে পাওয়া যায়। ন্যায়বিন্দুমতে স্বার্থ অনুমান জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ উহা নিজের জ্ঞানের জন্য এবং পরার্থ অনুমান শব্দজ্ঞানাত্মক, যেহেতু অপরকে বুঝাইতে হইলে শব্দের বা কথার আবশ্যকতা হয়। ইহাতে ঠিক ভাব বোধ হয় না। এইরূপ দুই ভাগ কেন হইয়াছে এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ন্যায়বিন্দুর প্রণালীটা দেখিলে মনে হয়, স্বার্থ অনুমান সরল এবং পরার্থ অনুমান জটিল বা মিশ্র (কম্‌প্লেক্‌স)।

স্বার্থ অনুমানের তিনটি রূপ ও তিনটি লিঙ্গ। সত্ত্ব, সপক্ষ, অসপক্ষ—এই তিনটি রূপ। আর তিনটি লিঙ্গ—অনুপলব্ধি, স্বভাব ও কার্য্য। "ন প্রদেশবিশেষে কচিদ্ঘটঃ" অর্থাৎ স্থান-বিশেষে ঘট নাই, ইহা অনুপলব্ধির দৃষ্টান্ত। "বৃক্ষোহয়ং শিংশপাত্বাৎ" অর্থাৎ ইহা শিংশপা-গুণ-বিশিষ্ট, সুতরাং উহা বৃক্ষ—ইহা স্বভাবের দৃষ্টান্ত। "অগ্নিরত্র ধূমাৎ", এখানে অগ্নি আছে, যেহেতু ধূম আছে, ইহা কার্য্যের দৃষ্টান্ত। অনুপলব্ধি আবার এগার প্রকারের। (১) স্বভাবানুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই। (২) কার্য্যানুপলব্ধি—এখানে ধূম কারণ নাই, যেহেতু ধূমের অভাব আছে। (৩) ব্যাপকানুপলব্ধি—এখানে শিংশপা নাই, যেহেতু বৃক্ষ নাই। (৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীত নাই, যেহেতু অগ্নি রহিয়াছে। ইত্যাদি। এই সরল অনুমানগুলি স্বার্থ-অনুমানের অন্তর্গত।

ইহার পর পরার্থানুমান। ইহাতে সাধ্য[১], হেতু[২], পক্ষ[৩] আছে। পরার্থ অনুমানও ত্রিরূপ লিঙ্গবিশিষ্ট; অন্বয়, ব্যতিরেক ও পক্ষ-ধর্ম্মতা ত্রিরূপলিঙ্গ। পরার্থ অনুমান দ্বিবিধ—সাধর্ম্ম্যবৎ ও বৈধর্ম্ম্যবৎ। দৃষ্টান্তের সহিত সাধ্যের সাদৃশ্য থাকিলে উহা সাধর্ম্ম্যবৎ, সাদৃশ্য না থাকিলে বৈধর্ম্ম্যবৎ। যাহা কৃতক, তাহা অনিত্য, যেমন ঘট—সাধর্ম্ম্যের উদাহরণ। যাহা নিত্য, তাহা অকৃতক, যেমন আকাশ,—বৈধর্ম্ম্যের দৃষ্টান্ত। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য লইয়া অনেক বিচার আছে। তাহার পর হেতু, পক্ষ ও সাধ্য লইয়া বিচার ও কি কি কারণে অনুমানে দোষ আসিয়া পড়ে, তাহার আলোচনা। পরমত খণ্ডনও আছে। ন্যায়বার্ত্তিককারের দোষ ও দিঙ্‌নাগের শ্রেষ্ঠতা দেখান আছে। সাংখ্যের স্বভাববাদ বৌদ্ধমত-বিরোধী, যেহেতু বৌদ্ধেরা পূর্ণভাবে স্বভাব স্বীকার করেন না। তাহার পর হেত্বাভাসের[৪] কথা। অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক, এই তিন প্রকার হেত্বাভাস। "তিনি সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি সুবক্তা" অনৈকান্তিকের দৃষ্টান্ত। যেখানে দুইটি রূপের অভাব, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। যাহা কৃতক, তাহা নিত্য, ইহা বিরুদ্ধের দৃষ্টান্ত। এস্থলে সপক্ষে অসত্ত্ব ও অসপক্ষে সত্ত্ব আকার বিরুদ্ধ হইল। "অনিত্য শব্দ, যেহেতু উহার চাক্ষুষ হয়"—ইহা অসিদ্ধের দৃষ্টান্ত। প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক, এই উভয়ের মধ্যে সন্দেহ বা অসিদ্ধি থাকিলে তাহাকে অসিদ্ধ বলে। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ কতকগুলি সংশয়কে বিরুদ্ধ অব্যভিচারী বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক বিষয় সাধারণ জ্ঞানগম্য নহে, যেহেতু সে সকল অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। সেই জন্য আগমসিদ্ধ বিষয় বাস্তব বিষয়ের অতীত হইলেও কোন না কোন তত্ত্বদর্শীর জ্ঞানে উহা যথাবস্থিত ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া উহা গ্রহণযোগ্য। হেত্বাভাস ছাড়া পক্ষাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতি আরও আভাস আছে এবং তাহাদের উপবিভাগও অনেক আছে। তাহার উল্লেখ এখানে আবশ্যক নহে।

যে সময় বৌদ্ধাচার্য্যেরা বিশেষ ভাবে ন্যায়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ের দুই একখানি ছাড়া কোনও বিশিষ্ট হিন্দু ন্যায়গ্রন্থ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে

১। Major term. ২। Middle term.

৩। Minor term. ৪। Fallacy.

ত্রয়োদশ শতক অবধি বৌদ্ধেরা অনেকগুলি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সময়টি প্রাচীন ন্যায়ের অতিক্রম ও নব্য ন্যায়ের উপক্রমকাল। বৌদ্ধ-ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। গোতমীয় ন্যায়ের অনেক বিষয়ই উভয় সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে নব্য ন্যায়ের জন্ম হইয়াছে। কি ভাবে প্রাচীন ছাড়িয়া ন্যায়-তত্ত্ব নূতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ইহা একটা বিশেষ "রিসার্চের" বিষয়।

বৌদ্ধেরা মানব-মন ও আধ্যাত্মিক বিষয় কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁহাদের কৃতিত্ব কি পরিমাণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ে বৌদ্ধেরা যে, উপনিষদের নিকট ঋণী ও উপনিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এবং এমন কি, উপনিষদেরই পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। আবার বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে তর্কশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ, পালিভাষা ছাড়িয়া, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহাও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বৌদ্ধেরা প্রাচীন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং উহাই তাঁহাদের স্বকীয় ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূল ধারা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই এবং নূতন উপকরণ দিয়া প্রাচীন তত্ত্বসমূহ সজ্জিত ও দৃঢ় করিয়াছিলেন।

এখন আমরা বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধ নীতি প্রাচীন বৈদিক তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের একটা নূতন দিক্ দেখাইয়া দিয়াছে। মহাভারতের যুগে দেখা যায় যে, কর্ম্মের আর পূর্ব্ব অর্থ নাই। গীতাতে কর্ম্মের লক্ষণ মীমাংসকদের কর্ম্ম-লক্ষণ নহে অর্থাৎ উহা তখন আর কেবল যাগ যজ্ঞ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত না। কর্ম্মের ক্ষেত্র তখন বাড়িয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ নীতি বা কর্ম্মতত্ত্ব সূচনা করার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। আমরা পাশ্চাত্য ধরণে অভ্যস্ত হইয়াছি; সুতরাং মূল ব্যাপারটা পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া দেখাইলে বিষয়-বোধের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে নীতি-তত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে, উহা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বা তর্ক-শাস্ত্রের মত আদর্শ-মূলক[১] বিজ্ঞান। সৌন্দর্য্য সৃজন ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি কোনও নিয়মের বশীভূত নহে। সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে। দুইটি মূল অণু একত্র হইলে একটি যোজক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা পূর্ব্বেও হইয়াছে এবং পরে একত্রিত হইলেও হইবে। সুতরাং ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী অথবা কার্য্য-কারণ-সাপেক্ষ, তাহাই প্রাকৃতিক বিধান। কিন্তু নীতি এবং সৌন্দর্য্য জড় নিয়মের বশীভূত নহে। উভয়েরই নূতন নূতন রূপ এবং দুইই প্রতিভা-সৃষ্ট। বাল্মীকি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, কাব্য

---

১ Normative Science.

রাজ্যে এক নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাহার পর কালিদাস ও ভবভূতি; তাঁহারাও রস-জগতে নূতন চিত্র, নূতন মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। এখনও অনেক রসস্রষ্টা আছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। সেইরূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি সৌন্দর্য্যবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে আদর্শমূলক। সঙ্গীতবিদ্যায় ভরত, হনুমন্ত, কল্লিনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শস্রষ্টা। নীতিতত্ত্বেও ঐরূপ আদর্শসমূহ আছে। মনু, মোসেস, বুদ্ধ, কনফুসস্ ও খ্রীষ্ট নূতন নীতিমার্গ, নূতন পন্থা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। ঐ আদর্শ-সমূহ মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবলম্বন করে। অতএব নীতিতত্ত্ব কোনও প্রাকৃতিক বিধানের বাধ্য নহে এবং জড়-সঙ্ঘাতের আদর্শ নীতিতত্ত্বের আদর্শ হইতে পারে না।

গ্রীক "এথিক্স্" শব্দের অনুবাচক শব্দ হিন্দু দর্শনে নাই। গ্রীকদের ধর্ম্ম উপাসনা ও ধ্যান বড় একটা ছিল না, কাজেই তাহাদের "ষ্টোইক্" ও "এপিকিউরিয়ান" সম্প্রদায় ধর্ম্ম বাদ দিয়া মানুষের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। গ্রীক "এথিক্সে"র সহিত ধর্ম্মের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। কাজেই উহা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার আমরা এখন ধর্ম্ম শব্দ যতটা বিষয় লইয়া ব্যবহার করি, বৈদিক যুগে তাহা ছিল না। আমাদের মনুপ্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতা কতকটা "এথিক্সের" স্থান ও কতকটা "ল"য়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রীকদের এথিক্স্ ও বৌদ্ধদের ধর্ম্ম প্রায় একার্থবোধক। যাহা হউক, নীতি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় "এথিক্স্" ও "মর‍্যাল্স্" শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এ স্থলে প্রচলিত ভাবেই নীতি শব্দ ব্যবহৃত হইল।

নীতি শব্দে প্রবর্ত্তন বুঝায় এবং বিধিনিষেধ, ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতির অপেক্ষা করে। স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়াইয়া নীতিবশে কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হয়। মানুষ এরূপ করে কেন? পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত বা প্রয়োজন সাধন জন্য নীতি অবলম্বন করে। এ স্থলে প্রশ্ন আসিতে পারে যে, মানুষের পুরুষার্থ কেবল ক্ষুৎ-পিপাসা লইয়া বা শারীরিক অভাব লইয়া অথবা যাহাতে সুখ হয়, সেই সকল বিষয় লইয়া সাধিত হয়। মানব-জীবনে নীতির আবশ্যকতা কি? পশুরা পশু-জীবনে, এমন কি, উদ্ভিদ-জীবনেও কেবল প্রকৃতির তাড়নায় ও প্রেরণায় চলিয়া থাকে। তাহা হইলে নীতি—ব্যাপারটা হয় কুসংস্কারমূলক অথবা রাজা, সমাজ ও যাজকের অভিপ্রায়বশতঃ লোকে মানিয়া থাকে। মিথ্যা কথায় যদি ইষ্ট-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতে লোকে বিরত হয় কেন? এ প্রশ্ন সমাধানের পূর্ব্বে আমরা মনস্তত্ত্বের আশ্রয় লইব।

পশুজগতে দেখা যায় যে, ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় উহারা উহার তৃপ্তির জন্য কোনও নিয়ম রক্ষা করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিই তখন উহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। দুর্ব্বলকে বধ করিতে অথবা দুর্ব্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে উহারা কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মানুষে তাহা করে না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান এবং পশুর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান ঠিক এক নহে। শরীরের আহ্বানে ইতর জীব প্রকৃতির বলেই চলে। মানুষ এ স্থলে

শরীরের অথবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়া অন্তভাবে কাজ করে। শরীরের অভাব নিম্ন-শ্রেণীর জীবের যে ভাবের হয়, মানুষেরও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কার্য্য,—যুক্তি ও বিচারসাপেক্ষ; পশুর তাহা নয়।

ক্ষুৎ-পিপাসা বা তৃষ্ণা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। উহা মিটাইবার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ঐ উপায়ের মূলে আমাদের ইষ্ট-সাধনতা-বুদ্ধি থাকে। যদি উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তখন ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। সেই জন্য ইউরোপীয় নীতিতত্ত্বে, কার্য্যের পূর্ব্বে কএকটি মানসিক অবস্থা ধরিয়া থাকে। প্রথম অভাব (ওয়ান্ট), দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বা কামনা (ডিসায়ার), তৃতীয় ইষ্টতা-জ্ঞান (উইস্) এবং অবশেষে ইচ্ছা (উইল্)। যখন কএকটি কামনা সম্মুখীন হয়, তখন সকলগুলির প্রতি আমাদের আসক্তি হইতে পারে না। ঐ কামনাগুলির মধ্যে একটি বলবৎ হয় এবং তাহা যদি ভাল বলিয়া বুঝে, তাহা হইলে উহার প্রসাধনে মানুষ যত্নবান্ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথমে ক্ষুৎ-পিপাসা বা অভাব হয় এবং উহা সাধনের জন্য কতকগুলি কামনা এবং কামনা-সমূহের মধ্যে দুই একটি ঈপ্সিত, এবং ঈপ্সিতের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য, তাহার জন্য সংকল্প এবং পরে তাহার প্রতি আমাদের ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা হইতে কার্য্য হয়।

এখন দেখিতে হইবে যে, যাহা আমাদের করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। এরূপ স্থলে উহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ উহা আমরা চাহি কেন? ইহার উত্তর—আমরা উহা ভাল বলিয়া চাহি; উহাতে মঙ্গল হইবে বলিয়া, উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া চাহি। কাজেই যাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, তাহা আমাদের পক্ষে ভাল বলিয়া না বুঝিলে উহা কখনই আমাদের পাইবার চেষ্টা হইতে পারে না। এখন মানুষের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে কি ভাল, তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়? একটা মিথ্যা কথা বলিলে যদি কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে মিথ্যা কথাটা আমাদের পক্ষে ভাল অথবা মন্দ? এইখানেই পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কেহ যশ, কেহ ধন, কেহ বিদ্যা, কেহ দেশ বা জন-সেবা, কেহ দেশ পর্য্যটন এবং কেহ ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে। অতএব যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি, সে সেই ভাবেই কার্য্য করে। আবার এ দিকে পরস্বাপহরণ, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা, অসরলতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, দুর্ব্বল-দলন প্রভৃতি প্রবৃত্তিও লোকবিশেষের আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্গুলি মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল, কোন্গুলি হেয় বা উপাদেয়, কোন্গুলি সাধু ও অসাধু অথবা শাস্ত্রীয় ভাষায় পাপ বা পুণ্য, ইহা কি উপায়ে স্থির হইতে পারে? কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এস্থলে বিধি নিষেধই আমাদের নিয়ামক। কোনও তত্ত্বদর্শী পুরুষ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পালনীয় এবং যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্জ্জনীয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন

যাহা ভাল, তাহাই জীবের উপযোগী অথবা যাহা জীবের পক্ষে উপযোগী, তাহাই ভাল। জীবের পক্ষে কি উপযোগী, তাহা কি করিয়া জানা যাইতে পারে, তাহার উত্তর অভিব্যক্তি-বাদীদের নিকট পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, বিধি অবিধি, ইহা-দের অনুভূতি কোথা হইতে হয়, সে সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদীরা নিরুত্তর। আবার জীবের পক্ষে যাহা উপযোগী, তাহাই উহার পক্ষে সুখ এবং সুখই জীবের কল্যাণ। অভিব্যক্তি-বাদীর মত এতটা স্থান অধিকার করিয়াছে যে, দুই চারি কথায় তাহার শেষ হয় না। তবে মোটামুটি যেমন মানব-প্রকৃতির ও জীবনের অপরাপর বিষয়ের পরিপুষ্টি হইতেছে অথবা উহার ক্রমোন্নতি হইতেছে, সেইরূপ মানুষের নৈতিক জীবনেরও ক্রম-পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুখই জীবের পক্ষে কুশল; কাজেই সুখই জীবের নীতির পরিমাপক। অভিব্যক্তি-বাদীর চক্ষে নীতির অন্য কোনও মূল্য নাই। প্রকৃতি যাহাতে সুখের ইঙ্গিত করে, তাহাই জীবের পক্ষে কুশল ও কল্যাণপ্রদ।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল সুখবাদীদের মত। তাঁহারা সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। নীতি-বুদ্ধি অথবা নীতির স্বতঃপ্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। যাঁহারা নীতি-বুদ্ধি অথবা যুক্তি-আশ্রিত-নীতি-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কএকটি সম্প্রদায় আছে। ক্যাণ্টের মত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ক্যাণ্ট সুখ-মূলক-নীতিবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব-নীতি সুখের দ্বারা অনুশাসিত হইতে পারে না। মানবের নীতি বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে এবং "কনসেন্‌স্" বা ইতি-কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি অভ্রান্ত; ইহার কখনও ভুল হইতে পারে না। মানুষ সুখের অন্বেষণে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে না; কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া থাকে। ভাল মন্দ আর কিছুই নহে—প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ভাল হইলেই ভাল এবং মন্দ হইলেই মন্দ। ক্যাণ্টের মত অনেকটা গীতার সঙ্গে মিলে।

পাশ্চাত্য মতের বিষয় অনেক বলা হইল। মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপে দুইটি প্রবল সম্প্রদায় আছে; একটি সুখবাদী ও অপরটি যুক্তিবাদী। ইহা ছাড়া আর একটি তৃতীয় বাদ আছে এবং উহাকে আমরা আত্মবোধ[১] বলিব। ইহার উৎপত্তি হেগেল হইতে এবং গ্রীন্ উহা বিস্তৃতভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এ মতটি নব্যতন্ত্রের দুই একটি লেখক মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

১। Self-realisation.

রাম বলেন ভাই লক্ষন তুমি এথা আইস।
সিংহাসন ছাড়িলাম রামি তুমি পাটে বৈষ্য॥
রাজত্ত করহ তুমি বৈষ্যা রাজপাটে।
রাজটিক্যা দিব রামি তোমার লল্যাটে॥
রনেক দুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজা।
তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা॥

(পৃঃ ১০।২

দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক।
জামতা রামার হ্রিদে দিল বড় সোক॥
সম্মুরে দেখিয়া সিব না মুয়াইল মাথা।
এই সে ভাঙ্গড় সিব রামার জামতা॥
ধিক ধিক নারদে বলিব রার কি।
তার বার্কে রপাত্রে দিলাম রামি ঝি॥
না জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল।
ত্রিভুবনে জাহার নাই পাইলাম মুল॥
না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিত্তা।
হেন জনে দান দিলাম আপন দুহিতা॥
দিলাম দুহিত্যা দান দিগাম্বর পাপে।
দিনে দিনে তনু সুখাইল এই তাপে॥
না বুঝিলাম হেন ছ্যার আমি মন্দমতি।
না জানিয়া রনলে পেলিলাম কন্যা সতি॥
পাই সে পরম লর্জ্জা বলিতে জামতা।
সভা মাঝে সভাকে রামার হেট মাথা॥
বৃসব বাহন জার উত্তরি ভুসন।
দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন॥
প্রেত পিচাস লয়্যা সদাই করে খেলা।
রমঙ্গল ভুসন গলায় হাড়ের মালা॥
গুনহিন দোস জত রমঙ্গলধাম।
মহাদেব বলিয়া রাখিল কেবা নাম॥
ভুত প্রেত লয়্যা জার সয়ন ভোজন।
দেবকুলে হৈল কেবল রামার গঞ্জন॥

সদা পিয়া ধুতুরা সির্দ্ধের বড়া সাত।
সভা মাঝে জে জনাকে না জুড়িল হাথ॥
(পৃঃ ১৮।১)

ইসত হাসিয়া সতি সিবেরে করএ স্তুতি
সুন প্রভু দেব ত্রিলোচন।
রঞ্জলি করিয়া ভুজে বল মুঁখসরসিজে
জাইবারে দক্ষর ভুবন॥
পিতা রারম্ভিল কির্ত্ত উৎসব দেখিবা হেতু
চলিলা ভুবনে জত লোক।
জতেক ভগিনিগনে সভে গেল নিমন্ত্রনে
রামার রিদয়ে বড় সোক॥
প্রাননাথ পসুপতি দেহ মোরে রনুমতি
জাব রামি পিতার রালয়।
বহু দিবসের রাসে জাইব জনক পাসে
কহিতে মনেতে বাসি ভয়॥ (পৃঃ ১৯।১-২)

রাছেন সিবের জটায় গঙ্গা ঠাকুরানি।
দুগ্রা রাগে কহেন নারদ মহামুনি॥
সুনিয়া রাইল দেবি সঙ্করের পাসে।
হর পানে হেরি হৈমবতি মন হাসে॥
দেবি বলে দেখি হর বদন মোলিন।
দিন দুই দেখিয়ে রামারে ভাব ভিন॥
জটায় জার্নবি ছিলা জয়করি জান্যা।
জটে ধরি জগতজননি রানে টান্যা॥
দুর্গাতে গঙ্গাতে বহু দন্দ বাজা জায়।
দেখিয়া নরদ রিসি দুই কক্ষ বাজায়॥
জানি লো জানি লো গঙ্গা তোর জেই কাজ।
পতির মস্তকে থাক নাই বাস লাজ॥
গঙ্গা বলে রপনার ছিদ্র নাহি জান।
রাপ্তছিদ্র না জানিয়া মোরে বল কেন॥
না জান রাপন ছিদ্র গনেসের মা।
তুমি কেন পতির বুকে দিয়াছিলে পা॥
(পৃ০ ৩৩।২-৩৪।১)

সর্ব্বরি প্রভাত হৈল রব্বনু উদয়।
মৃগয়া করিতে জাব লঙ্কেশ্বর কয়॥
সাজিল সকল রথ রথের সারথী।
ঠাট কটক য়াদি সেনা সাজে সিঘ্রগতি॥
সাজিল সকল সেনা রাবনের সাথে।
বেসে সুবেসে রাবন উঠিলেন রথে॥
বাদ্যকরগনে তবে বাজায় বাজনা।
রাবন কাননে গেল সঙ্গে লয়া সেনা॥
মৃগয়া করিতে হৈল দ্বিতিয় প্রহর।
তেহাঁর কারনে গেলা ময়দানবের ঘর॥
প্রবেস করিলা ময় দানবের পুরি।
একাকিনি ঘরে রাছে দানবঝিয়ারি॥
রাবন বলে কিবা নাম কহ দেখি সুনি।
কাহার নন্দীনি তুমি কাহার রমনি॥
রকুমারি মন্দদরি নাম ময় দানব পিতা।
কি নাম তোমার বটে তুমি থাক কোথা॥
বিস্বশ্রবার পুত্র রামি পৌলস্তের নাতি।
রাবন রামার নাম সংসারের পতি॥
তোমারে দেখিয়া মোর জুড়াইল মন।
তোমার রামার কর পানি গ্রহন॥
জে রাজ্ঞা করিয়া কন্যা রহিল জোড় করে।
করিবে রামারে বিভা পিতা রাসুন ঘরে॥
বাসা করি রহিল রাবন রাক্ষস সব।
সন্ধ্যা কালে ঘরকে রাইল ময় দানব॥
পিতার কাছেতে কন্যা করিল জোড় হাথ।
তোমারে দেখিতে এস্যাছেন লঙ্কানাথ॥
তারে বিভা দেহ মোরে লাজ খায়্যা বলি।
সুনিয়া দানব তবে হৈল কুতুহলী॥
(পৃ০ ৪৭।২-৪৮।১)

মলয় পর্ব্বত উপর রহে হনুমান॥
মা বাপের কাছে রাছে পর্ব্বত উপর।
নানা বিদ্যা মন্ন কুর্দ্ধ সিখল বিস্তর॥
তবে পড়িবারে গেলা ভার্গবের স্থানে।
চারি সাস্ত্র বেদ পড়িলেন চারি দিনে॥
গুরু পড়াইতে নারে গুরু ঢোল করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি সাঁপ দিল তারে॥
বানর হইয়া বেটা গুরুকে করিস ঘৃনা।
বল বুদ্ধি বিক্রম পাসরিবে রাপনা॥
গুরুর সাঁপে হনুমান রাপনা পাসরে।
তেঞী পালাইল হনু বালী রাজার ডরে॥
হনুমান বির জদি রাপনাকে জানে।
ত্রিভুবনের জিনিতে পারে এক দিনের রনে॥
(পৃ০ ৮০।২)

ডাক দিয়া বলে লবের তরে কুস॥
সর্ব্ব লোক বলে তোমার ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অনচিত জত তুমি করহ সংগ্রাম॥
দুই জনের তরে জদি তিন জন রোসে।
ধর্ম্মে নাহি সহে তারে মরে রাপন দোসে॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতির পুত্র রামা[রা] বটি তেঞী পাই রক্ষ্যা॥
লব কুসের কথা সুনি শ্রীরাম লর্জ্জিত।
জত কিছু বল তোমরা নহেত উচিত॥
পৃথিবিমণ্ডলে রামি রাজচক্রবর্ত্তী।
রাজা রাসিতে ঠাট কটক রাইসে সংহতি॥
তে কারনে ঠাট কটক রাইল মোর সনে।
তোমার তরে নাঞী সাজি সুন দুই জনে॥
আমারে জিনিতে বির নাঞী ত্রিভুবনে।
আমার পুত্র বিনে রার কেহো নাঞী জিনে॥
পুত্রের ঠাঞী বাপের রাছে পরাজয়।
বাপ জিনিতে পুত্রে সাস্ত্রে হেন কয়॥
রাপন আকার দেখি তোমরা দুই জন।
পরিচয় দেহ তোমরা কাহার নন্দন॥
লব কুস বলি তোমরা দুই জন।
আমার পুত্র জদি হয় না করহ রন॥
(পৃ০ ১২১।১-২

শেষ,—

সংসার ছাড়িয়া রাম চলিলা স্বর্গবাসে।
পৃথিবির লোক যাইসে স্ত্রী যার পুরুসে॥
সুগ্রিব অঙ্গদ যাইল জত বানরগন।
তিন কুটী রাক্ষসে আইলা বিভিসন॥
প্রথিবির লোক যাইল অজধ্যানগরি।
ছোট বড় চলে জত কানা খোড়া যাদি করি॥
পৃথিবির লোক জত করে জোড় হাথ।
একে একে সভাকারে বলেন রঘুনাথ॥
রাম বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
আমার সঙ্গে নাহি তোর স্বর্গের গমন॥
এই মত সকলে রাম বিদায় করিল।
ভরথ সত্রুঘ্ন সহ স্বর্গ চলি গেল॥

[ই]তি উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত হইল জথা দিষ্টং… ০ (পঠনার্থে) শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দকুমারি ঠাকুরানি তস্ত পিত্যা শ্রীজুত গোপালচন্দ্র বাবুজি মহাশয়ের বাঁটীতে লেখা জায় শ্রীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম্‌, সেনাই পরগনে জাহানাবাদ্‌।

—•—

১৩৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শেখরে।
ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ডরে॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসিছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্ত পর্ব্বতেতে থাকি॥
হনুমান বলে এখন কি ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর॥
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুঃখ পায় শেষে॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বীর॥
সুগ্রিব বলে ধনু ধরে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসি॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার॥
কৃর্ত্তবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥ *॥

মধ্য,—

এথা সীতা সীতা বলি রাম করেন ধ্যান।
বরিষা গোঙাইতে গেলেন পর্ব্বত মাল্যবান॥
দুই ক্রোশ পথ রাম করিলেন গমন।
সুগন্ধ সহিত বায়ু বহে ঘনে ঘন॥
বাস করি রৈলেন রাম পর্ব্বত উপর।
স্থানে স্থানে আছে তথা উত্তম সরবর॥
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাহি মন।
ক্রন্দন করিয়ে করেন রাত্রি জাগরণ॥
আমার বচন লক্ষণ কর অবগতি।
দুরন্ত বরিষা কাল স্থির নাহি মতি॥
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনন্দিনী।
কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই না জানি॥
বরিষার মধ্যেতে সুগ্রীবে কি কব।
এ সময় বানর কটক কোথা পাব॥
নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার।
তত দিন আমার হবে অস্থি চর্ম্ম সার॥
ক্রন্দন করিতে রামের গেল ভাদ্র মাস।
বিবরিয়ে কহেন তা পণ্ডিত কৃর্ত্তবাষ॥ *॥

(পৃঃ ৯।১)

শেষ,—

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে।
হেন কালে ক্ষপারস আইল সে স্থানে ॥
পক্ষের পাখের সাঠে ঘোর বায়ু বহে।
ত্রাস পায়ে বানরগণ সম্পাতিরে চাহে ॥
দুই ওষ্ঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে।
সম্পাতির আড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে ॥
সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার।
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার ॥
লঙ্ঘিতে না পারে সে পিতার বচন।
মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকল বানরগণ ॥
অঙ্গদ বলে পক্ষরাজ শুনহ বচন।
এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন ॥
দেব দানবের পুত্র দেব অবতার।
কোন কার্য্যে দিব তোমারে এত ভার ॥
সম্পাতি বলেন শুন জত বানরগণ।
এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ ॥
পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি।
রাম নাম বলিতে হইল পাখাসারি ॥
নূতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর ॥
দেখিয়ে সকল বানর আনন্দে অপার।
ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার ॥
বানর সম্ভাষি পক্ষ উড়িল আকাশে।
আনন্দিত হয়ে জায় আপনার দেশে ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়ে অঙ্গদ চলে দক্ষিন সাগর ॥
কৃত্তিবাষ কহিলেন অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল কিষ্কিন্দাকাণ্ড ॥ * ॥

১৩৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$×৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল ॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥
বিসাদ-ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান ॥

মধ্য,—

রাক্ষস সব বলে বানর সবে জাই ঘরে।
অমৃতায় আনি দিব তো তোমারে ॥
হনু বলে রক্ষক হৈলাম বনের ভিতরে।
এক গুটি ফল আমি না দিব কাহারে ॥
এত শুনি রাক্ষসের আনন্দিত মন।
হরষিতে ঘরে সবে করিল গমন ॥
বৃক্ষের অগ্রে উঠি হনু এক দৃষ্টে চায়।
অনেক দূর গেল আর দেখিতে না পায় ॥
পত্রের ঠোঙ্গা করিয়ে পাকা ফল পুরে।
ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে ॥
হনুমান ফল দেয় লঙ্কা ভবণে।
ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে ॥
রাম বলেন শুনহ লক্ষণ গুনের ভাই।
এমন সুস্বাদু ফল কোথায় না খাই ॥
লক্ষণ বলেন ত্রৈলক্ষের কর্ত্তা আপনি।

কোন ভক্ত কোথায় দিয়াছে এমনি ॥
ধ্যান করি হনু ভাবে রামের চরণ।
বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥
এক ফল লাগি দুঃখ দিলেন নারায়ণ।
উতসর্গ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন ॥
ভোজন অন্তেতে রাম কৈলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুল লৈলেন মুখের সোধন ॥
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ।
নিদ্রেগত হৈলেন রাম কমললোচন ॥
প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হয়ুক হনুমানে।
এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল সম্মুখে।
খাও খাও হনুমান বলি ঘন ডাকে ॥
পাকা পাকা ফল বীর করিল ভক্ষণ।
মনের সাধে ফল খাইল পবননন্দন ॥
পাতা চুচিয়ে বীর করিল ভক্ষণ।
কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥
বড় বড় ডাল খায়ে গাছ কৈল মুড়া।
ভুমে জানু দিয়ে বীর চাবাইল গোড়া ॥
গোড়া সুদ্ধা খাইল বীর পবনকুমার।
গড়াগড়ি দিয়ে মাটি করিল পোশর ॥
আনন্দে বসিল বীর প্রাচীর উপর।
হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অন্তর ॥
নিদ্রে হৈতে উঠি কয় জত নিশাচরে।
দেখি গিয়ে চল বানর কোন কর্ম্ম করে ॥
ধায়িয়া আইল তথা জত রাক্ষসগণ।
কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন্ ॥
কেহ বলে দিশাভুল লাগিল তোমারে।
পাতা লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিবারে ॥
কেহ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি।
মায়া করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥
কেহ বলে হেন কথা কহ বা কেমনে।
কোথায় মরিল বানর গাছের চাপনে ॥
ধুলায় পড়িয়ে কাঁদে জত নিশাচর।
কি বলিয়ে ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে।
পিতা মাতা মৈল কিবা তোমারদিগের ঘরে ॥
রাক্ষস সব বলে এই পাইলাম বানর।
কোন জন ভাঙ্গিল বন কহত সত্বর ॥
হনু বলে চাকর তুমি রাখিলা আমারে।
সকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে ॥
রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন।
সিকড় সহিত কেমতে খাইলি মধুবন ॥
হনু বলে সত্য কথা বলিব তোমারে।
চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাহি ভরে ॥
(পৃ০ ১২।২-১৩।১)

নল বলে প্রভু রাম কমললোচন।
পর্ব্বতিয়ে বাঁশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥
রাম বলেন সে বাঁশ থাকে কোথাকারে।
নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥
দশ জোজন ব্যাপি তার মূল আয়াতন।
দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন ॥
ইহার কতকগুলিন বাঁশ দেনতো আমারে।
তবে সে সাগর আমি পারি বান্ধিবারে ॥
এত শুনি রঘুনাথ ভাবেন চমতকার।
বুঝিলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার ॥
এমন বীর কেবা আছে পৃথিবী ভিতরে।
তিন সাগরের পার কেবা জাইতে পারে ॥
হনু বলে আজ্ঞা করেন কমললোচন।
সেই বাঁশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥
রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার।
তোমার বিক্রমে হবে সীতার উদ্ধার ॥
রাম জয় শব্দ করি পবনকুমারে।
চক্ষুর নিমিষে গেল তিন সাগর পারে ॥

কতকগুলির বাণের কারন বলিল বচন।
অড় সুদ্ধা উঠাইল পবননন্দন॥
রামজয় করি লৈল মাথার উপরে।
বাঁশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে॥

(পৃ০ ৩০।১)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সার।
নবমী পূজা তবে করেন দুর্গার॥
ব্রহ্মার বচনে নবমী পূজা কৈলেন।
তুষ্ট হয়ে ভগবতী হাতে হাতে লৈলেন॥
দুর্গা বলেন সবংশে বধহ রাবণ।
আর কোন চিন্তা নাহি শুনহ বচন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সকল বানরে॥
নবমী পূজা করি মনের সন্তোষে।
দশমী দিবসে দুর্গা গেলেন কৈলাশে॥
হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন।
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ॥
গিরিসুতা দুর্গা রাম পূজিলেন চরণ।
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ॥
এত যদি কহিলেন নারদ মহামুনি।
মহামায়া স্তব রাবণ করয় আপনি॥
কোথা গেলে দুর্গা মা গো হরের ঘরণী।
তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি॥
আর বার রাবণ অকালে বোধন কৈল।
রাবন স্মরণে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল॥
হর বলেন গৌরী বড় দেখি উচাটন।
পুনর্ব্বার মনে বুঁঝি পড়িল রাবণ॥
এত পূজা তোমায় করিলেন নারায়ণ।
ইহাতে সন্তোষ তোমার না হইল মন॥
হরের বচনে গৌরী শান্তনা পাইল।
আপনার স্থানে মাতা আনন্দে রহিল॥
কৃত্তবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন।
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ হইল এখন॥

১৪০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৭১। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

সাগর বন্ধ করি রাম হৈলেন যদি পার।
দেখিয়ে রাবণ রাজা সভয় অন্তর॥
হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে।
সুক শারণ দুই রাক্ষস ডাক দিয়ে আনে॥
শুন বলি শুক শারণ সৈন্যের প্রধান।
রামের কটক যদি আইল বিদ্যমান॥
দুত হয়ে কিবে কায কর লঙ্কাপুরে।
নর বানর আইল আমা বধিবারে॥
বনপশু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
যত বানর আসিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবে নাম।
কটক চর্চ্চিয়ে তুমি আইস মম ধাম॥
রাম লক্ষ্মণ জানিবে সুগ্রীব বিভিষণে।
অত সৈন্যগণ জানিবে জনে জনে॥
কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর।
কিরূপে আসিতে চায় লঙ্কার ভিতর॥
রাজআজ্ঞা দুত তবে বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্বরিতে॥

মধ্য,—

বলে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কেবা বীরবর
হও তুমি কার অনুচর।
কি কারণ আইলে বীর বচন অতি গভীর
বসিলে প্রায় পর্ব্বত শিখর॥
অঙ্গদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ
এবে তুমি পাসর আপনা।
জানিশ তো বালি রাজন আমি তাহার নন্দন
জে তোরে করিল বিড়ম্বনা॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে
লয়ে গেলেন কিস্কিন্ধা নগর।
দশ মুখ দেখি তোর অন্তর হরিষ মোর
শীঘ্রগতি গলে দিলাম ডোর॥
তবে লাফায়ে ২ চলো বানর বলে নাচো ভালো
এই মতে ক্ষণেক কাল জায়।
বানরেক্তে গালি দেয় না দেখি তার উপায়
শরণ ললে বালিরাজার পায়॥
মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রঙ্গে
অঙ্গ বঙ্গে হতে জাও বিজয়।
তুমি তো সেই রাবণ আমি বালির নন্দন
এই কহিলাম পরিচয়॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৪।২-৫।১)

বিশ্বামিত্র মহামুনি উপনিত হলেন তিনি
দশরথ রাজার গোচর।
ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজা মুনিবরে কৈলেন পুজা
পাত্র মিত্রে হরিষ অন্তর॥
দশরথ মহাশয় যোগ হস্ত হয়ে কয়
আগমন কারণ কহেন মুনি।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই
নৃপ দিলেন মুনিবাক্য শুনি॥
মুনির সহিত আসি বধেন তারকা রাক্ষসী
মারিচের দর্প কৈলেন চুর।
আনন্দিত মুনিচয় সঙ্গে লইয়ে তোমায়
গেলেন তবে জনকরাজাপুর॥
(পৃঃ ১০।২)

শুন প্রভু দেব রাম অতিকা আমার নাম
হই আমি রাবণনন্দন।
যুদ্ধ করিতে মোরে পাঠাইলেন লঙ্কেশ্বরে
অদ্য আমায় করেন নিধন॥
কে বুঝে তোমার মায়া সিংহমুখ নরকায়া
সেই অতি অদ্ভুত রূপ।
করকমল ফুল্ল করনখ বজ্র তুল্য
বিনাশিলে হিরণ্য কশ্যপ॥
তব তত্ত্ব কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন
আৎসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক।
হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ
বলি তাহে না ভাবিল শোক॥
হয়ে ভৃগুপতি রূপ নাশিলা সকল ভূপ
ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাপ।
হত জন্তু হত তাপ পৃথিবীর সন্তাপ
খণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ২৩।২)

রাব। বলে অদ্য আমি জানিলাম কারণ।
অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাত্রি।
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নির্গুণের গতি॥
পাতালেতে কুর্ম্মরূপি স্বর্গে দেবগণ।
তোমার মহিমা দেব না যায় কথন॥
দারুণ ব্রহ্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম্ম।
এই মতে বৃথা আমার গেল দুই জন্ম॥
যুদ্ধ করি দুঃখ প্রভু পাইলাম অপার।
আর জন্মে এত যুদ্ধ না করিব আর

রাবণের স্তব শুনি হাসেন দেবগণ।
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ॥
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রঘুনাথ।
হেন জনের এমন মন হৈল অকস্মাত॥
ভালো ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়।
তোমার লঙ্কা তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যায়॥
দেবগণ বলে ভালো বিপত্তি ঘটিল।
রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল॥
সরস্বতী কন্ধে যায়ে কৈলেন আরোহন।
পুনর্ব্বার রামে রাবণ কহে দুর্ব্বচন॥
কোথাকার মানুষ তুই জটীল তপস্বী।
সর্ব্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে আসি॥
এত বলি ঘন করে বাণ বরিষণ।
হেরিয়ে ক্রোধিত হৈলেন কমললোচন॥

(পৃঃ ১৮।২)

এইরূপে হনুমানে বিদায় করিলেন।
পুষ্পক রথের প্রতি ডাকিয়ে কহিলেন॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
যুদ্ধে জিনিয়ে তোমায় আনিল রাবণ॥
কুবেরের হও যাও কুবের নিকট।
কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইনাম শঙ্কট॥
আজ্ঞা পায়ে রথ চলিল শূন্যভরে।
উপনিত হৈল রথ কুবেরের দ্বারে॥
রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তখন।
কেনে তুমি এথা আইলে তেজি নারায়ণ॥
যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ।
তাবত থাকিবে তুমি রামের সাক্ষাত॥
আজ্ঞা পায়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর।
হেরি রঘুনাথ হৈলেন হরিষ অন্তর॥
ত্রিভুবণের মুনিগণ একত্র হইলেন।
রঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান।
এত দূরে লঙ্কাকাণ্ড হৈল সমাধান॥

১৪১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫$\frac{৩}{৪}$ × ৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—৭০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলেন ডর॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিত্রান।
অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান॥
মুনি সব গেলেন যদি রাম বরাবরে।
দ্বারী সত্তরে গিয়ে রামের গোচরে॥

মধ্য,—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রমায়ণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল আছে। . .

শেষ,—

বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় পশু না রয় বন।
এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের শ্রীচরণ॥
উর্দ্ধশ্বাসে চলি জায় নারী গর্ব্ভবতী।
লজ্জা ভয় তেজি ধায় কুলের যুবতী॥
সরজুর কূলে সবে করিলেন গমন।
চাহিয়ে রহিলেন রঘুনাথের শ্রীবদন॥
এইরূপে রঘুনাথ সরজুর কূলে।
কোটি কোটি রথ তবে আইল হেন কালে॥
লব কুশ দুই ভাই কান্দিয়ে বিকল।
ধারা শ্রাবন প্রায় চক্ষে পড়ে জল॥
অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম দুই জন।

জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ॥
আপনি তেজিয়ে গেলে সকলি উদাস।
জীবন্ত থাকিব আর কিসের অ'শ্বাস॥
কাতর হইয়ে রাম পুত্র লৈলেন কোলে।
প্রবোধ বচন রাম কন সেই কালে॥
শাত কাণ্ড রামায়ণ তুজনার অভ্যাস।
সকলি জানহ তাহা মুনির আভাস॥
মুনিবাক্য রক্ষে করি জাই স্বর্গপুরে।
গৃহে বাস কর দোহে হরিষ অন্তরে॥
মম আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল হবে।
অন্তকালে দুই ভাই আমারে পাইবে॥
প্রবোধিয়ে দুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর।
স্বর্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর॥
রথখানার তেজ জেন সূর্য্যের কিরণ।
সেই রথারোহন হৈলেন দেব নারায়ণ॥
আর জত লোক ছিলেন সরজুর কূলে।
শরীর তেজিল তারা পড়ি সেই জলে॥
গরুড় বাহনে হরি জান নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেব আসি করেন স্তবন॥
চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইলেন একজন।
বড় কর্ম্ম কৈলেন প্রভু বধিয়ে রাবন॥
বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মা শুন আমার বচন।
আমার পশ্চাতে সব আসিছে এখন॥
রাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ।
অক্ষয় স্বর্গভোগী হবে সেই জন॥
সন্তাপন নামে স্বর্গ বৈকুণ্ঠ সমান।
পৃথিবীর লোকে আমি তাহা দিলাম দান॥
রথ লয়ে গেলেন ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
স্বর্গবাসী হয় লোক শ্রীরাম স্বরণে॥
দিব্য রথে জায় লোক স্বরিয়ে শ্রীহরি।
রামের প্রসাদে লোক গেল স্বর্গপুরী॥
মরণকালে রাম নাম করে জেই জন।
আপনার মূর্ত্তি তারে দেন নারায়ণ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দপদ পায় তো নিস্তার॥
স্বর্গে জায়ে সকল লোকের পূরিল আশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীর্ত্তবাস॥০॥
দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন।
শাতকাণ্ড রামায়ন ভাষায় রচন॥
বর্ন্নিয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ত্তবাস।
পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ॥
বিরুদ্ধ ছন্দ রশাভাব পয়ার লিখন।
ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন॥
ভক্তি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয়।
পণ্ডীতের ভাব জাহা ভাবিলাম নিশ্চয়॥
সতন্তর পয়ার আর করিয়ে রচন।
গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন॥
পণ্ডিতের যে পয়ার পাইলাম সারৎসার।
পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার॥
সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন।
অন্য গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন॥
ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরূপ হয়েছে।
অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে॥
ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ২৬ মাঘ।

১৪২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ২১।২ পত্রে প্রসাদদাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরি।
ইন্দ্রের অমরাবতি তাহা তিরস্কারি॥

রাজা প্রজা পুরজন সুখি নিরন্তর।
এক তিল সম জায় শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম জুবরাজ হৈয়া।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসি প্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুনের আশ্রয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভূত লক্ষণ রামের অদ্ভূত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুণের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম জৌবন।
সাস্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপন॥
জোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দ হৃদয়।
রামে রাজা করিবেক ভাবিল নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে।
সত্তরে লিখিলা পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেক ভাবে সর্ব্বজন॥

মধ্য,—

রাম বলেন শুন বলি প্রাণের লক্ষ্মণ।
বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন॥
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে।
পুত্রস্নেহে ছাড়িয়া না দিবে কদাচিতে॥
তবে তাঁহার ভঙ্গ হবে প্রতিজ্ঞা পালন।
কোন প্রয়জন তবে আমার জীবন॥
অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে।
উদ্দেশে প্রণাম করি চলিল(ব) বনেতে॥
করজোড়ে সসম্ভ্রমে কহিল লক্ষ্মণ।
জে কথা কহিলা গোঁসাই সত্য বিবরণ॥
কিন্তু দুখসাগরে মজেছেন মহারাজ।
না কহিয়া গেলে পুন হইবে অকাজ॥

(পৃঃ ১৪।১)

তবে গেলা তিন জন বশিষ্ঠ সদনে।
বিদায় হইতে তিনে পড়িলা চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি দুঃখিত হইলা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মুনি প্রকাশ না কৈলা॥
বনবাস ব্রত শিক্ষা হৈলা মুনি স্থানে।
রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাহ্মণে॥
সীতার সহিত রাম চলিলা তখন।
পাছে ধনুর্ব্বান লইয়া চলিল লক্ষণ॥
সীতা দেবীর দুঃখ দেখি মনে দুখ পাইয়া।
সুমন্ত্রেরে কহে মুনি আক্ষেপ করিয়া॥
স্ত্রীর বস রাজা তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন।
জোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন॥
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জানে।
দশরথপুত্রবধু হৈয়া জায় বনে॥
বনে গেল কর্ম্মফলে জে হউক পশ্চাতে।
নগর বাজার দিয়া হাঁটিবে কেমতে॥
সত্তরে আনহ রথ না জাব সঙ্কট।
তিন জন রাথ লৈয়া বনের নিকট॥
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত্র সারথি।
তিন জন রথে চড়ি চলে শীঘ্রগতি॥

(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচাড়ি॥

শ্রীরাম পাঠাইয়া বনে ঘর মুহ হৈতে নারি।
জয় রঘুনন্দন অজোধ্যার প্রানধন
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
আমি জদি জানি বৈরি মোরে কেকৈ রানি
তবে কেন জাইব বিশ্বাস।

প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রান সব নিল
তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্য খণ্ড কোন প্রয়োজন।
আহা মরি বাছা রাম উড়ু উড়ু করে প্রান
তোমা বিনা না রহে জীবন ॥
শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে রাজা রাত্রি দিনে
প্রবোধ না মানে কার বোলে।
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই রাজারে তুলিয়া লই
মোছাইল নেত্রের আচলে ॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলা ধর্ম্ম কইলা অতি পাপ কর্ম্ম
এখন কান্দহ কি কারণে।
কীর্ত্তিবাস দ্বিজ কয় দৈবের নির্ব্বন্ধ হয়
বনে গেলা বধিতে রাবণে ॥ * ॥
(পৃঃ ১৭।১-২)

শেষ,—
লজ্জাযুক্ত হইলেন জনকঝিয়ারি।
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্রীহরি ॥
সীতা বলেন আর সাক্ষি নাহি প্রয়োজন।
সকলে আসিয়া মিথ্যা বলেন বচন ॥
দুঃখ ভাবিয়া কন জনকঝিয়ারি।
বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি শুনহ শ্রীহরি ॥
এ কথা শুনিয়া কহেন কমললোচন।
বটবৃক্ষে জিজ্ঞাসা করেন ততক্ষণ ॥
বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রঘুবর।
তিনজন মিথ্যা কহিল সভার ভিতর ॥
মিথ্যা কথা ইহারা কহিল সর্ব্বজন।
আসিয়াছিলা মহারাজা দশরথ রাজন ॥
আসিয়াছিলা তোমার বাপ দশরথে।
পিণ্ডদান সীতার রাজা নিলা দক্ষিণ হাথে।
সত্যকথা কহিল বৃক্ষ রামের গোচরে।
এ কথা শুনিয়া সীতার জুড়ায় কলেবরে ॥
তুষ্ট হইলা সীতা বটবৃক্ষে দিলা বর।
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড। * ॥

১৪৩। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—
আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
ছত্র দণ্ড হারাইলা অজোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাইলা অপচয়।
কিস্কিন্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
অনাথ হইয়া দুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন গিয়া পর্ব্বতশিখরে।
সম্ভ্রম পাইয়া পলায় কটক বানরে ॥
শুগ্রীব বলেন এথা আইসে দুইজন ধানুকী।
এই পর্ব্বত এড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি ॥
বুদ্ধির সাগর বানর নানা বুদ্ধি সঞ্চে।
আমারে মারিতে রাজা দুই বিয় পাচে ॥
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে।
লাফে লাফে পড়িয়া গেল বড় গাছের কান্দে ॥
কোন গাছে সহিতে নারে বানরের আস্ফাল।
ডালে মূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে শাল পেয়াল ॥
বলবন্ত আছে জত পর্ব্বতশিখরে।
মহিষ ব্যাঘ্র সকল পলায় উচ্চস্বরে ॥

ধ্য—,

াগরপার রাবণ রাজার ঘর
শুনিতে বিষম কাহিনি।
কেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা আস
চারি মাস বার্ত্তা নাহি জানি॥
হে বানররাজ সাধ্যা দেহ রামের কাজ
বড় ধর্ম্ম পরউপগার।
র্ম্ম দেখি কর কাজ শুন হে বানররাজ
তোমার রহুক জসভার॥
াত্রি দিবা ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কেমতে রহিবে জীবন।
ক্ষুর জল নাহি রহে প্রবোধে ভাই স্থির নহে
দেশে ভাই না করিলা গমন॥
াকসাগরে কর পার তুমি কর প্রতিকার
সীতা দেবীর করহ উদ্ধার।
ন জন দেশান্তরি তুমি মিত্র দ্রঢ় করি
সব দুঃখ নাস হে তাহার॥
(পৃঃ ১৭।১)

ষ,—

সম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি করি।
রাম রাম বলিতে হইল পাখাসারি॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া সকল বানর আনন্দ অপার।
রাম রাম বলিয়া সাগরে হইব পার॥
বানর সম্ভাসিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখ সারিয়া জায় আপনার দেশে॥
পিতা পুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
কীর্ত্তিবাস কবি করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল কিষ্কিন্ধাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২৳× ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগ বিদিগ নাহি দেখে আকাষমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সূর্য্যাস্ত জায় জখন বেলা অবসান।
লঙ্কা প্র[বে]সিল তখন বির হনুমান॥
আলো করি উঠে চন্দ্র গগনমণ্ডলে।
ভালোমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥
রাজার দুয়ারে দেখে দুয়ারি প্রহরি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব বিসম অস্ত্রধারি॥
সেল সুল শক্তি জাটি মুসল মুদ্গর।
খাণ্ডা ডাবুষ টাঙ্গি ছুরি ভয়ঙ্কর॥
পর্ব্বতপ্রমান হস্তি কনকে রচিত।
নানা বর্ন্নে ঘোড়া দেখে রত্নে বিভূষিত॥
লঙ্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্দন।
ফল ফুল বৃক্ষ দেখে অতি সুসোভন॥
পরম সুন্দর ঘর দেখিতে রুপস।
ঘরের উপর সোভে রত্নের কলস॥
নানা বর্ন্নে ঘর সব হিঙ্গুল হরিতাল।

মনি মানিক বান্ধা মেঝ্যের সান কাচঢাল ॥
ঘরের উপর সোভা করে সুবর্ন্নের বারা।
চারি ভীতে সোভে দেখ গজমুক্তার ঝারা ॥
ধ্বজ পতকা প্রতি ঘরের চালে উড়্যে।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে ॥
ঘরের ভিতর সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
শেত নেত বস্তুর বিচিত্র বসন ॥ (পৃ০৮।১)
সাগর লজ্ঘিলাম আমি বড় প্রিতিআষে।
চাহিয়া না পাইল সিতা আওয়াসে আওয়াসে ॥
কার সনে যুক্তি করিব নাহিক দোসর।
চিন্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর ॥
কান্দে বির হনুমান লঙ্কায় বসিয়া।
রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া ॥
কোন কোন স্ত্রির মুখ না কৈলাম নিরক্ষন।
অর্দ্ধ রাত্রি সিতা চাহি কৈলাম জাগরণ ॥
অর্দ্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্দ্ধ রাতি।
তবু না পাইলাম আমি সীতা লক্ষ্মীসতি ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার প্রভুর ভকতি।
সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি ॥
তার বোলে ভর করিয়া লজ্ঘিলাম সাগর।
এতো দুঃখ পাইলাম আসি দেশ দেশান্তর ॥
সিতা জদি জিতেন অবস্য আমি দেখি।
রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িলা জানুকি ॥
সিতা না দেখিয়া জাই রঘুনাথের পাস।
সিতার বার্ত্তা না পাইলে রামের বিনাস ॥
রামের মরনে মরিবেক রাজা সুগ্রিবে।
তার উমা প্রান দিবে সুগ্রিবের ভাবে ॥
অঙ্গদ যুবরাজ মরিবে বালির নন্দন।
কিচকিন্ধা নগরে মরিবে জতো বানরগন ॥
লক্ষন বির প্রান দিবে রামের মরণে।
দেসে বার্ত্তা পাইয়া মরিবে ভরথ সক্রঘনে ॥
তাবত্ত মরিবে অগ্নি করিয়া প্রেবেস।
পাত্র মিত্র মরিবেক রঘুবংশের দেশ ॥
লঙ্কা হইতে আমি নাহি করিব গমন।
লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ ॥
হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যাসি।
সাপ দিয়া রাবনে করিব ভস্মরাসি ॥
চন্দনকাষ্ঠের করিব সিং(চি)তা সাগরের কুলে।
অগ্নিকার্য্য করিব আমি কি কাজ শরিরে ॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা আছেন বড় পৃত আসে।
সুন্দরাকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কির্ত্তিবাষে ॥*॥
(পৃ০ ১০।১-২)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন সুন রাম জগত ঈশ্বর।
আজি হতে শেতু হইল রামেশ্বর ॥
জাঙ্গালেব উপর বসিবে জতো লোক।
পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক ॥
উত্তর কুলে স্নান করিলা রাম নারায়ণ।
সেই জল স্পর্শ করিলা যত দেবগন ॥
অগ্রে স্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন।
তৎপরে ব্রহ্মা করিলা পরষন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন।
সভে পরষিলা জলা হয়্যা ভক্তিমন ॥
জেই স্থানে স্নান করিলেন প্রভু নারায়ণ।
সেই হতে পুন্য[টি]ক্ষত্র হইল ততক্ষণ ॥
শেতবন্ধ রামেশ্বর যেই জন সুনে।
শরীরের পাপ ভষ্য হয় ততক্ষনে ॥
ব্রহ্মা শিব বিদায় হইলা দুই জন।
সবংশেতে মার গীয়া লঙ্কার রাবণ ॥
এত বলি বিদায় হইলা দেবগন।
লঙ্কা প্রেবেসি তবে চলেন নারায়ণ ॥
অগ্রে পার হইল জতেক বানরগন।
তার পশ্চাতে শুগ্রিব বিভিষন ॥
তার পশ্চাতে পার হইলা শ্রীরাম লক্ষন।

তবে পার হৈলা সব সেনাপতিগন॥
রাম লক্ষন পার হৈলা জগত অধিপতি।
পশ্চাতে হইলা পার সব সেনাপতি॥
জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম।
দুরে ছিলা দুই জন হইলা এক গ্রাম॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীত জীবের করিতে হিত।
জগত তারণ হেতু রামায়ন গীত॥
রামায়ন গীত ইহা অতি সুধাখণ্ড।
এত দুরে সমাধান সুন্দরাকাণ্ড॥*॥

১৪৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫½× ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বন্দ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হইলা পার।
দেখিয়া রাবণ রাজার সভয় অন্তর॥
চিন্তয়ে রাবণ রাজা গুণে মনে মনে।
শুখ শারণ দুই চরকে ডাক দিয়া আনে॥
তোরে বলি সুখ শারণ সেনার প্রধান।
রামের কটক আইল কতো দেখ বিদামান॥
দুত হয়্যা কি কর্ম্ম করহ লঙ্কাপুরে।
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
বনপষু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
কতো বানর মিলিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
রাজছত্রি হই আমি না জানে কোন জনা।
লঙ্কা আসিয়া কেবা অগ্রে দিবে হানা॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবা নাম।
সকল কটক চিনিবে হয়্যা সাবধান॥
রাম লক্ষন জানিহ শুগ্রিব বিভিষনে।
প্রতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে॥
কোনখানে বঞ্চে তারা কিরূপ ছাউনি।
কোন পথে বানরগুলা করিবে উঠানি॥
রাজা[র] আজ্ঞা দুত বন্দিলেক মাতে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে॥

মধ্য,—

রাম তোর জত অন্তর সুন রে রাবণ।
যত দুর গনি রাবণ পঙ্ক চন্দন॥
শ্রগাল ব্যাঘ্রতে রাবণ যত দুর গনি।
যত দুর গনি রাবণ তৃণ আর আগুনি॥
সিংহ ব্যাঘ্রতে যদি উপমা দিতে পারি।
রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি॥
মক্ষিকা হয়্যা সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার।
খুদ্র হইয়া নিন্দা করিস পূর্ন্ন সংশোধর॥

(পৃঃ ১০।২)

ধন্য মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ।
মাএর এক সত্য তুমি করীহ পালন॥
বৈকুন্ঠের নাথ সেই প্রভু গদাধরে।
বানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে॥
অতিকা বলেন মাতা করি নিবেদন।
স্থার জুর্দ্ধ করিব কেবল লইয়া লক্ষ্মণ॥
অধমে কৃতার্থ যদি করেন গদাধরে।
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে॥
অতঃপর বিদায় মাতা তোমার চরণে।
এ জনমের মত আর নাহি দরসনে॥
মায়েরে প্রণাম করি রাবণকোঙর।
রামজয় শব্দ করি ডাকে উচ্চস্বর॥
আনন্দিত হইয়া তখন চারি বির সাজে।
রুশিয়া প্রেবেস কৈল সংগ্রামের মাঝে॥

ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী।
কটকের পদভরে কাপিছে মেদুনী ॥
ধুলায় অন্দকার করি জায় রাক্ষস বির।
ঠেলাঠেলি হইল গীয়া গড়ের বাহির ॥

(পৃঃ ৩৬।১)

তিন ভাই পড়িল দুই খুড়া জোদ্ধাপতি।
অনুমান করিছে অতিকা মহামতি ॥
বানরের সনে জুর্দ্ধ কোন প্রয়োজন।
নয়ান ভরি দেখি গীয়া রাজীবলোচন ॥
আনন্দে অতিকা জায় রাম দরশন।
মার মার করি আইসে জত বানরগণ ॥
দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাষ।
বিনা ভয় পৃত নাহি বুঝিলামাভাষ ॥
হাসিয়া অতিকা দিলা ধনুকে টঙ্কার।
সর্গ মত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে।
পলায় বানরগন না রহে নিকটে ॥
ডর পাইয়া জত বানর করে পলায়ন।
বলিতে লাগীল তবে রাবণনন্দন ॥
আমার রোশের জোগ্য নহে বানরগন।
কেন পলাইয়া জাহ লইয়া জিবন ॥
পাইয়া কথার পৃত বানর সকল।
আপনা আপনি বলে পথ ছাড়ি চল ॥
রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন।
কপি পথ ছাড়ে রামের আরতি বিহিন ॥
জেখানে বশীয়া আছেন কমললোচন।
সেইখানে অতিকা বির দিল দরশন ॥
সভা করি বসিয়াছেন কমললোচন।
বামেতে শুগ্রিব রাজা দক্ষিনে লক্ষন ॥
পদতলে বসিয়াছে ধার্ম্মিক বিভিষন।
জাম্বুবান আদি সভে করিছে স্তবণ ॥
একদৃষ্টে দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
রুপ দেখি মোহ পাইল রাবননন্দন ॥
রথে হৈতে অতিকা নামিল ভূমিতলে।
সজল নয়নে প্রনাম রামপদতলে ॥
কিত্তিবাষ পণ্ডীতের কবিতা বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্ব্ব রামায়ণ ॥ * ॥

(পৃঃ ৩৭।২)

সুন হে গোসাঞি তুমি কিছু যে বলিয়ে আমি
আমারে রাখিলে কি কারন।
আমি রঘুনাথের দাস মোরে করিলে নৈরাস
আজি হইল লক্ষনের মরন ॥
ভরথ আমার নাম সুন বাপু হনুমান
আমি হই রঘুনাথের ভাই।
চৌর্দ্দ বৎসরের সুখ রাম বিনে পাইল দুখ
আজি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞি ॥
এতো কহি ভরথ রাজা তবে কহে বানর তেজা
সুন রাম লক্ষনের কল্যান।
তোমার কঠিন হিয়া তিলেকে নাহিক দয়া
বনবাসে দিয়া প্রভু রাম ॥
বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম করিলে দারুন কর্ম্ম
রামচন্দ্রে বনবাস করি।
রার্য্যখণ্ড পাইয়া মোনে বসি রাজসিংহাসনে
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি ॥
বনবা[ে]স শ্রীহরি খর দুষন মারি
সিতা চুরি করিল রাবন।
সুগ্রীবেরে করি মিত খণ্ডিল রামের ভিত
সেতবন্ধ করিলা বন্ধন ॥
গিয়া রাম লঙ্কাপুরি কুম্ভকর্ন আদি করি
জত বির করিল নিধন।
রনে আইলা রাবন করিলা বিস্তর রন
সক্তিসেলে পড়িল লক্ষন ॥
রামের ক্রন্দন সুনি সুসেন বেজ বলে বানি
জাহ হনু গন্ধমাদন।

ঔসধি আনিবে জবে লক্ষন জিবেন তবে
প্রাত[ঃ]কালে লক্ষনের মরন ॥
অপরাধ নাহি করি আমারে বাঁটুল মারি
কেনে রামের না চিন্ত কুসল।
তুমি লইলে রার্য্য ধন রামচন্দ্র গেলা বন
সোকে রাম হইয়াছেন দুর্ব্বল ॥
সুনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা
শ্রীরাম বলিয়া ভরথ কান্দে।
কোথা গেলে পাব রাম ত্রিভুবনে অনুপাম
কিত্তিবাসের নাচাড়ি প্রবন্ধে॥* ॥
(পৃঃ৮৯১-২)

শেষ,—

রত্ন সিংহাষনে বসিলা রাম নারায়ন।
পুত্র হেন পালেন জতেক প্রজাগন॥
দুরন্ত রাক্ষষ মারি রাম গেলেন ঘরে।
ত্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে॥
সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্ত্তবাসি।
একোত্রেতে হইলা জত ত্রিভুবনের রিসি ॥
মুনি সব বলে রাম রাখিলে ত্রিভুবন।
অজোধ্যায় জাইয়া চল দেখি নারায়ন ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলেন জেই বির লক্ষন।
তাঁর তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন॥
ত্রিভুবনজই বির ইন্দ্রজিতে মারে।
পুষ্পমাল্য দিব গলে লক্ষনের তরে॥
দেবরিসি ব্রহ্মরিসি রাজরিসিগন।
ত্রিভুবনের মুনি হইলা একোত্রে মিলন॥
ত্রিভুবনের মুনিগন হইলা একর্ত্তরে।
রামধ্বনি করি জায় অজোধ্যানগরে॥
সর্ব্ব মুনি মনে মনে করেন তখন।
আমাদিগের এমন দসা করিবেন নারায়ন॥
এই জুক্তি মনে করি চলিল মুনিগন।
অন্তর্জামি ভগবান জানিলা কারন॥
সকল মুনি উপস্থিত অজোধ্যা নগরে।
রামনাম মন্ত্র জপেন ধিরে ধিরে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত।
জগতে করিলা তিহোঁ রামায়ন গিত॥
রামায়ন গিত করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯—৪২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। ৪১ সংখ্যক পাতাখানি অপর পুথির।

আরম্ভ,—

পাত্র মিত্র অজধ্যায় দাস দাসি জেবা।
সভারে বলিয় জেন করে মহারাজার শেবা।
সুনিয়া সুমন্ত হল জিয়ন্তেতে মরা।
বদন বাহিয়া পড়ে নয়ানের ধারা॥
লক্ষন বলেন সুমন্ত না কর্য বিশাদ।
কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ॥
তার বাড়া ত্রিভুবনে নাহি কঠিন হিয়া।
বনচারি করিলেন জটা বাকল দিয়া॥
অজধ্যার কণ্টক তার ঘুচিলাম জঞ্জাল।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরাল॥
আজি হৈতে রামনামে দেন জলাঞ্জলি।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরালি॥
ভরথে লইয়া করুন অজধ্যার সুখ।
অজধ্যার সুখে আমাদিগো বিধাতা বৈমুখ॥
সুনিঞা সুমন্ত কান্দে সিরে মারি ঘা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়য়ে গা॥
সুমন্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোলে।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৭॥০ টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত কয়েকটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব।" ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) দাশরথি হালদার (কালীঘাট) এবং (খ) কৃষ্ণলাল সাধু এম্ এ, বি টি (রাঁচী) মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১ম হইতে ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত বাঙ্গালা এবং ইংরেজি পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ডা: বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ত্ব" প্রবন্ধের সার মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। (এই সকল আলোচনা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৬। শোক-প্রকাশ—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নোক্ত দুই জন সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(ক) দাশরথি হালদার (কালীঘাট)।

(খ) কৃষ্ণলাল সাধু এম্ এ, বি টি (রাঁচী)।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "বসুমতী"র স্বত্বাধিকারী, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৮৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, আলিপুর, ২৪পঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ ঘোষ, সাকরাইল, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩এ, সেন লেন, নাথের বাগান। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিশ্বাস, ৮ গৌরীবাড়ী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচরণ মৈত্র এম্ এ, ৬৮।এ বীডন ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ৪ লাটুবাবু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার নায়েক, ৫ নিমতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৯ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মিত্র, ৫৯ মকবুলগঞ্জ রোড, লক্ষ্ণৌ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য, ৮ বাবুরাম শীল লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ১০ প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, কিউরেটার—ঢাকা মিউজিয়াম, রমণা, ঢাকা। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল, ডি লিট্, অধ্যাপক—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঠিকানা ঐ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৯ শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, শিক্ষক, ৭ গোপাল বিশ্বাস লেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌধুরিয়া বি এ, ৪২ আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত জহরলাল উদয়চাঁদের বাড়ী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, উপহৃত পুস্তক—১। বাঙ্গালীর বল। ২। চন্দ্রালোকে যাত্রা। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর—৩। খাদ্য (৪র্থ সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত—৪। উপদেশরত্নমালা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাজপেয়ী—৫। রামেন্দ্র-সুন্দর-জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত এককড়ি দে—৬। স্বদেশী-শিল্প। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৭। সুপ্রভাত, ৮। লিপিকা, ৯। নারীর প্রাণ, ১০। গরীব, ১১। দাবীদাওয়া। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল—১২। ঝড়ের আলো। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার—১৩। আসলে মেকি। শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী—১৪। প্রাচীনা স্ত্রী-কবি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—১৬। দিল্লী-অধিকার। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—১৭। মাণিক-জোড়। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী—১৮। ম্যাটসিনি ও মানবের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মুস্তফী—১৯। অরসিকের রসোদ্ভব, ২০। পথের ডাক, ২১। স্বপ্নভঙ্গ, ২২। পরিত্যক্ত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৩। জোড়-বিজোড়।

Le Editeur, Librairie Ancienne Honorè Champion. 1. Bulletin de la Societè de Linguistique de Paris, Nos. 74 & 75. The Officer-in-charge Bengal sectt. Book Depot. 2. Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1922-23. 3. Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1923. 4. Report on Public Instruction in Bengal for 1922-23. 5. Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1917-18 to 1921-22. 6. Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 7th July, 1924. 7. Index to the Proceedings, Vol. I, Nos. 2. 3. 4. 5. 6. The Secretary, Vivekananda Society. 8. Report of the Vivekananda Society for the year 1923. শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বসু—9. The Law of Mortgage and other Securities upon property, Vol. I. 10. Do Vol. II. 11. A Digest of Law Cases containing C. P. and Nagpur Law

Reports (1862—1910). Vol. II. 12. The Law of Crimes. 13. Phatak's Digest (1862—1912). 14. A Treatise on the Law of Fraud and Mistake. 15. Estoppel by Representation and Res Judicata in British India. 16. Desai's Point Noted Index of cases (1811—1912). 17. A Treatise on International Law. 18. The Institutes of Justinian. 19. A Treatise on the Law and Practice relating to infants. 20. The Trial of Muluk Chand for the murder of his own child or A Romance of Criminal Administration in Bengal. 21. The Indian Limitation Act being Act IX of 1908. 22. A Selection of Legal Maxims. 23. A Treatise on the Principles of the Law of Evidence. 24. The Great Barada Trial. 25. The Civil Procedure Code being Act V of 1908. 26. A Selection of the leading Cases in Equity, Vol. I. 27. Do. Vol. II. 27. The Central Provinces Revenue Manual. 29. The Code of Criminal Procedure (Act V of 1898). 30. Table of Cases cited. 31. Lectures on Jurisprudence. 32. The New Civil Court Manual. Vol I. 33. Do. Vol II. 34. Do. Vol III. 35. Full Reports of Decisions of Indian cases, Vol XIII, 1912. 36. Do. Vol. XV. 1912. 37. Do. Vol XVI 1912. 38. Do. Vol XVII 1912. 39. Do. Vol. XVIII 1913. 40. Do. Vol. XIX 1913. 41. Do. Vol. XX 1913. 42. Do. Vol. XXI, 1914. 43. Do. Vol. XXII, 1914. 44. Do. Vol. XXIII, 1914. 45. Do. Vol. XXIV, 1914. 46. Do. Vol. XXV, 1914. 47. The Central Provinces Land Revenue Act, 1917. 48. The Co-operative Societies Act. (Act. II of 1912) 49. The Land Acquisition Act (Act I of 1894). 50. The Code of Criminal Procedure being Act V of 1898. The Secretary, Shiromani Gurdwara Parbandhak Commitee. 51. The struggle for Freedom of religious worship in Jaito. 52. Do. Do. The Director, Geological Survey of India. 53. Records of the Geological Survey of India, Vol LV. Part 4. 1924. 54. Geological Map of Behar and Orissa.

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩৩১, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয়-লিখিত "জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ [হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন

পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে—অধ্যাপন (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), হোম (দেবযজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ) এবং অতিথি-পূজন (নৃযজ্ঞ)। জৈনগণ, হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ, প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের—দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায়, সংযম, তপস্যা ও দান অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে জৈনদের উক্ত ষট্‌কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে]। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (খ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (গ) চারুচন্দ্র মিত্র এবং (ঘ) রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় গত ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। এই কার্য্য বিবরণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (ত্রিংশ বার্ষিক) অধিবেশন স্থগিত থাকুক ; এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (ত্রিংশ বার্ষিক) অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া কোনই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না ; বরং ইহা দ্বারা পরিষদের ক্ষতি হইবে ; কাজেই এই অধিবেশন স্থগিত রাখা কোন মতেই সমীচীন নহে। এই অধিবেশনেই পরিষদের অবস্থা আলোচিত হইবার উপযুক্ত সময় ও স্থান। পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণের ভোটে দিলেন ইত্যাদি।" কিন্তু এই দিন অধিবেশনের কার্য্যাদি (Proceedings) ঐরূপ হয় নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কোন নূতন প্রস্তাব করেন নাই, তিনি মাত্র আমার (জ্যোতিষ বাবুর) প্রস্তাবই সংশোধন (amendment) করিতে চাহিয়াছিলেন। আর একই সময় দুইটি প্রস্তাব কি করিয়া ভোটে দেওয়া যাইতে পারে ? কোন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় তখন, যখন ঠিক একই প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই মত হয়—একটি স্বপক্ষে, অপরটি বিপক্ষে। এখানেও তদ্রূপ—"অধিবেশন স্থগিত থাকুক" এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে এক মত, আবার ইহারই বিরুদ্ধে এক মত। কাজেই শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু কোন নূতন প্রস্তাব করেন নাই ; এ বিষয়ে আমার আপত্তি রহিল ;—কার্য্যবিবরণের অন্যান্য অংশ গৃহীত হইতে পারে।

এই আপত্তির উত্তরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু দাঁড়াইয়া যে এই নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; এ বিষয়ে তাঁহার (সম্পাদক মহাশয়ের) স্মৃতির কোনরূপ অপলাপ হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, এই কার্য্যবিবরণ যে খসড়া হইতে লিখিত হইয়াছে, সেই খসড়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত। কাজেই

এ বিষয়ে কি করিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে, বুঝিলাম না। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সেই খসড়া সভাস্থলে আনাইয়া অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়কে দেখাইলেন। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বিষয় ত একই ; তবে ভাষার (technicalities) তফাৎ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু amendment করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু ঐ খসড়া নিজে হাতে নিয়া দেখিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার সেই আপত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, "শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে..............." এইরূপ ভাবে কার্য্যবিবরণ লিখিত হইলে উহা গ্রহণে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি ?

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, এইরূপ "সংশোধক প্রস্তাব" লিখিত হইলে উক্ত কার্য্যবিবরণ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নাই।

পরে কার্য্যবিবরণে "সংশোধক প্রস্তাব" লিখিত হইলে পর উক্ত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। তৎপরে বিশেষ ও মাসিক কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। "ক"—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত "খ"—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয় তাঁহার "জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, "প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আজ অনেক নূতন বিষয় আমাদিগকে শুনাইলেন। জৈন-ধর্ম্মের আলোচনা আমাদের দেশে অল্প দিন যাবৎ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। জৈনদিগের দৈনিক কর্ত্তব্য বিষয় প্রবন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, অবশ্য এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নাই, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও প্রশংসার বিষয়। প্রবন্ধকার মহাশয় অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়া জৈন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া গবেষণার সহিত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত মহাত্মগণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(ক)　গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—তিনি সুকবি ছিলেন।

(খ)　মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

(গ)　চারুচন্দ্র মিত্র।

(ঘ)　রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের শোক প্রকাশ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোকগতা সুকবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়া সম্বন্ধে বলিলেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; তাহার প্রমাণ এই যে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর দিন যখন তাঁহার মৃত দেহ কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে গঙ্গাজলে ধৌত করা হইতেছিল, তখন তিনি দূর হইতে তাঁহাকে (সুকবিকে) একখানি গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি তাঁহাকে স্যর আশুতোষের মৃত দেহ দেখাইবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষবাবু বলিলেন যে, অত্যন্ত লোকের ভিড়, এত জনতার ভিতর দিয়া আপনাকে তাঁহার মৃত দেহ দেখান অত্যন্ত কঠিন। আর আপনি এরূপ প্রবীণা হইয়াও তাঁহার মৃত দেহ দেখিতে এত উদ্বিগ্না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমি তাঁহার মৃত দেহ দেখিতে কেন যে এত উদ্বিগ্ন, তাহা আর কি বলিব! তিনি ভগবত্তুল্য লোক ছিলেন, আর বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এম্ এ উপাধির সৃষ্টি করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ যে কি ভাবে খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, এই সভার অধিবেশনের নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইবার পর ভূপেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করেন। সে জন্য অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের ভিতর উহার নাম দেওয়া হয় নাই। ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে এবং সমিতির নির্দ্দেশ মত কার্য্য করা হইবে।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে আমরা পরিষদের মধ্যে পাইবার জন্য অনেক দিন যাবৎই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। অদ্য আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পরিষদে পঠিত হইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ও বক্তৃতা দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ক-পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতি, ১২৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২১ রতন বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬এ রতন নিয়োগী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাগচি, ৬৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ২৩ মোহনবাগান রো। মহম্মদ হিদায়েদ হোসেন, ৭।১ রামশঙ্কর রায়ের লেন। শ্রীযুক্ত যতীশগোবিন্দ সেন পি এইচ্ ডি (লণ্ডন), প্যালেস হোটেল, ১৩৪বি, বৈঠকখানা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, পি এচ্ ডি, অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৫।১ হ্যারিসন রোড। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্লট নং ৪, কালীঘাট। শ্রীযুক্ত মোহিত-মোহন ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রনাথ বসু জমিদার, সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণা। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ৩ করিস চার্চ্চ লেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, Goods charitable Dispens ry. রুদ্রপুর, ২৪ পঃ। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ৩ প্রিয় মল্লিক রোড। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ, ১৩ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড। শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, রাসবাটী, ৯১ চিংরীহাটা রোড্। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস চৌধুরী, ঠিকানা ঐ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ৪৩ পদ্মপুকুর রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সিংহ, হেড্ ক্লার্ক, সেক্রেটারীর আফিস, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ৩।৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস, চিত্রকর, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহ, ঠিকানা ঐ। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু সরস্বতী, Vice Principal India School of Accountancy, Associate Editor, Success-Post Box-2020, Calcutta. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার এবং কণ্ট্রাক্টর, ১০২ আহিরী-টোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০১ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ নিবেদিতা লেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঘোষ, ৪ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় গলি, গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ, ৩ বীরচাঁদ গোস্বামীর গলি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসু এম এস সি

৩ নীলমণি সরকার লেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, Rali's section, E. B. Ry. কয়লাঘাট। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বসু, মোক্তার, হাওড়া কোর্ট, ৩ নীলমণি সরকারের লেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ৮৫ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৬৭ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, ৭০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-মোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি টি, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, শিলং। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আই এস ও, রায় সাহেব, ২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর।

থ-পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য (টিলক), ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্য), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, ৪। নিবেদিতা, ৫। গীতি-কুসুমাঞ্জলি, ৬। ইঙ্গিতকুসুমাঞ্জলি, ৭। উক্তি-কুসুমাঞ্জলি, ৮। আকাশ-বাণী, ৯। গার্হস্থ্য চিকিৎসা, ১০। কারাকাহিনী, ১১। সেতুবন্ধ যাত্রা, ১২। সিদ্ধজীবনী। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—১৩। পাখী। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার,—১৪। নসিরুদ্দিন, ১৫। জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বা আকাশরহস্য। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা,—১৬। বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি,—১৭। বোলশেভিকবাদ। শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, ১৮। বৈষ্ণবদর্শনে জীবতত্ত্ব, ১৯। ঐ।

The Chief Inspector of Explosives in India. 1. Twenty fifth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1924. The Supdt. Govt. Printing, India,—2. Memoirs of the Archæological Survey of India. No. 18. (Hindu Astronomy) শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—3. The Lure of the Cross. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—4. Talk of the Town 5. Outlines of the Hindu Metaphysics. 6. Sri Krishna : The Saviour of Humanity. 7. Haridasi. 8. My Confession. 9. Siva and Buddha. 10. Sadhu and other lives. 11. English Seamen. The officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-depot.—12. Resolution Reviewing the Reports on the working of Municipalities in Bengal during the year 1922-23. শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—13. Vegetable Drugs of India.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "অর্থশাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ (ইহা শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুর লিখিত মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের পঞ্চমাংশ।) ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ষোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ও (খ) চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেন মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি উপস্থিত করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, ৯০৩ খানি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক এবং ২০ খানি প্রাচীন পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ৭২০ খানি (ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয়ের নিকট ৪৫ খানি, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয়ের নিকট ৫১ খানি, আর্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে ২১ খানি এবং অবশিষ্ট অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দানের জন্য প্রদাতৃগণ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে।

৪। প্রস্তুত না থাকায় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "অর্থ-শাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, লেখক মহাশয় ঐ কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এ দেশের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার চিত্র দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিশারদ মহাশয় বলিলেন, এক শ্রেণীর লোকে প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে বিশ্বাস করেন না, এই জন্য তাহার আলোচনাও হয় না। তাহা ঠিক নহে। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যে ঐ যুগের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের বিষয়। পুরাকালেও ইতিহাসের আলোচনা হইত। কেবল যে রাজা ও রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইত, তাহা নহে– নানা শাস্ত্রের, দর্শন বিজ্ঞানেরও আলোচনা হইত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার দ্বারা যাহাতে আর্য্যগণের গৌরব প্রকাশ পায়, তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রের প্রতি পক্ষের হ্রাস বৃদ্ধির মূলে যে পৌরাণিক ইতিহাস রহিয়াছে, বক্তা মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহা বিবৃত করিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বিশেষ স্নেহ-ভাজন—তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ও সংকর্ম্মী ছিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই বিষয়ে লেখক মহাশয়ের চারিটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ পাইবার আশা করেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, [ক] চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন ও [খ] ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা যোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৺গৌরহরি বাবুর চেষ্টাতেই চৈতন্য লাইব্রেরী কলিকাতায় অন্যতম প্রধান লাইব্রেরীরূপে আজ বিরাজ করিতেছে। সরকারী লাইব্রেরী ছাড়া এই লাইব্রেরীকে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী বলা যাইতে পারে। ৺যোড়শী বাবু মোটর গাড়ীতে আঘাত লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি পরিষদের একজন অতি পুরাতন সদস্য ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

অতঃপর এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় Mc, L·gan Engineering College, লাহোর ? প্রঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিন্ধুকুমার সরকার, ৭৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হেলথ অফিস, Dis No. 1. প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন আই সি এস্, সাবডিবিশনাল অফিসার, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত, ১৪১বি কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, সিনেট হাউস, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ৪১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী, "সেরপুর হাউস", টীকাটুলী, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর এম্ এ, সিটি কলেজ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ চৌধুরী এম্ এ, ৪২ নীলখেত রোড্, রমণা, ঢাকা; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী বি এ, বি এস্ সি, জমিদার, সহর সেরপুর, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী, ঠিকানা ঐ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উপহৃত পুস্তক—১। ভারতোচ্ছ্বাস (পঞ্চম জর্জ্জের সাম্রাজ্যাভিষেক), ২। ঐ (সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ), ৩। ঐ, ঐ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,—৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (হিন্দী), ৫। শ্রীকৃষ্ণলীলা, ৬। দোঁহাবলী, ৭। বাঙ্গালার প্রতাপ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত— ৮। ভারতেশ্বরী ও ভারত-সম্রাট, ৯। সচিত্র প্রেমপত্রাবলী, ১০। সনাতন ধর্ম্ম-সঙ্গীত, ১১। আনন্দোচ্ছ্বাস-সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,—১২। ইলেকট্রিক পাখা, ১৩। ইলেকট্রিক্ মেসিন প্রভৃতির দোষ ও প্রতিকার। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ব্যতিক্রম। ১৫। অসীম। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত—১৬। ভারত-ললনা। শ্রীযুক্ত রায় নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত বাহাদুর—১৭। ভারত-রাষ্ট্রনীতি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,—

১৮। ভাস্করানন্দ-চরিত। শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ—১৯। শ্রীরাধা-পরিদেবনম্। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২০। গো-জীবন। শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়—২১। অন্তিমে "মা"। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী - ২২। মহাভারত-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু—২৩। ভাদুরে, ২৪। মালসা-ভোগ, ২৫। সখের সয়তানী। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ—২৬। যোগশাস্ত্র। শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ—২৭। ছন্নছাড়া, ২৮। সুহাস, ২৯। মণ্টুর মা। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় ভাগবতভূষণ—৩০। উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, ৩১। ঐ ১১শ বর্ষ, ৩২। ঐ ১২শ বর্ষ, ৩৩। ঐ ১৩শ বর্ষ, ৩৪। ঐ ১৪শ বর্ষ, ৩৫। ঐ ১৫শ বর্ষ, ৩৬। ঐ ১৬শ বর্ষ, ৩৭। ঐ ১৭শ বর্ষ, ৩৮-৩৯। পন্থা (১২শ ও ১৩শ বর্ষ), ৪০। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং। ৪১। ললিতমাধবনাটকং। ৪২। বিদগ্ধমাধবনাটকং। ৪৩। অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ। ৪৪। প্রেমবিলাস, ৪৫। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী। ৪৬। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতং, ৪৭। দানকেলিকৌমুদী, ৪৮। মানবের আদি জন্মভূমি (৩য় ভাগ)। ৪৯। শ্রীমদ্ভাগবত (অনুবাদ), ৫০-৫১। ঐ (১ম ও ২য় খণ্ড) (মূল), ৫২। সচিত্র রাজস্থান, ৫৩। রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী, ৫৪। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, ৫৫। শ্রীকৃষ্ণমাধুরী, ৫৬। মধুর মিলন, ৫৭। সাধন-সংগ্রহ, ৫৮। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, ৫৯। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (পূর্ব্বভাগ), ৬০। ঐ (উত্তরভাগ), ৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থ, ৬২। ললিত মাধব, ৬৩। বিদগ্ধ মাধব, ৬৪। দৃঢ় রসিক অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৬৫। বরদার প্রার্থনা, ৬৬। সহজ ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-লহরী, ৬৭। গীতি-পুষ্পহার, ৬৮। শ্রীগৌরার্চ্চন প্রয়োগঃ, ৬৯। মহাযজ্ঞ, ৭০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং, ৭১। পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন, ৭২। অন্ধের চক্ষুঃদান। ৭৩। স্রক্, ৭৪। বীণা, ৭৫। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, ৭৬। প্রেমের ডালি, ৭৭। ভক্তজীবন, ৭৮। শ্রীনামমন্ত্র-চিন্তামণি, ৭৯। সদুক্তি-সংগ্রহ, ৮০। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র, ৮১। হারা'ণ গীতাবলী, ৮২। গুরুদক্ষিণা। সম্পাদক, বঙ্গ-বিহার অহিংসা-ধর্ম্ম-পরিষৎ—৮৩। জৈন ত্রিরত্ন (২ খানি), ৮৪। জৈন পদ্মপুরাণ। সম্পাদক, গুজরাট পুরাতত্ত্ব মন্দির ৮৫। সম্মতিতর্কপ্রকরণং। রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী—৮৬। রচনা-সংগ্রহ (Intermediate Bengali Selection)। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর রায়—৮৭। শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত। সম্পাদক, কাশীধাম ব্রাহ্মণ-সভা—৮৮। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ। আর্য্য পাব্লিশিং হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ—৮৯। ইরাণী উপকথা, ৯০। দ্বীপান্তরের কথা, ৯১। উড়ো চিঠি, ৯২। কারা-জীবনী, ৯৩। নিগৃহীতা, ৯৪। গল্পের আরম্ভ, ৯৫। সাহিত্যিকা, ৯৬। ধর্ম্ম, ৯৭। বাঙালীর ব্যবসাদারী। ৯৮। মায়ের কথা, ৯৯। পণ্ডিচারীর পত্র। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ১০০। খাদ্য-কথা, ১০১। ষড় অবতার। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়, ১০২। নানা কথা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানমণ্ডলের সম্পাদক, কাশী—১০৩। অন্তারাষ্ট্রীয় বিধান, (হিন্দী)। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট—১০৪। কৃপণের কর্ণমর্দ্দন, ১০৫। মৃতের পুনর্জীবন, ১০৬। তস্কর-তনয়া, ১০৭। বিলাতী বণিকের কীর্ত্তি, ১০৮। ফিরিঙ্গীর

প্রতিহিংসা, ১০৯। অপূর্ব্ব সহযোগ, ১১০। রাজকীয় গুপ্তকথা, ১১১। লেডী ডাক্তারের লেড়কা। ১১২। প্রসাদ, ১১৩। অঞ্জলি, ১১৪। মনীষা, ১১৫। মলয়া, ১১৬। তারা ও রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, ১১৭। অবসর-সঙ্গিনী, ১১৮। উপেক্ষিতা, ১১৯। কারবার, ১২০। সরল কৃষিবিজ্ঞান, ১২১। শ্রীভগবৎকথা, ১২২। শ্রীব্রহ্মানন্দ বচন, ১২৩। বেঙ্গল পুলিশ কার্য্যবিধি, ১২৪। আইন ও আদালত, ১২৫। প্রস্তাবিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সরল মর্ম্মানুবাদ, ১২৬। শৈতানী লীলা (হিন্দী), ১২৭। নমাজ শিক্ষা, ১২৮। ফকবায পুথি, ১২৯। অসমীয়া ধন্বন্তরী নিদান বা বৃহৎ বৈদ্যসার, ১৩০। পৌরাণিক কথা, ১৩১। উড়ো জাহাজ, ১৩২। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ, ১৩৩। গীতা, ১৩৪। সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতি, ১৩৫। যখের আমল, ১৩৬। বিশ্বাসঘাতক, ১৩৭। তস্কর ও ডাকাত, ১৩৮। ঘরের ঢেঁকি, ১৩৯। বিভীষিকা, ১৪০। শয়তান, ১৪১। পাপনিধি, ১৪২। ঠাকুরদাদার গল্পের ঝুলি, ১৪৩। প্রাথমিক শিক্ষা সহচর (হিন্দী), ১৪৪। শ্লোক-মালা, ১৪৫। মহাবিদ্যা স্তোত্রম্, ১৪৬। পাব্লিক ভ্যাক্সিনেটার্স গাইড, ১৪৭। ভিষক্সহচর, ১৪৮। ভৈষজ্যসার, ১৪৯। শ্রীমদ্ভাগবত (পদ্য), ১৫০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১৫১। গোলে হররোজ, ১৫২। সুন্দরী বেলওয়া মানিকের কেচ্ছা, ১৫৩। ছহি আহকাম-ছালাত, ১৫৪। চাহার দরবেশ, ১৫৫। লায়লি মজনু, ১৫৬। নুরেনেহার সাহাজাদি, ১৫৭। তুতিনামার পুথি, ১৫৮। ধর্ম্ম মিহির, ১৫৯। ছেরাজোল হক (২য় খণ্ড), ১৬০। গাজিকালু ও চম্পাবতি, ১৬১। চোরহানোল বা মজাহার মীমাংসা, ১৬২। আদি পুস্তক, (Holy Bible), ১৬৩। পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম (ঐ), ১৬৪। বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, ১৬৫। চৈতন্যলীলা নাটক, ১৬৬। যুগল মিলন, ১৬৭। নিমাই সন্ন্যাস, ১৬৮। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১৬৯। যোগিনীতন্ত্রম্, ১৭০। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ১৭১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১মাংশ, ১৭২। কার্পাস আবাদ, ১৭৩। গানওয়ালী, ১৭৪। বালচিকিৎসা, ১৭৫। জ্বরচিকিৎসা, ১৭৬। শিক্ষাপ্রচার, ১৭৭। songs of Service (তিব্বতীয়), ১৭৮। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৫—১২ সংখ্যা, ৩য় ভাগ, ১।২ সংখ্যা, ১৭৯। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ম বর্ষ, ১—৮, ১১—১২ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১, ২, ৩, ৯, ১০ম সংখ্যা, ১৮১। সাহিত্য-সংবাদ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮২। শাশ্বতী, ১ম খণ্ড, ১ম, ২য় সংখ্যা, ১৮৩। গল্পলহরী, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ, ৫-৬, ৭-৮, ৯-১০, ১১-১২ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ৬ষ্ঠ সম্পূর্ণ, ৭ম বর্ষ, ১—৮ম সংখ্যা, ১৮৪। গৃহস্থ, ৪র্থ বর্ষ, ৮, ৯, ১০ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ১—১০ম সংখ্যা, ১৮৫। সম্মিলনী, ১১শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১২শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৩শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৪শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৮৬। সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৮৭। শিক্ষা-সমবায়, ২য় বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, ১৮৮। সৌরভ, ১ম বর্ষ, ৫—১০ সংখ্যা, ১৮৯। সমাজ-চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯০। সন্দেশ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯১। সুপ্রভাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯২। হিন্দুপত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ১, ২, ৩ সংখ্যা, ১৯৩। স্বাস্থ্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,

১৯৪। সরণী, ১ম বর্ষ, ১—১১ সংখ্যা, ১৯৫। সোপান, ৪র্থ ভাগ, ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, ১১ ও ১২ সংখ্যা, ১৯৬। পল্লীবাণী, ২য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ৩য় বর্ষ, ১ম-৪র্থ, ৬ষ্ঠ-১১শ সংখ্যা, ৪র্থ সম্পূর্ণ, ৫ম বর্ষ, ১—৪ সংখ্যা, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৯৭। যোগবল, ২য় বর্ষ, ৩য়-৪র্থ, ৫-৬ষ্ঠ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৮। যুবক, ১৭শ ভাগ, ১ম, ২য়, ১৯৯। যমুনা, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ২০০॥ যোগীসখা, ১৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৭শ বর্ষ, ৬—১২ সংখ্যা, ১৮শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০১। তিলিসমাচার, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০২। দীপালি, ১ম বর্ষ, ১, ২, ৩, ৪, ৭ সং, ২০৩। ধ্রুবতারা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০৪। বাঁশী, ৪র্থ বছর, ৭, ৮, ৯ সংখ্যা, ৮ম বছর, ১—৯ সংখ্যা, ২০৫। বঙ্গদর্শন, ১৩শ বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা, ২০৬। বিজুলী, ২য় ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ২০৭। তিলিবান্ধব, ২য় বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২০৮। তোষিণী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২০৯। তারা, ৫ম বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা, ৪—১২শ সংখ্যা, ২১০। বৈশ্যপত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২১১। ব্যবসায়ী, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২১২। বিকাশ, ১ম বর্ষ, ৩য়—৫ম সংখ্যা, ২১৩। বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২১৪। বৈষ্ণবসমাজ, ৩য় ভাগ, ১ম ২য়, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, ২য় ৩য়, ২১৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯ সংখ্যা, ২১৬। বাণী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২১৭। ভারতমহিলা, ৮ম ভাগ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা, ৯ম ভাগ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২১৮। আয়ুর্ব্বেদবিকাশ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২১৯। আয়ুর্ব্বেদপত্রিকা, ১ম ভাগ, ৯ম ১০ম সংখ্যা, ২২০। আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২১। অঞ্জলি, ১ম বর্ষ, ১—৬, ১০ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২২২। অবসর, ৯ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ২২৩। আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ২য় ৩য় সংখ্যা, ২২৪। কায়স্থসমাজ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ১-৬ সংখ্যা, ২য় ভাগ, ১—৬ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১-৭ সংখ্যা, ১১শ, ১২, ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৫। কুশদহ, ৫ম বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৬। চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা, ২২৭। কৃষিসম্পদ, ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৮। কাজের লোক, ১১শ সম্পূর্ণ, ১২শ সম্পূর্ণ, ১৩শ সম্পূর্ণ, ১৪শ ১ম—৮ম, ১১শ—১২শ সংখ্যা, ১৫শ সম্পূর্ণ, ১৬শ সম্পূর্ণ, ১৭শ ১ম—৫ম সংখ্যা, ২২৯। হাকিম, ১ম বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩০। রৌদ্রপালপ্রবোধিনী, ১ম সংখ্যা, ২৩১। উপাসনা, ৯ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, ২৩২। নববাণী, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২৩৩। নাট্য পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৩৪। প্রতিভা, ২য় বর্ষ, ১১ ১২শ সংখ্যা. ২৩৫। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩৬। প্রভাত, ১ম ভাগ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২৩৭। শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর, ১ম ভাগ, ১ম কিরণ, ২৩৮। প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২৩৮। ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ১ম. ২য় সংখ্যা, ২৩৯। ভারতী, ৩৭শ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২৪০। ইসলাম আভা, ১ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২৪১। মহাজনবন্ধু, ১৩শ বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা।

The Secretary, Smithsonian Institution—1. Exploration and Field-work of the Smithsonian Institution in 1923. 2. Additional Designs on Prehistoric Mimbers Pottery. 3. The Brightness of Lunar Eclipses 1860-1922. 4. Opinions rendered by the International commission on Zoological Nomenclature. 5, Cambrian and Ozarkian and Brachiopoda, Ozarkian Copholopodia and Notostraca. 6. Geological Formations of Beaverfoot-Brisco-standford Range, British Columbia, Canada. Sj. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বসু 7. Left her home; 8. The Intellectual Life; 9. A Book of Remarkable criminals; 10. Sacrifice and other plays. 11. Bengal Fairy Tales; 12 Hungry Stones. 13. The Wreck, 14. Life and Work of Romesh Chandra Dutt. C. I. E, 15. Studies in Early Indian thought. 16. The Soul of Germany. 17. William of Germany 18. Indian Nation Builders, part I. 19. Do, part II. 20. Do, part III. 21. The Masterpiece Library of short stories, Vol. XIV (American) 22. The Life of Swami Vivekananda, Vol. I. 23. Do, Vol. II. 25. Do. Vol. III, 25. Do, Vol. IV. 26. Inspired Talks. 27. The Treasure of the Humble. 28. Bulls: Ancient and Modern, 29. Mashi and other Stories. 30. The Conduct of Life and Society and solitude 31. Macaulay's History of England (Chapter I.) 32 Macaulay's Essays on Addison 33. The Heroes. 34. De Quincey's Revolt of the Tortars and the English Mail-coach. 35 A short History of the great war. 36. Visions and Judgments.37. The warden. 38. Letters of William Cowper. The Life of William Ewart Gladstone 39. A Book of Golden Deeds. 40. The Speeches and Table-talk of the Prophet Mahammad. 41. The Golden Sayings of Epictetus. 42. Thoughts are Things. 43. Jack's Reference Book for Home & Office. 44. Institutes of Musalman Law. 45. The Code of Criminal Procedure being Act, 1882. 45. Digest of cases; 47. The Unrepealed Acts of the Governor General in Council from 1883 to 1898 48. Indian Penal Code (Act. XLV of 1860). 49. The Indian Evidence Act. 1872 and Indian oaths Acts, 1873. 50. Calcutta University Calender. 1910. 51. Full notes on Dicken's Tale of two cities. 52. Code Civil Procedure, 1908. The officer-in-charge, Bengal Sectt., Book Depot. 53. Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1923. 54 Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the

year, 1923. 55. Council Proceedings of the Bengal Legislative Council sixteenth session, 1924, Vol. XVI. The Supdt. Naval Observatory. Washington D. C. 56. The American Ephemeries and Nautical Almanac for the year 1926, The Manager, Central Publication Branch, Govt. of India, 57. Indian Education in 1922-23 58, Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year, 1922-23. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—59. The Economy of Human Life. The Supdt. Govt. Printing, Rangoon, Burma 60. Report of the Superintendent Archæological Survey, Burma for the year ending 31st. March 1924. The Director of Industries, Bengal. 61. Improvement on the Manufacture of shellac (গালা প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতি সাধন) The Manager, Arya Publishing House. 52. Twelve years of Prison Life ; 63. The Coming Race. 64. Baji Probhu. 65. A system of National Education 66. Evolution. 67. The Superman ; 68. Thoughts and Glipmses. 69. Yogic Sadhan. 69, Songs to Myrtilla 79. Speeches of Sri Aurobindo Ghosh. কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—71 Pet Birds of Bengal Vol, I. The Manager, Oxford University Press 72 Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office. 73. Catalogue of the Oriya Manuscripts in the library of the India office The Supdt. Govt Printing, India. 74. Memors of the Archæological Survey of India, No 16. (The Temple of Siva at Bhumara) 76. Memoirs of the Archæological Survey of India. No. 17 (Pallava Architecture) The Supdt Govt. Press, Madras. 76. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts, in the Govt. Oriental Mess Library Madras, Vol. XXV. Suplemental. The Hony. Secretary, Watson Museum of Antiquities, Rajkot. 77. Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, 1923-24. The Asst. Secy. to the Govt of India, Deptt. of Education and Health (Books Distribution)—78. Proceedings of meetings of the Indian Historical Records Commission, Vol. VI, Madras, 1924. The Director, Geological Survey of India—79. Records of the Geological Survey of India, Vol LVI. Part 2, 1924. The Librarian, Bengal Library Govt. of Bengal.—80. Records of the Indian Museum. 39 Copies. 81. Memoirs of the Indian Museum, Vol. VII. No. 4. 82. Memoirs of the Indian

Meteorological Deptt. Vol XXIV. Part III. 83. Transactions of the Mining and Geological Institute of India, 6 copies 84. Journal of the Photography Society of India, 26 Copies. 84. The Presidency College Magazine, 17 Copies. 36. The Hindu School Magazine, 20 Copies. 87. The Hare School Magazine, 19 Copies. 88. The Hooghly College Magazine, 9 Copies. 89. The Modern Review, 2 Copies 90. East and West ; July, Augt., Sept., Oct. 1920 ; 4 Copies. 91. The Calcutta Review, No 291 Jan. 1918, 92 Indo-Portuguese Review, Vol. V 1922-23 93. The Dawn Vol. XVI. No. 4 & 5 94. The Dacca Review, 5 copies. 95. The Dacca Collegiate School Magazine, 3 Copies. 99. Patna College Magazine, 7Copies 97 Edward College Magazine, 2 Copies. 98. Rajshahi College Magazine, 4 Copies. 99. Pirojpur Govt. H. E. School Magazine, 10 Copies. 100, Ripon College Magazine, 13 Copies. 101. Krishnagore College Magazine, 14 Copies. 102. Krishnagore Collegiate School Magazine, 17 Copies. 103 Bangabasi College Magazine, 13 Copies, 104. Welfare, Vol I Nos. 1,2 105. Bethune College Magazine, Vol. I. No. 7. 106. Bengal Agricultural Journal, Vol. II. No. 3. 107. The College Magazine (Chittagong) 3 Copies. 108. Cooch Behar College Magazine, 2 Copies 109. Carmichæl College Magazine, 5 Copies. 110. Scottish Churches College Magazine, 11 Copies. 111. St. Paul's College Magazine, 10 Copies. 112. Midnapur College Magazine, 10 Copies. 113. Metropolitan Institute Magazine, 3 Copies 114 Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol VII, Part III & IV. No. 115. Echoes. 116. Denizens of the Jungles

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়ের
পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৫॥০ টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে পরলোকগত পণ্ডিতরাজের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়কে 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ে প্রথম দর্শন করি। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আমার সামান্য পরিচয় দেওয়ামাত্র তিনি একেবারে প্রসন্ন-হাস্যে আমাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। তাঁহার বিপুল সহৃদয়তা, অপূর্ব্ব সরলতা ও মহান্ উদার হৃদয়ের সেই জীবন্ত চিত্রটি আজিও ভুলিতে পারি নাই। এক হিসাবে পণ্ডিতরাজ সে কালের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অনুকূলতা প্রকাশ করিতেন। মাইকেল মধুসূদনের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মধুসূদনেব আদর্শে তিনি "দ্রৌপদী" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন, "মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মের আবরণে একজন পূর্ণ হিন্দু ছিলেন।" ইহাতে মধুসূদনের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান সাহিত্যে সঞ্জীবন-রসের অভাব, প্রাণহীনতা ও নির্জ্জীবতার বিষয় তিনি ১৩২০ সালে কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ অভিভাষণে তিনি মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"একদিন উত্তর-গোগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিলেন; প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধজয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়োনিধির ঘোরগর্জ্জনে দিগ্বিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্কণ, বেণুধ্বনি ও নূপুর-শিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন - এই জন্য দুঃখ হয়।" তিনি কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। সকল সাহিত্যিককেই উৎসাহিত করিতেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় "পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবে উত্তরবঙ্গের ও সমগ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের একটী উজ্জ্বল রত্নের লোপ হইয়াছে। তিনি রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের আবাস ছিল এবং অসংখ্য টোল ছিল। বঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিত কত্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। কৈশোরে তিনি বারাণসীধামে শিক্ষার জন্য

গমন করেন। তথায় ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া কুইন্স কলেজের প্রধানাধ্যাপক গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব তাঁহাকে উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। সে সময়ে উক্ত কলেজে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ ভিনিস্‌ও পাঠ করিতেন। বারাণসী হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি রঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও পরে ঐ বিদ্যালয় রঙ্গপুর কলেজে পরিণত হইলে তথায় অধ্যাপনা করেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ স্থানটী অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় কলেজটী উঠিয়া যায়। তখন নানা স্থান হইতে অধ্যাপকতা করিবার জন্য আহূত হইলেও তিনি দেশে থাকিয়া রঙ্গপুরকে নানা শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র করিবার জন্যই রঙ্গপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দেশীয় জমিদারগণ ও কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীতে (পাকা টোলে) দেশবিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী সমবেত হইত। তাঁহার একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যাপনায় তুল্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনাপূর্ব্বক সমালোচনা করিতে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে ও ভাগবত ব্যাখ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাকিনাধিপতি রাজা শম্ভুচন্দ্র এক সময় বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে তাঁহার রাজধানীতে নবরত্নের সমাবেশ করেন। পণ্ডিতরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 'হেমোদ্বাহকাব্য' ও 'বিজয়িনী কাব্য' প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উক্ত নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর, গ্রিয়ার্সন সাহেবের Linquistic Survey of India রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। উক্ত নবরত্নের অন্যতম রত্ন তারাশঙ্করের বংশধর হরশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" পত্রিকা রাজা শম্ভুচন্দ্রের পরিচালনে কাকিনা হইতে যখন "রঙ্গপুর-দিক্‌-প্রকাশ" নামে প্রকাশিত হয়, তখন পণ্ডিতরাজ এই পত্রিকায় এবং রাজসাহী হইতে প্রকাশিত "হিন্দু-রঞ্জিকা"য় বহু সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। কাশীতে শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁহার অধ্যাপক ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তিনি "তর্করত্ন", নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজের নিকট "পণ্ডিতরাজ", বারাণসীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট "কবিসম্রাট্‌" এবং ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের নিকট "পণ্ডিতকেশরী" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে 'শ্রীকণ্ঠ,' শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিদ্যারত্ন,' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে 'পঞ্চানন', মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে 'তত্ত্বসরস্বতী,' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে 'বিদ্যাভূষণ' এবং স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 'সরস্বতী' উপাধি দান করিয়া বিশেষ প্রীতি বোধ করিয়াছিলেন।

তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পণ্ডিতা রমা-

বাঙ্গী ইঁহার সহিত কবিতায় কথোপকথন ও সমস্যাপূরণ করিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। "মিত্রগোষ্ঠী," "বিদ্যোদয়" প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি সংস্কৃত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "বাণবিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুভদ্রা-হরণ, চন্দ্রদূত, প্রশান্তকুসুম, অশ্রুবিন্দু, রাজ্যাভিষেক-কাব্য, রত্নকোষকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণাস্তোত্রং, শিবস্তোত্রং, গঙ্গাদর্শনকাব্যং, ভারতগাথা প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তনের পর হইতে তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত বোর্ডের মাননীয় সদস্যরূপে গৃহীত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি।

বাঙ্গালা ভাষা এবং তাহার আলোচনা ও প্রসারের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক সময়ে তিনি ঐ শাখার সভাপতি ছিলেন। উত্তরবঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণ ঐ শাখা-পরিষদে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়ার অধিবেশনে তিনি সভাপতি-পদে বৃত হন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'মেঘনাদ বধে'র অনুকরণে "দ্রৌপদী" কাব্য রচনা করেন। ভাষা-সাহিত্যে তিনি অধিক গ্রন্থ না লিখিলেও তাঁহার "সংসার-নিরসন", "অশোক" (উপন্যাস), "একাদশীতত্ব", "ত্রিসন্ধ্যাতত্ব' উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আশা কাব্যের সমালোচনা, মৃণালিনীর সমালোচনা, বিলাতি বিচার, আমি একটি অবতার প্রভৃতি কতকগুলি সমালোচনা ও সামাজিক নক্সার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিম-যুগের লোক হইয়া অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুর প্রণালীতেই মাতৃভাষার সেবা করিতেন। কবি স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তিনি বিদ্যাপতির ছন্দে পত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বৈদেশিক সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মিঃ এফ এচ স্ক্রাইন, মিঃ বেভার্লি রিজলি, স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন, স্যর উইলিয়ম গেইট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি বারাণসীধামে বাস করিতেন। সেখানেও তিনি তাঁহার বাড়ীতে সাহিত্যিকের বৈঠক জমাইয়া তুলিতেন।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া, বঙ্গভঙ্গের ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক Special Constable নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমানিত হন এবং

তাঁহার উপাধি ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তৎপরে রাজসরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করেন।

তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের প্রতিকূলে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদিগের ব্রাত্যত্ব ইনি প্রমাণ করেন, কিন্তু ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর হওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। কলিতে বাল্যবিবাহ ও গান্ধর্ব বিবাহ চলিতে পারে, ইহাই তাঁহার মত ছিল। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও রাজনৈতিক মতের উল্লেখ করিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহাকে political পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতরাজের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ দীন হইয়াছে ও উত্তরবঙ্গ তমসাবৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"উত্তর-বঙ্গের বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিতরাজের তিরোধানে দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অদ্য বক্তৃবর্গের বক্তৃতায় সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় প্রথম তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পরে রাজসাহি ও দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ এবং কবিত্ব-শক্তি বরণীয় ছিল। সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যে তিনি অকপট যোগদান করিতেন। এরূপ পণ্ডিত ও কবিকে হারাইয়া বঙ্গভাষা দীনা হইয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় তিনি জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেছিলেন।" অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"উত্তরবঙ্গের প্রাণস্বরূপ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক, সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যের সহায়ক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা দীনা হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই. আই এস ও, এম বি, এফ সি এস—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন, এম এ মহাশয়ের "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশন দুইটির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। কোন প্রস্তাব উপস্থিত না থাকায় কোন সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন হইল না।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত ১৫ খানি প্রাচীন পুথি, ২৫ খানি বাঙ্গালা ও ৮ খানি ইংরেজী পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেন এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুথি-গুলির মধ্যে জীবগোস্বামীর ভাগবতসন্দর্ভ (ষট্‌সন্দর্ভ) পুথিখানি দুষ্প্রাপ্য—এ পুথি অন্য কোন লাইব্রেরীতে নাই। এই পুথি পাইয়া পরিষদের পুথিশালার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইল। "ক" পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" নামক প্রবন্ধলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধের সার মর্ম্ম পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর সম্পাদক, উপহৃত পুস্তক,—

[১] The Indo-Aryan Races, Vol. I, [২] A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society,

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা—[৩] Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I, [৪] The Life and Work of Buddhaghosa. [৫] The Buddhist Conception of Spirits. [৬] Historical Gleanings. [৭] The Law of Gift in British India. [৮] Rent Acts, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক—(৯) Report of the Maju Public Library for 11 years from 1913—24. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১০) বিদ্যাসাগর. (১১) শ্রীরামানুজ-চরিত, (১২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম ষট্‌ক, (১৩) ঐ, ২য় ষট্‌ক, (১৪) আত্ম-চরিত, [শিবনাথ শাস্ত্রী] (১৫) ভারতের সাধনা, [১৬] ঋদ্ধি, [১৭] বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত, [৮] মানসী, ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৮—১৯, [১৯] ঐ, পঞ্চম বর্ষ, ১৩২০ [৮ম—১২শ সংখ্যা], [২০] ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, [২য়—৭ম সংখ্যা], [২১] ঐ, ঐ, ১৩২১ [বৈশাখ—আশ্বিন], [২২] ঐ, ঐ, ২য় খণ্ড, ঐ, [কার্ত্তিক—চৈত্র], [২৩] মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১১শ বর্ষ, ১৩২৫—২৬, [২৪] ঐ, ১২শ বর্ষ, ১৩২৬—২৭, [২৫] ঐ, ১৩শ বর্ষ ১৩২৭—২৮, [২৬] শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক—[রাজসাহী],—[২৭] কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা, ১ম ভাগ, [২৮] ঐ, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, [২৯] ঐ, ঐ, ২য় খণ্ড, [৩০] ভাষাবৃত্তিঃ, [৩১] ধাতুপ্রদীপঃ, [৩২] তারা-তন্ত্রম্, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা—[৩৩—৩৪] সৌন্দরনন্দ কাব্য, [২ খানি]।

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন, এম্ এ, উপহৃত পুস্তক—১। লঘুভাগবতামৃত, ২। স্তবমালা, ৩। ভাগবতসন্দর্ভ ৪। পদামৃতসমুদ্র, [খণ্ডিত], ৫। স্তবাবলী, ৬। বিদগ্ধমাধব নাটক, ৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (খণ্ডিত), ৮। হংসদূত, ৯। মুক্তাচরিত, ১০। বেদান্তসার, ১১। ভাবার্থদীপিকাদীপন, ১২। গোবিন্দলীলামৃত (খণ্ডিত), ১৩। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১৪। দুর্লভসার খণ্ডিত), ১৫। গীতচিন্তামণি [পূর্ব্বভাগ, খণ্ডিত]।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের উপহৃত পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ, ১। কূর্ম্মপুরাণ, ২। পদ্মপুরাণ, ৩। বরাহ-পুরাণ, ৪। লিঙ্গপুরাণ (খণ্ডিত), ৫। অগ্নিপুরাণ (খণ্ডিত), ৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (খণ্ডিত), ৭। মৎস্যপুরাণ, ৮। দেবীপুরাণ (খণ্ডিত), ৯। নৃসিংহপুরাণ, ১০। রামায়ণ-আদি ও অযোধ্যা, ১১। ঐ—অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড, ১২। ঐ—লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড, ১৩। শ্রীমদ্ভাগবত—১—৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১৫। ভগবদ্ভক্তিবিলাস, ১৬। চৈতন্য চরিতামৃত—আদিখণ্ড, ১৭। ঐ—মধ্যখণ্ড, ১৮। ঐ—অন্ত্যখণ্ড, ১৯। মহাভারত—আদিপর্ব্ব (খণ্ডিত), ২০। ঐ—সভাপর্ব্ব (খণ্ডিত)।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ—সভানেত্রী

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, "বাঙ্গালার বরেণ্য মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য আজ আমরা এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়াছি। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতাই আমরা পাঠ করিয়াছি। তাঁহার কবিতা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্। আজ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, সেই মহিলা কবির শোক-সভায় মাননীয়া বিদুষী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া আজ সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন। আমি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন,—"নলিনী লিখিত এই সুন্দর হীরামণিমুক্তা-খচিত প্রবন্ধটি শুনিয়া আজ খুব পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। তার প্রবন্ধ অতি শ্রুতিমধুর হয়েছে ও তাহাতে ঘটনার সমাবেশ বেশ আছে। নলিনী আমার চেয়ে অল্প বয়সের, এই জন্য তার স্মৃতিশক্তি এখনও প্রখর আছে। বহু কালের কথা, স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর বিষয়ে সব কথা আমার স্মরণ নাই—যা কিছু বলব—তা ঐ নলিনীর প্রবন্ধ হতেই বলব। আমার স্মৃতিশক্তির অনেক হ্রাস হয়েছে। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে বলে নি। বিলাতে কোন এক পল্লী-গির্জ্জায় প্রত্যহ উপাসনান্তে পুরোহিত মহাশয় গির্জ্জার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় কি ফল হইতেছে, তাহা কোন কোন শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। এক দিন এক আশী বছরের বৃদ্ধ কৃষককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"হ্যাঁ হে বাপু, এই যে রোজ রোজ গির্জ্জায় এসে বক্তৃতা শুনছ, উপাসনা করছ,

এখন বল ত "Who created you—কে তোমায় সৃষ্টি করেছে?" বৃদ্ধ কোন উত্তরই কর্‌তে পার্‌ল না। পাশেই একটি ৫ বছরের বালক ছিল—তাকেও ঐ প্রশ্ন করতেই সে উত্তর দিল, কেন? God (ঈশ্বর)। বৃদ্ধ তখন বল্‌লে, দেখুন মশায়, এ ছেলেটি অতি অল্প দিন জন্মেছে, ওর স্মরণশক্তি ত থাক্‌বেই; আমি ওর চেয়ে ৭৫ বছর আগে জন্মেছি—কি করে সব পুরাণ কথা মনে থাকবে বলুন ত? আমারও সেই দশা—তাই নলিনীর কথা হতেই ২।৪ কথা মনে করে কিছু বল্‌ব। ব্যোমকেশের পর নলিনী সাহিত্য-পরিষদে শতদল কমলের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার সৌরভে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সেবীরা মশ্‌গুল হয়ে আছেন। হেম, নবীন, মাইকেলের পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর এক শ্রেণীর কবি ছিলেন।—তাঁদের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-কবিরা ছিলেন। হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবি ছিলেন। সে সময়েও দেশে নারী কবি ছিলেন। মধুকানের মা ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারতেন। অনেক স্ত্রী-লোকের পাদপূরণের ক্ষমতাও ছিল। এ যুগের পর গিরীন্দ্রমোহিনী, স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী প্রভৃতি শক্তিশালিনী কবির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা সকলেই বিদুষী। তখনকার কালেও বাঙ্গালার অন্তঃপুরে রীতিমত শিক্ষার প্রচলন ছিল—পুঁথিগত বিদ্যা অনেকেই শিখিয়াছিলেন। নারী শক্তিস্বরূপিণী বলা হ'ত। আজকাল অবশ্য অনেকেরই গ্রন্থগত বিদ্যা বেশী হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর সময়ে এত স্ত্রীশিক্ষা ছিল না। স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি ২।৪ জন স্ত্রীকবির খুব প্রশংসা তখন হয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী হিন্দু ঘরের কুলবধূ ছিলেন। বৌবাজারের অক্রূর দত্তের বাড়ীর বধূ। তখনকার কালে অক্রূর দত্তের বাড়ী বল্‌লে অনেক কথা বলা হ'ত। বিদ্যা বুদ্ধি, ধনে মানে এ বাড়ী কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল। স্রোতের মত অর্থ ব্যয় হত—কত লোক জন! যেন একটা হাট। এই দত্ত-বাড়ী হ'তে অনেক বীরের উদ্ভব হয়েছিল। রাজেন্দ্র দত্ত আগে এলোপ্যাথি, পরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীর আলোচনা করেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিদেশীয় চিকিৎসার ফল প্রচার করবার জন্য বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা ও ওষুধ বিতরণ করে বেড়াতেন। যোগেশ দত্ত একজন লেখক ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী নরেশ দত্ত "রইস ও রায়ত" নামক ইংরাজী কাগজের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁদের বাড়ীর "সাবিত্রী লাইব্রেরী"তে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ছিল এবং বিদ্যা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা হ'ত। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সেখানে বক্তৃতা কর্‌তেন। এই সময় এই ঘরের একজন কুলবধূ অন্তঃপুরে থাকিয়া তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জে তাঁহার কবিতা ও কাব্য উপহার দিলেন। এ বড় কম সাহসের কথা নয়। স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী, গিরীন্দ্র-মোহিনী—এঁরা সব যুগপরিবর্ত্তনকারী সাহিত্যিক। আমার সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর কুটুম্বিতা ছিল—সম্পর্কে তাঁহার দেবর ছিলাম। তদ্ব্যতীত তাঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই বেশী ছিল। একবার তাঁদের বাড়ী গেলে ৩।৪ দিন আসতে পারতাম না। আমাদের এই সম্পর্কের একটা সুবিধা এই ছিল যে, আমাদের তখন বেশ goose guill fight চলত—উভয়েই রস-রচনা করতাম—কত রকম ঠাট্টা ব্যঙ্গ চল্‌ত। তখন ঠাট্টা কর্‌লে গাল দেওয়া হল মনে

কর্‌তাম না। ঠাট্টা করা একটা বিদ্যা—সব জিনিষেরই এক একটা ridiculous side আছে—তাই নিয়ে রস রচনা—ঠাট্টা বিদ্রূপ বেশ চলে—এখন সে সব উঠে গেল। Scottএর সময় Bible নিয়েও ঠাট্টা চল্‌ত। গোবিন্দ অধিকারী বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ তিনি অপর পক্ষকে গাল দেবার সময় বৈষ্ণবের নানা কুৎসা রচনা করে গান বাঁধতেন। সেটা একটা ক্ষমতার কাজ। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এইরূপ সাহিত্যালোচনা আমরা সে কালে করেছি। তিনি একটা কবিতায় স্বামীদের নির্দ্দয় বলে অনেক লিখেছেন। এ নির্দ্দয় কথাটায় প্রকৃত পক্ষে স্বামীকে complimentary দেওয়া হয়েছে—গাল দেওয়া বা নিন্দা করা হয় নি। সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ গোবিন্দ তখন ক্রীড়াশীল বালক ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী আদর্শ হিন্দু মহিলা ছিলেন। হিন্দুগৃহের অন্তঃপুর হতে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পেরে-ছিলেন বলে আজ বঙ্গসাহিত্য তাঁর দানে সমুজ্জ্বল। নলিনীর প্রবন্ধের রচনা, উপকরণ-সংগ্রহ সুন্দর। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর এই প্রবন্ধ-পাঠ। সুন্দর ও সুলিখিত প্রবন্ধ এমন সুন্দর করে পড়তে না পারলে হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ হয় না। আমি তাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি, আর প্রার্থনা করি, তার সৌরভে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষৎ ভরপুর হয়ে উঠুক।

তৎপরে বিশেশ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবালা ঘোষজায়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়া যে পরিবারের কুলবধূ ছিলেন, সেই পরিবারকে তখনকার কালে সাহেবরা Wellington Dutt Family বলত—এই সংসার বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অনেক সাহিত্যিক, সুলেখক বিদ্বান্ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে অনেক বড় বড় লোক বক্তৃতাদি করিতেন। বিখ্যাত বাগ্মী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও এখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুইটী গৃহীত হইল।

প্রথম মন্তব্য—

"বঙ্গসাহিত্যের বরেণ্যা মহিলা কবি ও "জাহ্নবী"-সম্পাদিকা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোক-প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া পরলোকগতা মহিলা কবির জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

অতঃপর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া বলিলেন,—"পরলোকগতা গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত যখন আমি পরিচিতা হই, তখন আমি বালিকা। বেথুন কলেজে একটা শিল্প-মেলায় তাঁকে দেখি। তখন হইতেই আমি তাঁর স্নেহ লাভ করি। তিনি যদিও কোন স্কুলে পড়েন নি, তথাপি তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে একটা করুণ সুর পাওয়া যায়, তাহা আন্তরিকতায় পূর্ণ এবং মনের অকৃত্রিম ভাব প্রকাশ করে। তিনি যা অনুভব করতেন, তাই তাঁর কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন—সেই জন্যই তাঁর কবিতা বিশ্বহৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি জীবনে অনেক বেদনা পেয়েছিলেন—এ বেদনা মর্ম্মান্তিক হলেও তাঁর হৃদয়কে শুষ্ক করেনি—স্নিগ্ধতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতা করুণামাখা ও আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল বলে বিশ্বের শোকার্ত্তকে তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করত বলেই আমি তাঁর প্রতি চিরদিনই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম। আজ তাঁর শোকসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করবার অবকাশ পেয়েছি বলে আমি আজ ধন্য।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত 'অশ্রুকণা'র কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের সভানেত্রী মহোদয়া রচিত 'রেণুর' কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। অশ্রুকণার ভিতরে যে ব্যথা ও বেদনার ধারা ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, পূজনীয়া প্রিয়ম্বদা দেবীর রেণুর ভিতরে সেই ধারা সমভাবে বহমান। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ স্বামী পুত্র হারিয়ে অন্তরে অন্তরে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করেছিলেন বলে অশ্রুকণার কবির মর্ম্মবেদনা যতখানি বুঝতে পেরেছিলেন, অত আর কেউ পারে নি বোধ হয়। এই জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই শোক সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীর রুদ্ধ শোক আজ জাগরিত হয়েছে। তিনি সে শোকের বেগ সহ্য করতে পারেন নাই—তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। পুনরায় আমরা তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

তৎপরে স্বর্গগতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্না, তাহা তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত অবগত আছেন।

অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৬ই পৌষ ১৩৩১, ২১এ ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্,—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ পাঠ—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি মহাশয়ের "বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৬। নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব—(ক) ৩য় নিয়মের নির্ব্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে—"কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন, এবং সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।" (খ) ৩য় নিয়মে যোগ হইবে—"শাখার সভ্যগণের কাজ করিবার জন্য লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে নাম বাদ যাইবার ব্যবস্থা হইবে।" ৭। Oriental Conferenceএ প্রবন্ধ ও আর্থিক সাহায্য প্রেরণ সম্বন্ধে মন্তব্য। ৮। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ না হওয়ায় পঠিত হইল না।

২। কোন নূতন নাম সদস্যের জন্য কেহ প্রস্তাব না করায় কেহ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন না।

৩। 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্ সি মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞানের কল্যাণ সাধন

করিয়াছেন। যিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে প্রভূত উপকার পাইবেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

৬। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কতিপয় সদস্য পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্দ্ধনের ও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই সকল প্রস্তাব বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠন করেন। এই শাখা-সমিতি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিয়া, এই অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মাবলী পাঠ করিলেন।

(ক) ৩য় নিয়মের নির্ব্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে –

"কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।"

(খ) ৩য় নিয়মে যো হইবে—

"শাখার সভ্য নির্ব্বা হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং কোন সভ্য উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে তাঁহার নাম বাদ যাইতে পারিবে।"

সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত চাহিলে পর সম্মতিক্রমে এই নিয়ম পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। উক্ত কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের নিকট প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সমবেত সভ্যগণকে রোধ করিলেন।

সভাপতি মহ কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

শ্রীরায় যত ন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

ক পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রন। ঘোষ, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ)। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী—২। লিওনিদাস্। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—। ৩। সন্ধ্যারহস্য। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—৪। নবাবী আমল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—৫। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী।

ত্রিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, টাইটেল, বিজ্ঞাপন আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিংএ, এবং মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩২

বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সি আই ই,

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্-সি, এটর্ণি

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি,

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ   রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত

১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ দে ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ।

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

[পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

বৈদিক স্বরলিপি

বৈদিক স্বরলিপি নানাবিধ। পৃথক্ পৃথক্ শাখায় পৃথক্ পৃথক্ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

ক। ঋগ্বেদের রীতি অথর্ব্ববেদসংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়িসংহিতায় অনুসৃত হইয়াছে বলা যায়। তবে বাজসনেয়িসংহিতায় স্বরিত লিপি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। এই স্বরলিপিই (ঋগ্বেদীয় লিপি) সর্ব্বত্র সমাদৃত। কিন্তু ঋগ্বেদের লিপিতে উদাত্ত স্বরের কোনও লিপি নাই। অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যবর্ত্তী অচিহ্নিত অক্ষরে উদাত্তস্থিতি বলিয়া বুঝিতে হয়। অনুদাত্তের নিম্নে সরল অধোরেখা '—' থাকে, এবং স্বরিতের উপরে লম্বরেখা '।' থাকে। এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর উদাত্ত। কাশ্মীরে সংগৃহীত ঋগ্বেদের পুথি-সমূহে উদাত্ত ও স্বাধীন স্বরিতেরই চিহ্ন আছে। উদাত্তের চিহ্ন উপরে লম্বরেখা '।' ও স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন শঙ্খাকার বক্ররেখা '~'। কিন্তু এ (কাশ্মীরী) লিপি সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে ও ইহার সমাদরও নাই। ঋগ্বেদের প্রচলিত স্বরলিপির উদাহরণ—অ গ্নি না ঃ অর্থাৎ অগ্নি না। এখানে প্রথমাক্ষর অধোরেখা-চিহ্নিত অনুদাত্ত, দ্বিতীয়াক্ষর চিহ্নবিহীন উদাত্ত ও তৃতীয়াক্ষরে অধীন স্বরিত। অবশ্য স্বাধীন ও অধীন স্বরিতের ভেদ ঋগ্বেদীয় স্বরলিপিতে নাই। বাক্যাদি বা পাদাদিতে একাধিক অক্ষরে কোনও চিহ্ন না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, পরবর্ত্তী অনুদাত্ত বা স্বরিত চিহ্নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল অক্ষরই উদাত্ত। তাবা যাতম্—তা বা যাতম্। তবেৎ তৎ সত্যম্=ত বেৎ তৎ সত্যম্। বৈশ্বানরম্—বৈশ্বানরম্। প্রথম স্বরিতচিহ্নের পর পুনরায় উদাত্তের পূর্ব্বাক্ষরের পূর্ব্বাক্ষর পর্য্যন্ত যাবতীয় অক্ষর চিহ্নবিহীন থাকে! কেবল উদাত্ত লক্ষিত করিবার জন্য তাহার পূর্ব্বের অনুদাত্ত ও পরের স্বরিত স্বর চিহ্নিত হয়। মূল উদাত্ত স্বরে কখনও কোনও চিহ্ন থাকে না। ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি—ই মং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি।

স্বরলিপির জন্য মন্ত্রের এক একটী পাদকে একক স্থানীয় করিয়া ধরা হয়। স্বরস্থিতির জন্য যে এই পাদ বাক্যস্থানীয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই জন্য পাদাদিতে না থাকিলে সমাপিকা ক্রিয়া বা সম্বোধন পদে স্বর থাকে না (বাক্য স্বরের বিধি অনুসারে[১])। সুতরাং

১। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।

অনুদাত্ত ও স্বরিতাক্ষরের চিহ্ন পদসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; এক পদের প্রভাবে অন্ত পদের অক্ষরে চিহ্ন পড়ে। 'স্বস্ত্রিম্' পদটী অন্ত্যোদাত্ত, এবং 'অস্মভ্যম্' পদটী স্বরবিহীন হইলেও তাহারা যখন পাশাপাশি বসিবে, তখন দ্বিতীয় পদের প্রথমাক্ষরে স্বরিত চিহ্ন পড়িবে ; কারণ সেটী উদাত্তের পর স্থিত হওয়ায় অধীন স্বরিত প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে মূল পাঠ ও পদ-পাঠে স্বরলিপির বিভিন্নতা ঘটে। পদ-পাঠে প্রত্যেক পদের স্বরলিপি থাকে, এক পদের প্রভাব অন্ত পদে যায় না। স্ব স্তি ম স্মভ্যৎ। এই জন্ত পরপদের প্রথমাক্ষর উদাত্ত হইলে পূর্ব্বপদের অন্ত্যাক্ষরে অনুদাত্ত চিহ্ন চাই। এবং পূর্ব্বপদের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্বাক্ষর স্বরিত হইলে অন্ত্যাক্ষরে অনুদাত্ত চিহ্নও থাকিবে না। পূর্বেভি র্ঋষিভিঃ = পূর্বেভি র্ঋষিভিঃ। যজত্রম ধ্বরম্ = যজত্রমধ্বরম্। কিন্তু অন্ত্য উদাত্তের পরবর্ত্তী প্রথম অনুদাত্তের চিহ্ন থাকিবে, যদি তৎপরবর্ত্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকে। দেবমৃত্বিজম্ = দেবমৃত্বিজম্। এখানে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি না হইবার কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[১]

স্বরলিপির এই জটিলতার উপর আবার জটিলতা এই যে, স্বাধীন স্বরিতের পূর্ব্বে [ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট বা অভিনিহিত[২]] উদাত্ত স্বর থাকিলে স্বরিতের পর স্বরিতাক্ষরের মাত্রা (লঘু বা গুরু) অনুযায়ী '১' বা '৩' সংখ্যা দেওয়া হইবে এবং সেই সংখ্যা স্বরিত চিহ্ন বহন করিবে ; প্রকৃত স্বরিত অক্ষর যেটী, দীর্ঘস্বর হইলে সেটীতে অনুদাত্ত অধোরেখা পড়িবে। আবার এই স্বরিতের পরবর্ত্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে এই সংখ্যাটী এককালে স্বরিত চিহ্ন ও অনুদাত্ত চিহ্ন, উভয় বোঝাই বহন করিবে। অপ্‌স্ব১ন্তর্ = অপ্‌স্বন্তর্। রায়ো৩ বনিঃ = রায়ো বনিঃ। ইহাকে কম্প, প্রকম্পিত বা বিকম্পিত স্বর বলে।

খ। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠক সংহিতার উপরে লম্বরেখা দ্বারা উদাত্ত স্বর চিহ্নিত হয়। অনুদাত্ত ঋগ্বেদের অনুরূপ। অগ্নিনা। কিন্তু স্বরিত-লিপি লইয়া এই উভয় সংহিতাতেও বিষম গোলযোগ। মৈত্রায়ণী সংহিতায় অধোবক্র-রেখা দ্বারা স্বাধীন স্বরিত চিহ্নিত হয়। বীর্য্যম্ = বীর্য্যম্। কিন্তু অধীন স্বরিতের চিহ্ন একটী হাইফেন্ '—' অথবা তিনটী ঊর্দ্ধলম্ব রেখা '|||'। কাঠক সংহিতায় স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন একটু বিভিন্ন প্রকারের

১। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।
২। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।

অধো-বক্র-রেখা, কিন্তু অধীন স্বরিতের জন্য ব্যবস্থা একটী অধোবিন্দু ̥। উভয় সংহিতাতেই অধোলম্ব রেখা দ্বারা অনুদাত্ততর স্বর চিহ্নিত হয়।

গ। সামবেদে উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্তের চিহ্ন যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ সংখ্যা অক্ষর-মস্তকে স্থাপিত। ব র্হি ষি = বর্হিষি। কিন্তু উদাত্তের পরবর্ত্তী অক্ষর স্বরিত না হইলে '২' সংখ্যা দ্বারাই উদাত্ত চিহ্নিত হয়। গিরা = গিরা। যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং = যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং। উপর্য্যুপরি দুইটী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে দ্বিতীয়টীতে চিহ্ন না দিয়া পরবর্ত্তী স্বরিতের মাথায় '২র' লেখা হয়। অথবা প্রথম উদাত্তটীর মাথায় '২উ' লিখিলে স্বরিতের মাথায় 'র' লিখিবার আবশ্যক থাকে না। স্বাধীন স্বরিতের মাথায় '২র' ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তে '৩ক' থাকে। দ্বিবো মর্ত্ত্যস্য = দ্বিবো মর্ত্ত্যস্য। এবস্ত পীতয়ে = এবস্ত পীতয়ে। তন্বা = তন্বা।

(ঘ) শতপথ ব্রাহ্মণে উদাত্ত স্বর অধোরেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়; পূর্ব্বের অনুদাত্ত বা পরের স্বরিতে চিহ্ন আবশ্যক হয় না। আবার একাধিক উদাত্ত পাশাপাশি থাকিলে কেবলমাত্র অন্তিমটীতে চিহ্ন দেওয়া হয়। সকলগুলিতে চিহ্ন দরকার হয় না। পুরুষঃ = পুরুষঃ। অগ্নির্হি বৈ ধুরথ = অগ্নি র্হি বৈ ধুরথ। যখন সন্ধিতে উদাত্ত স্বর পশ্চাদ্‌গামী হয়, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তেরও চিহ্ন থাকে। সোঽগ্নিমেবাভীক্ষমাণঃ = সোঽগ্নিমেবাভীক্ষমাণঃ (এবাভী = এব + অভী)। সমাসজন্য উদাত্ত স্বর লক্ষিত করিতেও কখনও কখনও উপর্য্যুপরি দুই স্বরে উদাত্তচিহ্ন থাকে। স্পৃহয়দ্বর্ণঃ = স্পৃহয়দ্বর্ণঃ।

(আ) স্বাধীন স্বরিত কখনও কখনও উদাত্তরূপে পশ্চাদ্‌গামী হয়; মনুষ্যেষু = মনুষ্যেষু = মনুষ্যেষু। সন্ধিজাত ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট ও অভিনিহিত স্বরিতেরও এইরূপ পরিণতি হয়। কথাং বিদ্যম্ = কথং বিদ্যম্ = কথং বিদ্যম্; এবৈতৎ = এবৈতৎ = এবৈতৎ = এব + এতৎ। তেঽর্চন্তঃ = তেঽর্চন্তঃ = তে + অর্চন্তঃ।

(ই) আ, প্র, এই দুইটী উপসর্গ এবং পদান্ত অ সমাসে অন্ত পদের স্বরবিহীন আদি স্বরের সহিত মিলিত হইলে সন্ধিতে উদাত্ত স্বরের স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

আ+ইহি = এহি ; প্র+আহ = প্রাহ ; চিত্র+উতি=চিত্রোতি
(বিস্ময়কর বস্তু দানকারী)।

(ঈ) বিরামের পর উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকিলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের লোপ বা হ্রাস হয় এবং তাহার নীচে তিনটী বিন্দু দিয়া (...) সেই স্বরের প্রকৃতি লক্ষিত হয়। স ভা গঃ ; সং স্থি তে=সভাগঃ। সংস্থিতে ; এইরূপ কারণে পাদের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরেরও হ্রাস হইতে পারে। জুহোতি॥ অগ্র = জুহোতি॥ অগ্র ; পরপাদের প্রথম অক্ষর স্বরবিহীন হইলেও ইহা হইতে পারে। নাপ স্থু॥ অপ=নাপ্সু॥ অপ।

(উ) দ্বিরুক্তি (আম্রেড়িত) পদ বা দীর্ঘ সমাসের আদ্যক্ষরে বা আদিভাগে স্বর (উদাত্ত) থাকিলে সমগ্র পদের শেষের দিকে আর একটি নূতন স্বরের অভ্যুদয় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বল্‌বলীতি (বল্‌বলীতি), একচত্বারিংশৎ (একচত্বারিংশৎ)। কখনও কখনও এরূপ স্থলে মৌলিক স্বরটীরই লোপ হয়। একসপ্ততিঃ, (এবং একসপ্ততিঃ) ; এইরূপ সমস্ত পদের ন্যায় অনিয়ম কখনও কখনও ক্রিয়াপদেও দেখা যায়। উপসর্গ ও ক্রিয়া উভয় স্থানেই যুগপৎ স্বর-স্থিতি হয়। সমস্থিত গোপায়েৎ। ইহা ছাড়া স্বরস্থিতির বিপর্য্যয় বহু পদেই পাওয়া যায়। এই সকল অনিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণের ১০ম হইতে ২৩শ কাণ্ডে অধিক পাওয়া যায়। প্রাচীন অংশসমূহে এত বিশৃঙ্খলা নাই। চতুর্দ্দশ কাণ্ডে অনিয়মের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

উপসংহার

ঋগ্বেদের পাঠের (মূল ও পদ-পাঠের) পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক পদে একটী এবং কেবল মাত্র একটী প্রধান স্বর থাকাই সাধারণ নিয়ম। পাণিনির ব্যাকরণেও সেই কথা—"অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্ ৬।১।১৫৮" * সেই একটী মাত্র উদাত্ত (বা স্বাধীন স্বরিত) স্বর পদমধ্যে সাধারণতঃ যে স্থানে দেখা যায়, আদিম আর্য্য (Indo-European) ভাষায় ঠিক সেই স্থানেই স্বরস্থিতি ছিল, এই কথা ব্রুগম্যান্ (Brugmann) প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাতত্ত্ব-ধুরন্ধর পণ্ডিতগণ সকল আর্য্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা

* পদমধ্যের একটি অক্ষর ছাড়িয়া সবগুলিই অনুদাত্ত।

নির্ণয় করিয়াছেন। ইউরোপের সকল সভ্যতার কেন্দ্রীভূত গ্রীক ভাষাও ইউরোপীয়গণের নিকট এত উচ্চ সমাদর পায় নাই। ইহা একদিকে যেমন আমাদের গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয়, অন্য দিকে সেইরূপ লজ্জা ও অধঃপতনের পরিচায়ক। বৈদিক সাহিত্যের নাম শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়, আর তাঁহারা আমাদের সেই সকল লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিতেছেন। আধুনিক লিথুআনীয় ভাষায় আদিম আর্য্যভাষার সুর এ যাবৎ উচ্চারণে সংরক্ষিত আছে। আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে বৈদিক সুরের বিলোপ ঘটিয়াছে; তাহা বৈদিক সাহিত্যের উদাহরণেই পরিস্ফুট। ঋগ্বেদের স্বরস্থিতি ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের স্বর-স্থিতিতে অনেক প্রভেদ। তাহার কতকটা পরিচয় শতপথব্রাহ্মণের স্বরলিপি প্রসঙ্গে বলিয়াছি। যতই এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, ততই এই পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি হয়। দুই চারিটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ঋগ্বেদের সপ্ত শব্দ ব্রাহ্মণে সপ্ত হইয়াছে। অষ্টৌ হইয়াছে অষ্টৌ। ভিন্ন হইয়াছে ভিন্ন। সীদন্তি স্থানে সীদন্তি, গহ্বর স্থানে গহ্বর। স্থানে স্থানে স্বাধীন স্বরিতের পরিবর্ত্তে উদাত্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঋগ্বেদেই অন্ত্য স্বরিতের স্থানে উদাত্তের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। দ্যোঃ স্থানে দ্যৌ (৮।৮৯।১২)। অর্ঘ্য শব্দ একবার মাত্র (১।১২৩।১) ঠিক আছে; অন্য বহু স্থানে অর্ঘ্য হইয়াছে। কখনও কখনও অন্ত্য স্বরিত পশ্চাদ্গামী ও উদাত্ত হইয়াছে। মিত্র্য (এবং মিত্র্য), বীর্য্য (এবং বীর্য্য ও বীর), —তব্য-(—তব্য);

বেশী আলোচনায় পুথি বাড়িয়া যায়। সুতরাং লেখনী সংবরণ করি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত বই কয়খানি পড়িয়াছি:—

(১) Sanskrit Grammar by W. D. Whitney.

(২) Vedic Grammar by A. A. Macdonell.

(৩) সিদ্ধান্তকৌমুদী, বৈদিক প্রকরণ (শ্রীশচন্দ্র বসু)।

(৪) An Introduction to Natural History of Language (T. G. Tucker)

(৫) Language and Its Study (W. D. Whitney).

(৬) বৈদিক শব্দসূচি (বোম্বাই)।

(৭) Speijer's Sanskrit Syntax.

(৮) Brugmann's Comparative Grammar.

বৌদ্ধদর্শন

[দ্বিতীয়াংশ]

এখন আমাদের দেশে বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগে নীতিতত্ত্ব বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বুদ্ধি কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। ঋক্‌বেদসংহিতার স্থানে স্থানে আমরা দুইটি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। সে শব্দ দুইটি "ঋত" ও "সত্য"। "ঋত" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন উহার অর্থ যজ্ঞ, কখন জল, কখন প্রাচীন বাসস্থান ইত্যাদি। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, পরে উহার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম, নিয়তি, শৃঙ্খলা, একভাবিত্ব প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছে। ম্যাক্‌স্‌মূলর তাঁহার হিবার্ট লেক্‌চারে একটি শ্লোক[১] উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"দ্যুলোক সূর্য্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে এবং ভূলোক সত্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে।" কিন্তু সায়ণ, এখানে ঋতের অর্থ করিয়াছেন যজ্ঞ ও সত্যের অর্থ করিয়াছেন, "ব্রহ্মণানন্তাত্মনা।" "উত্তভিতা" শব্দের অর্থ স্তম্ভিত বা উদ্ধৃত, এইরূপ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিভিন্ন ঋতুর যেমন একের পর অপরটির নিয়ত আবির্ভাব হয়, ঋত শব্দে তাহাই বুঝায়। সম্ভবতঃ ঋতু শব্দ ও ঋত শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ঋ"ধাতুর অর্থ নির্দ্দিষ্ট বা নিয়ত বা গমন ইত্যাদি। আর একজন বেদজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত ঋত শব্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই "ঋত" হইতে আমরা প্রাচীন বৈদিক যুগের সংবাদ পাই, ইহা পূর্ণতার উপদেশ। ঋত, পৃথিবী ও প্রকৃতিকে অনুশাসন করিতেছে। জাগতিক ব্যাপার এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ঋতের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। উষা, ঋতের বলে প্রাতরাকাশে কিরণ বিস্তার করিতেছে, সূর্য্য আকাশে স্থিত হইয়া রহিয়াছে, সূর্য্যই ঋতের চক্রস্বরূপ। দেবতারা ঋত হইতে উৎপন্ন; সেই জন্য তাঁহাদের নাম ঋত-জাত এবং তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ঋতজ্ঞ, ঋতায়ু, ঋতসপ নাম দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ঋত জানেন বলিয়া ঋতজ্ঞ, ঋত পালন করেন বলিয়া ঋতায়ু, ঋত অনুরাগী বলিয়া ঋতসপ নামধারী হইয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋত ও সত্য, এই দুইটি শব্দ কোনও মহান্ তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দ হইতে বৃহৎ দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বউদ্ধৃত ঋক্ হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃতি ঋতের বশেই চলিয়া থাকে এবং মানুষও প্রকৃতির জীব বলিয়া উহাকেও প্রকৃতির অধীন হইয়া চলিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষ প্রকৃতির বশীভূত বটে, কিন্তু তাহার নীতিবুদ্ধি তাহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করাইয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষ এবং সুখের অন্বেষণ প্রকৃতিপ্রসূত; কিন্তু কর্ত্তব্য-

---

১। সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমে অধিশ্রিতঃ।

বুদ্ধিবশতঃ আবশ্যক হইলে মানুষ তাহা দমন করিয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, সত্য, ভূমিকে স্তম্ভিত বা রক্ষা করিয়া থাকে। ভূমি যদি পৃথিবী হয়, তাহা হইলে সত্য পৃথিবীকে অধিকার করিয়া আছে এবং এই সত্য হইতে ধর্ম্ম, নীতি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।

বৈদিক যুগেতে পাপ পুণ্যের বিচার যথেষ্ট ছিল। অঘ, দুরিত প্রভৃতি পাপবাচক শব্দের বহু উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্রে বিধি-নিষেধের অনেক কথা আছে। তবে এখন কালবশে অনেক বিষয় অপ্রচলিত। বৈদিক-সংহিতা-যুগের আর দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। তপঃ হিন্দুদের বহু পুরাতন অনুষ্ঠান। তপঃ শব্দে এখন আমরা কেবল ক্লেশমাত্র বুঝি। কিন্তু প্রাচীন কালে উহা ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। জগৎসৃষ্টি তপের দ্বারা হইল—ঋত, সত্য, তপ হইতে উৎপন্ন হইল। কাজেই এ তপ কেবল ক্লেশ নহে; ইহার মূলে নিশ্চয় আরও কিছু আছে। ইহা মানুষের বা ঋষিগণের একটা অলৌকিক শক্তি, যাহার প্রভাবে আপাত অসাধ্যের সাধন হইতে পারে। আর একটি প্রক্রিয়াও বহু প্রাচীন এবং উহা ধ্যান। ধ্যান শব্দটি সংহিতায় অধিক পরিলক্ষিত হয় না। তবে তপঃ শব্দের অনেক স্থানেই উল্লেখ আছে। ব্লুমফীল্ড তপের ইংরাজী অর্থ করিয়াছেন "creative force" অর্থাৎ সিসৃক্ষা। এ অর্থ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; তপঃ উদ্ভাবনী শক্তি—অভাব হইতে ভাবের উৎপাদন, যাহা নাই—তাহাই করা।

সংহিতাসমূহের মধ্যে নীতিতত্ত্বের অন্বেষণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। উপাসনাসমূহ ভক্তির প্রেরণা, প্রীতির ব্যঞ্জনা; ইহার মধ্যে নৈতিক আলোচনার সম্ভাবনা নাই। দুই এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়ম পরস্পর ব্যবচ্ছেদক ও বিরোধী। ঋত ও সত্য, এই দুইটী তত্ত্বের মূলে আমরা নৈতিক নিয়ম বা নৈতিক জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। তপঃ ও ধ্যান দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই।

এই অবধি সংহিতার কথা বলিয়া শেষ করিতেছি। ইহার মধ্যে আরও অনেক সামগ্রী আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে নীতিমূলক হইতে পারে। ইহার পর উপনিষৎ যুগে নীতির মূল সূত্রগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়। উপনিষৎসমূহ আর্য্য-জ্ঞানের এক অদ্ভুত বিকাশ। অল্প কথার মধ্যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এত গভীর ভাবে আলোচিত আর কোথাও হইয়াছে কি না, সন্দেহ। উপনিষদে আমরা নীতিমূলক অনেক বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। নীতির মূলে আত্মত্যাগ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ স্বার্থ দূরে রাখিয়া কোন একটি বড় আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া চলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ সুখ ক্ষুদ্র, উহার তৃপ্তিকাল অবধিই সুখ। প্রকৃত সুখ বড় জিনিসে (ভূমায়)—উচ্চ-তত্ত্বই সুখ ও শান্তি। উচ্চ-তত্ত্ব কেবল আত্মজ্ঞানে জানা যায়। প্রকৃতি আমাদের পদে পদে বাধা দেয়, জড়-পিপাসার আকর্ষণ করে, সেই জন্য স্বভাবের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্।" এ দুইটিই বড় আদর্শ। আত্ম-

জ্ঞান ও তত্ত্ব-সুখ, এই দুইটি ছাড়া মানুষের উন্নতি হয় না। ঋষি, জ্ঞানী, বোধিসত্ত্ব, সুপারম্যান, পূর্ণ মানব হইতে হইলে এই পথ দিয়া চলিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান একই বস্তুর দুইটি দিক্ মাত্র। উহা পাওয়া যায় কি করিয়া? সে উপদেশেরও উপনিষদে অভাব নাই। আত্মজ্ঞানই উপনিষদের ধর্ম্ম। এই আত্মজ্ঞানে চিত্তকে গড়িতে হইবে, মানুষকে প্রথমে "মরাল ম্যান" বা ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। ইহার উপায় শম, দম বা বাহ্যান্তর নিগ্রহ। প্রকৃতিকে লয় করিতে হইবে। চিত্ত প্রকৃতির উপর উঠিতে পারে এবং চিত্তই জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যবর্ত্তী। শম, দম ও তপঃ, এই তিনটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইয়া তত্ত্বজগতের সাক্ষাৎ হয়। উপনিষদের চরম তত্ত্ব সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। বোধ হয়, কোন জাতির জ্ঞানে এরূপ গভীর মন্ত্র উদ্ভাসিত হয় নাই। গ্রীকদের গুড্, ট্রুথ ও বিউটিফুল আছে। কিন্তু জ্ঞানের একদিকে সত্য ও অপর দিকে আনন্দ অথবা সত্যের একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে আনন্দ, ইহা উপনিষদের ঋষিরাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আনন্দ হয় জ্ঞানে, আনন্দ হয় সত্যে। জ্ঞানই শ্রেয়ঃ, সত্যই শ্রেয়ঃ। ইহার মধ্যে যে দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহাতেই অপর দুইটি রূপ থাকিবে। যাহা জ্ঞান, তাহাই সত্য, এবং আনন্দ ইহাদেরই মূর্ত্তি। সেই জন্য বৈদান্তিকের জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ এবং মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয় সেই পূর্ণ-বস্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ।

উপনিষদের তত্ত্ব আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদের যুগে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিরূপ সমাধান হইয়াছিল, তাহাই দেখা আবশ্যক। সৎ-অসৎ বিচার, আত্মত্যাগ, শম দম তপঃ প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি? পাপ পুণ্যের চিন্তাই বা কেন? এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য অমৃতত্ব প্রাপ্তি। মৃত্যুতে জীবনের শেষ হয় না, তাহার পরও আবার জীবন আছে। ঋষি দ্রষ্টা; তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে যে দেবতত্ত্ব মধুর ছন্দে বাহির করিয়াছেন, তাহাই অভ্যাস করিতে হইবে এবং তাঁহার বিধি-নিষেধের বাণী পালন করিতে হইবে। উপনিষদের সময়েও বোধ হয়, অমৃতত্ব প্রাপ্তিই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেবলোক, পিতৃলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি মানুষের পরম রমণীয় বাসস্থান—সেখানে পরম আনন্দ। ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা মানুষ এই সকল লোক পাইয়া থাকে। এই ইষ্টাপূর্ত্তের কল্পনা বহু প্রাচীন।[১] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ফললাভের জন্য অথবা উহা কামনামূলক। এখানে কামনা —আনন্দ বা সুখ—পিতৃলোকে ভোগ ও চন্দ্রলোকে ভোগ। এই ধারাটি পরবর্ত্তী শাস্ত্রে ও বিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে ঐ একই ভাবের প্রভাব দেখা যায়। অপবর্গ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি মানবের চরম লক্ষ্য। হয় নিরতিশয় সুখ, না হয়

১। ঋক্‌বেদ, ১০, ১৪, ৮; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫, ৭, ৭, ১।

দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। মাত্র ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্ম অনুষ্ঠানে কামনার লেশ থাকিবে না, কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার মনটাকে এরূপ ভাবে গড়িয়া লইতে হইবে যে, সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, এমন কি, শারীরিক ক্লেশ শীত-উষ্ণ প্রভৃতিও একই ভাবের বোধ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ঋতের জগৎ ও সত্যের জগৎ পরস্পর একপথগামী নহে। বৈদান্তিক যুগে সত্য আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বেও উহার ঐ ব্যবহারই ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখন ঋতের জগৎ অথবা প্রকৃতির অধিকৃত জগৎ নিয়মের অধীন। আমরা শত চেষ্টা করিলেও মাধ্যাকর্ষণের বাধা অতিক্রম করিয়া, লাফ দিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারিব না অথবা বিনা আলোকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু নীতি-জগতে বা সত্যের জগতে আমরা প্রকৃতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকি। এই নীতিজগৎ বা পারমার্থিক জগৎ প্রকৃতির অধীনে অথবা প্রকৃতির অতীত? নব্য ইউরোপীয়েরা এই প্রকৃতির স্থান ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়াইয়া নীতি-তত্ত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানুষ যাহা জানে, যাহা ভাবে, যাহা বুঝে ও যাহা দেখে, সে সকলই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পশ্চাতে আর কিছুই নাই। প্রকৃতিই জড়, প্রকৃতিই মন এবং প্রকৃতিই চৈতন্য। এ কথাটার কোন সার্থকতা নাই; কারণ, জড় ও জড়শক্তি লইয়া প্রকৃতি। বহু পূর্ব্বে প্রকৃতিবাদী সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে এই ভাবেই দেখিয়াছিলেন এবং এখনকার প্রকৃতিবাদীও প্রকৃতিকে ঐ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তবে সাংখ্যকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল জড় ও জড়শক্তি দ্বারা মানব-রহস্য বুঝান যায় না। সেই জন্য তাঁহাদের পুরুষ বা চৈতন্য। সাংখ্যেরাও মানবের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত ব্যাপারই বুঝিয়াছিলেন। মানুষ যদি আগাগোড়া জড়-শক্তিরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে সে জড়কে বুঝে কি করিয়া এবং তাহার অনন্তের জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসে? কাজেই জড়ে ও আত্মায় বা চৈতন্যে একটা প্রভেদ না থাকিলে চলে না। আবার এ দিকে প্রকৃতি কি অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি কি, তাহারই বা এত দিনে আমরা কতটা বুঝিয়াছি? এক একটা সৌরমণ্ডল কেবল তন্মাত্রের বা পরমাণুর সমষ্টি। তাহারা একটা কেন্দ্র গ্রহণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। কেন ঘুরি-তেছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি, মাধ্যাকর্ষণবশতঃ। প্রকৃতির জ্ঞান ত আমাদের এইটুকু মাত্র হইয়াছে।

যাহা হউক, মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার শক্তিটা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পূর্ব্বে ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ইচ্ছা ও কার্য্যে একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। তবে ইচ্ছা কাহার দ্বারা অনু-শাসিত হয়? একদল বলেন,—ইচ্ছা স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র; আর একদল বলেন, ইচ্ছা পর-ভাবী বা পরতন্ত্র। এ কলহের মূলে যাইবার আবশ্যক নাই। তবে হিন্দু গ্রন্থে ও শাস্ত্রে

ইচ্ছার স্ব-তন্ত্রতা বা স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। কর্ম্ম-বাদী হিন্দুরা বুঝিয়াছেন সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় ইচ্ছাশক্তি জন্যই হইয়া থাকে। যোগ বা ধ্যান হিন্দুর চক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রধান পন্থা। ইচ্ছা শব্দটি ন্যায়গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্য বা যোগগ্রন্থে ঠিক ইচ্ছা শব্দটি নাই। তবে ইচ্ছামূলক অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমার বোধ হয়, নব্য-যুগের ইচ্ছা শব্দে প্রাচীন হিন্দুরা যাবতীয় মানসিক শক্তি বুঝিতেন। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধই যোগ। কিন্তু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহা দ্বারা হয়? যোগশাস্ত্র মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যও মানসিক শক্তিরই ফল। কাজেই ধরিয়া লইতে হয় যে, চিত্তেরই এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা অভ্যাস সাধিত হয়। কোন কোন হিন্দুগ্রন্থে যোগ-শক্তি অস্বীকৃত হইয়াছে। বোধ হয়, গোতমীয় ও কাণাদ এবং বিশেষতঃ মীমাংসা-মতে যোগ-শক্তির ফলস্বরূপ সর্বজ্ঞত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা যোগফলে অবিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে অভ্যাসবলে মানুষ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, অভ্যাস করিলে আমরা পৃথিবী বা ভুবনত্রয় লাফ দিয়া পার হইতে পারি না। তাহার উত্তরে ন্যায়-কন্দলীকার শ্রীধর একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। শ্রীধর ইহার উত্তরে বলেন যে, বাস্তবিক অভ্যাসবশতঃ শরীরের শক্তি অসীম হয় না। কিন্তু মন সম্বন্ধে তাহা বলিতে পার না। কারণ, মনের শক্তির আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। মনের অধিকার কতদূর বিস্তৃত, তাহা বলা যায় না। কাজেই মনের দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদের বিষয়ের উপক্রমণিকাস্বরূপ। নীতিতত্ত্বের মূল মন্ত্রগুলি আয়ত্ত হইলে বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক হইবে না। বৌদ্ধনীতির মূল সূত্রসমূহ যে বুদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগে অপরিচিত ছিল না, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ও বৈদান্তিক যুগে আমরা দুইটি মহৎ নিয়মের উল্লেখ পাইয়াছি। ঋত ও সত্যের অনুভূতি বৈদিক ও বৈদান্তিক যুগে সমভাবেই ছিল। তাহার পর আত্মসংযম, শম, দম প্রভৃতি, আত্মত্যাগ, সৎ-অসৎ, শ্রেয়ঃ প্রেয় ও অমৃতত্ব নামক চরম পুরুষার্থ—এই সকল সংস্কার ও আদর্শ বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগেও ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। অমৃতত্ব যে মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়, ইহা কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, অপরাপর প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেও ইহা ছিল। মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দের মূলে পুনর্জ্জন্ম ও দুঃখনিবৃত্তি রহিয়াছে। কাজেই মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও অমৃতত্বে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। আর একটি বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আবশ্যক। সে প্রক্রিয়াটি নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন, ধ্যান ও যোগ, একই বিষয়ের নামভেদ মাত্র। ধ্যান ও সমাধিই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতির মূল ভিত্তি, ইহাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির প্রধান অনুষ্ঠান, তাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব।

বিষয় অনুপ্রবেশের পূর্ব্বে বিপক্ষ-পক্ষের দুই একটি আপত্তির সমালোচনা আবশ্যক। ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ধর্ম্ম ও নীতিবাদ দুঃখমূলক। তাঁহাদের

মতে প্রাচীন বৈদিক যুগে দুঃখ-বাদটা মোটেই ছিল না। কারণ, তাঁহাদের জীবনের প্রতি অনুরাগ ছিল। তখন পুনর্জ্জন্ম-বাদটা ছিল না; দেবলোকে অথবা পিতৃলোকে গিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া, তাঁহাদের আবার জীবন ভোগের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উক্তিটা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে একটা ধুয়া গোছ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপের বড় বড় দার্শনিক, তাঁহারাও দুঃখবাদী। সপেনহর ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ জগৎ-সৃষ্টিটা সম্পূর্ণই ভুল এবং মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনও সার্থকতা নাই। উইলিয়ম্ জেম্‌স্—তিনি আজ-কালকার একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তিনিও স্পষ্টভাবে মানব-জীবনে দুঃখ-বহুলতার কথা বলিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গেটে, ম্যাথ্ আরনল্ড প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক—তাঁহারাও জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন। অপরের উক্তি বাদ দিয়া প্রত্যেকেরই নিজের অভিজ্ঞতাই দুঃখবাদের একটি প্রমাণ। জীবনে মানুষের যাহা আশা ও কল্পনা, তাহার কয়টা সফল হয়, আবার তাহার কত আশা পোষণ করিতে সাহসই হয় না। এইটুকু ত গেল ব্যক্তির দিক্ হইতে। আবার সমাজেরও ঐ অবস্থা অর্থাৎ দুঃখবহুলতা। কতক লোক অলসভাবে বিলাসভোগ করিতেছে, আবার কত লোক খাটিয়া খাটিয়া দুই বেলায় আহার সংস্থান করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর রোগ, শোক, প্রাকৃতিক নিগ্রহ, এ সকল ত আছেই। এই দার্শনিক সমস্যার সমাধানে ইউরোপ-বাসী কখনও চেষ্টা করে নাই এবং সে শক্তি পূর্ব্বেও ছিল না এবং এখনও আছে বলিয়া বোধ হয় না। জন্মান্তর-বাদ ভারতীয় প্রতিভার ফল এবং ইহা সম্প্রতি ইউরোপীয় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক সমাজে স্থান ও আদর পাইতেছে।

আর একটি ইউরোপীয় আপত্তি যে, ভারতীয় নীতি বা কর্ম্মানুষ্ঠানে মানব-সমাজের কোন স্থান নাই। উহাতে কেবল মাত্র ব্যক্তিরই মঙ্গল বা কুশলের দিকে লক্ষ্য আছে। এ কথাটায় বিশেষ কোনও মূল্য নাই। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ এবং ব্যক্তির মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় প্রধান দার্শনিকেরা ব্যক্তিগত নীতিরই পোষণ করিয়াছেন। কারণ, স্বতোগ্রাহ্যবাদ ও আত্মোপলব্ধিবাদ ব্যক্তির জন্যই আবশ্যক।

ইউরোপীয় তৃতীয় আপত্তি যে, ভারতীয় নীতিবাদে তপঃ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মানুষের কোমল প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি শুকাইয়া যায় এবং মানুষে ও লোষ্ট্রে বিশেষ কোনও প্রভেদ থাকে না। আশা ও কামনাশূন্য হইয়া কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। বাহ্য ও অন্তর নিগ্রহ করিয়া পরমহংস অথবা অবধূতের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানুষের লাভ কি? উহা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সংসার ছাড়ায় মনুষ্যত্ব নাই, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত, ইষ্ট অনিষ্ট, দুঃখ বিপদের মধ্যে থাকিয়া কাজ করাই মনুষ্যত্ব। এ আপত্তিটি বড় গুরুতর। অল্প ভাষায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। ভোগবাদী ইউরোপের দৃষ্টিকেন্দ্রে দেখিলে ইহার মীমাংসা হয় না। ইউরোপীয় মধ্যযুগ খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসের যুগ। মধ্যযুগ ইউরোপীয় দৃষ্টিতে বড়ই হেয়। ভোগের চক্ষে সন্ন্যাস চিরকালই অশ্রদ্ধার বিষয়। তবে এখন আবার দেখা

যায় যে, ইউরোপে একটা প্রতিস্রোতঃ আসিয়াছে। মধ্যযুগের আদর্শ ও জ্ঞানের আদর অল্প অল্প করিয়া বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই আপত্তির উত্তরে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অভিব্যক্তিবাদ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের মূল মন্ত্র, অবস্থানের উপযোগিতা। যে জীব বা উদ্ভিদ এই অবস্থানের উপযোগী হইতে পারে, সে একটা জীবনের নূতন "বীজ" পায় এবং সেই সঙ্গে তাহার কতকগুলা শারীর সংস্থানেরও পরিবর্ত্তন হয়। প্রাণিজগতে এক একটি জাতি আসিতেছে, আবার তাহার ধ্বংস হইতেছে। যাহারা টিকিয়া যায়, তাহাদেরই অভিব্যক্তিবাদীরা উপযোগী বলিয়া থাকেন। কাজেই উপযোগিতার কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই। এক এক শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে বা অভিব্যক্তির মূলে কোনও দেব-অভিপ্রায় আছে কি না? এক জন নবীন আস্তিক দার্শনিক বলেন, অভিব্যক্তি নিয়মে কোনও অভিপ্রায় দেখা যায় না। মানুষ যেমন নূতন কিছু করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে, এই ধারাবাহিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পশ্চাতে সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা রহিয়াছে। জড় ও জীব-সৃষ্টির নূতন নূতন প্রকরণে যেখানে পরীক্ষা সফল হইতেছে না, আবার একটা নূতন প্রকরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ, আবার নূতন চেষ্টা, নূতন উদ্যম। অতএব স্রষ্টাও মানুষের মত অপূর্ণ ও সসীম।

যাহা হউক, অভিব্যক্তি নিয়মের পিছনে কোনও অভিপ্রায় থাক বা নাই থাক, উহার মূল লক্ষণ পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির অভিযানের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের ত্রাণ নাই। যদি মনে করা যায় যে, এই প্রকৃতি অভিযানে উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ-যোনি অতিক্রম করিয়া উন্নত মানুষ—জীব হইয়াছে, তাহা হইলে ধরিতে পারা যায় যে, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত জীব ভবিষ্যতে আসিবে। তাহাকে অতিমানব (সুপারম্যান)ই বল, আর দেবতাই বল। তাহাদের বিশেষ লক্ষণ কি হইবে? যদি তাহার ধরণ ও ভাব আমাদেরই মত হয়, তাহা হইলে তাহারা উন্নত হইল কিসে? স্রষ্টার চক্ষে কীট ও মনুষ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি না, বলা যায় না। মানুষের অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট কোনও জীব আসিলে তাহারা কি হইবে, তাহা কে বলিবে? এই জীব-জগতে আসা যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া, সৃষ্টি-প্রলয় কি চিরকালই চলিবে? দেবযোনি অথবা পূর্ণ-মানব আসিলে জগতে কি অভাব দূর হইবে? অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মানুষের ক্লেশ ত থাকিয়াই গেল। সুপারম্যান আসিবে বলিয়া এত পূর্ব্ব-সৃষ্টি আবশ্যক কেন? তাহাদের ত একবারে আসিলেই চলে; জীবের পর জীব, রকমের পর রকম না আসিলে কি সুপারম্যানের আসা হয় না? স্রষ্টার যদি সুপারম্যান আনাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অপরাপর জীবকে লইয়া এত কসা-মাজা কেন? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আছে বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানের তৃপ্তি, আদর্শ ও কল্পনাতেও হয়। কিন্তু জগতের অভিব্যক্তিবাদীর আদর্শে কোন তৃপ্তি নাই।

অতএব বৈদান্তিকের সহিত বিশ্বাস করিতে হয় যে, এই ভাঙ্গা-গড়া চক্রাকারে চলিতেছে। যাহা হইতেছে, তাহা মায়া। এক মহা সত্য ও নিত্য পদার্থের মানুষ-ম্লান রূপ। আমরাও

মায়ার অধীনে; কাজেই ভাঙ্গা-গড়া বা অনিত্যটাই দেখিতেছি। ইহা আমাদের অবিদ্যা বা ভুল বুঝা। স্রষ্টার ইহা লীলা বা বালকের খেলা। মানুষকে বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে পথ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধরাও জগৎকে স্বপ্ন ও মায়া বলিয়া থাকেন। মানবও তাঁহাদের মতে অবিদ্যাচ্ছন্ন। তবে তাঁহাদের জগৎকর্ত্তা নাই, কাজেই অবতারও নাই। বুদ্ধ হিন্দুর অবতার হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধদের অবতার নহেন, তিনি তাঁহাদের মহাপুরুষ, পরমযোগী। তিনি কর্ম্মবলে তত্ত্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ, অবতার ভাবে নহেন। হীনযান মতে তিনি উপাস্যও নহেন, যেহেতু কর্ম্ম ও নীতিবলে অপরেও বুদ্ধ হইতে পারে। হিন্দু এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধেরা মানুষকে খুব বড় করিয়াছেন। প্রকৃতিচর্য্যা করিলে মানুষ বড় হয় অথবা প্রকৃতি-দত্ত চিত্তকে নিরোধ করিলে বড় হয়, সে প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় এখনও আসে নাই। সুপারম্যানের মন যদি প্রকৃতির বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইল, তাহার সাম্য নষ্ট হইল, তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? যাঁহার প্রতিভা আছে, তাঁহার বিশেষত্ব মনে। যদি তাঁহার শরীর ক্লেশ না সহিতে পারে ও মন অল্পেই বিচলিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ মনুষ্যের সহিত তাঁহার কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই হিন্দু ও বৌদ্ধ আদর্শ সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা যে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাহার কোনও সারবত্তা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই অভিব্যক্তিবাদী। হিন্দুর বিকার, বিবর্ত্ত, পরিণাম প্রভৃতি বহু প্রাচীন কল্পনা। বৌদ্ধের উৎপাদ-নিরোধ ও অন্যথাভাব, অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। বৌদ্ধের প্রকৃতির সন্নিবেশ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এই আছে, আর অমনি নাই। নবীন ইউরোপীয় ও ভারতীয়, উভয় মতেই সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি অনন্ত, ইহার শেষ নাই, মহাপ্রলয়ের পরও আবার সৃষ্টি। তবে ইউরোপীয় অভিব্যক্তি যেন একটা সরল রেখা ধরিয়া যাইতেছে, আর ভারতীয় অভিব্যক্তি বৃত্ত বা চক্ররেখা অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপীয় অভিব্যক্তিতে ব্যঞ্জনার শেষ নাই, ভারতীয় মতে সৃষ্টিচক্র ষড়্ঋতুর মত একই ভাবে আবর্ত্তন করিতেছে। ইউরোপীয়ের সুপারম্যান একটি শব্দ মাত্র, একটি উগ্র কল্পনা, তাহার সার্থকতা বুঝা যায় না। ভারতীয়েরা সৃষ্টিচক্রে মহাপুরুষের আবির্ভাব, কালে কালে, কল্পে কল্পে, যুগে যুগে প্রতীক্ষা করেন। জগৎকে নূতন তত্ত্ব, তত্ত্বদর্শী পূর্ব্বেও দেখাইয়াছেন এবং পরেও দেখাইবেন, ইহাই ইতিহাসের বাণী। সুপারম্যান জগতের শেষ অবস্থায় আসিয়া জগতের কি হিতসাধন করিবেন?

নীতিতত্ত্ব, মধ্য ইউরোপে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ঐ আদর্শে বৈদিক ও উপনিষৎ-যুগের নীতি বিষয়ে যৎসামান্য বলা হইয়াছে। যুগভেদে আচার-ভেদ হয়, ইহা প্রাচীনেরা উত্তমরূপেই জানিতেন। আমরাও দেখিতে পাই, সংহিতা-যুগের আদর্শ উপনিষৎযুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উপনিষৎ-যুগের সংস্কার বৌদ্ধযুগে অন্যপ্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। তবে বৌদ্ধযুগের পরিবর্ত্তন বাহ্য রূপেরই হইয়াছিল; মূল ধাতুর কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সেইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কোন সম্প্রদায়ের মতামত বুঝিতে হইলে তাহাদের দৃষ্টিকেন্দ্র বুঝা আবশ্যক অর্থাৎ তাহারা বিশ্ব-ব্যাপার কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্প্রদায়-বিশেষের মূল মতটি বুঝিতে পারিলে নীতিতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ভারত, দর্শন-প্রাণ দেশ; কাজেই নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দর্শনও ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তা কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেন নাই। তবে উহার উৎপত্তি, ব্যবস্থাপন, সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টি-কেন্দ্র অনুসারে বুঝিয়া থাকেন। দৃশ্যমান জগৎ, তন্মাত্র, পরমাণু, ধাতু প্রভৃতি জড়-রচিত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেন না। তবে জড় ও জড়-শক্তি হইলেই যদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার আর অপর কর্ত্তা কেহ আছেন কি না এবং জীবের চৈতন্য জড়-প্রসূত কি না, এই দুইটি গুরুতর প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যাঁহারা সশক্তি জড়কেই জগতের প্রসবিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের জড়বাদী বলা যায়। আবার যাঁহারা সন্নিবেশ ও ব্যবস্থা দেখিয়া জড়ের পশ্চাতে জ্ঞান ও চৈতন্য দেখেন, তাঁহাদের চৈতন্যবাদী বলা যাইতে পারে। এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপসম্প্রদায়ও আছে। জড়বাদীর মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ অথবা তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান মানব-জ্ঞানে স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনও বিচার করা যায় না। তাঁহাদের সন্দিগ্ধ এবং দুর্জ্ঞেয়-বাদী বলা যাইতে পারে। তাঁহারাও জড় ও জড়শক্তি বা সাংখ্যের ভাষায় তমঃ ও রজঃ লইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করেন।

আবার এদিকে চৈতন্যবাদীদের ভিতরেও উপসম্প্রদায় আছে। এক দল মনে করেন যে, মানুষ কলের পুতুলের মত। জগৎকর্ত্তা তাহাদের যে ভাবে চালাইতেছেন, তাহারা সেই ভাবে চলিতেছে। জগৎকর্ত্তা পরমমঙ্গলময়; মানুষের দুঃখ কষ্ট বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। জগৎ কর্ম্মের বা পরীক্ষার স্থল। জগতের মূলে যিনি আছেন, তাঁহার বালকবৎ ক্রীড়া করাই উদ্দেশ্য। জগৎ যেমন তাঁহার খেলার সামগ্রী, মানুষও তাহাই। আত্মা সৃষ্ট ও স্রষ্টা অজ্ঞেয়। অপর সম্প্রদায় বলেন, জগৎটা কর্ম্মক্ষেত্র বটে এবং উহার মূলাধার আছেন। মূলাধার সত্তারূপে বিদ্যমান এবং তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্মারই কণা বা অংশ এবং জীব-হৃদয়ে আত্মার উপলব্ধি হয়। মানব-জীবন আত্মার বদ্ধাবস্থা এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা জীবের মুক্তি হয়। এই শেষোক্ত মতটি বৈদান্তিক মত ধরা যাইতে পারে। বৌদ্ধ মতও প্রায় এইরূপ। তবে বৌদ্ধের জগতের মূল সত্তা, মানব-বুদ্ধির অতীত এক কল্পনাবিশেষ। সে সত্তাটি অসৎ, অভাব বা শূন্য। আত্মা বলিয়া স্থায়ী কোনও নিত্য পদার্থ নাই। সমস্তই ক্ষণিক, কাজেই জ্ঞান বা সম্বিৎও ক্ষণিক। স্থায়ী নিত্য জ্ঞান মানুষের নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান, পরবর্ত্তী জ্ঞানকে আপনার সঞ্চিত বুদ্ধি দিয়া প্রভাবে মিশাইয়া যায়। কুশল কর্ম্ম করিলে মানুষের কল্যাণপ্রদ সংস্কার হয় এবং সংস্কারসমূহ একবারে নির্ম্মল হইলে মানুষ সম্বুদ্ধ ও মুক্ত হয়। এইরূপ মানুষই তত্ত্বদর্শী। সংস্কারের ভাল মন্দ অনুসারে পুনর্জ্জন্ম বা

সংসার। এইখানে বেদান্তের সঙ্গে একটু প্রভেদ। বৈদান্তিক মতে পুনর্জন্ম হয় আত্মার; বৌদ্ধ মতে সংস্কার-সমূহ পারমার্থিক নিয়ম-বশে আপনি আসিয়া জন্মাইতে বাধ্য হয়। বৈদান্তিকেরাও কর্ম্ম-ফল মানেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে কর্ম্ম-ফল আত্মাকে অভিভূত করে বা আত্মার আচ্ছাদন সূক্ষ্ম-শরীরকে অভিভূত করে। বৌদ্ধেরা উহা সংক্ষেপ করিয়া সংস্কারের উপরেই সমস্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধমত মীমাংসক মতের সহিত মিলে। মীমাংসকেরাও কর্ম্মেরই শক্তি মানিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতে কর্ম্ম হইতে "অপূর্ব্ব" (কনসারভেসন্) এবং উহা হইতে স্বর্গে যাওয়া বা মর্ত্তে আসা।

মানব-জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এখনও যে সকল জাতি বনে অথবা পাহাড়ে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও সৃষ্টির একটা না একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। পৌরাণিক যুগে ও বৈদিক যুগে নানা প্রকার সৃষ্টি-প্রকরণের উল্লেখ আছে। পর্ব্বতগুলি কি করিয়া হইল, নদীসমূহ কোথা হইতে নামিল, সমুদ্র কিরূপে উৎপন্ন হইল, অগ্নি, স্বর্গ হইতে কি করিয়া আসিল, ইহার মন-বুঝান ব্যাখ্যা একটা যে প্রকারের হউক, পাওয়া যায়। আমাদের এই গর্ব্বিত সভ্যতার যুগেও যে কল্পনার প্রভাব কমিয়াছে, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব এবং গ্রহসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে কত রকমের বাদ প্রতিবাদ আছে। কাল্পনিক চিন্তা হিসাবে সেইগুলিকে প্রাচীন সৃষ্টি-বর্ণনার পাশে বসাইলে বিশেষ দোষের হয় না। জ্ঞান যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে মানুষকে স্তিমিত-দৃষ্টিতেও চলিতে হইবে। জিজ্ঞাসা, ছাড়িবার পাত্র নহে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ত আছেই। এইরূপ প্রত্যেক দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞাত বিষয় জানার চেষ্টা আপনা হইতে অগ্রসর হইবে এবং সাময়িক দৃষ্টি ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার মীমাংসাও হইবে। চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নে এইটুকুই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার যুগে দেখা যায় যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টে বড় একটা প্রভেদ নাই। প্রকৃতি বা স্বভাবের ধারণা প্রাচীনকালে হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃতির মূলে পরমাণু বা তন্মাত্রা দেখিতে মানবজ্ঞানকে বহু দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক অধিষ্ঠানের মূলে যত দিন দেবতা বাস করিতেন বা বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তি যতদিন দেব-নিয়ন্ত্রিত ছিল, তত দিন বহু দেবতা ও বহুরূপী প্রকৃতি ছিল। ক্রমশঃ প্রতিভার বলে বায়ু, বরুণ, অগ্নি, উষা একই প্রকৃতির রূপ, ইহা অনুভূত হইল। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির একই ভাবের ক্রিয়া দেখিয়া দেখিয়া উহাতে আর দেবভাব থাকিল না এবং পরবর্ত্তী যুগে উহা ভূতে পরিণত হইল। বহুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতির পশ্চাতে বহু সত্তা আছে অথবা উহা একই সত্তার বিভিন্ন আকার, উপনিষৎ-যুগের পূর্ব্বে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বিশ্বক্রিয়ার তাঁহারা অব্যভিচারী নিয়ম দেখিলেন; উহা হইল ঋত এবং উহার পশ্চাতে এক মূল অধিষ্ঠান দেখিলেন। যাহাকে আমরা সংহিতা-যুগ বলি, উহার শেষ অবস্থায় দেবতারা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হইলেন এবং এক মহান্-বিশ্ব-দেবতা তাঁহাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, পরমেষ্ঠী

হইতেন। তিনি স্বয়ম্ভূ, ধাতা, ও বিধাতৃরূপে ঋষি-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতেন। পরে তিনি সহস্র-শীর্ষ পুরুষরূপে সর্ব্বময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবে বিকশিত হইলেন। আবার এদিকে কালও ক্রমশঃ একটা তত্ত্বে পরিণত হইল, তাহার পরিচয়ও আমরা অথর্ব্ববেদে[১] পাই।

বিশ্ব, জগৎ, তস্থুশস্ প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতিবোধক। কিন্তু ঠিক প্রকৃতির সংস্কারটা আমরা ঋত শব্দেই পাই। সংহিতা-যুগের পরে আরণ্যক, উপনিষৎ-যুগেও ঋত শব্দের বহু স্থলে প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে উহার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকার দরকার অর্থাৎ দর্শন-যুগে, সেখানে উহার ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, ঋত তখন মূর্ত্তি বদলাইয়া প্রকৃতিতে দাঁড়াইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে[২] আমরা একটি প্রশ্ন দেখিতে পাই যে, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ—ইহারাই কি জগতের মূল অথবা জগতের মূলে অপর কিছু আছে? এই মন্ত্র যে সময়েরই লেখা হউক, ইহা গভীর দার্শনিক চিন্তার ফল। যাহা হউক, ইহা বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগের রচনা না হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না। এ জগৎটা আপনা হইতে অথবা নিয়মবশতঃ অথবা আকস্মিক সৃষ্টি, এই যে প্রাচীন কালের প্রশ্ন, এখনও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই; প্রায় সমভাবেই চলিতেছে।

প্রকৃতির মূল রূপটাকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি। জ্যোতিষ্কমণ্ডল বা অচেতন জগৎ সেই একই ভাবে চলিতেছে। সেই ঋতু, সেই সমুদ্রোচ্ছ্বাস, সেই অগ্নি-দাহ, সেই বায়ুতরঙ্গ। প্রাচীনের চারি ভূত, এখনও তাহাই আছে। পৃথিবীর আকার গঠনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয় ত গ্রহসমূহের যৌবন বার্দ্ধক্য আছে। তবে পরিবর্ত্তন হয় জীব-জগতের। জগদভিযানে জীব এবং উদ্ভিদেরই ধর্ম্ম ও লক্ষণের পরিবর্ত্তন। যদি প্রকৃতির এইটাই রূপ হয়, তাহা হইলে ইহা কি স্বভাব, অর্থাৎ আগুনের যেমন উষ্ণতা অথবা তুষারের যেমন শীতলতা আছে, সেইরূপ জগতে যাহা হইতেছে, তাহা কি জগতের স্বভাব? অথবা গ্রহ-নক্ষত্র যেমন আপনার কক্ষে চলিতেছে, প্রকৃতিও কি সেইরূপ কোন বাঁধা নিয়মে আপনাকে আপনি চালাইতেছে অথবা ইহার মূলে কোন নিয়ম বা কার্য্য-কারণ-ভাব নাই; যেমন ইচ্ছা, তেমনিভাবে চলিতেছে। প্রকৃতির এই দিক্‌টা জড়ের দিক্; ইহার বিষয় বেশ অনুসন্ধান আছে। তবে চেতনের দিক্‌টা লইয়া প্রাচীনেরা বড় বেশী নাড়াচাড়া করেন নাই। যাহা হউক, এত পূর্ব্বে প্রকৃতিকে এরূপভাবে অপর কোনও জাতি অধ্যয়ন করে নাই।

আমাদের মূল কথাটা স্বভাব লইয়া। শূন্যবাদী ও যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা প্রকৃতিকে স্বভাবের মূর্ত্তিতে দেখেন নাই এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ আছে, তাহা পরে বলা হইবে। ষড়্‌দর্শনে স্বভাব-বাদ সম্বন্ধে সমর্থন অথবা নিরাকরণ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বভাব-বাদটা তবে কোন্ সম্প্রদায়ের ছিল? জয়ন্তের ন্যায়-মঞ্জরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিতে শিশুর পূর্ব্ব-জন্মের

১। ১৯, ৫৩-৫৪।　　২। ১, ২

সংস্কারবশতঃ রোদন ও স্তনপান—জয়ন্ত, নৈয়ায়িকদের সাধারণ মত অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে শিশুর রোদন ও স্তনপান স্বতোবুদ্ধিবশতঃ হয় এবং পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের উহাই উত্তম প্রমাণ। চার্ব্বাকদের উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন, শিশুর রোদন ও স্তন্যপান, তোমরা পদ্মফুল ফোটা অথবা চুম্বকের আকর্ষণের মত স্বভাব-বশতঃ হইয়া থাকে, এরূপ বলিতে পার না। তোমরা যাহাকে স্বভাব বল, সেটা কি? সে স্বভাব কি তোমাদের মতে কারণশূন্য, অজ্ঞাত কারণ-জন্য, অথবা নিয়মবিহীন কারণ-জন্য[১]? আবার মাধবাচার্য্যের সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক-দর্শনে দেখিতে পাই,—"এই অদৃষ্ট, অনিষ্ট ও জগদ্-বৈচিত্র্য কি আকস্মিক?" তাহার উত্তরে চার্ব্বাকসম্প্রদায় বলেন, "না, ইহা আকস্মিক নহে; ইহা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" তাহার পর একটি শ্লোক,—"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পার্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥" ইহা দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, চার্ব্বাকসম্প্রদায়ই স্বভাববাদী ছিলেন। তবে স্বভাববাদীরা সম্ভবতঃ পরিণামবাদী ছিলেন না।

তাহার পর সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদ। এ মতও বৌদ্ধেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ প্রসিদ্ধ। এই সৎকার্য্যবাদটি কি? যে সম্প্রদায় প্রকৃতিকে যেরূপভাবে বুঝিয়াছেন, এই কার্য্য-কারণ-বাদও তাঁহাদের সেইরূপ আকার ধরিয়াছে। সাংখ্যকারিকার টীকায় বাচস্পতি মিশ্র চারিটি কারণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলেন, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, পরমার্থ-সৎ বস্তুর বিবর্ত্তই কার্য্য। আর এক মতে সৎ হইতেই অসতের উৎপত্তি। আবার সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য্য, উভয়েই সৎ। এই বিশ্বব্যাপারের মূল কারণটি কি হইতে পারে? মানুষের মন এইখানে বিবশ হইয়া পড়ে। বিশ্ব-যন্ত্রের পিছনে একটি কিছু আছে। সে লক্ষণ-শূন্য নিত্য বস্তুর কেবল লেশমাত্র আমরা পাইয়া থাকি। যেমন অনন্তের আমাদের একটা অনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান হয়, জগতের মূল বস্তু সম্বন্ধেও বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেই ভাবের একটা জ্ঞান হয়। জ্ঞানের মূলে আমরা কয়টি পদার্থের পরিচয় পাই—জড়, প্রাণ, মন ও চৈতন্য। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জগতের মূল পদার্থ পরমাণু নামে অভিহিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের মতে বিশ্বের উপাদান এক অখণ্ড নিত্য বস্তু নহে; তাঁহাদের বহু সত্তা ধরিতে হইয়াছে। মন, চৈতন্য, পরমাণু—এ সমস্তই নিত্য; ইহাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে; কেহ কাহারও অধীনস্থ নহে। তাহাদের একত্র সমাবেশে জগৎ রচিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক বলেন, এই সমাবেশ বা সন্নিবেশ ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। অতএব উপাদান ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে। আবার বৈশেষিক মতে পরমাণু-সন্নিবেশ ও পরিস্পন্দ কোনও কর্ত্তা দ্বারা হয় না। উহা কোনও অজ্ঞেয় কারণবশতঃ হইয়া থাকে। কাজে কাজেই ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বহু সত্তা এবং উহাদের একত্র সংযোগে জগৎ রচিত হইয়াছে। যাহা হউক, বহুসত্তাবাদীর বহু

১। স্বাভাবিকং নাম কিমুচ্যতে, কিমহেতুকং অবিজ্ঞাতহেতুকং, অনিয়তহেতুকং বা।—ন্যায়মঞ্জরী, ৪৭০।

উপাদান-ঘটিত জগৎ রচনা বুঝা কঠিন। সাংখ্যেরও প্রকৃতি সর্ব্বময়ী। এক দিকে মনোবস্তু ও অপর দিকে জড়, এই উভয়ের বিক্ষোভ ক্রিয়াশীল রজের দ্বারা হইয়া থাকে বা রজই ক্রিয়া বা কর্ম্ম। ইঁহাদের জড় ও জড়শক্তি এবং চিত্ত, এই তিন লইয়াই প্রকৃতি। তবে জ্ঞানের জন্য চৈতন্য আবশ্যক, সেই জন্য পুরুষের অবতারণা। এখানে প্রকৃতিই আপন শক্তিতে আপনি বিকশিত বা পরিণত হইতেছে, ইহাই সৃষ্টি। কাজেই সাংখ্যের সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যক হয় নাই। আত্মা কেবল দ্রষ্টা ও চেতন। এখানেও দেখা যাইতেছে, দুইটি সত্তা। বৈদান্তিক মতে প্রকৃতি জগৎকর্ত্তার বিবর্ত্ত মাত্র। অর্থাৎ জগৎকর্ত্তাই স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে জগৎকর্ত্তা ও প্রকৃতি দুইটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নহেন, একই বস্তুর দুইটি রূপ। এই জন্য বৈদান্তিক একসত্তাবাদী এবং এই মতটিই মানব-বুদ্ধির পক্ষে যুক্তিপূর্ণ।

বিশ্ব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদের প্রাচীন কোনও দর্শন নাই। অভিধর্ম্ম গ্রন্থসমূহে যে সকল বিচার বিতর্ক আছে, তাহা অবশ্য সুসঙ্গত ও সুযুক্তিসম্পন্ন এবং উহাতেও অনেক দার্শনিক তত্ত্ব আছে। তবে উহার বিষয় অবতারণা ঠিক দার্শনিক ধারায় নহে। বুদ্ধ-মহানির্ব্বাণের পরেও থেরবাদীরা দার্শনিক গ্রন্থ-রচনায় উদাসীন ছিলেন। উহাঁদের ধর্ম্ম, নীতিশিক্ষা ও উপদেশই লক্ষ্য ছিল। মহাযানসম্প্রদায়ের ভিতরে বিশুদ্ধ দর্শন আছে এবং উহা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-প্রভাবে রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থের পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি এবং উহারও অধিকাংশই বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ লেখক দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, মহাযানসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-সংঘর্ষেই গঠিত হইয়াছিল। উহাঁদের ধর্ম্ম ও দর্শন দুইই, সূত্র ও অভিধর্ম্মমূলক নহে। মহাযান-সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ, তথতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদ প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শূন্য ও বিজ্ঞান, এই দুইটি বাদেরই প্রতিবাদ দেখা যায়। বুদ্ধদেব জগতের মূল সত্তা সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করিতেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। শূন্যশব্দ তিনি দুই এক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি অগ্নি-শিখা ও উহার অন্তর্ধান প্রভৃতি দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ব্বাণ ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। অগ্নি-শিখা পূর্ব্বে কোথায় ছিল ও কোথায় চলিয়া গেল, ইহা বাস্তবিকই ভাবুকের মনে চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়।

শূন্যবাদীদের কথা প্রথমে বলিব। নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কুমারজীব ও চন্দ্রকীর্ত্তি, ইঁহারাই শূন্যবাদী। নাগার্জ্জুনের মত বহু প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষেই সম্ভবে। শূন্য-পদার্থ কি, তাহা নাগার্জ্জুনের ভাষায় বলিব এবং যোগ্য টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিব। প্রজ্ঞাপারমিতায় আমরা দেখিতে পাই, "শূন্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মা নিঃস্বভাবযোগেন" অর্থাৎ বস্তুসমূহের স্বকীয় ভাব নাই; কাজেই উহার বিভিন্ন রূপ বা ধর্ম্ম—শূন্য। নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিকসূত্রে মূল কারণের লক্ষণ একস্থলে এইরূপ করিয়াছেন,—"শূন্যমিতি ন বক্তব্যম্ অশূন্যমিতি বা ভবেৎ। উভয়ং নোভয়ং চেতি

প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে।" এই মূলাধারকে শূন্য বলা যায় না, উহা অশূন্যও হইতে পারে অথবা দুইই হইতে পারে, কি তাহা নাও হইতে পারে, কেবল বুঝিবার জন্য শূন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা শূন্যের আবার প্রকার-ভেদ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের মহাশূন্য আছে, আবার মহাশূন্য হইতে শূন্য অবধি ক্রমভেদ আছে।

অশ্বঘোষও একজন বড় দার্শনিক। তাঁহার লঙ্কাবতারসূত্রে "তথতা"বাদ অবতারণা করিয়াছেন। তথতা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ভাবাভাবসমানতা" এবং কোন কোন স্থলে "তথতা" শূন্য নামেও বলা হইয়াছে। শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন, তিনি সমস্তই নাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ নাই, গমন (মোসন) নাই, কর্ম্ম নাই, সংস্কার এবং এমন কি, বুদ্ধও নাই। এইরূপে যাহা কিছু লইয়া বৌদ্ধ মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কিছুই নাই। তথতা মতে জগৎ বলিয়া কোনও অধিষ্ঠান নাই অথবা সমস্তই শূন্য—ধর্ম্ম বা গুণসমূহ ক্ষণিক। আমরা জগৎ রচনা করি বা আমাদের চিত্ত উহা রচনা করে; যেহেতু উহা "নির্ম্মিতপ্রতিমোহী" অর্থাৎ উহা মন দ্বারা গঠিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়া রাখে। সমস্তই "মায়োপম"। বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রথম, যাহা জ্ঞানসমূহ ধরিয়া রাখে, তাহা খ্যাতিবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়, যাহা কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে সজ্জিত করে, তাহা প্রতিবিকল্প বিজ্ঞান। তাহার পর চিত্তের কথা। সমুদ্র একটা জলরাশি, চিত্তও অনেকটা তাহাই। চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। চিত্ত ও মনে প্রভেদ এই যে, চিত্ত ভাব-সমূহ সংগ্রহ করে ও মন উহার বিধান বা সন্নিবেশ করে এবং বিজ্ঞানরূপে পঞ্চস্কন্ধ রচনা করে। বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের শেষে কিছু বলা হইবে। রত্নকীর্ত্তির দুইটি প্রবন্ধে উহার আলোচনা আছে। তবে উহা "তথতা"বাদেরই পরিণাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি অনুসন্ধানে দৃষ্টিকেন্দ্র অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কল্পনা। বৈদিক যুগে প্রকৃতির নাম ঋত ছিল। উপনিষৎ, ব্রাহ্মণযুগেও ঋত শব্দ প্রকৃতিবাচক ছিল। মনুসংহিতাতে ঋত শব্দের উল্লেখ আছে; তবে উহা সত্য অর্থে। দর্শন-যুগে প্রকৃতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। বোধ হয়, ঐ সময় হইতেই বিশ্ব-ব্যাপার, প্রকৃতি নাম ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধেরা স্বভাব-বাদী নহেন, আবার প্রকৃতি-বাদীও নহেন; তাঁহারা এই দুইটি নামই ত্যাগ করিয়া উহার নূতন নামকরণ করিলেন। তাঁহারা এই বিশ্ব-ক্রিয়ার প্রতীত্যসমুৎপাদ[১] নাম দিলেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহাতে বহু উপসর্গ সংযোজিত হইয়া থাকে; দেশে নূতন ভাব আসিলে নূতন কথা না হইলে প্রাণের আশা মিটে না। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধের দৃষ্টিতে এক বিশাল ব্যাপার, উহা একদিকে ধর্ম্ম, আবার উহা শূন্য। কাজেই যাহার উপর এত বড় সংস্কার আরোপিত আছে, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া মতভেদ হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এক সম্প্রদায় "ইতি" ধাতুর অর্থ করিলেন—গতি, গমন অর্থাৎ বিনাশ; অতএব প্রত্যেক বিনাশী

১। সংযুত্তনিকায়, ১২,১০ দ্রষ্টব্য।

ভাবের সমুৎপাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর এক মতে "প্রতি" উপসর্গ বীপ্সার্থে, "ইত্য" শব্দ প্রাপ্তি অর্থে, সমুৎপাদ শব্দ সম্ভবার্থে; অতএব রূপ প্রভৃতি প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া উহা প্রতীত্যসমুৎপাদ। তারপর ধর্ম্মসঙ্গিনী নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থে "তস্স পচ্চয়ধম্মস্স ভাবেন ভবনশিলস্স ভাব" অর্থাৎ প্রত্যয় ধর্ম্মের ভাব হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহারই ভাব। আর এক মতে "ইমস্সিন্ সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপপাদ ইদং উপপজ্জতে" ইত্যাদি। তাহার পর সিংহলী টীকা আছে—"পচ্চয়সামগ্‌গিম্ পতিচ্চ সমং গন্ত্বা ফলানাম্ উপ্পাদ এতস্মাতি পতিচ্চসমুপ্পাদ"। তাহার পর ব্রহ্মদেশের টীকা আছে—"তদ্ভাবভাবী ভাব"। যাহা হউক, আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির মতে সমুৎপাদ শব্দ প্রাদুর্ভাব অর্থে ব্যবহৃত; অতএব হেতু-প্রত্যয়-অপেক্ষিত অভাবসমূহের উৎপাদই প্রতীত্যসমুৎপাদ।

যাহা হউক, প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের যত অর্থই থাক, সকল অর্থেরই একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা কার্য্য-কারণ-বোধক! তবে উহা নিমিত্ত বা উপাদান কারণ নহে; কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সমবায়ে যে ভাবের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবটাই প্রতীত্যসমুৎপাদ-জনিত। সে ব্যাপারগুলির নাম প্রত্যয় অথবা সম্বন্ধ। (১) হেতু, (২) আলম্বন, (৩) অনন্তর ও (৪) আধিপতেয়, এইগুলির নাম প্রত্যয়। (১) যে যাহার নিবর্ত্তক অর্থাৎ বীজ-ভাবে স্থিত, সে তাহার হেতু। (২) যাহা অবলম্বন করিয়া কোনও ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই আলম্বন। (৩) কারণের নিরোধে কার্য্যের উৎপত্তি, যেমন বীজের নিরোধে অঙ্কুরের উৎপত্তি, ইহাকেই অনন্তর বলে। (৪) আধিপতেয় "যস্মিন্ সতি যৎ ভবতি" অর্থাৎ যাহা হইলে যাহা হয়, সেই তাহার আধিপতেয়। মাধ্যমিক সূত্রমতে এই প্রতীত্যসমুৎপাদই শূন্যতা, "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষতে"। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধ তন্ত্রের চূড়াস্বরূপ এবং ইহা সাংখ্যের প্রকৃতি নহে ও নাস্তিকের স্বভাবও নহে; ইহা একটা নূতন কল্পনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতে বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধ, মন সম্বন্ধে এত বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সে সকল বিষয় আলোচনা না থাকিলে তদানীন্তন সুধীমণ্ডলীর উহা বোধ-গম্য হইত না। তাহার নিদর্শন উপনিষৎসমূহে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দর্শনগুলি কতকটা ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র কেবল দর্শন নহে, উহা ধর্ম্মও বটে; এমন কি, ন্যায় বৈশেষিক তত্ত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরও মুক্তি হয়। বৌদ্ধ তত্ত্বও ঐরূপ একটা দার্শনিক ধর্ম্ম। বোধ হয়, আত্মা ও বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে মহাভারত ও যোগবাশিষ্ঠের পার্শ্বে পিটকের স্থান হইত।

তবে শূন্যবাদ বৌদ্ধ-তন্ত্রেরই ব্যাপার, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। উপনিষৎ আলোচনায় বুঝা যায় যে, অসৎবাদ কোনও একটি সম্প্রদায়বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দুই[১] স্থানে আমরা স্পষ্টভাবে অসতের উল্লেখ দেখিতে পাই।

১। দ্বিতীয় বল্লী, ৬,৭।

প্রথম স্থলে, ব্রহ্মকে যদি অসৎ বল, তাহা হইলে তুমিই অসৎ। অপর স্থলে, জগৎ প্রথমে অস্তিত্বশূন্য ছিল, তাহার পর অসৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম অস্তিত্বে বা ভাবে পরিণত হইলেন। কাজেই শূন্যবাদ যে বুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল না, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

বৌদ্ধেরা জগৎকে কেবল কার্য্য-কারণ ও নিয়মাশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন। বাহ্য জগতেও যেমন কারণ ও কার্য্য, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ। জগতের মূল শূন্য। ভাবের উদয় হইতেছে সত্য, তাহার পর আবার অভাব। যে ক্ষণটুকু উহা বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত থাকে, সেইটুকুই আমরা জানিতে পারি। সকল ভাবেরই উৎপাদ ও নিরোধ হয়, তাহা ছাড়া অপর কিছুই নাই। ইহার মূলে অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ[১]। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, উহা হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি এবং জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য প্রভৃতি। এই কঠোর নিয়মবশে মানুষের জীবন চলিতেছে। আবার এদিকে আভ্যন্তরীণ জীবনেও ঐ কঠোর নিয়ম। সংস্কার বা বৃত্তি লইয়া মানসিক গঠন এবং রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধের মধ্য দিয়া পুনরায় সংস্কার।

এখন কথা এই যে, মানুষ কি কেবল যন্ত্রের মত এই জীবনচক্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে? মানুষের কিছু কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নাই? ইহার উত্তর, মানুষের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আছে এবং যিনি সম্বুদ্ধ বা তত্ত্বদর্শী হইয়াছেন, তিনিই জীবনের পন্থা স্থির করিতে পারেন। কি ভাবে তত্ত্বদর্শী হয়, তাহা পরে বলা হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ একটি উচ্চ তত্ত্ব। তাহা ছাড়া চারিটি আর্য্য-সত্য আছে—দুঃখ, দুঃখসমুদয় বা উৎপত্তি, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপৎ বা পন্থা। দুঃখ নিরোধের উপায় কি? দুঃখ নিরোধের উপায় অষ্টমার্গ[২]। কর্ম্মজনিত সংসার বা প্রেত্যভাব অর্থাৎ মানুষের যাওয়া আসা উপনিষদেরই শিক্ষা। চারিটি আর্য্যসত্যের উল্লেখ যোগদর্শনেও আছে। তবে ইহা বৌদ্ধেরা যোগদর্শন হইতে পাইয়াছেন অথবা যোগদর্শন এ বিষয়ে বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ধ্যান ব্যাপারটি বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগের এবং উহার প্রকরণ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

এখন বৌদ্ধনীতি কি, তাহাই দেখা যাউক। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য-[৩] বাদী। যদিও জন্মসূত্রে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মনিয়ম অনুসারে মানব-চরিত্র গঠিত হয়, তাহার বৃত্তিসমূহ আকারিত হয় এবং এই হিসাবে তাহারা নিয়তিবাদী, কিন্তু বীজরূপী পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারসমূহ ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতির দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়। সংস্কার শব্দ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয় শাস্ত্রেই নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে বেগাখ্য, স্থিতি-

১। কোন মতে ৯ ও ৫ [মিলিন্দ প্রশ্ন, দিঘনিকায় ১৫, মহানিদানসূত্র]। ২। সম্যক্‌দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্, কর্ম্মান্তঃ, আজীব, ব্যায়াম, সমৃতি, সমাধি। কর্ম্মান্তঃ—conduct, ব্যায়াম—endeavour।

৩। Free Will.

স্থাপক ও ভাবনাখ্য, এই ত্রিবিধ সংস্কার। এখানে সংস্কার শব্দ ইংরাজী "আইডিয়া" ও "পোটেন্‌সি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা জড় ও মন, উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বৃত্তি (predisposition) অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হয় এবং পরজন্মে প্রকাশিত হয়, এরূপ অর্থেও সংস্কার শব্দ ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধেরাও দুই অর্থে সংস্কার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, একটি সংস্কারস্কন্ধ ও অপরটি সঞ্চিতবৃত্তি বা অভ্যাস। বৌদ্ধমতে বহু সংস্কার,—কেহ বাহান্নটি, কেহ বা ততোধিক সংস্কার ধরিয়াছেন। সংস্কার চেতসিকের অন্তর্গত অর্থাৎ উহা চিত্তের এক একটি ভাব। আবার এদিকে বিজ্ঞানও ঊননব্বইটি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মন লইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বিশেষভাবে সাধনা করিয়াছেন। চেতসিকসমূহ, রস, ভাব ও বৃত্তি।

নীতিসাধনে কতকগুলি চেতসিক বিশেষ আবশ্যক। বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য্য, প্রীতি ও চণ্ড। বিষয়ে অগ্রসর হওয়াকে বিতর্ক বলে। বিষয়ে মনোরক্ষা—বিচার; অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে মনঃ সংযোগ করি, কি না করি, ইহাই অধিমোক্ষ; বীর্য্য অর্থে উৎসাহ; প্রীতি অর্থে আনন্দ বা অনুরাগ; কামনা বা কামকে চণ্ড বলে। কোন বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চার করিতে হইলে ইচ্ছার আবশ্যক। বৌদ্ধ ভাষায় ইচ্ছার নাম চেতনা। চেতনা দ্বারা বিষয়ে একাগ্রতা হয়। আবার কতকগুলি হেয় চেতসিক আছে। সেগুলি মোহ (ভুল-বুঝা), আহিরিক (লজ্জাহীনতা), অনোত্তপ্প (ফলাফল-চিন্তাবিহীনতা), উদ্ধচ্চ (মনঃসংযোগে বাধা)। লোভ ও দিট্‌ঠি, এই দুই বিশেষ চেতসিক।

নীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অনুরুদ্ধের অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। উহা একখানি সংগ্রহ-পুস্তক এবং অভিধর্ম্মের সার মর্ম্ম উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। খ্যাতনামা বুদ্ধঘোষ বোধ হয়, সকল লেখক অপেক্ষা টীকা টিপ্‌পনীর দ্বারা এবং তাঁহার বিশুদ্ধিমার্গ-নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধি-মার্গে এ সকল বিষয় যথেষ্ট আলোচনা আছে।

কর্ম্মের মূলতঃ দুইটি ভাগ, কুশল ও অকুশল। ইহা ছাড়া অপরাপর ভাগও আছে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকার কর্ম্ম। আবার কারণ-রূপী কর্ম্ম—যাহা মানুষকে সংসারে আনে; বিপাক কর্ম্ম অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং ক্রিয়া অর্থাৎ কারণ-শূন্য কর্ম্ম, ইহা "বুদ্ধ" অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম-মার্গে উত্থানের পূর্ব্বে কতকগুলি শীল ও ষট্‌ পারমিতা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শীলসমূহ বুদ্ধের দশশীল বা নিষেধ-বাণী; আর পারমিতাগুলি[১] বিধি, তৃষ্ণা ও কাম মানুষকে বিপথগামী করে। কুশল কর্ম্মে মন নিবিষ্ট হইলে ক্রমশঃ বীথিমুক্ত হয় অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। তাহার ফলে "জবন" অর্থাৎ বিষয়ের সম্যক্‌ প্রতীতি।

বিজ্ঞান যে কেবল বাহিরের বস্তুরই হইয়া থাকে, তাহা নহে; পারমার্থিক জগতেরও বিজ্ঞান

১। দান, শীল, ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা), বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা এবং অপর চারিটি উপায়, প্রণিধান, বল ও ধ্যান।

হয়। পারমার্থিক জগতের বিজ্ঞানের আবার ক্রমভেদ আছে। প্রথমতঃ আদিকর্ম্মিকা বীথি অর্থাৎ শীলবিশুদ্ধি। ইহা সুকৃতি ভিন্ন হয় না। আগে সংসার-চিন্তা দূর করিয়া অভীষ্ট চিন্তার প্রতি মন অগ্রসর করিতে হইবে। প্রথম আরম্ভে পরমার্থ বিষয়ের যে আভাস হয়, উহা পরিকর্ম্মনিমিত্ত[১]। তাহার পর বিষয়ের পরিস্ফুট[২] মূর্ত্তি সম্মুখীন হয়, তাহার নাম উগ্রহনিমিত্ত। তাহার পর পাঁচটী বাধা আসে—তাহাদের নাম পঞ্চনিবারণ। সে বাধা অতিক্রম করিলে উপচার-সমাধি। ইহাই যোগ-জীবনের বোধ হয় আরম্ভ। এই অবস্থায় কাম-বিজ্ঞান বা ক্ষুৎ-পিপাসার জগৎ চলিয়া যায়। তাহার পর রূপবিজ্ঞান আসে ও এই অবস্থার ইহা প্রথমাধ্যায়, ইহার আবার অঙ্গবিভাগ আছে। তাহার পর বিচার অর্থাৎ আবার ঐ অবস্থার বিষয়ে মনোরক্ষা, বিচারের পর প্রীতি-ক্ষুদ্র ও ঐকান্তিক। সুখ, বৌদ্ধের মরু-মরীচিকা বা জলভ্রম, আর প্রীতি বাস্তবিক জলপ্রাপ্তি। তাহার পর ধ্যানানন্দ। অর্হতদের স্থান বেশ উচ্চ নহে। তাঁহারা ধ্যানী নহেন; তাঁহারা শুষ্ক বিপশাক। ধ্যানানন্দকে 'অপ্‌পনা' বলে এবং ঐ অবস্থায় যে বিতর্ক হয়, তাহাতে চিত্ত বিষয়ের মূলে প্রবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক যায়, তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচার যায়, চতুর্থে প্রীতি যায় এবং পঞ্চমে সুখস্থানে উপেক্ষা আসে। যোগদর্শনেও এ সকল তত্ত্বের কথা আছে। সুতরাং ইহা কোনও নূতন ব্যাপার নহে। ধ্যানের ফল ইদ্ধি বা ঋদ্ধি—"চত্বারো ইদ্ধিপাদো"। এবং দশ প্রকার ঋদ্ধি। অধিষ্ঠান-বীথি ও অভিজ্ঞা-বীথিও ধ্যানের ফল। আবার দিব্য চক্ষু, দিব্য শ্রোত্র, পরচিত্ত বিজ্ঞান (থট রিডিং) ও পূর্ব্ব-নিবাসের অনুস্মৃতি, ইহাও যোগীর হইয়া থাকে।

কামলোক ও রূপলোক অতিক্রান্ত হইলে যোগীর দৃষ্টি অরূপ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় অনন্ত-দেশ-জ্ঞান হয়। তাহার পর দশধা অবস্থা। তাহার পর আরও অভিজ্ঞান আসে; উহার পর অনিমিত্ত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম্ম বা গুণশূন্য জ্ঞান এবং পরিশেষে শূন্যতা উপলব্ধি।

এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কেবল শব্দঝঙ্কার মাত্র। কিন্তু ইহাও সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা ইহার বিশেষ বিবরণ চাহেন, তাঁহারা বুদ্ধঘোষের ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর টীকা ও বিশুদ্ধি-মার্গ দেখিতে পারেন। ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন, বিশেষতঃ যোগদর্শনে পাওয়া যাইবে। ইহার ফল অর্হত্ব অথবা বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হইলে নির্বাণ। নির্ব্বাণ অসংযত ধাতু অর্থাৎ সংস্কারশূন্য-ধাতু—উহা অস্তিত্ব-লোপ নহে বা "এনাইহিলেসন্‌" নহে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই দুঃখবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্য-জীবন অসার, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই মত নহে। হিন্দু ও বৌদ্ধ "পেসিমিষ্ট" নহেন। মানব-জীবন অমূল্য, ইহা উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

অতএব বৌদ্ধদের মূল নৈতিক মত সংক্ষেপে বলিতে গেলে কুশলকর্ম্মের অনুষ্ঠান। কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পূর্ব্বজন্মের সুসংস্কার থাকা চাই এবং থাকিলে মনোবৃত্তি সেই অভিমুখেই থাকে। কাম বা তৃষ্ণা কার্য্যের প্রেরক। চেতনা সাহায্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

১। Transcendental percept. ২। Transcendental visualisation.

সাধন হয়। পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে শীল ও পারমিতা আচরণ, করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের অনুসরণ এবং বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহার উপকারিতা উপলব্ধি, এই ভাবে সংস্কারসমূহ গঠিত হয়। যাঁহারা উচ্চ পন্থায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধ্যান আবশ্যক, উচ্চ তত্ত্ব কেবল ধ্যানের দ্বারাই জানা যায়। মূল তত্ত্ব সংবৃত বা আচ্ছাদিত; এক একটা আচ্ছাদন খুলিয়া গেলে ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। প্রথমে কামলোক, তাহার পর রূপলোক, তাহার পর অরূপলোক। লোক অর্থে এক একটি অন্তর্জগৎ বা সত্যের জগৎ। এক একটি ধ্যানে এক একটি নূতন আধ্যাত্মিক জগৎ পাওয়া যায়। এইরূপে চতুঃ বা পঞ্চ ধ্যান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের জ্ঞান হয়। এবং একবারে সংস্কারশূন্য; কামনাশূন্য হইলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হয়।

বুদ্ধপূর্ব্বযুগে নৈতিক তত্ত্ব কি ভাবের ছিল, দেখা যাউক। কাম শব্দটি বহু প্রাচীন। অথর্ববেদে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কর্ম্ম শব্দটীও বহু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে ধর্ম্ম-শব্দ ঠিক বৌদ্ধভাবে ব্যবহৃত হইত কি না, বলা যায় না। তখন উহা আচার বা রীতি অর্থে ব্যবহৃত হইত। তবে তৈত্তিরীয় শিক্ষা-বল্লীতে "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর", "ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্", এ স্থলে ধর্ম্মশব্দ বৌদ্ধভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শিক্ষাবল্লীতেই আবার আচার্য্য "যানি অনবদ্যানি[1] কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি", "কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"[2], "যানি অস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি", তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উপদেশে, বৌদ্ধ দশ শীল ও ষট্ পারমিতার মূল ভাবসমূহ পাওয়া যায়। তাহার পর কর্ম্ম ও ভব বা সংসার-বিষয়ক আলোচনা বৃহদারণ্যকে[3] পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যায়। "যে বিষয় পুরুষের আসক্তি, সেই বিষয় লিঙ্গ-প্রধান মন কর্ম্মের সহিত প্রাপ্ত হয়।...............সেই লোক হইতে আবার মনুষ্যলোকে কর্ম্ম-করণের জন্য আসে। সে কামনা সহ অথবা কামনাশূন্য হইয়া আসিয়া থাকে। সে যদি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম অথবা আত্মকামসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না—সে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" উহার পূর্ব্বের শ্লোকটিও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। "এই পুরুষকে কামময় বলিয়া থাকে; তাহার কামনা যে ভাবের হয়, তাহার চেষ্টাও সেই ভাবের হইয়া থাকে এবং কর্ম্মও সেই ভাবের হইয়া থাকে। আবার যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।" এই ভাবের আলোচনা বিভিন্ন উপনিষদে পাওয়া যায়। কাজেই উহা বৌদ্ধপ্রণীত নহে, উহা বৈদিক যুগেরই সম্পত্তি।

তাহার পর ধ্যানের কথা। ধ্যানযোগের কথা শ্বেতাশ্বতরে (১অ, ৩ শ্লো) আমরা দেখিতে পাই। ঐতরেয় উপনিষদে (১অ, ১১ শ্লো) "মনসা ধ্যাতম্" শব্দ পাওয়া যায়। সংহিতা-যুগেও ধ্যানের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতে ধ্যান, যোগ, সমাধি প্রভৃতি কবে আসিল, কোন্ ঋষি ইহার প্রণেতা, তাহা বলা যায় না। অপর কোনও প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার চিহ্ন দেখা যায় না। ভারত যে ধর্ম্ম-প্রাণ, এক যোগ ও সমাধিই তাহার প্রমাণ। অপর দেশে ঐহিক আবিষ্কার

১। অনিন্দ্যনীয়ানি। ২। বিচলিতব্যম্। ৩। ৪ অ, ৪ ব্রা, ৩ শ্লো।

অনেক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক মিশরেই শিল্প ও বিলাস-সামগ্রী কত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের উপায় ভারত ছাড়া অপর কোনও দেশে হয় নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই যোগবিশ্বাসী, অথচ পন্থাভেদ কেন হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পন্থাভেদ বিশেষ নাই। উভয় সম্প্রদায়ই সৃষ্টির মূলে সত্তা দেখিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ই সৃষ্টিক্রমে বিবর্ত্ত, বিকার, পরিণাম বা অন্যথাভাব স্বীকার করেন। মূল সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তবে মানবাত্মার সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত নহেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু মতে মানবাত্মা, পরমাত্মারই অংশ এবং উহা নিত্য ও অব্যয়। কর্ম্ম-ফল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বৌদ্ধেরা সেরূপ আত্মা স্বীকার করেন না। মৃত্যুর পর কর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কর্ম্মের আধার কি, সংস্কার কোথায় থাকে, পুনর্জ্জন্ম কাহার হয়, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে ভাল বুঝা যায় না। বৌদ্ধমতে কর্ম্ম যেন একটা ঐশী শক্তি এবং "কন্সারভেসন্" ও "পোটেন-সির" মত একটা জাগতিক নিয়ম, উহার ক্ষয় ব্যয় নাই, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা আপনার নিয়মে চলিয়া থাকে। বোধ হয়, মীমাংসকেরাও এই মত পোষণ করেন। তাঁহাদেরও কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্ব এবং এই অপূর্ব্বও জড় নিয়মের মত মানবাত্মাকে বশীভূত করিয়া রাখে। উহাই আপন বলে স্বর্গে লইয়া যায়, আবার উহাই মর্ত্তে আনিয়া ফেলে।

বৌদ্ধ-তত্ত্ব কতকগুলি বিশ্বাস, আদেশ ও উপদেশ-সমষ্টি নহে। উহা যুক্তি, তর্ক ও সঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপাসনা নাই। ঈশ্বর নাই, কাজেই উপাসনাও নাই। এমন কি, বুদ্ধেরও উপাসনা আবশ্যক নাই। কাজেই কর্ম্ম, অনুষ্ঠান, শীল, চরিত্র বা মনুষ্যত্বের দিকেই তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য ছিল। শীল, চরিত্র, মুদিতা, করুণা প্রভৃতির সাধন এত অনুষ্ঠান-বহুল হইয়াছিল যে, ক্রমশঃ তাহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর আবার পঞ্চধ্যান, ইহারও আবার শত শত প্রকরণ। কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সেই কারণে বৈদান্তিক ধর্ম্মও সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ও অনুষ্ঠানের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণে উহাকে পিরামীড মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার বলিয়া বুঝিত; উহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিত না। অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের ভিত্তি নিজের মনের ভিতর নহে; উহা কেবল শুষ্ক সাধনেই পরিণত হইয়াছিল। কাজেই উহাদের স্থল পৌরাণিকেরা তাঁহাদের সরস ভাব ও সরল সাধন দ্বারা অধিকার করিলেন। উপনিষদেরা রসের দিকটা আবশ্যকীয় বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মকে রসময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগৃহে রসের উল্লেখ বা রসসৃষ্টি দেখা যায় না। অন্ততঃ থেরবাদী বৌদ্ধেরা নহেন। জাতকে ঐ চেষ্টাটা হইয়াছিল; আখ্যায়িকার আচ্ছাদনে রস উদ্ভাবনের উহা চেষ্টা বটে, কিন্তু উহাতে লাবণ্যলালিত্য, সাহিত্য-কলা, সৃষ্টি-নৈপুণ্য নাই। ব্রাহ্মণেরা আখ্যায়িকার দিকটা সাজাইয়া গোছাইয়া এক বিপুল ধর্ম্ম-সাহিত্য রচনা করিয়া জন-সাধারণের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইয়া দিলেন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদের বাঁধা দর্শনশাস্ত্র নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধের

উপদেশ ও বিচার-প্রণালী দর্শনমূলক। দার্শনিকের পিপাসা, বুদ্ধের উক্তি ও তত্ত্ববিচার পাঠ করিলে তৃপ্তি হয়। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি ও কৌতূহলই বিজ্ঞান ও দর্শনের সৃজন করিয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের (১২৯) সৃষ্টিসূক্তে "সৎ বা অসৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না,—বায়ু, আকাশ ছিল না; কি সামগ্রীর দ্বারা সমস্ত আবৃত ছিল এবং কাহার দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পূর্ব্বে কি সমস্তই জলময় ছিল?" ইত্যাদি। এখানে একটা প্রবল দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধদেরও অষ্ট-দৃষ্টির উল্লেখ আছে। হয় ত এই দৃষ্টিই পূর্ব্বে দর্শন-কঙ্কাল ছিল। "অহং অভুবং অতীতাধ্বানম্, নাভুবমতীতাধ্বানং, কিং স্বিদং, কথং স্বিদং" অর্থাৎ "আমি পূর্ব্বে ছিলাম বা পূর্ব্বে ছিলাম না; ইহা কি? ও ইহা কেন," এই সকল প্রশ্ন হইতেই দর্শনের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহার পর দুঃখ। দুঃখের উৎপত্তি প্রভৃতি চারিটি আর্য্যসত্য, ইহাও দার্শনিক অনুসন্ধান। যোগদর্শনেও ইহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন রোগ, রোগের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে এবং উহা যেমন চিকিৎসা-দর্শন বা উহার মূল, এই আর্য্যসত্য কয়টিও বৌদ্ধতত্ত্বের মূল এবং ইহা বৌদ্ধগৃহে বিশেষ ভাবে আদরের সামগ্রী। বৌদ্ধজ্ঞান যুক্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; উপনিষৎযুগের তত্ত্বসমূহ বুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল এবং তিনি উপনিষদের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষৎ হইতেই দর্শনযুগের আরম্ভ এবং বুদ্ধ, দার্শনিক বিচার হইতে কখন বিচলিত হন নাই।

বৌদ্ধ জ্ঞানবাদ

বুদ্ধ পূর্ণমাত্রায় শূন্যবাদী ছিলেন কিনা অথবা তিনি ক্ষণিক-বাদী ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ একটা জটিল দার্শনিক বাদে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং উহাও বৌদ্ধ দর্শনেরই অঙ্গ ধরিতে হইবে। বুদ্ধ, প্রকৃতির পশ্চাতে এক মহাসত্তা দেখিলেন। প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বায়স্কোপের দৃশ্যাবলীর মত উহার অতীত ক্রিয়াসমূহ কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে, আর ভবিষ্যৎটাও কোন একটা অজ্ঞাত বস্তুতে লীন হইতেছে; কেবল বর্ত্তমানটাই আমরা বুঝিতেছি, এইটুকুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। বর্ত্তমান সতত অতীতে মিলাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাকারে সম্মুখীন হইতেছে। এরূপ স্থলে বৌদ্ধসাধনা "তত্ত্বমসি"তে না পৌঁছাইয়া প্রতীত্যসমুৎপাদে উপস্থিত হইল। শূন্যের উপাসনা নাই, শূন্যের হস্তামলকবৎ উপলব্ধি নাই, শূন্যের সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই, উহার বিবর্ত্ত নাই, ধ্যান দ্বারা কেবল ঐ ভাবাভাবরূপী বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শন বা যুক্তিতে কথাটা বেশ ভাল, জগতের একটা নূতন চিন্তা বটে, কিন্তু জিনিসটা পূর্ণ অবয়বের নহে। ইহাতে সব সমাধান হয় না। ইহার কতক অজ্ঞেয়ের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, আবার কতক মানুষের জানিবার আবশ্যক নাই; যেহেতু তাহার অনুসন্ধান নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ তাহা ছাড়িবে কেন? মানুষ প্রশ্ন-পটু, এক একটা বিষয় প্রশ্নাকারে মানব-সমাজে সমাধানের জন্য আসে। ইহাও জগৎ-রহস্যের একটা রহস্য।

মানবজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা অনেক অনুশীলন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে জ্ঞানই নহে, তাহা বৌদ্ধেরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কেবল শিশু ও পশুরই হইয়া থাকে। বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রায় একই ভাবের বোধ হইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মানুষ চিরকালই একভাবে দেখিতেছে; তাহাতে কেবল চক্ষু-লব্ধ জ্ঞানই হয়। কিন্তু সৌর জগতের জ্ঞান, উহার নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুভূতি মানসিক সন্নিবেশ। ইন্দ্রিয়সমূহ সামগ্রী সংগ্রহ করে, মন তাহাদের সাজাইয়া জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান রচনা করে। মন—আধার, জ্ঞান—আধেয়। মনের আকার অনুসারেই জ্ঞানের আকার হয়। কার্য্যকারণ, সম্বন্ধ, দেশ, কাল, রাশি, এ সমস্ত বাহির হইতে বা ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। মানুষ যাহা পর পর দেখে বা শোনে, মনের ভিতর উহা সেরূপ ভাবে সজ্জিত হয় না, কাজেই মন একটা আধার। সন্নিবেশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, উহা অপর কোন শক্তিদ্বারা সজ্জিত হয়। উহা মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ, সম্বন্ধ, কাল প্রভৃতি মনেরই সামগ্রী, উহারই ছাপে ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত জ্ঞানসমূহ মুদ্রিত হইয়া থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই এ তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। আবার জ্ঞানের দুইটা দিক্ আছে। বস্তু-প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, উহা উপস্থিত না থাকিলেও কেবল নামের দ্বারা উহা অনুভূত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয়ের জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রকৃতি, সৌরজগৎ, জীব প্রভৃতি বহু খণ্ড-জ্ঞানের সমষ্টি, উহা একটি তত্ত্ব। বৌদ্ধদের সমুদয়-গ্রহণ, অর্থ-গ্রহণ, নামগ্রহণ, সংকেত-সম্বন্ধ প্রভৃতি জ্ঞানের অনেক পর্য্যায় আছে। সকল জ্ঞানের আধার হইলে বুদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান সকলের সমান নহে। একই বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয়, বৌদ্ধমতে তাহার বিভিন্ন নাম আছে—প্রজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান ইত্যাদি। ইংরাজী "এক্স্পিরিয়ান্স্" এই প্রজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান।

জ্ঞান ও সত্য পরস্পর সম্বদ্ধ। সত্য অবধারণই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। তবে মানুষ কতটুকু সত্য জানে? আমরা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলি, তাহার অধিকাংশই অপরের জ্ঞান এবং উহাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। তাহার উপর অনেক বিষয় মতামত মাত্র; তাহা সত্য, কি অসত্য, বুঝিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য মতে সাধারণতঃ সত্য দুই প্রকার—ধ্রুব বা নিশ্চিত[১] ও কাদাচিৎক[২]। সত্যের অনেক ভাগ হইতে পারে—নিশ্চিত, অনিশ্চিত, সংশিত বা উপেক্ষিত। গুরুত্বের জন্য পতন, মেঘ ও বৃষ্টি, মঙ্গলগ্রহে জীব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধমতে (শূন্যবাদী) সত্য দুই প্রকার। সংবৃত্তি ও পারমার্থিক। অবিদ্যা জীব-মাত্রেই সাধারণ এবং উহা জগতের প্রকৃত তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া জীবের সাধারণ জ্ঞান সংবৃত্তি-জ্ঞান অথবা বেদান্ত-মতে ব্যবহারিক জ্ঞান। প্রজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান প্রভৃতি প্রসারিত হইলে পারমার্থিক জ্ঞান হইয়া

১। Necessary. ২। Contingent.

থাকে। তবে উহা ধ্যান-সাপেক্ষ। শূন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও সংসারের জ্ঞান পারমার্থিক। উহা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। তবে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রভৃতি কাহার? ইহা কাহার আশ্রিত? বৌদ্ধমতে উহা চিত্ত বা উহার ধর্ম্ম; উহা অহম্-আশ্রিত নহে। বৌদ্ধমতে জ্ঞান-প্রকরণে ইন্দ্রিয়-সংবেদন মূল ব্যাপার, অথবা প্রজ্ঞা মূল ব্যাপার, তাহা বড় বুঝা যায় না। উভয়ই ক্ষণিক, ভাবাভাব-সম্পন্ন ও ক্রম-অক্রম-সমর্থ। সকলই চঞ্চল, অস্থির, উৎপাদ-নিরোধশীল।

বৌদ্ধ সত্তাবাদ

জ্ঞান ও সত্তা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। জ্ঞান সত্তারই হইয়া থাকে। এখন যদি সত্তা একই হয়, তাহা হইলে বহু সমাবেশ কি করিয়া হয়? তাহার উত্তর, সত্তার ক্ষয় ব্যয় নাই; ধর্ম্ম ও গুণেরই উৎপাদ বিনাশ হয়। হিন্দুদর্শনে দ্রব্য বা সত্তা বা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যের আশ্রিত। তথতা বা ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধ একসত্তাবাদী। রত্নকীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত ছয়খানি ন্যায়গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত করিয়াছেন। উহাতে সত্তা সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা প্রথমে উল্লেখ করি। রত্নকীর্ত্তি, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-তন্ত্র-প্রচলিত সত্তার সাতটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থক্রিয়া-কারিত্ব, সত্তা-সমবায়, স্বরূপ-সত্তা, উৎপাদব্যয়-ধ্রৌব্য-যোগিত্ব, প্রমাণ-বিষয়ত্ব, সদুপলম্ভ-প্রমাণ-গোচরতা, ব্যপদেশ-বিষয়ত্ব। এইগুলির মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই, বৌদ্ধমতে সত্তার প্রধান লক্ষণ। "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ" এই বিবাদটি তুলিয়াই রত্নকীর্ত্তি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের সৎ ও বৈদান্তিক সৎ পরস্পর বিরোধী। যাহা হইতেছে, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই সৎ। বৈদান্তিক বলেন, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই অসৎ—কেবল মূলাধারই সৎ। ক্ষণভঙ্গ-বাদীদের মতে কার্য্য-কারণ-সন্তান অনবরত চলিতেছে—বীজ হইতে অঙ্কুর এবং তাহার পৃষ্ঠভাবী অপরাপর ব্যাপার। ইহার উৎপত্তি নিবৃত্তি জানিবার উপায় নাই, অন্ততঃ লৌকিক জ্ঞানে উহা হয় না। বৌদ্ধেরা জগৎকে কেবল ধারাবাহিক কার্য্য-কারণরূপে দেখিয়াছিলেন। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে এ নিয়মটা খাটে। আর উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ-শক্তি দ্বারা জগতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, ইহাও আধুনিক মতে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কার্য্য-কারণের একটা বৃত্তি বা নিয়ম আছে; তাহা না হইলে সাংখ্যকারের (সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ) ইহার কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। অপরদিকে কৃতক বস্তু অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি ক্ষণিক বলিতে পারা যায় না। যে বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, যাহার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাতে ভাব অভাবের সমষ্টি ধরিতে পারা যায়। বীজ ও অঙ্কুরে অনেক ভাব অভাব আছে, অনেক উপচয় অপচয় আছে। অথবা সৌগত দৃষ্টান্তে প্রদীপে তৈল ও বর্ত্তিকা-ক্ষয়ে কতকগুলি ক্রিয়াসন্তান ধরা যায়। কিন্তু ঘটের বেলায় কি ক্রিয়া হয়?

ইহার উত্তরে সৌগতেরা বলেন, উহা তখন কারণরূপী হইয়া থাকে, ক্রমশঃ উহাতে কার্য্য হইবে বা ক্ষয় হইবে। আবার ঘটে অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা শক্তি আছে। এই অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব ঠিক কি, তাহা বুঝা যায় না। ইহার মূল অর্থ, বস্তুতে কার্য্য করিবার শক্তি আছে। মধ্যযুগের সৌগতেরা শক্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা শক্তি মানেন না। ঘট, পাক দ্বারা বা অপর উপায়ে ধ্বংস হইলে, উহা ত্রাসরেণু, দ্ব্যণুক এবং অবশেষে মূল অবয়বী পরমাণুতে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা সম্ভবতঃ এই অর্থক্রিয়া দ্বারা ঐরূপ কোনও ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। ঘটে সম্প্রতি যে অর্থক্রিয়া-কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি রহিয়াছে, পরমুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হয় এবং এই পরিবর্ত্তন রাসায়নিক। তবে বৌদ্ধেরা বস্তুর উপাদান-কারণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহা অনুমানের বিষয়। তাঁহাদের পঞ্চ ধাতু আছে অর্থাৎ ভূত আছে; কিন্তু পরমাণুর স্থান নাই। ক্রমাগত কার্য্যধারা চলিতে থাকিলে মানুষের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই। তবে বস্তুসমূহের এক একটা অবস্থায় এক একটা অর্থসিদ্ধি বা বস্তু হইতে কার্য্যসিদ্ধি আছে, এই জন্য অভিজ্ঞতা।

বৌদ্ধদের জ্ঞানমূলে অপোহভাব আছে। অর্থাৎ গো-জ্ঞানে "অগৌ" বা গরু ব্যতীত অপর বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে গো-জ্ঞান হয় না। বৌদ্ধভাষায় গো-শব্দ "অগবাপোঢ়" অর্থাৎ যাহাতে গরুর রূপের অভাব আছে, সেই জ্ঞানটি থাকা চাই। ইহা ছাড়া তাঁহারা জাতি স্বীকার করেন না। বস্তুসমূহ স্বলক্ষণ অর্থাৎ তাহারা যাহা, সেই লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যায়। জাতিটা অনুমানের বিষয়। "দণ্ডী পুরুষ" ইহা একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং এই বিশিষ্ট বুদ্ধিই সামান্য জ্ঞান বা জাতিজ্ঞান। সামান্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি উপাধি চক্রমাত্র। ব্যক্তি-গ্রহণই পটু-প্রত্যক্ষ। আবার অবয়বী বলিয়া কোনও জিনিষ নাই অর্থাৎ নৈয়ায়িক মতে বস্তুর যাহা মূল অর্থাৎ পরমাণু, তাহাই অবয়বী এবং অপর সমস্ত বস্তু অবয়ব। বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করেন না। উঁহারা বলেন, অবয়বের সমষ্টিই অবয়বী।

বৌদ্ধেরা বস্তুর স্বভাব স্বীকার করেন না। অগ্নির উত্তাপ অগ্নির স্বভাব বলিতে পারা যায় না। যেহেতু কাষ্ঠ, ইন্ধন ও বহ্নি সংযোগ না হইলে অগ্নি হয় না, উহাতেও কার্য্য-কারণ-ভাব রহিয়াছে। যদি বস্তুর স্বভাব কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্যথাভাব কি করিয়া হয়? দুগ্ধের স্বভাব দধি অবস্থায় থাকে না অথবা ঘৃতও দুগ্ধ নহে। কাজেই বস্তুর স্বভাব কিছুই নাই। যদি সকল জিনিসই ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাহার ভাবান্তর ছাড়া উপায় নাই।

বৌদ্ধেরা সম্বন্ধ বা প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন কেবল বীজ সাহায্যে হয় না, উহাতে মৃত্তিকা, জল ও উপযুক্ত ক্ষেত্র আবশ্যক হয়। সুতরাং কারণের সহকারী অপরাপর ব্যাপার না থাকিলে কার্য্য হয় না।

বৌদ্ধেরা জগৎকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় ঔপনিষদিক ভাব নহে। তবে উহার মধ্যে ঐ সাময়িক অনেক মত প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। শূন্যবাদী

বৌদ্ধ এক শূন্য ছাড়া অপর কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। কিন্তু এরূপ হইলে ধর্ম্মের স্থান কোথায়? নাগার্জ্জুনের মতে ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলা যায় না। অমোঘ-ধর্ম্ম আছে এবং সে অমোঘ-ধর্ম্ম শূন্যতা বা প্রতীত্যসমুৎপাদ উপলব্ধি করিলেই হইয়া থাকে, ইহাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাহা সংস্কারপ্রধান, তাহা মৃষামোষধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম। উপনিষৎ-যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের আবির্ভাব হয়। দর্শনগুলি যেমন একদিকে তত্ত্ববিচার, অপর দিকে উহাতে একটা ধর্ম্মের কঙ্কালও আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনও বটে, আবার উহা একপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ। যে মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার স্থান ধর্ম্ম-জগতে অতি উচ্চ। উহা প্রায় সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছে এবং একটা নূতন আচার, অনুসন্ধান ও মানবাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া মানব-সমাজে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

দুই খণ্ড সমিৎকাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অগ্নি-উপাসকেরা মনে করিতেন যে, সমিৎকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে। তাই সমিধ্ বড় পবিত্র। সমিধ্‌কে স্বস্তিক বলা হইত। সমিৎকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড হইতে দিব্যাগ্নি ও অপর খণ্ড হইতে পার্থিবাগ্নি উৎপন্ন হইত। যজ্ঞে আর তিনখানি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠত্রয়কে পরিধি বলা হইত। পরিধিও অগ্নির জনক। অগ্নি পূর্ব্বে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। ইন্দ্র বজ্রমধ্য হইতে তিনপ্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক অগ্নি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, আর এক অগ্নি জীবান্তর্গত হইয়া জীবগণের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন। অগ্নি, মাতা পৃথ্বীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির জনক এবং অগ্নিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ। পরিধি-কাষ্ঠত্রয়ের একটী মাতা পৃথ্বীর প্রতিনিধি, একটী তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির জনক বলিয়া অগ্নি পিতৃরূপী, আর একটী কাষ্ঠ জীবের প্রাণের স্বরূপ। যজ্ঞে পরিধিকাষ্ঠত্রয় ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিদুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তাহার নিম্নে কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করা হয়। পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনী শক্তিরূপে পৃথ্বীদেবী ও বিশ্বপিতাকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বদ্ধ করে। ত্রিকোণাকারে সজ্জিত পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকে, পুরোহিত তারপর তাহাও প্রজ্বালিত করেন। প্রথম সমিধ্ দিব্যাগ্নি—দ্বিতীয় সমিধ্ পার্থিবাগ্নি। পুরোহিত এই দ্বিতীয় সমিদগ্নি দ্বারা বসন্ত ঋতুকে প্রজ্বালিত করেন এবং ইহা দ্বারা উৎপাদনক্ষম সমগ্র বর্ষকে প্রজ্বালিত করেন।

বৈদিক আখ্যানে পাওয়া যায়, অগ্নি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতরিশ্বার নিকট প্রথম প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত করিল। মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অথর্ব্বা ভৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য মনুকে প্রদান করিলেন।

নানা ঋষিবংশদ্বারা অগ্নি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ঋষি অঙ্গিরা অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন বলিয়া শতপথ উপদেশ করিয়াছে। অঙ্গিরার জন্য অগ্নি হুত ও তাঁহা দ্বারা স্তুত হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে, অপ্নবান অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন। ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ সলিলাবাসে অগ্নির পূজা করিয়া আয়ুপরিবারে তাঁহাকে স্থাপন করেন। আয়ু-পরিবারে প্রথম অতিথি হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগের দ্বারাই গৃহে গৃহে নীত হন। বস্তুতঃ ভৃগুগণই মনুষ্যমধ্যে অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন।

ভরদ্বাজদিগের মধ্যেও অগ্নিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যায়। মনুগণও প্রথম অগ্নিস্থাপন করেন। ইঁহারা ইদের গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। অগ্নি মনুদিগের পুরোহিত হইয়া পড়িলেন। শতপথে আছে যে, দেবগণ, মনু ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন।

অগ্নি নহুষদিগের গোষ্ঠীপতি হন। পুরুনীথ শাতবনেয়ের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত। পুরুগণ তাঁহাকে প্রথম পূজা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্নিপূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। নানা রূপে ও নানা নামে অগ্নি নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন স্লাভেরা অগ্নিকে বলিত Ogni, পরবর্ত্তী স্লাভেরা তাহার নাম দিয়াছিল Ogün। লাটিন ভাষায় ইহা Ignis, লিথুয়ানিয়ানে ugnis। শব্দতত্ত্বা-লোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নি, ignis, ugnis, Ogni প্রভৃতি এক সুপ্রাচীন সাধারণ শব্দের রূপান্তর। কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সংস্কৃত 'অগ্নি'-শব্দে যত স্পষ্ট, অন্য কোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশেষ সমস্যার বিষয়। ইহার বুৎপত্ত্যর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার কিছু পরিচয় আমরা দিব।

নিরুক্তি

অমরটীকায় ক্ষীরস্বামী 'অগ্নি'র ব্যুৎপত্ত্যর্থ দিয়াছেন—"অগতি ঊর্দ্ধং যাতি ইতি অগ্নিঃ" (১ম কাণ্ড, ৫৩ শ্লোক)। সাধারণতঃ অগ্নির নিরুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির সার্থকতার পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে, পদার্থবিশেষের এক একটী ধর্ম্ম আছে। জলের যেমন ধর্ম্ম নিম্নে গমন করা, অগ্নির তেমনই ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে গমন করা। অগ্নির এই ধর্ম্ম দেখিয়া ক্ষীরস্বামীর এই ব্যুৎপত্তি।

ঋগ্‌ভাষ্যকার শাকপুণি অগ্নি শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অগ্নিতে এই কয়টী বর্ণ আছে—'অ'—'গ্‌'—'নি'। এই তিনটীর আখ্যাত তিনি অতি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শব্দকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। 'অঞ্জু'র 'অ', দহ্‌ ধাতু হইতে যে দগ্ধ পদ হয়, তাহার 'গ' এবং 'নী' ধাতুর 'নী'কে ছান্দস প্রণালীতে হ্রস্ব করিয়া তিনি 'অগ্নি' শব্দ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

"ত্রিভ্য এব আখ্যাতেভ্যঃ জায়তে। অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু, অঞ্জেঃ অকারমাদত্তে, দহতে-র্দগ্ধশব্দাদ্গকারমাদত্তে, ততঃ নীপরাৎ তস্যৈবা ভবতি। নী ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বো ভূত্বা নির্দিশ্যতে।" অগ্নির এই এক নিরুক্তি।

ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তে বলিয়াছেন,—"অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, প্রথমং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি"—যজ্ঞের অগ্রে— প্রথমে অগ্নিস্থাপনা না করিয়া কোন কাজেরই অনুষ্ঠান হয় না, এই জন্য ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

ীবানের পুত্র বলেন,—"অক্নোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ", ইনি দ্রবীভূত করেন না, রুক্ষতা সম্পাদন করেন, এই জন্যই ইঁহার নাম "অগ্নি"।

অগ্নি সকলকে "অঙ্গং নয়তি" আত্মসাৎ করেন, অতএব ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ'—(১।২।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, —"অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোঽপি . সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে।"—অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিষ্পন্ন অর্থ 'অগ্রণী' অর্থাৎ যাহা অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা যায়; যেমন,—"অঙ্গয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলম্ ইত্যগ্নিঃ।" যিনি উচ্চাবচ কর্ম্মফলের প্রাপক, তিনি অগ্নি। অগ্নি ও পরমেশ্বর সমান। গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত "অগ্রে নয়তি"দ্বারা করিয়াছেন।

বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। বেদের প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণই করিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের ষষ্ঠ কাণ্ডের (১ম প্র ১ম ব্রা, ১১) নির্দ্দেশ এইরূপ, যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহা 'অগ্রি'রূপে সৃষ্ট হইল। যেহেতু, ইহা সর্ব্বাগ্রে 'অগ্রম্' সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম 'অগ্রি'। বস্তুতঃ, 'অগ্রি' তিনি, যাঁহাকে লোকে 'পরোঽক্ষ'ভাবে (mystically) বলে 'অগ্নি'; কারণ, দেবতারা 'পরোঽক্ষ-কামা' অর্থাৎ mysticদিগকেই ভালবাসে। শতপথের উক্তি যথা,—'অথ যো গর্ভোঽন্ত-রাসীৎ। সোঽগ্রিরসৃজ্যত স যদস্য সর্ব্বস্যাগ্রমসৃজ্যত তস্মাদগ্রিরগ্রিৰ্হ বৈ তমগ্নিরিত্যাচক্ষতে পরোঽক্ষং পরোঽক্ষকামা হি দেবাঃ।'—[৬—১।১।১১]

জৈমিনীয় উপনিষদ্ব্রাহ্মণে অগ্নিশব্দের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ব্রাহ্মণ ইহাদের বাচ্য-বাচকভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, 'অ' বর্ণে অমৃতের দৃষ্টি এবং 'গ্নি' বর্ণে মর্ত্ত্যের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে, অগ্নি শব্দের দুইটী অংশ আছে—একটী অমৃত, অপরটী মর্ত্ত্য। দেবতাদের মধ্যে দুইটী অংশ আছে। একটী অনৃত বা মর্ত্ত্য, আর একটী সত্য বা অমৃত। নামরূপাদির অংশটুকু মিথ্যা, আর সেই নামরূপাদির আশ্রয় যে অংশ, তাহা সত্য বা অমৃত। বাচ্য অংশের দ্বিত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহার যে বাচক শব্দ, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একটী অংশের প্রতিপাদকরূপে শিষ্যের বোধসৌকর্য্যার্থ এক একটী অর্থ করা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"এত্যগ্নেরমৃতমপহতপাপ্মশুদ্ধমক্ষরম্। গ্নিরিত্যস্য মর্ত্ত্যমনপহতপাপ্মাক্ষরম্।" ৮—অনুবাক্। ৩য় খণ্ড। ৪। বৃহদ্দেবতা (২।২৪) অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে স্থির করিয়াছেন,—

"জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ॥"

ঋষিগণ যে ইঁহাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিয়া থাকেন, তাহার কারণ—(১) তিনি সমস্ত ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বে জাত হইয়াছিলেন ; (২) যজ্ঞে তিনি অগ্রণী, এবং (৩) তিনি অঙ্গকে সংযুক্ত করেন।

অগ্নির নাম

বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী সংহিতাদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২)—পার্থিব অগ্নির নাম বিপ্রগণ দিয়াছেন 'পবমান', অন্তরীক্ষের অগ্নির নাম 'পাবক' এবং দ্যুলোকস্থ অগ্নিকে বলা হয় 'শুচি'। অথর্ববেদ (৫. ২৪. ২) পাবককে 'বনস্পতি' নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরাণগুলি একটু প্রকারভেদ করিয়া সাধারণতঃ সংহিতারই অনুসরণ করিয়াছে। পুরাণকারগণ বলেন, অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয়। পবমান—ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি ; পাবক—বিদ্যুদগ্নি, শুচি—সৌরাগ্নি। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছে—ইহলোকে ঋষিগণ অগ্নিনামেই অগ্নির স্তুতি করেন, অন্তরীক্ষে ইনি জাতবেদ বলিয়া পূজিত হন এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানর নামে স্তুত হইয়া থাকেন। বৃহদ্দেবতায় এই তিনটী নামের উল্লেখ আছে।[১] নিঘণ্টুকার দৈবতকাণ্ডের প্রথমেই এই তিনটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্ক (৭. ২৩) বলেন, প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা অগ্নি বৈশ্বানর বলিতে সূর্য্য বুঝিতেন। শাকপুণির মতে কিন্তু বৈশ্বানর পার্থিব অগ্নি। পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপুণির মতই মানিয়া লইয়াছেন।

বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটী নাম 'ইন্দ্র'। নিজের রশ্মিজাল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া বায়ুর সাহায্যে তাহা পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির এই নামের সার্থকতা।

নিরুক্ত (৭. ৫) ও সর্ব্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য্যকে 'ত্রিদেব' নামে পরিচিত করিয়াছে।

অগ্নিত্রয়

অগ্নিত্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানর, এই তিন অগ্নিকে বোঝায়। এই তিন স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পার্থক্য দেখান হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রস্তুতি, বিভূতিস্থান বা জন্ম নির্ব্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বৃহদ্দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছে—এইরূপ করিবার কারণ, সমস্ত জগৎ তাঁহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত।

আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে এবং জাতবেদ উভয়ে আশ্রিত ; এইরূপে অগ্নি ও বৈশ্বানর জাতবেদের দুই রূপ হইয়াছে।[২]

সালোক্য, একজাতত্ব ও ব্যাপ্তিমত্তায় তাহারা এক হইলেও তাহাদের পৃথক্ দেবত্ব

১। ইহাগ্নিভূতম্ ঋষিভির্লোকে স্তুতিভিরীড়িতঃ। জাতবেদাঃ স্তুতো মধ্যে স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি।—১।৬৭

২। 'এতে উত্তরে জ্যোতিষী জাতবেদসী উচ্যেতে।'—নিরুক্ত ৭।২৩

স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন কোন সূক্তে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইবে, তখন সেই সূক্তভাক্ হইবেন "পার্থিব" অগ্নি। জাতবেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন মধ্যমাগ্নি। বৈশ্বানর-সম্বোধিত কোন সূক্তের কথা বলিলে, সেই সূক্তভাক্ হইবেন সূর্য্য[১]।

এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মানুষদিগের দ্বারা নীত হয় এবং সেই দ্যুস্থান তাঁহাকে নয়ন করেন। এই জন্য এই উভয় একনামযুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে।

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে—যাঁহারা জাত, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন বলিয়া তাঁহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত হন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত—বিদিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'জাতবেদ'।

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চ্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অন্তরীক্ষস্থান অগ্নি বিদ্যুদ্রূপ কেশযুক্ত বলিয়া এবং দ্যুস্থান অগ্নি রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া কবিরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'কেশী'[২]। তবে প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি[৩]।

শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, পার্থিব ও মধ্যমাগ্নি সূর্য্য হইতে প্রসূত। প্রত্যেক যজ্ঞে অগ্নি ও মরুৎকে চিকীর্ষা করিবার সময় বৈশ্বানরীয় সূক্ত দিয়া কার্য্য করিতে হয়।[৪] এই বৈশ্বানর হইল দ্যুলোকস্থান সূর্য্য। এই কার্য্য ত্রিলোকের অবরোহপ্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই দ্যুলোক-দেবতার স্তুতি করিয়া মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ-দেবতা রুদ্র ও মরুতের স্তুতি করিতে হয়; তারপর পুনরায় স্তোত্রিয়[৫] দেবতা অগ্নির স্তুতি করিতে হয়।

অগ্নির পঞ্চনাম

বৃহদ্দেবতা (২।২২) বলেন, বৈদিক সূক্তে অগ্নির পাঁচটী নাম, ইন্দ্রের ছাব্বিশটী এবং সূর্য্যের সাতটী।

অগ্নির পাঁচটী নাম বলিলে বুঝাইবে—দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা।

১। বৈদিক ঋষি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বোঝায়; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণোদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।[৬]

১। বৃহদ্দেবতা, ১—৯৮-১০০। ২। নিরুক্ত ১২।২৫-২৭। ৩। বৃহদ্দেবতা—১।৯৫

৪। বৃহদ্দেবতা—১।১০১; নিরুক্ত ৭।২৩

৫। অগ্নিদেবতা সম্পর্কেই স্তোত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। যাস্ক ৭।২৩ দ্রষ্টব্য।

৬। বৃহদ্দেবতা—২।২৫; ঋগ্বেদ—১।৯৬।৮

২। পার্থিব অগ্নির নাম 'তনূনপাৎ'। দিব্যাগ্নিকে তনু বলে। তনন (প্রসরণ) হইতে তনু নিষ্পন্ন। তনু হইতে মধ্যমাগ্নির জন্ম। মধ্যমাগ্নি হইতে 'তনূনপাৎ' জাত হইয়াছে।

পৌত্রকে কবিরা 'নপাৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাস্কও বলিয়াছেন—"নপাদিতি অনন্তরায়াঃ প্রজায়াঃ নামধেয়ম্' (৮।৫)। পুত্রের ঠিক পরবর্ত্তী যিনি, 'অনন্তর' বলিলে তাঁহাকেই বোঝায়। তাই বৃহদ্দেবতা (২।২৭) বলিয়াছেন,—

অনন্তরং প্রজায়াস্তু নপাদিতি কপনয়বঃ।
নপাদমুষ্য চৈবায়মগ্নিস্তেন তনূনপাৎ॥

পার্থিবাগ্নি দিব্যাগ্নির পৌত্র; সুতরাং ইনি তনূনপাৎ।

৩। সমবেত নরগণের দ্বারা যজ্ঞে অগ্নি পৃথগ্‌ভাবে পূজিত (শংসিত) হন বলিয়া আপ্রী-সূক্তে অগ্নির নাম হইয়াছে—'নরাশংস'। যাস্কের উক্তিতে কাত্থক্যের মত এইরূপ— "নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাত্থক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্তি"। শাকপূণির মত— 'অগ্নিরিতি শাকপূনির্নরৈঃ প্রশস্তো ভবতি।' কাত্থক্যের ন্যায় বৃহদ্দেবতাও বলেন— যজ্ঞে আসীন হইয়া অগ্নি স্তুত হয় বলিয়া 'নরাশংস' যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪। পার্থিবাগ্নি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈখানস ঋষিগণ তাঁহাকে 'পবমান' নামে স্তব করিয়াছেন।

৫। অগ্নির একটী নাম 'জাতবেদাঃ'। জাত হইয়াই অর্থাৎ জন্মিয়াই —

(ক) ইনি ভূতগণকে জানেন বলিয়াই ইঁহার নাম 'জাতবেদাঃ'।

(খ) বিত্ত হইতে জাত বলিয়া ইঁহাকে 'জাতবেদাঃ' বলে।

(গ) অথবা জাত হইয়াই বিত্ত (ধন) অবগত হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার এই নাম।

(ঘ) বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ভূতগণ দ্বারা বিদিত হন, তাই বিশ্বের 'মধ্যভাগেন্দ্রে'র ন্যায় তিনি 'জাতবেদাঃ' বলিয়া স্তুত হন।

নিরুক্তকার যাস্ক (৭।১৯) অগ্নিকে বলিয়াছেন—'জাতবিদ্য', 'জাতবিত্ত', 'জাতে জাতে বিদ্যতে'।

অগ্নির পৌরাণিক নাম

পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেখা যায়, অগ্নি এক, কিন্তু তাঁর রূপ বহু। কোথাও কোথাও অগ্নি ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মে তাঁহার বহুত্ব—'বহুত্বং কর্ম্মসু'। সকল সময়ই তিনি 'সপ্তার্চ্চির্জ্বলনঃ', তিনি 'সপ্তজিহ্বাননঃ'। কখনও কখনও সাতটী আগ্নর উল্লেখ দেখা যায়; তিনটী যাজ্ঞিক অগ্নি—'অগ্নিত্রেতা' বা 'ত্রেতাগ্নয়ঃ'; ইহাদের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দক্ষিণাগ্নি হইলেন মাতা

এবং আহবনীয় হইলেন গুরু। আর বাকী চারিটী অগ্নি হইল—সভ্য, আবসথ্য, স্মার্ত্ত ও লৌকিক। হরিবংশ (১২-২৯২) বলেন, সপ্তার্চির পরিবর্ত্তে অগ্নির তিনটী শিখা আছে, তাই তাঁর নাম 'ত্রিশিখ'। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে অগ্নি পঞ্চ—আত্মা, অগ্নি, পিতা, মাতা, গুরু। যজ্ঞাগ্নির হিসাব অনেক রকমে হয়—পাঁচ, ছয়, আট। অথর্ব্ববেদও এই আটের কথা বলিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৭।২১) পাওয়া যায়—ইন্দ্রের প্রসাদে অগ্নির সংখ্যা সাতাইশ। অন্যত্র (১৩।১০৩) ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটী সাধারণ নাম 'যুগান্তার্ক,' 'সম্বর্ত্তক বহ্নি'। মহাভারতে সূর্য্যের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হইয়াছে—'পাতালজ্বলন'; হরিবংশ কিন্তু এই নামে বোঝেন, ঔর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি, তাঁহাকে; এ ছাড়া দেশ ও কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুরাণে পাওয়া যায়; যেমন, 'তোয়াগ্নিঃ সাগরে'। 'কালাগ্নি' থাকেন মাল্যবান্ পর্ব্বতে অথবা নাগলোকে। 'সপ্তার্চি' প্রভাতে ও সায়ংকালে হেমকূটের উপরে উদিত হন।

বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ধর্ম্মের বসুনামক পত্নীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন অঙ্গিরার পুত্র, শাণ্ডিলের পৌত্র। কোন পুরাণমতে, দেবী শাণ্ডিলী শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতে থাকিতেন; অগ্নি তাঁহারই পুত্র। ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিলী দক্ষপ্রজাপতির অপর পত্নী। মহাভারত একস্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বায়ুদেবতা অনিলের পুত্র। রামায়ণও তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহা হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশ্যপের কন্যা। বায়ুপুরাণ মতে দক্ষের কন্যা। স্বধা ও বসুধারা তাঁহার অপর স্ত্রী। পূর্ব্বে পাবক, শুচি ও পবমান, অগ্নির এই তিন পুত্রের নাম করিয়াছি। পাবকের পুত্র 'কব্যবাহন'—ইনি পিতৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র 'হব্যবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র 'সহরথ,' ইনি অসুরদিগের অগ্নি। বায়ু ও অগ্নিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

কোন কোন পুরাণে অগ্নির কন্যার নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে (২য় অঃ) অগ্নির কন্যার নাম 'ধিষণা'—ইনি হবির্দ্ধানের পত্নী। বায়ুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর একটী কন্যা হবির্দ্ধানের ঊর্দ্ধতম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্নী।

পুরাণকারগণ অগ্নির নানারূপ সংখ্যা দিয়াছেন। বসুধারার পুত্র ও পৌত্র লইয়া ৪৫ জন অগ্নি। বায়ুপুরাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বয়ং অগ্নি ও পাবক, পবমান ও শুচি, এই কয়জনকে লইয়া ৪৯ অগ্নির বিষয় বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ মন্বন্তরে পুরাণোক্ত সর্ব্বমেলিতাগ্নির সংখ্যা ৬১।

• পুরাণমতে অগ্নি পিতৃগণের রাজা। চতুর্থ মনু তমঃ যখন রাজা ছিলেন, তখন ইনি সপ্ত

ঋষির মধ্যে অন্যতম ঋষি ছিলেন। মহাদেবের রুদ্র নামক যে মূর্ত্তি, তাহারই নাম অগ্নি। অগ্নি, সকল দেবতা ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ।

পুরাণে কর্ম্মবিশেষে অগ্নির নামবিশেষে পূজার বিধি আছে। নবগৃহপ্রবেশকালে পাবক নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান উপলক্ষে মারুত, অন্নপ্রাশনে শুচি, নামকরণে পার্থিব, চূড়াকরণে সত্যনাম, গর্ভিণীর চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারে মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিশেষে প্রগল্‌ভ, প্রায়শ্চিত্তে (মহাব্যাহৃতি হোমে) বিধু, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, শান্তির জন্য বরদ, বরদানে দূষক ও বশীকরণে শমন নামক অগ্নির পূজার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আমাদের ইতিহাস

আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোপীয়ানেরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছিলেন, আমরা এখনও সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন। আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। প্রথম প্রথম তাহাই বলিয়াছেন,—"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল না; রাজা-রাজড়া থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজা থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বিশেষ কোন কাজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য।"

"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নানা ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানকার লোক অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর ছিল; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, মিথ্যা কথা তাহাদের স্বভাবের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে কিছু দিন চলার পর যখন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন,—"না, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস তাদের একেবারেই নাই। দুই চারিখানি কাব্য আছে, ব্যাকরণ আছে, একটু আধটু দর্শনশাস্ত্রও আছে, আর বাকী সব অগ্রাহ্য—ইতিহাস একেবারেই নাই।"

এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবেরা একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি স্তবকারী (পাথরের লেখা) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে পারিত না। সাহেবেরা পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্দ্রগুপ্তের নাতির সময়ের। কিন্তু সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন—সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং প্রায় ষোল শত বৎসর একটা ফাঁক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পড়া একটা বিদ্যার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এ বিদ্যা জানিতেন ; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন। ক্রমে এই সকল লেখ পড়িয়া ও সিকা পড়িয়া জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—স্বাধীন রাজারা লেখ দিতেন। তাঁহাদের প্রজারা লেখ দিবার সময় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রাজাদের সকলেই সিকা তৈয়ার করিতেন এবং সিকায় তাঁহাদের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রায় হাজার দুই হাজার রাজা এই ষোল শত বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বন্যা ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল ; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝা গেল না ; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।

দু চার দেশের দু চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়া গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা ঠিক হইল না। এতবড় যে সংস্কৃত-সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাসবাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বেশ ঠাস গাঁথুনী হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন যে, "ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুপ্তদের সময়েই হইয়াছিল—১৩।১৪ শত বৎসর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার ছিল না, সভ্যতার চিহ্ন বড় একটা ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু চর্চ্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়া পড়িল ; সে ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, গুপ্ত রাজারা কোন রকমে ভাঙ্গাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে ইহাদের ইতিহাস টিতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব অন্ধকার।"

"আলোর মধ্যে বেদ। সে বেদও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লেখা, কিন্তু আমরা ধরিতে পারিতেছি না। সুতরাং ঋগ্‌বেদ খিও খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই যাইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১।১২ শত বৎসর খিস্ত খৃষ্টের আগে।"

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইয়া গিয়া খিও-খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর আগে পর্য্যন্ত পৌছিল। তার মধ্যে আবার বুদ্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু আঁট রহিল। তার আগে সব ধূপ্‌কা।

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যটা ভাল করিয়া সব দিক্ থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দ্দশাটা হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়—প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে যাঁহারা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে হয় এবং তাঁহাদের কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্ব্বাপর ধারা দাঁড়ায়। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না।

এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পুথির একখানি ভাল ক্যাটালগ আজও তৈয়ারি হয় নাই। আর ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। কিন্তু শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্মৃতি হইয়াছে। ঋষিদের যে স্মৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ঋষিদের স্মৃতির টীকা করিয়াছেন।

তারপর মুসলমানরা যে সময় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ঋষিদের স্মৃতি ও টীকাকারদের টীকা চলিল না। ব্রাহ্মণেরা তখন প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এক একটা নিবন্ধ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন। নিবন্ধে আর একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। অনেক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকদ্দমা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুরা স্বাধীন হইয়াছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্মৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই। এই প্রমাণ ক্রমে খাটিয়া খুটিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

সুতরাং ভাল করিয়া স্মৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে। আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান—এই ভাবে পড়া, পূর্ব্বে না হইলেও পূর্ব্বে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা আবছায়া আবছায়া এই রকম ভাব ও জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে "হেমাদ্রি"র প্রকাণ্ড নিবন্ধটা সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে, হেমাদ্রির সময়ও তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন,—দেবগিরির রামচন্দ্র রাজার অধীনে তিনি বড় বড়

রাজকার্য্য করিতেন। সেটা ১২৫০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি যে সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার পূর্ব্বে হইবে নিশ্চয়ই। কারণ, তিনিও ত একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্। তিনি আর পুথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া বোম্বাইর মাণ্ডলিক সাহেব, মনুর উপর মেধাতিথির যে টীকা আছে, সেটা ছাপাইয়াছেন। মেধাতিথি যে সকল বইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ করিতে করিতে গিয়াছেন।

বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র যিশুখৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়,—পাণিনি যে সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়,—মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত। পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে—যিশুখৃষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

গৌতমও তাঁহার আগেকার স্মৃতির বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে। তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে গৌতমের আগেও স্মৃতি ছিল। স্মৃতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেদের অধীন। লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর ঋষিদের যে সকল কথা স্মরণ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তারপর স্মৃতি হইয়াছে,—এই রকম করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস দিতেছি।

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মগধে পর পর ৫৯ জন রাজা হইয়াছিলেন। তার পর নন্দরাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। নন্দরাজারা যিশুখৃষ্টের ৪শত বৎসর পূর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পার্জিটার সাহেব এই ৫৯ জন রাজার নাম অনেক পুথিপাঁজি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজায় ১৫ শত বৎসর হইবে; ৪ শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০০ হয়। কিন্তু পার্জিটার সাহেব একশ বৎসরে ৪ জন রাজা ধরেন নাই—১০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে ১২শত বৎসরে অথবা তাহারও পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে বলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিশুখৃষ্টের ২৫শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বলেন,

কলির ৬শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, আর কলি ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; সুতরাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

ঋষিদের তখন অসীম প্রভাব। তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাঁকজমকের বর্ণনা। যজ্ঞটা কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয়, তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়া পড়িল।

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্যা ছিল, একমাত্র কন্যা; তাহার বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধু-সৌবীরের রাজা। সিন্ধুদেশে সৌবীর-বংশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইল। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের দুইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এতদিন সুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া গিয়াছে পারস্য উপসাগরের ধারে। অনেকে বলেন, সুমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকে বলেন—না, এরা মিশর-দের চেয়ে একটু নূতন। আমরা বলি, সুমেরদের যখন এতবড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে পাওয়া গিয়াছে, তখন সুমেররা ভারতবর্ষ হইতে পারস্য উপসাগরে যাইতে পারে, পারস্য উপ-সাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর। সে ত যিশু খৃষ্টের ৩।৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, এই দুইটী জিনিষ ছাড়িয়া দিলে আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে হস্তিনা নগর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্‌বংশ কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজত্ব করেন। হস্তিনা— গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনার ধারে। প্রায় এই সময় পরীক্ষিদ্‌বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান কালের ব্যাপার, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। যাঁহারা পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকৃষ্ণের সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিসীমকৃষ্ণের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্ত্তমানেও হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কেমন

করিয়া হয়? পুরাণের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্ত পরবর্ত্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাগুলি একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পারেন না। তাঁহারা এটাকে হয় নির্ব্বোধের কাজ, না হয় জুয়াচোরের কাজ বলিয়া মনে করেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসও অধিক। আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথা পার্জিটার সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্ত লোককেও স্বীকার করিতে বলিতেছেন।

অধিসীমকৃষ্ণের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন। বয়স তাঁহার এখন ৭৫।৭৬ হইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান হইয়া আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় মায়া; আমি সে সময় হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত। সুতরাং পুরাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, সেটা একটু মন দিয়া শোনা উচিত। তিনি যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্তু তিনি নিজের কোট ছাড়িলেন। তাঁহাকে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারণ, ইঁহারাই এখন ইউরোপের মধ্যে বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব খুব হুঁসিয়ার লোক। তিনি যে আপনার কোট ছাড়িয়াছেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান করা তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—আমি এখানে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। ম্যাকডোনাল্ড ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর; না থাকে না কর; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে tradition, সেটা বিশ্বাসযোগ্য।

এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরাণদ্বারায় ঢালিয়া সাজিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু খৃষ্টের ৬ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে যিশু খৃষ্টের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি—ইঁহাদের সময় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খৃষ্টের নয় শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একজন দুইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেহ যিশু খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২শত বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইঁহারা সকলেই পাটলীপুত্রে পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগর যিশু খৃষ্টের ৫শত বৎসর পূর্ব্বে

রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য থাকে। সুতরাং পাণিনিকে ৫শত বৎসরের পূর্ব্বে দিবার আর উপায় নাই।

এইরূপে সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে। এ জিনিষটাকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ১৮৲।১৯৲ টাকায় একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃতের কাজ সারেন। পণ্ডিত যাহা বলিয়া দেন, তাঁহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী